বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম ভাগের রেখাচিত্র

দ্বিতীয় ভাগের সূচী

দ্বিতীয় ভাগের রেখাচিত্র

তৃতীয় ভাগের সূচী

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

মুক্তপুরুষ প্রসঙ্গ
হিমালয়ের মহাতীর্থে
পঞ্চমা
জলাধারের অন্তরীক্ষে

॥ প্রথম ভাগ ॥

শ্রীঅরবিন্দ

হে মহান্!

কাল-আবর্ত্তনে যবে,—দেশমাঝে অজ্ঞানের গাঢ় আবরণ,
স্বার্থোন্মত্ত সবলের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি মাত্র নিয়োজিত দুর্ব্বলপীড়নে ;—
হিংসাদ্বেষ-অশান্তির প্লাবন বহিয়া যায়, সভ্যতার চারিসীমানায়,
দরিদ্রের জীবন বিকল, হাহাকারে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যবে
তাপক্লিষ্ট ধরণীর এ বায়ুমণ্ডল, কোথা মুক্তি, কোথা প্রতিকার ?

কেন্দ্রে আদ্যা মহাশক্তি, সর্ব্বান্তরযামী, করুণায় হন বিচলিতা ;—
সঙ্গে সঙ্গে মহান্ কল্যাণপ্রসু শুভ-ইচ্ছা স্ফুট এক, তাঁহা হতে হয়ে
উৎসারিত ধেয়ে আসে ধরা পানে, উপযোগী শুদ্ধ দেহ করিয়া গ্রহণ
সাধিতে তাঁহার ইচ্ছা, শুনাতে অভয় বাণী পথভ্রষ্ট বিপন্ন সমাজে।

সেই তুমি! তাঁরি ইচ্ছা মূর্তিমান্, আসিয়াছ—জানে মর্মীজন,
ঘুচাতে জাতির দৈন্য, জুড়াতে দুঃসহ গ্লানির জ্বালা।

পাশবদ্ধ ভারতের কানে, অভয়, দিয়েছ শক্তির বীজ ;—তারি
সাথে আত্মসমর্পণ-যোগ, সিদ্ধির অমোঘ বাণী।

মোরা ধন্য মানি, সকলের শ্রীঅরবিন্দ তুমি, গুরুরূপে প্রকট ভারতে।

মরলোকে হে চির অমর! প্রদীপ্ত ভাস্কর তুমি ;—তোমা পাশে
আমি অতি অকিঞ্চন,—

ভক্তি-অর্ঘ্য আজি এই "সাধুসঙ্গ"খানি মোর তব-কর-কমলেতে
করিয়া অর্পণ, সার্থক করিতে চাই জনম আমার। লহ নমস্কার।

কয়েকটি কথা

১৩৩৬ সালে হিমালয়পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণকাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে যখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল ; ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব যাঁরা অনুসন্ধিৎসু,—আমার আরও পর্য্যটন, বিশেষতঃ সেই সময়কার সাধুসঙ্গ-কাহিনী শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রধানতঃ আমি চিত্রশিল্পী, আমার ধ্যানের বস্তু এবং তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ-কৌশল রেখা, রং ও তুলির মধ্য দিয়ে ;—সাহিত্য তা থেকে ভিন্ন,—আমার মনে হয় এর প্রকাশ-পদ্ধতিও বড় সহজ নয়। তবে ভ্রমণবৃত্তান্তখানি যে অবস্থায় বেরিয়েছিল, তাকে একটা প্রেরণা বলেই মনে হয়। কারণ, তার পর আমি যে আর কখনও সাহিত্যে হাত দিতে পারব, তা ছাড়া আমার যে আরও লেখবার বিষয় আছে, তাও তখন আমার কল্পনাতে ছিল না। আরও কথা, তখন চিত্রকলা আমার উপজীবিকা ছিল না। কারণ, তখনকার দিনে সংসারকে ভয়, সেই হেতু সংসার থেকে পালিয়েই বেড়াতাম আর তাতেই এতটা ভ্রমণ-অবকাশে নানা প্রকার সাধুসঙ্গের যোগাযোগ ঘটেছিল। কিন্তু এখন আমি একেবারে ডাহা সংসারী, ছবিই আমার অবলম্বন, তাই নিয়েই মগ্ন। উপজীবিকা শুধু নয়, আমার কতকগুলি বিশেষ ধ্যানের বিষয় ছিল তাই ফোটাবার চেষ্টায় দিনযাপন করি। আমি তখন যথার্থ স্বাধীন ছিলাম,—যেহেতু বাইরে কোথাও কোন চাকরী বা বাঁধা কাজ তখন ছিল না।

এই সূত্র ধরে একদিন 'উত্তরা'র পরিচালক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র এসে আমার ঘরে, আসনের সম্মুখে হাজির হলেন। সাঁড়াশীর দুই দাড়া দিয়ে যেমন করে একটা জিনিসকে ধরে মানুষে কার্য্য উদ্ধার করে, তেমনি করে দুটি প্রবল যুক্তি দিয়ে তিনি আমায় আঁকড়ে ধরে 'উত্তরা'র জন্য তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গের কথা লিখতে উদ্বুদ্ধ এবং বাধ্য করেন। তাঁর প্রথম অকাট্য যুক্তি এই যে, তন্ত্রসম্বন্ধে কথা বা আলোচনা বা জ্ঞান, যা কিছু আমি এত দিন পর্য্যটন এবং এতগুলি সাধুসঙ্গের ফলে লাভ করেছি, মোটকথা উল্লেখযোগ্য যা কিছু পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি, সে লাভেতে দেশবাসীর অংশ আছে—সুতরাং, আমি সে সকল প্রকাশ করতে বাধ্য এবং তা জাতীয় সম্পত্তি। আলস্য করে সে সকল উপেক্ষা করবার আমার কোন অধিকার নেই। আর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যেহেতু আমার এখন অবকাশ আছে এবং সম্প্রতি 'প্রবাসী'তে অতখানি একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে চুকেছি, আর সেটা সাধারণের ভালও লেগেছে, তখন কেন আমি প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্র 'উত্তরা'র জন্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করব না! তার পর আর কথা চলে না, বিশেষতঃ ঐ লোকটির সঙ্গে ; তাঁকে যাঁরা জানেন ভাল-মতেই বুঝবেন।

তখন দীর্ঘ পর্য্যটনে আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল একখানি খাতা, আর তার বুকে-ঢাকা একটি পেন্সিল। তার পাতায় পাতায় ছিল গান আর নানা

কথা টোকা, আর ছিল সাধুসঙ্গের নানা আলোচনার নোট। আরও ছিল অনেক-গুলি সাধু সজ্জনের স্কেচ—যে সব মূর্ত্তি আমার মনে সাড়া তুলেছিল। ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সালের নানা কথায় পূর্ণ খাতাখানি। কোথায় পড়ে ছিল সে খাতা, হাতড়ে খুঁজে বার করে বসলাম। এই হ'ল তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের গোড়ার কথা।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

কারো কারো জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তার গতানুগতিক জীবন একান্ত দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আমার পক্ষে সে অবস্থা একটু গুরুতর হয়েছিল। তখন আমি পূর্ণ যুবা,—তার প্রথম অভিব্যক্তি গুরু-অনুসন্ধান প্রবৃত্তি। বহু তীর্থই ঘুরেছি মনোমত গুরুর সন্ধানে। যিনি আমায় পথ দেখাবেন, আমায় অজ্ঞানের আবর্ত্ত থেকে চৈতন্যের রাজ্যে পৌঁছে দেবেন। শেষে আত্মগ্লানি সম্বল করে ঘরে ফিরে এসেছি। তার পর, আশ্চর্য্য ব্যাপার,—অল্প দিন পরে এই কলকাতার মধ্যেই অপূর্ব্ব সুযোগে গুরু লাভ হ'ল।

এখন ঘরের কাছে গুরু লাভের যে ভাগ্য আমার হয়েছিল, সেই গুরু স্বামী পরমানন্দ ;—পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী—তিনি বৈদান্তিক মন্ত্র দিলেন, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম ওঁ—। তখনকার মত ঐ মন্ত্র বেশ কাজ করলে। কিন্তু তার পর এক সময়ে পাঁচজন ভক্তের মাঝখানে বসে পরমহংসদেবের প্রসঙ্গে তাঁকে ধনলোভী এবং ভণ্ড প্রকৃতির বলে কটাক্ষ করলেন। তাই শুনেই—আমার মন বিরূপ হয়ে গেল আর তাঁর সঙ্গ ভালই লাগলো না। বেশ বুঝলাম এঁর মন নির্ম্মল হয়নি। তখন আবার ছটফটানী আরম্ভ হয়ে গেল,—প্রায় পাগল হবার অবস্থা। তার পর যে ভাবে বাবা মুক্তিনাথের আশ্রয় পেলাম সেই যোগাযোগের বিষয়টা আগে বলবার কথা,—তারপর অন্য যা কিছু।

প্রাণ যখন বড়ই ছটফট করে ওঠে তখন আর কিছুতেই বাড়িতে থাকতে পারি না, ছুটে কোথাও চলে যাই—গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি, অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি। একদিন হ'ল কি জামাটা গায়ে দিয়ে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে ফটিকদার অফিসে গিয়ে উঠলাম। ফটিকদা আমার মনের কথা জানতেন। হ্যারিসন রোডে বন্ধুবর মদনের বাড়ির সামনেই তাঁদের অফিস। সেখানে গিয়ে এক নূতন মূর্ত্তি নজরে পড়লো। বিষ্ণুপদ তাঁর নাম,—রোগা, দুর্ব্বল, বেঁটে, ক্ষুদ্র শরীর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাধারণ বেশভূষা। খুব উৎসাহপূর্ণ কথা তাঁর। বসে বসে তাঁরই কাছে প্রসঙ্গক্রমে শুনলাম যে, এখানে, এই কলকাতায়, এমন একজন সাধু আছেন যিনি জন্ম-মৃত্যু-রহস্য ভেদ করেছেন! জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে এমন আমার মত একজনের জীবন ধন্য হবে। নির্জ্জনে থাকেন, সাধারণে জানে না ; তাঁর নাম—বাবা মুক্তিনাথ। আমি আগ্রহপ্রকাশ করলাম,—একবার দেখা হয় না আমার সঙ্গে ?

তিনি বললেন, তিনি যার তার সঙ্গে দেখা করেন না। তবে আজ আমি তাঁকে ব'লে, জিজ্ঞাসা করে নি, যদি তাঁর মত থাকে, এমনি সময় এসে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি কালকে। সেই কথাই ঠিক করে, ফটিকদার সঙ্গে কাজ সেরে, একটা প্রবল উৎসাহ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিন যথাসময়েই

বিষ্ণুপদ এসে উপস্থিত হোলেন,—তারপর দুজনে গেলাম সাধুর কাছে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শ্রীমানি বাজারের উপর দোতালায় একখানা ছোট ঘরে ঢুকলাম। মাথায় গৈরিক ফেটি বাঁধা, চক্ষে কালো ঠুলি, সর্ব্বাঙ্গ গৈরিকে ঢাকা, কেবল পিঠের দিকটা খোলা। দক্ষিণ দিকে, জানালার সামনেই একখানি আসনে উবু হয়ে বসে আছেন, ঠিক যেন এখনি উঠবেন এইরকম ভাব। গিয়ে প্রণাম করেই বসলাম। বিষ্ণুপদ বললে, এঁরই কথা কাল আপনাকে বলেছিলাম।

তিনি প্রথমে আগাগোড়া পরিচয়টা আমার কাছেই জেনে নিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, এখন ভাবটা তোমার খুলে বল তো, এতটা বাইরে যাবার ঝোঁক কেন? আমি তোমায় এমন জিনিস দিতে পারি যাতে বাইরে যাবার কোন দরকার হবে না, ঘরে বসেই কাজ করে গেলে ইষ্টলাভ হবে। দেখলাম তিনি বাইরে যাওয়া চান না; আর ঘরে বসে কাজ করে যদি শান্তি মেলে তাহলে বাইরে যাবার দরকারই বা কি? এই বুঝে তাঁর কাছেই উপদেশ নিতে সম্মত হলাম। তিনিও যেন খুসী হলেন, বুঝলাম। তার পর মন্ত্রদীক্ষার কথা হ'ল। তিনি এমনই কতকগুলি কথা বললেন যাতে সত্যই আমার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল যে মহাসুকৃতির ফলেই এঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে, কারণ ইঁনি সিদ্ধ বীজের অধিকারী।

তিনি দুই-একদিন আসা যাওয়ার মাঝে নানা প্রশ্ন করে আমার মনের বিশেষ গতি বুঝে নিলেন, তারপর দীক্ষার দিন ঠিক হ'ল। তখন আমি প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করতাম। তিনি বললেন, কাল তুমি গঙ্গাস্নান করে একেবারে এইখানেই এস। আর আমার দক্ষিণার টাকা চাই, পঁয়ষট্টি টাকা নিয়ে এস।

এখন আশা পেলাম। টাকার কথায় তিনিও আমার মনোভাবটা কি রকম হ'ল সেটা একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং বুঝে নিলেন। অতটা টাকার কথায় আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেল না, লক্ষ্য করে বললেন, আমারও অভাব আছে, টাকার দরকার আছে, সেটাও তো মেটানো চাই, আর তোমাদেরই তো সেটা মেটাতে হবে, না হলে আর কার কাছে যাব। টাকা আমার চাই-ই। একেবারে সোজা কথা।

হাতে টাকা তখন ছিল না বটে, তবে মেজ ভাই হাবুর কাছে ছিল, তার কাছ থেকে হাওলাৎ নিতে পারব। তাই-ই করলাম। পরদিন গঙ্গাস্নানের ফেরৎ একেবারেই এসে উঠলাম তাঁর ঘরে। আর কেউ ছিল না। তিনি তাঁর আসনের সামনে বসতে বললেন সোজা হয়ে, তার পর বললেন, গায়ের চাদর খুলে ফেল, তার পর কাপড়ের কসিটা কোমর থেকে একেবারেই আলগা করে দাও।

তার পর প্রাণের ক্রিয়া দেখালেন,—যে ভাবে জপ করতে হবে তা দেখালেন, তার পর দিলেন বীজ-মন্ত্র। এই মন্ত্রজপের প্রণালী বিচিত্র। তারপর জিহ্বার সঙ্গে জপের মাত্রানুযায়ী একটি ক্রিয়া দেখালেন আর বললেন, ঐখানেই নিরবচ্ছিন্ন জপ চলবে সারাক্ষণ। বাইরের কাজকর্ম্ম চলবে, সবই চলবে, আবার জপও চলবে। এই নিরবচ্ছিন্ন জপের ফলই হবে জপসিদ্ধির অবস্থা, তার পর ধ্যান আসবে,—ধ্যানের ধারা আপনিই আসবে নিজ আসনে বসে। পবিত্র স্থানে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে এই জপ চলতে থাকলে যে অবস্থা হবে তখনই বুঝবে এই সৃষ্টির রহস্য, তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। ফলাফলের কথা আমি এখন কিছুই বলব না, তুমি আপনিই বুঝতে পারবে। তবে,—এর পর যা, তা তোমার নিজ অধিকারের কথা;—অহম্ প্রবল হলে বাইরে ভড়ং জটাজুট

রেখে লাল কাপড় পরে পুরু গদির উপর বাঘছালে বসে, বেশ সাধারণ সরলবুদ্ধি গৃহস্থদের চরিয়ে খেতেও পার। তেমন তেমন যোগাযোগ হলে, ধনী শিষ্য সেবকদের হাত করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে একজন বেশ মাতব্বর হয়ে নিজ ভোগসুখ মিটিয়ে কিছু বিষয়-আশয়, কয়েকখানা বড় বড় ইমারত রেখে মধ্যে একটি শিব বা শক্তির প্রতীক মন্দিরে স্থাপন করে ভবের লীলা সাঙ্গ করলেও করতে পার। যা পেয়েছ তাতে লেগে থাকলে শক্তিলাভ হবেই। যদি তার মোহ কাটাতে পার তবেই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা, না হলে ঐ মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু। তবে আমার একান্ত আদেশ রইল গৃহস্থাশ্রম কখনও ত্যাগ কোরো না। সন্ন্যাসের আধার তুমি নও ; তুমি সহজ অকপট সরল মানুষ, গৃহস্থাশ্রমে থাকলে ঐ আশ্রমেরই কল্যাণ হবে, ফলে তোমার সব কিছুই লাভের সম্ভাবনা এর মধ্যে রইল।

রোজই একটি সময়ে, বিশেষত সন্ধ্যার আগে যাই, তাঁর সামনে প্রাণায়ামের ক্রিয়া-কর্ম্ম করি, গুহ্য তত্ত্বগুলি শুনি, একটি ধ্যানের অবস্থা আসে। ধীরে ধীরে কয়েকটি বিচিত্র অনুভূতি আরম্ভ হয়েছিল ; তাঁকে বলতে তিনি বললেন, আরম্ভ হয়েছে। ক্ষেত্র তৈরী ছিল বলেই দ্রুত কাজ হতে সুরু হয়েছে, তুমি একটু ঘন ঘন এস এখানে, না হলে তোমার পক্ষে সামলান দায় হয়ে পড়বে। খাওয়াটা খুব কমে গেল। তিনি বললেন, তা হোক, ওতে কিছু ক্ষতি নেই। একটু ধীর তালে চল, অনেক কিছু হবে।

তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসে বুকের মধ্যে যেন এক ভার চেপে রইল। সবই করছি তাঁর উপদেশ মত, কিন্তু গুরুভার আর যায় না। এটা প্রায় একমাস পরের কথা।

সেটা আর কিছু নয়, ঘর ছাড়বার প্রবল চেষ্টা। ঐ বাড়িতে, ঐ রকম যে আত্মীয়-স্বজন, এদের মধ্যে থেকে কখনো কিছু হবে না,—এই ধারণাই প্রবল হতে লাগল। সংসার কোলাহল থেকে বেরিয়ে না গেলে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়, এই ভাবটা ক্রমে বদ্ধমূল হয়েই গেল। যাদের সঙ্গে শিশুকাল থেকে এতটা গভীর সম্বন্ধ,—সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়ে যারা এতবড় করেছে, তাদের উপর আর প্রীতি নেই, ভালোবাসা নেই—এমন কি তাদের আর আপনজন বলে বোধই হয় না। তারাই যেন সকল শান্তির প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াল। তারা যদি যথার্থ আত্মীয় বন্ধুই হবে তাহলে আমার এভাবের জীবন সমর্থন করে না কেন? শুধু তা নয়, ঘুরে ঘুরে নাকি মাথা খারাপ করে ফেলেছি—আমি পাগল,—ভণ্ড, অলস, অকর্ম্মণ্য,—অর্থ উপার্জ্জনের কাজ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াই—এই সব মন্তব্য তারা প্রচার করে কেন?

যাক্ তাদের কথা, কারণ তারা সবাই মন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—কেবল যার সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা ছিল সেটি হলেন স্ত্রী। অল্পদিন নয়, চার-পাঁচ বছর তাকে বিবাহ করেছি। অবশ্য তার পরে যা হবার,—অর্থাৎ সে বেশ ধীরে ধীরে আমায় আঁকড়েছে যেমন করে আঁকড়াতে হয় ; আর এ কাজে প্রকৃতি তাদের সহায়। আমার দিক থেকে প্রতিদানের আশা ভরসা না রেখেই সে বেশ ক'রে, যেমন লতা একটা গাছকে জড়ায় তেমনি ক'রে ধরেছে। ঐ টানটা কাটানোর প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ ঐটাই ছিল একমাত্র প্রবল বাধা।

তখন,—তার মূর্ত্তি দেখলেই মনে হ'ত পায়ের বেড়ি, চিরজীবনের যেন অকাট্য—অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল, যা কখনও খসবে না। আবার জোর করে খসালে নাকি প্রত্যবায় আছে শাস্ত্রে বলে। তার মূর্ত্তিতে আর একটা কিছু দেখতে

আরম্ভ করেছিলাম,—যৌবন আর লাবণ্য এ দু'য়ের আকর্ষণের উপরেও আমার দৃষ্টি তখন কাজ করছে—মনে হ'ত এক অনন্ত শান্তি, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ লাভে বঞ্চিত করে ও আমাকে স্বার্থময় সংসার আবর্ত্তে এমনভাবে ফেলে দেবে, যেখান থেকে আর মুক্তির উপায় থাকবে না জন্ম-জন্মান্তরেও। তার ভালবাসা যতই স্বার্থলেশহীন হোক্ না কেন, তখন কিন্তু মনে হ'ত যেন তাও স্বার্থময় উদ্দেশ্য নিয়েই ধরে রাখতে চায়। তার সরল চক্ষের সেই সরল চাহনি, সেটাও মনে হ'ত যেন একজনকে পূর্ণ অধিকারের গর্ব্বে বিস্ফারিত, আর যেন বলছে আমার হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই, যাবে কোথা তুমি! অথচ কথায় তার ভাব একেবারেই বিপরীত। সে বলে,—কেন এমন হ'ল তোমার, আমি কি অপরাধ করেছি? আমার বড় ভয় করে তোমার ভাব দেখে। তুমি ঘরে থাক, আমি তোমায় জ্বালাতন করব না, তোমার কাছে যাব না। যদি বল, তোমার সঙ্গে কথাও কইব না, যা বলবে তাই করব,—কেবল ঘরে থাক তুমি; ঘরে থেকে কি ভগবানকে ডাকা যায় না? পরমহংসদেব বলতেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলি তার যতই যুক্তিপূর্ণ হোক তার আসল উদ্দেশ্য বাঁধন—প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়,—এই কথাই সর্ব্বক্ষণের জন্য মনের মধ্যে যেন নিশ্চিত সিদ্ধান্তের মতই হয়ে গিয়েছিল। তার ঐ করুণ মধুর ভাষাও যেন আকর্ষণের তথা বন্ধনের শৃঙ্খল। এ ছাড়া রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদাই অন্তরে অন্তরে রয়েছেন,—তিনি যেন ধরে আছেন। তাই ভুলেও তখন তার কথাগুলির অন্য অর্থ করিনি। বাস্তবিকই তখন ঘরের লোক, আপনজন বলতে যারা, তাদের সকলকার সঙ্গেই সম্বন্ধ যেন বদলে গেল। তখনকার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্রের এই অদ্ভুত রূপান্তর, জীবনের এক অতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ রকমটা আমার পরিচিত কারোর মধ্যে হয়েছিল কি না তা জানি না, শুনিনি। তবে যাঁরা এটা পড়েছেন তাঁদের কারো যদি হয়ে থাকে ত তিনি ঠিক বুঝবেন যে, তখন আমার যথার্থ কি হয়েছিল।

*   *   *   *

সকলেই জানে, ভগবানের একটি নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। সেই নামটি যে কতদূর সত্য তা আস্তিকেরা ত বিশ্বাস করেই, আর নাস্তিকেরাও করে, তবে তারা করে মনে মনে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছি, অনেক জনকে দেখেছি পেতে। যাই হোক, এখন আমি আবার যেভাবে ঐ বাঞ্ছা-কল্পতরুর প্রমাণ পেলাম, এমনটি বুঝি আর কেউ পায়নি।

ঠিক হয়ে গেল যে ঘর থেকে না বেরুলেই নয়,—কারণ ঘরে থেকে ইষ্টলাভ যাদের হয়, সে পাত্র আমি নই। মনের ঝোঁক থেকেই টের পাওয়া যায় যে, কার কি ভাবে ও পথে যাবার কথা। শুনেছি অনেক ভাগ্যবান আছেন যাঁরা ঘরে বসে সবই পেয়ে যান,—কিন্তু সে ভাগ্য ত সকলের হয় না। এর মধ্যে চমৎকার কথা এইটুকু যে, নিজ সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হতে যে সময়টা, ঐটুকুই যা কিছু দ্বন্দ্ব, দুঃখ, অশান্তি বা অব্যবস্থিত চিত্তের ব্যাপার। যেইমাত্র সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, ঘরে থাকব না, বা ঘরে থাকলে ইষ্টলাভ হবে না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনোমত এক স্থানও জুটে গেল। সর্বদিক দিয়েই মনোমত, বাড়ি থেকে বহু দূরে, প্রাণের প্রিয়তম ক্ষেত্র,—চির আকাঙ্ক্ষার ধন,—সেই হিমালয়ের কোলে নৈনিতালের মধ্যেই মল্লিতালের কাছে, তার থেকে বড় জোর তিন-চার রশি দূরে একটি বেশ ফাঁকা স্তূপাকার উঁচু জায়গা আছে; গোটাকতক চীড় বা

পাইন গাছ ছাড়া সেখানে আর কোন গাছপালা নেই। সেই গাছগুলি দিয়ে ঘেরা স্থানটুকু যেন প্রকৃতির হাতে গড়া একটি রম্য সাধন ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রটির ঠিক মাঝামাঝি আছে একটা বিরাট ফাঁক,—দূর থেকে সেটা দেখা যায় না। সেই ফাঁকটার মধ্যে,—ফাঁক বলছি এই কারণে, সেটা ফাঁকের মতই দেখতে বলে,—আসলে প্রবল জলধারা নেমে বড় বড় খাঁজ পড়ে সেই স্থানটা হয়ে গেছে এক বিরাট ফাঁক ; তার এক ধার দিয়ে বেশ নামবার জায়গা বা পথের মত আছে। উপর থেকে স্তরে স্তরে নেমে আসা যায় সেই ফাঁকের মাঝখানে, যেখানটা উপর থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফিট গভীর। সেই নীচের স্তরে গিয়ে দাঁড়ালে পাশেই একটা গুহা দেখা যায়। কোন সময়ে কোন সংসার বিরাগী সাধু মহাত্মা সেটা তৈরী করে থাকবেন। তপো-জীবনের আশ্রয়স্বরূপ সেই গুহাটি কত কাল কত তপস্বীর হাত-ফেরৎ হয়ে শেষে যাঁর হাতে ছিল তাঁর সঙ্গেই সম্বন্ধ। তিনি আমার উপর তাঁর গুহাশ্রম রক্ষার ভার দিয়ে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা জনকে নানা কথাই বলতে শুনেছি! সেখানকার একজন বললে, উনি অনেক দিনই এখানে ছিলেন, এখন সারা ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে যত তীর্থ আছে, সব প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছেন। আর দ্বিতীয় একজন বললে, —উনি কোন পলিটিক্যাল অফেণ্ডার, সাধু সেজে এখানে ছিলেন, এখন ধরা পড়বার ভয়েতে সরে পড়েছেন। আর তৃতীয় একজন বললে, একটি শৈব গুরুকে ধরে তিনি তাঁর শিষ্য হয়ে মুঙ্গেরে অনেক দিন ছিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে এক ভৈরবীর যোগাযোগ হয়। গুরুর আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি ঐ ভৈরবীকে নিয়ে এইখানে এসে অনেক দিন বাস করছিলেন। তারপর, এক রাত্রে সেই ভৈরবী হঠাৎ পালিয়ে যায় -এখন তিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছেন।

আমার সঙ্গে এই গুহাবাসী সাধুর বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। যখন ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য ছটফট করছি, তখন আমার এক প্রিয়বন্ধু—দেবানন্দ তাঁর নাম—ইউ. পি. সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন এবং তখন নৈনীতালেই ছিলেন। আমার সকল কথাই জানতেন, সব খবর রাখতেন ফটিকদার পত্রের মধ্য দিয়ে। তিনিই এক পত্রে এখানকার সন্ধান দিয়েছিলেন এই বলে, যদি দীর্ঘকালের জন্য হিমালয়ের কোন গুহায় বাস, আর সেই গুহাটি রক্ষার ভার গ্রহণ করতে রাজী থাক, তাহলে চলে এস। তিনিই এখানে এনে অধিকারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বৃদ্ধ তাঁকে বলা যায়,—তাঁর কথায় মনে হ'ল তিনি বাঙ্গালীই। অত্যন্ত রোগা, বয়স মনে হয় আন্দাজ ষাট বৎসর হবে। বললেন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আমায় কিছুদিন বাইরে যেতে হবে, দীর্ঘকালও হতে পারে। তুমি আপন মনে করে কি গুহাটি রাখতে পারবে, যতদিন আমি না আসি? এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। কোন নারী তাঁর সঙ্গে আমি দেখিনি। বয়সেও তিনি ছিলেন প্রবীণ যাকে বলে তাই। যাই হোক এর উত্তরে একথা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে কোন সঙ্কোচ হ'ল না যে, আমি ঠিক এই রকমই আশ্রয় চাইছিলাম অন্তর থেকেই,—আর তাঁর এই অনুগ্রহ ভগবানের দান বলেই নিয়েছি।

ব্যস্, পরদিন তিনি চলে গেলেন, আমিই হলাম গুহার অধিকারী। যে কথাটা বলবার জন্য এতটা কথা বলতে হ'ল সেটা এই যে, বড় জ্বালাতন হয়ে, বড়ই কষ্টের পর এই চমৎকার সাধন স্থানটি পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম, মনে

হ'ল, যেন সিদ্ধি হাতের কাছে এসে গিয়েছে, ধন্য হয়ে গিয়েছি,—জন্ম জীবন এতদিন, হে দয়াময়! তুমি সার্থক করেছ,—আমার প্রতি তোমার অসীম দয়া— এত দয়া বুঝি আর কারো প্রতি প্রকাশ করনি।

সফলকাম প্রত্যেক মানুষই ভগবানকে লক্ষ্য করে ঠিক ঐ কথাটাই বলে। যাই হোক, চার-পাঁচ সপ্তাহ, তারপর মাস দুই-তিন কেটে গেল, এখন আসনটি বেশ জমেছে। নিয়মমত সাধনের সকল কিছুই চলছে।

প্রতিদিন এক প্রহরের পর ভিক্ষায় বেরিয়ে যাই—যেদিন যা জোটে দুই-একজনের কৃপায়, দ্বিপ্রহরে এসে তাই বানিয়ে নিয়ে ভোজনের পর কাঠকুটা কুড়াতে যাই। সে দিন আর সেই রাতের মত আগুনের জোগাড় করে একটু লেখাপড়া করতে বসি। বৈকালে আবার দু'একজন আসে, ভালকথা সৎবাক্য শুনতে। বন্ধুবর আসেন, প্রায়ই তত্ত্ব করেন ভোজন জুটচে কি রকম। তাছাড়া দু'চারজন আসে—তার মধ্যে আবার কেউ কলাটা, মুলাটা, কেউ বা ঘটিতে একটু দুধ নিয়ে আসে। না গ্রহণ করলে মনে দুঃখ পায়, নিলে খুসী হয়, সে জন্য নিতেও হয়। ঐ সব উপহার রাত্রের জন্য রেখে দিই। আবার কেউ বা একটা ঔষধ চায়—বড় কঠিন রোগে ভুগছে, সাধুর কৃপায় আরোগ্য হবে এই বিশ্বাস। তাদের এড়াতে না পারলে একটু জল দিয়ে বলি, ভগবানের নাম করে এটা খাইয়ে দাও, ভাল হয়ে যাবে। জানি এতে তার ইষ্ট কিছু হোক না হোক অনিষ্ট কখনও হবে না, অথচ আমি বেঁচে যাব। কারণ এখানে এটা দেখেছি—কিছু-না-কিছু না দিলে রেহাই নেই; তারা কিছুতেই মানবে না, বুঝবে না। তাই যতই সত্যি বলি না কেন, তারা ঠিক মনে করবে যে, সব জেনেশুনে তাদের পাপী বলে এড়িয়ে যেতে চাই। কাজেই দিতে হয় কিছু। মনে মনে ভগবানকে ডাকি, হে দয়াময়, তুমি অন্তর্য্যামী, সবই জানো, ভাল করবার কোন শক্তি আমার নেই, তোমার দয়াতেই যেন ওর ভাল হয়। সত্য বলতে কি, ভালও হয়। যাকে যা দিয়েছি, পরে খবর পেয়েছি, তারা সত্যিই ভাল হয়ে গেছে, মহা উৎসাহে তারা নিজেরাই এসে বলে যায়।

সন্ধ্যায় ধুনীটা ভাল করে জ্বালিয়ে গুহার ভিতরে আসনে বসি। এক প্রহরের পর একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর মধ্য রাত্রে উঠে আবার ধুনী জেবলে আসনে বসি। মাঝ-রাতে মন্ত্রজপের কাজ খুব ভালই হয়। আবার শেষ রাত্রে একটু ইচ্ছা হয় ত শুই, না হয় আর না শুয়ে ভোরের দিকে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। এই ভাবে এখানে মহা আনন্দে সাধনের নেশায় মশগুল হয়েই দিন-গুলি কাটছিল। এখন এই বার্দ্ধক্যের অবসন্ন দিনে যখন চিন্তা করতে বসি, তখন মনে হয় যে, সারা জীবনে যা কিছু আনন্দ, বৈশিষ্ট্য, প্রাপ্তি বা সার্থকতা তা প্রথমে ঐখানে, তার পরে বৃন্দাবনে ঐ সময়েই হয়ে গিয়েছে। এর চেয়ে বড় কিছু এ জীবনে আর হয়নি—যার ফল অবশিষ্ট জীবনে পথের সম্বল হয়ে আছে।

* * * *

এখন যা বলছিলাম; কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, একজন প্রৌঢ় মাঝে মাঝে আসছে। তার উদ্দেশ্য যে কি তা বুঝতে পারিনি, কারণ সে মোটেই কথা বলে না। ক্রমে রোজ রোজ তাকে আসতে দেখছি, কিন্তু এক সময়ে আসে না, আবার পাঁচজনের মত কিছু নিয়েও আসে না। একদিন এল বৈকালে, পরদিন এল সন্ধ্যায়, তার পরদিন এল দুপুরে, কোনদিন সকালেই

এসে হাজির। আজ দেখি ভোরেই এসেছে। তখন বাইরে গিয়েছিলাম, এসে দেখি সে বসে আছে। আসে, বসে কিন্তু কিছুই বলে না, এইটাই বিচিত্র। চুপ করেই বসে থাকে ; এদিক ওদিক, গুহার ভিতরের দিকে লক্ষ্য করে— যেন কি খুঁজছে, মুখে কিন্তু রা নাই। আমারও তার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা

হয়নি, এ পর্য্যন্ত তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু ক্রমে তার কথাটা বেশ চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল ; অন্য কারণে নয়, সেটা তার নির্ব্বাক অবস্থার জন্য।

এখন, এ লোকটা কে ? হিন্দুস্থানী কি বাঙ্গালী তাও জানি না, তবে সে যুবা নয়—প্রৌঢ়, কাঁচাপাকা মেশানো ধূলায় ধূসর চুল—মাথায় যেন একটা ঝোপ-জঙ্গল, তার মাঝে মাঝে, গাছে যেমন সোঁদাল ঝোলে, দু' তিন চার পাঁচটা জটা ঝুলছে। এক সময়ে হয়ত গৌরবর্ণই ছিল, এখন হয়েছে তামাটে, মুখে অল্প গোঁফ, অল্প অল্প ছাগল-দাড়ি, তাও ঐ রকম কাঁচাপাকা চুলে ভরা। দীর্ঘ রোগা শরীর, ঢুলুঢুলু লাল চোখ দুটি, যেন কোনদিকেই স্থির দৃষ্টি নেই, একজনের চক্ষের সঙ্গে যখন মেলে তখন দেখায় যেন জলভরা। ঘন কালো ভ্রূ, প্রথমেই সেটা চোখে পড়ে। গায়ে একখানা কম্বল মাত্র, ভিতরে কৌপীন।

আমার নিয়ম ছিল কারো সঙ্গে আগে কথা না কওয়া ; আর যত কম কথায় কাজ শেষ করা যায় মাত্র ততটুকুই কথা। ঐ অবস্থায় বাক্‌সংযম অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই কোথাও বেশী কথার উদ্যোগ দেখলেই, 'দোহাই বাবা' বলে জোড় হাতে তাকে বুঝিয়ে দিতে হ'ত যে, সাধুগিরি করতে আসিনি, উদ্দেশ্য শুধু সাধনপথে চলা। আমি সাধুও নয়, সিদ্ধও নয়, সংসার আছে, ঘরে স্ত্রী, মা, বাপ, এমন কি ঠাকুরমা পর্য্যন্ত আছে, কেবল কিছুদিনের জন্য সংসারের গোলমাল থেকে বেরিয়ে এসে একটু সাধন ভজন করছি মাত্র।

যাই হোক, এখন দেখছি এ লোকটার নির্ব্বাক ব্যবহারের সঙ্গে আমার বেশ একটা মানসিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে গেল। কোথা থেকে ধূমকেতুর মত

এই অদ্ভূত লোকটা আরও অদ্ভূত রহস্যময় নির্ব্বাক অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হ'ল, একটা যেন অশান্তির কারণ হয়ে। আমার আসনে এসে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বিক্ষেপের সৃষ্টি করতে চায়! আমি কথা কই না আমার নিয়ম বলে,—কিন্তু সে কথা কয় না কেন? ঐ পাগলাটে ভাবের মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য তার আছে কি না কে জানে?

এখানকার যে গুহাটি তার একটু ভিতর-বার আছে। প্রথমে যেটি,—প্রায় দশ ফিট উঁচু আর পাঁচ-ছয়জন বসতে পারে এমন জায়গা। তারই একপাশে ধুনী জ্বলে। সেই গুহার ভিতরে আর একটা গুহা আছে, সেটা অন্ধকার আর ছোট আর নীচু, ভিতরে পাঁচ ফিটের বেশী নয়। সোজা দাঁড়ানো যায় না। বাইরে থেকে ভিতরের গুহায় যেতে একটা প্রায় দেড় হাত চৌকা কাটা পথ, সেইটাই দ্বার, ভিতরে গিয়ে ঝাঁপটা বন্ধ করলেই বেশ গরম, পাহাড়ে শীতে আদুড়-গায়ে থাকা যায়। আর গরমের সময়েও বেশ ঠাণ্ডা। ভিতরে প্রায় চার হাত লম্বা আর তিন হাত চওড়া হবে গুহাটা, আমার আসন ঐ ভিতরের গুহায়। সব সময়ে ত ভিতরে থাকা যায় না—কেউ এলে বাইরেই বসি। শীতের দিনে বাইরে আগুন না হলে চলে না। কাজেই এই লোকটি যখনই আসে, তাকে বাইরে বসতে হয়, আর ধুনীর কাছেই বসে। সে যখনই বসে দেখছি, তার দৃষ্টি বেশীর ভাগ থাকে ভিতরের গুহায়। যাই হোক, একে নিয়ে অন্তরের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, তাতে আর চুপ করে থাকা সম্ভব রইল না,—ঠিক করলাম আজ একটা হেস্তনেস্ত যা হয় করে ফেলব।—জিজ্ঞাসা করব কেন সে আসে এখানে, কি উদ্দেশ্য তার।

মনে এই সংকল্প করবার পরই আবার মনে হল, আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করতে ভগবানের একটা অদ্ভূত ছলনা নয় ত? যথার্থ আপন সাধনে অভিনিবিষ্ট কি না, এ ভাবের ব্যাপারে সাধনের ধারা বিচলিত হয় কি না, ইষ্ট সেই পরীক্ষায় ফেলেন নি ত? এইসব ভেবে আবার সংকল্পের গোলমাল হয়ে গেল, কি করব তা ঠিক করতে পারলাম না।

*　　*　　*　　*

সেদিন লোকটা এল সন্ধ্যা ঘেঁষে, আমি তখন ভিতরে, আসনে আছি। বাইরে ধুনী জ্বালাই ছিল, বোধ হয় আগুন ছিল কম। বেশ টের পেলাম সে এল, ধুনীর কাছে যেখানে চেটাই পাতা, সেখানেই বসল। মন ছিল চঞ্চল, সে আসার পর আর বেশীক্ষণ আসনে থাকতে না পেরে বাইরে এসে ধুনীটা আবার ভাল করে জ্বালিয়ে কতকগুলি কাঠ ফেলে দিলাম যাতে কিছুক্ষণ বেশ আলো থাকে। আমার আলো ছিল না, রাত্রের যা কিছু কাজ ঐ ধুনীর আগুনেই চলে যেত। একখানা মৃগচর্ম্ম ছিল। তাইতেই বসতাম। আর কেউ এলে খান-কতক চেটাই ছিল। হাঁটু উঁচু করে দু'পা মুড়ে আর দু'হাত দিয়ে সেই খাড়া-মোড়া হাঁটু জড়িয়ে লোকটা বসে আছে।

মনে রাজ্যের দ্বন্দ্ব এসে মহাগোল বাধিয়ে দিলে,—কি করে কথাটা আরম্ভ করি। আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমায় বলতে হ'ল না, সেই-ই আমায় রক্ষা করলে আগে কথা কয়ে। হিন্দিতে সে জিজ্ঞাসা করলে,—ভারী গম্ভীর তার স্বর,—বাবু সাহেব কলকাত্তাকা আদমী? আমি,—জী হাঁ, বলে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম।

তখন সে আবার বললে—বাঙ্গালী বাবুলোককো এল্‌মে বহুত হৈ, সারা হিন্দুস্থানমে উঁসিকো বরাবর কোই নাহি। আংরেজ লোক ভি উঁসিকো,—

বাধা দিয়ে আমি বললাম,—আপ ক্যা বোল রহা, মেরে সমঝমে নাহি আতি। সে সেইভাবেই বসে, উত্তরে সেইভাবে বললে,—ময়নে ইয়ে বোল রহা হুঁ,—যে, আপ বাঙ্গালীওঁ কো আংরেজ ভি বহোৎ ডরতে। শুনে আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম,—ইসব বেফায়দা বাত সৎ সাধু-সন্ত কো বাস্তে নাহি। আপকো কোই প্রয়োজন কী বাৎ হো তো আচ্ছা, কহিয়ে।

সে এতক্ষণ ধুনীর দিকে চেয়েই কথা বলছিল, এখন আমার কথা শুনেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে,—তার চক্ষে এক অদ্ভুত জ্যোতি, ধুনীর আগুনে যতটুকু দেখা যায় দেখে অন্তরে আমি যেন একটা কম্পন অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যেন আমার মধ্যে স্বীকৃত হয়ে গেল। সে বললে,—আপ্‌ সায়দ হামিকে বিস্‌ওয়াস্‌ নাহি করতে—! শুনেই আমি বললাম,—উও বাত্‌ নাহি, উহ সব বাৎসে হামারা কুছ কাম নাহি, ইএ হাম বোলতা হুঁ, আপ ফির ওহি বাৎ হামসে মৎ বোলা করো জী!

—কাহে মহারাজ?

লোকটা পাগল নাকি? আবার একটা বিরক্তির ভাব আমার মধ্যে দেখা দিলে, তবুও সংযত হয়ে বললাম,—সাধু, সেবক আদমীকো উহ্‌ বাৎসে কুছ ফ্যায়দা নাহি, ইঁসিবাস্তে।

—আপ ঘর ছোড়কে আয়া কি নাহি?

—আয়া তো সহি!

—আপনা দেশকা কুছ কল্যাণ কি লিয়ে তো আয়া হোগা? এই কথাগুলি বলেই সে আসন-পিঁড়ি হয়ে বেশ যুৎ করে বসল। আমি বললাম,—পহলা আপনা কল্যাণ, পিছে দেশকী বাৎ,—ফির, মুঝে অজ্ঞানকী দরিয়ামে ফাস রহাহুঁ,—না মালুম কৈসি আপনা জান বাঁচাউ,—হামসে দেশকী কল্যাণ ক্যা হো সকতা, বাৎলাও, জী!

সে তবুও দেশের কথা ছাড়ে না, বলে,—দেশ কি বাৎ, সবকোই কো অধিকার, হৈ কি নাহি?

—হামরা বাস্তে নাহি, বলেই আমি এমনভাবে চুপ করে রইলাম যেন আর ও-প্রসঙ্গ না ওঠে।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, যেন কি বলবে তাই ভাবছে। মনে করলাম বাঁচা গেল। কিন্তু এত সহজে কি বাঁচা যায়! আবার সে আরম্ভ করে দিলে। এবার আর হিন্দিতে না বলে আমার কথাতেই বলি। সে বললে,—দেশের কল্যাণের সঙ্গে ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই কি?

আমি বললাম,—দেশের কথায় আমার কোনই কৌতূহল নেই, আকর্ষণও নেই। আমার সঙ্গে ওসব কথা কয়ে তোমার কিছুই লাভ হবে না। মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে এবার সে বললে,—তুমি নিশ্চয়ই আমায় গোয়েন্দা মনে করেছ। আমি ত অবাক, বললাম,—তাতে কি? শুনে সে মৃদু হাসতে হাসতে বললে, —হয়তো সেই জন্যেই তুমি আমার কাছে মনের কথা বলছ না।

—আমার মনে কোন কথাই নেই। আর যদিও কিছু থাকে, তার সঙ্গে আসলে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। একথার পর সে অনেকক্ষণ আমার মুখের

দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল, যেন সে আমার মনের কথাটা খুঁজে বের করে নেবে। তারপর বললে, কেমন করে জানলে? আমি বললাম, তোমার আলাপ দেখে, আলাপের বিষয় দেখে, আর কি দেখে হতে পারে, তুমিই বল না।

সে বললে,—ওটা তোমার ভুল। তোমায় আমি একটু পরীক্ষা করছিলাম—যথার্থ সাধু না ভণ্ড রাজদ্রোহী তাই দেখছিলাম।

বললাম,—আমার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নেই। আমি নিজের জ্বালায় জ্বলে মরি, সেই জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি একটু শান্তির আশায়, কেমন করে জ্ঞানের আলো পাব। বাধা দিয়ে সে বললে, তাহলে ত তোমায় আরও বেশী সাধু-সঙ্গ দরকার।

বললাম,—সে ত ঠিকই, নিশ্চয় দরকার—কিন্তু সে সাধু পাব কোথায়?

লোকটা একবার আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে তার পর আরও একটু কাছে এসে বসল। তার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে যেন একেবারে অনুগত করে ফেললে। এবার সে বললে,—তুমি কি যথার্থই তা চাও? যথার্থই কি তুমি সাধনপথে এগিয়ে যেতে চাও? একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই কি তুমি এখানে এসেছ?

আমি বললাম,—আপনি কি অনুমান করেন? আপনি ত মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আমার কথাটা শুনেই সে খপ করে আমার একখানা হাত ধরে ফেললে, তার পর আমার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—

বাবু! আজ দশ দিন আমি তোমার আসল ভাবটা বুঝতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সত্য বলতে কি, আমি একটু ধোঁকায় পড়েছিলাম,—কারণ তোমার নিজের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল, সেই কারণে তোমার অন্তরের ভাব আমি কিছুতেই ঠিক ধরতে পারছিলাম না,—এই এখন সেটা পেরেছি। বল, তোমার মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল কি না? আমি স্বীকার করলাম,—এখনও চলছে।

—তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে কি নিয়ে যে তোমার দ্বন্দ্ব,—তা আমি বলে দিতে পারি। শুনে আমি জিজ্ঞাসুভাবেই তার মুখের দিকে চাইলাম।

সে নিঃসঙ্কোচেই বললে,—এই যে ঘর ছেড়ে তুমি এখানে এসে যোগের নিয়মে যেসব ক্রিয়া আরম্ভ করেছ—তা ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না এই সন্দেহ তোমার মনের তলে তলে আজ কয়েকদিন থেকে বেশী রকমেই পীড়ন করছে।

—ঠিক তাই। আপনি যখন বুঝেছেন তখন আমায় এত পরীক্ষা করলেন কেন?

ঠিক কি নিয়ে দ্বন্দ্বটা চলছে আগে তো টের পাইনি, কারণ তুমি আমায় এড়াবার ইচ্ছায় বরাবর বিরুদ্ধ ভাবেই দেখে এসেচ, তাই তোমার অন্তরের নাগাল পাইনি। এখন আমি তোমায় ধরেছি—বল, এখন আমি কি করব? তোমার মত একজন আমার চাই। তোমার কাছে আসার উদ্দেশ্যই হল তোমায় পরীক্ষা করে নিয়ে আগে তোমার জন্য কিছু করা, তার পর তোমায় আমার জন্য কিছু করবার উপযুক্তভাবে তৈরী করা। কেমন,—আমার কথা তোমার ভাল লাগছে?

এখনও কিন্তু অন্তর থেকে একে বন্ধু বলে মেনে নিতে প্রাণ চায় না;—

এতটা কথার পরও সন্দেহ, বিশেষতঃ শেষের কথাটাতে একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের সঙ্কেত পেয়ে মনটা দমে গেল। সাধনরাজ্যে এসব চক্রান্তের কথা কেন?

মনের মধ্যে কত কথাই উঠতে লাগল,—লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে ঠায় চেয়ে রইল,—কি বুঝছে কে জানে। বোধ হল যেন মনের মধ্যে যে যে ভাব উঠছে যেন সব পড়ে নিচ্ছে।—অনেকক্ষণ পর যেন একটা নূতন কিছু পেয়েছে এমনভাবে বললে,—দেখ, তুমি যেমন আমায় ঠিক বুঝতে পারোনি, আমায় নিয়ে গোলমালে পড়েছ, আমিও ঠিক তেমনি তোমায় নিয়ে পড়েছি. আমিও তোমায় ঠিক বুঝতে পারিনি ; এই বলে সে হা হা হা হা করে আমায় চমকে দিয়ে এক রকমের অনর্থক হাসি আরম্ভ করলে,—যেন একটা পাগল। তার মুখের ভাবটা বড় ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সহ্য করতে না পেরে, যথার্থই ভয় পেয়ে বললাম, আমি আপনাকে বুঝতে পারব না,—আপনি আমার মধ্যে বড়ই উদ্বেগ আর অশান্তির সৃষ্টি করেছেন, আর কাজ নেই, আপনি দয়া করে সরে পড়ুন—তাহলেই আমি শান্তি পাব।

সে আবার হা হা হা করে সেই পৈশাচিক হাসির সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবে চাইতে লাগল আমার দিকে। অসহ্য! সেই আঁধার আলোয় তার ঐ ভাবটি বড় ভয়ানক রকম ক্রিয়া করলে মনে। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ বসে রইলাম তার দিকে চেয়ে।

—আবার ভয়ও আছে দেখছি, আরে আমার শিশু—মেরে লালা, তুই এইটুকু হৃদ্পিণ্ড নিয়ে সাধনে নেমেছিস? একটুখানি গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম দেখছিস আর ভয়ে কেঁপে মরে যাস, এই পুঁজি তোর?—এই কথাগুলি বলে আমার ডান হাতখানি নিয়ে তার দু'হাতের মধ্যে ধরে দোলাতে আরম্ভ করে দিলে।

ঐভাবে হাত ধরে দোলাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় চলে গেল, ক্রমে সাহস এল, বুঝলাম, অন্তরে অন্তরে বিশ্বাসের সঙ্গে এই বোধ এলো—এ ব্যক্তি সাধারণ নয়, পাগল নয়, পিশাচও নয়—এই যে মূর্ত্তি সমুখে রয়েছেন ইনি কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে—ঐ দেখ! বলে, পিছনে গুহার মধ্যে দেখতে ইঙ্গিত করলেন।

পিছন ফিরে দেখলাম, গুহার ভিতরে,—কিছুই বিশেষ দেখতে না পেয়ে তাঁর দিকে ফিরে দেখি,—কেউ কোথাও নেই। অথচ দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কি ভয়ানক জীবন্ত ভাবের একটা প্রহসন চলছিল। অবাক হয়ে বসে রইলাম কতক্ষণ।

কি জানি এর মধ্যে এমন কি দেখলাম, চক্ষু দিয়ে দর দর ধারা বইতে সুরু করে দিলে। কি ভেবে যে এটা হল তা ভাল বুঝতে পারিনি। কেবল এই কথা মনে হতে লাগল যে, তোমার এত দয়া আমার উপর? আমি ভয় পেয়েছিলাম,—তোমার ভয়ানক মূর্ত্তি, ভয়ানক হাসি, দেখে শুনে যে ভয় পেয়েছিলাম তুমি নিজগুণে সেই ভয় থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেলে! হায় ক্ষুদ্রশক্তি আমি, এই ক্ষুদ্র শক্তি দুর্ব্বল মন বুদ্ধি নিয়ে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মহা সত্তার সন্ধানে বেরিয়েছি! ধিক্কার এল—দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র অস্তিত্বের এই মহাপ্রয়াস দেখে। বামনের চাঁদে হাত! নিজেকে যত ক্ষুদ্র মনে হয়, ততই বুকের

মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে চক্ষু দিয়ে তপ্ত অশ্রু ঝরতে থাকে—কেবল তাঁর ঐ দয়ার কথা ভেবে, আর উনি কত মহৎ এই অনুভব করে।

এইভাবে বহুক্ষণ হয়ত কেটেছিল, অনুমান করলাম পাশে ধুনী একেবারেই শীতল হয়ে গেছে দেখে। উঠলাম, ভিতরের গুহা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম, প্রাণের মধ্যে একটি অপার্থিব সাধনলব্ধ শক্তির অনুভূতি, তার সঙ্গে

বেশ কনকনে শীত, তখন কার্তিক মাস। আমার জন্ম-মাস।

শান্তি নিয়ে।

একটা বড় ঘুমের পর যেমন নিত্য উঠে থাকি, উঠলাম। ঝাঁপটা সরিয়ে বাইরের গুহায় এসে আগুন জ্বালাবার উপকরণ আর শুকনো সরু চীড় বা পাইনের ডালপালা পাশেই গাদা করা আছে তাই নিয়ে আগুন করে ছোট ছোট কাঠ দিয়ে শেষে বড় কাঠ একখানা ফেলে, ঐ ধুনীর কাজ শেষ করলাম। একবার বাইরে যেতে হবে। বাইরের গুহাটা থেকে বাঁদিকে খানিকটা গিয়েছি —সেখান থেকে মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। রোজই একবার করে আকাশের দিকে চাই, তখন কালপুরুষ দেখা যেত ঐ সময় প্রায় মাথায় উপর। চেয়ে দেখি আকাশের গায় আজ সেই জায়গায় আর একটা মূর্তি।

কি মূর্তি ? যা কখনও দেখিনি। যেন আকাশের গায়ে আঁকা। পিছনে ঘোর অন্ধকারে সে মূর্তি যেন ফুটেছে। আজ কিছুদিন ধরে ঐ সময়টা দেখতাম কালপুরুষের তারাগুলি একটু পশ্চিমে হেলেছে, তাই আজও দেখব এই ধারণায় চেয়ে দেখেছিলাম.—কিন্তু যা দেখলাম সে তারাও নয়, নক্ষত্রও নয়, এক অনির্বচনীয় মূর্তি। ভাল করে দেখতে গেলাম, অল্পক্ষণেই মিলিয়ে গেল। মূর্তি মিলিয়ে গেলেও তার রূপের রেশটা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরা ছিল। উজ্জ্বল নীল, আকাশ পাতাল জোড়া শরীর ; মাথায় কিরীট ; কানে কুণ্ডল, বুকে হারসংযুক্ত মণি, চাঁদের মত স্নিগ্ধ জ্যোতি তার,—কোমরে উজ্জ্বল রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার ঝুলছে, তার নীচে ঝালরের মত পীতবস্ত্র। এক হাতে গদা, প্রকাণ্ড তার শেষ দিকটা। দৃষ্টি তার আমার দিকেই ছিল মনে হল।

যেই মাত্র ঐ মূর্তি মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ মূর্তি আমার চিত্ত-ক্ষেত্রের দেবমূর্তির কল্পনা, মনের সৃষ্টি। সত্য অস্তিত্ব এর নেই বা আছে, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। নারায়ণ বা বিষ্ণু মূর্তির যে কল্পনামূলক অনুভূতি ছিল চিত্তের মধ্যে, তা-ই ঐ শান্তিময় অবস্থায় নির্জন আকাশের পটে দেখা দিয়েছে। এ মূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করতাম না,—করলাম শুধু এই জন্য যে, এর পর যে ব্যাপার ঘটেছিল, তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কিছু থাকতে পারে ;—এই মনে করেই এ বিষয় উল্লেখ করছি।

মোটের উপর দেখছি আজ সকাল থেকে যা কিছু ঘটেছে তা আমার সাধনের দিক থেকেও যেমন বিচিত্র, আর অজ্ঞাত ঐ মহাপুরুষের কৃপা, আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ উপলক্ষে যা যা আমার মানসক্ষেত্রে ঘটেছিল, সৌভাগ্যের দিক দিয়েও তেমনি অদ্ভুত। যাই হোক এখন ধুনীতে আরও গোটা গোটা কাঠ দুটো ফেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে আসনে বসেছি।

যখন গুহার ভিতরে আসনে বসতে হয়, প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার পক্ষে দরজাটা খুলে রাখাই প্রয়োজন, কারণ বদ্ধ স্থানে, যেখানে বাতাস খেলে না, সেখানে কোনরূপ যৌগিক ক্রিয়া নিষিদ্ধ। সেই জন্যই শোবার সময় ছাড়া সব সময় গুহাদ্বার খোলাই রাখতে হয়।

বেশ সুখকর স্মৃতি, আজ ভাগ্যে যা যা ঘটেছিল, শেষে আকাশের গায়ে ঐ নারায়ণ বা বিষ্ণুমূর্তি দর্শনের এক মহানন্দময় অনুভূতি নিয়ে বসেছি। ধ্যান ত সহজভাবেই রয়েছে—কাজেই কোন আরম্ভ বা উদ্দেশ্য না নিয়েই স্বাভাবিক প্রাণ-চৈতন্যের গতি অনুসরণ করে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের এক অপূর্ব অনুভূতি। এইভাবে কতকটা কাল বাহ্যশূন্য অবস্থায় কেটে গেল ;—হঠাৎ ধুনীর সেই অল্প আলোয় দেখছি কি? গুহার মধ্যে কে একজন আসনে বসে, নিষ্পন্দ শরীর, যেন সমাধিমগ্ন। এ কি ব্যাপার?—এ যে আমারই শরীর ;—আমি ত একটু আগে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বিষ্ণুমূর্তি দেখে,—পরে নিয়মিত আসনে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞান ছিল না, কোন ভাবে ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় ছিলাম,—এখন দেখছি ঐ অবস্থায় শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আগে এমন কখন হয়নি, এটা কি হ'ল? কেমন করে এটা যে হ'ল—কে জানে? আমার পক্ষে ত অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি একেবারে স্বপ্নের অতীত বিষয়, কখনও ওদিক কল্পনাও করিনি। এটা অহংএর খেলা ত নয়! আশ্চর্য বোধ হ'ল শরীর ইন্দ্রিয় সবই ঐখানে ঐ আসনের উপর স্থাণুবৎ পড়ে আছে,—আর আমি সেটা দেখছি এখান থেকে চক্ষু দিয়ে যেমন সব দেখা যায় ঠিক সেই রকম অথচ আমার চক্ষু-ইন্দ্রিয়-যন্ত্রটা নেই। এ কেমন করে হয়? আসল চক্ষুর তন্মাত্রা যে বস্তু তা ইন্দ্রিয় ব্যতীত থাকতে পারে কি? চক্ষু দিয়ে যেমন ষ্টিরিয়োস্কোপেও ছবি দেখা যায় আবার শুধু চক্ষুতেও সেই ছবি দেখা যায়—যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যখন দেখি, তখন সেই যন্ত্রের অনুগামী হয়েই দেখি, যখন যন্ত্রসাহায্যে না দেখি তখন স্বাভাবিক দৃষ্টি। ঠিক এও তাই, যখন চক্ষু-ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি তখন তার বশেই যা কিছু দৃশ্যগোচর হয় আর যখন ব্যতিরেকে দেখি তখনই স্বাভাবিক দৃষ্টি ফুটে ওঠে, তার মধ্যে যন্ত্রের প্রভাব থাকে না। যন্ত্র দিয়ে দেখলে যেটুকু দেখা যায় তার প্রভাবে আশপাশে সুমুখে বাধা থাকলে উদ্দিষ্ট বস্তু দেখা যায় না, কিন্তু এখন আত্ম-চৈতন্যের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখছি তার কোন বাধা নেই। ঐ গুহার ভিতর সবই দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়িয়ে আরও দেখতে পাচ্ছি ; দৃষ্টি প্রসারিত করলে বিশাল প্রান্তর নদনদী দেশ সমুদ্র আকাশ বাতাস গ্রহনক্ষত্র সবই দেখছি, কোনই বাধা নেই।

একটা প্রবল বোধশক্তি মাত্র আছে, তা সুখ বলা যায়। শরীর যে কতটা ভার তা এখন বুঝতে পারি। বিজ্ঞানময় কোষমাত্র আমার সকল স্মৃতি, সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার আধার হয়ে রয়েছে। কি আনন্দ এই দেহমুক্ত অবস্থায় তা কেমন করে বুঝাব। এক একবার যেন আনন্দের তরঙ্গ আসছে আর আমায় বিহ্বল করে দিচ্ছে। এ এক অতি অদ্ভূত অভিজ্ঞতা, পূর্বে আর কখনও হয়নি। সিদ্ধ সাধু মহাপুরুষদের এটি সর্বক্ষণ হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তাঁরা ত্রিলোকের খবর পান, ত্রিকালজ্ঞ হয়ে যান।

আরও একটি বিচিত্র ব্যাপার,—যখন রয়েছি কোন লক্ষ্যে, তখন যেন আমি সুদ্ধ দৃষ্টি ও দ্রষ্টা এক, মধ্যে যন্ত্রও নেই, শরীরও নেই—শরীর-বোধও নেই। দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মহাপ্রসারিত হয়ে পড়েছে,—যেমন লক্ষ্য বস্তু আর লক্ষ্য, যা আমা থেকে বস্তুর সঙ্গে যোগ রাখছে তা মোটেই পার্থিব দৃষ্টিও নয় বা বস্তুও নয়।

হঠাৎ মনে হ'ল আমার মৃত্যু হয়নি ত? না হলে কেমন করে বাইরে

এলাম ? দেহত্যাগ হয়ে গেল নাকি এই সূত্রে ? সে কেমন করে হবে ? আমার দেহত্যাগ, আমি জানব না। তা কি হয় ? কেন হবে না ! অনেকের ত হয়, যাদের অত্যন্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি, সজ্ঞানে দেহ ছাড়া তাদের পক্ষে অসম্ভব বলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের মৃত্যু-মূর্চ্ছা আসে আর সেই অজ্ঞান অবস্থায়ই তারা দেহত্যাগ করে। তার পর ত আর ঢুকবার উপায় তাদের হাতে থাকে না,—তারা জড়বুদ্ধি ভোগী জীব মাত্র। আমার কেন তা হবে ? না, না, না, না,—এ মৃত্যু নয়। জীবের যথার্থ দেহত্যাগের পূর্বে একটা দ্বন্দ্ব আছে, তার মৃত্যুর একটা আভাস আছে, মৃত্যুসংস্কার থেকে তার মধ্যে একটা আন্দোলন চলে কতকক্ষণ ; সে সব তো কিছুই হয়নি। সকলের উপর বড় প্রমাণ আছে। এখন দেহত্যাগ যে হয়নি তার বড় প্রমাণ আমার বোধে—আমার চৈতন্য কিছুতেই এ অবস্থাকে মৃত্যু বলে স্বীকার করছে না।—আমার মৃত্যু, এ কখনও নয়। এখন বুঝেছি সেই মহাপুরুষের শক্তির প্রভাব নিশ্চয়—এটা তাঁর সিদ্ধির প্রভাব,—তিনি কৃপা করে বিদেহ মুক্তির আভাস দিয়েছেন। তাঁর বাহ্য অন্তর্দ্ধানেও তিনি আমায় ত্যাগ করেন নি।

কেমন করে বেরিয়ে এসেছি তা জানি না, কেমন করে আবার প্রবেশ করব তাও জানি না, তা সত্ত্বেও এটা মৃত্যু নয়,—কারণ আত্মচৈতন্য প্রতিবাদ করছে। যাই হোক এখন এইসব তোলাপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক রকম গতি হতে লাগল। যেন উপর দিকে টানছে। আপন ভাবেই টান, কোন অপর শক্তির টান নয়। যেন ইচ্ছা হল আমি ঊর্দ্ধলোকেরই বস্তু, গতি আমার ঐ দিকেই। এর মধ্যেও সংস্কারের কাজ কিছু আছে কি না তা জানি না, তবে আমার নিজের দিক থেকে বেশ অনুভব হচ্ছিল যে, আমি যখন এখানকার, বা এ রাজ্যের বিষয় বস্তু নয়, তখন কেন এখানে রয়েছি। এখানে কারা থাকে ? যারা স্থূল, অহং-সর্বস্ব, যারা পঙ্কিল, যারা কর্মবিপাকগ্রস্ত—ভোগ-সর্বস্ব, দেহত্যাগ হলেও তারাই এখানে থাকে। যাদের ভোগায়তন খসেছে, তারা এখানে কেন থাকবে ? থাকতে পারেই না,—দুঃসহ এখানে থাকা। এইসব যুক্তি, আমার মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে ভেসে উঠেছে বটে, কিন্তু আমি ত একটুও নড়বার নাম করছি না ! অন্তরে একটা আনন্দ ত আছেই, গতি যদি হয় তাও সেই আনন্দেরই গতি হবে, কিন্তু কেন 'আমি' এখান থেকে নড়ছি না, কি হল ?

হায় রে কপাল ! ঢেঁকি যে স্বর্গে গেলেও সে ধান ভানা ছাড়া আর কি ভাবতে পারে ? কেন নড়তে পারছি না, একটু অনুসন্ধিৎসু হতেই বুঝলাম যে, ঐ যে দেহটি ওখানে রয়েছে,—তাকে ফেলে যে যেতে চাই না। মমতা দেহত্যাগেও যায় না, এইটিই দেখাতে এতটা তোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হ'ল, আর এ ক্ষেত্রে যে আমার দেহত্যাগ হয়নি এইটিই প্রমাণ হয়ে গেল,—কারণ তা যদি হ'ত তা হলে ঊর্দ্ধগতিতে আপনিই ভেসে যেতাম। আসল কথাটা এই যে, যদি দেহ থেকে বেরিয়ে এসে অবস্থান্তরে গতি হয়, দেহটা যে অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল, কে রক্ষা করবে ? লোকে দেখলে ত্যক্ত দেহ মনে করে মাটিতে পুঁতে দেবে, না হয় পুড়িয়ে দেবে। দেহটা রক্ষা করবে এমন ত ব্যবস্থা করে আসিনি ? কেমন করে আসব ? আগে কি জানতাম বা প্রস্তুত হতে পেরেছিলাম ? যখন বুঝলাম ঐ দেহটার জন্যই ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়েছে, দেহটা যে কত বড় বন্ধন এখনই তা প্রত্যক্ষ করলাম। একটা যেন

বিষাদ এসে পড়ল ; ঠিক বলতে গেলে যেন একটা বিষণ্ণ ভাবের হাওয়া,—ফাগুন মাসের রাত্রের শেষে ভোরের দিকে গায়ে লাগে আর গা-টা শির শির ক'রে ওঠে সেই রকম। যেন অশান্তির প্রবাহ একটা বয়ে গেল আমার মন-বুদ্ধির উপর দিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঊর্দ্ধগতি অনুভূত হ'ল, যেন অন্ধকার রাতের পর অরুণোদয় হল। আঃ কি আনন্দ, গম্ভীর পরিপূর্ণ আত্মপ্রসার। কেমন করে প্রকাশ করব তা জানিনি, সাধ্যও নেই।

ঊর্দ্ধগতি শুনে কেউ যেন না মনে করেন যে, উপর অর্থাৎ আকাশের দিকে গতি। মোটেই তা নয়। ঊর্দ্ধগতির সহজ অর্থ এখানে বুঝতে হবে চৈতন্য-সত্তার প্রসার। সে কেমন ? এই যে আমি, এই বোধ যেন গলে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে গেল—তার মধ্যে কোন দিকের ব্যাপার নেই। এ ছাড়া অন্যভাবে বুঝানো এই অল্প ভাষাতে সম্ভব নয়। আমি আর খণ্ড সত্তা নয়—আমি বিশাল, যেন সকল বাস্তব ছাড়িয়ে এক মহা আনন্দময় অস্তিত্বে পরিপূর্ণ। পূর্ণ জ্ঞান আর আনন্দ হ'ল একমাত্র অনুভূতির বিষয়—মাত্র আনন্দই সম্বল। প্রবাহময় সে আনন্দ। ঢেউয়ের পর ঢেউ যেমন সমুদ্রে অনেক দূর থেকে এসে তীরে মিলিয়ে যায় তেমনি অনন্ত আনন্দের রাজ্য থেকে আনন্দের ঢেউ, একটার পর একটা নিরবচ্ছিন্ন এসে আমাতে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার বর্ণনা নেই, কারণ ভাষা নেই।

এইভাবে সেই ব্যাপক অবস্থায়, আনন্দের সমুদ্রে, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মহানন্দ উপভোগের পরই আবার সেই পূর্বাবস্থায় এসে পড়লাম। ঐ যে আমার দেহটি রয়েছে—আমি দেখছি। একটা বিষাদের শীতল তরঙ্গ আবার যেন আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল। আবার পরক্ষণেই সেই আত্মচৈতন্যের বিস্তার। আনন্দের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আমাতে মিলিয়ে যাচ্ছে দেশ কালের ব্যবধান পেরিয়ে। তারপরে আবার সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় এসে পড়া, ঐ আমার দেহ ! এ রকমই চলছিল। তার পরই—

একটা যেন গোলমাল বেধে গেল, ঐ দেহটি নিয়ে। স্থূল দেহটি ছেড়ে আত্মচৈতন্য একেবারে উধাও হতে চাইছে না। কি হবে আমার দেহের গতি যদি আর আমি দেহের মধ্যে ফিরে যেতে না পারি ? অথচ এদিকে আত্ম-চৈতন্যও প্রসারমুখী হয়ে রয়েছে,—এই ভাবের অবস্থা যখন তখন আর একটা কিছু হ'ল। যা হ'ল তা কোন বাস্তব ঘটনা নয়, তাকে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হবে, যেমন মাছ ধরতে ছিপ ফেলে বসে ফাৎনার দিকে দেখতে দেখতে দেখা যায়, যখন মাছে ঠোকরায় তখন ফাৎনাটা ওঠে নামে, তারপর চোঁ করে ডুবে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়—এ ঠিক সেই রকম হ'ল। আমার চৈতন্য, অর্থাৎ আমি—এই বোধ, এই আমার দেহ আর এই আমি, সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাপক সত্তা এই বোধ হতে ঐ ডুবে-যাওয়া ফাৎনার মতই ঘোর একটা অন্ধকারের মধ্যে যেন একেবারে ডুবে গেলাম, জ্ঞান, চৈতন্য, কোন প্রকার বোধ রইল না।

পরে যখন এই অবস্থার কথা চিন্তা করেছি, তখন যেন মনে হয়েছে, ঐ যে প্রগাঢ় অন্ধকার, আলোর অভাবে যে অন্ধকার অনুভব করি, অন্ধকারটা সে রকম নয়। চৈতন্যের প্রসার যখন হয়েছিল, তখন যেমন আমি চৈতন্যময় সত্তা এই বোধ প্রসারিত হয়ে চৈতন্যের দীপ্তিময় একটা বিরাট রূপ অনুভব করে-ছিলাম, এ যেন ঠিক তার বিপরীত রকমেরই একটা আমি-বোধের অভাব বা শূন্যতা, তাকেই অন্ধকার বলছি, যদিও সে সময়ে প্রথমটা সে অবস্থায় অন্ধকার

বোধই হয়েছিল। আরও সহজ করে বললে একথা বলতে হয় যে, প্রথমে যেটা অন্ধকার অনুভূত হয়েছিল পরে সেটাই আত্মজ্ঞান বা অস্তি বা আমি আছি এই বোধের অভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন প্রথম অনুভবের যে অন্ধকার, এই আমি-বোধশূন্য ভাবের আভাস, সে অন্ধকার বড় চমৎকার।

তার পরেই মনে হ'ল যেন আমি আছি,—সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে! সে কিন্তু ভয়ের অন্ধকার নয়, ওতপ্রোত ব্যাপক অস্তিত্বের অভাবগত আঁধার। এক একবার দেখছি যেন আমি অন্ধকারের মধ্যে, আবার একবার দেখছি আমিই চৈতন্যময় বিরাট সত্তা। আর কিছুই নেই—সেখানে কল্পনা নেই, সংস্কার নেই, কোন শব্দ নেই, গন্ধ নেই, আছে আমায় স্পর্শ করে এক যেন সীমাহীন বিরাট অস্তিত্বের আভাস, তাই-ই সেটা অন্ধকার। এই অবস্থার আর কোন ভাষা নেই বলেই অন্ধকার বলছি,—কিন্তু এখানে আমরা অন্ধকার বলতে যা মনে করি তা নয়, নয়, নয়। সে বড় মহান, পবিত্র ও সত্যই তার অস্তিত্ব,—কি বলব সেই অন্ধকারের তুলনায় আমাদের জাগ্রত অবস্থার যে সূর্য্য আর আলো তা মিথ্যা। যখন ভাষায় আর কিছুতেই বোঝাতে পারচি না,—তখন তার পরের কথাটা বলি।

কতক্ষণ ঐ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন অন্ধকার হয়েই ছিলাম আচ্ছন্নের মত, তারপর একটা শব্দময় অবস্থায় এলাম। এলাম না বলে জেগে উঠলাম বললেই ঠিক হয়। যেন জাগরণের মতই অবস্থা হ'ল, অসংখ্য ধ্বনির সমষ্টি যেন আমি, একান্তই ঐ শব্দ বা ধ্বনি অনুভব করছি 'কানে শোনার মত নয়' যেন শব্দময় অস্তিত্ব আমার হয়ে গেছে এখন। অদ্ভুত সে ধ্বনি, গম্ভীর, শত শত শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মেঘের গর্জন মিশালে যেমন শোনায় সেই ধরণের শব্দ—তার অন্য উপমা নেই। এটা যেন বিরাট বিশ্বের আবর্তন-শব্দ, দেশ-কালের অতীত এইসব অনুভব যতই প্রত্যক্ষ ততই গভীর, ভুলবার নয়। সেই অবস্থায় এই অস্তিত্ব নিয়ে আরও কতো কি অনুভব করেছি না-করেছি সে কথায় আর কাজ নেই। কেমন করে ফিরে এলাম সেই কথাই বলছি এবার।

যেমন ভাবে অন্ধকারে ডুবেছিলাম, ঠিক তেমনি ভাবেই কতক্ষণ পর যেন হঠাৎ দিব্য ভেসে উঠলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে এই যে আমার দেহ! যেন কোন্ মহানন্দময় একটি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম স্মৃতিময় অনুভূতির রেশ নিয়ে। ও কি? সেই মহাপুরুষ আমার শরীরের কাছেই একখানা আসনে উপবিষ্ট। চৈতন্যের মধ্যে তখন একটা প্রবল আলোড়ন চলতে লাগল ঐ দেহ অধিকার করতে। আমার দেহের মধ্যে যেতে চাই আর ঐ মহাত্মার সঙ্গ করতে চাই। উনি অতি আপন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চমক,—দেখি, এখন দেহের মধ্যে এসেছি। চক্ষু মেলে দেখি মহাপুরুষ মৃদু মৃদু হাসছেন আমার দিকে লক্ষ্য করে,—তাঁর মধ্যে যেন জগৎভরা রহস্য। বুঝলাম, এইসব তাঁরই শক্তির খেলা। —এই দেহাত্মবোধের রাজ্যে, যেখানে রোগী, ভোগী, কর্মী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী নির্বিচারে দেহাত্ম বুদ্ধি নিয়ে ভোগের কামনায় হাবুডুবু খাচ্ছে—তিনি আমার অসহায় অজ্ঞান অবস্থা দেখে কৃপা করে দেখিয়ে দিলেন যে, দেহমুক্ত অবস্থা কি, আর ঐ দেহই আমি-সত্তার কত বড় একটা বন্ধন।

এখন এই অবস্থার কথা বাবা মুক্তিনাথকে জানাবার একটা প্রবল আগ্রহ হ'ল। সেই মহাত্মাকে ঐ গুহায় রেখেই তার পরেই আমি কলকাতায় ফিরে আসি একবার। বাবা মুক্তিনাথের সঙ্গে দেখা করে সকল কথাই বললাম।

তিনি বললেন,—তোমার মধ্যে কতকাল থেকে ঐ সাধু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের জীবন কি রকম, তারা কেমন থাকে, কেমন করে তাদের ক্রিয়াকর্ম চলে এইসব শুধু দেখা শোনা নয়—বিশেষত এই গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে তফাৎটা কোথায়, এইসব ঠিকমত বুঝবার জন্য প্রাণ তোমার ছটফট করছিল তাই তোমার বাইরে যাবার এতটা আগ্রহ। এখন সেটা এইরকমে কিছুকাল থেকেই বেশ ধারণা হয়েছে কিন্তু তোমার ঘুরপাক খাবার অতীব প্রবল মোহ যে একটা আছে,—তার ফলে এখন আর ঘরে থাকা মুস্কিল তোমার পক্ষে বুঝতেই পারচ, আবার বাইরে যেতে হবে, আর শীঘ্রই হবে। কেবল ঐ খবরগুলি আমার গোচরে আনবার জন্যই তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসা ;—নয় কি ?

মনে মনে বুঝলাম সত্য কথাটাই বলেছেন। কোন কথা না বলে চুপচাপ বসেই আছি, অবশ্য ঠিক একেবারেই বসে নেই, ভিতরে কাজ ঠিকই চলছে। তিনি আবার বলছেন,—দেখ, তুমি মূর্তি দেখ তো,—একটা বিশেষ লক্ষ্য ক'রো দিকি,—যখন ঐ মূর্তি মিলিয়ে যাবে তার পরই স্মৃতিতে কি ভাবে ধরা থাকে, কতক্ষণ স্পষ্ট থাকে লক্ষ্য ক'রো। যদি দেখ যে স্মৃতিতে কোন দাগ নেই, ঠিক সেই রূপ কিছুতেই মনে আনতে পার না তাহলে বুঝবে তুমি সাকারের দলে নও।

আমি বললাম, আর্ট স্কুলে যখন ছিলাম তখন মেমারী ড্রইং অভ্যাস ছিল, সেইজন্য প্রায়ই কোন মূর্তি আঁকলে মেমারীতে রাখতে পারি। তিনি হেসে বললেন, এ তোমার ষ্টাডি করা মূর্তি নয় যে স্মৃতিতে থাকবে, এগুলি যোগ-বিভূতির বিষয়, এ মূর্তির ঐশ্বর্য্য স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় না। দৈবমূর্তি ঠিক ঠিক স্মৃতিতে ধরে রাখাও সহজ কথা নয়। তবুও যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে বিশেষ সাকার ভাবেই তোমার সিদ্ধি। একটু থেমে আবার বললেন, সাধনের অবস্থায় যে সকল দেব-দেবী মূর্তি দেখা যায় তা তো রক্ত মাংসে গড়া মূর্তি নয় যে স্মৃতিতে ধরা যাবে। ঐ বিভূতির মূর্তি তুমি আঁকতে চেষ্টা করেছিলে ? আমি বললাম, যা চিত্তের মধ্যে দেখি তা এমনই বিশাল, এমনই ব্যাপক, তা কাগজে রংয়ে ধরা সম্ভব নয়। তিনি যেন একটু কৌতূহলী হয়েই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি বৈশিষ্ট্য তার বল তো ? আমি বললাম, তার ব্যাক্‌গ্রাউন্ড নেই, সমস্ত ক্ষেত্রটাই ভরা। তিনি বললেন, ঠিক ঠিক, সত্যই তোমার দেখার বৈশিষ্ট্য একটা আছে। বাইরের কারো সঙ্গে আলোচনা ক'রো না। এসব যে দেখে তারই, আর কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই তার। সেইজন্য আলোচনাও বিফল। তুমি তো এটা জানো, তোমায় না বললেও চলে কিন্তু ঐ যে বিষ্ণুপদ, জান তো ? ও প্রথম প্রথম একটু বেশী একাগ্র হয়ে কাজ করেছিল, কিছু পেয়েও ছিল। মহা উৎসাহে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জাঁক ক'রে আলোচনা করতে শুরু করে দিলে, ফলে ঐ পর্য্যন্ত হয়েই ঠেকে গেল, আর অগ্রগতি নেই। তার পর এখন বছরখানেক হল নিত্য-নৈমিত্তিক এসে খোসামোদ করছে, খাবার আনচে, কাপড় আনচে,—কত কি সব করচে। বলে—আমায় আবার একটু এগিয়ে দিন। হাতিকে হাতের ঠেলা দিয়ে সরানো যায় কি ? ও একটা হাতির সামিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ বিষ্টুই তো আমায় এনেছিল ? তার আগেই কি ঐ সব ব্যাপার ? তিনি বললেন, হাঁ, তার আগেই যা কিছু হবার সব হয়ে

চুকে গিয়েছে,—এখন টেনেটুনে চলছে ; আসল গতিবেগ বন্ধ ;—ঐ অবধিই তার হয়ে গেল—

একটু দুঃখ পেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ সামান্য একটু বহির্মুখী হয়েছিল বলেই ওর আর কিছু হবে না, এ ত বড় ভয়ানক কথা,—

তিনি বললেন, তা আমি কি করব ? ওর যদি দ্রুত ওঠবার শক্তি না থাকে, খানিকটা এগিয়ে আর না চলতে পারে, আমি কি তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাব ?

আমি বললাম, তা না হলে গুরু কি ? আপনি ওকে সাহায্য করবেন না আবশ্যক হলে ? তিনি বসে ছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, সাহায্য করাটা চলতে পারে আর সেটাই করা উচিত, সত্য—কিন্তু, তার সব কিছু সম্পূর্ণ করিয়ে আগাগোড়া ঠেলে তুলে দেওয়া তা আমারই হোক বা আর একজনের শক্তিতে হোক, তার কোন অর্থ হয় ? এটা বুঝতে পারছ না, তুমি তার পঙ্গুত্ব কামনা করছ ?

—তা বুঝেছি কিন্তু এইটুকুই বুঝতে পারচি না যে একবার একটু স্খলন হয়েছে বলেই তার আর উর্দ্ধগতি হবে না, একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল সারাপথ, এটা ঠিক বিচার কি ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার বিচার ? শুনবামাত্রই বলতে যাচ্ছিলাম, আপনারই,—কিন্তু ঠিক যেন একটা বিদ্যুতের আঘাত পেলাম এবং তৎক্ষণাৎ সংযত হলাম, বুঝলাম জীব এবং প্রকৃতি বা ঈশ্বরের খেলা চলছে তাতে গুরু এক মধ্যবর্তী অংশ বা যন্ত্রমাত্র। তাঁর কর্তব্য সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির বিধি নিয়মই বলবৎ। যেই সংযত হলাম অমনি তিনি বুঝলেন সূত্রটি ঠিক ধরতে পেরেছি ;—তখন বললেন,—দেখ, ছোট একটা স্খলনেই সব শেষ হয় না, যদি সে পাত্র নিজ ভ্রম বুঝে সামলে আবার শক্ত হয়ে ঠিকমত চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। আমায় সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে, এমনকি তার যদি সত্য সত্যই অগ্রসর হবার মত বল না থাকে তাহলে আমাকেও ছেড়ে দিতে হবে তাকে, আমি অপাত্রে কেন শক্তি নষ্ট করব ? অধ্যাত্ম বিধাতার এইই বিধান। যত লোক আসে সবাই কি সিদ্ধ হয়, সবাই কি পায় ইষ্টকে যারা ইষ্টের ইঙ্গিত বোঝে না ?

আমি স্থির হয়ে গেলাম, মনের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ে গেল,—তখন তিনি আবার বললেন,—দেখ, তুমি নিজের অবস্থাটাই এর সঙ্গে জড়িয়ে তত্ত্বটা যে কি তাই জানতে চাইছিলে, অর্থাৎ তোমারও যদি ঐ রকম অবস্থা হয় তাহলে কি হবে ? এটা তোমার গোপন মনের কথা, তুমি হয়তো স্পষ্ট এটি ধরতে পারনি, কিন্তু আমি তো জানি। এখন তুমি বুঝেছ, যাও বাবা, নিজের পথে নিজের তালে চল। তুমি শক্ত আছ জানি, খানিক সামলে চলতে পারবে,—তারপর আপনিই বুঝতে পারবে তোমার গতি কতদূর,—তারপর যা করতে হবে তা কাকেও বলে দিতে হবে না। তুমি আবার তো বেরিয়ে পড়বে ; —সেই তালেই আছ ? তা যাও ;—কলকাতায় এলে খবর দিও যদি থাকি।

বুঝলাম বিদায় দেওয়া হচ্ছে ;—আমি কিছুক্ষণ আরও ছিলাম যদি গুহ্য সাধনের তত্ত্ব উপদেশ পাই আর ভবিষ্যতে জটিলতার সৃষ্টি যাতে না হয়, সাবধান হতে। চক্ষের ওপর বন্ধু বিষ্ণুপদর যে ত্রুটি দেখলাম ও শুনলাম এর পরও যদি কারো চৈতন্য না হয় তাহলে আর কাকে দোষ দেওয়া যাবে ?

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আসবার সময় পথেই ঠিক করলাম কোথায় যাব,

বাড়িতে তো কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।—একখানা ছবি মদনের কাছে অল্প-মূল্যে বিক্রয় করে সেই রাত্রেই প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদে যাত্রা করলাম,—সেখানেও বেশীদিন থাকতে পারলাম না। বাড়িতে রটেছে আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি।

মেসোমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন,—একি সব শুনচি? বললাম, আমি যে সন্ন্যাসী হইনি তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তবে কিছুদিন বাইরেই থাকব স্থির করেছি। আমি দীক্ষা নিয়েছি,—আরও কিছুদিন সাধন ভজন করব তার পর আবার ঘরেই যাব। তিনি কি বুঝলেন তা জানি না, তবে সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ মাসিমার কাছে শুনলাম, তিনি বলেন, ঘরে বসে কি সাধন ভজন হয় না, এই তো আমরা করছি, আমরাও তো দীক্ষা নিয়েছি,—তাতে আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে তো হয়নি। আমি বললাম, এই তো তোমরা মাঝে মাঝে দুমাস আড়াই মাস বাইরে চলে যাও।—মাসিমা বললেন, সে তো তীর্থধর্ম করতে। আমি বললাম, আমিও তাই তীর্থধর্ম করে আসব কিছুদিন! যাই হোক তখন থেকে পাঁচ ছয় বৎসর কাল উত্তর ভারতে, হিমালয়ের নানা তীর্থে পর্য্যটনে কেটেছে,—শেষের কিছুকাল কোন মহাপুরুষের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনেই আসন করে বসে যথার্থই ইষ্টলাভ করে যখন গার্হস্থ্যজীবনে ফিরে এলাম তখন ইউরোপের প্রথম মহাসমর শেষ হয়ে এসেছে।

সে সকল বিবরণ অন্য গ্রন্থে বলা হয়েচে।

॥ ১ ॥

এই সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের জটিল সাধনা সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রবল হয়। সাধনসিদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন, এমন কোনও মহাপুরুষের সন্ধান যদি পাই, তাহা হইলে এ চঞ্চল মন প্রাণ বুঝি স্থির হয়। তন্ত্রের প্রসিদ্ধ স্থানসকল খুঁজিলে কি মিলে না? বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় যত পীঠস্থান আছে ঘুরিতে সংকল্প করিলাম। খুব আশা ছিল যে, কোনো না কোনো স্থানে নিশ্চিত সন্ধান মিলিবে।

অন্য কোথাও যাইবার পূর্বে, কি জানি কেন পুরী বা শ্রীক্ষেত্র যাইতে অন্তরের মধ্যে একটা টান অনুভব করিলাম। সুতরাং অবিলম্বেই পুরী যাইবার আয়োজন এবং পরদিন পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেল, এদিক-ওদিক বেড়াই, সমুদ্রে স্নান করি, জগন্নাথ দর্শন করি, মনে প্রাণে জগবন্ধুর কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাই।

একদিন বৈকালে মন্দিরের সিংহ-দরজা পার হইয়া জগমোহনের সম্মুখেই এক ভৈরব মূর্তি চোখে পড়িল। সুদীর্ঘ স্থূল বা মাংসল শরীর, গোলগাল মুখ, ঢুলু ঢুলু আঁখি, মাথায় ছোট ছোট কালো চুল, তার উপর একটা কাপড় অযত্নে জড়ানো, মুখে কার্তিকেয়ের মত মানানসই গোঁফ, দাড়ি কামানো। লাল কাপড় পরা, তার উপর লাল চাদর জড়ানো, হাতে একটি সরু লাঠি, যাহা শরীরের সঙ্গে মোটেই মানায় নাই, আপন ভাবেই বিভোর, ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। আমি তাঁর সঙ্গ লইলাম।

তিনি জগবন্ধুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া যখন চাতালের এক দিকে বসিলেন তখন আমিও কিছু দূরে বসিয়া পড়িলাম।

ক্রমে দুই-একজন করিয়া সাত-আটজন বাঙ্গালী জড়ো হইল, কেহ-বা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াই বসিল,—কিছু জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া কেহ-বা আরও কাছে গিয়া বসিল। তিনি কিন্তু কোনও কথাই কারো সঙ্গে বলিলেন না, যেন আপন ভাবেই বিভোর, বাহ্য জগতের হুঁস নাই। এক ভাবেই বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন তখন আর একজনের দিকে ফিরিয়া নীচু-গলায় বলিলেন: ইনি কথা কন না বোধ হয়, এখন কিছু বলবেন না।

দেখিলাম, তাহারা অবস্থা বোঝে না।

আর একজন তাই শুনিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া, তাহলে এখন আসি বাবা, বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। একে একে তখন সকলেই সরিয়া পড়িলেন।

আমি তখনও স্থির বসিয়া আছি। দেখিতেছি, তিনি নির্বিকার, একই ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা-দীপ জ্বালা হইলে তিনি উঠিলেন এবং মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সমুদ্রের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি পিছনেই আছি।

যখন স্বর্গদ্বার শ্মশানের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রাত্রি হইয়াছে। অবিরাম সমুদ্রগর্জন শুনা যাইতেছিল, তার উপর চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার। ভৈরব কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শ্মশানের দিকে বিহ্বল-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। একটি মাত্র চিতা জ্বলিতেছে, তার আশে-পাশে যেন দুই-তিনজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়াপুরুষ লম্বা লম্বা দণ্ড হাতে নড়াচড়া করিতেছে। শ্মশানের প্রান্তে যাত্রীদের ঘরখানিও চিতার আলোকে দেখা যাইতেছিল, তাহার ভিতরে আলোর কোনও আভাস নাই।

ভৈরব রাস্তা হইতে নামিতে লাগিলেন, দেখিলাম, শ্মশানের ঐ ঘরখানি লক্ষ্য করিয়াই যেন চলিতে লাগিলেন। আমি পিছনে নিঃশব্দে চলিলাম। শ্মশান-ভূমি পার হইয়া তিনি সরাসরি সেই ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন, আমি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন আমার কি করা উচিত।

ক্রমে দেখিলাম ভিতরে আলো, আবার আর যে দুইটি মূর্ত্তি ভিতরে নড়াচড়া করিতেছিল, সে দুইটিই নারী ; ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম তাহাদের মধ্যে একজন যেন যুবতী। দুজনেরই লাল কাপড় সুতরাং তাঁহারা ভৈরবী অনুমান করিলাম। যাই হোক আমি ঠিক করিলাম কাল প্রাতে আসিয়া দেখা করাই ভাল, আজ এ অবস্থায় ওখানে যাইয়া উপস্থিত হইতে মন সরিতেছে না। ফিরিলাম সে-রাত্রে।

পরদিন সকালে, তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে, স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলাম। শ্মশান-যাত্রীদের সেই ঘরের সম্মুখেই একটু চাতালের মত, সেই-খানে দেখিলাম ভৈরব,—নিদ্রা হইতে উঠিয়া পুরাতন একখানি সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে তাকিয়াতে ঠেস দিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। গা

খোলা, গলায় পৈতার গোছা, মালার মত ঝুলিতেছে, দড়ির মত নীচের দিকটা পাকানো—একখানি লুঙ্গির মত পরা। সেইরূপই ঢুলু ঢুলু আঁখি। আমি প্রণাম করিয়া কিছু দূরে বসিলাম।

আমার দিকে একবার অনাসক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আপন মনে তামাক খাইতে লাগিলেন। দূরে পোঁটলা-পুঁটলি, একটা টিনের টোল খাওয়া বিবর্ণ তোরঙ্গ, সাপুড়েদের বেতের ঢাকা দেওয়া বড় চুপড়ির মত সেকালের পেটিকা দুই একটি, পুরানো হ্যারিকেন একটা, ত্রিশূল, চন্দন-পিঁড়ি—এইসব নানা জিনিস চারিদিকেই ছড়ানো। ভিতরে বুঝি উনান ধরানো হইয়াছে, ধোঁয়া

বাহির হইতেছে। আমি কতক্ষণ বসিবার পর লাল কাপড় পরা একজন যুবতী কলাইকরা বাটিতে চা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া মৃদু স্বরে, বাবা চা খান, বলিয়া সসংকোচে চলিয়া গেল। বাবা কিন্তু চা খাইবার কোনও চেষ্টাই দেখাইলেন না।

আমার মনের অবস্থা তখন জটিল, তার উপর সম্মুখে বড় রাস্তার দিকে হঠাৎ চাহিয়া দেখি পাহারাওয়ালার মত একজন, আরও দুই-তিনজন সঙ্গে, রাস্তা হইতে নামিয়া এই দিকেই দ্রুত গতিতে আসিতেছে। আমি ভাবিলাম, থাকিব না যাইব। দেখাই যাক না কেন, আরও একটু থাকিয়া যাই, দৈবে যদি কথাবার্তার সুযোগ পাওয়া যায়।

পাহারাওয়ালা ও তাহার সঙ্গীর দল আসিয়া পড়িল। দেখিলাম, যে গতিতে তাহারা শ্মশানের উপর দিয়া আসিতেছিল ঘরের কাছে আসিয়া তাহাদের গতি বিশেষ মন্দ হইয়া পড়িল। তারপর সকলেই দাঁড়াইয়া গেল, কেহই তাহাদের মধ্যে কথা কহে না।

ভৈরব কিন্তু কোনো দিকে না চাহিয়াই আপন মনে তামাক টানিয়া যাইতেছেন। এতগুলি লোক যে এখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকেই দেখিতেছে, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। দলের একজন একটু অগ্রসর হইয়া, কাশিয়া গলা সাফ্ করিয়া,—দেখ! এটা সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকবার জায়গা নয়, বলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া আর একজন বলিল:

শুনছেন ? তাহাতেও তাঁর ভাবের কোনও ব্যতিক্রম হইল না দেখিয়া আর একজন পাহারাওয়ালাকে বলিল : দেখছো না, ভয়ানক মাতাল অবস্থা।

ভাবটা তাঁর মাতালের মতই বটে। দলের সকলে নিজেদের মধ্যেই নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। কোন মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া উড়িষ্যার প্রহরী এবার ভিতরের দিকে চাহিয়া ডাকিল : কে আছ গো ভিতরে ?

তখন ভিতর হইতে একটি অর্দ্ধবয়সী ভৈরবী মূর্তি বাহিরে আসিলেন। তাঁকে দেখিয়াই প্রহরী বলিল : দেখ ! আজ চার দিন হই গলা, তোমরা এখান হতি যাইছ না, কিন্তু এবার দারগাবাবু হুকুম দিইছেন, তোমাদের এখান হতি সরাই দিতি হব। আমরা সেই জন্যই আসুচি।

ভৈরবী শুনিয়া কাতর-কণ্ঠেই বলিলেন : কি করব বাবা আমরা এতদিন কোথাও একটা জায়গা ঠিক করতে পারিনি ; আজ বিকেলে আমরা এখান থেকে যাব, ঠিক বলছি বাবা, কাল আর তোমরা আমাদের এখানে দেখতে পাবে না।

প্রহরীর দল এই কথা শুনিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, আর কিছু না বলিয়া একে একে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমি তখন সংকোচ কাটাইয়া ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনারা কোথায় যাবেন ?

তিনি বলিলেন : জগবন্ধুর মন্দিরের কাছে, কালিকাদেবীসাহিতে পাণ্ডারা একটা জায়গা দেবে ত বলছে, এখন সেইখানেই যাওয়া হবে।

এই সময় দেখিলাম ভৈরব তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিলেন, চক্ষু প্রায় বুজিয়াই আছেন।

—চা খান বাবা, জুড়িয়ে গেল যে, বলিয়া ভৈরবী বাটিটা তুলিয়া ধরিলেন। তখন ভৈরব, অ্যাঁ, বলিয়া একবার চক্ষু চাহিয়া সেটি হাতে লইলেন বটে কিন্তু আবার চোখ বুজিয়া দুলিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, এখন বোধ হয় চেষ্টা করিলে আমার সঙ্গে কথা কহিতেও পারেন। ভৈরবী তখন ঘরের ভিতরে গেলেন দেখিয়া আমিও একটু কাছ ঘেঁষিয়া বসিলাম।

তিনি ত কথাই কহিবেন না, অনেকক্ষণ পর সসংকোচে বলিলাম : আপনি কি দয়া করে আমার কথা শুনবেন ? অনেক দূর থেকে এসেছি।

তিনি চক্ষু বুজিয়াই ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে শুনিবেন। সাহস পাইয়া তখন ধীরে ধীরে নিজের কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে লাগিলাম। তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষ্য কি এবং সাধন-পথ কি প্রকার ? ঐ মার্গের কোনও সাধক বা সিদ্ধ পুরুষের সংযোগের আশা করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতেছি— এই সব। তাঁর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম তিনি সব শুনিয়াছেন। অন্য কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম না, কেবল তিনি চক্ষু মুদিয়া দুলিতে দুলিতে আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

যখন দেখিলাম তিনি কিছুই বলিলেন না—তখন অনুমান করিলাম যে হয়ত অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন সুতরাং স্থির বসিয়াই রহিলাম। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা রহিলাম, তার পর দেখিলাম, তিনি ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেইরূপ ঢুলু ঢুলু চোখে, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মাতালের মত

টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। পাঁচ সাত দশ পনেরো মিনিটের বেশী হইয়া গেল—তিনি আর বাহির হন না দেখিয়া উঠিলাম।

॥ ২ ॥

দিনটা কাটাইতাম নানা স্থানে, আর রাত্রে থাকিতাম চক্রতীর্থে বালির উপরে, গায়ের চাদরখানি পাতিয়া ঘুমাইতাম। ভোরে উঠিয়া আবার স্বর্গদ্বারের দিকে আসিতাম।

পরদিন সকালে না আসিয়া বৈকালে আসিলাম,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না,—তল্পি-তল্পাও কিছুই নাই। ভাবিলাম, ভৈরব কালিকাদেবী-সাহিতেই বা গিয়াছেন। ছুটিলাম সেই দিকেই। পথে উঠিয়াই একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম: এখানে যে ভৈরবটি ছিলেন তিনি কোথায় গেলেন?

যাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁকে এই স্বর্গদ্বারে অনেকবারই দেখিয়াছি, একসঙ্গে দুই-তিনদিন সমুদ্রে স্নানও করিয়াছি। এইখানে তাঁর একখানি ছোট বাড়ি আছে, এখন সপরিবারে বায়ু-পরিবর্তনে আসিয়াছেন।

তিনি বলিলেন: সেই বামাচারী ভৈরবের কথা বলছেন, যাঁর সঙ্গে দুজন ভৈরবী ছিলেন—শ্মশানের ঐ ঘরটায় আড্ডা করেছিলেন ত?—

—তাঁদের কথাই ত বলছিলাম।

তিনি বলিলেন: সে এক বড় মজাই হয়েছে। আমরা সেই ভৈরবী দুটির খিটিমিটি আজ চারদিন থেকে অনেক বারই শুনছিলাম। ছোটটি আগে ছিলেন না, বামুনের ঘরের বাল-বিধবা, মাসখানেক হোলো ভৈরব তাঁকে কোনও গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছেন। বড়টিই অনেক দিন সঙ্গে ছিলেন। ছোটটি আসাতে বড়টির সঙ্গে আর চলল না, ক্রমে দুজনে ঝগড়া-ঝাঁটি থেকে এখন অচল অবস্থায় এসেই দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যে তাঁকে বিদায়ও নিতে হয়েছে। নগদ পনেরো টাকায় বিদায়, তারপর কাল বিকালে তাঁরা সহরে পাণ্ডাদের আশ্রয়ে উঠে গিয়েছেন। কাল আমার বাড়ীর মেয়েরা স্নান করতে গিয়ে শুনে এসেছেন সেই বড়টির মুখে।

আর না দাঁড়াইয়া দ্রুত সহরের দিকে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই কালিকাদেবীসাহি, তার পর সেই ভৈরবের সন্ধান পাইতেও বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, চারিদিকেই চালাঘর যাত্রীদের জন্য,—আর ভৈরব উঠানের সতরঞ্চের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু সেবা করিতেছেন। যাইতেই তিনি অতি যত্ন-সহকারে, 'এস, বস' বলিয়া সস্নেহেই আবাহন করিলেন। আমার ত আনন্দের আর সীমা নাই। আজ ভৈরবের আর-এক রকম মূর্তি।

অল্পক্ষণ বসিবার পর তিনি আপনিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন: এখানে কোথায় আছ? কি ভাবে চালাও?

তাঁহার কথার যথাযথ উত্তর দিলাম। তার পরই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: এ রকম অবস্থায় কত দিন?

বলিলাম: আজ চার বৎসর হতে কিছু বাড়াবাড়ি, না হলে আগে বাড়ীতেই আলোচনা ছিল।

—আচ্ছা, তান্ত্রিক সাধনার উপর তোমার এতটা অনুরাগ কি থেকে হ'ল?

—কি থেকে হ'ল তা চট্ করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয়

বৈদিক উপাসনা যে লক্ষ্যে পেঁছায়, তান্ত্রিক-সাধনায় হয় ত আর একটা অন্য কিছু রহস্যময় অবস্থায় নিয়ে যায়, না জানি সে অবস্থা কতই অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময়। তা ছাড়া, পাতঞ্জলের যোগদর্শন প্রভৃতি আর্য্য বৈদিক সম্প্রদায়ের সাধনা আর তার ফল স্পষ্ট ভাষায় ক্রমান্বয়ে সব জায়গায় খুলেই লেখা আছে কিন্তু তন্ত্রের সবই গুহ্য, সেই জন্যই রহস্যময়,—বিশেষত আমার কাছে বেশী কৌতূহলের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি স্থিরভাবে একবার ঘাড় নাড়িলেন, যেন ঠিক বুঝিয়াছেন এবং উত্তরটি সন্তোষজনক,—এই ভাবটা। তার পর ডাকিলেন: ও মা, কৌটোটা দিয়ে যাও, চারটে বেজেছে বোধ হয়। তার পর নল ছাড়িয়া, একটি হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

এবারে দেখিলাম সেই কনিষ্ঠা ভৈরবী, একটি ছোট কালো টিনের কৌটা ও এক গ্লাস জল আনিলেন। তিনি কৌটা খুলিয়া, ছোট মটর পরিমাণ কালো একটি গুলি মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া সেটিকে গিলিয়া ফেলিলেন। তার পর ভৈরবী চা আনিয়া দিতে তিনি আমায় বলিলেন: চা খাবে কি?

তখন খাইতাম না, তাই বলিলাম: চা খাই না।

চা খাইবার পর তাকিয়াতে হেলান দিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন: আচ্ছা, তুমি সন্ধ্যাহ্নিক করতে কি?

—যখন উপনয়ন হয়েছিল তখন নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক প্রায় একবৎসর করেছিলাম। তার পর প্রায় তিন বৎসর করিনি। পরে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল, ভগবৎ উপাসনা আর ধর্মপথে যাবার প্রেরণা। আমার মেসোমশায়ের গুরু একবার আমায় বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মণের ছেলে ভক্তিভাবে সন্ধ্যাহ্নিক আর গায়ত্রী জপ করলে তাঁকে পাওয়া যায়। তখন থেকেই সন্ধ্যাহ্নিকের উপর জোর দিলুম।—

এই অবধি শুনিয়া তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে অন্তরালস্থিত ভৈরবীকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিলেন: ও মা, এর কথাগুলি শুনছ? মন দিয়ে শুনে যেও। তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: আচ্ছা, সন্ধ্যার কোন্ অংশে তুমি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলে, বল বাবা, কোন সঙ্কোচ ক'রো না।

—সূর্য্যোপস্থান আর গায়ত্রী জপে।

—সূর্য্যকে কি ভাবে ধারণা করতে?—গায়ত্রীর সঙ্গে, না আলাদা?

—ধ্যানে যে গায়ত্রীর বর্ণনা আছে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ঠিক্ ঠিক্ সেই রূপই চিন্তা করতুম আর তিনি যেন আমার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে উঠছেন এই রকম প্রত্যক্ষ করতুম।

—আচ্ছা, তোমার বাপ, মা, স্ত্রী, এ-সব ত আছেন?

—আছেন, ঠাকুমাও আছেন।

তিনি পুনরায় বলিলেন: তাঁরা তোমায় রোজগারের জন্য তাড়া দেননি?

উত্তরে বলিলাম: বাবা আমায় তাঁর কর্মক্ষেত্রে চাকরীতে ঢুকিয়েছিলেন,—চাকরীতে মন বসেনি, তাঁর অমতে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্য আর্ট স্কুলে গেলাম। তার পর পাঁচ বৎসরে সেখানকার কাজ শেষ করে, বেরিয়ে ঐ সব কাজই করতাম। এ অবস্থায় এখন আর ছবি আঁকাও ভাল লাগে না।

কথাগুলি শুনিয়া তিনি সস্নেহেই বলিলেন: তুমি ছবি আঁকা ছেড়ো না বাবা,—ওতে ভাল হবে তোমার। একে তোমার উঁচু সংস্কারগুলি আছে, তার উপর চিত্রবিদ্যায় অধিকার থাকাতে ভগবৎ-মূর্ত্তির ধারণা তোমার স্পষ্ট হয়, এতে ধ্যানের কাজ হয়, বুঝলে? ওটা ছেড়ো না। আবার বলিলেন: ওটা ভগবানেরই দান জানবে, কখনও ছেড়ো না।

চুপচাপ বসিয়া তাঁর কথাগুলি মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন: আচ্ছা বাবা, ধ্যানে তোমার কোনও মূর্ত্তি আসে কি?

—আসে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: স্ত্রী, না পুরুষ?—

—পুরুষ।

তিনি অনেকক্ষণ পর বলিলেন: বাবা, তোমার শৈব শরীর।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তিনি যেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন: আচ্ছা, তোমার কি ঘরদোর ছেড়ে, গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে জীবন কাটাতে ইচ্ছা যায়?

—না, তা আমার কখনও ইচ্ছা হয় না। আমি উৎকৃষ্ট গৃহস্থজীবনে সন্ন্যাসীর জ্ঞান পেতে চাই।

শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন : বেশ বাবা বেশ, খুব ভাল। তার পর একটু থামিয়া বলিলেন—আর তপস্যা ?

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম : গার্হস্থ্য জীবনেও তপস্যার অভাব নেই, এখানেও ত দেখছি পদে পদে তপস্যা।

তিনি যেন উত্তেজনা-বশেই উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন : বাবা, তুমি পাবে, ঘরে বসেই পাবে।

আমি বলিলাম : কি করে পাব বলে দিন, এখনও অনেকটাই অন্ধকার আছে, নিরাশাও কম নয়—মাঝে মাঝে বড়ই অস্থির করে তোলে। মনে সন্দেহ হয় বিপথে যাচ্ছি না তো ?

তিনি বলিলেন : ঐ রকম করেই পাবে, যেমন করে খুঁজছো, ঠিক ঐ রকম করেই খুঁজতে খুঁজতে পাবে, ঠিকই পাবে ! সন্দেহ আসবে বৈকি, প্রথম প্রথম তো আসবেই—যত এগোবে তত বেশী আসবে, শেষে সর্ব-সংশয়চ্ছেদ।

তাঁর কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ-কথামৃতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী মনে পড়িল। ঠিক যেন একসুরেই বাঁধা। প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল, শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এইভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল।

এখন মনে হইল, আসল কথাই ত চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আমি একটু অধৈর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম : কই, আমার আসল কথা সম্বন্ধে ত কিছুই বললেন না ?

উত্তরে প্রসন্নমুখেই বলিলেন : আস্তে ! বাবা আস্তে ! এত অধৈর্য কেন ? পরে বলিলেন : এখনও অনেক কিছুই বলতে হবে তোমাকে।

তাঁর এই কথা শুনিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত তাঁর প্রশ্নের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিলাম। তিনি নল হাতে মুদ্রিত নেত্রে কেবল দুলিতে দুলিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে ভৈরবী বলিলেন : আচ্ছা, বল দিকি, কালীকে তোমার কি মনে হয় ?

বলিলাম : প্রথম অবস্থায়, ছেলেমানুষ যখন, মামার বাড়ীতে কালীপুজো হ'ত, দেখতাম। সে সময় কালীমূর্তি দেখলেই একটা অবোধ্য আতঙ্কের ভাব উপস্থিত হ'ত। সেই ভাবটা অনেকদিন সংস্কারগত হয়েছিল। তার পর বড় হলে জ্ঞান হ'ল ; রামপ্রসাদের গান আর পরমহংসদেবের কথামৃতের সঙ্গে পরিচয় হলে সে ভাবটা চলে গেল, মূর্তির ভয়ঙ্কর ভাবের জায়গায় এলো মায়ের মত করুণাময়ী একটি ভাব।

ভৈরবী বলিলেন : কি রকম, খুলে বল দেখি বাবা, কোনও কথা যেন বাদ দিও না।

—ছেলেবেলায় কালীমূর্তি দেখলেই মনে হ'ত যে এই ভয়ঙ্কর দেবতা কেবল হিংসাপ্রবণ রাক্ষসী, এর চেহারায় ভাব-ভঙ্গীতে সবটাই আতঙ্কের কারণ। এর দ্বারা কখনও কারো অমঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু হয় না। অথচ জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বলত—কালী ভগবান। মনে করতাম ভয়েতেই এই ভগবানকে সকলে পূজা করে, উপাসনা করে। তার পর যখন আমার মধ্যে ধর্মের প্রেরণা এল—রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণের ভাবের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখন থেকে ঐ ভয়টি ক্রমে ক্রমে ভক্তিতে দাঁড়াল। তখন বুঝলাম, ঐ মূর্তির আসল ভাবটি রূপকের

একটা বিশাল আবরণে ঢাকা আছে। বাইরে থেকে কালীকে ধারণা করবার যো নাই।

ভৈরব বলিলেন: আচ্ছা, তুমি ত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা কিছু কিছু করেছ, সে দিক থেকে কালীকে কি রকম বুঝলে, কি ভাবে সামঞ্জস্য করে নিলে, কোনও বিরোধ হ'ল না?

—না, তাতে বিরোধের কিছুই পাইনি। কারণ,—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ—এঁদের উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রথম থেকেই ছিল। তাঁরা গানের ভিতর যে সকল তত্ত্ব রেখে গেছেন, সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে তাই গান করতাম, আর অনেক সময়ই সেগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করতাম। তাই জ্ঞানের দিক থেকেও কালীতত্ত্বের মীমাংসায় গোল বাধেনি। আরও, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে এই কালীতত্ত্বের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনেছিলাম তাতেই আমার বিষয়টি সহজ হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্ট অদৃষ্ট এই বিশ্ব, যে শক্তি সামান্যে অধিষ্ঠিত সেই বিরাট প্রকৃতিই কালী, এই ভাবেই ধারণা হয়ে গেল।

ভৈরব বলিলেন: আর শিবের সঙ্গে কালীর সম্বন্ধটা কি ভাবে মীমাংসা করলে, শব হয়ে পদতলে পড়ে আছেন কেন?

আমি বলিলাম: এক্ষেত্রে সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশেষ মিল,—পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই ক্রিয়াশীল। তাই সৃষ্টির মধ্যে তিনিই প্রধান। শিব পুরুষ, নিষ্ক্রিয় বলেই শব হয়ে পড়ে আছেন।

ভৈরব বলিলেন: তাহলে তুমি কালীকে মাতৃভাবেই দেখেছ?

—হাঁ নিশ্চয়ই।

এই কথা শুনিয়াই ভৈরব বলিলেন: তুমি ত বাবা তন্ত্রের মতে সাধন কখনও করতে পারবে না। তোমার পৃথক মার্গ।

—তাতে আমার দুঃখ নেই, তবে আপনি অনুগ্রহ করলে এ মার্গের সাধন-রহস্য ত জানতে পারব, তা হলেই হ'ল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তিনি উঠিলেন, বলিলেন: আচ্ছা বাবা, কাল তিনটে নাগাদ এস, কথা হবে—কেমন?

—আচ্ছা।—বলিয়া প্রণামপূর্বক বিদায় লইলাম।

মনের মধ্যে এই সকল তোলাপাড়া করিতে করিতে একটা কৌতূহলের জ্বর লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। কাল তিনটা কতক্ষণে বাজিবে।

আকাঙ্ক্ষার বস্তু পাইতে যতই বিলম্ব ঘটুক, সে বিলম্ব কাটে, পাওয়াও যায়। আমারও রাত্রি কাটিল, পরদিন বেলাটুকুও কাটিল। আবার অন্তরে অদম্য কৌতূহল লইয়া ঠিক তিনটার কিছু পূর্বেই উপস্থিত হইলাম।

তিনি সহাস্যে আহ্বান করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়াই মনের মধ্যে এক প্রশ্ন আসিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিল। দুর্দমনীয় কৌতূহল, যেন কতকটা অধৈর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম।

—কালীকে আপনার কি মনে হ'ত?

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন: তোমায় এখনও অনেক প্রশ্ন করবার আছে; এর মধ্যেই তুমি আমায় প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে, বাবা?

বলিলাম: কি জানি কেন আমার ধৈর্য রইল না, না হলে এত তাড়াতাড়ি এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি। আপনি ক্ষমা করবেন।

তিনি সস্নেহেই বলিলেন : আরে বাবা, এটা কি অপরাধ বলে ধরা যায় ? আচ্ছা ব'সো, তোমার যখন এতটা হয়েছে, তখন আগেই তোমার ছট্‌ফটানিটা ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাক। কেমন, তুমি জানতে চাও, কালীকে আমার কি মনে হ'ত,—এই না ? ছেলেবেলা থেকেই কালীকে আমার বৌ মনে হ'ত।

শুধু আশ্চর্য নয় স্তম্ভিত হইলাম, ঐ ভয়ংকরী মূর্তিকে বৌ ! তিনি কিন্তু মনের কথাটি বুঝিয়া ফেলিলেন, বলিলেন : তোমার ওটা অদ্ভুত লাগল ? আমার কিন্তু ছোটবেলা থেকেই নিজের পুরুষভাব প্রবল থাকার জন্যই কালীকে আমার স্ত্রী, রমণী বা ভালবাসার বস্তু মনে হ'ত।

আমি তখন বলিলাম : আশ্চর্য বটে ! আচ্ছা, এখন অনুগ্রহ করে আমায় বলুন তান্ত্রিকসাধনের ব্যাপার, আর সে সাধনের লক্ষ্যই বা কি ?

ভৈরব বলিলেন : তোমাদের বৈদিক সাধনায় যেমন অধিকারভেদ আছে, আমাদের তন্ত্রের সাধনায়ও তেমনি আছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারভেদে দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার। তন্ত্রে সাধারণ জীব বলতেই পশু, এই জন্যই শিব হলেন পশুপতি।

এইটুকু শুনিয়াই আমি বলিলাম : যদি সেই অধিকারভেদেই ব্যবস্থা, তবে তন্ত্রের দরকার কি, বৈদিক প্রণালীতে সাধন করলে ত সকলকারই কাজ হয়ে যায় ?

—তোমাদের বৈদিক প্রণালীর সাধনের মধ্যে—উত্তরে ভৈরব বলিলেন : অনার্য্য, শূদ্র, নারী এদের সাধনার স্পষ্ট অধিকার কোথায়। এদের যে দেব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকারই নাই ত পূজা করবে কি করে বল দেখি ? এই-খানেই দেখতে পাবে শিব কত উদার, কেন তিনি মহাদেব। তিনি যে সাধন-প্রণালীর প্রবর্তন করেছেন তা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির জন্য বা আর্য্যবংশাভিমানী কুলীনদের জন্য নয়,—সর্বসাধারণের জন্য।

আমি বলিলাম : তা সত্য, কিন্তু তাতে প্রবৃত্তির এতটা উৎকট প্রশ্রয় দেওয়া কেন ?

ভৈরব বলিলেন : তাহলেই ত সোজা কথাটা এল যে, সাধারণ জীবের ভোগ না হলে ত্যাগ আসবে কেমন করে। সেই জন্যই প্রথম অধিকারীর পশ্বাচার। ভোগের উৎকট আকাঙ্ক্ষা যাদের মধ্যে গজ্‌ গজ্‌ করছে, বাক্-চাতুরীতে তা থেকে তাদের কি কিছুতেই সরানো যাবে ? তাই তিনি পঞ্চ মকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—সাধনের অঙ্গরূপে উপদেশ করেছেন। যারা মোহান্ধ হয়ে নির্বিচারে ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যে ডুবে আছে তারা সাধনার অঙ্গ বলে ঐ সকল ব্যবহার করবে।

আমার কূটতর্কের উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না, সহজ বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তর্কের বিস্তারের জন্য তার মধ্যে বাঁকা প্রশ্ন তোলা আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে চুপ করিয়া থাকিলে অনেক কিছু শুনিতে এবং জানিতেও পারা যায়—এইজন্যই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন :

—আসলে, পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ। পাশমুক্ত হওয়াই তন্ত্রের সাধন এবং লক্ষ্য। এই পাশই আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে প্রকাশ হতে দিচ্ছে না, পরন্তু প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, কাম প্রভৃতি পাশ আছে, জান ত ? সেই পাশগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্য পশ্বাচারের পর সাধকেরা বীরভাবে উৎকট সাধন করেন।

যেমন মনে কর ভয়, এই ভয়কে একেবারে দূর করবার জন্য ঘোর অমাবস্যার নিশায় শবের আসনে বসে সাধনার প্রবর্তন। এভাবে সাধনার পর কি সাধকের আর জগতে কোনও বস্তুতে কোনও প্রকারের ভয় থাকে? তেমনি কাম জয় করবার জন্য সম্পূর্ণ উত্তেজিত উলঙ্গ অবস্থায় পূর্ণ যুবতীর সঙ্গে মৈথুনে রত হয়ে জপে তন্ময় হয়ে যাওয়া। ঘৃণাও তেমনি, যত ঘৃণ্য বস্তু আছে সে সকলের সঙ্গে ব্যবহারে মনের সংকোচ, শুচি-অশুচি ভাবকে দূর করা। এই রকম সকল পাশগুলিকে একে একে প্রবৃত্তির অনুকূল ক্রিয়াযোগে বিপরীতভাবে উৎকট সাধনার দ্বারা মনের রাজ্য থেকে সমূলে উৎপাটিত করে সাধক পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। তখন ঐ পঞ্চ মকারের মানে আলাদা হয়ে যায়।

আমি কৌতূহলী হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম: আলাদা মানে কি রকম, বলুন না? তখন তিনি অতি মধুরভাবে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিলেন:

মদ্য তখন আর উত্তেজক মদ নয়, শিব বলছেন পার্বতীকে:—

১। সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ॥

(মদ্য) ব্রহ্মরন্ধ্র হতে যেই সুধা ক্ষরে অনিবার,
পিয়ে মাতে সদানন্দে সেই মদ্যসাধক সার॥

—তার পর মাংস কি?:—

২। মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

(মাংস) মাশব্দে রসনা বুঝ, বাক্য তারি অংশ হয়,
সেই বাক্য রসনার অতি প্রিয় সুনিশ্চয়,
সে বাক্য ভক্ষণ করে বাক্‌সংযত যেই,
নির্বাক সেই মহাসাধু মাংসের সাধক সেই॥

—তার পর মৎস্য:—

৩। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধক॥

(মৎস্য) গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুই মৎস্য চরে অবিরাম,
ইড়া ও পিঙ্গলা সেই দুই নদী অনুপম,
রজ, তম দুই মৎস্য চলে ফিরে তাহার মাঝারে,
সেই মৎস্যদ্বয় যেই ভক্ষিবারে পারে;
সেই সে সাত্ত্বিকবীর সদা স্থির সুষুম্নাবিমানে,
মৎস্যের সাধক শ্রেষ্ঠ বলি তারে মানে যোগিগণে॥

—তার পর মুদ্রা, সেটা এই:—

৪। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্,
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্,
যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

(মুদ্রা) সহস্রার মহাপদ্মে কর্ণিকার মাঝে,
শ্বেতবর্ণ সুনির্মল চল চল পারদের সাজে,

চন্দ্রসূর্য্য হইতেও রশ্মি যার হয় জ্যোতিষ্মান্,
অতীব কোমল স্নিগ্ধ কুণ্ডলিনী মহাশক্তিমান্,
এই যে অপূর্ব আত্মা তাহারে যে হয় অবগত,
সেই সেই মহান্ প্রাজ্ঞ মুদ্রার সাধক জগতে বিদিত।

—তার পর চরম হ'ল মৈথুন। সেই মৈথুনের তত্ত্ব শিবের মুখে শোন ঃ—

৫। মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥
আকারহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥

(মৈথুন) মৈথুন পরমতত্ত্ব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ,
তাহাতে হইলে সিদ্ধি সুদুর্লভ লভে ব্রহ্মজ্ঞান,
নাদ বিন্দু করি যোগ যেই যুক্ত পুরুষ ধীমান,
শিবা শিব রমণেতে মৈথুনের করে অবসান!
আত্মা আর কুলকুণ্ডলিনীশক্তি রমণের মূল উপাদান,
এই মৈথুনে রত যেই সে মৈথুনের সাধক প্রধান ॥

—কেমন বাবা, তন্ত্রের সাধনকথা শুনলে? সহজ কথায় অল্পের মধ্যে তন্ত্রসম্বন্ধে এইটুকুই বলা যায়।

আমি বলিলাম ঃ এ অতি অপূর্ব তত্ত্ব, আসলে বৈদিক প্রণালীর সাধনালব্ধ সিদ্ধির সঙ্গে ত কোনও গোলমালই নেই।

—তা হবে কেমন করে, আসলে তোমরা সকলে যাকে ব্রহ্মজ্ঞান বল, সেই ব্রহ্মজ্ঞানই যে সকল সাধনার চরম লক্ষ্য।

আমার ধারণা ছিল তন্ত্রের লক্ষ্য অন্য, কাজেই তাঁহার ঐ কথাগুলি শুনিয়া আমার প্রাণে সাম্যভাবের এক অপূর্ব আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পর তিনি নিজেই বলিলেন ঃ সবই তো হ'ল, কিন্তু এখনও তোমার মধ্যে একটা খট্কা চুপি চুপি লেগে রইল যে বাবা!

দেখিলাম, তিনি সত্যই বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার জন্য বলিলাম ঃ কি বলুন দিকি?

তিনি বলিলেন ঃ আমরা নানাপ্রকার ভৈরবী নিয়ে ঘর করি, সেটা তোমার ব্যভিচার বলেই মনে হয়, তার উপর আবার তাকে মা বলে ডাকি, তারা আমাদের বাবা বলে, এ সব কি রকম?—কেমন, এই না?

অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম ঃ বাস্তবিকই, এটা বড়ই বীভৎস লাগে, স্বামী-স্ত্রী ভাবে ঘরকন্না করা, তাকেই আবার মাতৃ সম্বোধন।

তিনি বলিলেন, হাঁ, ওটা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের খুবই বিষম ঠেকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আপনাদের তন্ত্রমতে বুঝি কামিনী ও জননীর সম্বন্ধ একই? যদি মনে কিছু না করেন ত এ রহস্যটি জানতে বড় কৌতূহল হয়।

তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ এর রহস্য মোটেই শক্ত নয়, আমাদের পক্ষে

অতীব সহজ। কেবল যাদের পক্ষে নৈতিক হিসাবের স্ত্রী ও জননী পৃথক সংস্কার বদ্ধমূল তাদের পক্ষে এটা ধারণা করা খুবই শক্ত।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কি জননী ও কামিনী এই দুইটি সম্বন্ধ একই বলেন নাকি?

ভৈরব তৎক্ষণাৎ বলিলেন: আমি বলি মানে—এই দুইটির মূলে একই নারী নয় কি? প্রকৃতির মধ্যে কি এ দুটি ভাব পৃথক আছে নাকি?

—যদি তা না থাকে ত মানুষ সমাজের মধ্যে এল কি করে?

ভৈরব: সে ত মানুষেই করে নিয়েছে, মাতৃভাব ও কামিনীভাব পৃথক-ভাবে আস্বাদনের জন্য, আর সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা রাখবার জন্য মাতৃভাবের মধ্যে পবিত্রতা ও স্ত্রী বা রমণীভাবের মধ্যে সে পবিত্রতা নেই। এই না তোমাদের সমাজের বা ধর্মের যথার্থ ভাব?

—স্ত্রী বা কামিনী ভাবের মধ্যে একটা সম্ভোগের প্রবণতা বা উন্মাদনা পুরুষের মধ্যে উৎকট ভাবেই আছে। কাজেই সেই ভাব মাতৃভাবের সঙ্গে এক কি করে হতে পারে?

ভৈরব তখন বলিলেন: বলি বাবা, মাতৃভাবই বল আর কামিনীভাবই বল, দুই ত আরোপিত ভাব, আসলে ত সেই একই কামিনীর দুটি রূপ বা ভাব। তার পর,—গোড়াতেই ত প্রকৃতি কামিনী, সৃষ্টিতে সম্ভোগার্থেই ত তার সার্থকতা। তার পর যখন সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই সৃষ্ট জীবের অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় তার লালন পালন ও বৃদ্ধির জন্যই ত জননীভাবটি,—নয় কি?

আমি বলিলাম: তা হলে এটা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, জনক পুরুষের কাছে প্রকৃতি বা স্ত্রী মূলত সম্ভোগের বস্তু হলেও কিন্তু সেই প্রকৃতি যে জীবটি গর্ভে ধারণ করে প্রসব করলেন, শিশু অবস্থায় বলুন আর যুবা অবস্থায় বলুন, সকল অবস্থায় তার সঙ্গে জননী সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনও ভাব আসতে পারে কি? তার কাছে ত চিরকালই সেই মা। পুরাণের কথায় কার্তিকের কেন দারপরিগ্রহ করতে প্রবৃত্তি হয়নি? নারীমাত্রেই পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তির অংশ, এই তত্ত্বটিই ত তাঁর বিবাহ ব্যাপারে বিরাগের কারণ হয়েছিল?

ভৈরব বলিলেন: একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে বাবা, মানুষ-সমাজের একটা নৈতিক সংস্কারকে সনাতন সত্য সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিলে তত্ত্বের দিক থেকে সত্য উদ্ধার অসম্ভব হবে। আসলে পুরুষ মানুষের সবটাই যথার্থ পুরুষ নয়, আর কামিনীর সবটাই প্রকৃতি নয়, এই গেল প্রথম কথা। তার পর, এটাও দেখতে হবে, সমাজের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলা রাখবার জন্যই কামিনীর মধ্যে ঐ দুটি মূল ভাবের সম্বন্ধ পুরুষ জীবের জন্য ব্যবহারিকভাবে আরোপিত হয়েছে। বেশী কথা না বাড়িয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে যে সমাজ পরিবারের মধ্যে নৈতিক ব্যবহার আর প্রজাসৃষ্টির অনন্ত ধারার মধ্যে সতেজ শৃঙ্খলা রাখবার জন্যই আমাদের প্রাচীন ঋষিকল্প পুরুষেরা এই দুটি সম্বন্ধকে ধারাবাহিকভাবেই পৃথক এবং বদ্ধমূল করে গেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাবে যে এজগতে সকল সমাজেই পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিকে কামিনী-ভাবে সম্ভোগের স্পৃহাটাই এতটা প্রবল যে, এপর্যন্ত তার ধারা তিলমাত্র ক্ষীণ হয়নি—যদিও সভ্যতার গরবে এখন পৃথিবীর সকল জাতিই গর্বে একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে। ও ভাব ত্যাগ করা একটা মহা তপস্যার ব্যাপার হয়ে

দাঁড়ায়। কেবল জন্মমরণের কারবার শেষ করবার চেষ্টা যার এসেছে, মুমুক্ষুত্ব এসেছে, যে বুঝতে পেরেছে যে প্রকৃতিকে শুধু কামিনীভাবে দেখা মানে নিজে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি হওয়া,—ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করবার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপুনঃ জন্ম-জন্মান্তর সৃষ্টি করা,—সে-ই কেবল প্রকৃতির জননী-রূপটাই কষে ধরে থাকে। তাতে ধীরে ধীরে কামিনীর মোহ কাটানো সহজ হয়।

—তাহলেই ত এটা ঠিক কথা যে প্রকৃতির মধ্যে জননীভাবটা একমাত্র পবিত্র ও সত্য ভাব।

—আসলে তা নয় বাবা। মাতৃভাবই প্রকৃতির একমাত্র ভাবও নয় আর সত্যভাবও নয়। মুক্তির জন্য মানুষে ঐ ভাবটি প্রতিক্রিয়াবশেই ধরে থাকে আঁকড়ে, আসলে ওটা আংশিক ভাব মাত্র। জ্ঞানের বা জীবন-মুক্তির পর আর ও ভাব থাকে না।

—তখন আবার কি ভাব আসে?

—সেইটিই প্রকৃতির আসল ভাব, অতি গুহ্য, অনির্বচনীয়। কেবলানন্দময়ী ভাব। তার বর্ণনা নেই।

—এইজন্যই পরমহংসদেব একসময় মাঠাকরুণকে* আমি তোমার কে—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন—তুমি আমার আনন্দময়ী গো।

ভৈরব বলিলেন: তুমিই বুঝে দেখ।

আমি: প্রকৃতির আসল ভাবটি, তাহলে কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে, কোনপ্রকার সম্ভোগ কামনালেশশূন্য আনন্দময়ী, যেখানে রমণী ও জননী দুটি ভাব এক হয়ে গেছে।

ভৈরব বলিলেন: সাবাস বেটা—চৈতন্যময় পুরুষের কেবলানন্দদায়িনী। সেই আনন্দ অনুভবের বিষয়, ক্রিয়াসম্ভোগের বালাই নেই।

এই সকল কথার পর আর ভৈরবের কাছে সপ্তাহখানেক যাই নাই। তার পর একদিন গেলাম, শুনিলাম, তিনি পুরীর নিকটেই একখণ্ড স্থান সংগ্রহ করিয়া একটি আশ্রমপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন,—এখানকার অবস্থাপন্ন দুই-তিনজন ব্যক্তিকে ঐ কাজে সহায়ও পাইয়াছেন।

॥ ৩ ॥

পুরীতে প্রায় আড়াই মাস ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, দিনমানে স্বর্গদ্বার আর বৈকালের দিকে চক্রতীর্থে আসিতাম, রাত্রে মহাকালের মন্দিরের ধারে বালির উপর রাত্র কাটাইতাম। গরমের সময়, সমুদ্রতীরে বেশ কাটিত।

চক্রতীর্থে এক ঘর বন্ধু জুটিয়াছিল, তাঁহারা আজিমগঞ্জের অধিবাসী। বড়লোক, কারবারী, মাড়ওয়ারী। বৈকালের দিকে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতাম, সৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা চলিত। মুনিবজী ব্যতীত তাঁহাদের সকলেই যুবা, আমাকে সাধুর মতই দেখিতেন এবং ব্যবহার করিতেন। মোট কথা, আমার সঙ্গে তাঁহারা সাধু-সঙ্গের ফললাভের চেষ্টা করিতেন।

আর স্বর্গদ্বারেও একটি আড্ডা ছিল। কলিকাতার হাটখোলার কোনও একজন ধনী মহাজনের গৃহে। সেখানে ছিলেন কালীবাবু, বিশেষ ভদ্রব্যক্তি,

* পরমহংসদেবের বিবাহিতা পত্নী সারদাদেবীকে।

সাধু-স্বভাব। তিনি যন্ত্রসঙ্গীত চর্চা করিতেন। সরোদ বাজনাটি তাঁর বুঝি জীবনেরও অধিক প্রিয় ছিল। ওখানে আরও পাঁচজন সমজদার জুটিতেন। ধর্ম আলোচনার লোকও দুই-চারজন ছিল না এমন নয়। গানও হইত, অবশ্য ভজন গান ;—টপ্পা, ঠুংরীর কোন বালাই সেখানে ছিল না। পাঁচজনের একজন হইয়া আমারও একটা স্থান সেখানে ছিল। গান-বাজনা করিতাম, শুনিতাম, ধর্মের নানা প্রসঙ্গ আলাপও চলিত। মোটের উপর সেখানে দিন কাটিত ভাল। দুই মাসেরও অধিক কাল ঐভাবে চলিয়া বেশ একটা আত্মীয়-সমাজের মতই মমতা জমিয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবে সেখানে কয়েক মাস কেমন দিয়া চলিয়া গেল বুঝিতে দিল না। তার পর একদিন হঠাৎ বৃন্দাবনের কেশবানন্দজী ও কাশীর জ্ঞানানন্দজীর আবির্ভাব ঘটিল। আমার সঙ্গে পূর্বে কেশবানন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মিলনের ফলে আমায় পুরী ত্যাগ করিতে হয়।

কেশবানন্দজী ব্রহ্মচারী নামেই প্রথমে পরিচিত ছিলেন। আজকাল স্বামী নামে পরিচিত যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিয়াছেন, বিরজা হোমাগ্নিতে শিখা-সূত্র ত্যাগ এবং ভস্ম না করিয়াছেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী বা স্বামী নহেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমীর মধ্যেই স্থান ;—এই ত শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্তিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিয়ম। কিন্তু ভারতের আধুনিক সকল সমাজেই সনাতন নিয়মের কতই না ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। গৃহত্যাগীর বাজারেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কম হয় নাই। যাই হোক, কেশবানন্দজী আমাকে স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন।

কেশবানন্দজীর বৃন্দাবনে, হরিদ্বারে এবং অধুনা ভুবনেশ্বরেও একটি করিয়া আশ্রম আছে ; তাঁর বৃন্দাবনের আশ্রমে অনেকবারই গিয়াছি এবং অনেক-দিনই কাটাইয়াছি। সেখানে দুর্গানন্দ, নিত্যানন্দ ও কালিকানন্দজীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

বয়সের দিকে যেন কিছু বেশী দেখাইলেও জ্ঞানানন্দজী কেশবানন্দজীর শিষ্য বলিয়াই প্রকাশ। কেশবানন্দজী বড় মহারাজ ও জ্ঞানানন্দজী ছোট মহারাজ বলিয়াই কাশীর ভারতধর্ম মহামণ্ডল আশ্রমে পরিচিত, যদিও জ্ঞানা-নন্দজীই সেই প্রতিষ্ঠানের আদি মধ্য ও অন্ত সবটাই। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ ধনপতিগণের অর্থে এবং বহুতর কর্মীর সামর্থ্যেই মণ্ডলটি প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানানন্দজীর ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত একথা পরিচিত সাধারণেই জানেন।

সংসার-ত্যাগী সাধু যাঁরা তাঁদের যদি সাধারণ সংসারীর মত আচার এবং ব্যবহার দেখা যায় সেটা সাধারণের দৃষ্টি তীব্রভাবেই আকর্ষণ করে এবং জনসমাজে সে-সকলের আলোচনাটাও কম তীব্র হয় না। কাজেই কেশবানন্দ ও জ্ঞানানন্দজীর সম্বন্ধে নানা আলোচনা নানা সমাজে হইলেও আমি কেশবানন্দকে এক সময়ে, বৈরাগ্যের প্রথম পাদে তাঁহার বহুতর তপস্যার কথা শুনিয়াছিলাম বলিয়া তপস্বী, আর জ্ঞানানন্দজীকে দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম ও মানিতাম।

তার পর পথে যখন হঠাৎ একদিন সকালে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদামশাই, কবে এখানে এলেন ? শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কেই তিনি ছিলেন দাদামশাই। এটা তাঁর পূর্বাশ্রমের কথা ; অভ্যাসমত দাদামশাই

বলাতে দেখিলাম, তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাই হোক তিনি বলিলেন: আমাকে আর দাদামশাই ব'লো না, স্বামীজী বলবে। আর তুমি বিকালে চক্রতীর্থে অমুক বাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, কথা হবে। এখন তাড়াতাড়ি আছে, আমি সহরের দিকে যাচ্ছি।—তুমি কতদিন এখানে?

যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তখনকার মত চলিয়া গেলাম। বৈকালে কথামতই ঠিকানায় গিয়া উঠিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। একদিকে কেশবানন্দজী অপর দিকে জ্ঞানানন্দজীর ঘর। মধ্যে জ্ঞানানন্দের পার্শ্বের ঘরে একটি গৌরবর্ণা আধাবয়সী স্থূলাঙ্গী বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিতা নারীর স্থান। শুনিলাম, তিনি খৈরীগড়ের রাণী—গুরুদেবের সঙ্গে সমুদ্রের হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

একটি পরিষ্কার বিছানার উপর প্রকাণ্ড একখানি ব্যাঘ্রচর্ম বিস্তৃত, সেখানে কেশবানন্দজীকে পাইলাম। তিনি বলিলেন:

—এ রকম করে কতদিন চলবে, তুমি গৈরিক নাও, সাদা কাপড়ে এসব চলবে না। খাওয়া-দাওয়া চলছে কি করে?

—একবার মাত্র খাই, তা যেখানেই হোক; সামান্য চেষ্টায় যা জোটে তাতেই চালিয়ে নি।

—ওরকম করলে শরীর থাকবে না—কেশবানন্দ বলিলেন: গৈরিক নিয়ে তুমি গৃহস্থের বাড়ীতে, 'নারায়ণ, হরি' বলে দাঁড়াবে, তাইলেই ভিক্ষা পাবে। এ আশ্রমে থাকতে গেলে ভেক চাই, লাল কাপড় পরতে হবে।

—মাপ করবেন, আমার গৈরিক পরবার ইচ্ছা মোটেই নেই। এই সাদা কাপড়ে যা হয় তাই হবে। আপনি আমায় একটু নিরিবিলি থাকবার আব কাজ করবার জন্যে আপনার ভুবনেশ্বরের আশ্রমে একটু স্থান দিন, আর কিছু চাই না।

—আমার ভুবনেশ্বরের আশ্রমে এখন দোতলার ঘর তৈরী হচ্ছে। কালিকানন্দ সেখানে আছে, সব কাজ দেখছে শুনছে, আর শিবানন্দের উপর আশ্রমের ভার দেওয়া আছে। কালিকানন্দ আর সেখানে থাকতে চাইছে না, তুমি যদি তার জায়গায় কাজ করতে পার ত যেতে পার।

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি রকম কাজ?

কেশবানন্দ: কাজ এমন কিছু নয়, ল্যাটারাইট পাথরের কাজ। কত পাথর এল, আর মিস্ত্রী মজুর খাটছে তার হিসাব রাখা, মজুরী দেওয়া, ঠিক মত সব চলছে কি না লক্ষ্য রাখা—এই কাজ। সে তোমায় কালিকানন্দ সব বুঝিয়ে দেবে। দুই এক ঘণ্টার কাজ—অনেক সময় তোমার থাকবে। আর হুজুরী পাণ্ডা সেখানে আছে, সে তোমায় সব ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে।

পরে জানিয়াছিলাম হুজুরী পাণ্ডা তাঁর অনুগত একজন, তাঁর সাহায্যে তিনি সেখানে অনেক জমি-জারাত সংগ্রহ করিয়াছেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি দুটি টাকা আমায় দিয়া বলিলেন: আচ্ছা তাহলে এইখানেই স্নানযাত্রাটা দেখে চলে যেও।

—কিন্তু টাকাকড়ি আমি রাখতে পারব না, সেটা অন্য কারো উপর ভার দেবেন।

তিনি বলিলেন: তাহলে শিবানন্দের কাছে টাকাকড়ি থাকবে।

—সেই ভালো—বলিয়া আমি সে প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

অন্যান্য অনেক কথাই হইল। উঠিবার সময় শেষে আবার একবার কথা হইল যে, আমি দুই-চারি দিনের মধ্যে তাঁর ভুবনেশ্বর আশ্রমে যাইয়া থাকিব ও কালিকানন্দজীর কাজটি লইব এবং কালিকানন্দজী বৃন্দাবন আশ্রমে যাইবেন।

চক্রতীর্থে ও স্বর্গদ্বারের আড্ডায় যখন প্রকাশ হইল, আমি এখান হইতে স্নানযাত্রার পরেই চলিয়া যাইতেছি, তখন যন্ত্রী কালীবাবুর বড় ভাবান্তর হইল, তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী হইয়াছিল। করুণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন: আবার কবে দেখা হবে কে জানে, আপনাকে ত ধরে রাখবার যো নাই।

—বাঁচলে আবার দেখা হবে, আপনার বাজনা শোনবার মোহ আমি সহজে কাটাতে পারব না। নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে।

ঘরে মা, ভাই প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ থাকিতেও কালীবাবু বাড়ী যাইতেন না। সন্ন্যাসীর কোন বাহ্যিক লক্ষণ তাঁর ছিল না কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তিনি সন্ন্যাসীর মতই ছিলেন। সাদা কাপড়, পিরাণ, জুতা পরিতেন, টেরি কাটিতেন। অধিক রাত্রে গোপনে জপ ধ্যানে থাকিতেন, কেহই টের পাইত না। সাধু চরিত্র, তার মধ্যে বালকের সরলতা, তিনি চিরকুমার ছিলেন। এক সরোদ যন্ত্রটিই তাঁর কেবলমাত্র আকর্ষণের বস্তু ছিল। কালীবাবুর সঙ্গে পুরীতে এই যে আলাপ এবং প্রণয় ইহা যেন চিরকালের।

ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতায় শোভাবাজার রাজবাটীর একতলে, একটি ছোটঘরে, সঙ্গীতের আড্ডায় আবার কালীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা। দেখা হওয়ায় আনন্দে অধীর হইলেন। পুরীতে সেই আনন্দময় জীবন-যাপনের কথা হইল, সে দিন এই আলোচনাতেই কাটিল। তারপর আর বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। প্রায় ছয়-সাত বৎসব পরে আবার টালিগঞ্জে কালীবাবুর সঙ্গে দেখা। স্বর্গীয় রাণী রাসমণির জামাতা *মথুরবাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত

শিবনাথবাবুর বাড়ীতে। টালিগঞ্জের সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ কম ছিল না, শিববাবু আমাদের প্রতিবেশী। দেখিলাম, তাঁহারই বাড়ীতে বাহিরের চালা-ঘরে কালীবাবু যন্ত্রপাতি লইয়া অবস্থান করিতেছেন। কিছু দিন মধ্যে মধ্যে তাঁহার যন্ত্রালাপ শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিল। কিন্তু সে বেশী দিন নহে,—একদিন শুনিলাম, কালীবাবু জ্বরাতিসারে ভুগিতেছেন—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাইবার, তাঁহাদের দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাঁদের কাছেই গিয়া আছেন। তার এক সপ্তাহ পরে শুনিলাম, মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর ভব-যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। মমতা তাঁহার কাহারও উপর ছিল না ; সুরের সাধনা করিয়া তিনি সুরলোকেই গিয়াছেন। তাঁর বিয়োগে প্রাণে মর্মান্তিক বেদনা পাইলাম। অনেক সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত প্রচ্ছন্ন সাধু দেখি নাই।

পুরীতে আরও দুইটি সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-রূপ।—একজন গৌরবর্ণ বৃদ্ধ উড়িয্যাবাসী, মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। গৃহী ; তাঁর বড় বড় ছেলে, মেয়ে, বৌ, দাসদাসী—বিশাল সংসার ; স্ত্রী নাই। আলাদা এক স্থানে থাকেন, বাড়ীর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি তান্ত্রিক, আবার বৈষ্ণব। গলায় রুদ্রাক্ষ, আবার তুলসীর মালাও আছে। গায়ে ওঁকারের ছাপ। কথায়-বার্তায় যেন সর্বধর্ম-সমন্বয়েরই ভাব। তীর্থ করিতে বাকী নাই। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতাও আছে। তাঁর কাছে আমি দুই দিন গিয়াছিলাম।

ইঁনি জপের পক্ষপাতী, বলেন : জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ। বিনা জপে কখনই ইষ্টলাভ হয় না। কালী বল, কৃষ্ণই বল, যাই বল না কেন, ইষ্ট-সাধনায় সিদ্ধি পেতে গেলে জপ ব্যতীত আর অন্য পথ নাই। জপের দ্বারাই মূর্তি সাক্ষাৎকার হয়। যিনি মূর্তি পান, তিনি মহাভাগ্যবান!

বুঝিলাম ইঁনি মূর্তিই চরম বলিয়া ধরিয়াছেন আর জপের দ্বারাই পাইয়াছেন।

আর এক ব্যক্তি, পাগলের মত অনেকটা নিঃসঙ্কোচ। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানোই কাজ। হঠাৎ একজন লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে সাহস হইবে না। তৈলঙ্গীবাবা বলিয়া অনেকে তাঁকে বলেন। তিনি বলেন, যত মঠাশ্রয়ী সাধু আছেন সকলেই ভণ্ড, চোর ; ধর্মের নামে একটা ধুমধাম করিয়া পাঁচজনকে আকৃষ্ট করিবার ফন্দি। বিষয়-বুদ্ধি আর ভোগই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমাকে কোনও মঠাশ্রয়ী সাধুর সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলেন : ভগবানকে মানুষ কখনই চায় না। চায় কেবল শক্তি—ভোগের বস্তু সংগ্রহ, বিষয় আকর্ষণ করিবার শক্তি এবং লোকের উপর নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি। যে বলে আমি ভগবানকে চাই তার ভিতরের কথাই এই। তিনি কেশবানন্দজীকে জানেন, তাঁহার বৃন্দাবনের আশ্রমে অনেকবারই অতিথি হইয়াছিলেন।

তাঁর সঙ্গে অনেকদিন বেড়াইয়াছিলাম। পরনে একখানি কৌপীন, তার উপর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া এক ছেঁড়া কম্বল। তিনি বলিলেন : ঘুরিয়া ফিরিয়া যত বেড়ান যায় ততই ভাল। দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিলে চিত্ত নির্মল থাকে। এক জায়গায় বসিয়া গেলেই বিপদ। যত ভোগ, রোগ, আলস্য, আরামের

ইচ্ছা, নানা কর্মে প্রবৃত্তি, নানা মতলব ও দুশ্চিন্তা আশ্রয় করিবেই করিবে। সাধু ব্যক্তির ইহা অপেক্ষা অশান্তির কারণ আর কিছু নাই।

বুঝিলাম, এটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন যে, নানা শাস্ত্র অধ্যয়নে কেবল বৃথা সময় নষ্ট। যারা আলস্যপরায়ণ তারাই বসিয়া বসিয়া অতিরিক্ত অধ্যয়নের পক্ষপাতী। কেবল বইয়ে-মুখে থাকে যে-সকল মানুষ, বুঝিতে হইবে তাহাদের কর্মশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সাধুর কর্মই অবলম্বন হওয়া উচিত—অধ্যয়নের আড়ালে কর্মকে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি মোটেই ভাল নয়। পরে ঘোর বিপাক আসিবে।

দেখিলাম, তিনি কর্মেরই বেশী পক্ষপাতী, বলেন ঃ ভগবৎ উপাসনার চেয়ে উদ্যম এবং পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হলে উপাসনার বেশী কাজ হয়। এই যে অলস সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দেখছ, কর্মের নামটি নাই, কেবল ভুঁড়ি বাড়াবার ফন্দিই চলছে, এরা ভাগ্যবান মনে ক'রো না। এদের দুর্ভাগ্য অসাধারণ। মানব-সাধারণের অশ্রদ্ধাই তাদের প্রাপ্য। কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর চেহারায় ওরা কাপুরুষ, চোর। শাস্ত্রের কতকগুলি বাঁধা গৎ মুখস্ত ক'রে গৃহী লোকদের ঠকানোই ওদের প্রধান কাজ। কানে মন্ত্র দেওয়া আর-একটা ঠকাবার ব্যাপার। অনেকেই তার মধ্যে গিয়ে পড়ে, শেষে গুরুশিষ্যে মারামারি। এদের অদৃষ্টে শেষকালে মার ঠেঙানি এই সবই আছে। সমাজের আপদ এগুলি জানবে।

এঁর সঙ্গে আবার বৃন্দাবনে একবার দেখা হইয়াছিল, পরে সে কথা বলিব।

এখন এখানে স্নানযাত্রা দেখিব কি,—লোকের ভীড়ে শ্রীক্ষেত্র যথার্থই একটি ভীষণ কোলাহলময় অশান্তিকর স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইসব দেখিয়া প্রাণ অশান্ত হইয়া উঠিল। সকলের কাছে বিদায় লইয়া সেই রাত্রেই ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলাম, সঙ্গে একখানি কম্বল, একখানি গানের খাতা, খানকতক বই ও একটি পেন্সিল।

কালিকানন্দজী ত মহা খুসী। ইতিমধ্যে বড় মহারাজ তাঁহাকে আমার যাইবার কথা লিখিয়া থাকিবেন, তিনি যেন প্রতীক্ষায়ই ছিলেন বোধ হইল। এখান হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আনন্দে আমাকে তাঁর কাজগুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিয়া গেলেন। আমিও যথাসাধ্য বুঝিয়া লইতে লাগিলাম। টাকাকড়ি সবই শিবানন্দের কাছে থাকিবে, আমি কেবল হিসাব রাখিব। শিবানন্দ বাজার করিবে, পাক করিবে, ঘর সংসারের সকল ভারই তাহার উপর।

খাওয়ার কথাটা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। আনাজের মধ্যে তখন কচুই মিলিত, তাহারই ঝোল আর বোলতার টিপের মত মোটা লাল চালের ভাত। দুইবেলাই এই খাদ্য, ব্যস্।

তখন আষাঢ় শ্রাবণ, বর্ষার সময়। ভুবনেশ্বরে প্রায় দেড়মাস ছিলাম, তাহার মধ্যে কোনও দিন সূর্যদেবের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কাজেই কোন্ দিকটা পূর্ব, কোন্ দিকটা পশ্চিম তাহা বুঝিতে পারিতাম না। ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে অনেকটা যাইতে হয় এবং গ্রামের শেষের দিকেই গৌরীকুণ্ড। এই প্রসিদ্ধ গৌরীকুণ্ডের অতি নিকটেই আমাদের কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। আশ্রমের একতলায় তখন দুইখানি পাকা পাথরের ঘর ছিল আর দুইখানি টিনের চালওয়ালা ঘর। আমরা সেই ঘরেই বাস করিতাম। পাকা ঘরগুলিতে মহারাজের আসবাব সকল ছিল, আরাম-চেয়ার, খাট, পালঙ্ক,

বিছানা-পত্রে ঘরগুলি পূর্ণ। এখন দ্বিতলের সিঁড়ি শেষ হইয়া ঘর আরম্ভ হইয়াছে দোতলায়।

প্রথম প্রথম ভুবনেশ্বরের আবহাওয়ার মধ্যে যাইয়া একটা অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণ পূর্ণ ছিল। গৌরীকুণ্ডে স্নান ও মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণের নির্জনতা যে আনন্দ, বিস্ময় ও উদাসভাব ঘনীভূত করিয়া দিল তাহা যথার্থই কখনও ভুলিবার নয়। ভাষায় তাহার বর্ণনা নাই, তাই সে দিকে চেষ্টা না করিয়া অন্য কথা বলি।

ইচ্ছা হইত দিবারাত্র এইখানেই কাটাই। একটি প্রস্তর-বেদি, কুণ্ডের একদিকে ঘাটের ধারে, তার চারিদিকেই সুসমতল ভূমির উপর গাঢ় হরিৎবর্ণের
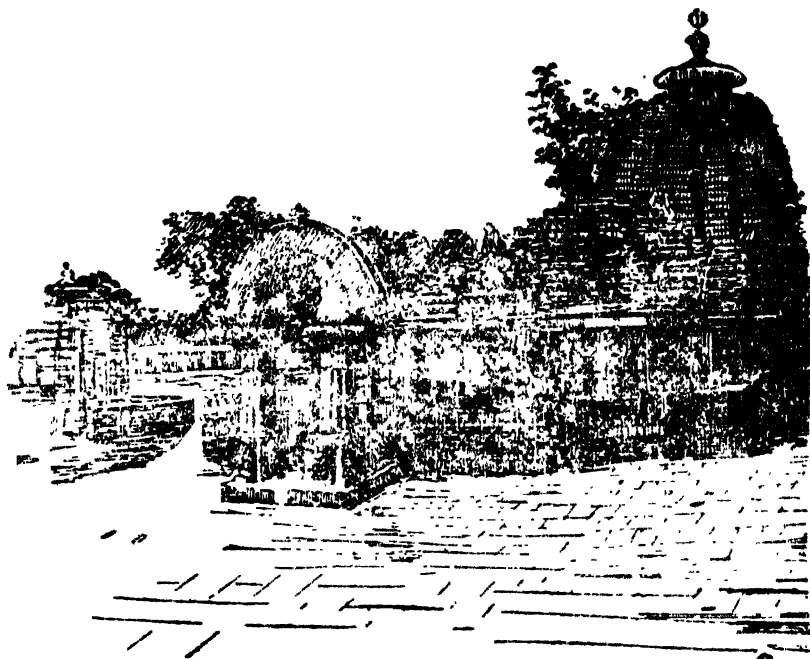
ঘন তৃণ আচ্ছাদন,—যেন সবুজ ঘাসের বিছানা, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সেই কুণ্ডের পাশেই মুক্তেশ্বরের মন্দির। মন্দিরটি খুব ছোট নয়, খুব বড়ও নয়। কিন্তু তাহার প্রস্তর-ভিত্তির কারুকার্য ভুবনবিদিত। নানা দেশবাসী শিল্পপ্রিয় অনুসন্ধিৎসু মানবের আকর্ষণের বস্তু। সেই মন্দিরের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ কারুকার্যের তুলনা নাই।

মন্দিরের একটি দ্বার একদিকে, অপর তিনদিক বন্ধ। ভিতরে কিন্তু চামচিকারই রাজ্য। ভিতরের দিকের ছাদের মধ্যে যে সুন্দর অপূর্ব কারু-বিগ্রহ সকল, আলঙ্কারিক শিল্পসৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া একসময়ে সাধারণের মনোহরণ করিত, তৈলদীপের ভূষায় সে সকল কৃষ্ণবর্ণ এবং বিকৃত হইয়া আছে। কখনও পরিষ্কার হয় না।

যাহা হউক দিনমানে মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণেই ছিল আমার আসন। নিকটেই আর একটি ছোট মন্দির আছে,—কোণের দিকে, মুক্তেশ্বর কুণ্ডের যে ঘাট তাহার উপরেই। সেই মন্দির অভ্যন্তরে কখনও কখনও সকাল সন্ধ্যায় বসিতাম। কত সৌভাগ্যফলেই ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে আসিবার যোগাযোগ ঘটিয়াছে ইহা ভাবিয়া মনে মনে অন্তর্যামীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং প্রাণকে শান্ত করিতাম।

এই যে সৌভাগ্যের কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে বিপর্যয় কিছু ছিল ; মধ্যে মধ্যে তাহা যথেষ্ট মনোকষ্টের কারণ হইত।

শিবানন্দই ছিল আশ্রমের প্রধান, তাহার গুরু অথবা প্রভুভক্তি অসাধারণ। গুরুদেব তাহার উপর যে আশ্রমের সকল ভারই দিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাহার দায়িত্ব-বোধ অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। সেই মাত্রা সময়ে সময়ে আমার পক্ষে কষ্টকর প্রতিক্রিয়া ফল প্রসব করিত। শিবানন্দকে দেখিতে বেশ—গৌরবর্ণ, ক্ষীণকায় যুবা, মাথায় জটা-মুকুট, একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির, কিন্তু একেবারেই স্নেহহীন ছিল না।

প্রথম প্রথম আমি যখন সকালে কাজকর্ম সারিয়া মুক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইয়া বসিতাম সে কিছু আপত্তি করে নাই। তারপর যখন দেখিল আমি নিত্য নিত্যই উহা করিতেছি এবং ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতেও বিলম্ব করিতেছি, তখন সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—কলিকানন্দজী তো কভি এয়সা নহি করতে থে, অর্থাৎ কালিকানন্দজী কখনও আশ্রম হইতে বাহিরে গিয়া এত বেলা অবধি কোথাও থাকিতেন না।

আমি বলিলাম ঃ সকালে আশ্রমের মধ্যে সর্বক্ষণ থাকা আমার ভাল লাগে না, যদি নিকটেই মুক্তেশ্বরের প্রাঙ্গণে গিয়া বসি তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সে বলিল ঃ ক্ষতি নাই বটে, তবে আশ্রমের মধ্যে থাকিলে মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখা হইত। সগড়ওয়ালা আসিলে পাথর কত আসিল তাহার হিসাব রাখা হইত। হাতের কাজ ফেলিয়া আমাকে ডাকিতে ছুটিতে হইত না, ইত্যাদি। অবশ্য সত্য বলিতে কি, রান্না ছাড়া তার হাতে অন্য কাজ থাকিত না।

পরাশ্রয়ের এই ত দোষ! যাহা হউক আমি বলিলাম ঃ আচ্ছা। আমি সকাল সকাল আসিব। মনে কিন্তু একটা অশান্তির ছায়া আসিয়া লাগিল।

সকালে তাহার স্নান পূজাদি সমাপন হইলেই সে প্রায় আটটা নাগাৎ রান্না চড়াইত, ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাৎ শেষ হইত। এক কচুর ঝোল আর ভাত—কতক্ষণ লাগে? রান্না শেষ হইলেই আমাকে খাওয়াইয়া সে নিজেও খাওয়াটা সারিতে চাহিত। বোধ হয় তাহার ক্ষুধা পাইত।

আমারও যে ক্ষুধা পাইত না এমন নয়, কিন্তু যেখানে মাত্র দুইবার ভাত খাওয়ার বন্দোবস্ত সেখানে অত সকাল সকাল যদি খাই তাহা হইলে দুইটা-তিনটা নাগাৎ আবার ক্ষুধা পায়। কিন্তু সন্ধ্যা বা রাত্রি না হইলে ত আর দ্বিতীয়বার খাবার বা ভাত মিলিবে না। সেই কারণেই আমি সকালের দিকে একটু বিলম্বে খাইতে চাহিতাম,—সে সেটা পছন্দ করিত না। ভুবনেশ্বরে আসিয়া দিনকতক, প্রায় একপক্ষ কাল, ক্ষুধার তাড়না কিছু বেশী অনুভব করিতাম। বোধ হয় জলবায়ুরই গুণ। বৈকালে খাইবার কিছুই বন্দোবস্ত নাই। বা এ আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। সংযম-অভ্যাস, বিশেষত আহারের ব্যাপারে তখন কষ্টকর মনে হইত।

আরও একটু অ-সুখের কারণ ছিল। শিবানন্দ রাঁধুনী ভাল। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায়, ভোজন শেষে আসন হইতে উঠিবার সময়, কেমন রান্না হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিত, তখন নয়নের সজল অবস্থায়ই 'বহুত আচ্ছা হুয়া' বলিতে হইত। একমাত্র উপকরণ, তাহাতে নিরামিষ, ঘৃতবর্জিত, তৈলপক্ক বলিয়া বোধ হয় শিবানন্দ অতিরিক্ত লঙ্কার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—যাহা আমার পক্ষে শেষের দিকে পীড়ার এবং স্থানত্যাগেরও কারণ হইয়াছিল। আমার জন্য ত আর পৃথক বন্দোবস্ত হইতে পারে না!

॥ ৪ ॥

একটি প্রৌঢ় বয়সের সাধুমূর্তি একদিন সকালে কেশবানন্দের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ভুবনেশ্বরেই থাকেন, বিন্দু সরোবরের তীরে একখানি ঘরে। পূর্ববঙ্গের লোক, তামাটে রং, কাঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ, লম্বা ক্ষীণ শরীর, নামটি তাঁর যাহাই হোক, নাগ মহাশয় নামে পরিচিত।

আমার সঙ্গে পরিচয় হইবার পর তিনি একদিন তাঁর আশ্রমে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি সানন্দেই স্বীকার করিলাম। তিনি আমায় দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন,—যদিও তিনি আমার পিতার বয়সী।

বোধ হয় আমাকে জাতিতে ব্রাহ্মণ জানিয়াই ঐরূপ সম্বোধন করিতেন। অতীব বিনয়ী স্বভাব তাঁর, কিন্তু কথাবার্তা তেজোপূর্ণ।

পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ, বারদিয়ার ব্রহ্মচারী লোকনাথের কথা অনেকেই জানেন। তাঁর অনেক শিষ্য। পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই শুনিয়াছিলাম। নাগ মহাশয় তাঁরই শিষ্য একথা ঘনিষ্ঠ পরিচয়প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম। লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিবার জন্য তাঁহার কাছে বেশী বেশী যাতায়াত করিতাম। তিনি আগ্রহের সহিত আমাকে তাঁহার জানিত সকল কথাই শুনাইতেন। কথায় তাঁর বেশ পূর্ববঙ্গের টান ছিল।

সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া নাগ মহাশয়কে ঠিক বুঝিবার যো ছিল না; ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর তাঁহাকে কতকটা জানিতে পারিলাম। আসলে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁহার উদ্দেশ্য, জপ, তপ, যোগ, ধ্যান ইত্যাদি সাধারণত সাধু সন্ন্যাসীদের এ সকল অভ্যাসের অনুরূপ নয়, একদিন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা-প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলিলেন তাহাতেই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ও ধর্ম প্রকাশ পাইল এবং আমায় বিস্মিত করিয়া দিল।

কথাবার্তায় তিনি সকল সময়েই উৎসাহে পূর্ণ। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন: দেখুন, ভগবানের জন্য জপ, তপ, ধ্যান-ধারণা আর এখন আমার ধর্ম নয়; আমার ধর্ম এক বিঘা জমিতে কিসে পনেরো থেকে বিশ মণ ধান উৎপন্ন হয়, ভগবানকে পাওয়ার কোন চিন্তাই নাই। তাঁহাকে পাইব ও আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যাইব, অমৃতত্ব লাভ করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে মত্ত হইয়া সংসারের সুখ দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাইব, এ আমার এখন আর প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে জমির উর্বরাশক্তি কিসে বৃদ্ধি হয়, আর পতিত জমির উপর কিসে ফসল উৎপন্ন করা যায়, আর কি উপায়ে দেশের সকল জমিতেই উৎকৃষ্ট চাষ-আবাদের ফলে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য ঘোচে সেইটাই আমার একমাত্র সমস্যা এবং তাহা হইলেই আমার ভগবান পাওয়া হইল!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি দেশ ছেড়ে এ রাজ্যে কেন? দেশের মধ্যেই কি আপনার এ সকল পরীক্ষা করবার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র পেতেন না?

তিনি বলিলেন: এই উড়িষ্যা রাজ্যে এত পতিত জমি আছে দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। তাছাড়া আমাদের বাঙ্গলায় যাহোক দু'চার জন কর্মীও এক্ষেত্রে আছে, কিন্তু উড়িষ্যাপ্রদেশে এখন কেউ নাই। এই উড়িষ্যা-শ্রমজীবীদের উদ্যমহীনতাই এখানে আমাকে কর্মক্ষেত্র গড়তে আকৃষ্ট করেছে। এরা এত অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে যে, কোন রকমে এক সন্ধ্যা খাবার মত কিছু যোগাড় হ'লেই আর পরিশ্রমের দিকে যাবে না। একটা পান ও একটু গুণ্ডিতেই এদের সন্তোষ। অথচ এরা বাঙ্গলার তুলনায় বেশী নিরক্ষর নয়। কিন্তু আলস্যে বাঙ্গলার উপর যায়।

এ দিক থেকে কিছু সাড়া পেয়েছেন কি না—জিজ্ঞাসা করিলাম। নাগ মহাশয় প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন: হাঁ, এখানে উদয়গিরির পথে একখণ্ড জমি পেয়েছি আর আটজন গ্রাম্য লোক পেয়েছি; কাজও গত বৎসর হতে সুরু করেছি, দেখা যাক। এখানে ব্যাপার কি জানেন, এরা জমি পরীক্ষা করে না,—আর জমিতে কখনও সার দেয় না। বড় জোর, কেউ কখনো কখনো একটু গোবরের সার দিলে। এরা এটুকু বোঝে না, জমির উর্বরাশক্তি ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কোন্ জমিতে মাটি কি রকম, তাতে কতটা কি আছে তা বুঝে চাষ

করা—এ সব জানা এখন প্রয়োজন। আমি অনেক ভাল ভাল চাষীর সঙ্গে আলাপ করেছি, দেখলাম জমির উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে, একথা আজ কেউ কেউ বোঝে বটে, কিন্তু কিসে উর্বরাশক্তি বাড়ে সেটার দিকে কারো লক্ষ্য নেই। এখন এদের সঙ্গে কাজ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষার দ্বারা দেখাতে হবে যে, কিছু কিছু রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করলে জমিকে খুব ফলানো যেতে পারে আর তা অল্প ব্যয়েই পাওয়া যায়।

—এতে ত আপনার অর্থেরও প্রয়োজন, সেটা কি ভাবে যোগাড় হয় ?

—ভিক্ষা করি, আবার দুই-একজন এদেশের মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক কিছু কিছু সাহায্য করেন, দেখেছি এদের বরং দয়া দাক্ষিণ্য, বিবেচনা আছে কিন্তু বড় লোকের সে সকল কিছুই নেই। আমি প্রথমেই একজন জমিদার, রাজা উপাধি, তাঁর কাছে আমার প্ল্যান নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিন দিন ঘুরিয়ে একদিন দর্শনের সুযোগ দিলেন। সকল ব্যাপার তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে হিসাব করে দেখিয়ে দিলাম। শেষে কিছু জমি ও প্রয়োজনীয় রসায়নাদি (কেমিক্যাল) খরিদ আর চাষের ব্যবস্থার সঙ্গে দশজন শ্রমজীবী প্রার্থনা করলাম। বিবেচনা করে দেখব বললেন। একপক্ষ কাল হাঁটাহাঁটির পর ম্যানেজারবাবুর মুখে বলে পাঠালেন যে, ওসব সাধু-সন্ন্যাসীর কর্ম নয়, তার চেয়ে আপনি জপ তপ করুন গে।

আমাদের দেশে বড়লোকেরা প্রায়ই অ-চৈতন্য, বিশেষত গরীবের সম্পর্কে।

আমি বলিলাম: আপনি, অ-চৈতন্য কথাটি বললেন কেন—বিমুখ, বললেই কি ঠিক হ'ত না ?

নাগ: না—গরীবের শরীরের রক্ত জল করে যে অর্থ উৎপন্ন হচ্চে তাই শোষণ করেই তাঁরা অর্থবান, বড়লোক বা জমিদার হয়ে ভোগ-বিলাসের উচ্চস্তরে বসে আছেন, এই যে মর্মান্তিক সত্য, এ সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই অচেতন, তাই অ-চৈতন্য বলছি।

তাঁর অন্তঃকরণে গরীব দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়া অন্তরের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম। এ ধরণের সাধু ত দেখি নাই! জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনার এখানে চলে কেমন করে ?

নাগ: এই যে দেখুন না, একটি ছোট কাঠের উনান আছে, তাইতে একবার দুটো চাল ডাল ফুটিয়ে নি, এক পাকে যা হয়। একটু ঘি যোগাড় করা থাকে, তাই দিয়ে সুরু করি, আর শেষে একটু দই কিম্বা দুধ। এই যে সব লোক দেখছেন, সবাই শ্রমজীবী এবং আমার অনেক কাজই করে দেয়। আমি কাউকে দিনে ঘুমুতে দিই না।

—এখানে ত দেখেছি আমাদের বাঙ্গলা দেশের মত ভাত খেয়েই সকলে শোয়,—না শুয়ে থাকতে পারে না।

নাগ: দিনের বেলায় এদের মধ্যে ঘুম তাড়াবার চেষ্টায় আছি। আমি এদের বোঝাতে চেষ্টা করি, বেশি পরিশ্রম করলেই বেশি পয়সা। কাজই আসল—আর তাই থেকে পয়সা। যদি তারা দিনে না ঘুমিয়ে বা অত্যন্ত অল্প সময় ঘুমিয়ে তারপর পরিশ্রমের কাজে লাগে ত তারা কখনো দরিদ্র থাকবে না।

আমি: শুধু জমির কাজেই ত সকল সময় কাটে না,—

নাগ: হাঁ তা, ত বটেই। ক্ষেতের কাজ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের

মধ্যে ব্যবহার উপযোগী যা-কিছু সেই দিকে মন দিতে হবে। কেউ কেউ লোহার কাজ করে থাকে—যেমন, কাস্তে, নিড়ান, পেরেক, কোদাল, কুড়ুল; আবার কাঠের জিনিষও তৈরী করে। আবার কেউ কেউ তুলার কাজও করে থাকে। চরকা চালানো এদের মধ্যে এখনো খুব চলন আছে, সে দিকেও কাজ চলছে।

আমি তাদের একটু বুঝাতে চেষ্টা করি যে, চাষ করা ছাড়া অন্যান্য অনেক কিছুই অবসর সময়ে করা দরকার, যা না হ'লে দারিদ্র্য ঘুচবে না। কেবল ধান-চালের ব্যবস্থা করলে চলবে না। তবে, সেদিকে আমি বিশেষ কিছুই সাহায্য করতে পারি না। দরকারী যা হোক একটা কিছু করতেই হবে, ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের বাঙ্গলা দেশের মধ্যে যে একটু সাড়া পড়েছে আমি সেইটাই এখানে চালাতে চাই,—তবে তার মধ্যে রাজনৈতিক কিছুই থাকবে না। দেখছি এরা যথার্থই ভালবাসে, তাই ঠিক করেছি যতদিন এরা আমায় চাইবে, ততদিন এখানে এদের কাছেই থাকব।

আমি: আপনার চাষ-আবাদের উৎকর্ষের জন্য এই যে উদ্যম বা প্রচেষ্টা—কালে জয়যুক্ত হবেই এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। কারণ যেটা যে সময়ে উপযোগী ভগবান উপযুক্ত লোকের দ্বারা মানব সমাজের মধ্যে সেইগুলির প্রবর্তন করেন, তাইতেই লোকে জীবনযাত্রায় বেঁচে যায়।

নাগ: যারা নেয় তারাই বাঁচে, যারা অলস তারা আলস্য ভোগ করতে করতে মরতেই ভালবাসে, তাও দেখছি।

আর একদিন নাগ মহাশয় আমায় তাঁর ক্ষেত্র দেখাইতে লইয়া গেলেন,—সেটা ভুবনেশ্বর গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশের কিছু বেশী হইবে। দরিদ্র পল্লীর মধ্য দিয়াই পথ। আমরা কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, এই যে উড়িষ্যায় এত দুর্ভিক্ষ হয়, এত লোক না খেতে পেয়ে মরে, দয়ালু ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় কি রকমে, তিনি দয়াবান, না নিষ্ঠুর, কি মনে হয় আপনার? অবশ্য আমি সাধারণ ভাবে বিচারের দিক থেকেই বলচি।

নাগ: দয়াবান যদি তিনি, তাহ'লে নিষ্ঠুরতাটা কার, কোথা থেকেই বা এল? এক জাহাজ সেপাই বা যাত্রী সমুদ্রের মাঝে ঝড় তুফানে ডুবল, খবর এল আড়াই হাজার লোক মারা গেছে, এটাও যা, ওটাও তা।

—জাহাজ ডুবে মারা যাওয়া, ওটা ত দৈব বা আকস্মিক ঘটনা, ওটাতে কারো হাত নেই; কিন্তু আমাদের দেশে বাঙ্গলায় বা উড়িষ্যায় যারা মরে দুর্ভিক্ষে, দারিদ্র্যে, না খেতে পেয়ে, রোগ ভোগ করে, এ যে বড় ভয়ানক, এ কোন্ পাপের দণ্ড?

—প্রয়োজনের অতিরিক্ত জন্মালেই নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী—এ ত জানা কথা, যেখানে ভোগে সংযম নেই, কেবল উপভোগই চলছে—সেখানে এই রকমই জন্মে থাকে,—আর যেখানে এই রকম উচ্ছৃংখল জন্মানোর হার—মরণও সেই রকম দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এ ত সাধারণ নিয়ম।

—বাঙ্গলা দেশে, জানেন তো প্রতি বৎসর কত লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কত মারা যায়?

—সে অনেকটা স্বকৃত। হয়েছে কি জানেন, ভুগতে ভুগতে অভ্যাস হয়ে

গিয়েছে। ভুগবে সেও ভাল, তবু প্রতিবিধানের জন্য শক্তি ব্যয় করবে না। এই দুঃখই সকলকার চেয়ে বড় দুঃখ নয় কি?

—শক্তি থাকলে ত ব্যয় করবে?

—দাদা শক্তিটা কি এতগুলো লোকের রোগে ভুগতে আর কেবল কুইনিন খেতেই চলে গেল? যার অধিকারে যেটুকু জমি আছে একটু একটু করে যদি সকলে মিলে সাফ করতে সুরু করে, তাহ'লে শরীরটাও ভাল থাকে, দেশের শ্রীও ফিরে যায়, রোগও সরে পড়ে যে। এটা কি অসম্ভব বলেন?

—জঙ্গল ত কম নয়, কত দিন ধরে জমচে,—

—কি যে বলেন দাদা! প্রতি গ্রামে বেকার ছেলে কত আছে—ঘরের ভাত খেয়ে, ইয়ারকি দিয়ে, যাত্রা, থিয়েটার, কনসার্টের আখড়ায় আড্ডা মেরে, তাসে, পাশায়, ঘুমিয়ে, নানা অকর্মে দিন কাটাচ্চে তার খবর রাখেন কি? বিনাশ্রমে অন্ন জুটচে, কাজেই পরিশ্রমের গৌরবে চিরকালই বঞ্চিত হয়ে, ম্যালেরিয়ার শিকার হয়ে তিলে তিলে মরছে। আলস্য, আরামপ্রিয়তা এসকল পুরুষানুক্রমিক মজ্জাগত দুর্বলতারই নামান্তর।

—মাসিকেতে স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ দেখেছেন, কত লোক অর্ধাশনে, কত লোক না খেতে পেয়ে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রতি বৎসর মারা যাচ্ছে।

নাগ মহাশয়ের অমন শান্ত মুখমণ্ডল অশান্ত ভাব ধারণ করিল, ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন: দাদা, আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকার খবরের কথা বলবেন না। দেশ বিদেশের নানা খবর, শিল্প-সাহিত্য-কাব্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নানা সমাজের ধর্ম ও কর্মের খবর তাঁরা খুব দিতে পারেন আর মুখরোচক গল্প-সাহিত্য যোগাতে পারেন, কিন্তু এই যে পল্লীগ্রামের সর্বনাশ করে সহরের পুষ্টি হচ্চে তার কোনও মীমাংসার কথা কোথাও পাবেন কি? বৈজ্ঞানিক ভাবে ভোগ-বিলাসের ইন্ধন প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন থেকে শেষ পাতা অবধি। কেবল অর্থকরী পাশ্চাত্যের কৃত্রিম জীবনের অনুকরণে সমস্তই পাবেন; আর এ সকলের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় জীবনে এখন ঐকান্তিক একথাও পাবেন, কেবল পাবেন না দেশের বাস্তব জীবনের সরল পথের খবর। নিজেদের গ্রাম্য জীবনকে শক্তিশালী করবার দৃঢ় লক্ষ্য বা তার স্পষ্ট নির্দেশ কোথাও পাবেন কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম: আপনি হয়ত এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, এখন রাষ্ট্র-নৈতিক সমস্যা দেশবাসীর মনে ক্রমশ এতটা বলবৎ হয়ে উঠেছে যে, আমাদের পল্লীজীবনের ভিত্তি যে সত্য সত্যই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কারণ এটা বোধের মধ্যে আসবার অবকাশ দিচ্চে না। রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপেই পল্লী-সংস্কারের সকল আন্দোলনই এতটা ক্ষীণ করে ফেলেছে, এটা এখনকার দিনে খুবই স্পষ্ট। তবে এদিকের কাজের মানুষও খুব কম—কেবল দুই-একজনের কথাই আমাদের মর্মে পেঁ‍ৗছায়।

—আমার আক্ষেপ এইটুকু যে, আমাদের দেশে এখনো অনুকরণের হাওয়াই চলছে,—সকল বিভাগেই—ভাল মন্দ সকল দিকেই,—আর অত্যন্ত প্রবল ভাবেই চলেছে। সাহিত্য-শিল্পে, মায় চুরি-ডাকাতিতে পর্যন্ত!

—অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় যেখানে আমাদের দুঃখের ও দুঃখমোচনের পন্থার মিল দেখতে পাই, আমাদের কর্ম স্বভাবত সেই ভাবেই চলে। সেটা অনুকরণের মত দেখালেও আমাদের তা ছাড়া আর উপায় বা গতি দেখতে

পাওয়া যায় না, আর তাতে দোষই বা কি? তবে এটা ঠিক, আমাদের দৃষ্টি এখনও ইউরোপের দিকেই সর্বতোভাবে নিবদ্ধ।

—দোষ ঐখানেই—যেখানে অন্তর থেকে দুঃখবোধ আর সেটা মোচনের প্রেরণা অন্তর থেকে আসে না। কোন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার যতই মিল থাক, আপদ উদ্ধারের পন্থা অনুকরণের দোষ এই যে আমাদের জাতিধর্মনির্বিশেষে সে পন্থা খাপ্ খাবে কি করে? মধ্যপথে গতিহীন হবার আশঙ্কা খুবই আছে।

আমরা চলিতে চলিতেই কথা কহিতেছিলাম। লক্ষ্য করিতেছিলাম পথে যে সব লোক চলিতেছে তাহাদের অধিকাংশই সুস্থ নয়। গোদ ও গলগণ্ডটা যেন বেশী আমার চোখে পড়িতেছিল। মনে হইল, এ সকল জলবায়ুর দোষেই ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি, বা মীমাংসা কিরূপ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম: দেখুন, এই এক মাইলের কিছু বেশী আমরা এসেছি, এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনকে পথে দেখলাম, আন্দাজেই বলছি।—এর মধ্যে আমি দু'জনের গলগণ্ড, তিনজনের পায়ে গোদ দেখলাম। প্রায় প্রত্যেককেই দেখছি গায়ে রক্ত নেই, বিমর্ষ, কারো গা-ময় দাদ, কারো পেটজোড়া প্লীহা যকৃৎ—এই যে সব অসুখ সত্যই এগুলি কি জলবায়ুর জন্য নয়? দেশ-বাসীর এতে কি হাত আছে? এরকম অসহায় অবস্থায় পড়ে এরা যে বাঁধা মার খাচ্ছে তার উপায় কি মনে হয় আপনার?

নাগ মহাশয় ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিলেন: এতে দেশবাসীরই ত একমাত্র হাত, আবার অন্য কার হাত থাকবে! ঐ আলস্য ও শ্রমবিমুখতাই ত গোড়াকার অসুখ। বহুদিন থেকেই চলে আসছে—তাই এদের ওসব সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। যদি প্রতিবিধানের উপর লক্ষ্য থাকত, দেখতেন তাহলে দেশের চেহারা অন্যরকম হ'ত। দেখছেন ত সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে সরকারী সাহায্য পাবার নিয়ম কি? গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে থেকে এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় যোগাড় করে সরকারকে দেখাতে পারলেই সরকার থেকে বাকী টাকাটা দিয়ে সেটি সম্পূর্ণ করবার কাজে সাহায্য পাওয়া যাবে। প্রকৃতি বা ভগবানের রাজ্যেও চিরকালের নিয়মও ঐরূপ। সেই নিয়ম থেকেই না এ নিয়ম এসেছে? আপনি কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে আগে প্রাণপণ করে লাগুন, তারপর বাকীটা তাঁর কাছ থেকে এসে আপনার উদ্দিষ্ট কর্ম সফল করে দেবে। মানুষের হাতে কর্মের ফলাফল নির্ধারিত হবার শক্তি নেই, সেটা তাঁর হাতেই বরাবর, তবে, মানুষকে আগে (কোন কল্যাণকর কাজে) তার দৃঢ় সংকল্পের পুঁজি নিয়ে নামতে হবে,—দেখবেন সাফল্যের জন্য বাকিটুকু তাঁর অনন্তশক্তির ভাণ্ডার থেকেই আসবে। এ যেমন ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগত চেষ্টাও সেইরকম। এই রোগ তাড়ানোর ব্যাপারেও দেখবেন—দেশের লোক, যাদের মধ্যে অশান্তি, সে অশান্তি তাড়াবার জন্য যখনই বদ্ধপরিকর হয়েছে তখনই না হোক, কালের মধ্যে দিয়ে সমবেত চেষ্টাতেও সে অশান্তি দূর হতে বাধ্য, এই গ্রহপতি সূর্য্যদেবই তার সাক্ষী। আর, সকল কাজই যে অর্থসাপেক্ষ তা মনেও করবেন না, সমবেত মন ও শরীরের চেষ্টাতেই মূল কাজ হয়ে যায়। যেদিকেই দেখুন না কেন—

আমি: আপনার কথা শুনলে মনে বল আসে—আর আপনার এসকল কথা অমূল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ এত অসহায় ও অবসন্ন

তা দেখলে আমার মধ্যে বড়ই অবসাদ আসে,—কি করে দেশের মানুষের মধ্যে এ অবসন্ন অবস্থা কাটবে—

নাগ: আগে দুঃখবোধ, তারপর তা থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা। সম্মোহিত অবস্থায় প্রতিকারের চেষ্টা আসে না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই তা দেখেছি, সাধারণ মানুষগুলি দুঃখেই মুহ্যমান হয়ে পড়ে। সকল ব্যাপারে এইরূপ মুহ্যমান হওয়াটাই যেন ভারতের বিশেষত্ব। সুখে হোক আর দুঃখেই হোক এই মুহ্যমান ভাবটিই জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকের সঙ্গে সমান তালে চলবার পথে সর্বাপেক্ষা বিষম বাধা নয় কি? দেখুন দাদা, জলবায়ুর প্রভাবে অশান্তি ভোগ করা সকল দেশেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, কিন্তু এখানকার লোক মুহ্যমান অবস্থায় যে কালটা কাটায় অন্য দেশের মানুষে ততক্ষণে সে অশান্তির প্রতিবিধান করে ফেলে।

আমি: এটা কি সত্য নয় যে অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকে সে বিষয়ে তাদের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পায়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকে তাতে বঞ্চিত।

নাগ: আহা, আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছি না, সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার কথাটা নিশ্চয়ই এখানে আসল নয়। এখানে আসল কথাটা মুহ্যমান হয়ে পড়া আর সেই অবস্থায় অনেকটা কাল কাটানো। আর সরকারের সাহায্যের কথা যা বলছেন দাদা,—এ সরকারের সাহায্য না পাওয়া গেলেও, ও সরকারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে কে?—আসলে অকর্মণ্য মানুষদের ও একটা অছিলা, অন্য পাঁচজনের কাছে নিজের দুর্বলতার কৈফিয়ৎ মাত্র, ভগবান যে বিরূপ তারই লক্ষণ। আমি দাদা, ওরকম চুণকামকরা কৈফিয়তের প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নয়।

—আপনি তাহ'লে কোন ব্যাপারেই রাজতন্ত্রের দিকে সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে রাজি নন?

—এক একটি গ্রাম এক একটি রাজত্ব, গ্রামবাসীরাই তার কর্তা, এ তো প্রাকৃতিক নিয়ম। এতে বাইরের কারো হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই—যদি গ্রামবাসী তাদের শুভাশুভের জন্যে সকল কর্মেই বদ্ধপরিকর হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হয়। আমি সাদাসিধা কথাই বুঝি, জটিল পথে যাব কেন? সহজ, সরল, সত্য কথাটা ত'হলে বুঝে দেখুন, সামাজিক জীব মানুষ, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাতেই তার সার্থকতা। এখানে প্রাকৃতিক নিয়মেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে প্রেরণা দিচ্চে কি না। সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়াটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া, যার ফলে চিরকাল অশান্তি। তারপর, সহজ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায়, মানব-শরীর পরিশ্রমের উপযোগী করেই সৃষ্ট হয়েছে যেখানে তার অভাব, যতই ব্রেন থাক, যতই ইনটেলিজেন্স থাক, নানাপ্রকার অচিন্ত্যপূর্ব রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কাজেই প্রতি পদে পদে দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গেলেই সর্বনাশ হবে; জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হবে। কিন্তু মন-প্রধান মানুষ কখনই বিবেক বুদ্ধিকে সকল ক্ষেত্রে সম্বল করে চলতে পারে না, তারই ফলে মানুষের মধ্যে যত ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সুখী দুঃখী, অত্যাচারী নিগৃহীত ইত্যাদি অবস্থার তারতম্য ঘটে যাচ্ছে।

—এখানে দেখলাম রামকৃষ্ণ মিশনের কাজও আরম্ভ হয়েছে। সেখানেও রোগগ্রস্ত অনেকেই চিকিৎসার সাহায্য পাচ্ছে—

—আহা আসল কথাটা বুঝলেন না দাদা, দেশের মধ্যে অনেকগুলি

ডাক্তার, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী হ'লেই কি এইসব রোগের নিরসন হবে? এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ফলে এত ডাক্তার, ঔষধ, হাসপাতাল হয়েছে, আরও হচ্ছে না বলে খবরের কাগজে সরকারের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ হচ্ছে—এতে কি দেশে রোগের সংখ্যা কিছুমাত্র কমেছে?—এত আইন, এত আদালত, বছর বছর পাল পাল উকিল জন্মাচ্ছে, এত মামলা, মোকদ্দমা, বিরোধ কি তিলমাত্র কমেছে? এত ডাক্তার, এত উকিল বাড়াতে দেশের কি কল্যাণ হয়েছে, যার একটুও বুদ্ধি আছে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এতে দেশের সর্বনাশ, অকল্যাণই হয়েছে, আরও হবে। কারণ, যথার্থ সবার উপকারের দিকে লক্ষ্য থাকবে না,—অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে টাকাটাই হবে মূল লক্ষ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের বদলে হবে দরিদ্র পীড়ন। দেশের কল্যাণ তো দেখতে পাই না।

॥ ৫ ॥

নাগ মহাশয়ের আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি—কবে কোন্ সাল হইতে আমাদের দেশে এবং উড়িয্যার কোথায় কোথায় জলপ্লাবনে এবং জলাভাবে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল —কোন্ সময়ে মহামারী হইয়া কত লোকক্ষয় হইয়াছে, এ সকল তাঁর স্মৃতির মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তিনি বলিতেছিলেন—এই যে এক এক ধাক্কায় দেশ থেকে এতগুলি প্রাণী অকালে সরে যায়, এটা একটা জাতির কতটা লোকসান জানেন? এখনও এ সকলের প্রতিবিধানের জন্য লোক সরকারের মুখ চেয়ে আছে।

আমি পুনরপি বলিলাম: না চেয়ে উপায়ই বা কি?

নাগ: তবুও আপনি ঐ কথা বলবেন? কেন সংঘবদ্ধ হওয়াটা কি আবেদন-নিবেদনের চেয়ে এখনও আপনার সর্বপ্রকারে প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে না? সকল অমঙ্গলের নিরসন যে তাইতেই হবে। আমি জানি, দেশের শরীরকে সুস্থ, কর্মঠ, সবল এবং শ্রমতৎপর করতে হবে, আর কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হবে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান দেশবাসীর এই কর্তব্য সুমুখে রয়েছে। যিনি অবহেলা করবেন, সাধ্য থাকতে কর্মে বিমুখ হবেন, বিধাতার অভিশাপ তাঁর অদৃষ্টে নিশ্চিত। এতটা দুরবস্থার মধ্যেও যারা সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনুভব না করছে আপনি কি তাদের সভ্য কিম্বা ভগবানের নাম নেবার উপযুক্ত মানুষ মনে করেন?

আমি: মনে হয় আমাদের দেশে এখন কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে, —আপনার মত একজন লোক যখন নেমেছেন একাজে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: কোথায় কাজ—ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কাজ করবার ভিন্ন ভিন্ন মানুষ চাই,—কয় জনই বা কাজে নেমেছে? আপনি হয়ত মনে করেছেন যে, সকলেই ঘরবাড়ী ছেড়ে, গীতাখানি বগলে করে, চাদর গায়ে দিয়ে, খালি পায়ে এসে এ কর্মে নামবে?—আসলে তা নয়। যে সওদাগরী অফিসে কাজ করছে সেই কেরানি থেকে আরম্ভ করে—যারা পায়ের উপর পা দিয়ে ভোগবিলাসে সুখে হুকুম তামিল করিয়ে জীবনযাত্রার কাজ সারে, তাদের পর্য্যন্ত এ কাজে নামতে হবে—তবেই না দেশলক্ষ্মী প্রসন্না হবেন।

—যদি সেটা সত্য-সত্যই হয়—আমাদের এই সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই যদি কাজে নামে তাহলে কী শুভদিন আসবে আমাদের দেশে।—তা কি সহজে ঘটবে?

তিনি মহা উৎসাহে বলিলেন: তা অচিরেই ঘটবে—আপনি দেখতে পাবেন, এমন অবস্থা দেশের এসেছে যাতে দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করবে, যদি বিধাতা বলে কেউ থাকেন, তবে এটা অবশ্যই ঘটবে, ঘটতে বাধ্য জানবেন। ভেদ, বিদ্বেষ, দলাদলি ও দুর্বলতা চরমে এসে ঠেকেছে, এখন ও না হলে আর উপায় নেই।

শান্ত একটা উত্তেজনা অনুভব করিলাম—কবে আমাদের দেশের লোক শ্রমের গৌরবকে নিজ নিজ জীবনে প্রাণ দিয়া বরণ করিবে।—এটা ১৯১৫-১৬ সালের কথা।

একদিন নাগ মহাশয়ের গুরু লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা কিছু শুনিবার জন্য ধরিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—এখনকার লোকে অলৌকিক কিছু দেখবার জন্য লালায়িত। অলৌকিক একটা কিছু না দেখলে সাধারণের বিশ্বাস হয় না, তাই আমার গুরু মাঝে মাঝে আমাদের অনেক কিছু দেখিয়েছেন। তিনি বলতেন যে, এদিকে লক্ষ্য থাকলে ইষ্টলাভ হবে না। অতি স্থূলবুদ্ধি যাঁরা তাঁদেরই কেবল ঐ দিকে মন ও আকর্ষণ। ভগবানের ঐশ্বর্য্যেই তাঁরা মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন। ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটলে তবেই না চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়।

—রামকৃষ্ণদেবেরও ঐ মত ছিল।

—সব শেয়ালের একই ডাক,—প্রত্যেক সিদ্ধ মহাপুরুষের আসল কথা একই। তা সত্ত্বেও দেখবেন, সাধারণকে ঐশ্বর্য্যের মোহ কতখানি গ্রাস করে আছে। সাধুর কাছে কত লোক আসে, কটা যথার্থ ইষ্টের সন্ধানে আসে। গুরু যাঁরা; তাঁরা উপযুক্ত আধার লক্ষ্য করে তাঁদের অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগ করেন।

একবার ক্রমান্বয়ে, কিছুদিন ধরে ব্রহ্মচারী লোকনাথ কেবল সকল জীবে সমবুদ্ধির সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন। সকল জীবে সমান বুদ্ধি যদি না আসে, বুঝতে হবে সাধন ঠিক হয়নি। সাধনার শেষে জ্ঞানলাভ হলে সর্বজীবে একই সত্তা রয়েছেন এই বুদ্ধি আসে। কিন্তু সাধন ত সকলকারই হঠাৎ পূর্ণ হয় না, সেইজন্য তিনি বলতেন যে, সকল জীবের মধ্যে তোমার সত্তা। তোমার আত্মা, আর সকল প্রাণীর আত্মার উপাদান একই, বিশেষ করে ভাবনায় এইটি আয়ত্ত করতে তোমরা তৎপর হও, তাতে সাধনের পথ সুগম হবে। তিনি এই ভাবটিই আমাদের মধ্যে যাতে বদ্ধমূল হয় কিছুদিন ধরে সেই চেষ্টা করছিলেন।

এমন সময় একদিন আমার গুরু-ভাইদের একজনের পিতৃবিয়োগ হয়। যে দিন তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ সেদিন ব্রহ্মচারীকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকতে বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মচারী ইদানীং কোথাও যেতেন না। বলতেন —আমায় তোমরা কোথাও যাবার জন্য টানাটানি ক'রো না। কিন্তু ভক্তের জোর বেশী, তাঁরা সকলে মিলে ধরে বসলেন যেতেই হবে। শেষে অনেক মিনতির পরে, ব্রহ্মচারী মহাশয় বললেন—বেশ, আমি যাব বটে কিন্তু আমি একলা যাব, যে-কোন সময়েই যাব, তোমরা কেউ আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসো না।

তাইতেই রাজী, সকলে ত মহাখুসী হয়ে যে-যার ঘরে গেল। পরে কাজের দিন সকাল থেকে ব্রহ্মচারীর জন্য সকলেই অপেক্ষা করতে লাগল। সেই শ্রাদ্ধ-

বাসরে অনেকেই তাঁকে দেখবে বলে এসে উপস্থিত হয়েছে। যখন শ্রাদ্ধের বেদীতে বসে কাজ আরম্ভ হয়েছে, সেই সময় দৌড়ে এক কালো কুকুর সেই শ্রাদ্ধবাসরে এসে দাঁড়াল। সকলেই মার মার করে ছুটল। একজন একটা চ্যালাকাঠের বাড়ি কুকুরটাকে এক ঘা বসিয়ে দিল। কুকুরটা সেই মার খেয়ে আস্তে আস্তে নেমে একবার সেই বেদীর উপরে কর্মকর্তার দিকে করুণভাবে চেয়ে সটান বেরিয়ে গেল, আর কাউকে কিছু করতে হ'ল না।—এদিকে কিন্তু শ্রাদ্ধের সকল কাজ হয়ে গেল, সমস্ত দিন গেল, ব্রহ্মচারী এলেন না। তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলতেন না। যাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ, তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই কিছু অসুখ বিসুখ হয়ে থাকবে, তাই বুঝি আসতে পারলেন না—এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার পর কাজকর্ম সমস্ত চুকে গেলে একবার তাঁর আশ্রমের দিকে গেলেন। দেখলেন, তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—বাবা, এত আদর করে নিমন্ত্রণ করে শেষকালে প্রহার! শুনে কর্তা ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। ব্রহ্মচারী বললেন—বাবা, কালো কুকুরটি কি অপরাধ করেছিল যে তাকে অত কঠিন অভ্যর্থনা করে তাড়ালে? —সকলে এ কথা শুনে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে প'ড়লেন, কারো মুখ দিয়ে রা বার হ'ল না।

তাঁর সঙ্গে যিনি সর্বদা থাকতেন, আমাদের গুরুভাই, পরে তাঁর মুখে ব্যাপার শুনেছিলাম। ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পর ব্রহ্মচারীর ঘর হতে একটা কালো কুকুর বার হয়ে গেল—ঘরের মধ্যে আর ব্রহ্মচারীকে দেখা গেল না। অল্পক্ষণেই সেই কুকুর আবার এসে ঘরে ঢুকল। তখন ঘরে এসে দেখা গেল ব্রহ্মচারী যেন বাইরের দিকে আসছেন। দেখা হবামাত্র বললেন—শ্রাদ্ধবাড়ীতে বেশ কিছু খেয়ে এলাম।

নাগ মহাশয় শেষে বলিলেন: এ রকম অনেক-কিছুই আমরা দেখেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এ সকল মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন? একটা মানুষ—কি ভাবে কুকুর হয়ে গেল—ভগবানের পক্ষে—অবশ্য—

নাগ: আপনি বুঝি যুক্তি ছাড়িয়ে কোন-কিছু বুঝতে রাজী নন? আমরা যে তাঁর কতরকম ঐশ্বর্য্য দেখেছি, তাঁর সঙ্গ যে অনেক দিন করেছি। তা ছাড়া জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের কত শত ব্যাপার—তা কি আমরা সব জানতে পারি?

—তা বলে একটা মানব-শরীর একটা কুকুর-শরীর হয়ে গেল,—এটা বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়ালেন কি রকম করে?

—হাঁ, তার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁর যে অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধি ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, হিমালয়ের গুহাগুহে তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থাটি কেবল সাধনেই কেটেছিল।—তাঁর পক্ষে একটা শরীর পরিবর্তন কি খুব একটা বড় কথা?—মনে ভাবুন দেখি, এই শরীরগুলি কি?—হাড়, মাস, রক্ত, মজ্জা, নাড়িভুঁড়ি, নখচুলের একটি আকৃতি, আসলে তা ভৌতিক বা যৌগিক পদার্থ। তার পর পরমেশ্বরকে যে পায় সে ত তাই হয়ে যায়, তাঁর ইচ্ছাশক্তি কি সাধারণ? একটা কায়ার পরিবর্তন সে ত তাঁর ইচ্ছাধীন। আমাদের ভোগ বা কর্মের মোহ, শুভাশুভের বা কর্তৃত্বের মোহ জর্জরিত করে রেখে দিয়েছে, তাই আমাদের কাছে ওটা অসম্ভব ব্যাপার। শুনতে ও সব বুজরুকির মতই, কিন্তু মহাপুরুষের কাছে ও ত তুচ্ছ, কিছুই নয়।

—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—যদি তিনি এতই শক্তিমান ছিলেন তাহলে তিনি ত দুহাজার বৎসর শরীর ধারণ করে থাকতে পারতেন ;—নানা কর্ম, ভোগ ও জগতের কত কল্যাণ করতে পারতেন।

—হাঁ, তা ত পারতেনই, কিন্তু তাঁরা কেন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধারণ জীবের মধ্যে অহেতুক বাধা বা গতির অন্তরায় সৃষ্টি করবেন।

—তাহলে মানব-শরীরকে পশু-শরীরে পরিবর্তিত করে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধারণের মধ্যে ধোঁকার সৃষ্টি করলেন কেন?

—তাঁদের প্রয়োজন, জীবের কল্যাণের জন্যই যেটুকু প্রয়োজন মনে করেছেন, মাত্র সেইটুকুই করেছেন।—আমি মুক্তকণ্ঠে বলব, যেটুকু ঐশ্বর্য্য তাঁরা দেখিয়েছেন, তাতে সংশ্লিষ্ট সে-জনসমাজের কল্যাণই হয়েছে—অকল্যাণ কিছুমাত্র হয়নি। আর এটা ধোঁকা কেন হবে—তা ত ঠিক নয়। কারণ তাঁর সত্য তপস্যার কথা আমাদের অনেকেরই শোনা আছে, কঠোর কঠোর যোগসাধন এবং ঐশ্বর্য্যলাভ এসকল সে-সমাজের মধ্যে পরীক্ষিত সত্যের মতই বিশ্বাসের বস্তু। তাঁর ভক্ত সকলকারই ধারণা এই যে, যোগ-সিদ্ধির ফলে ওসকল ঐশ্বর্য্য সকলকারই আসবে, তা লোকনাথ ব্রহ্মচারীই বা কি, আর রামচন্দ্র মাইতিই বা কি। তবে রামকৃষ্ণ যেমন এটা পুনঃ পুনঃ বলতেন যে, যোগৈশ্বর্য্যের দিকে লক্ষ্য থাকলে ঐটুকুই তার গণ্ডি—উচ্চ লক্ষ্যে যাওয়া যায় না, লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায় বটে।—ব্রহ্মচারীও বলতেন—বাবা, এ সকলের দিকে লক্ষ্য দিবি না, জগদম্বাকে পেলে এ সকল আপনা হতেই আসবে। তখন সামাল সামাল ডাক পাড়তে হবে যে।

—সামাল সামাল ডাক পাড়তে হবে কেন?

—আরে দাদা, এটুকু বুঝলেন না? যোগ-ঐশ্বর্য্য এলে শক্তি-চাঞ্চল্য কি ভাবে উপস্থিত হয়ে থাকে। আধার যদি রজোগুণী হয় তাহলে ঐ যোগৈশ্বর্য্যের ফলে আধিপত্য, ভোগলালসা, উচ্চ উচ্চ শক্তির চালা-চালি—এ সকল আপনা হতেই এসে পড়ে, তাতে তাকে ভ্রষ্ট করবেই। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে যে কি দুঃখ তা যে পড়ে সে-ই জানে,—উচ্চ সত্ত্বগুণী আধার না হলে ঐ যোগৈশ্বর্য্যের মোহে অনেক লটাপটি খেতে হয় যে,—জানেন ত বিশ্বামিত্রের ব্যাপার? এ বড়ই জটিল সমস্যা, ইষ্টসিদ্ধি কি সহজে হবার যো আছে দাদা, এ মাটিতে! বসুন্ধরার মাটির অনেক গুণ—মাধ্যাকর্ষণটা তার স্থূলভাব মাত্র—সেই কায়ার মধ্যে অনেক কিছুই আছে।

অল্পক্ষণ থামিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—এই আমার কথাই বলি, যে পরিমাণে মনঃসংযম প্রয়োজন, আমি ইষ্টলাভের জন্য কি তাই করতে পেরেছি? মাত্র চার বৎসর কাটিয়েছি—তার পর বাপ বাপ বলে পালিয়ে আসতে হ'ল।

এইভাবে নাগ মহাশয় সরলভাবে তাঁর পূর্ব্ববর্তী সাধন জীবনের কতকাংশ খুলিয়া ফেলিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন, ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছিলেন নাকি?

নাগ: ভয়ঙ্কর বই-কি! আধার তৈরী না হলে যা হয়। যে-তালে যে-মাত্রায় অগ্রসর হতে হয়, তাড়াতাড়ি পেঁছাব বলে যদি দৌড় বেশী দেওয়া যায় তাহলে শীঘ্র শীঘ্র প্রাণশক্তির পুঁজি খালি হয় না কি?—প্রাণশক্তি কি খেলার জিনিস?—এর তাল দ্রুত হলেই সর্বনাশ—এর লয় যত বিলম্বিত হয় ততই নিশ্চিত, ততই দৃঢ় অধিকার লাভ হয়। গুরুর সঙ্গে থাকায় এই সুবিধা;

তিনি রাশ খুব দৃঢ় মুষ্টিতে পাকড়ে থাকেন। ব্রহ্মচারীর সিদ্ধির সুযোগ-সুবিধা ত ঐ জন্যই হয়েছিল, গুরু বরাবরই সঙ্গে—আর আমার ত তা নয়—একলা গোঁ ভরে চলেছিলাম—তাল রাখতে পারিনি।

নাগ মহাশয়ের সরলতায় মুগ্ধ হইলাম। বিশেষ কৌতূহলী হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম: তার পর কি হ'ল ?

—লাভ এই হ'ল যে, গতিভঙ্গ হ'ল, এ যাত্রায় ঐ পর্য্যন্ত। যেটুকু পুঁজি হয়েছিল তাই নিয়ে এই সৎকর্ম-মার্গে নেমে পড়েছি। গুরুর কৃপায় কোন প্রকার ইন্দ্রিয়জ মোহে পড়বার আগেই সামলাতে পেরেছিলাম—এখন তাঁরই কৃপায় কায়মনোবাক্যে কর্মের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টায় আছি।

যখন তিনি এতটাই বলিলেন তখন তাঁহাকে আরও একটু ধরিয়া বসিলাম, —ইন্দ্রিয়জ মোহটা কি সকল তপস্যারই অনিবার্য্য পরিণাম ?—

নাগ মহাশয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া পেটের কথাটা যেন তল অবধি দেখিবার চেষ্টা করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন: ওটা জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলুন ত ?

—মহাভারতের সেই বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধ আদি বড় বড় মহাত্মাদের ইন্দ্রিয়জ মোহে পড়বার কাহিনী ত অনেক শুনে এসেছি। তা ছাড়া ছোটখাট মহাত্মাদের ইন্দ্রিয়জ মোহে পড়বার কাহিনীও কম শুনিনি। কাজেই উৎকট তপস্যার পরিণামে, যে একপ্রস্থ সকলকারই ইন্দ্রিয়জ মোহের ফাঁদে পড়বার সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবেই যেন সংস্কারগত হয়ে রয়েছে।—সেই-জন্যই, বিশেষ করে ওটা জানবার অভিপ্রায়েই, আপনাকে ধরে বসেছি।

—যা বলেছেন তা অনেকাংশেই সত্য। তপস্যার জোর যার যতটা, বৈরাগ্যের প্রাবল্য অনুযায়ী একবার ঐ ইন্দ্রিয়সুখের লালসাটি তার ততই প্রবলভাবে আক্রমণ করতে বাধ্য।—এর কারণ আর অন্য কিছু নয়, যার অহঙ্কারে ভোগলালসা যতটা মাখানো থাকে, শুদ্ধ ভাবের আলোক যখন তাতে লাগে তখন সেই লালসার মলিনতা ততটাই তার অহংকে নামায়, তাতেই ঐ ভোগে আসক্ত করে আর সেই ইন্দ্রিয়সুখের বা রূপজ মোহের গভীরতা ও অনিত্যতা সম্যকবোধে জাগিয়ে দেয় যখন তার ক্রিয়া শেষ হয়ে যায় তখনই।

—ক্রিয়া হয়ে যায় ?—ক্রিয়া হবার দরকার কি ? বুঝতে পারা গেলেই ত হয়ে গেল, বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা ত তা থেকে সামলে নিয়ে ইন্দ্রিয়ঘটিত কর্ম থেকে তফাতে—

—না না, ঠিক তা ঘটে না। আসল ব্যাপারটা যে শুধু মনে হয়েই ক্ষান্ত হয় না—শরীর পর্য্যন্ত না জড়ালে তার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। শরীর থেকে আরম্ভ করে স্নায়ু দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে মন পর্য্যন্ত তার যে ক্রিয়া সেইটাই হ'ল একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়া, বুদ্ধিই এটা নিশ্চয় করে বুঝিয়ে দেয়, আর আত্মা থাকেন সাক্ষী। এই যে আমাদের ভোগমূলক যত কিছু কর্ম তা সবগুলিই এই ক্রমে ঘটে থাকে। সাধারণ মানুষের, প্রথমে মনে হয়,—তার পর সংস্কারবদ্ধ সেই মন তার সুখকর স্মৃতির সাহায্যে সেই সুখ পুনঃ ভোগের ইচ্ছাকে সতেজ করে, তার পর ভোগের বস্তু পেতে যেটুকু দেরী। তা ওরকম অবস্থায় পেতে দেরীও হয় না। মানস-মূর্ত্তি সশরীরেই প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হয়,—তখন আর ঠেকাবে কে ? তখন ভোগ ছাড়া যে আর গতি নেই।

আমি বলিলাম: ঐখানেই ত পতন হ'ল।

নাগ মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন : তাই দেখায় বটে, কিন্তু উচ্চ আধার যদি হয়, তাহলে বুঝতে পারা যায় যে, ভিতরের গলদ কেটে গেল—আর পড়তে হবে না। ইন্দ্রিয়জ মোহের অসারতা—তখন তার চেয়ে আর কে ভাল বুঝতে পারে। সে ভবিষ্যৎকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যে মনে ইন্দ্রিয়সুখের ইচ্ছার স্ফোট আর উঠবেই না। মনে উঠলে তবেই না ইন্দ্রিয়কে ভয়,—না হলে ভয় কি?

—তাহলে দেখুন সাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা ভ্রম ধারণা আছে। তারা ভাবে বুঝি যোগী, তপস্বীদের সাধনাবস্থায় মনের মধ্যে কাম-ইন্দ্রিয় ভোগের ইচ্ছা হলেও তাঁরা জোর ক'রে সেই কর্ম থেকে বিরত থাকেন—আর তাকেই বলে সংযম।

নাগ মহাশয় হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন : মনেই যদি নারী-সম্ভোগের, ইন্দ্রিয়সুখের লোভ বা ইচ্ছা এল তবে সংযম টেঁকবে কি করে? সংযম কথাটির মহিমা কোথায়?—কি অপূর্ব বস্তুর সন্ধান যোগশাস্ত্র দিয়েছেন এই সংযম শব্দাত্মক ভাবটির মধ্য দিয়ে।

—আচ্ছা যোগভ্রষ্ট হলেই কি তার সকল সঞ্চিত কর্মগত শুভ ফল নষ্ট হয়?

নাগ মহাশয় বলিলেন : তা হবে কেন? মানুষ যা-কিছু তপস্যা দ্বারা উপার্জন করে তা কখনো নষ্ট হয় না। মানুষের এই যে তপস্যার প্রবৃত্তি, এর মধ্যে যে ভগবানের একটি অভিপ্রায় আছে তা হয়ত মানুষে সব সময়ে বুঝতে পারে না বা মনে রাখতেও পারে না। অহঙ্কার সব কর্মের গোড়ায় থাকে, কাজেই যা-কিছু করছি তা আমি করছি এই ভাবে চলে। মধ্য পথে প্রবৃত্তির কোন একটা বিশেষ প্রাবল্যের জন্যই ঠেকে যায়। তার মধ্যেও অন্তর্যামী ভগবানের কোন অভিপ্রায় থাকে। যে তপস্যার গতিভঙ্গ হয় তাতেও একটা কল্যাণময় অভিপ্রায় থাকে। তাইতে, তার ফলে আমরা একটা কিছু মহৎ ভাবই দেখতে পাই। যেমন বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ফলে শকুন্তলার জন্ম,—সেই শকুন্তলা থেকেই ভরতের উৎপত্তি, আর সেই ভরত থেকেই ভারতবংশ—আর তাইতেই বংশ-বিস্তৃতি—আর তাই থেকে ভারতবর্ষ—ঠিক যেন তপোভঙ্গের একটি ধারাবাহিক স্থায়ী ইতিহাস এই ভারতবর্ষ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তার পর বিশ্বামিত্রের দিক থেকে দেখতে গেলেও আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বামিত্রকে আর ঐ মোহে পড়তে হয়নি। তার পর, ক্রোধ হিংসা প্রভৃতির জন্যও যে পতন তার ফলও কম নয়—শেষের দিকে যখন তাঁর সকল মোহ কাটল তখনই বিশ্বামিত্র হলেন ঋষি। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথমেই বিশ্বামিত্র ঋষির নাম রইল। তাহলে এটা আমরা সুন্দরভাবেই বুঝতে পারি যে তপস্যায় যদি বাধা আসে ত সে বাধা নিজের উৎকট ভোগের আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি থেকেই আসবে, আর সেটা না কাটলে কখনই অগ্রসর হবার যো নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : মানুষের মধ্যে এই যে কাম-ইন্দ্রিয়ভোগের উৎকট স্পৃহা, সেটা যেন সকল ভোগের উপর যায়, তার জোর এতই বেশী অন্য যা-কিছু যেন তার তুলনায় কিছুই নয়। আমার এখানে এই সংশয় লাগে যে, কেন মানুষের কামেন্দ্রিয় এত প্রবল, সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির যেন সকলের চেয়ে বড় বাধা।

নাগ : মৈথুন যে সৃষ্টির আদি—যেখানে সৃষ্টির ব্যাপার সেইখানেই

মানুষের নারীদের উপর টান, আবার যেখানে সৃষ্টি-নিবৃত্তির ব্যাপার সেই-খানেও পূর্ব সংস্কারের প্রবল উত্তেজনা। এতদিনের সংস্কার কি এক কথায় যাবার? সেটা যেতে যেতেও যে আবার কতক সৃষ্টি হয়ে পড়ে, তার ধারায় কত বংশের উৎপত্তি হয়, যেমন বিশ্বামিত্রের বেলা আমরা দেখেছি। প্রবৃত্তির উদ্দাম ছন্দে মানুষ যখন ভেসে যায় তখনও তার সৃষ্টির ছাপ বা নিশানা রাখতে রাখতে যায়, আবার যখন নিবৃত্তির ছন্দে, ত্যাগের মার্গে চলে তখনও তার ছাপ রাখতে রাখতে চলে। মুক্ত পুরুষের আধ্যাত্মিক পথে যাত্রার মাঝে কায়িক ভোগের কর্ম বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁর চিন্তাপ্রবাহ নূতনতম তরঙ্গের সৃষ্টি করে, সেই ধারা শুদ্ধ মনের সাহায্য অনুসরণ করলে আত্মাকে ধরতে পারা যায়।

তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষের স্থূল কাম বা ইন্দ্রিয়জ মোহ ট্রান্স্ফর্ম্ড্ হয়ে যায়—

বাধা দিয়া নাগ মহাশয় বলিলেন:—ট্রান্সেণ্ড্ করে,—ইংরাজীতে কাজ নেই দাদা,—মন চৈতন্যমুখী হলেই অন্তরের যতকিছু ভোগের প্রেরণা আর স্থূল বস্তুমুখী হয়ে থাকতে পারে না, স্বভাবতঃই বিজ্ঞানমুখী হয়ে সূক্ষ্মতত্ত্বে তার সকল প্রবৃত্তির অর্থবোধ হয়।

॥ ৬ ॥

কোনও একজনকে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে দেখিলে সাধারণত সকলে না হোক, বেশীর ভাগ লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশেষত যাঁরা একটু দেশের বা দশের দিকে চাহিয়া চলিতে ইচ্ছা করেন তাঁরা সকলকার আগে সেই-সব মানুষের গুণ গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের নাগ মহাশয়ের ওখানে বন্ধুর অভাব ছিল না। একে ত তাঁর গরীব লোকের সঙ্গেই কারবার, শ্রমজীবী সাধারণ তাঁর কথায় জীবনে একটা উৎসাহ অনুভব করিত, তার উপর ভোগের, নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর লক্ষ্য না থাকায় তাঁর চরিত্রের শক্তি স্থানীয় সাধারণের গোচরে স্পষ্টরূপে সকল সময়েই জ্বলজ্বল করিত। অনেকে নিজেদের মধ্যে কোন কোন বিবাদের মীমাংসার জন্যও তাঁহার কাছে আসিত। তিনি তাহাদের মধ্যে দেশ-কাল-পাত্রহিসাবে অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন।

একদিন এক মীমাংসার ব্যাপার লইয়া এক দল লোক উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই অভিযোগকারী। তাহাদের অভিযোগ একজন ব্রহ্মচারীর উপর। আমি সকল ব্যাপার শুনিয়া মর্মাহত হইলাম। কিন্তু তাঁহার মীমাংসা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম।

নাগ মহাশয়ের অতীব তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি, যখনই তিনি কোনও বিষয়ে মনোযোগী হইতেন তখনই যেন সে ব্যাপারের শেষ অবধি দেখিতে পাইতেন এবং তাহার যেরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন তাহাতে তাঁহার পবিত্র অন্ত-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইত।

ব্রহ্মচারীর উপর তোমাদের এতটা কোপ কেন?

তাহাদের একজন বলিল: যদি কোন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুন্দরী যুবতী দেখা যায় তা হলে সাধারণের কি মনে হয়?

নাগ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন: তোমরা কি সাধু-সন্ন্যাসীদের একা পুরুষ

জাতির ভোগের সম্পত্তি মনে কর নাকি? গৃহস্থ-পুরুষেরা যে উপকার পান, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীরা কি সে সুযোগ পেতে পারেন না?

—তা পারেন বটে, কিন্তু একজনের সঙ্গে যদি বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়—

—তা হলেই বা। গুরুকে সেবা করা এবং নিজ সাধন উৎকর্ষের জন্য যদি কোন কুললক্ষ্মী নিরন্তর গুরুসঙ্গ কামনা করেন, আর যদি গুরু সেটা সমীচীন মনে করেন তাহলে তাতে দোষটা কি বুঝতে পারলাম না ত।

—আচ্ছা, লোকচক্ষে এটা কেমন—

—সেটা যাঁর বিষয় তিনিই বিবেচনা করবেন, তোমাদের ও বিষয়ে মাথা ঘামানোতে কি বোঝায় জান?—নারীজাতির প্রতি দৃষ্টি তোমাদের পবিত্র হয়নি, মাতৃজাতির প্রতি তোমাদের দুষ্ট মনোভাব এখনও আছে।—বলিয়া তিনি মধুর হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

অভ্যাগতদের প্রতি সস্নেহে চাহিয়া আবার বলিলেন: যারা নিজের ঘরে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ হবার উদ্যম নেই যাদের, তাদের অন্য আশ্রমের সমালোচনার নামে এই সব কদালোচনা শোভা পায় কি?—

যাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইল,—তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন একটু অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল: আমরা অনেক কিছুই নালিশ নিয়ে এসেছিলাম—আপনি একেবারেই সব শেষ করে দিলেন।

নাগ: বেশ ত, যতগুলি আইটেম্ সবগুলোই বলে যাও না, সবগুলির মীমাংসা হবে এখন। বল ত, তার পর দ্বিতীয় দফা—

তিনি: সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে অত বিষয়ের দিকে নজর কেন?—জমি জমা অনেক কিছুই করেছেন, করছেন, আবার জোর ক'রে সেদিন একটা কুণ্ড দখল করে নিলেন।

—আশ্রম করতে গেলে তাকে স্থায়ী করবার উপায়ও ত করতে হয়? সেটা চলবে কিসে? জমিজমা থাকলে তার উপস্বত্ব থেকে আশ্রম চলে যাবে। এতে দোষ কি? পাঁচজন সাধুসজ্জন প্রতিপালিত হবে, ওগুলো ত আশ্রম করতে গেলেই দরকার হয়ে থাকে। যাঁর ও-সকল স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করবার সুযোগ সুবিধা আছে তিনি তা ছাড়বেন কেন?

তিনি: আর জোর করে জায়গাজমি দখল করা, কুণ্ডটি জোর করে নিজের এলাকার মধ্যে করে নেওয়া?

—ও সকল বিচার ধর্মাধিকরণে হবে, এখানে কেন? বিষয়ে অধিকার-অনধিকার সাব্যস্ত হবে বিচারালয়ে; আপত্তির সূক্ষ্মবিচার সেইখানেই হবে।

তিনি: তা হয় না, আজকাল টাকার জোরে যেটি অসম্ভব, যেটি অন্যায়—সেও সম্ভব হয়, ন্যায়ও হয়।

নাগ মহাশয় উত্তরে তৎক্ষণাৎ বলিলেন: তা না-হয় আপাতত হ'ল কিন্তু সে ত তোমাদের একতারই অভাবে, সঙ্ঘশক্তি-বিমুখ হয়ে আছে বলেই না তোমরা একটা সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পার না। আদালতে যেতে হয় কেন তোমাদের?—তার পর, বিচারের ওপর বিচার আছে ত?

তিনি: আপাতত অধর্মের জয় হ'ল ত?

শুনিয়া হাসিয়া নাগ মহাশয় বলিলেন: সব কাজেই সদ্য সদ্য ফল পাওয়া

যায় কি? তার পর ধর না কেন, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বলে একটা কথা আছে জান ত? এখানে যার শক্তি বেশী, সে-ই নিজ মনোমত ভোগের উপাদান সংগ্রহ করবে, তাতে যদি কারো কোনো বাধা না খাটে তখন কি বুঝতে হবে? —মাথা নীচু করা ছাড়া আর উপায় নেই। ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলছ, তুমি হলে কি করতে? বিষয়ে প্রবল তৃষ্ণা থাকলে আর সেই উপযোগী শক্তি থাকলে তুমি কি কোন ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধককে গ্রাহ্য কর? একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখ না—এই বাঙ্গলার রাজত্বটা কি ভাবে, কাদের হাত থেকে কাদের হাতে এসে পড়েছে। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবেই বা কে, মানবেই বা কে! প্রবল শক্তি দুর্বলকে স্তম্ভিত ক'রে নিজ উদ্দেশ্য সফল করবে। তার পিছনে অবশ্য জনমতের সমর্থন ছিল বলেই না ওটা সম্ভব হয়েছে।

—এটা হ'ল আলাদা, রাজত্ব নিয়ে—

নাগ মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন: কেন, আলাদা কেন? এও ত নিজ শক্তিমত্তারই কথা, জোর করে দখল করার ব্যাপারই আসছে!

তিনি বলিলেন: সাধু-সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী যাঁরা, তাঁরা কেন পরধনে, পরের সম্পত্তিতে লোলুপ হবেন—সেটা ধর্মের রাজ্যে কি অন্যায় নয়?

নাগ মহাশয় বলিলেন: বিষয়ের ব্যাপার যেখানে, সেখানে সাধুই বা কি আর সন্ন্যাসীই বা কি! বিষয়টা বিষয়, সম্পত্তিটা সম্পত্তি। অধিকার নিয়েই কথা নয় কি? সম্পত্তি বা বিষয়ের ব্যাপারে অধিকারের যে আকাঙ্ক্ষা, তার মূলই হ'ল লোভ। সম্পত্তির স্পৃহা সম্পত্তিকেই টানবে। সম্পত্তি-লোলুপ মন,—তার সঙ্গে কর্মশক্তি অনুকূল থাকে যদি, তাকে কে ঠেকাবে? ঠেকাতে গেলে তার চেয়ে প্রবল শক্তি চাই; বাক-বিতণ্ডার কর্ম নয় ত!

—তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহীর প্রভেদ কি রইল?

নাগ মহাশয় বলিলেন: যেখানে বিষয় নিয়ে কথা, সেখানে কোনও প্রভেদ ত নাই-ই। বিষয় থাকলে বিষয় রক্ষা করবার শক্তি চাই। ব্যক্তিত্ব, জনবল ও অর্থবল এই তিনটি তার মুখ্য প্রয়োজন। সেটি যার আছে সে বিষয় উপার্জন অধিকার ও রক্ষা করতে পারবে।

—তাহলে সন্ন্যাস আশ্রমের সার্থকতা কি?

নাগ মহাশয় পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে যেন একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শান্তভাবেই বলিলেন: প্রভেদ দেখতেই ত পাচ্ছ ভাই, যেখানে বিষয় সেখানে প্রভেদ কোথায়? বিষয়মূলক কর্ম যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ লাল কাপড়ই পর আর সাদা কাপড়ই পর ফল যে সমানই, একথা কি আজকার দিনে কারো বুঝতে অপর একজনের সহায়তা দরকার করে? সংসার ছাড়া, বিষয় ত্যাগ করা—এ ত করার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই গেল। আর যখন একজনের কর্ম এতটাই প্রবল তখন আর সন্ন্যাসের কথায় কাজ কি?

—নিষ্কাম কর্মই ত সন্ন্যাসীর? গৃহীদের—

নাগ মহাশয় বলিলেন: নিষ্কাম কর্ম যদি সম্ভব হয় ত গৃহীদের হবে না কেন? আর, গৃহী আর সন্ন্যাসীতে তফাৎ কি,—গৃহী-অবস্থার পরিণতিই তো সন্ন্যাস? গৃহীই ত পরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় সন্ন্যাসী হন। না কি, সন্ন্যাসী আবার কোথাও অন্য লোক থেকে এখানে আসে?

সে ব্যক্তি যেন একটু গোলমালে পড়িলেন, বলিলেন: এই যে এখানকার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়, এঁরা সকলে ত গার্হস্থ্যের পরিপক্ক অবস্থায় সন্ন্যাসী হচ্চেন

না—এঁরা কেউ আধপাকা অবস্থায়, কেউ বা একেবারে কাঁচা অবস্থায়, অল্প বয়সে সন্ন্যাসীর দলে ভর্তি হয়ে পড়েছেন, তাই ত যত গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে।

নাগ মহাশয়ঃ আরে ভাই, এখন সেই পুরানো দিনের চতুরাশ্রম ত আর নেই! দেশের মধ্যে সমাজের আগাগোড়া পরিবর্তন হয়ে গেছে যে! তখনকার দিনে প্রাকৃতিক নিয়মেই আমাদের মানব-সমাজের আশ্রম নিয়মিত হয়েছিল, যেহেতু তখনকার মানুষ প্রকৃতির কোলেই মানুষ হত। চতুরাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস ছিল চতুর্থ আশ্রম। জীবনে ভোগ ও কর্ম পূর্ণ হয়ে বৈরাগ্য এলে তখন ত্যাগ। মহাভারতের যুগের পর থেকে বর্তমান ইতিহাসের মধ্যে প্রথমেই মহাবীর জৈন-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর দল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের আর এক সংঘ বা প্রকাণ্ড শ্রমণের দল জমে গেল। ধর্মের যেন এক প্রবল বন্যা এল। তাইতে দেশে গৃহী, অগৃহী, নির্বিচারে বৈরাগীর রাজ্যে ঢুকে পড়ল। বৈরাগ্য-ধর্মের নামে যেন এক বিরাট মোহ এল রাজ্যের সকল দিকে; শেষে সম্রাট অশোকের প্রভাবে তার বহু বিস্তার। তখন থেকেই আশ্রমের ব্যাভিচার সুরু হ'ল, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম ঠিকই রইল। ক্ষণিক বৈরাগ্যের ঝোঁকে অথবা রাজানুগ্রহ লাভের লোভে যাঁরা ঢুকলেন সংঘের মধ্যে, তাঁদের মোহ কাটলে প্রকৃত ভোগের ক্ষুধা পেতে লাগল। তখন থেকেই সংঘে প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনের ফাঁকের মধ্যে বেশ কতক ভোগের হাওয়া ঢুকে, ক্রমে ঝড় বইতে সুরু করে দিলে! ক্রমে সংঘের একটা দিক বিকৃত হয়ে প্রকৃতির নিয়মেই দেশের সমাজের আপদ হয়ে উঠল। তখন শংকর এলেন। সনাতন ধর্মকে মায়ার দুক থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে পাল্টা নূতন করে সম্প্রদায় গড়ে গেলেন। পুরানো বৌদ্ধ তন্ত্রের ঝড়তি পড়তি, যারা জাত হারিয়ে আউল, বাউল, সাঁই, কর্তা নানা ছাঁচে সহজ ধর্মের বনজঙ্গল গজিয়ে বাঙ্গলার নানা দিকে ছড়িয়ে রইল।

শংকরের অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ভেদের এক একটি মীমাংসা নিয়ে বিরাট সম্প্রদায়, বিরাট দল গড়তে রইল। শংকরের সম্প্রদায়ের আদর্শ ক্রমশ বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কুলীন, গিরি, পুরী, ভারতী, অরণ্য ইত্যাদি দশ নামী থেকে বংশজ বহু নামী ও নানা পন্থী হয়ে ভারতময় আনন্দের হাট-বাজার লাগিয়ে দিলে। নাথ সম্প্রদায়ের যোগীগুরু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের সংখ্যা তাদের মধ্যে বড় কম যান না। তারপর বৈষ্ণব ধর্মের পালা,—সে দিকেও সন্ন্যাসীর দল বড় কম হ'ল না। তখন থেকে এখনো পর্য্যন্ত যোগী বা সন্ন্যাসী রাজ্যের নিষ্কাম কর্মের যোগফল এইভাবে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ইদানীং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্প্রদায় শুধু ভারতে নয়, নূতন পৃথিবী আমেরিকা পর্য্যন্ত ঠেল মেরেছে—দেখছ ত?

তিনিঃ তাহলে এই যে প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসীর নানা সম্প্রদায়, এঁদের কর্মপন্থাও নানা দেখাচ্ছে, তাঁদের আদর্শ যাই হোক। গৃহীদের সঙ্গে এক কাপড়ের রং-এর ব্যবধান ছাড়া আর কি ব্যবধান তা ত দেখতে পাই না।

নাগ মহাশয় বলিলেনঃ সে ত বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—আমি কিন্তু আরও ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি। সেটা এই যুবকসঙ্ঘের মধ্যে বিদ্যানুরাগ, বিলাসত্যাগ ও কুমার অবস্থায় সন্তোষ আর গৌরববোধ। এটা কম গৌরবের নয়। আর এটাও একটা বিশেষ শুভ যোগাযোগ নয় কি,

দেশের নানান কাজে দেশের যুবক-সম্প্রদায় কতটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে পারছে? এই যে পরার্থে কর্মের যোগ এটা কি সহজ, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সেতু! বিবেকানন্দ পুরানো সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর এই নূতন দল গড়ে। এর মধ্যে স্রষ্টার একটা অভিপ্রায় রয়েছে দেখছ না?

এই ভাবের কথায় আমরা সকলেই বিশেষ কৌতূহলী হইলেও তিনি বিষয়টি লইয়া আর বেশী কিছু সময়ক্ষেপ করিতে চাহিলেন না, বলিলেন: আজ এই পর্য্যন্ত, আবার সময়ান্তরে হবে।

তার পর আমার হাতটি ধরিয়া বলিলেন: চলুন দাদা, আজ আপনাকে একটি নূতন জিনিস দেখাব।

একটি জীর্ণ পুরাতন মন্দির—তার অল্পদূরেই একটি বহুপ্রাচীন নিম গাছ। তখন আষাঢ় মাস, গাছটি সুপক্ক ফলে পূর্ণ। নীচেও অসংখ্য বীচি স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। নাগ মহাশয় গাছে উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

—আসুন দাদা, বলিয়া একগোছা সুপক্ক নিম ফল হাতে লইয়া দুই একটা করিয়া মুখে পুরিতে আরম্ভ করিলেন। আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম:—এ কি, তেতো লাগছে না?

—একটা খেয়েই দেখুন না, মন-রসনার বিবাদ-ভঞ্জন হয়ে যাক্।

আশ্চর্য্য—এমন মধুর, একেবারেই তিক্তস্বাদ শূন্য, এত মিষ্ট নিম ফল যে হয়, তা আমার জীবনে কখনও আস্বাদ করি নাই। ভুবনেশ্বরে আসিয়া এই এক অপূর্ব বস্তু দেখিলাম। নাগ মহাশয় আজ আর অন্য কিছুই খাইলেন না, ঐ ফলই হইল তাঁহার অদ্যকার আহার। আমিও কিছু কিছু খাইয়াছিলাম। আমরা নামিবার পূর্বে দেখিলাম, একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি মহাবীর

আসিয়া নীচে জমা হইতে সুরু করিল। নাগ মহাশয়ও দেখিতে পাইলেন, বলিলেন: দাদা, আর নয়,—অধিকারীরা এসেছে, আর আমাদের এখানে স্থান নেই।

নীচে নামিতে না নামিতেই একে একে তাহারা চকিতের মত গাছে উঠিয়া পড়িল। আমরা নিকটস্থ দেউলের মণ্ডপে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে সুরু করিলাম। আর তখন পশ্চিম দিকে মেঘের ফাঁকে একবার দিবাকরও দর্শন দিলেন। ভুবনেশ্বরে আসিয়া বোধ হয় আজ প্রথম সূর্য্য দেখিলাম। উজ্জ্বল কিরণরশ্মি যেন আনন্দ ঢালিয়া চারিদিক নাচাইয়া তুলিল এবং মনের সকল অবসাদ যেন কাটিয়া গেল। বলিলাম: দেখলেন, আমাদের মনের যেন সকল জড়তা কাটিয়ে এতদিন পর আজ মার্তণ্ডদেব দেখা দিলেন,—কি আনন্দ বলুন ত।

নাগ মহাশয় লাবণ্যোজ্জ্বল ছলছল্ নেত্রে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া,—একটি ধ্যান আবৃত্তি করিলেন। কি সুন্দর তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ,—

ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলী স্ফুরদধররুচা রঞ্জিতশ্চারুকেশো,
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণঃ প্রভাভিঃ।
বিশ্বাকাশাবকাশ গ্রহপতিশিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ,
সর্বানন্দপ্রদাতা হরিহরনমিতঃ পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ॥

ইনি যে আমাদের মূর্তিমান কল্যাণ। আমাদের জীব-সমাজের এর চেয়ে কে বড় আপনার আছে।—জানেন দাদা, আর্য্যেরা যতদিন এই প্রত্যক্ষ দেবতাকে জীবন্তভাবে, ব্যক্তিগত জাতিগত ভাবে জীবনের মধ্যে ধরেছিল, ততদিন তারা বিশ্ববরেণ্য ছিল তার পর ক্রমে ক্রমে যখন এঁকে ছেড়ে নানা মূর্তির দিকে, অনার্য্য-মিশ্রণের ফলে রজোগুণের প্রভাবে বিস্তৃত হতে লাগলেন, তখন থেকেই ক্রমে শৌর্য্য, বীর্য্য, আত্মজ্ঞান, ঔদার্য্য ক্ষয় হতে লাগল—যার শেষ পরিণাম এই বর্তমান অবস্থা।

—শিবনারায়ণ স্বামীর মতে জীবের এই একমাত্র প্রত্যক্ষ আদি দেব,—ইনিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং পরম গতি।

—সনাতন ধর্মের ত ইনিই আদি দেবতা, সেইজন্য ইনি অজ, তার পর আদিত্য, ইনিই একমাত্র সত্য, প্রত্যক্ষ দেবতা। এষ বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব ব্রহ্মাচৈব প্রজাপতি। মহেন্দ্রশ্চৈব কালশ্চ যমো বরুণ এব চ। নক্ষত্রগ্রহতারানামাধিপো বিশ্বতাপনঃ। এষ ভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ॥ ঈশ্বরঃ সর্ব-ভূতাত্মা পরমেষ্ঠী প্রজাপতি। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সংসার ভয়নাশনঃ॥ কালাত্মা সর্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ। দারিদ্র্যব্যসনধ্বংসী শ্রীমান্ দেবো দিবাকরঃ॥ এর কোনটি অতিরঞ্জিত বিশেষণ নয়, প্রত্যেকটি ঋষিগণের উপলব্ধ সত্য।

নাগ মহাশয় আনন্দে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, যেন একটি বালক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছে।

—কি বলব, অধঃপতনের কালিমা আমাদের জাতির আজ আর মাথা তোলবার যো রাখেনি, না হলে আজ জগৎকে ডেকে, গলায় যত জোর তত বড় করে বলবার কথা যে আমাদেরই—সূর্য্যদেবতা সনাতন। এখন পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে যাঁর রোগ আরোগ্য করবার শক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে আর আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বহু শত বর্ষ পূর্বে তাঁকে একমাত্র আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্যের দেবতা বলে জীবন্ত ভাবেই পূজা করে গেছেন। ইনি নারায়ণ, জীবের সর্ব-কালের পরমগতি।

6 -

—আমাদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ত শুধু সূর্য্যোপাসনাই, কিন্তু যথার্থ উপদেশের অভাবে আমরা গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলেছি,—অথচ এখনও আমাদের উপনয়ন সংস্কারটি প্রথা-অনুসারে বজায় আছে।

—মন্দের ভাল এইটুকু যে, উপাসনার এই মহান্ সত্যটি প্রথার মধ্যে এখনও আছে, কালে কোনও যোগাযোগে আবার পুনরুদ্দীপ্ত হতে পারে।

—হতে পারে নয়, বলুন হবে। হতে পারে শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

নাগ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন: দাদা, এটা ব্যক্তিগত কথা ত নয়, জাতির কথা হচ্চে। সমষ্টি, গোষ্ঠী, সর্বজনের কথা বলছি, কালের ব্যবধানের মধ্য দিয়েই না সেটা সম্ভব!—তবে, হবে বই কি, না হলে সন্ধ্যা-গায়ত্রীর কোনও অস্তিত্বই থাকত না যে। জাতিগত ভাবেই বলুন বা সমাজগত ভাবেই বলুন, পুরাতন বলে যেটির অস্তিত্ব আছে, যে ভাবেই হোক না কেন, তারই প্রয়োজন আছে। এ জাতির পদ্ধতি, আচার, এসকলই মানব-সমাজের চৈতন্য ও উন্নততর অধিকারের লক্ষণ। যতক্ষণ এর প্রয়োজন আছে ততক্ষণ এগুলি তিনিই রেখে দেবেন, মানুষ নানা ষড়যন্ত্র করেও একে লোপ করতে পারবে না।

আমি: আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে আমাদের আসল ধর্ম সেই পূর্বপুরুষের অধিকৃত, সাধনলব্ধ অনুভূতিকে পাওয়া,—যা আমরা এতদিন ধরে হারিয়ে বসেছি?—আমার স্বতই মনে হয়, আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম, যার গতি সেই হারানো পূর্বগত সিদ্ধমহাপুরুষদের উপলব্ধ তত্ত্বের দিকে।

নাগ মহাশয় আনন্দে, দীর্ঘ বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া স্নেহভরে আমার দাড়িতে হাত দিয়া বলিলেন: দাদা, আজ এই নির্জনে আমায় যে আনন্দ দিলেন, তা আর কি বলব! আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিদের এই যে মহান তত্ত্বজ্ঞান, তা জাগ্রত সূর্য্য-উপাসনার ফলেই হয়েছিল। মানুষের চৈতন্য এর চেয়ে আর বড় ধারণা তখন করতে পারেনি সেইজন্য আর এগিয়ে যেতে পারেনি, বংশানুক্রমে নীচের দিকেই বহুর মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। প্রাচীনতম উপাসনার পদ্ধতি যা আর্য্য সভ্যতার একমাত্র চরম পরিণতি তা সূর্য্যোপাসনার মধ্যেই আছে।

আমি: পরবর্তী যুগে উপনিষদের বা বেদান্তের যে ব্রহ্মজ্ঞান তা যে সূর্য্যোপাসনার প্রত্যক্ষ ফল তা আমরা একটু গভীর আলোচনা করলেই বুঝতে পারি।

নাগ: যোগদর্শনে ত স্পষ্টই নির্দেশ আছে যে, সূর্যে মনঃসংযম করলে বিশ্বজগতের জ্ঞান হয়। এই সূর্য্যকে ধরলে কিছুই জানতে বাকি থাকে না। পাশ্চাত্য জগতের বুদ্ধি বস্তুতান্ত্রিক সেইজন্যই প্রথমে সূর্য্যের মধ্যে আরোগ্য-কারী শক্তির উপর লক্ষ্য দিয়েছে। রোগময় মানব-সমাজে আরোগ্যই ঐকান্তিক কাম্য, তাই চিকিৎসার জন্য একদল তাঁকে ধরেছে, আবার এমন সময় আসবে যে পদার্থ বা বস্তুবিজ্ঞান-বিদেরা এই সূর্য্যকে ধরে বিশ্বের সকল তত্ত্বই আয়ত্ত করবেন, টেলিস্কোপ আর কাজে লাগবে না। আরও,—তখন বিদ্যুৎ তৈরী করতে আর যন্ত্র বা কোনও ডাইনামোর প্রয়োজন হবে না, যখন আসল ডাইনামোর নাগাল পাওয়া যাবে।

ভারতের অনুসন্ধান পদ্ধতিই আলাদা। এঁরা এমন একটি বস্তু চেয়েছিলেন যাকে পেলে আর কিছুই পেতে বাকি থাকে না, এঁদের বুদ্ধি

যন্ত্র-নির্মাণের দিকে যায় না—তাঁরা গোড়াতেই বুঝতেন যে, যন্ত্র কখনই সকল অভাব পূর্ণ করতে পারে না। যাঁকে জানলে আর কিছু জানতে বাকী থাকে না, তাঁরা এমনই একটি বস্তুর আবিষ্কারে সমাহিত হয়েছিলেন। সে এই তেজোময় মণ্ডলটি, বাইরের শরীর তাঁর তেজ, অন্তরে শুদ্ধ সর্বব্যাপী চৈতন্য। এইটি তাঁদের চরম আবিষ্কার—সে আবিষ্কারকে আধুনিক মানবের জাতিগত জীবনে উপলব্ধি করতে, প্রত্যক্ষ করতে অনেক কালই লাগবে।

—দেখুন, পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী এই সূর্য্য-উপাসনার বিষয় অনেক দিন থেকেই বলছেন (১৯১১ সাল), খুব অল্প লোকেই তা গ্রহণ করতে পেরেছে।

নাগ মহাশয় কতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক হইয়াই রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন: দেখুন, তাঁর তপস্যা, সাধারণের মধ্যে সত্য বস্তুতে নিষ্ঠা জাগাবার এই যে তাঁর চেষ্টা, তা কখনও বৃথা হবে না,—তবে কি জানেন, এই বস্তুতন্ত্রের যুগে ভারত-সন্তানের কথা, পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ-তৎপর আধুনিক যুগে ভারতের জনসমাজ প্রথমে কানেই নেবে না। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্ত্যদেশের সভ্য-সমাজ আয়ত্ত করে যখন ভারতসন্তানকে উপদেশ করবে তখনই এখানে এ তত্ত্ব জনসমাজে প্রাধান্য করবে।

বলিলাম: কি দুঃখের কথা—

নাগ মহাশয় অবিচলিত ভাবেই বলিলেন: সুখ দুঃখের কথা নয় ত, আসলে একটি তত্ত্বজ্ঞানের তরঙ্গ পূর্বদিক থেকে উঠে কালের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে যায়, আবার পশ্চিমকে প্লাবিত করে পূর্বে এসে সমাহিত হয়। এই ত জগৎ-তত্ত্বের খেলা আবহমান কাল থেকেই চলচে। এখানকার জ্ঞান এই ভাবেই একটি জাতির তপস্যার ফলে সেই দেশের একদিকে উদ্ভাসিত হয়ে সেই জাতিকে, সভ্যতাকে সফল করে দেশ-দেশান্তরে সংক্রামিত হয়ে অপর জাতিকে সফল করে থাকে। শেষে জগৎ-সভ্যতাকে বেষ্টন করে তাকে পূর্ণ করে তারি মধ্যে সমাহিত হয়ে যায়;—সকল তত্ত্বজ্ঞানের এই ত ইতিহাস। কত জাতি উঠল, কত গেল কিন্তু বেদ হ'ল সনাতন, এর ক্রিয়া অপ্রতিহত ভাবেই চলছে। আমাদের পূর্বপুরুষের উপলব্ধজ্ঞান যাকে বলছি সেটি ত এই একটি জাতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরকাল বাঁধা থাকবে না,—এক জনস্থানকে আলোকিত করে উপযুক্ত অপর জন-সমাজ বা সভ্যতাকে আলো দেবে। এই ভাবেই সৃষ্টিতে বেদের উদ্দেশ্য ত সফল হয়ে থাকে।

আমি: তা হলে, আমরা যেটা শ্লেষ করে বলে থাকি, বা আমাদের অধঃপতনের ফল বলে যেটাকে আমরা হালকা মনোভাবের পরিচয় বলেই জানি বা মনে করি তার মধ্যেও কতটা সত্য রয়েছে—তার অন্তরালে স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্য হয়েছে—সে বিষয়ে আমরা সাধারণে একেবারেই অন্ধ।

নাগ: তা ত হতেই পারে। আরে দাদা, এতটা ভেবে কেই বা দেখে, এতটা মাথা কেই বা ঘামায়, কিন্তু যে দেখে সে পায়—যে বুঝতে চায় সে ত বুঝতে পারে। চৈতন্য-রাজ্যের রাস্তা একেবারেই সোজা। তার পর দেখুন, এটা ত আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষ আর্য্য-ঋষিরা, আমরা যাঁদের বংশধর বলে গৌরব করি বা করছি, তাঁদের উপলব্ধজ্ঞান আমরা পাইনি বলেই না এখানে এবার পেছে এসেছি। আমাদের সেই তত্ত্বের বা

জ্ঞানের প্রয়োজন বলেই না আমাদের এই জাতির, এই সমাজের, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি—যাতে সেই বস্তুটি পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়। এই যে আকর্ষণ, টান একটি গুণের সম্পর্ক ধরে—এই যে আর্য্য-ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধানুরক্তি, এর ফলেই না আমাদের সিদ্ধি নিকটতর হচ্ছে। এটি এই ভারতের আবহাওয়ার একটা কত বড় মহৎ গুণ। অবশ্য জীব যেখানেই জন্মায় সেই দেশের, সমাজের, সেই পরিবারের বিশিষ্ট গুণগুলি পেয়ে যায় যাতে তার নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। আমরাও তাই করতে এসেছি।—কি বল দাদা।

আমি বলিলাম: একটা কথা আমার মনে হচ্ছে সেটা বলে ফেলি, হালকা ভাববেন না ত? শুনিয়া নাগ মহাশয় হাসিয়া কাঁচা পাকা লম্বা দাড়ির চুলগুলির উপর আংগুল চালাইতে লাগিলেন। বলিলেন: বলে ফেলুন দাদা, মনের মধ্যে জমা রেখে দেবেন না যেন।

আমি বলিলাম: দেখুন, আজ প্রায় দশ-বারো দিন হ'ল এই ভুবনেশ্বরে এসেছি, আজ সবে সূর্য্যের মুখ দেখলাম, সেই মূর্ত্তি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে কি অপূর্ব্ব আনন্দই এল। তার পর যে তত্ত্বটির আলোচনা চলল তার মূলও ঐ দিবাকর, তাহলে উনিই যে আমাদের একমাত্র জাগ্রত উপাস্য দেবতা তাই কি প্রমাণ হ'ল না?—

শুনিয়া নাগ মহাশয় তখন গম্ভীর হইয়া গেলেন। অস্তমিত সূর্য্যের পানে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তাকাইয়া কিন্নরকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন:—

ওঁ অজায় লোকত্রয়পাবনায়, পুতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়।
সূর্য্যায় লোক প্রলয়ান্তকায় নমো মহাকারুণিকোত্তমায়॥
ওঁ বিবস্বতে জ্ঞানভৃদন্তরাত্মনে, জগৎপ্রদীপ্তায় জগদ্ধিতৈষিণে।
স্বয়ম্ভুবে দীপ্তসহস্রচক্ষুষে, সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ॥
ওঁ সুরেরনেকৈঃ পরিসেবিতায়, হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্ময়ায়।
মহাত্মনে মোক্ষপ্রদায় তুভ্যম্ নমোঽস্তু তে বাসরকারণায়॥
ওঁ যন্মণ্ডলম্ জ্ঞানময়ম্ পবিত্রম্ ত্রিলোকপূণ্যম্ ত্রিগুণাত্মরূপম্
সমস্ততেজোময়দিব্যরূপম্ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥

ক্রমে তাঁহার দুনয়নে ধারা বহিতে লাগিল—গদ্গদকণ্ঠে তিনি গাহিতে লাগিলেন। এমন আনন্দময় স্তোত্র আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। আবৃত্তি চলিতে লাগিল—আদিত্য-হৃদয়ের শেষাংশ তিনি সবটুকুই আবৃত্তি করিয়া শেষ করিলেন—

ওঁ যন্মণ্ডলম। ব্রহ্মবিদো বদন্তি, গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ।
যন্মস্ত্রিণো বেদবিদাঃ স্মরন্তি, পুনাতু মাং তৎবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥
ওঁ যন্মণ্ডলম্ বেদবিদোপগীতম্, যদ্যোগিনাং যোগপথানুগম্যম্
তৎসর্ব্ববেদম্ প্রণমামি সূর্য্যম্, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥

সকল বর্ণ সকল রসের আকর এই জগৎপ্রাণ তেজোময় দিনদেবকে লোকে কত দিনে চিনিবে, কত দিনে হে জাগ্রত দেবতা, তোমার দিকে প্রজাসমষ্টি দৃষ্টি ফিরাইবে। হে অন্তর্য্যামি, তোমার অগোচর কিছুই নাই, তোমাতে নিষ্ঠা থাকিলে সকলই পাওয়া যায়, জীবন সফল হয়, তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াই

আমরা রোগে, শোকে, জরাগ্রস্ত হইয়া অকালে, অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া গতায়ু হইতেছি—কে একথা বুঝিবে!

আমরা বহুক্ষণ শান্তচিত্তে সেই আনন্দঘন অনুভব লইয়া কাটাইয়া দিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। নাগ মহাশয় কোনও কথা না বলিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে অনেকক্ষণ কাটিল, শেষে নাগ মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেনঃ চলুন, যাওয়া যাক, রাত হয়ে গেল।

আমি বলিলামঃ তা গেল ত গেল, এখানে আমাদের ত কোনও বন্ধন নেই, আমরা এখন মুক্ত, যদি ইচ্ছা হয় থাকুন না—আমার যাবার তাড়া নেই।

বলিলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে শিবানন্দের কথা উদিত হইল। কোথাও যদি যাই, ফিরিতে রাত্র হইয়া গেলে শিবানন্দ মহা ত্যক্ত করে, কৈফিয়ৎ চায়। বলে, আশ্রমে সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিবার নিয়ম। একথা বার বার তোমাকে বলিতে হয় কেন?

যাহা হউক, নাগ মহাশয় আর থাকিতে চাহিলেন না, বলিলেনঃ দাদা, আজ এই পর্য্যন্ত। আজিকার এই সূর্য্যদেব-প্রসঙ্গ মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আমিও সে রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

॥ ৭ ॥

আশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্বেই শিবানন্দের কাছে কিরূপ সম্ভাষণ পাইব, কতকটা অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আসলে সেদিন ততটা কিছু ঘটিল না। তবে দ্বার হইতেই শিবানন্দ আরম্ভ করিলঃ

—তোমকো আজ রাজমজুরলোককো হিসাব সব ঠিক করনা পড়েগা! আজ ছয় রোজ পূরা হিসাব কিয়া নহি।

আমি ত 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া লাগিয়া গেলাম। কৃতজ্ঞ-মনে তখন পরমেশ্বরকে এই বলিয়া স্মরণ করিলাম যে, শিবানন্দের কোপ হইতে বুঝি আজ রক্ষা পাইলাম। কিন্তু আসলে তা পাই নাই। আমার অদৃষ্ট!

বলিতে হইবে না যে আমার উপর রাজমজুরদের হিসাব-নিকাশের ভার আছে, আশ্রমের যে সিঁড়ি, নূতন ঘর নির্মাণ হইতেছে তাহার খবরদারীও অল্পাধিক আমার কর্তব্যের মধ্যে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমি খবরদারীর কাজ হইতে সরিয়া পড়িতেছি তাহা শিবানন্দ লক্ষ্য করিতেছিল। আজ সে বলিয়া বসিল যে, উহা সে মহারাজকে লিখিয়া দিয়াছে। আমি 'আচ্ছা' বলিয়া হিসাবেই মন লাগাইলাম।

অনেক হিসাব করিলাম, প্রায় দেড় ঘণ্টার উপর, সকল দফাই মিলিল—কিন্তু গতকাল তারিখের সাড়ে তিন টাকার একটা খরচ হিসাবের মধ্যে কিছুতেই মিলাইতে পারিলাম না। পূর্ব সপ্তাহেও আমার হিসাবে কিছু ভুল হইয়াছিল—সেটাও গরমিল হইয়া আছে। টাকা থাকে শিবানন্দের কাছে, আর হিসাব করি আমি। সুতরাং আমার তছরূপাতের ভয় ছিল না, কিন্তু শিবানন্দ দোষটা আমারই ঘাড়ে ফেলিতে চায় এই বলিয়া যে, খরচটা আমি তাহার বলা সত্ত্বেও মনোযোগ করিয়া লিখি নাই সুতরাং মহারাজের কাজে গাফিলি করিয়াছি। আমি জ্ঞানত হিসাবের কাজে অমনোযোগী হই নাই। তবে যোগফলে ভুল-চুক হওয়া আমার পক্ষে যে অসম্ভব তা নয়। মা সরস্বতী অঙ্ক বিদ্যায়

পাঠশালার জীবন হইতেই আমায় রেহাই দিয়াছেন, সেইজন্য অঙ্কের সঙ্গে আমার চিরবিরোধ। কি করিব, এক্ষেত্রে দফায় দফায় মিলাইয়াও যখন কিছু করিতে পারিলাম না—তখন শিবানন্দের স্মরণশক্তির শরণাপন্ন হইলাম। বলিলাম: তোমার কালকের খরচগুলি আর একবার মনে করিয়া বল দেখি। শিবানন্দের ধারণা তাহার কখনও ভুল হয় না।

তাহাকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেখিতে বলায় শিবানন্দ ত একেবারে অগ্নিমূর্তি। এত্‌না দফা বোল চুকা, তুমারা খ্যাল নহি রহতা?—লেও ফের লিখো, ফের মিলাও। পড়াশুনা কুছ কিয়া নহি, বাঙ্গালী তোম, কলিজমে পড়কে কেয়া শিখা, ইত্যাদি। যাই হোক, সে আবার বলিয়া গেল, আবার দফায় দফায় মিলাইলাম কিন্তু সেই কালকের তবিলে সাড়ে তিন টাকা ঘাটতি রহিয়া গেল। তার পর আমি তাহাকে আবার যখন বেশ করিয়া মনে করিয়া দেখিতে বলিলাম, সে কোনও কথা না কহিয়া উঠিয়া টাকা পয়সার থলিটা ঝনাৎ করিয়া আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল এবং চলিয়া গেল।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, এরকম করিয়া ত আর বেশী দিন চলিবে না, আমার সকল কথা মহারাজকে লিখিব ঠিক করিলাম। যাহা হোক এখন উঠিলাম,— শিবানন্দকে বলিলাম: দেখ, হিসাবে ওরকম একটু ভুলচুক হয় তার জন্য রাগ করতে আছে কি? এখন টাকা-কড়ি তুলে চল আমায় খেতে দেবে। এ আশ্রমে মোটে আমরা দুটি প্রাণী থাকি, এই দুজনের মধ্যে রাগারাগি গোলমাল ভাল কি?

সে কথা শুনিল, টাকার থলিটি উঠাইয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া আমায় ভাতা দিতে দিতে বলিল: মহারাজ ক্যা সমঝে গা, হামারা পাস রুপেয়া রহতা হামকো চোর সমঝে গা। তোমরা ক্যা—

আমি বলিলাম: যদি ইয়াদ ভুল হো যায় তো ক্যা হোয়গা?

যেই ইয়াদ ভুলের কথা বলা, আবার সে মহা গরম হইয়া গেল, বলিল: হাম এতনা রোজ সে ইঁহা রহা হামরা ইয়াদ কভি ভুল নেহি হোতা, তোমরা লিখনে কো ভুল হুয়া। মহারাজকো পয়সা এয়সাই যয়েগা?

যাই হোক, আহারাদির পর মহারাজকে এইভাবে একখানি পত্র লিখিয়া দিলাম যে, হিসাব-নিকাশের কাজে আমার ভুল হয়, মিলাইতে পারি না, আপনি

অন্য ব্যবস্থা করুন। আর, এখানে আমি যে শান্তির আশায় আসিয়াছি, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিতেছে না। যে বিষয় ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইয়াছি যদি এখানে আমায় তাহাই লইয়া মাথা ঘামাইতে হয়, তাহা হইলে আমার কি হইল? আমি কি এইসব করিতেই ঘর ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি? আপনি আমায় মুক্তি দিবেন।

পরদিন যথাসময়ে পত্রখানি নিজের হাতে ডাকে ছাড়িয়া দিলাম। উত্তর আসিতে দশ-বারো দিনের কম নয়। ইতিমধ্যে আমি একটু স্বাধীনভাবেই বেড়াইতে লাগিলাম। রাজমজুরদের কাজের তদারক এক রকম ছাড়িয়া দিলাম, আশ্রমের বাহিরে নাগ মহাশয়ের কাছে অথবা অন্য কোথাও বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিতাম।

বিন্দু-সরোবরের তীরে একদিন বিকালে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ একদল নবাগত যাত্রী দেখিতে পাইলাম। বিন্দু-সরোবরের তীরেই তাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এদিকেই আসিতে লাগিলেন দেখিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। নিকটে গিয়া দেখি, আমাদের কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন তাঁহাদের মধ্যে। ভুবনেশ্বরে আসিবার পূর্বে দুই-এক দিন পুরীতেও ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। নির্জন ভুবনেশ্বরে তাঁহাকে দেখিয়া মহানন্দে নিকটস্থ হইলাম। তিনিও আলাপ করিবার জন্য যখন অগ্রসর হইলেন তখন আমরা মিলিলাম। এইখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল।

তাঁহার বক্তৃতা থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে কতবার শুনিয়াছি, দেবালয়ে এবং অন্যান্য স্থানেও বহুবার শুনিয়াছি। ভাগবতের ব্যাখ্যান তাঁহার মুখে বড়ই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক। দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার ভাগবতের এই প্রকার ব্যাখ্যা তখনকার দিনে বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ আগ্রহের বস্তু এবং আনন্দের বিষয় ছিল। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে নির্জনতার মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া যেন ধন্য হইলাম। তাঁহার সঙ্গ-সংযোগের ফলে আমার অনেক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছিল।

সদালাপী লোকটি, সরল, অকপট এবং সুচতুর। বয়স প্রায় বত্রিশের কাছে, খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, পূর্ণ মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ললাট, কেশগুলি দীর্ঘ—প্রায় পিঠের উপর ঝুলিতেছে। আমার চক্ষে তাঁর মূর্তিটি ভালই লাগিল। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়া সেখানে আমাদের আলাপ এবং পরিচয় হইল।

পরিচয় প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, এখানে,—মহাপাত্র একজন ভদ্র গৃহস্থ এবং সাহিত্যিক,—সামাজিক সংস্কারে তাঁর অদম্য উৎসাহ। তিনিই ভাগবতরত্নকে এখানে আনাইয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহারই অতিথি। মন্দিরে আজ সন্ধ্যায় তাঁর ভাগবতের বক্তৃতা।

ভাগবতরত্নের বাড়ি বীরভূমের সিউড়িতে। তন্ত্রের স্থানগুলি দেখিবার এবং তান্ত্রিক সাধু-সঙ্গ করিবার আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জানিয়া তিনি তাঁর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন: আমাদের বীরভূমে তন্ত্রের অনেকগুলি পীঠস্থান আছে। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাব আর সেখানে আপনি অনেক কিছুই দেখিতে, জানতে পারবেন। এখানে কোথায় আছেন? আমি কেশবানন্দের আশ্রমের কথা বলিলাম। তার পর সে প্রসঙ্গে

সকল কথাই বলিলাম। আমার এখানকার অবস্থাটি তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন।

সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন: চলুন, আমার সঙ্গেই চলুন। আমি বলিলাম: সে তো হবে না, মহারাজের আদেশ এলে তখন যাব। তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে বীরভূমে যাব। বীরভূমের পীঠস্থানগুলি দেখতেই হবে। আজ ত চলুন, মন্দিরে আপনার কথা শুনে আসা যাক।

কতক্ষণ আমাদের নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলাম যে, তাঁর বক্তৃতায় আমরা মুগ্ধ, তাঁর বলিবার ধরণটি সুন্দর, তাঁর মধ্যে কতকটা যেন বিপিনচন্দ্রের (পাল) প্রভাব দেখিতে পাই। তিনি তাহাতে বলিলেন যে, পালের বাঙ্গলা বক্তৃতা অতীব ওজস্বিনী এবং প্রাঞ্জল,—আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ তাহাতে ত আর কোন সন্দেহ নাই। সেই সূত্রে কিছু প্রভাব আসিয়া পড়া আশ্চর্য্য নহে। তবে এখনকার দিনে বক্তৃতায় পাল বাঙ্গলায় অদ্বিতীয়, এ কথায় সকলেই একমত।

এ কথা সত্য যে, পাল মহাশয়ের বক্তৃতা তখনকার দিনে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে নির্ঘাৎ,—তবে তাহার মধ্যে কিন্তু একটু আছে বটে মনে হয়। অনেকেই বলেন, গভীর চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান এবং আন্তরিকতা থাকিলে তাঁর বক্তৃতা যথার্থই উৎকৃষ্ট হইত। আসলে এ সময়টা যেন উত্তেজনামূলক বক্তৃতারই যুগ। তাই এখন তাঁর প্রভাব—নয় কি? শেষে আমাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হইল যে যাঁর কর্ম যত পরিমাণে আন্তরিক, যাঁর ত্যাগের সাহস আছে, চিন্তা যাঁর গভীর, তিনিই দেশের কল্যাণ করিতে পারিবেন। উত্তেজনামূলক বক্তৃতার প্রভাব বেশী দিন থাকিবে না। ঋতু পরিবর্তনের মতই উড়িয়া যাইবে।

সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্বে আমরা সকলে ভুবনেশ্বর নাটমন্দিরে সমবেত হইলাম। বাঙ্গালী আট-দশ জন ছিলেন,—তার মধ্যে ছিলেন ভুবনেশ্বর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। ভদ্র ব্যক্তি প্রবীণ, চেহারায় তাঁর সম্ভ্রম সূচনা করে। শুনিলাম, তিনি অবসরপ্রাপ্ত সব-জজ, কয়েক বৎসর ভুবনেশ্বর ষ্টেটের কাজে এইখানেই আছেন। শ্রোতার মধ্যে বেশীর ভাগ স্থানীয় উৎকলবাসী,—তার মধ্যে পাণ্ডারাই প্রধান। সর্ব সুদ্ধ পঁচিশ হইতে ত্রিশ জনের মধ্যেই। কয়েক জন প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তার মধ্যে ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষাতেই কথা হইল। তবে সামাজিক, প্রাদেশিক এবং ভাষাগত বৈষম্য থাকায় ভাল জমিল না। মধ্যে আবার একটু বিতর্কও হইয়া গেল।

ভাগবতের বিষয়ই বক্তৃতা রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্বই তার মধ্যে মুখ্য। এই ভাবের কথাই ব্যাখ্যানের মধ্যে ছিল। একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় হঠাৎ একটি প্রতিবাদ-সূচক প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। রাধাকে পাইলেন কোথা? ভাগবতে রাধার কথা নাই, সুতরাং রাধা ত অপ্রামাণ্য।

কুলদাবাবু তখন উত্তরে টীকাকারের কথা বলিলেন। প্রধানা গোপীকেই রাধা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, বক্তৃতা হইয়া গেল। তখন ভুবনেশ্বর ষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিলেন—উভয়কেই আগামী কল্য তাঁহার আবাসে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

পর দিন শিবানন্দকে—আশ্রমে আহার করিব না বলিয়া চলিয়া গেলাম। কুলদাবাবুর বাসায় গিয়া কথাবার্তায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলাম। তার পর ম্যানেজার মহাশয়ের ওখানে যাওয়া গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানেও সেই বিষন্নী সাধুর কথাই হইল। যে

ব্রহ্মচারী সাধুর কথা স্থানীয় কয়েকজন নাগ মহাশয়ের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন, ম্যানেজার মহাশয় তাঁরই কথা বলিলেন। এ রকম বিষয়ী, মামলাবাজ সাধু ত দেখি নাই। জায়গা জমির উপর লোলুপ দৃষ্টি, অন্যায় অধিকারের কথাও বলিলেন। সাধু খোঁজা আমার কাজ—আমি পূর্বে একবার তাঁহার খোঁজে আসিয়াছিলাম। তিনি তখন পুরীতে রথ দেখিতে গিয়াছিলেন। কাজেই আমার আর তাঁর সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। পরে তাঁর সম্বন্ধে এই সকল শুনিয়া আমার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আবার এখানেও যখন শুনিলাম তখন একটু বিচলিত হইলাম।

সেই সাধুর পরিচয় যথার্থরূপে জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। এতগুলি লোকের অভিযোগ সত্য কি না, জানিবার জন্য অন্তরে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সংকল্প করিলাম, আজই বৈকালে একবার যাইব। তিনি পুরী হইতে এতদিনে ফিরিয়া থাকিবেন।

ম্যানেজার মহাশয়ের সৌজন্যে এই বিদেশে স্বদেশীয় অতিথির প্রতি যত্নের ত্রুটি হইল না। পরিতোষ আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি ওখান হইতে ছুটি লইয়া বাহির হইলাম এবং অল্পক্ষণেই সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমদ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম।

তখন তিনি সবে নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। স্থূল শরীর, গাঢ় শ্যাম বর্ণ, দেখিতে অনেকটা তান্ত্রিক কাপালিকের মত। একখানি প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ারে শুইয়াছিলেন। গলার স্বর তাঁর বেশ মিষ্ট। আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করা হয়, কোথায় থাকা হয়, কি উপলক্ষে আগমন, লেখাপড়া কতদূর হইয়াছে, বিবাহ হইয়াছে কি না, দীক্ষা হইয়াছে কি না, ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম: আপনার নামে কিছু অভিযোগ আছে। এতক্ষণ দাঁড়াইয়াই ছিলাম, এইবার তিনি, মেজেতে মাদুর পাতা ছিল দেখাইয়া, বসিতে আজ্ঞা করিলেন।

তিনি এভাবের কোনও কথা হঠাৎ একজন আগন্তুকের মুখে শুনিবেন তাহা আশা করেন নাই। যেন একটু বিস্মিত হইলেন,—পরে বলিলেন: কি রকম? বলিলাম যে, সাধু বা সন্ন্যাসীদের এভাবে বদ্ধ বিষয়ীর মত ব্যবহার শুনিয়া আমায় বেদনা দিয়াছে, তাই আপনার কাছে সত্য ব্যাপারটি জানিবার জন্যই আসিয়াছি।

তিনি অল্পক্ষণ গম্ভীর হইয়া গেলেন, পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন: তোমার এ সকল কথায় কাজ কি? তোমায় ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে, যার তার কথায় কান দিয়ে কোন লাভ নেই। হাতি চলে বাজার মে, কুত্তা ভুখে হাজার—সাধুন কো দুর্ভাব নেই যব নিন্দে সংসার।

এমনভাবে বলিলেন যাহাতে এ প্রসঙ্গ আলোচনার প্রবৃত্তি আর রহিল না, যেন এইখানেই উহা শেষ হইয়া গেল। আমি কিন্তু শান্ত হইতে পারিলাম না। অথচ কি যে বলিব তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: কার মুখে এ সকল শুনেছ?

ভাবিয়া দেখিলাম, যদি নাগ মহাশয়ের স্থানে এই সকল শুনিয়াছি অথবা ম্যানেজারের ওখানে তাঁর মুখে এসকল শুনিয়াছি বলি তাহা হইলে তাঁদের প্রতি হয়ত মন্দ ভাব পোষণ করিতে পারেন। ভাবিবেন, ইঁহারাই তাঁর

বিরুদ্ধে দল পাকাইতেছেন। এই সকল ভাবিয়া বলিলাম: তা আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে এখানকার সাধারণের মধ্যেই শুনেছি। এখানে কোন লোকেরই আমি পরিচিত নই, আমারও কেউ পরিচিত নেই—আপনার প্রসঙ্গ এখানকার অনেকেরই আলোচনার বিষয়। পূর্বে আপনি যখন পুরীতে গিয়েছিলেন তখন একবার আপনার খোঁজে এসেছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ বসিবার পর মনে হইল, কাজ কি আমার এত মাথা ব্যথায়, সে যা আছে তা থাকুক, আমি দেখি যদি সাধুসঙ্গের ফল কিছু লাভ হয়। লোকের অভিযোগের কথা সত্য কি মিথ্যা আমার কি দরকার। ভাবিতেছি, সাক্ষাৎ লোকটির সংস্রবে আসিয়া কেমন মনের ভাবটা বদলাইয়া গেল—আর তাঁহার নিন্দার কথা শুনিতে বা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি মাত্র নাই। এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতেছি—তিনি বলিলেন: তোমার পিতামাতা আছেন কি না?

তার পর বলিলেন: তোমার দীক্ষা হয়েছে,—কোথায় দীক্ষা নিয়েছ?

উপনয়নই ত দীক্ষা, আবার দীক্ষা কি?

তিনি বলিলেন: ও ত বৈদিক দীক্ষা, তান্ত্রিক দীক্ষা ত হয়নি?

বলিলাম: দীক্ষা ত একবার হলেই হল। আর প্রণবই ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

তিনি বলিলেন: সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর বৈদিক দীক্ষাতেই কাজ হয়—গৃহীদের তান্ত্রিক দীক্ষা চাই।

আমি শুনিয়াছিলাম বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাব শুধু সন্ন্যাস নয় আমাদের গার্হস্থ্য জীবনকেও পাইয়া বসিয়াছে। শংকরাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাদি; সন্ন্যাসের প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশ হইতে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু গার্হস্থ্য বিভাগে কুলগুরুগণের শাসন অটুট রহিল। নানা দিক দিয়া তান্ত্রিক সাধনের সারভাগ সকল জাতির মধ্যে এদেশের গার্হস্থ্য জীবনকে আচ্ছন্ন করিল,—আজও তাহার প্রভাব স্পষ্টই বর্তমান। যাহা হউক, বলিলাম: যদি আমার উপনয়নের দীক্ষাকেই দৃঢ় করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রণবেরই সাধন করি, তাহা হইলে ক্ষতি কি?

বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচারীজী বলিলেন: তোমার বাপ পিতামহ যা ক'রে গেছেন তাই করবে, না কি, নিজের যা খুসি, ধর্মের ব্যভিচার করতে চাও? তোমাদের ঐ হয়েছে, আজকাল দুপাতা ইংরেজী পড়ে সকলেই এক এক অবতার।

তাঁর এই প্রকার মন্তব্য ভিত্তিশূন্য—জ্ঞানের অভাবই সূচনা করে। যাক, তাঁর এ ভাবটি আমার ভাল লাগিল না, আমিও মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং দৃঢ়ভাবেই বলিলাম: বৈদিক দীক্ষাও রইল, তার পর আবার তান্ত্রিক দীক্ষাও একটা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। দুটির প্রয়োজন কি এটা জানতে কৌতূহল হওয়াটা ব্যভিচার না কি? বাপ পিতামহ যা ভাল বুঝেছেন তা করেছেন, তাঁদের কাজের জবাব তাঁরা দেবেন, আমাদের—

তিনি: তোমাদের বাপ পিতামহের চেয়ে কি মনে কর তোমরা বেশী জ্ঞানী হয়েচ নাকি?

আমি: আপনার কথার ভাবটা এই যে, আমরা ক্রমাগত বংশবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়েই চলেছি। সোজা কথায় আপনার মতে এখনকার গৃহস্থ

ভদ্রের বংশধরেরা ক্রমে অধঃপাতেই যাচ্চে আর ঘোরতর অজ্ঞান হয়েই পড়ছে। এই নয় কি?

তিনিঃ হাঁ, তা তো পড়ছেই, দুপাতা ইংরেজী পড়ে বক্তৃতা করতে পারলেই কি জ্ঞান হ'ল? পূর্বপুরুষদের পথানুসরণ করবার প্রবৃত্তি নেই, দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই, সাধু-সন্ন্যাসীর সম্মান নেই, পুজো নেই; দেশ ত উচ্ছন্ন যেতেই বসেছে।

আমিঃ আমার মনে হয় পুরানো ক্রিয়াকর্ম, আচারের উপর আপনার অন্ধ আকর্ষণ—সেই গোঁড়ামিই আসল ব্যাপারটি দেখতে দিচ্চে না, আপনার সত্য দৃষ্টিকে অন্ধ ক'রে দিয়েছে।

তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেনঃ দেখ, তোমরা যে মূর্খ তার প্রমাণ তোমরা সাধু গুরু এদের সম্মান জান না, কি ক'রে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয় তা জান না।

আমিঃ আমারও বিশ্বাস আপনি ভগবানের সত্য নিয়মের ব্যভিচার করেছেন, আর আমি যদি মূর্খই হই তাতে বেশী দুঃখ নেই কিন্তু আপনি যদি মূর্খ হন, কি ভণ্ড হন, সেটা খুব বেশী দুঃখের কথা নয় কি?

হঠাৎ তাঁহার চক্ষু দুটি মহারোষে জ্বলিয়া উঠিল, বোধ হয় যেন ভস্ম করিবার ইচ্ছা। যেন মূর্তিমান ক্রোধ। সেই চণ্ডমূর্তি দেখিয়া আমার লোকটির উপর যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তাহাও একেবারে চলিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—দ্যাখ,—বলিয়া হঠাৎ সামলাইয়া লইলেন। সেই ভাব-পরিবর্তন একটি দেখিবার মত জিনিস। তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পর মুখে হাসি আনিয়া বলিলেনঃ তোমরা বালক, তোমাদের উপর রাগ করব, না দুঃখ করব কিছু বুঝতে পারছি না।

কোনও কথা না কহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেনঃ যাক্, ছেড়ে দাও ও-সব, যদি তোমার কিছু জানবার থাকে ত সেই কথা বল, আমি বুঝিয়ে দেব বৈকি। আমরা না বুঝিয়ে দিলে কে তোমাদের বুঝিয়ে দেবে। তবে সাধু-গুরুর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে বিনয়ের সঙ্গেই করা চাই, অনুগত হওয়া চাই, আজ্ঞাধীন ভাবেই তাঁদের কাছে প্রশ্ন করতে হয়।

আর কেন, এইব্যার উঠিয়া যাওয়াই ত ভাল, আর উঠিয়া যাইতেও আমার ইচ্ছা হইতেছিল বটে, কিন্তু যদি তাহা করি তাহা হইলে ইনি মনে আঘাত পাইবেন, আর আমার পক্ষে হয়ত অসৌজন্য প্রকাশ পাইবে। ইহার উপরে আরও কিছু কথা ছিল। দেখা যাক্ না শেষ অবধি যদি কিছু খবর পাওয়া যায়, এখানে আসাটা একেবারেই কি বৃথা হইবে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছি দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কুলগুরুর উপর বিশ্বাস আছে কি?

সঙ্গে সঙ্গেই আমি উত্তর দিলামঃ না। তিনি ফের জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কেন?

আমিঃ আমাদের মনের মধ্যে গুরুর যে আদর্শ আছে তা কুলগুরুর সম্পর্কে এসে বাধা পায়। তাঁরা আমাদের মতই গৃহী, আমাদের মতই লোভী, আমাদের মত ধনলোলুপ, আমাদের সকল দুর্বলতাই তাঁদের আছে। এ দেখেও যদি তাঁদের প্রতি আপনি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার দাবী করেন তা হলে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

—ওই তোমাদের কেমন একটা গোঁ। কেন? হোন না তিনি খারাপ, হোন না তিনি গৃহী, তাতে কি আমার এলোগেলো, আমার মন্ত্রই তো সব, যদ্যাপ আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।—এ ভাবটি কেমন বল দেখি?

—আগে,—সেকালে ঐ ভাবটির মাহাত্ম্য যেমন তাঁরা বুঝতেন আমরা একালে তেমন বুঝতে পারি না, বুঝতে প্রবৃত্তিও হয় না। অসৎ-এর সঙ্গে আপোষ করা ভাল মনে হয় না। যদিও ভাবটি সহজ ও সরল বটে।

তোমাদের কুলগুরু আছেন?

—আছেন, আমার মার গুরু।

—তাঁর ছেলেপুলে আছে?

—হাঁ, ছয়টি ছেলে, চারটি মেয়ে।

তাঁর ছেলের মধ্যে বাপের কাজে কেউ আছে কি না, ছেলেরা কি করে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম: যতদূর জানি, বড়টি ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করে, বারো টাকা মাইনে,—তার বিয়ে দিয়েছেন গত বছরে; মেজটি চা সিগারেট, পান বিড়ির দোকান করেছে; তার পরেরটি মোটর চালাতে শিখছে; আর একটি থিয়েটার করে, তার পরেরটি পাঠশালে যায়, ছোটটি সাত-আট মাসের।

—তা হোক, গুরু ত্যাগ করা উচিত নয়—তবে তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়ে পরে ক্রম-দীক্ষা নিতে পার।

—কার গুরু?

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন: কেন, তোমাদের বংশের গুরু, কুলগুরু!

আমি বলিলাম: আমাদের বংশের সকলকে নির্বিচারে কি তাঁকেই গুরু করতে হবে এমন কোনও ভগবানের নিয়ম আছে? তাঁরা উপযুক্ত কি না, যোগ্যতা আছে কি না,—

তিনি যেন আবার গরম হইতে আরম্ভ করিলেন; প্রকৃতি বা স্বভাবেরই দোষ বা গুণ যাই হোক। বলিলেন: কি! গুরুর যোগ্যতা তুমি বিচার করবে! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা!

—সে বিচার আমি ছাড়া আর কে করবে? যিনি গুরু হবেন, আমার সর্ব সংশয় ছেদ যদি না করতে পারেন, শ্রদ্ধা যদি তিনি আকর্ষণ না করতে পারেন, কি করে তিনি আমার গুরু হবেন?

—না না, ওসব জ্যাঠামি ধর্মরাজ্যে চলবে না। কুলপ্রথা ত্যাগ করলে সর্বনাশ হবে। গুরুর অভিশাপে বংশ জ্বলে যাবে। আজকালকার সব ছেলেরা ঐ করেই ত উচ্ছন্ন গেল। নিজের পছন্দমত বিয়ে করব, নিজের পছন্দমত গুরু করব; আরে তাই যদি হবে তো শাস্ত্রে কুলগুরু বলেছে কেন? হাঁ, যদি গুরুবংশ না থাকে তাহলে অন্য কথা বটে।

আমি বলিলাম: তা যদি হয় তাহলে আমাদের গুরুবংশ নাই, আমার পিতা সেইজন্য দীক্ষা নেন নি।

তিনি: তবে এই যে বললে তোমার মার গুরু আছেন।

আমি বলিলাম: আমাদের পিতৃকুলের গুরুবংশ লোপ হওয়ায় মা আমার জ্যাঠাইমার মামাদের গুরুপুত্রের কাছে একাই দীক্ষা নিয়েছেন। আমি প্রথমে তাঁকেই কুলগুরু মনে করেছিলাম,—ঠিক অতটা ভেবে দেখিনি।

তিনি শুনিয়া বলিলেন: যাক্, তা তোমাদের যদি কুলগুরু না থাকে তাহলে আলাদা কথা, কিন্তু তা বলে গৃহী লোকের সন্ন্যাসীগুরু ঠিক না, গৃহী গুরুই দরকার।

আমি বলিলাম: সব রোগীর কি একই ওষুধ? গৃহী গুরু কে কোথায় আছেন খুঁজতে যাব?

তিনি বলিলেন: চেষ্টা ক'রে না পাওয়া যায় ত তাহলে অন্ততঃ আগে গৃহী ছিলেন পরে ব্রহ্মচারী হয়েছেন এমন দেখে গুরু করতে হবে। একেবারে সন্ন্যাসী গুরু করা হবে না।

যাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছিল, ইনি আগে গৃহী ছিলেন, একটি ছেলে আছে, স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় ব্রহ্মচারী হইয়াছেন এমনই একটা খবর শুনিয়াছিলাম ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে।

আমি: যাক্, আসলে মন্ত্র নেওয়ার কথা নয়,—তান্ত্রিক দীক্ষার উদ্দেশ্যই বা কি, বৈদিক দীক্ষারই বা উদ্দেশ্য কি তাই জানতে কৌতূহল ছিল।

তিনি: গৃহী লোকের তান্ত্রিক দীক্ষার কত ফল তা চট্ ক'রে এখন তোমার কাছে কি ক'রে বলব? দীক্ষা নাও, মন্ত্র পাও, জপ কর, অভিষেক হোক, পুরশ্চরণ কর, লক্ষ জপ কর, তবে বুঝবে যে কি ব্যাপার,—শক্তির রাজ্যের মধ্যে ঢুকলে তখন গুহ্য ব্যাপার সব বুঝবে।

আর নয়, এখন উঠিতে পারিলেই বাঁচি। ভগবান রক্ষা করুন।

॥ ৮ ॥

ইতিমধ্যে মহানন্দ বলিয়া একজন অপূর্ব সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। প্রথমে যেদিন গেলাম তিনি কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিলাম। দুইজন লোক ছিলেন, তাহাদের সঙ্গেও যে তিনি মনোযোগ করিয়া কথা কহিলেন তাহাও বোধ হইল না। দু'একটি কথা কহিলেন, তাহাও এত ধীরে যে আমার কানে পেঁছাইল না।

তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। নিম্নাঙ্গ একেবারে স্থির, কেবল হাত দুটি মাঝে-মাঝে নাড়িতেছিলেন। মুণ্ডিত-মস্তকের উপর যৎসামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচা-পাকা চুল গজাইয়াছে। গৌরবর্ণ মূর্তি, যেন অনেকটা হরিদ্বারের ভোলানন্দ-গিরির মত। ভুরু দুটি খুব কালো। লম্বা-ধরণের মুখ। পরিধানে সাদা কাপড়,—গৈরিকের সম্পর্ক নাই। গলায় একটি মালা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক মিলাইয়া একটির পর একটি গাঁথা। ক্ষীণ শরীর।

পরদিন গেলাম ক্ষুদ্র একটি কুঁড়ের মধ্যে, চারিদিকে বাগান। ঘরখানির চওড়া দাওয়ার উপরে তিনি সমস্ত দিন আসনে থাকেন। আমি সেদিন যখন গেলাম, তখন কেহ ছিল না। নির্জন আশ্রমে অপর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে করিলাম যে ভালই হইয়াছে, কথা কহিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যাইবে। প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি অভয় মুদ্রা দেখাইয়া আশীর্বাদ করিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। মনে হইল যেন আমার কথাই ভাবিতেছিলেন। আমিও স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। কথা কহিবার প্রবৃত্তিই হইল না। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টার উপর সময় চলিয়া গেল

এমন সময় আর একজন মোটাসোটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক রেশমের পাঞ্জাবী ও চাদর পরিয়া আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বসিলেন।

আগন্তুক ধনবান্ বিষয়ী লোক বলিয়াই মনে হইল। সাধু কিন্তু তাহার সঙ্গেও কোন কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ তিনি বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। যেন কথা কহিবার সাধ্য নাই। পরে যেন অসহ্য হইয়াই বলিলেন : স্বামীজি, তাহলে কি আজ বিকেলে আমাদের ওখানে যাওয়া হবে?

একটু ভাবিয়া সাধু বাংলায় বলিলেন : না, দরকার নাই। ভদ্রলোকটি তখন কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন : কেন, কাল ত আমি বলে গিয়েছি, আপনিও ত—

—তোমার বাড়ীতে আমায় নিয়ে গিয়ে কি উপকার হবে? ও অসুখ তো আমি আগেই বলেছি,—এখন সারবে না। যে কারণে ওটা হয়েছে তার ভোগ পূর্ণ না হলে, কারো সাধ্য নেই যে আরোগ্য করতে পারে।

শুনিয়া তিনি বলিলেন : আপনারা ত ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারেন। তাহাতে সাধু আবার বলিলেন : যদি কেউ মন্ত্রশক্তির দ্বারা করে তা হলে যিনি আরোগ্য করবেন তাঁকে কঠিন ভোগের মধ্যে পড়তে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোন কঠিন কাজ হয় না, হবার যো নেই যে।

কথাগুলি শুনিয়া ভদ্রলোকটি আমার দিকে একবার চাহিলেন এবং কিছু বিমর্ষ হইয়া গেলেন। বোধ হইল যেন অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিলেন : তা হলে কি আপনাদের দয়ার কিছু হতে পারে না। আপনারা মহাপুরুষ, ইচ্ছা করলে ত দয়া করতে পারেন।

সাধু যেমন বসিয়াছিলেন ঠিক তেমনি অবস্থায় স্থিরভাবে বলিলেন : দয়া, দয়া—দয়ার কথা বলছেন?—তার পাত্রও ত আছে।

ভদ্র : আমরা কি এতই অধম? এমন ত কাজ কিছু করিনি যার জন্যে—

সাধু : তবে এই কঠিন ভোগটা এল কোথা থেকে? প্রকৃতির রাজ্যে সবই সুশৃংখল নিয়মের অধীন, এখানে কিছু অবিচার হবার যো কি আছে?

ভদ্র : আমরা অনেক কিছুই ভাল কাজ ত করে থাকি। দোল-দুর্গোৎসব আজ তিন পুরুষ থেকে চলছে। অনেক কাঙ্গালী-ভোজন করানো হয়, গরীব ছোটলোককে দানও করা যায়—

সাধু কি যেন একবার বলিবার চেষ্টা করিলেন, তার পর নিরস্ত হইলেন, আর কোনও কথা কহিলেন না। ভদ্রলোকটি দুই-একটি আরও কি কথা যেন বলিলেন, মন দিয়া শুনি নাই; কিন্তু সাধুর মুখ হইতে আর কিছু বাহির হইল না দেখিয়া তিনি উঠিয়া চিন্তিত মনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আর প্রণামও করিলেন না।

আমি আরও কিছুক্ষণ রহিলাম, কিন্তু তিনি কথা না কওয়াতে প্রণাম করিয়া আমিও উঠিলাম। যখন রাস্তায় আসিয়াছি তখন দেখি ঝাঁকড়া চুল, চাদরে গায়ে যুবা মূর্তি একজন বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাতে তাঁহার জিনিস-পত্র ছিল। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এঁর সঙ্গে কথা কওয়া ত মুস্কিল দেখছি, আপনি বোধ হয় এঁর সঙ্গেই আছেন।

তিনি : হাঁ, প্রায় দুই বৎসরকাল যাবৎ আমি পিতার আজ্ঞায় এঁর সঙ্গে আছি। আমার সঙ্গেও কথা ইনি খুবই কম কন। আমাকে যে কথা কইতে নিষেধ করেছেন তা নয়। কিন্তু এঁর সঙ্গে এসে অবধি কথা বলবার সময়ে

আমার নিষ্প্রোজনে কথা হইবার প্রবৃত্তিই হয় না। এটি এঁর সঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল বুঝতে পারছি।

আমি: যদি কারো সঙ্গে কথা কইতে হয়—

তিনি: সে সময়ে আমি ঠিক বুঝতে পারি কতটুকু কথা বলা দরকার।

আমি বলিলাম: যদি কোন বিষয়ে আলোচনা—

মুখ হইতে কথা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি বলিলেন: নিষ্প্রয়োজন। তাতে বাক্য নষ্ট আর শক্তি ক্ষয় হয়। শুনিয়া আমি বলিলাম: কোনও প্রকার সদালোচনা কারো সঙ্গে না করেই বা থাকেন কি করে, সকলকার সঙ্গে না হোক—ভাল সঙ্গী পেলে কথা কইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে না?

তিনি: এখন সব আলোচনাই নিজের মনের সঙ্গে—খুব তর্ক-বিতর্ক করি, বুদ্ধির ক্রিয়ায় যখন সেটার মীমাংসা হয়ে যায়, তখন কি আনন্দ। আর এঁর সম্বন্ধে কথা এই যে—ঝুড়ি ঝুড়ি গীতার কথা, নানাপ্রকার যোগশাস্ত্রের কথা এঁর কাছে শুনতে যদি চান তাহলে নিরাশ হতে হবে! শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তা হলে?—

আমাকে কথা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া বলিলেন: যদি প্রত্যক্ষ কিছু পেতে চান ত দু'চার দিন আসা-যাওয়া করুন, কথা না কইলেও এঁর কাছে এসে একটু স্থির হয়ে বসে গেলে অনেক কিছুই পেতে পারবেন। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কথাটা আমার অন্তরে প্রবেশ করিল।

আমার একটু আন্তরিক ভক্তি ইঁহার উপর হইয়াছিল আর মনের মধ্যে বেশ একটু ইঁহার সঙ্গলাভের ইচ্ছার তাড়নাও অনুভব করিতেছিলাম। এদিকে কুলদাবাবুরও কলিকাতায় যাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল। আমার এখনও মহারাজের হুকুম আসে নাই—কাজেই আমার আর তাঁর সঙ্গে যাওয়া ঘটিল না। কথা তাঁহার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত রহিল যে মহারাজের হুকুম আসিলেই আমি কলিকাতায় তাঁহার ঠিকানায় যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তার পর তাঁর সঙ্গে সিউড়ি যাওয়া যাইবে। বীরভূমের তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলি দেখিবার সুযোগ পাইব। কুলদাবাবুও ইতিমধ্যে ঢেন্‌কানল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। সেখানে তাঁহার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল।

আমি ঠিক করিলাম এই সময়ে মহানন্দের সঙ্গ যতটুকু পাই সে সুযোগ ত্যাগ করিব না। কুলদাবাবুকে বিদায় দিয়া আমি সেই দিনই বৈকালে মহানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ঠিক সেইরূপ আসনে সেই ঘরের দাওয়ায় তিনি বসিয়া আছেন। প্রণাম করিয়া একটু দূরে বসিলাম।

আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, অল্পক্ষণেই আসনে শরীরটি আমার একেবারেই স্থির হইয়া গিয়াছে। কোনও অঙ্গ যেন নাড়িবার সাধ্য নাই। আকণ্ঠ যেন একেবারে পাথর, প্রাণের কোন ক্রিয়া নাই। এই ব্যাপার অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হইতে যেন প্রশ্ন হইল—কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি।

কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি?—প্রথমত এই উত্তর হইল যে প্রাণের চাঞ্চল্য, যে জন্য অস্থির হইয়া সাধু, সাধক বা তপস্বীর পানে ছুটিয়াছি সেই অস্থির চিত্তকে স্থির করিবার উপায় জানিতে আসিয়াছি। আবার প্রশ্ন—যোগশাস্ত্রে ইহার উপায় ত নানাভাবে ব্যাখ্যা করা আছে, সে সকল ত অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সকল উপায়ের মধ্যে উপযোগী কোন একটা অবলম্বন করিলেই ত পারি।

উত্তর: তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, ছাপানো পুস্তকের মধ্যে নিহিত

উপায় অবলম্বন করিতে প্রাণ চাহে না, কেন যে চাহে না তা ভাবিয়া দেখি নাই।

প্রশ্ন : ভাবিয়া দেখিলে কি পাওয়া যায় ?—

উত্তর : পুঁথিতে ত প্রণব মন্ত্র শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা আছে। সেই মন্ত্র ঈশ্বরের বাচক ;—উহার জপের দ্বারা চিত্ত স্থির হইবে ইহা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে।

কিন্তু তাহা ত আমার প্রাণ চায় না, সর্বদাই একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বা সিদ্ধ যোগীর পশ্চাতে মন অবিরাম চলিতেছে।

প্রশ্ন : কেন ?

উত্তর : সাধারণ নিয়ম জানিয়াই প্রাণ সন্তুষ্ট নয়। একজন জীবিত ব্যক্তির নিকট হইতে জীবন্ত শক্তিমান নির্দেশ যেন চাহিতেছে।

প্রশ্ন : তাহা হইলে ত গুরুর কথাই হইল।

উত্তর : হাঁ, তাই ত বটে।

প্রশ্ন : তাহা হইলে গুরুর প্রতি বিশ্বাস আছে কি না সেটা অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

উত্তর : যখন নিজের শক্তিতে কুলাইতেছে না তখন গুরু বলিয়া একজনকে মানিতেই হইবে।

প্রশ্ন : এটা যেন দায়ে পড়িয়া মানার মত হইল না ?—

উত্তর : সত্য বটে, যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা গুরুর প্রতি ভক্তি ত আসিতেছে না।

প্রশ্ন : আমার সুবিধার জন্য একজনের সাহায্য চাই, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, আমার প্রতি কৃপার জন্য নির্মল কৃতজ্ঞতা তাহাও স্বীকার করিব না, এটা কোন্ ভাবের পরিচয় ?—

উত্তর : জ্ঞানরাজ্যে মানুষ-গুরুর কথা নাই। সব মানুষই অল্প বিস্তর অসম্পূর্ণ, জ্ঞান তাঁহাদের সংকীর্ণ বলিয়াই চক্ষে পড়ে। এই সকল দেখিয়া কি করিয়া সে রকম লোককে গুরু বলিয়া সম্পূর্ণ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আইডিয়্যাল হিসাবে পূজা করিব ?

প্রশ্ন : জ্ঞানরাজ্যের ঐটিই কি একটি প্রকাণ্ড বাধা নয় ? তত্ত্বজ্ঞান যে গুরুমুখী, যাঁর সে জ্ঞান হইয়াছে তিনিই উহা আর একজনকে দিতে পারেন ; আর নিঃসন্দেহ বুদ্ধিতে নির্মল চিত্তেই তাহার ক্রিয়া হয়, অন্যথায় শুভফল ঘটিবে কি করিয়া ?—

উত্তর : সেটা বুঝিতে পারি, কিন্তু তবুও মানুষকে গুরু স্বীকার করিতে প্রাণ চায় না। এ রোগের ঔষধ কি ?

প্রশ্ন : এটা ত বুঝিতে পারা যায় যে, এতাবৎ যা কিছু জ্ঞানের রাজ্যে প্রকাশ হইয়াছে তা ত মানুষের চৈতন্যের মধ্য দিয়াই হইয়াছে—তাহা হইলে যাঁহার নিকটে অন্তরের সকল সংশয়চ্ছেদ হয় তাঁহাকে গুরু বা শ্রেষ্ঠ বা আমার আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা কি ?

উত্তর : এখন মনে হইতেছে যে বাধা অন্য কিছুই নয়, কেবল যে ব্যক্তি আমার মধ্যে সকল ভেদ ঘুচাইবেন সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়াই একমাত্র বাধা।

এই ত ঠিক কথা। তাহা হইলে এই কথাই স্থির হইল যে গুরু পাওয়া

গেলে তাঁহার প্রতি মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে বাধা নেই। তাই না এত খোঁজাখুঁজি!

বুদ্ধি এতক্ষণে স্থির হইল। নির্মল আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। স্পষ্ট ধারণাতে স্থির হইল, গুরুই আমার সকল ভেদ নিরসন করিবেন, যখন তাঁহাতেই চিত্ত সমাহিত হইবে—তখনই শান্তি আসিবে।

তখন এই কথাই মনে হইল, কোথায় তিনি, যিনি আমার অশান্ত হৃদয়ের সকল প্রশ্ন মীমাংসার দ্বারা শান্ত করিবেন।

মনের মধ্যে তাহার এই উত্তর হইল যে, সময় হইলেই পাওয়া যাইবে। অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইলেই যোগাযোগ ঘটিবে।

তা বলিয়া ত স্থির থাকা যায় না, অন্তরে আকুল তৃষ্ণা কি নাই? মনে হয় ত উহা তীব্রভাবেই রহিয়াছে। এ জগতে আসাই ত তত্ত্ব মীমাংসা করিতে। যদি, আমি কে—কেন আসিয়াছি,—আমার গতি কোন্ দিকে?—এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা না হয় তাহা হইলে জীবনধারণই ত বৃথা।

এ প্রশ্নের উত্তর ত একরকম মোটামুটি জানা হইয়াছে। আমি কে?—ইহার উত্তরঃ আমি আত্মা, পরমাত্মার অংশ।

কেন আসিয়াছি?—ইহার উত্তরঃ ভোগ করিতে আসিয়াছি, ভোগের সম্পর্কে প্রকৃতির পরিচয় পাইতে, আমার প্রকৃতিকে চিনিতে আসিয়াছি। লক্ষ্য আমার পূর্ণ জ্ঞান, আনন্দ ও শাশ্বত অবস্থাই ভূমানন্দের ক্ষেত্র। পার্থিব যত কিছু বিষয় আছে সে সকলের অতিরিক্ত যে আনন্দ অর্থাৎ যে আনন্দ বিষয়ীভূত নয়, যে আনন্দের বাধা নাই সেই আনন্দই আমার একমাত্র কাম্য। তাহার অভাবেই না বিষয়ীভূত আনন্দকে অবলম্বন করিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে বিষয়মুখী মন থাকিতে ভূমার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আবার এদিকে বিষয়কে জোর করিয়াও ছাড়া যাইবে না, বিষয়ের সম্পর্কে থাকিতে থাকিতে পরিবর্তনশীল বিষয়ের অনিত্যতা বোধ ক্রমাগত অন্তরে যতই বদ্ধমূল হইবে ততই বিষয়ীভূত আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা হইতে পৃথক হইতে থাকিবে। আর বিষয়ের আনন্দ যতটা পরিমাণে পৃথক হইবে ভূমা ততটাই চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিবে। ইহাও বুঝিতে পারি, কিন্তু কতদিনে বিষয়ভোগ কাটিবে; ক্ষুদ্রের মোহ সম্পূর্ণ কাটিলে তবেই না সর্বাত্মিকা জ্ঞান ফুটিবে, তাহার উপরেই ভূমার খেলা, পূর্ণ আনন্দে তাহার পরিশেষ। এতটা কর্ম কি সহজে অল্প সময়েই ক্ষয় হইবে? তাহা ত হইবে না, তবে আমি কি করিব?

এখানেই সাধনের প্রয়োজন, তপস্যা লইয়াই থাকিতে হইবে। লক্ষ্য সর্বদাই থাকিবে ভূমার দিকে। কর্মকে শৃঙ্খলিত করিতে হইবে, ভাগ করিয়া লইতে পারিলে সহজ হয়, আরও সহজ হয়, সকল কর্মেই কর্ম-ক্ষয়ের উপর লক্ষ্য থাকিলে। কর্মের বিস্তৃতি না হয়, কারণ কর্ম বিস্তার করিলেই বিষয় বেশী ঘাঁটিতে হইবে, আর বেশী বিষয়ের ব্যবহারের ফলই মুক্তি হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া। সহজ ও সরল বুদ্ধি তীব্রভাবে সকল সময় জাগ্রত রাখিতে হইবে, ইহাই ত তপস্যা, আর তপস্যা কি?—আমি জীব, কর্ম ও বিষয়ভোগে লিপ্ত, আমার কর্ম বিষয়মূলক যাবতীয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা, আমার স্বভাবে বা স্বরূপে স্থিত হইবার যে ঐকান্তিক যত্ন আর তাহা লইয়া যে উদ্যম, ক্রমান্বয়ে কালের মধ্য দিয়া যে রতি উহাই তপস্যা। যাহাকে জড়াইয়া

আমি অশান্তির মধ্যে কাল কাটাইতেছি, এই যে বিষয়কামনা, প্রাণকে বিষয়-মুখে নিরন্তর চালনা করিতেছে, অভাবমোচন হইলে সুখ, পুনরায় অভাবগ্রস্ত হইয়া দুঃখবোধ এবং তাহার প্রতিকারের জন্য যে তীব্র কর্মপ্রবাহে নিরন্তর তাড়িত হইতেছি তাহা হইতে নিবৃত্তির চেষ্টা—তাহাই তপস্যা। পূর্ণভাবে উপলব্ধি না হইলেও স্বরূপের যে বিমলানন্দময় আভাস তাহাই সম্বল করিয়া এবং তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া সেই লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের যে চেষ্টা এবং কর্ম তাহাই আমার তপস্যা হইবে।

গুরু মূর্তি ধরিয়া সাক্ষাতে বা কাছেই থাকুন কিম্বা নাই থাকুন, গুরু আছেন। তাহাতে সন্দেহ-ই নাই। কারণ অধ্যাত্ম-পথ দেখাইবার জন্য সকল ধর্মেই গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে গুরুর আশ্রয় ব্যতীত চলিবার যো নাই। বাপ মা হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া পার্থিব কর্মপথ দেখাইয়া দেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-পথ কে দেখায়? কেহ না দেখাইলে যাইবার, পাদক্ষেপ করিবার উপায় কি? জীব ত জন্মাবধিই অসহায়। বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থায়ই সে সহায় চায়, এবং পায়,—তাই-ই সে চলে। যেমন জগৎ-সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, ধন, জন সহায়,—অধ্যাত্ম-পথেও যে সেই প্রকার সহায়তা চাই, সাহায্য চাই। সে সহায় গুরু। যার মনোবৃত্তি যেমন, যে ভাবে যার সংস্কার গঠিত তার সহায় সেই ভাবে জোটে। যার দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ সহায়ের প্রয়োজন, জীবন্ত মূর্তির মধ্য দিয়া না হইলে যে অন্যভাবে সহায়তায় বিশ্বাসী নয় সে জীবন্ত মানুষ বা দেহধারী গুরুই পায়। যে মানুষ জীবন্ত গুরুতে বিশ্বাসী নয় সে তার চৈতন্যশক্তি হইতেই অলক্ষ্যে সাহায্য পায়। যতটা পায়, পুরুষার্থের সহায়তাতেই আবার ততটাই অগ্রসর হয় কিন্তু আসলে নাম রূপাত্মক যে আমি—সে আমি যে আত্মচৈতন্যস্বরূপ সর্বজ্ঞ আমি নয় একথা প্রত্যেক অগ্রগামী পাদক্ষেপেই প্রমাণ হইয়া যায়। কি ভাবে?—দুঃখের আঘাতে। অভাবেই দুঃখ, অভাবমোচনেই সুখ। নামরূপাত্মক আমি যে আমার সকল অভাবমোচনে সক্ষম নই, পুরুষার্থ বিফল হইলে সেইটাই প্রমাণ করে। যতকিছু জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মশক্তি আমার আছে সবটা উজাড় করিয়া চেষ্টা করিলেও আমি আমার দুঃখ নিবারণ করিতে ত পারি না। এমন সকল যোগাযোগ অপেক্ষা করে যাহাতে আমার আদৌ হাত নাই। এ সকল দেখিলে ত স্পষ্টই বোধ হয়, এটি প্রমাণ করিতে বাক্-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

পুনঃ, জীব সকল কেন সৃষ্ট হইয়াছে, বা হইতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে গেলে ত স্থূল ছাড়িয়া কারণে যাইতে হয়। যদি, আমি কেন আসিয়াছি, আমার সৃষ্টির কারণ বুঝিতে পারি তাহা হইলে সকলের আসার কারণ জানিতে পারিব। এই সোজা কথা বুঝিতে বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। এই এক আমির রহস্য ভেদ হইলে সকল আমির রহস্যই ভেদ হইবে। সুতরাং বাহিরের বিস্তৃত রহস্যের মধ্যে না তলাইয়া অন্তরের মধ্যেই অনুসন্ধানে লাগা ভাল ও একমাত্র সহজ পথ। ইহাই ভারতীয় আর্য্যপ্রথা। এই প্রথার মধ্যেই একটি সহজ সরল পথ পড়িয়া আছে যাহাতে আমি সকল জগত-রহস্যের চরম মীমাংসা করিয়া আমার জন্ম সফল করিতে পারি। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং আমি এই আমির মধ্যেই সমাহিত হইব, গুরু আমায় পথ দেখাইবেন। যখন অহঙ্কারের মত্ততায় আমার

শ্রেয়ঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে তখন দুঃখের কশাঘাতে তিনিই আমার চৈতন্য সম্পাদন করিবেন। যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে দৃষ্টিহীন আত্মশক্তির অভাবে মুহ্যমান হইব তিনিই চৈতন্যশক্তির প্রেরণা দিয়া আমায় শক্তিমান করিবেন। আমি বেশ বুঝিয়াছি—যৌবনগর্বে যে শক্তি চালনা করিয়া আমি আমাকে শক্তিমান মনে করিয়া সকল কর্মে অগ্রসর হই, সাফল্যে মনে মনে দম্ভ করি, সে শক্তি আমার নয়। ঋতু পরিবর্তনের মতই সে আসে আবার অন্তর্দ্ধান করে। যদি আমার শক্তি হইত তাহা হইলে আমারই থাকিত, কখনও অভাববোধ করিতাম না। শক্তি আমার যখন আজ্ঞাধীন নয় তখনই ত এটা প্রমাণ করিতেছে যে উহা আমার নয়। এখানকার জল হাওয়ায় যিনিই আসিবেন তাঁহাকেই ষড় ঋতুর মত শক্তির প্রভাব লাগিবে। এখানকার ভৌতিক পদার্থের যোগাযোগে যেমন শরীর মন কর্মাদির উদ্যম, তেমনই তাহার আবার অভাবও আছে। যে যোগাযোগে আমি শক্তিমান, আমার ভাগ্য আমি উপার্জন করি, সেই শক্তিই আবার যোগাযোগের অভাবে ক্ষীণ অক্ষমতারই পরিচয় হইয়া আমায় হতাশ করে। নৈরাশ্যের মধ্যে শক্তিহীন অপদার্থ হইয়া পড়ি। তখনই অহংকার চমকিয়া উঠে, অজ্ঞানের খোলস খসিবার উপায় হয়। জড়তায় মুগ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না। তখন দেখি, তোমারই শক্তি তুমি দাও ত পাইব, না দিলে পাইব না। এই বোধ প্রভাতে পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর আনন্দ দেয়।

এখানকার মেয়াদ কতটুকু সময়। এই সময়ের মধ্যে বাল্য কৈশোর-যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য। কয়টি লোক বার্দ্ধক্য পায়? প্রৌঢ়াবস্থায়ই বা কতজন পেঁছায়? আবার যৌবনই বা কতজনের ভোগ করিবার মেয়াদ থাকে? তাহা হইলে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন আমি কতজনের গড়ে? কলের পুতুলের মত দায়িত্বহীন জীবনযাপন ত অনেক বৃদ্ধেরও দেখিয়াছি। আমি কে বা কেন এ প্রশ্ন জাগেই বা কয়টি লোকের? যাহাদের জাগে তাহাদের মধ্যেই বা কতজনের অন্তরে সেটা তীব্রভাবে তাড়না করে? আর তাহাদের মধ্যেই বা কত জনের উহা জীবনে যথার্থ কাম্য হয়? যে পৃথিবীতে খাওয়া-পরার সমস্যা সমাধানের জন্য জন-সমষ্টি লালায়িত—সেখানে কয়টি জীব আমি কি, কে, ও কেন, এজন্য মাথা ঘামাইতে যাইবে?—

হাঁ, যুক্তিযুক্ত কথাই এই যে তোমার সঙ্গে ভগবানের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রকৃতির রাজত্বে তুমি প্রাকৃত জীব,—ভোগ, কর্ম, জ্ঞান এই তিনটিতেই তোমার অধিকার। ইন্দ্রিয়-মন-শরীর লইয়াই তোমার কারবার, এখানে ভগবান বা ঈশ্বরকে কোথায় পাইতেছ?

তবে সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম, একথার তাৎপর্য্য—

সর্বে ব্রহ্ম এর তাৎপর্য্য সরল,—ব্যবহারে, কর্মে ব্রহ্ম কোথায়?—ব্রহ্ম যদি বলিতেছ তবে কর্ম বলিতেছ কেন?—তোমার কর্মের ব্যাপারে ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়? তার পর ভগবান বা ঈশ্বর সে ত সমষ্টির কথা, বিরাটের কথা। তুমি একটি জীব, তোমার নাম রূপ গুণ ও সংস্কারের মধ্যে তুমি বাঁধা, প্রকৃতির শক্তি লইয়া কর্ম কর, ভোগ কর, জ্ঞানলাভ কর, মন, বুদ্ধি, চিত্তের সাহায্যে তোমার অহংকারকে সম্বল করিয়া; এখানে ভগবানকেই বা পাইতেছ কোথায়? তাঁকে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধের মধ্যে কোন্ ভাবে পাও?

কেন, বুদ্ধি দিয়া। বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় মাত্র করিতে পার যে তিনি আছেন কি নাই, তাও কল্পনার রঙ তার মধ্যে কতখানি তা কি বিচার করিয়া

দেখিয়াছ? আগা-পাশ-তলা যার কল্পনার আশ্রয়ে চলিতে হইতেছে তার বুদ্ধি যে শুদ্ধ বুদ্ধি তার প্রমাণ কি? প্রতিষ্ঠা, ধন, মান ও ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগের মধ্যেই যার বুদ্ধি নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায় তার বুদ্ধিকে বিশ্বাস আছে কি?

এই যে সাধু মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন ভগবানই সৃষ্টির কর্তা—আর তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি পিতা, আমরা সন্তান,—আমরা তাঁর অংশ।

আহা, তাঁদের যেটা অনুভূতি সেটা ত তোমার শোনা কথা? তার সঙ্গে তোমার আসল সম্পর্ক কি? সত্যকে ধরেই না প্রত্যয়?—সত্যকে কি পাইয়াছ? কাজেই তোমার আত্মপ্রত্যয় কোথায়? তার পর যেখানে একটা হাট বসিয়াছে সেখানে কত মানুষ, কত গাড়ি, ঘোড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি কত পশুপক্ষী, কত রকমের কত কত মালপত্র লইয়া কারবার চলিতেছে। হাটের ভিতরে যারা আছে তারা হাটকে এক রকম দেখে, আর হাটের বাহিরে আসিয়াছে যারা—তারা হাটকে আর এক রকম দেখে। এ ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তেমনি, এই সৃষ্টির মধ্যে যারা আছে তারা এই সৃষ্টিকে এক রকম দেখে, যারা বাহির হইয়া গিয়াছে তারা আর এক রকম দেখিতেছে। যারা ভিতরে আছে তারা যে যার বিষয়টিই দেখিতেছে—সম্যক দেখিতেছে না, কাজেই তাদের সবই আংশিক, আর যাঁরা সৃষ্টির ভিতর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, তাঁরা সম্যক দেখিয়াছেন। আগা-পাশ-তলা সবটাই তাঁদের চৈতন্যের মধ্যে সম্যক দৃষ্টিতে ধরা আছে, তাঁদের সে দেখার খবর তোমার আমার কাছে কতটা সত্য—যতক্ষণ আমরা এর মধ্যে এক-একটি সংকীর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া সংস্কারের রাশি বাড়াইয়াই চলিয়াছি।

তার পর তাঁকে পাওয়া, সে কি টাকা-কড়ি, বিষয় পাওয়ার মত পাওয়া? আত্মার সঙ্গেই না তাঁর সম্বন্ধ। তুমি আত্মা, আগে তোমার এই তত্ত্ব সত্য হইয়া না উঠিলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়ই বা পাইতেছ? কল্পনায় ধরিলেই ত আসলে ধরা হইল না? বুঝিয়া দেখ—

চিত্তশুদ্ধি হইলেই ত তাঁকে ধরা যায়?—

হাঁ, চিত্তশুদ্ধিটি কি বস্তু? চিত্তক্ষেত্রে যে সংস্কারের আবর্জনা, ময়লা রহিয়াছে সে সব পরিষ্কার হইলে, পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি চিদানন্দ-স্বরূপ এ বোধ জাগিবে।—নাম-রূপাদি সংস্কার, কল্পনার রাজ্য, যাহা কিছু মনোময় পদার্থ তাহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে সে সকল পরিষ্কার না হইলে কি করিয়া স্বরূপের স্ফূর্তি হইবে? কল্পনায় সুখ থাকিতে পারে সত্য কিন্তু বস্তুলাভ অন্য কথা।—বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি।—

॥ ৯ ॥

মহানন্দের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পর, এক শুভ আশা, জীবনের সাফল্য,—কাল্পনিক হইলেও,—অনুভব করিয়া, আমার অন্তরের মধ্যে একটি শান্তিময় প্রবাহ সকল সময় খেলা করিতে লাগিল। যেন সর্বার্থসিদ্ধির আভাস। আনন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শক্তির অনুভব। আমার মধ্যে কত-কত মহৎশক্তির সম্ভাবনা বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। মহানন্দের গুরুভাব তাহার মধ্যে বর্তমান। এই অপূর্ব সাধুটি চুপচাপ নিজ আসনে, আপন ভাবেই সমাহিত, বাহ্যজগতের অস্তিত্ব তাঁহার

কাছে আছে কি না কে জানে! কে বুঝিবে কি ভাবে, কোন্ শক্তির প্রবাহ কোন্ পথে চালনা করিতেছেন।

নাগরিক জীবনে, নিজ গৃহে বসিয়া, আমরা কতপ্রকারের সাধু-সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই। এমন সব উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের নিকট তাঁহারা উপস্থিত হন,—অনর্থক বাকচাতুরীর অবতারণা করেন ;—এমনই সাংসারিক ভোগ, আসক্তি এবং অর্থলোলুপতার পরিচয় দেন যাহাতে ত্যাগী সাধুসম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব সঞ্চিত হইয়া সরল গৃহস্থ-মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ফলতঃ সাধু-সঙ্গের মহৎ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তাহাতেই বুঝি—গার্হস্থ্য জীবনে যথার্থরূপে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কতটা গভীর তাহা অনুভব করিবার মনোভাবও আর নাই। স্বার্থপর জীবনদ্বন্দ্বে অবসাদগ্রস্ত এবং আসুরিকভাবে জাজ্জ্বল্যমান এই যে এখনকার দুর্বল সংসারী মানুষের মনোবৃত্তি, নির্মল আনন্দ ও শান্তির আস্বাদনে বিমুখ হইয়া বোধ হয় দিবানিশি পুড়িতেছে,—কাহাকেও দেখাইবার নয়—জানাইবার নয়। জানা নাই কোথায় সেই শান্তির ধারা যাহার স্পর্শে দগ্ধজীবন সুস্থ হয়, মধুময় হয়। ভোগমূলক কর্মের প্রবাহে এতটা ডুবিয়া থাকিলে সাধুসঙ্গ লাভ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?—কিন্তু একথাও ভুলিবার নয় যে এদেশে সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে কামকামী, সংসারমনা, অর্থাসক্ত সাধু সংখ্যায় অনেক হইলেও যথার্থ লোক কল্যাণরত, ত্যাগী সন্ন্যাসীরও অভাব নাই, যাঁহারা এই নিরন্তর কর্মক্লিষ্ট, দুর্বল সংসারী মানুষের প্রতি কর্তব্যে সর্বদাই জাগ্রত আছেন। যথার্থ সাধুসঙ্গ ব্যক্তিগত প্রবল আকাঙ্ক্ষাও ধর্মরতির যোগাযোগ অপেক্ষা করে।

যাহা হউক মহানন্দের কুটীর আশ্রমে যাওয়া-আসা করিতে করিতে অনেক কিছুই লক্ষ্য করিলাম। এমনই আশ্রমটির পরিস্থিতি যে সাধুসঙ্গের গভীর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কেহ এদিকে আকৃষ্ট হইবে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত সেথায় অনাবশ্যকীয় কিছুই নাই। শয়নের সামান্য খাটিয়া বিছানা পর্যন্ত নাই, কেবল সেই যুবা সাধুটির একখানি চেটাইয়ের উপর কম্বল বিছান, অন্য সময়ে তোলাই থাকে, শয়নকালে পাতা হয়। তার উপর সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার উপযোগী নানাভাবের বাক্যচ্ছটার আড়ম্বর না থাকায় সাধারণ কেহ বড় একটা ঘ্যাঁষে না। এই ভাবে তাঁহার নিজ আশ্রমটি অপূর্ব কৌশলে বাহিরের অত্যাচার হইতে রক্ষা হয়।

যতক্ষণ সুবিধা পাইতাম তাঁহার কাছে বসিতাম। আবাহনও নাই বিসর্জনও নাই। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদেরও প্রয়োজন নাই। কতক্ষণ বসিবার পর মনের সন্তোষ হইলে উঠিয়া আসিতাম। এই ভাবে অপার্থিব আনন্দের আভাস পাইয়া তাঁহার প্রতি যতটা আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম—ততই তাঁহাকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহও বাড়িতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় এবং গুরুভাব সম্বন্ধে নিগূঢ় জানিবার জন্য একদিন সংকল্প করিয়া যথাস্থানে আসন করিয়া বসিলাম। অন্যান্য দিন যেমন হয় অল্পক্ষণেই মনস্থির হইয়া গেল। তখন আমার প্রথম প্রশ্ন হইল:

—এখানে আসার পর যখন আমার মনস্থির হয়ে যায়, অনেক জটিল বিষয়ের সরল, আশানুরূপ মীমাংসাও সহজেই হয়, নানাদিক দিয়েই মনে হয় আপনিই আমার গুরু।

উত্তর: বুদ্ধি বা বিবেক জ্বলে উঠলে, যেখানেই আসন করে বসা যাক

না কেন সেইখানেই চিত্তস্থির হবে,—আর মনের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজেই হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কিন্তু এখানেই যে আমি বিশেষ কিছু পেয়েছি—

—তা ত নিজগুণেই পাওয়া গিয়েছে। যে যে বিষয় মীমাংসার জন্য অন্তর ছট্‌ফট্‌ করেছে, স্থির একাগ্রচিত্তে বসবামাত্র অন্তরাত্মার প্রেরণায় সহজেই তার মীমাংসা হয়ে গেছে। ব্যক্তিবিশেষকে গুরুভাবে লক্ষ্য করলেও আসলে এ

সকল ব্যক্তিগত জাগ্রত আত্মারই অভিব্যক্তি। গুরুভাবে মানুষকে ধরে টানাটানি করার রোগটি দুর্বল হিন্দুসমাজে অধিকাংশ মানুষের সংস্কারগত।

সত্যই ত! অবস্থা-বিশেষে সাত্ত্বিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া হঠাৎ কোনও সাধুকে গুরু বলিয়া আঁকড়াইবার প্রবৃত্তি আমাদের হিন্দুদের যেন মজ্জাগত। পরে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কোন দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া আবার অশ্রদ্ধা আসিতেও দেরী হয় না। অনেকগুলি সংসারী লোককে এরূপ হঠাৎ ভক্তিমান হইয়া গুরুগ্রহণ, আবার কোনও কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গুরু-ত্যাগ করিতেও ত দেখিয়াছি। সেই কারণে আগে আমারও গুরু করিবার প্রবৃত্তি তো ছিল না।

—তবে কি আমার অদৃষ্টে যথার্থ নিষ্ঠা বা গুরুলাভ নাই ?

—জীবভাবের উন্নত অবস্থায়—ধর্মজীবনের প্রারম্ভে গুরু-শক্তি এলে তাকে ঠেকাবেই বা কে ? আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধ হলেই কোন তত্ত্ববিকাশের অবস্থায় উপলক্ষ হয়ে যিনি সম্মুখে আসেন, অন্তরে গুরুর স্থানে তাঁকেই দেখা যায়। সেই তত্ত্ববোধ উপলক্ষে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে আনন্দ-সম্ভোগ চলে, তার পর আবার অবস্থান্তর হলে কাকে উপলক্ষ করে কোন্ তত্ত্ব ফুটবে কে জানে ?

—তবে কি গুরু এক নয়, এক একটি তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরুর দরকার ?

—মূলে আত্মা, গুরু বা ইষ্ট একই ত,—কিন্তু চঞ্চলমতি জীবনের অসমান কর্মবৈচিত্র্যের জন্য, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সহযোগ প্রয়োজন। তাদেরই একাধিক গুরু মিলে যায়। কারো কারো এক গুরু উপলক্ষ করে সকল কর্মই শেষ হয়, সকল তত্ত্বেরই সাক্ষাৎকার হয়। চিত্ত যার সত্যনিষ্ঠ, অনুভব সকল যার তীক্ষ্ণ, সর্বব্যবহারে যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ এবং দুর্বলতাশূন্য, কর্ম যার এক ধারায় চলেছে এবং অন্তর্দৃষ্টি গভীর,—তারই একমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। এক্ষেত্রে ভালমন্দ, বড়-ছোটর কথা নেই। সকলকার কর্মক্রম ত সমান নয়, একমুখীও নয়। শক্তিমান সিদ্ধগুরু পেলে সেই একের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। আর উচ্চ আধার না হলেই বা শক্তিমান গুরুর সাথে যোগাযোগ ঘটবে কি করে ?

একটা কথা পরিষ্কার হইয়া গেল, আনন্দ পাইলাম,—কিন্তু আর একটা কথা মনের মধ্যে গোল পাকাইতে লাগিল,—সেটি গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ও ব্যবহারের তথ্য।

—চিত্তের মধ্যে যখন কোনও তত্ত্বের স্ফুট ওঠে, সেই তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য, সাক্ষাৎকারের জন্য. প্রাণ যখন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তখন পূর্বে যাঁর সে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়েছে তাঁরও অন্তরে সাড়া জাগে। তার পর আমাদের প্রকৃতি আছেন. যাঁর আসল কাজই হল সহধর্মী একের সাথে অপরের যোগাযোগ ঘটানো, চুম্বকে লোহাতে যোগাযোগের মত, তিনি ঠিক তাঁদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

—তা হলে এর মধ্যে আর একজনের হাত আছে !

—আছে বৈ কি ?—না হলে পুরুষ প্রকৃতির রাজত্ব চলবে কেমন করে ! যিনি চোরের চুরির যোগাযোগ, হন্তব্যের সঙ্গে হত্যাকারীর যোগাযোগ ঘটান, প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়িনীর যোগাযোগ ঘটান, কর্মীর সঙ্গে অভীষ্ট কর্মের যোগাযোগ ঘটান,—সেই প্রকৃতিই অবলীলাক্রমে এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। এক্ষেত্রে দূর বা নিকটের কোনও প্রশ্নই নেই। এই ঘটনার সম্পর্কে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে অবস্থিত বস্তু বা প্রাণীর নিশ্চিত যোগাযোগ ঘটে যায়। অপূর্ব এই প্রকৃতি—যাঁকে অনির্বচনীয় বলা হয়েছে,—তাঁকে এই ভাবেই স্পষ্ট ধরা যায়। পূর্ব পূর্ব দ্রষ্টা মহাপুরুষেরা এই ভাবেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারে তাঁকে ধরেছেন।—

—সকল ব্যাপারেই তা হলে প্রকৃতি মধ্যবর্তিনী ?

—সর্ব বিষয়ে যোগাযোগের এইটিই যে মূল, না হলে কি করে হবে ?—সৃষ্টির ব্যাপারে গোড়ার কথাটি ভুললে চলবে কেন। মূল-সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে

পুরুষের এমনই যে শুধু একের দ্বারা কিছুই হবার উপায় নাই। পুরুষের ইচ্ছা হয়,—আর প্রকৃতি সেই ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ ঘটান। দুইয়ের আনন্দ থেকেই প্রবৃত্তি বা স্ফুট ওঠে,—আনন্দময় পুরুষের আনন্দ থেকেই ইচ্ছার স্ফুট ওঠে—আর আনন্দময়ী প্রকৃতির আনন্দ থেকেই পুরুষের ইচ্ছানুরূপ যোগাযোগ ঘটাবার প্রবৃত্তি হয়—তাহাতেই সৃষ্টির মধ্যে উভয়ের অস্তিত্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই ভাবেই সার্থক হয়। এই থেকেই ত ভারতের সকল শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি। রূপকের আবরণে এই তত্ত্বই ত মূলে রয়েছে।

—তা হলে, এর মধ্যে আবার গুরুতত্ত্ব এল কোথা থেকে ?

—এখন এটা ভাল করে, মর্মে মর্মে বুঝে নিতে হবে যে,—সৃষ্টির গোড়া থেকেই, আপনহারা হয়ে জীব বহির্মুখী—প্রকৃতির রাজ্যে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যত কিছু ভোগ সেই ভোগ কামনা নিয়েই তার পুনঃ পুনঃ গতাগতি। তার মধ্যে থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটছে, আবার নানাবিধ কর্ম ও ভোগের ফলে ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞানও সঞ্চিত হচ্ছে। আত্মচৈতন্য যে ক্রমে স্বরূপচ্যুত হয়ে জীবভাবে এই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের মধ্যে এসে কর্মভোগে পড়েছেন, সেটা অনুলোম গতি,—আর ভোগান্তে যে ক্রমে চৈতন্য স্বরূপে মিলছেন সেটি বিলোমগতি। এই অনুলোম ও বিলোম গতিতে যাওয়া-আসা যেন অনন্তকাল ধরেই চলেচে। এখন গুরুর কথা—

এখানে এইভাবে গতাগতির ফলে, কর্ম ও ভোগে চরম অর্থাৎ পরিসমাপ্তির অবস্থায় যে যে আত্মার এই সৃষ্টি-রহস্য ভেদ হয়েছে—শেষে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও যাঁরা পরমাত্মায় লয় হয়ে যান নি, তাঁদের উপলব্ধ তত্ত্ব সকল,—এবং যে ক্রমে তাঁদের জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার ধারা নিরন্তর সূক্ষ্মভাবে আকাশের মধ্য দিয়ে জীবসমাজে প্রবহমান রয়েছে। তাঁরাই সৎ গুরু। আত্মার দ্বারাই আত্মার মুক্তির পথ। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মাই গুরু। এখানে আত্মারামেরই খেলা। যা কিছু জ্ঞান কর্ম এবং ভোগ এই সৃষ্টির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন চলেছে, বা সৃষ্টিকে গুলজার করে রেখেছে, তা সবই আত্মায়-আত্মায় সম্পর্ক ধরেই,—কখনও একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছিন্নভাবে নয়। তাইতেই সৃষ্টির সার্থকতা। পরমাত্মা এবং সৃষ্টির মধ্যে শক্তিমান, চৈতন্যমুখী জীব-সমূহের মধ্যবর্তী কেন্দ্র হয়ে তাঁরা অবস্থিত। তাঁদের আত্মজ্যোতিঃ থেকে চৈতন্যরশ্মি প্রাকৃতিক নিয়মেই বৈরাগ্যবান, চৈতন্যমুখী, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি পুরুষের অন্তরে দীপ্তি দেয়। সর্বদেশ, সর্বকালব্যাপী তাঁদের প্রভাব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে।

পৃথিবীর টান, ধরিত্রীর টান, বড় টান—ধরণী সহজেই এখান থেকে একজন সন্তানকে কি একেবারে মুক্তি দিতে চান ? নানা ভাবেই বাধা দেন। কারণ এ ভাবের উচ্চস্তরের জীব নিয়ে তাঁর অনেক কাজ হয়। ত্রিগুণের অতীত হবার পূর্বে গুণময়ী প্রকৃতির রাজ্যে, শেষ, সত্ত্বগুণের গন্ডী ছাড়াতে গিয়ে মুমুক্ষু যাঁরা তাঁরা সর্বশেষ বাধা পান। লোককল্যাণ, জীব জগতের কল্যাণ কামনা করে বসেন। এই যে জগৎ সংসারে জীবকোটি অজ্ঞানের মধ্যে নিরন্তর ভোগ কামনা ও ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছে, তাদের অজ্ঞান দূর করে পরম পদ আত্ম-স্বরূপের অপার আনন্দময় অবস্থায় তাদের উন্নীত করবার জন্য ব্যাকুল হন, সাযুজ্য, মোক্ষ এ সকল তাঁরা তখন চান না। তাঁরা পরমাত্মার সংস্পর্শে থেকে জগতের মধ্যে চৈতন্যের বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করতে চান। সেই গুরু-ধারার সঙ্গে

নিরন্তর সংযোগের ফলে তাঁরাও যথার্থ গুরুপদ-বাচ্য। অপরাপর নবীন অধিকারীরা আত্মচৈতন্য স্ফুরণে তাঁদের সাক্ষাৎ প্রভাব ও সহায়তা পান। পরে তাঁরা আবার আদর্শ হয়ে যান,—এই ভাবে গুরুধারার পারম্পর্য্য রক্ষা হয়ে চলেছে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশও চলেছে।

অপূর্ব এই গুরুতত্ত্ব,—আজ যে বস্তু পাইলাম,—জানি না জন্ম-জন্মান্তরের কতটা সুকৃতি থাকিলে এ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। আমার জীবন ধন্য বোধ হইল। এখন যে বস্তু অন্তরে পাইলাম, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হইলে, সৎগুরুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিলে তবেই না আমার জন্ম জীবন সার্থক হইবে। আমার মধ্যে কিন্তু ইহার পরেও আবার প্রশ্ন উঠিল—কুলগুরু প্রথার ব্যাপারটি কিরূপ ?

॥ ১০ ॥

এর পর কুলগুরুর কথা, আর বিস্তৃতভাবে বেশী কথায় না গিয়া অল্প কথায় শেষ করিব। এখনকার সমাজে কুলগুরুর অস্তিত্ব, কুল-পুরোহিতগণের মতই শক্তিহীন। আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিবর্তে বংশগত সংস্কারের বশেই চলিতেছে। এখন বর্ণাশ্রমের এবং বৃত্তির ব্যভিচার ঘটিয়াছে, অধ্যাত্মমার্গে গতি কোথায় ?—

তীব্র বৈরাগ্যের কাছে গৃহী কুলগুরু বা সন্ন্যাসী গুরুর ভেদাভেদ নাই। গৌণ বৈরাগ্যের অধিকারে কুলগুরুর সাহায্যে মন্ত্র দীক্ষার অনুষ্ঠান বংশগত সংস্কার ধরিয়া এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। কুল অর্থে পার, বংশধারা, মহান সৃষ্টি প্রবাহ, জীবের মূল চৈতন্য-শক্তি প্রভৃতি বহু ভাবেই ব্যবহার আছে। কুল হইতে কৌল, যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন। যথার্থ সন্ন্যাসী, মন্ত্রসিদ্ধ, তান্ত্রিক কৌল এখন দুর্লভ,—কিন্তু এক সময় এদেশে কুলধর্মের প্রবল্য এবং কৌলগণের প্রভাব কম ছিল না। ক্রমে ঐ নামটি সম্প্রদায়গত হইয়া গিয়াছে। তন্ত্রের প্রভাব ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুলগুরুর প্রাধান্যও ক্ষীণ হইয়া বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন কুলপ্রথা অনুসারে কুলগুরুর কাছে দীক্ষার ব্যাপার সমাজে প্রবল নাই ; যে যে সংসারে আছে—সেখানে প্রথা-হিসাবেই রহিয়াছে। জন্ম-লগ্ন ও রাশি প্রভৃতির বিচারে জাতকের ইষ্ট নিরূপণ করিয়া মন্ত্র দিবার ব্যবস্থা। মন্ত্র বলিতে বীজ,—তাহার নানা ভেদ বৈচিত্র্য আছে। এই কুলগুরু দীক্ষার প্রথায়, জপাৎ সিদ্ধিই হইল আসল কথা ; সাধন প্রণালীর মধ্যে কর্ম হইল জপ, জপের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরশ্চরণ, অভিষেকাদি ক্রিয়াফল লাভের ব্যবস্থা আছে।

ইহা দ্বারা ভগবান লাভ বা ব্রহ্ম চৈতন্যে সমাহিত হইতে পারা যায় কি ? ইহাতে মুক্তিলাভ হয় কি ?

শক্তিলাভ ঘটে এটি সত্য,—ভগবান লাভ অন্য কথা,—ঈশ্বরলাভ কোনও ক্রিয়া-সাপেক্ষ নয়,—এ কথায় এখনও সন্দেহ আছে নাকি ? যদি থাকে ত সে বড়ই মারাত্মক।

আমি বুঝিতে চাহিতেছি, এই যে জপাৎ সিদ্ধি,—এই সিদ্ধি কি ? এ সিদ্ধি কি ভগবান বস্তু লাভ নয় ?

তন্ত্রমতের যত কিছু ক্রিয়া সমাজে এতাবৎকাল প্রচলিত আছে,—সমস্তই শক্তি লক্ষ্য করিয়া। ফলে যথার্থ বৈরাগ্য এবং ভক্তির অবর্তমানে কুলপ্রথায়

দীক্ষা-গ্রহণের উপকারিতা এবং জপাদি ক্রিয়াভ্যাসের ফল শক্তিলাভ,—উত্তর উত্তর ক্রিয়ার প্রবল অভ্যাসের ফল প্রবল শক্তিলাভ। শক্তি বলিতে মনঃশক্তি, তাহাতে উচ্চ উচ্চ জাগতিক ভোগ বাসনা পূর্ণ হইবার অনুকূল অবস্থা পাওয়া। সংযমের আঁট না থাকিলে বিপদে পড়িতে হয়। পূর্বে, তান্ত্রিক দীক্ষায় গুরুর প্রথম কর্তব্য ছিল শিষ্যের কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ।

উহা কিরূপ?

সাধারণ জীবের অধ্যাত্ম চৈতন্য শক্তি সুপ্ত। তাহার প্রমাণ জীবের এই বহির্মুখী গতি, ধনৈশ্বর্য্যের, সম্পদের আকাঙ্ক্ষা। নিরন্তর অভাব বোধ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, এবং অবিরাম পরিবর্তনই যার গতি তার সেই পাশবন্ধ অবস্থা। এসকল যে দুঃখের হেতু এ বোধই নাই। কুণ্ডলিনী জাগরণে অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয়। যে সকল পার্থিব বিষয়কে সুখের হেতু বলিয়া ধারণা ছিল,—অধ্যাত্ম জীবনে সেই সকল বিষয় দুঃখেরই হেতু এই অনুভূতি হয়। পূর্বজীবন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অর্থ সম্পদাদি তুচ্ছ বোধ হয়। এই অবস্থাই হইল কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথম লক্ষণ। এই চক্ষে, স্থূল এই নয়নের দৃষ্টিতে যা এতদিন দেখা হইয়াছে তা সবই ভুল, তখনই এটি বুঝিতে পারা যায় যখন উপনয়ন হয়। উপনয়নের তত্ত্বই এই অধ্যাত্ম চৈতন্যের উদ্বোধনে। কারণ নেত্রের উন্মীলন।

সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইবার তন্ত্র-মতে কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। এই শক্তি জাগাইলেই যে সব হইয়া গেল তাহা নয়। কোন ক্রিয়া শক্তির ফলে ঐ শক্তি জাগিলেও, যদি ঊর্দ্ধগামী না হয়, অর্থাৎ যথার্থ আত্ম-চৈতন্যের পানেই সকল আকাঙ্ক্ষা গতিশীল না হয়, তবে উহা আবার সুপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে, কারণ উহার প্রথম হইতেই বহুকাল সুপ্তভাবে থাকাই স্বভাবগত। তোমার বিষয়ে বা ভোগবাসনায় টানও থাকিবে,—আবার ভগবান-লাভের জন্য সাধনাও চলিবে, তাহা কি করিয়া হইবে,—আর সে সাধনার ফলই বা কিরূপ হইবে?

তাহা হইলে ইহাতে কি গৃহস্থ জীবনে কোনও উপকার হয় না?

উপকার কিছু আছে বৈকি, না হইলে এখনও উহার ধারা এ সমাজে রহিয়াছে কেন? গৃহস্থের তীব্র বৈরাগ্যের অভাবে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং বংশগত অভ্যুদয় কামনায় সস্ত্রীক মন্ত্র-গ্রহণ এবং জপাদি ক্রিয়ার ফলে মনঃসংযম এবং শক্তিলাভ ত হয়। বংশগত সংস্কার এই ভাবে বংশধরের পার্থিব কল্যাণের হেতু হয়। পিতৃপিতামহ যখন এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদেরও ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য,—এই সংস্কার বশেই মন্ত্র-গ্রহণ সম্পন্ন হয়। ইহাতে অকল্যাণ ত নাই-ই পরন্তু ইহ এবং পর দুই কালেরই প্রবল একটি সহায় ও সম্বল হইয়া রহিল,—যেহেতু কুলগুরুগণের আদেশবাণী এইরূপ যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রগ্রহণ না করিয়া দেহত্যাগ হইলে পরলোকে গতি হয় না,—মন্ত্র পাওয়া চাই-ই। মন্ত্র গ্রহণ না করিলে পশুজন্ম ঘোচে না। তন্ত্র-মতে সংস্কারহীন দেহগত-বুদ্ধি জীবই পশু।

মন্ত্র কানে পৌঁছাইলেই কি পশুত্ব ঘুচিয়া যায়?

মন্ত্র বা বীজ, শব্দ মাত্র—সাধনের দ্বারা ঐ মন্ত্র বা বীজ চৈতন্য শক্তিতে শক্তিমান হয়। শুদ্ধ চিত্তে, ঐকান্তিক যত্নে, যথার্থ ভক্তিভাবে, অতি গোপনে নিজ নিজ সাধনের দ্বারা মন্ত্র জাগ্রত করিতে হয়। তখনই তাহার দ্বারা

পশুজন্মের শেষ হয় বা অনেক কিছুই হয়। শক্তিমান গুরুর নিকট জাগ্রত শক্তিমন্ত্র পাইলে,—এবং ভক্তিমান শিষ্যের মধ্যে সেই বীজ পড়িলে কালে তাহাতে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বীজ মাত্রেই শক্তিশালী বা জাগ্রত নয়। তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রবল চেষ্টা না থাকিলে যেমন বস্তুলাভ ঘটে না, সেইরূপ তীব্র আকর্ষণ অনুভূত না হইলে জাগ্রত মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন গুরুর যোগাযোগও ঘটে না।

আমার এখন কুলগুরুর কথায় আর দরকার নাই। পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, আধিপত্যলাভ, নানাবিধ শক্তিলাভ—যেগুলি ভগবানের বিভূতি, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। এখন অনুগ্রহ করিয়া এইটুকু সংশয়চ্ছেদ করুন,—যিনি বাক্য মনের অগোচর, মহান্, যিনি শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাব, অনন্ত চৈতন্যজ্যোতিঃরূপে যিনি সর্ব্বব্যাপী, বিরাট্, নিয়ন্তা স্রষ্টা, পাতা ধাতা, আমাদের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞান ও কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সেই অনন্ত পূর্ণ সৎ চিদানন্দ ঘন যিনি, তাঁহাকে আমাদের কোন প্রকারে ধরিবার সাধ্য নাই, অথচ তাঁর সম্পর্কেই জগতের সকল বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ ও আস্বাদন চলিতেছে,—তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ কি কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই? যখন ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে পাইতে পারিব না,—তবে কি নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, আর নানাবিধ তুচ্ছ মোহের অন্ধকারে আমি আচ্ছন্নই থাকিব,—তাঁর সঙ্গে আমার এ ব্যবধান কি ঘুচিবে না?

উহার উত্তর এই যে,—

তোমার তাঁকে ধরিবার, জানিবার বা অনুভব করিবার সাধ্য নাই—ক্ষুদ্র তোমার শক্তি, তুমি তাঁহাতে পোঁছাইতেই পার না—ইহা সত্য—কিন্তু তিনি তোমার মধ্যে প্রকাশ হইতে পারেন, জন্ম জন্মান্তরের ভেদ ব্যবধান ঘুচাইয়া তোমায় আত্মসাৎ করিতে পারেন। তুমি পার না, তিনি পারেন, আর সেইটাই ভরসা।

মেঘে ঢাকা সূর্য্যও যেমন জগতময় আলো যোগান, মেঘলোক ভেদ করিয়া তাহার আলো আমরা পাই, দিনমানে একেবারে রাত্রির গাঢ় আঁধার হয় না—তেমনি পরমাত্মার চৈতন্য-জ্যোতির নিরবচ্ছিন্ন অভাব হয় না, যদিও সাধারণের কাছে অজ্ঞান-আঁধারে কয়েকটা স্তর ঢাকা থাকে।

মহারাজের পত্র আসিয়াছে। আমার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। কালিকানন্দজীকে দিয়া লিখাইয়াছেন। আদেশ হইয়াছে যে হাজারী পাণ্ডার হাতে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া যেন চলিয়া যাই। আর, কখনও তাঁর কোনও আশ্রমে, বিশেষত বৃন্দাবনের রাধাবাগের আশ্রমে, আমি যেন আর প্রবেশ না করি, অর্থাৎ তাঁহার আশ্রমের নিকট আমার চির বিদায়। ভাষা আরও একটু কঠিন ছিল, একটু সংযত ভাবেই বলিলাম। শিবানন্দ আনন্দিত হইল কি দুঃখিত হইল বুঝিতে পারিলাম না, মুখখানি তার গম্ভীর হইয়া গেল।

আমি মুক্তি পাইয়া আর বিলম্ব করিলাম না। নাগ মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি নাই, আবাদের জমিতে লোকজন লইয়া ব্যস্ত আছেন। তার পর মহানন্দের কুটীরাশ্রমে গিয়া একবার শেষ বিদায় লইয়া আসিলাম। তার পর লাঠি কম্বলাদি লইয়া পাড়ি দিলাম।

মনে মনে একটা বিষম বেদনা লইয়া চলিলাম। সে বেদনাটুকু—ভুবনেশ্বরের মধ্যে এই যে দুই মাস কাল কাটাইলাম, এই ভূমির রূপ, রস, গন্ধ, এবং মুক্তবায়ু,—প্রাচীন শিবালয়-পূর্ণ স্থানের মাহাত্ম্যে মহীয়ান

অনির্বচনীয়, বিশাল এবং গভীর জঙ্গল-বেষ্টিত নানা ধ্বংসস্তূপে, করুণ দৃশ্যে পূর্ণ, সুন্দর ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র আর তাহার কুণ্ডগুলি প্রাণের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—ছাড়িবার সময় উহা তীব্র অনুভব করিলাম। এইখানেই যদি জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারিতাম! কিন্তু নিয়তি অন্যত্র টানিতেছে। যদি ঐ ব্রহ্মচারীর আশ্রম-সম্পর্কে এখানে না আসিতাম তাহা হইলে এতটা অশান্তি ভোগ করিতে হইত না। বোধ করি এত শীঘ্র যাইতেও হইত না।

আরও আক্ষেপ আছে।—কেন? কি প্রয়োজন এত ঘোরাঘুরি করিবার? এক স্থানে বসিয়া গেলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়। এমন স্থানে নিভৃতে, বিশাল, নীরব এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় মনের সকল চাঞ্চল্য যেন স্বতঃই শান্ত হইয়া আসে। এইখানেই যদি থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে প্রার্থনার বিষয় আর কি ছিল।

তাহা কিন্তু হইবার নয়। সাত ঘাটের জল খাইতেই হইবে, গুরুও অনেক পাওয়া যাইবে,—কিন্তু মর্ম বুঝিবে কে?—এই ধরিত্রীর অন্তর্গত সকল বস্তুই ত সেই অনন্ত চৈতন্য সত্তার দিকে লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিতেছে—প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুটি, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুটি সেই সত্তার পানেই লক্ষ্য ফিরাইতে প্রেরণা দিতেছে, কিন্তু সেদিকে ত দেখিব না। দেখিলে ত আমার কর্ম ক্ষয় হইয়া যাইবে, শান্তি লাভ করিতে পারিব। ছুটাছুটির ব্যাপার ফুরাইবে! হায়, হায়! কর্ম না ছুটিলে—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম,—কর্ম-ফল ভোগ ছুটিবে কি করিয়া! দেখা ও শুনার ভোগ আরও কত আছে কে জানে!

এই সকল মহৎ-সঙ্গ—ইহার জন্য প্রাণটা কাঁদিতেছে। যদি মহারাজের পত্র আরও অনেকদিন পরে আসিত ত বেশ হইত। কিন্তু সে পত্র এমনই পত্র যে, উহা প্রাপ্তিমাত্র আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। এমনই বিষয়ের স্বার্থ-বিষে জর্জরিত এই পত্রখানি এবং তাহার এমনই উপদেষ্টা যাঁহার মুখ হইতে এই পত্রের নির্দেশ আসিয়াছে। আবার যদি কখনও এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিবার যোগাযোগ হয় ত তখন আর ক্ষুদ্র স্বার্থ-জর্জরিত কোনও অধিকারীর আশ্রমে নয়, কোনও মুক্ত স্থানে, বিনা চুক্তিতে যেখানে থাকা যায়—এমন কোন মুক্ত স্থানে আসিব, কোনও বাধা না মানিয়া এই বিমুক্ত ক্ষেত্রে ডুবিয়া থাকিব।

ভুবনেশ্বরের নিকট বিদায় লইয়া স্টেশনের দিকে যাত্রা করিলাম। অর্দ্ধেক পথে আসিয়াছি পিছন হইতে কে যেন অঙ্গ স্পর্শ করিল—আমাকে একেবারে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল। দেখি—সনাতন, পাণ্ডাদের একটি ছেলে। সে আমাকে ভালবাসিত,—বড়ই অনুরক্ত ছিল। মাঝে মাঝে মন্দিরে গেলে সে আসিয়া কাছে বসিত, কত কথাই কহিত। কিছু চাহিত না,—মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যাইবার কথা বলিত। কলিকাতা যাইবার তার বড় ইচ্ছা। কে একজন তার আত্মীয় কলিকাতায় গিয়াছে, সেইখানেই আছে, তাই তার মনের মধ্যে সেখানে যাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ঘরে তার মন টিকিত না। ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া চলিতেছি একথা সে জানিল কি প্রকারে? চুপি-সারে এতটা পথ পিছনে পিছনে আসিয়াছে—জানিতেও পারি নাই।

পরনে তার একখানি কৌপীন মাত্র, বাড়ীতে যা পরিয়া থাকে তাই পরিয়াই আসিয়াছে। এখন কি করিয়া তাহাকে ফিরাই। গতি ভঙ্গ হইল।

তাহাকে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলাম যে—এখন আমার সঙ্গে যাওয়া হইতেই পারে না, আমার থাকিবার স্থান নাই—তাহাকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিব।

আরও একটু বড় হইলে কাজকর্ম শিখিয়া কলিকাতায় গেলে ভাল হইবে। যতই কিছু বলি না কেন,—তাহার কোন কথা নাই কেবল, মুড়কি কড়কতা জিব।

তাহাকে দুই আনা পয়সা দিলাম,—আবার যখন আসিব তাহাকে লইয়া যাইব বলিলাম। তাহাতেও সে রাজী নয়। সুতরাং ফিরিতে হইল। সে ফিরিতে রাজী নয়। ভাল বিপদ,—এখন কি করা যায় ; কি করিয়া ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাইব।

ফিরিলাম,—দ্রুত ফিরিয়া অনেকটা দূর চলিয়া আসিয়াছি, দেখিলাম সনাতন ফিরিয়া আমার দিকে আসিতেছে। আমি চলিতে লাগিলাম। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি—সনাতনের পিতা ও আর একজন চাদর গায়ে, লাঠি হাতে চলিয়াছে। ভাবিলাম, বোধ হয় তাহাকেই খুঁজিতে যাইতেছে। নিকটবর্তী হইলে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, যে তারা সনাতনের সম্বন্ধে কোনও সংবাদই রাখে না। সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিতে তাহার পিতা বলিলেন : মুত সাক্ষী গপাড় যাউচি, এঁখড় যাই পারিব নি, ও শড়া কুথা, কি করুচি? যাউ, মরু,—কঁড়করিমি।

মন্দ নয় ত। আর কিছু না বলিয়া নিকটে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম। ততক্ষণে তাহারা চলিয়া গেল। পথে নিশ্চয়ই তাহাকে পাইবে এবং কিরূপে সম্ভাষণ করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, যদি মারধোর করে। বেচারা সনাতনের কি নিগ্রহ!

অল্পক্ষণেই দেখিলাম সনাতন দৌড়াইতেছে—প্রাণপণে তাহাদের গ্রামের দিকেই ছুটিতেছে। বোধ হয় তাড়না পাইয়াছে। আর তাহাকে না ডাকিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উঠিলাম।

সনাতনের পলাতক মন ; গৃহে, যেখানে নিরন্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম এবং তাড়না ভোগ করিতে হয় সেখানে থাকিতে পারিবে না। আমার নিজের বাল্য-জীবনের যে দুঃসহ দুঃখময় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে—তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় আমার জীবনের সঙ্গে যেন সনাতনের কোথায় একটি ঐক্য সূত্রের যোগাযোগ আছে, যাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। বাড়ীতে আমারও মন বসিত না, বাড়ীর কাহারও আমার প্রতি স্নেহমমতা ছিল না, এক ঠাকুরমা ছাড়া কাহারও আমার উপর টান ছিল না। পিতা মাতা কাহারও স্নেহের ধারায় আমার বাল্যজীবন সিক্ত হয় নাই—অথচ আমার কি ছিল না, সবই ত ছিল,—ছিল কেন, এখনও ত আছে।

এখন কোথায় তারা—আমিই বা কোথায়—কেহ আমার কথা ভাবে কি না কে জানে। তবে এটুকু জানিতাম, একজন আছে, সে আমি ছাড়া আর কাহাকেও জানে না—সে বিষণ্ণ জীবন লইয়া পিত্রালয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাকেই স্মরণ করিয়া দিন কাটাইতেছে।

পথে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। আরও কতকটা আসিয়া এক বৃক্ষতলে ছয়-সাতজন বসিয়াছে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। কথা কহিতেছে একজন, —গাছের গোড়ায় একটু উচ্চস্থানে বসিয়া খর্বাকৃতি যুবা—ছাইমাখা,—মাথায় চুলের পাক-বাঁধা। আর পাঁচজন নীচে তাঁহাকে ঘিরিয়া কথা শুনিতেছে, আবার কি একটা বস্তুও যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ঠাণ্ডা ছিল সেদিন, আকাশ মেঘে ভরা। কিন্তু বৃষ্টি যা হইবার কাল রাত্রে হইয়া গিয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছে। যে কয়টি মূর্তি বসিয়াছিল তাহারা উড়িষ্যার লোক, তবে এ অঞ্চলের অর্থাৎ ভুবনেশ্বরের অধিবাসী নয়।

বৈষ্ণব এবং শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই বোধ হয়। গায়ে সকল-কারই চাদর জড়ান। মধ্যে একটু উচ্চ আসনে বসিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন—ঠিক তাঁহার সম্মুখে একজন স্থূলকায় ব্যক্তি, মাথার কেন্দ্রে কতকটা টাক পড়িয়াছে। তিনি হাতে গাঁজার জট হইতে বীচি বাছিতেছিলেন, আর তাঁহার পাশে একজন ভাং পিষিতেছিলেন, আর একজন জল লোটা প্রভৃতি লইয়া ব্যস্তভাবে সহায়তা করিতে অগ্রসর। দেখিলাম, গাঁজাগুলি ভাং-এর সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইল এবং পেষণ চলিতে লাগিল। গাঁজা ও ভাং একত্র বাটিয়া খাইতে এই উড়িষ্যা মুলুকেই দেখিলাম। এতদিন এক একটি নেশা কেহ কেহ উপভোগ করিয়া থাকেন দেখিতাম, এখন দুইটি তীব্র মাদক, একটি বাটিয়া ছানিয়া পান করিবার এবং অপরটি যাহা অগ্নি-সংযোগে ধূমপানের জন্যই প্রসিদ্ধ জানিতাম—এখন এই দুইটির একত্র সংযোগে পানের ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কি প্রচণ্ড নেশাই ইহারা বরদাস্ত করিতে পারে।

কিছুক্ষণ ঐস্থানে ছিলাম। অন্য উদ্দেশ্য ছিল। ভাং পানের পর ইঁহারা কি করেন দেখিবার জন্যই বসিলাম। আমায় বসিতে দেখিয়া তাঁহারা

বোধ হয় ভাবিলেন আমিও তাঁহাদের একজন। এ ভ্রম তাঁহাদের বেশীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের পানাদি শেষ হইলে যখন আমি কিছু ভগবৎকথা শুনিতে চাহিলাম, তাঁহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পরে একজন বলিলেন, আমরা কি জানি, মূর্খ লোক, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনারা কোনও দেবতার উপাসনা করেন ত ?

মধ্যাস্থিত স্থূলকায় ব্যক্তিটি বলিলেন : মহাবিষ্ণু—আর তার উপর কোনও দেবতা আছে নাকি ?

এইবার উচ্চাসনে জটা-বাঁধা যুবাটি গলার রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া হুঙ্কার

করিয়া বলিল : ও কি কথা, শিব শিব, মহাদেব শঙ্কর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, তার পর আর শ্রেষ্ঠ ভগবান কেউ আছে নাকি ?

আর একজন দুই একটি পান মুখে পুরিয়া, একটু গুঁড়ি হাতে ঢালিয়া বলিল : হাঁ, সকলকার দেবতা সকলের কাছে শ্রেষ্ঠ, যার যেমন ভক্তি। সকলেই বড়—কেউ ছোট নয়।

এমন যখন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে তখন দেখি—একটি ওভারকোট জড়াইয়া একজন কলিকাতার অজীর্ণ রোগী, শীর্ণকায় হাত দুটি পকেটে রাখিয়া ধীরে ধীরে বড় রাস্তা হইতে এই দিকেই আসিতেছেন। বাঙ্গালী দেখিয়া মনে কেমন একটু আনন্দ হইল, কথা কহিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু উপস্থিত সংযত হইলাম। তিনি যখন বাঙ্গালী সন্দেহ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন তখন একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছেন বোধ হয় ? তিনি, হ্যাঁ, বলিয়া একটু জোর করিয়া হাসিলেন।

আমি সামনের সাধু মণ্ডলী দেখাইয়াই বলিলাম : এই এঁদের কথা শুনছি—

তিনি : ওরা গাঁজাখোর, ঘোর মূর্খ ; পৌত্তলিক ব্যাটাদের কথা কি শুনবেন ? ওদের কথা কি শুনবার মত ? হ্যাঁ—

বুঝিলাম ইনি ব্রাহ্ম হইবেন। বলিলাম : এদের কথা শুনলে ত কিছু ক্ষতি নাই,—দেখা যাক্ না কি বলে এরা।

—এরা আকাট মূর্খ, ফিলসফি পড়েনি, রিলিজানের কি বোঝে ? ওয়ার্থলেস্,—বলিয়া তিনি একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন।

এদিকে, তখন, সেই প্রথম বক্তা—দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— তোমার শিবের রূপ ব্যাখ্যান কর ত। তাঁর রূপ কি ? কি রূপে ধ্যান কর, বল ত ?

উৎসাহে পূর্ণ হইয়া শৈবভক্ত আরম্ভ করিলেন,—কেন, শিবের চারি হাত, পঞ্চ মুখ, দিগম্বর, ত্রিনয়ন, শুভ্রবর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি—

একটু মুচকি হাসিয়া সেই বৈষ্ণব সাধু তখন বলিলেন : এ ত সাকার রূপ, তিনি কখনও শ্রেষ্ঠ দেবতা হতে পারেন,—পাঁচ মুণ্ড, চার হাত, ত্রিনয়ন এ সকল যতই বড় হোক না কেন পূর্ণ শক্তিমান অনন্ত হতে পারেন না। একটি রূপ কল্পনা করলেই ত অনন্তত্বে বাধা পড়ে।

তখন শৈব জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও ত সাকার। বল দেখি এই ভাবে ধ্যান কর কি না ?

—আমাদের মহাবিষ্ণু, নিরাকার, বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, বিরাট, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ইত্যাদি—তাঁর কোন খণ্ডরূপ আমরা ধ্যান করি না।

দলের মধ্যে ফোঁটাতিলকমালা-বিহীন এক মূর্তি তখন জিজ্ঞাসা করিল : অনন্ত—নিরাকার—বিরাট,—এ সকল যা বললে এ সকল ধ্যান কর কি করে ?

তার মুখটি শুকাইয়া গেল—একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল : কেন ধ্যান হবে না ? নিরাকার—যেমন আকাশ, ঐ রকমই ধ্যান হয়।

তখন মধ্যস্থ যিনি, অনন্তের ধ্যান কর কি করে ? এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিরাকার মহাবিষ্ণুর ভক্ত বলিলেন : অনন্তের ধ্যান কি করা যায় ?

তাহার আর সে ভাব নাই, এখন বেশ সাহস হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ পাইলাম।

কলিকাতার বাবুটি তখন একটু উতলা হইলেন,—গমনোদ্যত হইয়া বলিলেন: চলুন, আমরা ওদিকে গিয়ে একটু কথা কই, এ বেটাদের আবার ধর্ম-মীমাংসা! হাসিয়া বলিলাম: আর একটু।

মধ্যস্থ ব্যক্তি তখন উৎসাহে বলিতে লাগিলেন: ঠিক কথা। অনন্তের ধ্যান কি হয়? আমাদের মন বুদ্ধি সংকীর্ণ, বিশ্বব্যাপী অনন্ত সত্তাকে ধরতে পারব কেন! বল ত বাবু?—

বাবুর মুখে আর কথা নাই, আমার দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে একবার, চলুন, চলুন, বলিলেন।

আমি বলিলাম: আহা, ইহারা আপনার কাছে যে কথা উপস্থিত করেছে তার কি করলেন?

তিনি যা বলিলেন সে কথায় আর কান না দিয়া সেই মহাবিষ্ণু ভক্তের কথায় লক্ষ্য করিলাম। তিনি বলিলেন: আমরা মানুষ, ক্ষুদ্র মনে ছোট ছোট জিনিস নিয়েই ব্যবহার করি—লেখা পড়া যতই করি, পণ্ডিত হই, একশোটা যদি পাশ দি, তা হলে সেই ছোটই থাকব, বিশ্বব্যাপী পরবিষ্ণু ভগবানের ধারণা করবার মত উপযুক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় কখনও পাব না—সেই জন্য আমরা জ্যোতিঃ ধ্যান করি। মানুষের মূর্তি ভগবৎ ধ্যানের উপযুক্ত নয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের?

—আমরা মাধবাচার্য্যের। গুরুর কাছে ইষ্টকে মানুষ-মূর্তিতে ধ্যানের উপদেশ পাইনি।

বাবুটির মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—একে রুগ্ন তাহার উপর একেবারেই রক্তশূন্য।

॥ ১১ ॥

এখনকার য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রবল প্রভাবে এদেশের প্রবীণ শিক্ষিত মানুষ-গুলির মধ্যে বিদ্যার অভিমান এবং অশিক্ষিতজনের প্রতি অবজ্ঞা এতটা প্রবল দেখা যায়, যাহা লক্ষ্য করিলে লজ্জিত না হইয়া থাকা যায় না। অথচ পাশ্চাত্য-সমাজে এমন হয় না। সেখানে যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কোন না কোন প্রকারে উপকারে আসেন। অল্পশিক্ষিত জনের প্রতি উচ্চ শিক্ষিত লোকের ঘৃণা বা উপেক্ষা নাই।

একেই অর্থকরী বিদ্যা ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির জটিলতায় দুঃখ পাই, যথার্থ বলিতে কি, প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই আমরা সংসার, সমাজ ও ধর্মজীবনে আন্তরিকতা হারাইয়াছি: আলস্য, আপাত সুখকর মিথ্যা বস্তুর কুহকে সর্বদাই আচ্ছন্ন, আর সর্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে আমরা কতটা শক্তিহীন তাহা বোধ হয় নিত্যই অনুভব করিতেছি, কিন্তু কেহ ভাবিয়াছেন কি,—এই দুর্নিবার ব্যাধি—সত্যই কি এই মজ্জাগত দুর্বলতা রোগের বিরাম কখনও হইবে না?—সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার এই যে আমাদের এখনও এ বিষয়ে সচেতন হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কি আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য বঙ্গবাসীর স্বভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে,—যাহার প্রতিবিধানের সকল পথই আজ বিধাতার অভিশাপে বুঝি কঠিন ভাবেই অবরুদ্ধ।

এখন যাহা বলিতেছিলাম—আমাদের এই প্রবীণ নূতন ভদ্রলোকটি, যিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্যই এখানে আসিয়াছেন বলিয়া জানিলাম, অধীত ফিলসফি কলিকাতার বাবুটি ;—ইঁহাদের সর্বব্যাপী, নিরাকার মহাবিষ্ণুর উপাসনা সম্বন্ধে, জ্যোতিঃ ধ্যানের কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। পরে যখন তাঁহাদের একজন বাবুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ বাবু, আপনারা বিদ্বান পণ্ডিত লোক, আপনারা ভগবানের কি ভাবে উপাসনা করেন, দয়া করে যদি বলেন ত কিছু শিখতে পারি। আমাদের গুরু মহারাজ বলেছেন, সকলকার কাছেই কিছু না কিছু শিক্ষা করবার আছে।

বাবু তাঁর অসুস্থ বিরস মুখখানি বিকৃত করিয়া সগর্বে বলিলেনঃ আমাদের কথা তোমরা কি বুঝবে, ধর্ম ধর্ম করছ যে, ফিলসফি পড়েছ? তোমাদের শিক্ষা হবে কি করে, তোমাদের গুরুও গাঁজাখোর, মুখ্যু, জোচ্চোর লোক। তোমাদের মুটে মজুরী, ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরী করবারই কথা, তা না করে গাঁজা খেয়ে সাধু সেজে লোককে প্রবঞ্চনা করছ। তোমরা বদমাস, চোর, শঠ, ইম্পস্‌টার,—তোমাদের সঙ্গে কথা কইলে সময় নষ্ট। এই বলিয়া চলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন।

হঠাৎ যে তাঁর মেজাজ এতটা খারাপ হইবে ভাবি নাই,—অজীর্ণ রোগীরা প্রায়ই ক্রোধী, খিট্‌খিটে স্বভাব হয় জানিতাম, মনোমত কিছু না হইলেই একেবারে জ্বলিয়া উঠেন,—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু তাঁদের অসহ্য। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, এখানে তার ঔষধও আছে।

যেমন তিনি ঘৃণা-বিকৃত মুখে অগ্রসর হইবেন, একজন—যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—উঠিয়া এক লাফে তাঁহার সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বজ্র-মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বললেন বাবু! আমরা চোর, বদমাস, ছোট লোক, শঠ, ইম্পস্টার? যিনি এই কথাগুলি বলিলেন তিনি মূর্খত কখনই নন্, বরঞ্চ তিনি যে একজন পণ্ডিত তা তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণের ভাবেই বুঝা গেল।

কোথায় গেল বাবুটির সেই তেজ, দর্প, দুর্বিনীত দাম্ভিক বচন, জিঘাংসার ঘনীভূত মূর্তি। বাবুর মুখে রা নাই, চক্ষু নিস্তেজ, ভয়ে মুখখানি একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে, মড়ার মত বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ

দেখুন দিকি, অনর্থক এ সব কি ব্যাপার—অসভ্যতা, বর্বরতা। ছেড়ে দাও আমার হাত। বলিয়া একবার হাত ছাড়াইবার বিফল প্রয়াস করিলেন।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সেই সাধুটি আমার দিকে চাহিয়া, তাঁহার হাত না ছাড়িয়াই বলিলেনঃ আপনার কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি বলুন, এ বাবুটি আমাদের গুরুকে এবং সম্প্রদায়কে আক্রমণ শুধু নয়, অযথা কুৎসিত গালি দিয়েছেন কি না। ধর্মের দরবারে যদি যথার্থ বিচার হয় ত বলুন, কে অপরাধী সাব্যস্ত হবে? কে ছোট লোক, কে বদমাস্? বাঙ্গালী বাবুদের এ বড় অহংকার—

লজ্জায় আমি মরিয়া গেলাম।

সাধু ব্যক্তি আমার লজ্জা অনুভব করিলেন,—তখন বাবুর দিকে চাহিয়া

বলিলেন : আপনারা সব কি মনে করেন,—আপনাদের এই বিদ্যার চাপরাশ ভূতের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার পক্ষে কোনও সহায়তা করে—না বেশী করে দাসত্ব করবার, ক্রীতদাস হবার পথ প্রশস্ত করে দেয় ? আপনি ফিলসফি পড়েছেন, সেই অহংকারেই সাধু-সম্প্রদায়ের উপরে এই নীচ মনোভাব পোষণ করেছেন ? এই কি ফিলসফি অধ্যয়নের পরিচয় ? আপনার এই ভারতের দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান কতটুকু ? আপনারা ত পল্লবগ্রাহী। আপনার মত লোকের দর্শনশাস্ত্র

অধ্যয়নের অধিকার আছে বলে আমি স্বীকার করি না। যে মানুষ ইহ-সর্বস্ব, অর্থোপাসক জাতির পদলেহন করে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত এক পাও চলতে পারে না, তাদের ফিলসফি পড়ে কি ফল হয় ? একটু আভাষ মাত্র পেয়েছেন তাইতেই এই ? ধ্যান-ধারণা নেই, বিবেক বৈরাগ্য নেই, চিত্তশুদ্ধির

কোন উপকরণ সংগ্রহ না করে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে এই রকমই ত হয়ে থাকে। শকুনির মত উঁচুতে উঠলেই কি হয়? মন যে বিষয় বিভব আর ভোগ বিলাসের জন্য ছটফট্ করছে। সংযম কোথায়? নারীজাতিকে মাতৃজ্ঞান করতে শিখেছেন? ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য হয়ে টাকার পিছনে, ইন্দ্রিয় ভোগের পিছনে, ছুটবেন উন্মাদের মত—আবার দার্শনিক পণ্ডিতও হবেন,—এ কি সম্ভব? বলুন, আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, কারা বদমাস্, কারা শঠ, কারা ইস্পষ্টার। বলিয়া তাঁর হাতটি মৃদু নাড়িয়া দিলেন।

বাবুর মুখে এক অপূর্ব ভাব—না রাগ, না দ্বেষ, না দম্ভ, কেবল কতকটা ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ের চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা গেল,—কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কি আপদ,—কি কুক্ষণেই তিনি এদিকে আজ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। নিরুত্তর দেখিয়া প্রশ্নকর্তা পুনরায় বলিলেন: আপনি রোগী, দুর্বল, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, সেই জন্যই অসংযত বাক্,—দয়ার পাত্র। যে বিদ্যার অহংকারে আপনার সাধু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপর এরূপ ঘৃণিত মনোভাব উৎপন্ন করেছে—সে বিদ্যার অধিকারে আপনার নিজের কি কল্যাণ হয়েছে বলতে পারেন? ইহ-কালেরই বা কি ফল পেয়েছেন আর পরকালের জন্যই বা কি পাথেয় সঞ্চয় করেছেন? এইটুকু ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যে অবৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ফলে এরই মধ্যে শরীরটি জীর্ণ, রোগপূর্ণ করে রেখেছেন, স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য অর্থব্যয় করে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন—যদি কিঞ্চিৎমাত্র স্বাস্থ্য ফিরে পান ত আবার সেই ভোগে লেগে যাবেন। এ বিদ্যার ত এই পরিণাম,—ধিক্ আপনার বিদ্যা, যে বিদ্যালাভ করে মানুষ হয়ে মানুষকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয় না, পশুর মত হিংস্র স্বভাব নিয়ে সমাজে থাকতে হয়! আপনার মত বিদ্বান ও পশুতে প্রভেদ কি? নিরুত্তর কেন,—বলুন বলুন, আপনার কথা-গুলো সব কোথায় গেল?—

একটু জোর প্রকাশ করিয়া আবার তিনি হাত ছাড়াইয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিলেন এবং শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন: ছেড়ে দাও আমার হাত, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই না, যেতে দাও বলছি আমাকে, আমি তোমাদের নামে পুলিশে নালিশ করব, কেস্ আনব, জেল খাটাব, তখন দেখবে মজা, ভদ্রলোকের হাত ধরায় কত সুখ।

যুবা সাধুটি, তাঁহার এ কথায় যে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন এরূপ বোধ হইল না, হাতও ছাড়িলেন না। স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন: আমরা যখন চোর, বদমাস্, ইস্পষ্টার তখন সেই রকম ব্যবহার আমাদের কাছ থেকে আশা করাই উচিত—তাই-ই পাবেন। আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে যা খুশী বলুন, আমরা গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আপনি আমাদের গুরুকে লক্ষ্য করে অযথা গালি দিয়েছেন, কুকথা বলেছেন, সেজন্য আমরা আপনাকে ক্ষমা করতে পারব না। আপনারা গুরুহীন, ভ্রষ্টাচারী, অধঃপতিত, ম্লেচ্ছ-সংসর্গে কলুষিত,—গুরু মহাপুরুষের মর্ম কি বুঝবেন? আপনারা সংঘশক্তিহীন,—সংঘের মহান্ ধর্ম, —তার পবিত্রতা কি বুঝবেন? এই যে পাপ বাক্য আমাদের গুরু এবং সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করেছেন—এর জন্য দণ্ড আপনাকে নিতে হবে। যে মুখ থেকে আমরা গুরু-নিন্দা শুনেছি সেই মুখ থেকে পাপ রসনাকে

চিম্‌টে দিয়ে বার করে অগ্নিতে দগ্ধ করে ঐ পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আপনি প্রস্তুত হোন।

বাবুর মুখে এখন বিষাদের ছায়া স্পষ্ট, তবুও নরম হইলেন না। শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন: এটা মগের মুলুক নয়, ইংরেজ রাজত্ব, দরকার হয় ত তোমরা আদালতে অভিযোগ করতে পার, রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, একজনকে ধরে বে-আইনি আটক করবার বা দণ্ড দেবার কোনও অধিকার তোমাদের নেই। ছেড়ে দাও আমাকে।

তাঁহার হাত না ছাড়িয়াই যুবা সাধু বলিলেন: আপনি আমার কাছে অপরাধী। এমন দুর্বল কাপুরুষ আমি নই যে নিজের সাধ্য থাকতে অপরাধীকে দণ্ড না দিয়ে ছেড়ে দেব, তার পর এক বিচার-ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হব। সেখানে যার পয়সা বেশী সেই জয়লাভ করবে। সে সব আপনাদেরই শোভা পায়, আপনারা সভ্য বিদ্বান। আমরা, আপনাদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং শিক্ষায় বিশ্বাসী নই। আপনি প্রস্তুত হোন। পরে তিনি সাথীদের দিকে ফিরিয়া আগুন জ্বালাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

এতক্ষণ আমি এক দৃষ্টিতে এই দুজনের দিকে চাহিয়াছিলাম আর কথা শুনিতেছিলাম। এখন দলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—ইঙ্গিত মাত্রেই দলস্থ একজন ধুনির আগুনে বাতাস দিতে লাগিল, অপর একজন একখানা লম্বা কাঠ তাহাতে ফেলিয়া দিল। যুবা তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া। বাবুর মুখখানি আতঙ্কে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহার প্রতিবাদের কোনও শক্তি নাই। কেবল দুই-একবার আমার দিকে কাতর নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আমার এক একবার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। সত্যই কি ইহারা বাবুটির জিভ টানিয়া পুড়াইবে নাকি? যদি তাহাই হয় তবে আমার কিছু কর্তব্য আছে, এতটা কখনই হইতে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যুবা সাধুটীর মুখে সাত্ত্বিকভাবের লাবণ্য এবং অন্তরের পবিত্রতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা এমন একটা কাজ কখনও কোনও অবস্থায় হইতে পারে কিছুতেই বোধ হইল না—অন্তরে বুঝিলাম এটি তাঁর অভিনয়—কিন্তু এমনই তাঁর দৃঢ় সংযম এবং গম্ভীর ভাবটি, যে কিছুই বুঝিবার যো নাই।

এইবার বাবুটির চক্ষে জল আসিয়াছে—দেখিতেছেন, এখানে তাঁর কোনও জারিজুরী খাটিল না, এখন নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে ইহারা তাঁহার ব্যবহারে এতটা মর্মাহত হইয়াছে যে প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না,—আর আমার দ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন প্রথম হইতেই সম্ভব হয় নাই, যেহেতু তাঁহার কোন মন্তব্যই আমি অনুমোদন করি নাই বরং তাহাতে বিরক্তির ভাবই আমার মুখে পরিস্ফুট দেখিয়াছেন। তথাপি সজল নয়নে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: এরা সত্য-সত্যই আমার জীবন্ত মুখে আগুন লাগাবে নাকি? এদের জেলের ভয় নেই?—

আমি মৃদু স্বরে বলিলাম: আপনিই এঁদের অপমান করেছেন,—মর্মে আঘাত করেছেন; সেটা ওদের বিষম লেগেছে। আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। জেলের ভয় যে এদের নেই সে ত আপনি বুঝতে পেরেছেন, এক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না।

তখন তিনি সাধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন: আমি না হয় এপোলজি চাইছি।

যুবা সাধুটি গম্ভীর ভাবে বলিলেন: আপনি যে অনুতপ্ত হয়েছেন তা বোধ হয় না, ওরকম মৌখিক এপোলজি আমাদের প্রাণে সাড়া দেয় না।

তিনি এবার সাধুর দৃঢ়তা দেখিয়া দমিয়া গেলেন। তখন জোড়হাত করিয়া বলিলেন: যথার্থই যদি আপনারা আমার কথায় মনে আঘাত পেয়ে থাকেন, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং অনুতপ্ত—আমার অন্যায় হয়েছে, আমি এখন বুঝতে পেরেছি।

এবারে যুবা পুরুষ তাহার হাতটি পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন: যদি সত্য সত্যই আপনি বুঝতে পেরে থাকেন যে কি অন্যায় করেছেন—তাহলে প্রতিজ্ঞা করুন ভবিষ্যতে আর কখনও ভাল করে না জেনে-শুনে সাধু সন্তদের সংঘ এবং গুরুকে লক্ষ্য করে কোনও প্রকার অযথা কথা বলবেন না,—কু-কথা মুখে আনবেন না।

তিনি জোড়হাতে বিনীতভাবে বলিলেন: তাই স্বীকার করছি।

তখন যুবা সাধুটি কোমল অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন: এটা আপনার জেনে-রাখা উচিত যে এই হিন্দুস্থানের সাধু সম্প্রদায় কোন প্রকারে আপনাদের গৃহস্থ-সমাজের ক্ষতি ত কখনই করেন না, বরঞ্চ অশেষ কল্যাণই করে থাকেন। একটু অনুসন্ধান করেই দেখবেন পৃথিবীর সব সভ্যদেশে যেমন এখনেও দেখবেন—সকল দিকেই এই ভারতে সাধু-সম্প্রদায় গৃহস্থের অশেষ কল্যাণের কাজে বহু পূর্বকাল থেকেই রত আছেন,—তার বিনিময়ে তাঁরা যা পান তা নগণ্যই। ব্যক্তিগত অন্যায় যে কোনও সাধুর হয় না তা বলছি না—সম্প্রদায়ের কথাই বলছি। এই সাধু-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—আপনি আমি করিনি—এর সৃষ্টির মূলেও পরমাত্মার একটা অভিপ্রায় আছে। কি যে সেই অভিপ্রায়—তা বুঝতে চেষ্টা করুন। এই বিশাল জ্ঞান ও শক্তির রাজ্যে যে যে-তত্ত্বই অনুসন্ধান করে, সে অবশ্যই সেটা পেয়ে থাকে, পেয়ে আসছে, আর ভবিষ্যতেও পাবে। আন্তরিক ইচ্ছা করে লাগলেই হ'ল। আপনি রোগী বলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি —আপনি কি দৈবশক্তিতে আরোগ্য বিশ্বাস করেন?

তিনি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন: ওসব বুজরুকি আমি মানি না।

যুবা বলিলেন: না মানেন বা না বিশ্বাস করেন তা'তে ক্ষতি নেই—একবার পরীক্ষা করে দেখুন না—এই একটি ঔষধ আপনাকে দি, আপনি কাল স্নান করে, ভগবানকে স্মরণ করে এটি একটি মাদুলিতে ধারণ করবেন, ডান হাতে ধারণ করবেন,—কিছু খেতে হবে না। এক দুদিনের মধ্যেই গুণ বুঝতে পারবেন। ছোট তামার মাদুলী একটা হাতে রাখতে কোনও অসুবিধা হবে না। অন্ততঃ তিনটি দিন রেখে, পরে যে জামা পরবেন তার বুকের পকেটে রেখে দেবেন, তা হলেও হবে।

তিনি তাঁর আসনের ধারে একটি ঝুলি হইতে কি একটি বাহির করিয়া বাবুর হাতে দিলেন। বাবুটি উহা হাতে লইয়া একবার দেখিয়া পকেটে রাখিয়া বলিলেন: আচ্ছা, প'রে দেখব। পরে একটু হাসিয়া—আচ্ছা তা হলে আসি —থ্যাংস্. মেনি থ্যাংস্,—বলিয়া উন্নত মস্তকে নাকের ডগায় হাত ঠেকাইয়া গুটি গুটি চলিলেন।

দুই-চার পা চলিয়া কি ভাবিয়া তিনি আবার ফিরিলেন। পুনরায় সেইখানেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনারা এই ট্যালিস্‌ম্যানের জন্য কত চার্জ করবেন, যদি ফল পাওয়া যায় ?

যুবা সাধুটি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন : এটা আমাদের কারবার নয়। গৃহস্থদের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত পাত্র বুঝলে আমরা এটা দিয়ে থাকি, এর জন্য চার্জ করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না, তবে আপনার পীড়া আরোগ্য হলে গরীবদুঃখীকে কিছু দান করবেন যদি ইচ্ছা হয়।

বেশ,—বলিয়া বাবুটি চলিলেন, এবং দুই-চার পা চলিয়া আবার তাঁহাকে ফিরিতে দেখা গেল। এবারে নূতন কথা—আপনারা গাঁজা ভাং খান কেন? —না খেলে কি হয়, খেলেই বা কি হয় ?

—আপনাদের মত ত আমাদের বাড়ীঘর নেই, জলবৃষ্টিতে শরীরকে রক্ষা করবার স্থান সব সময় পাওয়া যায় না। শীত গ্রীষ্মে হয়ত বনে জঙ্গলে, মাঠে, পথে, নানা দেশে, নানা প্রকার জল বায়ুতে, মশার কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। খাবারও সব সময় পাওয়া যায় না, দুই-চার দিন বিনা আহারেও কখনও কখনও কাটাতে হয় ; হয়ত জুটলোই না।—আমাদের মধ্যে আবার কারো কারো অজগর বৃত্তি, কারো বা মাধুকরী বৃত্তি ইত্যাদি আছে, সেই জন্যেই গাঁজা বা ভাঙে আমাদের অভ্যস্ত হতে হয়, যাতে আমরা আমাদের তপস্যার উপযোগী করে শরীরকে গড়ে নিতে পারি। তপস্যার পক্ষে এই নেশাগুলি অশেষ ফলপ্রদ, আমাদের এইরূপ সংস্কার জানবেন—কিন্তু ভোগের পক্ষে নয়। ভোগের পক্ষে এইগুলি বিষময় ফল প্রসব করে, নানা রোগ উৎপন্ন করে।

বাবুটি সেই আর্দ্র তৃণগুল্ম-বিস্তৃত কঙ্করময় স্থানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, সত্য নাকি? তাই ত, আমরা ত মনে করি এগুলো নেশার জন্য খাওয়া হয়, তা—তাহলে ত—বাস্তবিক আমরা ভুল বুঝে আপনাদের উপর নানা অবিচার করি। বাস্তবিক, তাই ত, তাই ত,—হয় ত তাহলে এগুলোর একটা মেডিসিনাল্‌ কোয়ালিটি আছে।—আপনার কথা আমার এখন বিশ্বাস হচ্ছে বটে, তাহলে ত আপনাদের খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। আপনারা কদিন এখানে আছেন ?

—কাল প্রাতে আর আমাদের এখানে দেখতে পাবেন না। বর্ষার চারমাস ছাড়া আমরা কোথাও ত্রিরাত্র যাপন করি না। এই নিয়ম।

—তাই ত, তাই ত—আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আপনাদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা কই—তা তা আপনারা এত শীঘ্র চললেন !

—আমাদের এই রকমই—বলিয়া যুবা একটু হাসিলেন।

বাবু আর একটু বসিয়া মাথা নামাইয়া নমস্কার করিয়া বিষণ্ণ মুখে উঠিলেন, ধীরে ধীরে চলিলেন, আর ফিরিলেন না।

সম্মুখে এই যে ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল তাহার আদ্যন্ত সবটাই আমার ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল। আমিও গুটি গুটি তাঁহাদের নমস্কার করিয়া ষ্টেশনের পথে পাড়ি জমাইলাম। ঔষধে বাবুর কোনও ফল হইল কি না, অথবা ঔষধটি মূলেই ধারণ করিলেন কি না—সে খবর আমি জানিতে পারিলাম না।

পরদিন কলিকাতায় পেঁৗছিয়া কুলদাবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আনন্দে আমায় গ্রহণ করিলেন। কথা হইল আমরা পরদিন নবদ্বীপে

যাইব। সেখানে একদিন থাকিয়া পরে সিউড়িতে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হওয়া যাইবে। পরে সেখান হইতে বীরভূমে পীঠস্থানগুলিতে যাওয়া যাইবে।

*　　　*　　　*

আমরা নবদ্বীপে আসিয়া যেখানে উঠিলাম সেটি একটি মেটারনিটি হস্‌পিটাল, ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম মাতৃমন্দির। কুলদাবাবুরাই এই আশ্রমটি সাধারণের নিকট ভিক্ষালব্ধ অর্থে গড়িয়া তুলিয়াছেন। একটু বিশেষত্ব আছে, এ ধরণের প্রতিষ্ঠান আমাদের বাঙ্গালায় আর কোথাও আছে কি না জানি না। কতকটা য়ুরোপের অরফ্যানেজের মতই।

১৯১৪-১৫ সালে আমরা কুলদাবাবুর ভাগবত বক্তৃতা, কলিকাতার নানা স্থানে অনেকবারই শুনিয়াছি। সেই সময়ে ভাগবৎ-প্রসঙ্গে বক্তৃতার পর—শেষে পৃথক ভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সর্ব-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রোতৃবর্গের নিকট বলিতেও কয়েকবার শুনিয়াছিলাম। নবদ্বীপে মেলা মহোৎসব উপলক্ষে বহু নরনারীর সমাগম হয়। সে সময় অনেক পথভ্রষ্ট নরনারীও আসে। তাহাদের মধ্যে বহু গর্ভবতী নারী লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের সমাজ হইতে পলাইয়া এখানে গোপনে ভ্রূণ-হত্যাদি পাতকে লিপ্ত হয়। অবৈধ প্রণয়ের কণ্ঠক মনে করিয়া এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সন্তান প্রসব করিয়া কেহ পথে ফেলিয়া, কেহ বা গঙ্গায় ভাসাইয়া দেয়। এইরূপে অনেকগুলি জীব, এই জগতের আলোক দেখিবার পূর্বেই পরলোকে পুনঃ প্রস্থান করে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণে এইরূপ শিশুহত্যা হয় তাহার সংখ্যা অল্প নহে। কুলদাবাবু প্রমুখ কয়েকজন মহাপ্রাণ এবং ভক্তিমান কর্মযোগী এই অসহায় শিশুগুলির রক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়া এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এদিকে সাধারণের দৃষ্টি এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও উপকরণের সাহায্যে শিশুগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের যে এই কর্মে প্রবৃত্তি তাহার মূলে ছিল ভগবৎপ্রেরণা। ইতিমধ্যে অনেকগুলি শিশুকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া তাঁহারা যথাশক্তি প্রতিপালনের ভার লইয়াছেন। এখানে বিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে যথারীতি প্রসবের ব্যবস্থা আছে। যতদিন মাতৃক্রোড়ের আশ্রয় প্রয়োজন মনে করেন, ততদিন শিশুদের সঙ্গে জননীদেরও প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে, পরে পৃথক করা হয়। যে সকল জননী অতঃপর সৎভাবে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সমাজে থাকিতে চান, এখানে তাঁহাদের জন্য পৃথক বিভাগে কর্মের ব্যবস্থা আছে। ক্রমে ক্রমে এখানে অনেকেই এই আশ্রমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আশ্রমে আট-দশটি জননীর সন্তান লইয়া থাকিবার মত ব্যবস্থা এখন হইয়াছে, ক্রমে বিস্তৃতির আশাও আছে।

আমরা সন্ধ্যার পর নবদ্বীপ পেঁাছিয়া আশ্রম সংশ্লিষ্ট কার্য্যালয়ে উঠিলাম। মাতৃমন্দির হইতে ইহা পৃথক্। কর্মীরা এবং বাহিরের কেহ আসিলে এখানে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাপন-প্রণালী, ভোগ-ব্যসনাদির জটিলতা নাই। যতটুকুতে প্রাণধারণ করা যায় ততটুকুই আছে। কুলদাবাবু কর্মোপলক্ষে আসিলে এইখানেই থাকেন। এখানে এখন উপস্থিত হইয়াই কুলদাবাবু সহকর্মিগণের নিকট সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা প্রয়োজনীয় সকল খবর একে একে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কতটা কাজ হইয়াছে, মাতৃমন্দিরের নানাবিষয়ে নানাপ্রকার ব্যবস্থা, এই সব।

বিচিত্র ব্যাপার আরও শুনিলাম, প্রসূতিরা কেহ কেহ প্রসবের পর দশ দিন থাকিয়া একটু সবল হইলেই আর থাকিতে চায় না, কেহ বা পলাইয়া যায়, আবার কেহ পলাইতে চায়। কেহ কেহ সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া ইতিমধ্যে পলাইয়া গিয়াছে। সেই জন্য মেয়েদের প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় ; এই সকল দূষিত, অপরিণত-বুদ্ধি নারী, জননী নামের অযোগ্য হইলেও, বিধাতার বিধানে আজ তাহারা জননী। নিজ গর্ভজাত সন্তানের প্রতি ইহাদের কোন মমতা বা স্নেহ নাই। যতদিন না সুস্থ হয়, দুর্বলতা যতদিন থাকে ততদিন বাধ্য হইয়া তাহারা আশ্রমে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে বল পাইলে, তখন যাইবার ইচ্ছা জানায়। যতদিন থাকে অধিকাংশ মায়ের সন্তানপালনে উপেক্ষা ব্যতীত আর কোনও আগ্রহ তাহাদের দেখা যায় না। কর্তৃপক্ষ যতদিন পারেন ততদিন শিশুগুলির জীবন রক্ষা ও পুষ্টির হেতু মাতৃস্তন্যের জন্যই আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। যখন মায়েরা নিতান্তই নিজ সন্তানের প্রতি বিরূপ হয়, তখন অগত্যাই কৃত্রিম উপায়ে গোদুগ্ধাদির সাহায্যে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হয়। তবে অর্থাভাবে এবং যথার্থ উপযোগী উপকরণের অভাবে, সময় সময় দক্ষ সেবার্থীর অভাবেও, সুশৃংখলায় স্বাস্থ্যধর্ম-অনুমোদিত উপায়ে সকল কর্ম নির্বাহ সম্ভব হয় না। সেইজন্য এ বিষয়ে দেশবাসীর অধিক পরিমাণে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। অনেক বৎসর পূর্বের কথা লিখিতেছি, জানি না এখন সে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিরূপ।

যাহা হউক অত্যন্ত মশার উপদ্রবে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে গেলাম। সেখানে গঙ্গার অবস্থা শোচনীয়। বাঁধান ঘাট হইতে নদীগর্ভ প্রায় এক মাইল পথ। প্রাচীন ঘাটটি অনেকটাই জীর্ণ। ঘাটের পাটে, একপার্শ্বে, অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ একখানি কুটীর। তাহার আচ্ছাদন কতকটা চট, কতকটা টিনের জীর্ণাংশ ; পাতা দিয়া নিম্নাংশ ছাওয়া, তাহাও আর চলে না, এমন ভাব। দেখি তাহার মধ্যে একটি ক্ষীণ শরীর, তপঃক্লিষ্ট যুবা-মূর্তি। শীর্ণকায় তপস্বী সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সম্মুখে একটু খোলা, প্রায় দুই হাত চতুষ্কোণ, একটি ঝাঁপ দরজার মত, প্রয়োজন মত বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিবার ব্যবস্থাও আছে। এখন দেখিলাম, হাতে গাঁজার ছিলাম্‌ নামানো, ধ্যানস্তিমিত নেত্র, —বাহিরের কিছুতেই লক্ষ্য নাই, বসিয়া আছেন। আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, আরও অনেকে আসিল গেল, বাহির হইতে প্রণামও করিল, কোন দিকেই লক্ষ্য নাই, হাতের ছিলামটি হাতেই আছে—অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে একবার হাত উঠাইয়া মুখের কাছে ধরিয়া সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া একটু টান দিলেন, ধোঁয়া বাহির হইল না। আবার হাত নামাইয়া স্থির হইলেন। প্রায় একঘণ্টা পর আমি স্নানের জন্য চলিয়া গেলাম। বেশ আরামেই স্নান করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনি ঠিক সেই রকমই বসিয়া আছেন।

হাতে আমার ভিজা কাপড়, মাথায় ভিজা গামছা জড়ানো। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোনও কথা নাই। একজন আসিয়া প্রণাম করিয়া হাতের একটি পাত্রে দুধ আনিয়াছিলেন, সম্মুখে পাথরের উপর রাখিয়া দিলেন। পরে, পাত্রটা থাক এখন, পরে নিয়ে যাব,—বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনি এঁকে চেনেন নাকি ?

তিনি : চিনিলাম আর কোথা ?—তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, গলায় কণ্ঠির মালা।

আমি ঃ কতদিন এখানে আছেন ?—

তিনি ঃ দুই বৎসর ত দেখছি, এই গঙ্গার ধারে,—পূর্বে বরিশালে
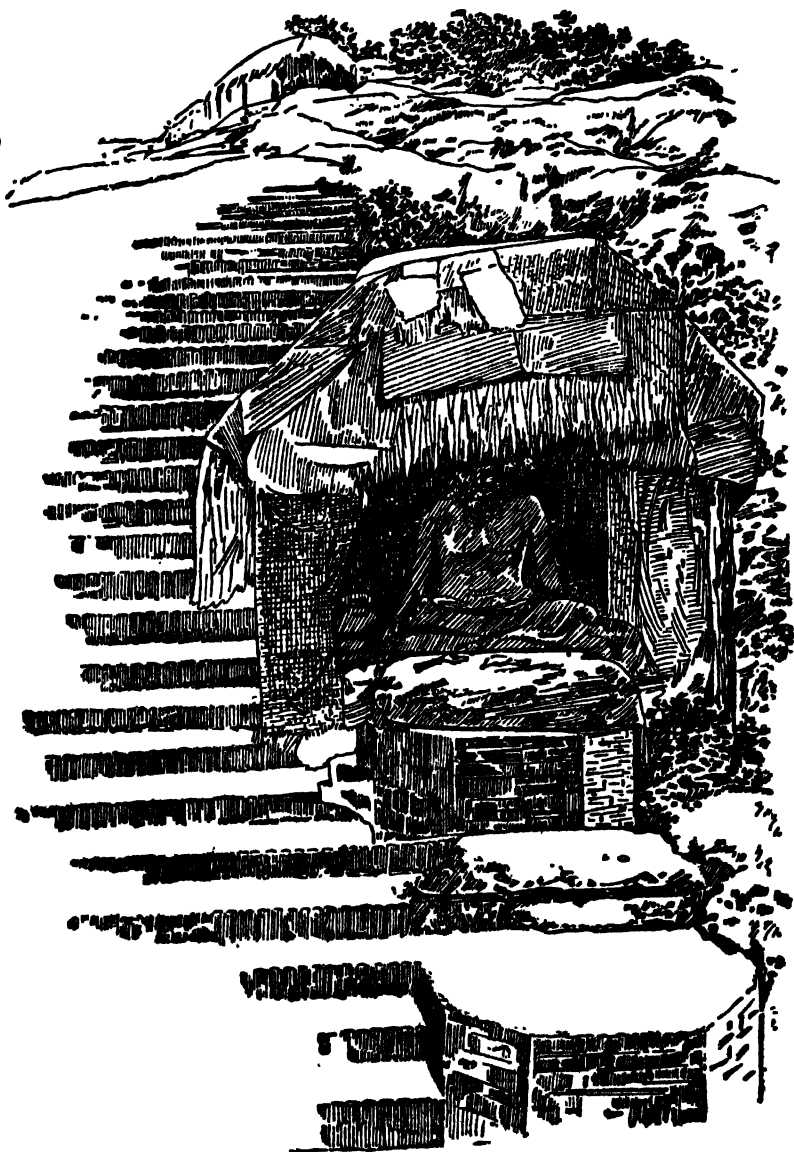
ছিলেন, জমিদারের একমাত্র সন্তান, বিবাহ হয়েছিল। বৈরাগ্য দেখেই বাপ বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে বিপরীত হ'ল।

আমি ঃ খাওয়া দাওয়া চলে কি রকমে ?

তিনি: উনি ত আসন ছেড়ে কোথাও যান না—আমি একপো করে দুধ এনে দি—আর কেউ কখনও কিছু দিলে, ফলমূল মিষ্ট—তাও বড় একটা খেতে দেখি না—কাউকে দিয়ে দেন। কথা কন খুব কমই।

আমি: কিছু উপদেশ কাকেও দেন না?

তিনি: না—কখনও ত দেখিনি, শুনিওনি। বেশী জেদাজেদি করলে বলেন—সৎপথে থেকে সংসারধর্ম কর, ভোগবিলাস যাতে এসে পড়ে এমন বেশী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা ক'রো না—সন্তানদের কখনও মিথ্যা শিখিও না,—এই সব।

আশ্রমে আসিয়া দেখি কুলদাবাবু দুইজন বৈরাগীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। একজন ভেকধারী, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, হৃষ্টপুষ্ট শরীর। আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনিও একজন—আলাপ করুন।

এমন সময়ে খোল-করতাল বাজাইয়া নাম করিতে করিতে ক্ষুদ্র এক নগর-কীর্তনীয়ার দল আসিয়া প্রবেশ করিল। গান থামিলে কুলদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রকম, আজ কত হোলো?

—একধামা চাল ও একটাকা নয় আনা পয়সা মহাজনদের ঘরে পাওয়া গেছে।

এ আশ্রমের অর্থসংগ্রহের যতগুলি উপায় আছে এই নগর-কীর্তনই তাহার অন্যতম। ইহারা কীর্তন করিয়া নগরের গৃহস্থবাড়ী হইতে ভিক্ষা,—চাল, ডাল, কাপড়, পয়সা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে জমা দেয়। পাল-পার্বণে বেশ কিছু পাওয়া যায়, অন্য সময়ে তত হয় না। পূর্ব বঙ্গের বৈষ্ণব মহাজন অনেকেই নবদ্বীপ ধামে বাড়ী করিয়াছেন—তাঁহারাই বেশী দান করেন। এখানকার পুরাতন অধিবাদিগণের নিকট কিছু পাওয়া যায় না। তাঁহাদের এরূপ সৎকর্মের উপর আস্থা নাই, শুধু সমালোচনা করিয়াই খালাস।

যিনি নূতন ভেক লইয়াছেন, কুলদাবাবুর অনুরোধে তিনি গান করিলেন। মধুর কীর্তন, কণ্ঠও মধুর, তাহার উপর অন্তরের বৈরাগ্য ও প্রবল ভগবৎ-অনুরাগ—বায়ুমণ্ডল মধুময় করিয়া তুলিল। প্রথম দুই লাইন আমার কানে এখনও বাজিতেছে—

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা॥

সমস্ত দ্বিপ্রহর কীর্তনানন্দে কাটিল, তার পর বৈকালে একবার ঘাটের দিকে চলিলাম,—সেই সাধুটির কাছে।

গিয়া দেখি, দ্বার বন্ধ ছিল, এখন খুলিলেন—আমি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলাম।

অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, অতি ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সসঙ্কোচে বলিলাম: আপনার কাছে এসেছিলাম—দয়া করে যদি কিছু বলেন,—

হাসিতে হাসিতে বলিলেন: বাবা, আপনার পথ ত হয়েছে, ঐ ললাটে দেখছি বেশ পরিষ্কার রাস্তা পড়েছে বাবা, গুরু-সঙ্গ ত হয়েছে, ভিতরে আনন্দের ত অভাব নেই।

আমি: মনস্থির হয় নি,—ক্ষণেকের জন্য হয়ত কখনও হ'ল, কখনও হ'ল না।

তিনি : এই যে বসে আছি বাবা, এর মধ্যে যে কী চাঞ্চল্য তা কি বলব, চলে ফিরে বেড়ালে ত আর কথা নেই—ঝড়ের মত উলট-পালট করবে। ক্ষণস্থির—

—আপনি দয়া করুন, তাই চাই আমার, তাহলেই আমার হবে।

—দয়া ঐ খোলের ভেতর থেকেই আসবে—যেমন যেমন চাই ঠিক তেমনি করেই তিনি যোগাড় করে নেবেন—কেন চঞ্চল হবে তার জন্য। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর আবার বলিলেন : অহংকার নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি তাই এত দণ্ড—এই রকমই চলেছে কতদিন। আমি তপস্যার জোরে পাব এর চেয়ে ভুল বুদ্ধি আর নেই—সেই ভুল করেছি বাবা। এত অহংকারের জোর—এখনও ; এসব বুঝতে পেরেছি, তবুও কিছুতেই নিস্তেজ হয় না। আমিও ছাড়বার পাত্র নয়।

॥ ১২ ॥

নবদ্বীপে তিনটি সাধুর দর্শন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম এই সাধুটি। সংযতবাক্, সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন না অথচ মনে হয় সব কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কিছু কথা হইয়াছিল—যে সূত্রে হইয়াছিল সেইটি আগে বলিব।

দ্বিতীয়,—নামটি তাঁহার জানিবার সুযোগ হয় নাই, এক ব্যক্তি, তখন শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটেই থাকিতেন—গঙ্গার ধারেই পরিচয় হইল। সাধু ত বটেই—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বলিয়াই বোধ হইল। গলায় মালা আছে। এম-এ, বি-এল উকিল, প্রৌঢ়বয়স্ক, স্ত্রী-বিয়োগের পর বৈরাগী হইয়া নানা দেশ, বিশেষত বৈষ্ণব তীর্থগুলি ঘুরিয়া এখন এইখানেই কয়েক বৎসর যাবৎ আছেন। শুনিলাম, নানা শাস্ত্র, পুরাণ, যোগশাস্ত্র, উপনিষদাদি রীতিমত তাঁহার অধ্যয়ন করা আছে। শরীরটি কৃশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে, হাসিয়াই কথা কন।

যেদিন প্রথমে সেই ঘাটের উপরে কুটীর মধ্যে সাধুটির কাছে গিয়াছিলাম —তার পরদিন ভোরে উঠিয়াই গঙ্গার ধারে গেলাম। দরজা বন্ধ দেখিয়া নামিয়া সৈকতের উপর বেড়াইতে লাগিলাম। হাত দুটি পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, এক-খানি পাতলা রেশমের সাদা চাদর গায়ে জড়ানো, কদমফুলের মত কাঁচাপাকা ঘন চুল, খালি পায়ে একটি মূর্তি আমার সম্মুখেই বেড়াইতে চলিয়াছেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাকে দেখিয়াই তিনি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। মনে হইল আলাপের ইচ্ছায় তিনি হয়ত এরূপ গতি শিথিল করিয়া থাকিবেন,—আমি যখন তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম তিনি হাসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকেও তাই করিতে হইল।

তিনিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনাকে পূর্বপরিচিত বোধ হচ্ছে যে!

আমি বলিলাম : হতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে পূর্বে কোথাও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

তিনি ছাড়িলেন না, আমি অগ্রসর হইলে তিনি পা চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : পূর্বে কখনও এখানে এসেছিলেন কি? আমি স্বীকার করিলাম। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে একবার এখানে আসিয়া প্রায় মাস দুই ছিলাম।

—মহাপ্রভু পাড়ায় যেতেন কি?

—কীর্তন কিম্বা ভগবৎকথা শুনতে কখন কখন গিয়েছি বৈকি।

—তবেই ঠিক হয়েছে—সেইখানেই দেখেছি আপনাকে, আমার মনে আছে।

তার পর নানাকথা। সেই নানাকথার মধ্যে তিনি আমার এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে উভয়েরই সবিশেষ কতকটা পরিচয় পাইলাম।

দেখিলাম, যতদিন না মানুষের সেই পরাবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় ততদিন সঙ্গ-কামনা দুর্দমনীয়, লোক-সঙ্গের স্পৃহা ছাড়া যায় না, বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাক্য-আলাপনেরও বিরাম হয় না। আমার সঙ্গে তাঁহার কথা আরম্ভ, পরিচয় প্রভৃতি লোকসঙ্গ-লালসা হইতেই—বাক্যেরও সংযম নাই। এমন সব কথা অবতারণা করিতে লাগিলেন যাহা নিতান্তই এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। উপরে যাহা বলিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার এত কথার মধ্যে ঐটুকুই পাইলাম। শেষ, যখন আমি ফিরিবার চেষ্টায় গতি সংযত করিলাম—তখন তিনি বলিলেন: নাঃ, আর এগিয়ে যাওয়া যায় না, বিশ্রী দুর্গন্ধ—না? একেবারে গঙ্গাতীরটি নরক করে তুলেছে, একটু বিচারও নাই, ব্যবস্থাও নাই।

ফিরিতে ফিরিতে আমি বলিলাম: এ ত সনাতন ব্যবস্থা, গ্রামের বাইরে ফাঁকাতেই ত ঐ কর্ম চিরকাল চলে আসচে।

—আগে এতটা ছিল না—এই কয় বৎসর ভয়ানক লোক আমদানি হতে আরম্ভ হয়েছে, যত পূর্ববঙ্গের বাঙ্গাল বেটারা নবদ্বীপে এসে একেবারে পয়মাল করে তুল্লে।—বুঝেছেন?

আমি উত্তর না করিয়া সম্মুখের দিকে একটু দ্রুত পা চালাইলাম।

তিনিও গতি দ্রুত করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন: আর আসল নবদ্বীপ ত এটা নয়, তাই এসব চলছে।

—আসল নবদ্বীপ আবার কোথা, আপনি বলেন?

—সে ত বহুকাল গঙ্গার ভাঙনে ওপারে গিয়ে পড়েছে।

—তবে এই যে মহাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীবাসাঙ্গন, এইসব তখনকার ব'লে নানা স্থান দেখায় এরা?

ওটা তো ব্যবসা। জানেন না, বিশ্বম্ভরের বাপ জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী, শ্রীবাস বাড়ী, গঙ্গাধরের টোল এসব কি ঐ রকম কোঠাবাড়ী ছিল? সবই মাটির ঘর। চালা ঘর, খড়ের ছাউনি ছিল। ধনবান না হলে কি কেউ তখন কোঠা করতে পারত?

আমি ভাবিতে লাগিলাম, দেখিয়া তিনি বলিলেন: আপনার আমার কথায় সন্দেহ হচ্চে না কি? আমি বলিলাম: একটু সন্দেহ এই হচ্চে যে হয়ত বাড়ীগুলি চার-পাঁচশো বছরের নয়, কিন্তু সেই স্থানেই হয়ত এখানকার বাড়ীগুলি পরে কোনও সময় হয়ে থাকবে।

—আসলে শুধু বাড়ী নয়, সমস্ত নবদ্বীপ নগরটাই বহুকাল পূর্বে গঙ্গা গ্রাস করে বসে আছেন। এখন এই পাঁচশো বছরের মধ্যে গঙ্গার গতির কতটাই পরিবর্তন হয়েছে। কেউ কেউ বলে, এখান থেকে আড়াই ক্রোশ পূর্বে উত্তর কোণে আগেকার নবদ্বীপ ছিল। আগেকার নবদ্বীপ এর চেয়ে ঢের বড় নগর ছিল, এত ছোট ছিল না। এক সময় সমস্ত গৌড় মণ্ডলের রাজধানী সেখানে ছিল।

—আমার মনে হয় গঙ্গাও যেমন সরে-সরে গেছেন, নগরটিও সেই রকম সরে-সরে বর্তমান জায়গায় এসে পড়েছে।

কথা কহিতে কহিতে আমরা সেই ঘাটের সম্মুখেই আসিয়াছি, দূর হইতে দেখিলাম, তাঁর ঘরের আগড় খোলা, দুই-একজন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

আমাকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমার সঙ্গী বলিলেন: আপনি বুঝি এঁর কাছে যাচ্ছেন?

আমি বলিলাম: হাঁ, তাই বটে। আমরা হয়ত আজই বৈকাল না হয় কাল চলে যাব, আর দেখা হবে না,—একবার দেখে আসি।

তিনি বলিলেন: চলুন, আপনাকে আর এক সাধুর কাছে নিয়ে যাই, দেখবেন কেমন লোক। এঁর সঙ্গে এর পর কোন সময় দেখা করবেন। ইনি ত কথা বড় কন না—এঁর কাছে কি পাবেন?—

দেখিলাম, এঁর কাছে এখন দু-একজন লোকও দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলাম, ইত্যবসরে একবার তাঁর সেই সাধুর কাছে যাওয়া যাক্ না। বলিলাম: বেশ, চলুন দেখে আসি।

সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি যেখানে থাকিতেন তাঁর বাড়ির কাছেই একটা কোঠাবাড়ীতে এই সাধুটি থাকেন। আমরা গিয়া দেখিলাম—দুই-তিনজন লোক বসিয়া আছে, তিনি তাহাদের সহিত কথায় ব্যস্ত। আমরা প্রণাম করিয়া একটু দূরে উপবেশন করিলাম। তিনি লক্ষ্য করিলেন এবং হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

মুণ্ডিত মস্তক, শিখা নাই, গৈরিক বস্ত্রে দেহ আবৃত; প্রৌঢ়বয়স্ক, ক্ষীণশরীর গৌরবর্ণ সাধুটি। গলার আওয়াজটি খুব জোর, বেশ তেজস্বী মূর্তি। আসনে বসিয়া একটি যুবকের দিকে ফিরিয়া কথা বলিতেছিলেন। সম্মুখের উপর পাটির দুটি দাঁত নাই।

মৃত্যু-সম্বন্ধে কথা হইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন: আসলে যারা বদ্ধ জীব, স্থূল বিষয় নিয়ে ভুগছে, সাধারণত তারা দেহত্যাগের সময় তাদের অহং জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলে।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করিল: বিষয় নিয়ে ভুগছে কি?

তখন তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া বামহাতের তালুতে ডানহাতের তর্জনী ও অনামিকা এই দুইটি অঙ্গুলির আঘাত করিতে করিতে বলিলেন: আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তাই হ'ল বিষয়। বিষয়ের এই অর্থটি সর্বদাই মনে রাখতে হবে, ভুললে চলবে না। যা কিছু আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, গন্ধ পাই, স্পর্শ এবং আস্বাদন করতে পারি—এক কথায় এ সমস্তই হ'ল বিষয়। তার পর ইন্দ্রিয়কে চালনা করে মন—কাজেই মনের ধর্মই হল বিষয়-ঘাঁটা, বিষয় নিয়েই তার সংকল্প বিকল্প যা কিছু চলছে। বেশ করে বুঝে যেও। এখন এই মনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আমাদের এই অহংটি,—অহং বলতে 'আমি' এই জ্ঞান বা বোধটি—নিরন্তর বিষয় কামনাই করছে। প্রাপ্তিতে আমার সুখ, অপ্রাপ্তিতে দুঃখ এই মনে করছে।—এই ত বিষয় নিয়ে ভোগ। বুঝলে?—

যুবকটি বলিল: হাঁ, ওটা বুঝেছি, কিন্তু এখানে সকলকারই অহংকার

ত প্রবলভাবে দেখা যায়, আমি—আমার বোধটা খুবই তীক্ষ্ণ,—তবে ও অবস্থায় অহং জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলে কি রকম?

উত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন:

আমাদের অহং সত্তা ত চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর সঙ্গে জড় বিষয়ের সম্পর্ক কি? আত্মার আসল বিষয় হ'ল তত্ত্বজ্ঞান আর আনন্দ,—এই আত্মার সঙ্গে নিরন্তর হেতা বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটছে কি রকমে। মধ্যে ইন্দ্রিয়গণের চালক মন থাকার জন্যই আত্মার সঙ্গে বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটছে। আত্মা যেন তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভুলে প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যেই পূর্ণ আনন্দকে খুঁজছেন, কেমন এই ত জীব-জগতের সম্বন্ধ ব্যাপার? কাজেই জড় বস্তুতে অভিনিবেশের ফলেই স্থূল বস্তুতে প্রয়োজন বুদ্ধি এসেছে। ইট, কাঠ, মাটি, পাথর, সোনা, রূপা প্রভৃতি, আবার স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিতে মমতা বুদ্ধি নিয়ে নানাপ্রকার ভোগ চলছে, যার শেষ মৃত্যু। এই মৃত্যুটি কি?—বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-ত্যাগ নয় কি? জড় বিষয়গুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে অবলম্বন করে এই যে এতকাল কাটানো হয়েছে, তার ফলে দেহ বা ইন্দ্রিয়াদিতেই আত্ম-বুদ্ধি হয়ে গেছে। যাদের—আমি বলতে এ দেহ বা ইন্দ্রিয়ই এই জ্ঞান হয়—তাদের, দেহ-নাশেই আমার নাশ এই কল্পনাই দৃঢ় হয়ে যায়। তখন দেহত্যাগের পূর্বে বা সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরেই আর তারা অহং-তত্ত্বে চেতন অর্থাৎ আমি আছি, এই জ্ঞান জাগ্রত রাখতে পারে না। একটি স্থূল দৃষ্টান্তে এটি বেশ বুঝা যায়। যেমন,—যারা শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহ করে, যারা শ্রমজীবী, তারা যেমন পড়ে অমনি ঘুমায়। শুলে আর জেগে থাকতে পারে না। একবারে গাঢ় নিদ্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে রাতকাবার করে দেয়,—সেই রকম।

প্রশ্ন: তা হলে জাগ্রত স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থার সঙ্গে কি ঠিক জীবন মৃত্যুর তুলনা হয়?

উত্তর: তুলনা কি, আসলে তাই ত ঠিক। একই অবস্থা, কেবল অল্প-বিস্তর কালেরই প্রভেদ। একটি অল্পকাল, অপরটি দীর্ঘকাল—এই যা। আর একটিতে শরীর-ক্রিয়া চলে, অপরটিতে চলে না—একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অহংকে মন ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়ে যখন জগতের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তখন হ'ল জাগ্রত অবস্থা, তার পর জ্ঞানশূন্য নিদ্রিত অবস্থা হ'ল সুষুপ্তির অবস্থা, আর জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার মাঝের যে অবস্থা তা হ'ল তন্দ্রা। সে অবস্থায় জাগ্রত অবস্থার স্পষ্ট বিষয় ভোগাদি ব্যবহার বা কর্ম নাই বটে কিন্তু তার আভাষ আছে, আবার ওদিকেও সুষুপ্তির লয় বা অজ্ঞান নাই কিন্তু তার আভাষ আছে। তেমনি, জীবন ও মৃত্যুর মাঝেও ঠিক এক অবস্থা আছে তাকে জীবনও বলা যায় না, মৃত্যু বা অহং কর্তৃত্বের লোপও বলা যায় না।

প্রশ্ন: সে অবস্থা কতক্ষণ, জানা যায় কি?—

উত্তর: অত্যন্ত শ্রমক্লান্ত ব্যক্তির গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি যেমন অল্প কালের মধ্যেই আসে, স্বপ্ন বা তন্দ্রাবস্থা তার অতি অল্পক্ষণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ক্রমে। স্থূল থেকে কারণে যেতে হলে সূক্ষ্ম অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়, অন্য পথ নাই, এদিকেও সেই রকম অত্যন্ত স্থূল বিষয়াসক্ত জীবের অল্প সময়ের মধ্যে অহং লয় পায়। আবার, যেমন শারীরিক শ্রমবিমুখ যারা, শরীরের চেয়ে মস্তিষ্কের কাজ বেশী করেন তাঁদের

যেমন গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি চট্ করে আসে না, বিলম্বে নিদ্রাকে পান, তেমনি যাদের মন কতকটা বিষয়মুখী, কতকটা চৈতন্যমুখী তাদের অহং লয় দেরীতে হয়। মৃত্যুর পর তাই অধিক চিন্তাশীল জীবের অহং বহুকাল জাগ্রত থাকে, সহজে লয় হয় না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, কেউ কেউ বলেন, মৃত্যু বড় ভয়ানক, আবার কেউ কেউ বলেন, মৃত্যু শান্তিময় অবস্থা—কোন্‌টা সত্য ?

উত্তর : মৃত্যু সকলকার সমান নয়। যারা সংসারে বড় কষ্ট পায়, দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ, রোগ, শোক ইত্যাদিতে কাতর হয় তাদের মৃত্যু কি রকম জান, —উৎকট শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে এমন যে রোগী তার যদি গভীর নিদ্রা আসে সেই নিদ্রা সুখের না দুঃখের !

প্রশ্ন : তা হলে কি মৃত্যু যথার্থই জীবিত কালের চেয়ে এতটা শান্তিময় অবস্থা ?

উত্তর : তাতে সন্দেহের অবসর কোথা ! তবে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব পর্যন্ত—যখন বুঝতে পারে যে এইবার এ শরীরটি যাবে,—মায়ার টান যার যতটা তার ততই এ শরীর ছাড়তে কষ্ট বোধ হয়। দুঃখ এত হয় যে চক্ষে জল পড়ে। কেউ কেউ কিছুতেই শরীর ছাড়বে না, ভয়ঙ্কর অনিচ্ছা প্রকাশ করে। যতই বুঝতে পারে যে এ যাত্রায় আর থাকা চলবে না, ততই কাতর হয়,—শেষে, মৃত্যু-মূর্চ্ছা এসে তাদের ভয়, দুঃখ এ সব থেকে পরিত্রাণ করে। জীবনের এপার থেকে ওপারের ব্যাপার যা কিছু তা তো কল্পনা ! আবার যার মন যেমন তার কল্পনার বিষয়ও সেই রকম। আসলে চৈতন্যের রাজ্যে দুঃখভোগ কোথা ? ভয়ের ক্রিয়াই বা কোথায় ? শরীর থাকলে স্নায়ুগুচ্ছ থাকে, তার পর স্মৃতিকে আশ্রয় করে—তাইতেই না ভয়ের ক্রিয়া, হৃদ্‌পিণ্ডে তার ঘাত-প্রতিঘাত ! শরীর নেই তো ভয়ংকর কি ?—ভয় তো শরীরকে নিয়েই। হিন্দুদের জন্মান্তরবাদের সবটাই ধর্তব্য নয় ; কর্মের জটিলতা যার আছে তার জন্ম আবার হবে—আসলে, জীবের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে জগৎকে তারা ভালবাসে,—না এসে থাকতে পারে না। আসলে যার ইচ্ছা হয় সে আসে, যার হয় না সে ঈশ্বরত্ব পায়।

প্রশ্ন : আমার মনে হয় যার কাজে গলদ আছে তারই ভয়ের কল্পনা।

উত্তর : আসলে সবই ত কল্পনায় দেখা। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করলে আসলে থাকে কল্পনা মাত্র। যে সূত্রে যে ভয়ের কল্পনা করে সেই সূত্রেই সেই কল্পনাকে মূর্তিমান দেখে—তার পর কালে যেই সেটি কল্পনা বা মিথ্যা, এই জ্ঞান হয়ে যায় তখন শান্তি।

প্রশ্ন : ভূত প্রেতের ব্যাপারও তাহলে সত্য ?—

উত্তর : সত্য কেন হবে না। অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিকাশ হয় নি, একটা কোন জটিল ভোগ-বিষয়ে গাঁট পাকিয়ে রেখেছে—যারা সুখ বলতে ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না, এমন এক শ্রেণীর জীব ত আছে, তারাই দেহত্যাগের পর প্রেত-অবস্থায় থাকে, তাদের প্রিয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের ফলে সেই স্থানের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, সূক্ষ্মভাবে সেই সেই ভোগের আস্বাদ নেবার জন্য !

প্রশ্ন : এই যে বললেন বিষয়মুখী মন-প্রধান জীবের অহং জ্ঞান চট্ করে লোপ হয়।

উত্তর : হ্যাঁ, যাদের অতি জড়-বুদ্ধি, সাধারণত তাদের ত তা হয়ই। তবে

যারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একটি কোন বিশেষ বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না, তার অহং জ্ঞানের সঙ্গে সে তাকে এমন ভাবে জড়ায় যে তা খোলা ত চট্ করে ঘটে না তাই তাকে গাঁট পাকিয়ে রাখা বলেছি। তারাই দেহত্যাগের পর স্বপ্নাবস্থার মত প্রেতলোকে সেই বিষয়ের কল্পনায় চেতন থাকে। আসলে মৃত্যু নানা রকমেই আছে, যেমন জীবন নানা রকমের আছে। তার মোটামুটি একটা হিসাব চলে, খুঁটিয়ে বুঝতে হলে তাই নিয়ে বেশী ঘাঁটতে হয়,—অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, তাতে লাভ নাই। জীবনকালের কর্ম্মই হ'ল আসল এবং বলবান,—তাইতে লক্ষ্য থাকলে সবই যখন ঠিক হয় তখন আবার অত শত ভাবনা কেন বল ত দেখি! কর্ম্মানুসারেই আমাদের গতি।

প্রশ্ন: আচ্ছা রোগের সঙ্গে জীবনের ভোগ আর মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ আছে কি?

উত্তর: নেই ত কি—নিশ্চয়ই আছে। যার শরীরের যে যন্ত্রের অথবা যে ইন্দ্রিয়ের ভোগ বেশী তার সেই ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্ষয় তত বেশী, তার তাই থেকেই মৃত্যু-রোগ উৎপন্ন হয়, যাতে তাকে শরীর ছাড়তে হবে। ভোগের বৈষম্য থেকেই ত আমাদের রোগের উৎপত্তি, আর এটা তো বুঝতে সহজ যে, যার যে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে লালসা বেশী, তার সেই ভোগ থেকেই রোগ জন্মাবে, আর দেহত্যাগের সময়ে সাধারণ ভাবে সেই ইন্দ্রিয়ভোগ ব্যাপারে অলীকতা তার চৈতন্যে প্রতিপন্ন হয়। তাইতেই তাকে সেই ভোগটি ত্যাগ করতে সাহায্য করবে। এখানে ত সেই অধঃস্তরের জীব থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বোচ্চ স্তরের, দেবভাবের জীব পর্য্যন্ত সব রকমই আছে, কাজেই জীবন ও মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পরের অবস্থাও নানা রকমেরই আছে। এটা কর্ম্ম ও ভোগের অকূল সমুদ্র। এক একটি জীব, চিন্তা ও কর্ম্ম-হিসাবে যেন এক একটি জগৎ।

প্রশ্ন: আচ্ছা যাদের হঠাৎ মৃত্যু হয়, বা অকালেই মরে?

উত্তর: যাদের ভোগের প্রাবল্য ঘটেনি, বিষয়ের সঙ্গে ঘোরতর সম্বন্ধ ঘটেনি অথচ শরীরের সকল যন্ত্রই সতেজ তাদের ত অকালে মরবার কথা নয়। ইন্দ্রিয়ভোগের অবসর ঘটেনি, যাদের সকল ইন্দ্রিয় সতেজ আছে এমন অবস্থায় যদি মৃত্যু-যোগ উপস্থিত হয় বুঝতে হবে,—শরীর-যন্ত্র ফুসফুস, হৃদ্পিণ্ড প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি কোন না কোন শরীর-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা বা অপূর্ণতাই দেহ-ত্যাগের কারণ,—সেই সূত্র ধরেই তার মৃত্যু-রোগ উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন: আচ্ছা অপঘাত মৃত্যুর বেলা?

উত্তর: অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত, চঞ্চল প্রকৃতি—অথচ যাদের বিবিধ প্রকার ভোগের অবকাশ ঘটেনি—কোনও শরীর-যন্ত্র দুর্ব্বল না থাকলেও—কাল পূর্ণ হলে তাদের অপঘাত সূত্রে দেহত্যাগ।

প্রশ্ন: আর শিশুদের?

উত্তর: তাদের কোন শরীর-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা থেকেই মৃত্যু-রোগের উৎপত্তি। সকল শিশুর সকল যন্ত্রই-ত সুস্থ বা সতেজ নয়। পিতার বীজ দুর্ব্বল হলে, পিতার কোনও যন্ত্র দুর্ব্বল থাকলে সন্তানকেও সেই পাপ ভোগ করতে হয়। আয়ুক্ষীণ, অকাল মৃত্যু ত তারই ফল—এ যে সহজ সত্য।

প্রশ্ন: তাহলে ত দেখা যাচ্ছে—ভোগের ব্যাপারে প্রকৃতির সহজ নিয়মের মাত্রা অতিক্রম করলেই রোগ, শোক, দুঃখ, অশান্তি যত কিছু সহ্য করতেই হবে!

উত্তর : এই জ্ঞানটিই সার, ভোগ ও কর্মের ব্যাপারে। সৎ-ধর্ম আশ্রয় করলে যেমন গুরু, তাঁদের প্রভাব কতটা কল্যাণকর, লোক-সমাজে কতটা হিতকর, অসৎ-এরও তেমনি প্রভাব। যথেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অসংযত কর্মীরা তাদের অসৎ ভাবের সকল কর্মের বীজ দুর্বলচিত্ত মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এই ভাবে অসৎ-এর দল বাড়ে। প্রথম থেকেই প্রকৃতির নিয়মানুগ হলে জীব আপনা-আপনিই মুক্তির রাজ্যে গিয়ে পড়বে, কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আর স্বাধীন কর্মবৃত্তি থাকায় মানুষ এমনই অন্ধ যে ইচ্ছার খেয়ালে প্রকৃতির সহজ নিয়ম ভাঙ্গতেই প্রবৃত্ত হয়—তার ফলে ঘা খেয়ে-খেয়ে প্রকৃতির নিয়মেই যখন সে বিজ্ঞানমুখী হয় তখন প্রকৃতির সকল নিয়মই মাথা পেতে নিতে শেখে,—আবার যারা তার মত যথেচ্ছাচারে রত—তাদেরই উপদেষ্টা হয়। এ ত আগাগোড়াই দেখা যায়। শরীর-ঘটিত সকল ব্যাপারে মিতাচার হ'ল যথার্থ মনুষ্যত্ব। সেটা জন্ম-জন্মান্তরীণ উৎকর্ষেরই বিশিষ্ট ফল। উন্নততর জীবনের গতিই হ'ল প্রকৃতিকে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুকে অতিক্রম করে, আত্মজ্ঞান বা মুক্তির দিকে। অবাধ ভোগ, যথেচ্ছাচার যেখানে সেখানে সংযমের শক্তি ও আনন্দময় ফল পাওয়া যাবে কি করে? আমাদের ধর্মশাস্ত্র ভোগ ও কর্মময় জগতে সংযমেরই মহিমা প্রচার করেছেন, উদ্দেশ্য, ভোগে ডুবে থাকতে দেবেন না। জীবন-ব্যাপারে আমাদের যখন ভোগ ও কর্মগত ব্যবহার সংযত হয় তখনই জীবনের অন্তরে গুরুত্বের প্রতিষ্ঠা। সকলদিকেই তাঁর শক্তি অতীব মধুর, কল্যাণময় ফল প্রসব করে। ইহ এবং পর দুই কালেই সেই জীব আদর্শ হয়ে অপরাপর বহুতর উন্নতিকামী জীবের লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকেন, তাঁরাই গুরু। তার পর চিৎশক্তির পরাকাষ্ঠা হলে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি। যেমন এখানকার সিভিলিয়ানেরা,—সকল বিভাগে কর্ম করে শেষে গভর্ণর হন; এ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ্ হেড্ হয়ে যান।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এ যেমন হ'ল প্রভিন্সিয়াল গভর্ণরের সঙ্গে গুরুর তুলনা, তাহলে ভাইসরয়্ কে হবে?

উত্তর : এখানে যদি বলি,—অবতারই হ'ল ভাইসরয়্, যদিও অবতার বলতে তাঁর স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়াই বুঝায়, রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ নয়।

প্রশ্ন : অবতার যদি না মানি?

উত্তর : সে কি? এদিকে এত ভূতপ্রেত মানলে, তাদের অস্তিত্ব বুঝলে, স্বীকার করলে, আর ঈশ্বর অবতার এ সব বুঝবে না কেন? অবতার না মান জগৎগুরু বলে ত মানতে পার?

প্রশ্ন : তা ঠিক বটে, কিন্তু অবতার মানার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা কুসংস্কারের ধাঁধার মধ্যে এসে পড়তে হয়। জানেন ত এখনকার ইওরোপীয়-গুরুর প্রভাবিত সভ্য-জগৎ ভক্তিমার্গের উপর কতটা হেয় দৃষ্টি ফেলে রেখেছেন —এখনকার সভ্য-জগতের সাহিত্যে ভক্তিমার্গের কোনও আলোচনা নাই। দাস আমরা—হাজার বছরের উপর—প্রভুর আনুগত্যই আমাদের দীর্ঘ জীবনের কারণ। সাহেবরা না বল্লে আমরা মানতে পারব না, মাপ করবেন।

উত্তর : বেশ ত, কুসংস্কার যদি মনে হয় ত কু-গুলো বাদ দিয়ে নেবে। বিজ্ঞানের চালনিতে চেলে নেবে,—বিচার করে মানতে গেলে সুবিচার করতে হবে। অপ্রাপ্ত অবস্থায় সবই ত যুক্তি-মূলক অনুমান। যারা সৎ বস্তু দেখেছে,

পেয়েছে, আর তাদের জীবনে যা প্রকাশ পেয়েছে তারাই হ'ল আচার্য্য বা গুরু, লোক-শিক্ষায় ব্রতী। এজগতে তাদের চরিত্রই হ'ল আদর্শ।

প্রশ্ন : দেখুন, অকপটেই বলছি,—এই ইংরাজী শিক্ষায় আমরা বিশ্বাসটা হারিয়ে প্রত্যেক জ্ঞান, ভক্তি, অনুভূতিমূলক বিষয়কে অবিশ্বাস করতেই শিখেছি যা পূর্ব পূর্ব দাসত্ব কালে ঘটেনি। তাই—জীব অবস্থার পরাকাষ্ঠাই হ'ল ঈশ্বর বা ভগবৎ প্রাপ্তি, এটা মানতে বা বিশ্বাস করতে আমাদের ইংরাজী-বিধি-দত্ত-জ্ঞান ততটা বাধা পায় না—কিন্তু ঐ অবতার,—

উত্তর : কেন, তফাতটা কি বুঝে দেখলেই ত হ'ল। এখনকার কর্মে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে, বিচার বা অন্যান্য রাষ্ট্র বিভাগে কর্মদক্ষতা লাভ করলে শেষে কোন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া আই-সি-এস্-এর চরম সার্থকতা, ভাইসরয় কিন্তু তা নয়। তাকে হোম্ থেকে নির্বাচিত করা হয়। এবং সেইখান থেকে আসা চাই-ই। সকল বিভাগেই তাঁর শক্তি অবাধ, তিনি এখানকার সর্ববিধ রাষ্ট্রকর্মে নিয়ন্তা—তেমনি এদিকে অধ্যাত্মরাজ্যের জগদ্গুরু বা অবতার। অবশ্য অবতার ঠিক ভাইসরয় নয়, প্রতিনিধি নয়—অবতার বলতে স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়াই বুঝায়। জীব অবস্থার চরম হ'ল গুরুত্ব এবং ভগবৎপ্রাপ্তি,—তার পর কর্ম-ক্ষয়ে তাঁরা ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে যান। আবার তাঁতে লয়ও হয়ে যান। অবতার ত জীব-অবস্থার পরিণতি নয়। সাক্ষাৎ গোলক যা নিত্যধাম থেকে তাঁর নিজ ইচ্ছায় তিনি অবতীর্ণ হন। সময়-সময় তাঁর ইচ্ছায় আবার তাঁর সেই সাঙ্গোপাঙ্গের কেউ এ জগতে আসে, কোনও উচ্চ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁরাই হন জগদ্গুরু।

প্রশ্ন : তিনি প্রতিনিধি বা কর্মচারীর দ্বারাই ত কাজ করতে পারেন, নিজে মানুষ হয়ে আসতে যাবেন কেন?

উত্তর : যিনি রাজার রাজা, রাজেশ্বর তিনি তাঁর রাজ্যে আসবেন—তাঁর খুসি, তাঁর ইচ্ছা,—কোন কর্মবাধ্যতাসূত্রে তিনি বাধ্য ত নন। কেন, তিনি সবই ত পারেন—তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা—তাঁর মানুষ হয়ে এ জগতে আসার মধ্যে বাধা কি?

যুবা বলিলেন : তিনি আসেন কখন?

উত্তর : কখন আসেন,—বলা কিম্বা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,—তবে আসেন, এসেছেন পূর্বে-পূর্বে কতবার, তার প্রমাণ আছে।

আবার যুবা প্রশ্ন করিলেন : আচ্ছা তাঁর নিজের আসা আর প্রতিনিধি বা জগদ্গুরুর আসার কোনও বিশিষ্ট লক্ষণ আছে কি, যা দিয়ে ঠিক ধরা যায়?

উত্তর : আছে বৈকি! প্রতিনিধি যাঁরা আসেন তাঁরা বিশেষ বিশেষ অধিকারীর মধ্যে আলো দেন, তাঁরা যে ধর্ম প্রচার করেন তার তাৎপর্য্য হ'ল একমাত্র ভগবানই জীবের পরম গতি, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তুকে পাওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য, তাঁরা সেই অনুরূপ সাধন পথেই আলো দেখান। আর যখন তিনি স্বয়ং আসেন তখন অধিকারিভেদ রাখেন না, সকলকেই বলেন—আমাকেই ভজনা কর, আমি সেই বস্তু যাকে তুমি চাও, যাকে আশ্রয় করলে কৃতার্থ হবে। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই হ'ল দুয়ের পার্থক্য।

সেই যুবা স্থির হইয়া সকল কথা শুনিবার পর বলিল : দেখুন, আবার বলি,—ইংরাজী-সভ্যতার হাওয়ায় আমরা যেটা প্রত্যক্ষ নয় তাকে ত অবিশ্বাস করতে শিখেইচি, আরও, বিচার-বুদ্ধিতে যে বস্তু ধরা যায় না, তাকে কল্পনায়

ভেবে অনন্তের পথে ধেয়ে যেতে যে সরল বিশ্বাস আমাদের পূর্বপুরুষেরা সম্বল করেছিলেন, তাও আমরা এখন উপেক্ষা করতেই শিখেছি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তা গ্রাহ্য, তা ছাড়া সবই ত্যাজ্য,—অবিশ্বাসের মধ্যে ফেলে দিতেই আমরা অভ্যস্ত। তাই চট্ করে এইসব অবতার-কথা মেনে নিতে পারব না, যদিও এসব শুনলেও আনন্দ আর ভাবতেও বেশ লাগে।

তিনি বলিলেন : তা কি করে পারবে,—জীব-চৈতন্য কতদূর পরিপক্ক হলে তবে গুরু, ঈশ্বর বা অবতার-জ্ঞান হয়। অপক্ক, বিশ্বাসহীন অবস্থায় শুধু মেনে নিলে উল্টা উৎপত্তি হবে যে। কতটা শক্তিমান হলে তবে বিশ্বাস বস্তুটি আসে। বিশ্বাসহীনতা দুর্বলেরই সম্বল, তাদের যুক্তি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণই হ'ল অবলম্বন। প্রমাণ ব্যতীত তাদের চলবার যো নাই।

যুবকটি তখন ধীরে ধীরে কহিল : দেখুন, আসলে এসকল তত্ত্ব সত্য হোক বা না হোক ভগবানের সম্পর্কে কল্পনা যে কতদূর প্রসারিত হতে পারে তারই একটা মহৎ দৃষ্টান্ত। আমার এখন এই মনে হচ্চে। আপনি গভর্ণর, ভাইস্রয় প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে কেমন বেশ সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন, আসলে কি ঐ ভাবের ব্যাপার ঘটে ?

তিনি : আহা, এই যে এখানকার এ্যাড্মিনিষ্ট্রেটিভ্ সিস্টেম এটাও ত সভ্যতার ক্রমবিকাশেরই ফল। এসব এল কোথা থেকে, মানুষের সৃষ্টি মনে কর না কি ? চরাচর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে যে সকল নিয়ম গুহ্য বা রহস্যে ঢাকা আছে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সংকীর্ণ বলেই না তার উদ্ঘাটন সম্ভব হয় না। সভ্যতার উৎকর্ষে, উপযুক্ত পর্য্যায়ে উন্নত হলে মানব-সমাজের বিশিষ্ট চিন্তাশীল জীব যারা, তাদের মধ্যে কতক কতক প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন সেই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পদ, মানব-সমাজের ব্যবহারিক ভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়তা করে। আসলে এখানে কেউ অবান্তর বা কোন নূতন জিনিসের কল্পনা বা সৃষ্টি করতে পারে না। যেটা সৃষ্টিতে কোন না কোন ভাবে আছে, তারই আভাস পেয়ে মানুষ কিছু আবিষ্কার করলে। আর তাই সভ্য-সমাজের মধ্যে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টি ঐ কলের পুতুল অবধি। শক্তিময় বিরাট সৃষ্টির বৈচিত্র্যের অতি অযোগ্য ক্ষীণ অনুকরণ। মানুষের সৃষ্টি, এ বড় দাম্ভিকের বা অজ্ঞানের কথা। না হলে দেখ, এই গ্রাভিটেশন, ইলেকট্রিসিটি, এয়ারপ্লেন, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন, রেডিয়াম্, ওয়ারলেস্, জাহাজ, রেল—এ সব, মানুষের স্থূল দৃষ্টির বাইরে প্রকৃতির যে অসীম সৃষ্টি-কৌশল রয়েছে তার কতটুকু, তুলনাই হয় না। তার কতটুকু মানুষ পেয়েছে বা কাজে লাগিয়েছে। ধর না এই যে বিদ্যুৎ, স্পেস্-এর মধ্যে সর্বত্র বিদ্যুৎ পরিপূর্ণ—সেটা কাজে লাগাতে কত মাথা-ফাটা-ফাটি, কত ডাইনামোর প্রয়োজন, কত কত জিনিসের যোগাযোগ অপেক্ষা করে।

যুবা : স্পেস্-এর মধ্যে যা আছে সে ত স্থির ষ্ট্যাটিক্ বিদ্যুৎ,—ডায়নামিক্ নয় ত, কাজে লাগাতে গেলে—

তিনি : আহা, তাহলেই ত দেখতে পাচ্চ ষ্ট্যাটিক্-কে ডায়নামিক্ করতে এখনও কোনও সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি.—কিন্তু প্রকৃতি কি ভবে বিনা আড়ম্বরে, ঐ ষ্ট্যাটিক্-কে ডায়নামিক্ করে নিয়ে কাজ চালাচ্চেন, সে গুহ্য রহস্যের সন্ধান কি মানুষে এখনও পেয়েছে ? আমাদের ত বেশীর ভাগ মানুষই অজ্ঞান, তাই এখন যেটুকু আবিষ্কার হয়েছে, তাতেই আমরা মনে করি অনেকটাই হয়েছে। আসলে বিজ্ঞানের উন্নতির এতটা যে অহঙ্কার, এতটা

বিস্তার, তাতে মানুষের কি দুঃখ দূর হয়েছে? এই সব উন্নতির ফলে মানুষে মানুষে আক্রোশ, স্বার্থপরতা, জীবনসংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। এ উন্নতি কি যথার্থ উন্নতি?

যুবা এখন বেশ প্রফুল্ল ভাবেই বলিল : আগেকার তুলনায় এখনকার এত উন্নতি স্বীকার করতে হয় বৈকি! এখনকার এই উন্নতির সময় থেকে তখনকার দিন, তখনকার অবস্থার কথা মনে কবলে যেন সে সময়টায় জগৎ বেশী অন্ধকার ছিল মনে হয়।

তিনি: কিন্তু এখনকার আলোতে অল্প-বয়সে চোখের মাথা খাবার কেমন সুবিধা হয়েছে বল দেখি? কত কত বালক-বালিকার চশমার দরকার হয়ে পড়েছে। রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য এই চারটে জিনিস জগৎ থেকে কতটুকু তোমার এই আলোকের সময় কমেছে আমায় দেখিয়ে দাও।

যুবা : না, তা পারব না, সে বরং আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী। তবে কেবল এইটুকু বলতে পারি যে তখনকার চেয়ে এখন লেখাপড়ার চর্চা লোকের মধ্যে ছড়িয়েছে। না হলে আগেকার লোকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সরল জীবন-যাপন-প্রণালী, বেশী পরিমাণে মনুষ্যত্ব তাঁদের ছিল। মনের জটিলতা সাধারণের মধ্যে এতটা ছিল না। মনে হয় এই স্কুল-কলেজ থেকেই ছেলেদের শরীর ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে—খুব কম ছেলেই দেখা যায় স্কুল-কলেজের কুসংসর্গের প্রভাব থেকে বাঁচতে পারে--এসব এখন বোঝা যাচ্ছে। এখন এ দেশের বাপগুলি ছেলেদের যথার্থ কল্যাণের দিকে নজর দেওয়ার চেয়ে,—কিসে ছেলে গোটাকতক পাস করে বিয়ের বাজার গরম করবে, আর কাছে থেকে শীঘ্র-শীঘ্র কিছু পয়সা আনবে এই চিন্তা মুখ্য হয়েছে,—তার পর ছেলের শরীরে ঘুণ ধরুক, উচ্ছন্ন যাক্, সে দিকে লক্ষ্য নেই। মোটের উপর আমাদের জেনেরেশন্-এ এই পিতাগুলি স্বর্গে না গেলে এদেশের কোন সুবিধা নাই। এটা আমরা বুঝেছি যে—দেশে এত উকিল আর ডাক্তার বাড়াতে দেশের অপকার যতটা হয়েছে, উপকার তার চেয়ে ঢের কম হয়েছে একথা বলতে পারি। উকিল আর ডাক্তার এত না বেড়ে যদি এর দ্বিগুণ ইঞ্জিনিয়ার আর সায়েন্টিষ্ট্ বেশী হ'ত তা হলে আমরা বেঁচে যেতুম! এই দুর্দিনে, জানেন, কামান্ধ স্বার্থপর পিতারা এখনও ছেলেদের ওকালতি আর ডাক্তারীতে পাঠাচ্ছে। ছি, ছি,—

তিনি: দেখ, কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখবে এই দুই বৃত্তি নিতান্তই নিস্তেজ হয়ে পড়বে, এমন অবস্থা দেশের হবে, কেউ আর উকিলকে ডাকবে না, ডাক্তারদেরও হয় উন্নত হতে হবে, না হয় হায় হায় করতে হবে। প্রকৃতি কখনই বেশী দিন মানুষের এ ব্যভিচার সহ্য করবে না।

যুবা: কি করে যে হবে বুঝতে পারি না,—দেশের লোকের মরাল্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কতটা উঁচু হলে আর শরীর কতটা স্বাস্থ্যপূর্ণ হলে তবেই না ঘরে ঘরে উকিল ডাক্তারের প্রয়োজনবোধ কমবে,—এ মোহ কাটাবার কোনও লক্ষণ ত বর্তমানে দেখি না, আমার বিশ্বাস হয় না।

তিনি: আমরা ঠিক বুঝতে পারি না—কি থেকে কি হয়, তবে এখনকার এই বিষম ভোগ, ব্যভিচারে উন্মাদনা, দেশ জুড়ে শরীর-নীতি, পারিবারিক-নীতি, সমাজ-নীতি—সমাজে ধর্ম বলে যা কিছু আছে তাই ভাঙ্গবার প্রবল উত্তেজনা,—এ চরম অবস্থায় এসে পড়েছে। অপেক্ষা কর, কি মূর্তিতে যে আসবে তা এখন ঠিক বলা যাবে না, তবে এর প্রতিবিধান সম্মুখে আসছে। এই

যুদ্ধের বাজারে (১৯১৪-১৮র বড় যুদ্ধ) টাকা কত সস্তা হয়ে পড়েছে দেখেছ? এর পরিণাম যে কি ভয়ানক তা কেউ এখন দেখতে পাচ্ছে না, সর্বনাশ এমনি করেই আসে। আবার সুদূর পশ্চিম দেশেও এত যন্ত্র উদ্ভাবন ও পরিচালন,—লোক-হত্যার কাজে নিয়োগ কি ভয়াবহ ফল-প্রসব করবে কে বলতে পারে। তাহলে দেখ, নিম্নস্তর পশু থেকে আর রাজ্যের উচ্চতম মানুষ পর্যন্ত হিংসা-রাজ্যের জীব, হিংসার দ্বারাই জীবনের উদ্দেশ্য বজায় রাখছে। আগেকার পৃথিবীর যত ভয়ানক হিংস্র প্রাণীবংশ লোপ হয়ে তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছে। হত্যা, কতকালের মানুষের অভ্যাস, হত্যা করে-করে নিজেদের এখন যন্ত্রের সাহায্যে বিরাট ভাবে হিংসা, প্রতিহিংসার অধিকারী করে তুলেছে। দেখ না এই পশুরাজ্যে যা নখ, দাঁত, শিং—সভ্য মানুষের রাজত্বে—সেগুলি, তীর-ধনুক, কুঠার, বর্শা, ভোজালি, তলবার ; আর এখনকার আরও উচ্চ সভ্যতায় সেগুলি বন্দুক, পিস্তল, কামান, আবার চরম উৎকর্ষ তার পয়েজনাস্ গ্যাস্-এর আবিষ্কার।

যুবা : অবশ্য এ দিকে যাই হোক কিন্তু লাইফকে এন্‌জয়্ করতে ওরাই জানে—এ সব মানুষ-হত্যার ব্যাপার ছেড়ে দিলে কিন্তু ওরা বিজ্ঞানের যতটা উন্নতি করছে, তার শত ভাগেরও এক ভাগ আমাদের প্রাচীন বা আধুনিক কোনও ভারতেই হয় নি।

তিনি : প্রাচীন ভারতীয়েরা ভূত বা পদার্থ-বিজ্ঞানের সন্ধানও জানতেন, প্রয়োজন হলে কাজেও লাগাতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে ; তবে তাঁরা এ সম্বন্ধে ডিটেল্‌ড্ ইন্‌ফরমেশন বিশেষ রেখে যাননি। সামান্য যা আছে মারণ, উচাটন, ভূত-বশীকরণ ইত্যাদি প্রায়ই এখন অব্যবহার্য্য। অবশ্য এই পরাধীন অবস্থায় এক শ্রেণীর লোকের কাছে এর কোনও মূল্য নেই মনে হয়, —কিন্তু এই বিশাল সৃষ্টির রহস্য—সৃষ্টির মধ্যে জীবের উৎপত্তির কারণ, মানুষের উৎপত্তি এবং বর্তমান অবস্থায় পরিণতি, ভোগায়তন শরীর, ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ভোগ ও কর্মের রহস্য, পাশবদ্ধ অবস্থায় বিচার মুক্তি ও তাহার পথ—স্রষ্টা বা ঈশ্বর, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধ এ সমস্ত অতি গভীর-তত্ত্ব প্রাচীন ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমি আর-আর জড় পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা, চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, অংকশাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি বহুতর জ্ঞানের বিভাগ ছেড়ে দিচ্চি,—যার পর আর জ্ঞান নেই, মানুষের চরম জ্ঞান যে আত্ম-তত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব-পরিচয়, সভ্যতার চরম উৎকর্ষের অমৃত ফল তা এই ভারতই জগৎকে দিয়েছে। ভগবানকে কত রকমে, পার্থিব সর্ববিধ সম্পর্কে, এত প্রকারে আস্বাদনে, আবার সকল সম্পর্কেই তার সার্থকতা এ কোন্ জাতি অনুভব করেছিলে? তুচ্ছ স্বল্প বিদ্যার মোহে এ সকল অবিচার করলে চলবে কেন?—কোন্ সভ্যতায় এতটা চৈতন্যের প্রসার হয়েছিল? লঘু গুরু জ্ঞানহীন ব্যক্তি এ সকল উড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু বিচারবান উন্নতিকামী যাঁরা, তাঁরা কখনও এ সকল আগেকার গৌরব এখন এর মূল্য নেই বলে তুচ্ছ করতে পারবেন না। যাঁরা এতটা গভীর চৈতন্যে সমাহিত হয়ে প্রকৃতির গুহ্যতম রহস্যের আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব-সকল আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তাঁদের কাছে রেলওয়ে এয়ারপ্লেন, ইলেক্‌ট্রিসিটি, গ্রামোফোন, রেডিও, গ্রাভিটেশন, রিলেটিভিটি-র সন্ধান কি ছিল না,—তাঁদের পক্ষে এসকল আবিষ্কার কি কঠিন বস্তু ছিল?

যাদের যেমন প্রকৃতি তাদের সভ্যতার গতিও সেই দিকে। এখনকার পাশ্চাত্যের মত এক সময়ে ভারতেরও সাম্রাজ্য-মোহ প্রবল হয়েছিল। কিন্তু সেটা ভারত ভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার পর সেই গতির মোড় ফিরে গেল। ক্রমে আত্ম-জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিই এখানে বড় হয়ে গেল। মোক্ষমার্গের সঙ্গে আসক্তি ও ভোগরাজ্যের বিবাদ বাধল, ইহকালের সঙ্গে পরকালের বিবাদে ভারতের বাহুবল নিঃশেষিত হয়ে গেল। কিন্তু এখনও পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মানুষ পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্যে যা কিছু আবিষ্কার করেছেন তা ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের কাজে, ভোগবিলাস, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের কাজেই তার উপযোগিতা। ইহলোকের সুখ ব্যতীত জগতে তাদের আর কিছুই নেই, কিন্তু ভোগ-সুখের আয়তন-বৃদ্ধি ভারতের জ্ঞানীরা চাইতেন না। তাঁদের কর্মকে এবং ভোগ-মূলক যা কিছু ব্যবহারকে তাঁরা সংক্ষেপ করতেই চাইতেন। তাঁরা ভাল মতেই এটা বুঝেছিলেন যে এই সংসারে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরামের কুহক থেকে যতটা নিবৃত্তির দিকে যাওয়া যায়, কর্মকে যতটা কমিয়ে আনা যায় ততটাই আধ্যাত্মিক কল্যাণ। তাঁদের ইহসর্বস্ব-বুদ্ধি ত ছিল না, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, চৈতন্য পর বা পরামার্গেই গতি পেয়েছিল। তাঁদের জীবনগতি আলোচনা করলে এইটিই পরিষ্কার ধারণা করা যায়। তাঁরা যে বস্তুকে মুখ্য করে দেখেছেন তারই ডিটেল্ড্ ইন্ফরমেশন রেখে গেছেন। হিন্দু-ধর্মের চতুরাশ্রম কি অপূর্ব সংস্কার! ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে মৃত্যুর কি অপূর্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। তাঁরা কেউ ঘরের মধ্যে আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হয়ে দেহত্যাগ করতে চাইতেন না। সকলেই বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস অবলম্বন করে শেষ জীবন পরমেশ্বরের চিন্তায়, বনে দেহত্যাগ করতেন।—মৃত্যুকে তাঁরা পরম-গতির সহজ পথ বলেই দেখেছিলেন—সেটা কোন শোক বা মোহের ব্যাপার ছিল না পরন্তু জীবনের পূর্ণ পরিণতি এবং চরম সার্থকতা বলেই জানতেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। কিন্তু আর এখন পূর্বের মহান আদর্শ নেই, এখন পদার্থ-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, এই সকল পাশ্চাত্য-আদর্শ কাজ করছে, —পার্থিব জীবন-দ্বন্দ্বে জয়ী হবার প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি হতে আর বাধা নেই। তুমি শীঘ্রই দেখবে, পাশ্চাত্যের ভারতীয় শিষ্যেরা এখন ঠিক ঐরকম নানা আবিষ্কারে জগতের মাঝে ভারত-বাসীর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে, এটি সত্য, সন্দেহ নেই—নিশ্চয়ই হবে। তবে এটা ঠিক জানবে এই জীবন দ্বন্দ্বে এতটা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করবার শক্তি সঙ্গে সঙ্গে অর্জন না করলে বাঁচা মুস্কিল হবে। অল্পায়াসের এই পঙ্গু জীবনকে কঠিন দ্বন্দ্বসহ না করলে শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়বে। এক দিকে ত এর মধ্যেই ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে।

যুবা: মৃত্যুর কথা আরো একটু আছে,—মৃত্যু যখন আমাদের হবেই,—এ জানা কথা, তবুও মৃত্যুকে এত ভয় হয় কেন বলুন দেখি, এই ভয়টা এড়ানো যায় কি করে?

তিনি: চিরকালই যার তুচ্ছ ইন্দ্রিয় বিষয়ের ব্যাপারেই কাট্‌ল, জীবনে কখনও কোনও মহৎ চিন্তায় অধিকার যদি না জন্মে থাকে, কোনও মহৎ ভাবের আস্বাদন না পেয়ে থাকে, তাহলে মৃত্যুভয় যাবে কি করে? মহৎ কিছু আশ্রয় না করলে মৃত্যুভয় যাবার নয়। দেখ, এখানে মানুষ তিন রকমের উন্নতপ্রাণ বা মহৎ-আশ্রিত হতে পারে। প্রথম,—আমি কে ও কেন? এই জিজ্ঞাসা যার

জাগে আর এই অনুসন্ধানই জীবনের মুখ্য কর্ম হয়। দ্বিতীয়,—প্রকৃতি হোক বা ভগবান হোক, অবলম্বন করে এই বিশাল সৃষ্টি-প্রবাহের অনন্তশক্তি, অনন্ত বৈচিত্র্যময় উৎসের অনুসন্ধানে জীবন-গতি চালনা করলে। আর তৃতীয়,—মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখ অনুভব করা, সেবাব্রত অবলম্বন করলেও মহৎ-আশ্রিত হওয়া যায়। সকল মানুষ যে একই সত্তা, একের দুঃখে আমার দুঃখ, এই অনুভব যার হয় তিনি মহৎ। স্বার্থকে পরার্থে বিস্তৃত করা। এই তিনটি উপায়ে মানুষের অস্তিত্ব মহান হয়। মৃত্যুভয় এড়াবারও এই তিনটি প্রধান উপায়। আসন্ন মৃত্যুতেও যদি এই তিনটির একটি ভাব জ্ঞানে আসে তাহলেও মৃত্যুভয় এড়ানো যায়। কিন্তু সারা জীবন অন্য কর্ম করে সেই সময়ে মনে এ ভাব আসাও মুস্কিল।

সারা জীবনে যে-বিষয়ের আস্বাদনে প্রবৃত্তি হ'ল না, এখন এই জীবনের সন্ধিক্ষণে সেদিকে মন না যাবারই কথা। তবে এই তিনটি মহৎ বিষয়ের কথা জেনে রাখা ভাল। এর মধ্যে আত্মাকে ধরা এবং প্রকৃতিকে ধরা স্বভাবের মধ্যে দিয়েই হয়, সুতরাং মধ্যে অবিশ্বাস বা সংশয় এসে নিজের জ্ঞানলব্ধ প্রমাণকে এবং বিশ্বাসকে নষ্ট না করে সে বিষয়ে তীক্ষ্ন লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু ভগবানকে ধরা, বিশ্বাস করা, অবলম্বন করা বড়ই কঠিন, কারণ একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া তার আর অন্য প্রমাণ নেই। ভগবান-সম্বন্ধে মানুষের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানই নেই। যাঁরা ইন্দ্রিয়-বিষয়কে অর্থাৎ বাহ্যভোগের বস্তু তুচ্ছ করে —তাঁকেই জীবনের অবলম্বন করেছেন এমনই যে ব্যক্তি তাঁদের কথাই ভগবানের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু ভক্তের কথা তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ হতে পারে, তোমার-আমার কাছে ত অনুমান মাত্র। আমরা পরীক্ষা-বুদ্ধি নিয়ে হয়ত ব্যাপারটা দেখতে যাব। কাজেই এর উপর দাঁড়ানো শক্ত।

যুবা : আচ্ছা, ভক্তি-শাস্ত্রে ত দেখতে পাই কর্ম ও বিষয় ভোগাদি ত্যাগ না করেও ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা যায়। তিনিই সব করাচ্ছেন, আমরা যন্ত্র মাত্র—এই জ্ঞান থাকলেই হ'ল।

তিনি : বিপদ ত ঐখানেই। 'আমি'কে কেন্দ্র করে যত-যত কাজ হচ্ছে সে সকলের কর্তা আমি, এই যে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান এটা যাবার নয় যতক্ষণ না আমাকে গ্রাস করবার মত বিরাট একটি 'আমি'র সাক্ষাৎকার হয়। তা হবার আগে পর্য্যন্ত ভগবান কর্তা মুখে বলা যেতে পারে, কাজের বেলা তার জায়গায় আমার এই 'আমি'টিকেই দেখা যায়। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চাঁদের কর্তৃত্বই প্রবল—তা যাবার নয়, এও সেইরকম। সেই যে তিনি, আছেন এবং সকল ক্ষেত্রে কর্তারূপেই আছেন, তাঁর অস্তিত্বের জ্ঞান তোমার আমার কোথা ? কল্পনায় ত কাজ হবে না। পদে পদে ভ্রম, অবিশ্বাস, এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কাজেই যিনি ভগবানকেই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য ক'রে, তাতেই সকল আকাংক্ষা সমর্পণ করবেন, তিনিই নিজের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করবেন, তাঁরই জন্ম, জীবন ও মৃত্যু সার্থক হবে সন্দেহ নেই। সাধারণের ত এদিকে লক্ষ্য নেই, নিজেরটুকুতে যে দেহ, মন, বুদ্ধি, শক্তি আছে তাইতেই মশ্‌গুল, সমস্ত জীবনটা তার মধ্যেই ঘুরলেন ; কাজেই—

যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়নু সব পরিজন মেলি খায়,
মরণকো বেরি, কোইনা পুছই, করম সঙ্গে চলি যায়।

যদুবা : আবার, 'শেষ শমন ভয়ে তুয়া বিনু গতি নাহি আরা—'এও ত আছে?

তিনি : কার আছে, কে বলছে একথা?—যিনি একথা বলছেন তিনি বলতে পারেন, তিনি জীবনে তাঁকে আস্বাদন করেছেন, কাজের যেটুকু গলদ আছে এই সময়ে সেটুকু কাটিয়ে নিতে হবে। তাই এ আত্মনিবেদন। কিন্তু চিরজীবন যে ব্যক্তি তাঁর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করেই এসেছে—তার গতি কি হবে?—তার সেই 'আমি' ত এখন কর্মফলাধীন।

যদুবা : তাই ত? ভগবান না ভজিয়ে আপনারা ছাড়বেন না দেখছি। অন্য কোনও উপায়ে যখন হ'ল না তখন মৃত্যুভয় দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধার!)

॥ ১৩ ॥

আমরা নবদ্বীপ হইতে কালই যাইব, সুতরাং গঙ্গাতীরের সেই কঠোর তপস্বীর নিকটে একবার যাইতে মনস্থ করিলাম। সুযোগ করিয়া বৈকালের দিকে তাঁহার নিকট গেলাম এবং ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎও পাইয়াছিলাম।

বিশেষ কিছু বলিতে নারাজ,—সেদিনের মেজাজ নাই, আজ আর এক রকম দেখিলাম। এঁর বিশেষত্ব এই যে-তিনবার তাঁর সাক্ষাৎ পাইলাম, তিন-বারই তিন রকম মানুষ। শেষে যে মানুষটি পাইলাম, তাঁহাকে নিতান্তই সর্ববিষয়ে বিরক্ত বলিয়াই বোধ হইল।

তাঁহার ভাবটি এইরূপ,—কেন, এত কথা কহিবার জন্য ব্যস্ত কেন,—যে সব কথা আলোচনা করিতে চাও, নিজেই একটু সেগুলি ভাবিয়া দেখ না কেন? অনর্থক প্রশ্ন করিয়া একজনকে উত্ত্যক্ত করিবার প্রয়োজন কি? সকলকার সঙ্গে সকল কথা কহিতে মন বাধা দেয়—ইচ্ছা হয় না। আবার মনের কথা কহিবার লোক কোথায়!

আমার এই ভাবটি ভালই লাগিল,—কারণ অভিজ্ঞতার ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিয়াছি যে, তাহাদের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। এত রকমের এত কথার অবতারণা করে যে, ইচ্ছা হয় তাহাদের স্পষ্টই বলিয়া দি বাপু, আগে বাজে কথাগুলা ছাড় দিকি, কোন্ কথা প্রয়োজন, কোন্টাই বা নিষ্প্রয়োজন আগে সেইটি ঠিক কর, তার পর জিজ্ঞাসায় আসিও।

সাধু দেখিলেই যেন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মুখ চুলকায়। অনর্থক গ্রাম্য কথার বেশীটা প্রভাব প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়,—আবার তার মধ্যে এমন এক রকমের মানুষ আছেন যাঁরা কথা কওয়ার দিকে না গিয়া শুনিতে ভালবাসেন। শুনিবার আসক্তি তাঁহাদের এত যে, আড্ডায় অসার গ্রাম্য আলোচনা শুনিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে আসর জমাইতে আসেন। শ্রোতা না হইলে যেমন কোন পালা জমে না—এই গ্রাম্য কথা-বাগীশদের আসরে শ্রোতার অভাব থাকিলে সে দিনের আসর যেন বৃথা হইয়া যায়। বিশেষত পল্লীগ্রামে অধিবাসী যাঁরা, তাঁহাদের অনর্থক কথা কওয়া এবং কথা শোনার বাই অনেকটা বেশী,—সেই কারণে সাধু পাইলে, অন্ততঃ নানা প্রকার নূতন কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা সাধু-সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। সাধারণ সাধু হইলে বেশ বনে, যথার্থ তপস্বী হইলে উভয় পক্ষেরই ভাব-বৈষম্য উপস্থিত হয়—তাহার পরিণাম অশান্তিকর।

এ ক্ষেত্রে এইটুকু বুঝিলাম যে, সম্ভবত এখানকার সেইরূপ কোনও গ্রাম্য বাক্যবিশারদের অত্যাচারে বর্তমানে ইঁহার বিরক্তির কারণ ঘটিয়া থাকিবে,—সেই কারণেই আমাকে আজ আমল দিতেছেন না।

অবশ্য শেষে আমার ঐকান্তিক যত্নে কথা কিছু বলিয়াছিলেন,—তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—সাধু দেখিলে বা পাইলে তাহার সঙ্গ করা ভাল বটে, কিন্তু তিনি কথা কহিবার অবকাশ না দিলে, কিছু জিজ্ঞাসার অধিকার বা অনুমতি না দিলে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু উহা অন্যায়,—উহাতে তাঁহাকে বিরক্ত করা হয়। সাধু বিরক্ত হইলে সাধুসঙ্গের কোনও সুফল লাভ ঘটে না। সাধু পাইলে, যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহার অবসর খুঁজিতে হয়, আর আন্তরিক হইলে তাহা পাওয়াও যায়। তখনই যথার্থ লাভ হয়।

আমাদের যে শক্তিটুকু আছে, তাহার অধিকাংশ অযথা বাক্য-ব্যয়ে ফুরাইয়া যায়, আমরা যদি বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা অভ্যাস করি তাহা হইলে অনেকটা শক্তি-সঞ্চয় করিতে পারি। যাহারা বেশী কথা কয় এবং অনর্গল বকে, তাহাদের প্রকৃতি ভীরু,—অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত,—নাড়ীতে তেজ নাই, সেই কারণেই তাহারা বেশী কথা কহিয়া স্নায়ুগুচ্ছ সতেজ রাখিবার চেষ্টা করে। বাক্যের শক্তি অসীম এবং অসাধারণ। অযথা বাক্য যেমন শক্তিক্ষয়কারী, অযথা আহারও সেইরূপ, যে ব্যক্তি যা তা বলে, আর যা তা খায়—তাহার পরিণাম ভয়াবহ। বাক্য এবং ভোজনে সংযম সর্বপ্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন,—সর্ববিধ সাধনার গোড়ার কথা। ভোজনে সংযমের প্রয়োজন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে যিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের মধ্যে ভ্রম উৎপাদন করেন, ধর্মরাজ্যে তিনি অপরাধী, সুতরাং দণ্ডার্হ।

নানাস্থান ভ্রমণ, এ জগতে কর্মক্ষয় করিবার একটি চমৎকার পন্থা। উহার উপকারিতা আছে এবং উহা শারীরিক এবং মানসিক দুই দিকেই কল্যাণপ্রদ। তবে কোন বিশেষ সাধনার সময় ভ্রমণ বা নানাস্থানে গতিবিধি ভাল নয়। সে সকল উপযুক্ত ক্ষেত্রে সহজ নিয়মেই সমাধান হইয়া যায়।—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি স্থির হইলেন।

বুঝিলাম, তাঁহার এখন আসন হইতে নড়িবার উপায় নাই, আসন তাঁহাকে স্থির রাখিতেই হইবে, যতদিন কোনও বিশেষ প্রেরণা না আসে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে সকল ব্যভিচার সংস্কার গত হইয়া গিয়াছে, সে সকল সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য, জানি না কতকাল একাসনে থাকিতে হইবে। তিনি ইহাই আমায় বুঝাইলেন।

তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি আর না বসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যত হইলাম। তিনি তখন বলিলেন: বাবা, শুভ ইচ্ছা রাখবেন, দয়া যেন থাকে। এই এক সত্য—এ জগতের কারো সঙ্গে তিল পরিমাণ মনের গোলমাল থাকলে ইষ্টলাভ হবে না, সকলেরই আশীর্বাদ চাই। একটি শিশু বা ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত আমার কোনও ব্যবহারে দুঃখ পেলে, আমার বিরুদ্ধে কোনও ভাব পোষণ করলে আর আমার ইষ্টলাভ হবে না, এটা মনে রাখবেন। জীবে জীবে কি যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—তা এর মধ্যেই পাবেন।

* * *

এবার কুলদাবাবুর সঙ্গে সিউড়ি যাইতেছি। নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া, সেখান

হইতে ছোট লাইনে বর্দ্ধমান। এ লাইনে গাড়ীর স্পিং নাই ; সুতরাং ধাক্কা ও ঝাকানী খাইতে খাইতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া বর্দ্ধমান, তার পর অণ্ডালে আসিলাম। সেখান হইতে লুপ লাইনের গাড়ীতে সিউড়ি যাইতে হইবে। আমি যাইব বক্রেশ্বর পীঠে, সিউড়ির আগে দুবরাজপুর ষ্টেশনে নামিয়া ক্রোশ দুই হাঁটিলেই পেঁছানো যায়। কিন্তু এখন কুলদাবাবুর বাড়ী যাওয়া হইবে, কাজেই প্রথমে সিউড়ি যাওয়া গেল। কুলদাবাবুর অতিথি হইয়া দুই দিন ছিলাম।

সিউড়ি নগরটি বেশ, শুখনো খট্‌ খটে, উঁচু জায়গায়। কোটাবাড়ি অনেক, অনেকটা মেদিনীপুরের মত। কুলদাবাবু তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই-এক-জনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তার মধ্যে ওখানকার শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের কথাই মনে আছে। তিনি ছিলেন তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সিউড়ির গৌরব। ওখানে সকল কিছু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত। বিশেষতঃ ওখানকার পুস্তকাগার এবং সাহিত্য প্রতিষ্ঠান তাঁহারই হাতে গড়া। লাইব্রেরীর বৃহৎ কক্ষমধ্যে তাহার সঙ্গে বহুক্ষণ ছিলাম। তখনকার তাঁর প্রত্যেক কথাই বেশ মনে আছে। বেশ লোকটি। তাঁহার উদ্যোগেই ওখানকার পাঠাগারেরও উন্নতি। তিনি যখন আমার চিত্রশিল্পে অধিকারের কথা শুনিলেন তখন ধরিয়া বসিলেন, এখানে থাকিয়া কিছু ছবি আঁকিয়া দিলে বড় ভাল হয়। আমি বলিলাম :— এখন মনটা বড়ই খারাপ—গোলমালের মধ্যে থাকতে পারব না। এই যুক্তি তাঁর মনঃপুত হইল না ; বলিলেন : ধুত্তোর মন খারাপ, রেখে দিন আপনার মন খারাপ। ও সব পরে করবেন, এখন আমরা ছাড়ছি না।

আসলে কুলদাবাবুর মনোগত অভিপ্রায়টি মিত্র মহাশয়ের মুখ দিয়া বলাইয়া আমাকে ঐখানে বাঁধিবার চেষ্টা।

শিবরতনবাবু বলিলেন : দেখুন, আমার সোজা কথা, সোজাসুজিই আপনাকে বলি,—আপনি একে আর্টিষ্ট, তার উপর শিক্ষিত, ধর্ম ভাবাপন্ন, আপনি যে ঐ ফকির সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, এটা সমাজের একটা মহা লোকসানের ব্যাপার ; এসব আমরা সহ্য করব না। এসে পড়েছেন যখন কিছুদিন থাকুন এখানে। আমরা কিছুদিন আপনার সঙ্গসুখ ভোগ করি।

আমি বলিলাম : তা কি করে হয়, আমি এসেছি এক মহা কৌতূহল নিয়ে এখানকার তান্ত্রিক সাধুদের সঙ্গে দেখা শুনা,—

নিঃসঙ্কোচেই তিনি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ধুত্তোর তান্ত্রিক সাধুসঙ্গ—আপনাকে ও সব করতে দেব না আমরা এখানে।

আমি বলিলাম : দেখুন, কত দূর থেকে কত আশা নিয়ে এসেছি ;—তিনি আবার বাধা দিয়া বলিলেন : ধুত্তোর আপনার আশা নিয়ে আসা। আমি বলিলাম,—এই তো কুলদাবাবুও আছেন, বলুন না ভাগবৎরত্ন মশাই, এখন চুপচাপ কেন ? এখন আমায় রক্ষা করুন—আমার সাধনের পথে—

বাধা দিয়া মিত্র আবার বলিলেন : ধুত্তোর আপনার সাধনের পথ,—এখানে থাকতেই হবে কিছুদিন। কুলদাবাবু মৃদু মৃদু হাসির আবরণে তামাকের ধূমপান-সুখে বিভোর হইয়াই রহিলেন,—তখন আমি বলিলাম, কালই আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

—ধুত্তোর আপনার কালই যাবার ব্যবস্থা,—ওসব কথা থাক, এখন আপনার

কোথাও যাওয়া হবে না, জেনে রাখুন, একটি মাস মাত্র এখানে রাখব আমরা, তার পর সযত্নে বক্রেশ্বরে পাঠিয়ে দেব, যা খুসী করবেন সেখানে যেয়ে।

আমি তো মহাবিপন্ন বোধ করিলাম। যে কোন যুক্তির কথাই বলি না কেন,— তিনি ঐ,—ধুত্তোর, আপনার যুক্তিটুক্তি এখন রাখুন—কোন কথাই শুনিতে চান না। কাজেই আমি বিপন্ন বোধ করিলাম এবং ম্রিয়মাণ রহিলাম। মুখে আমার বিষন্নভাবটাই প্রকট হইয়া থাকিবে, এ লক্ষ্য করিয়া শিবরতনবাবু বলিলেন,—এঃ—আপনার সম্বন্ধে সব কিছু আশাই আমাদের নৈরাশ্যে পরিণত হ'ল। আচ্ছা বলুন তো. ঐভাবে এতটা কাল কাটিয়ে আপনার লাভটা কি হবে? আপনি ঢের বড় কিছুই করতে পারতেন।

আমি এবার যথার্থই অনুতপ্ত হইলাম, বলিলাম—আপনি আমার সম্বন্ধে কি রকম ধারণা করে বসে আছেন জানি না, হয়তো মনে মনে আমায় ব্রিলিয়্যাণ্ট একটা কিছু ধারণা করেছেন, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই জানবেন যে আমার মধ্যে যথার্থ যদি কিছু সমাজকে দেবার মত বস্তু থাকত তাহলে এভাবে এখানে আসব কেন, আর আসল কাজ ছেড়ে ঘুরে ঘুরেই বা মরব কেন?

—ধুত্তোর আপনার ঘুরে ঘুরে মরা,—আপনি মোটেই প্রেমের মানুষ নন,—বলিয়া উঠিলেন। তার পর দ্বারপথে যাইতে যাইতে—এখন চুপ করে একটু বসুন, যতক্ষণ না ফিরি কোথাও যেন যাবেন না, বলিয়া কুলদাবাবুর দিকে চাহিয়া একটু ইসারা করিলেন এবং চটি জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমার তরফের যুক্তি আমি যতই দেখাই না কেন, তাঁর সেই ধুত্তোর,— রেখে দিন ও সব আপনার—, এই বোল ছাড়া আর অন্য কথা নাই। শেষে সাব্যস্ত হইল আমার মাথার ঠিক নাই। যে দুদিন ছিলাম তাঁহার পাঠাগারই ছিল আমার প্রিয় আশ্রয়। দেখিলাম কুলদাবাবু এখানেও কোন কোন লোক-হিতকর কর্মে সংশ্লিষ্ট আছেন।

কুলদাবাবুর ঘর-কন্নার কথা একটু বলা দরকার মনে করি। তিনি যখন কলিকাতায় নানা কর্মে থাকেন, কিম্বা বাহিরে কোথাও কর্ম-ব্যপদেশে ঘোরা-ফেরা করেন তখন তাঁর পরিবারবর্গ এখানেই থাকেন। তাঁর সকল কর্মই একসূত্রে বাঁধা,—একই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁর সকল প্রচেষ্টা সম্ভাবিত করিতেছে। ভাগবত-ধর্মই তাঁর জীবনের সর্ববিধ ব্যাপারে মূল অবলম্বন। বাহ্য ব্যাপারে আসক্তি তাঁর অন্য কিছুতেই দেখিলাম না, একমাত্র তামাকের ধূমপান ছাড়া।

সিউড়িতে দুই দিন ছিলাম। কুলদাবাবুর বাড়ীতেই আহার করিতাম তাঁহার সংসারে। এই আহারের মধ্যে কোনও বিলাসিতা নাই। বোলতার টিপের মত মোটা ভাত, এবং অতি সাধারণ উপকরণ দুই তিনটি। শেষে দেশীয় আম, কাঁঠাল এবং দুগ্ধ। ছেলেপুলেরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট বটে, বেশ স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতেই মানুষ হইতেছে। চমৎকার সেকেলে ধরণের গৃহস্থ। কুলদাবাবু এই বিংশতি শতাব্দীর অন্তর্গত সভ্যজগতের লোক, কিন্তু কোথাও তাঁর ঘর-সংসার বা সাংসারিক ব্যবহারে, বেশভূষায় বা আসবাবে, তাহার কোনও প্রকার পরিচয় নাই। অথচ তিনি যে চেষ্টা করিয়া এ চালটি বজায় রাখিয়াছেন তাহাও নয়। যেমন চলছে, চলুক,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন আধুনিক বস্তু তিনি নিজ সংসারে প্রবেশ করান নাই। সহজ নিয়মে যেটা আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন চা খাওয়াটা,—তাহাতে বৈরাগ্য নাই। ছেলেপুলেরা, অবশ্য বয়সের

তারতম্যে, নগ্ন শরীরে, ধূলামাটি মাখিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, বেশ স্বচ্ছন্দে মানুষ হইতেছে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে নারী যাঁহারা, সকলেই পূর্ণ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করেন। সংসারের সকল কর্মই মেয়েদের হাতে করিয়া করিতে হয়। কোনও কর্মের জন্য বাহিরের লোক নাই। শেষ এইটুকু দেখিলাম, কোন দিকেই কুলদাবাবুর সংসারে, গতানুগতিক প্রথায় প্রয়োজন নিরসন ব্যতীত কোন প্রকার আধুনিকতা প্রবেশ লাভ করে নাই। আমার মনে হইল দেশের সকল সাধারণ গৃহস্থ পরিবারই এই ধরণের।

যাহার জন্য আসিয়াছি, তৃতীয় দিনে তাহার কথা পাড়িলাম। এইবার আমায় বক্রেশ্বরে পাঠিয়ে দিন কিম্বা পথটি বলে দিন এই অনুরোধ করিলাম। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে আর চলে না তখন একটি লোককে সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন।

সিউড়ি হইতে বক্রেশ্বরের যে পথ, উহা প্রশস্ত এবং নয়ন-বিমোহন। দুই ধারে বড় বড় গাছ। অর্জুন গাছ বেশী। অশ্বত্থ, পাকুড়, কাঁঠাল, তেঁতুল

প্রভৃতি বড় জাতের গাছও চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ওধারে সকল জমিই উঁচু নীচু, ঢেউ খেলানো,—মালভূমি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই বীরভূম ও বাঁকুড়ার সর্বত্রই। কোথাও কোথাও মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের মত লাল মাটিও আছে। নিম্ন বঙ্গের স্যাঁৎসেতে ভাব একেবারেই নাই। প্রভাতের মেঘলা আকাশের সঙ্গে পথের দুই ধারে ঘন পত্র শাখাময় তরুর সারি

এবং দূরস্থিত গভীর শালবনের একটা আশ্চর্য্য ঘন সম্বন্ধ আছে, যাহা পথিকের মনকে ভুলাইয়া দেয়। পথশ্রমের কথা আভাষেও মনে আসিতে দেয় না। আবার তাহার মধ্যে যখন মাঝে মাঝে সূর্য্য প্রকাশিত হন, অকস্মাৎ তরু-গুল্ম-লতাপূর্ণ বনভূমির শোভা পরিবর্তিত হইয়া যায়, মনে হয় যেন বিশ্ব-আত্মার সকল প্রকাশটুকুই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, অস্পষ্টতা কোথাও নেই। যেন নিঃসর্গের অস্তিত্ব রৌদ্র-জ্বালার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তরুতল, ছায়ায় স্নিগ্ধ, তার পাশে দীপ্তাংশ জ্বালাময় হইয়া গিয়াছে।

প্রায় দুই ক্রোশের মাথায় একটি বাঁকের মুখে একটা বিশাল অর্জুন গাছ, তাহার তলায় দুই-চারিজন লোক বসিয়া কথা কহিতেছে, তামাক খাইতেছে, আর দূরে মাঠের দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছে। সেখানে হাল-কাঁধে দুজোড়া গরু, চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম: বক্রেশ্বর কোন্ দিকে যাব?

—আপুনি কোন্ গাঁয়ের বট?

—কলকাতায়ই আমাদের ঘর।

—কিসের লেগে বক্কোমুনির থানে যাইছেন? মানত আছে বটে?

—পীঠস্থান কিনা—তাই।

—যান্ ক্যাম্নে হৈ সোজা হো বাঠে, গাঁয়ে যেঁয়ে উঠবেন গা। হোই যে গাঁ দিশছে।—কোথা হোতে আইছেন?

সিউড়ি থেকে আজ আসছি, বলিয়া পা চালাইলাম; পশ্চাতে শুনিলাম,—মনিষটা ভাল বটে গো! এবারে বড় রাস্তা ছাড়িয়া বামে চলিলাম। ধু-ধু মাঠ, দূরে দূরে এক একখানি গ্রাম দেখা যাইতেছে ঘন রেখার মত। উঁচু-নীচু মাঠ, তার মাঝে দুই-একটি বড় গাছ। বহু দূরে ঈষৎ নীল রেখা, কোন পাহাড় হইবে। দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরে আসিয়া পেঁাছিলাম। কুলদাবাবু বলিয়া দিয়াছিলেন, কালীবাড়ীতে গিয়া উঠিবেন। তাহাই আমি করিলাম।

বড় না হইলেও ছোট নয়, মন্দিরটি আধুনিক বাঙ্গলা মন্দিরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। জগদম্বার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা-নিবাসী কোন বড় ব্যবসায়ী ব্যক্তি সাধু, সন্ত, গৃহস্থ যাঁহারা এই তীর্থে আসিয়া নিজেদের অসহায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের একবেলা প্রসাদান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী এখানে আছেন, তিনিই [illegible], সেবাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নামটি বোধ হয় [illegible], লোকটি ভাল। [illegible]-বত্রিশ এর মধ্যে বয়স, [illegible]।

আগে কেহ এখানে খবর দিয়াছিল কি না [illegible] আসিয়া [illegible] কোন প্রকার পরিচয় না [illegible] কোনরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল না। [illegible] ঠিক হইয়া আছে।

এখানে পাপহরা বলিয়া একটি প্রবাহ আছে। [illegible] পাপহরার কথা বলিবার পূর্বে এখানে যে ছয়টি কুণ্ড বা উষ্ণ জল-প্রবাহ আছে তাহাদের পরিচয়ই প্রথম, যেহেতু ঐ কুণ্ড কয়টির ধারাগুলি হইতেই পাপহরার জন্ম।

পাপহরাকে গঙ্গা বলিবার প্রথাও আছে। আসল গঙ্গার সঙ্গে পাপহরার

ভৌগলিক কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে যা অস্বীকার করিবার নয়। সদ্যপাতকসংহন্ত্রী, এই যে গঙ্গার গুণ, ভাবের দিক দিয়াই হোক বা বিজ্ঞানের দিক দিয়াই হোক,—জলের গুণেই হোক বা ধর্ম-সংস্কারের গুণেই হোক, স্নান করিলেই শরীর ও মনের উপরে তাহার ক্রিয়া

প্রত্যক্ষ হয়। আবার অধিক দিন স্নান অভ্যাস করিলে শরীর নীরোগ হয়। —পাপহরারও সেই গুণ স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, যদিও আগে শুনিয়া বিশ্বাস করি নাই। অনেক রোগী বহু দূর দূরান্তর হইতে এই পাপহরায় স্নান করিতে আসে এবং ফলও পায়। যাত্রীর সংখ্যা প্রত্যহ এখানে খুবই কম, তবে মাঝে মাঝে বেশ হয়। স্নান এই পাপহরায়, আর আহার কালীমার প্রসাদান্ন। রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ, দিনমানে কোনদিন কিছু-কিছু ফাউ জুটিত, সে কথা পরে বলিব।

অন্নগত প্রাণ বলিয়া কালীবাড়ীর কথা প্রথমে বলিলাম, যেহেতু সেইখানেই দৈনন্দিন অন্নের ব্যবস্থাটা ছিল, তাই দুই-মাসকাল নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বন্দ্বে কাটাইতে পারিয়াছি। বক্রেশ্বরে আসিয়া বক্রেশ্বরের কথাই প্রথম এবং প্রধান। ইহা অবশ্যই প্রথমে জানা ছিল যে এখানে সতী-অঙ্গ পড়ার জন্য এ পীঠস্থানের মাহাত্ম্য কম নয়, বক্রেশ্বর ভৈরব এই স্থানের অধিপতি। তাহার উপর আবার মহাযোগী অষ্টাবক্র এই, স্থানে সাধন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহা সিদ্ধপীঠ। তন্ত্রমতে মহা মহা কঠিন সাধন-সকল এই সিদ্ধপীঠে বহুকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিদ্ধাসন এখানে বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে এখন আর এখানে কোন সাধক নাই।

সিদ্ধপীঠের চিহ্ন এখন যে কয়টি এখানে আছে তাহার মধ্যে যে এক বিশাল নিদর্শন এখনও রহিয়াছে তাহা বোধ হয় অন্য আর কোনও পীঠে নাই।

একটি উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী, মধ্যে একটি বিশালায়তন মহীরুহ। এত লম্বা গাছ কোথাও আমি দেখি নাই। ক্যালিফর্ণিয়ার জঙ্গলে যে দানবাকৃতি

বৃক্ষের কথা শুনি, এটি যেন তার ছোট ভাই। কাণ্ডটি ফাটিয়া ফাটিয়া, অসংখ্য গভীর রেখাপাত করিতে করিতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, মধ্যে কোথাও শাখা বা পত্র নাই। শীর্ষদেশ কতকটা শাখাপত্র সমন্বিত, প্রায় একটি ছাতার মত। উপরের দিকে চাহিলে মাথার পাগড়ি খসিয়া পড়ে। পাতাগুলি বেশ বড় বড়, ছোট নয়, অনেকটা সেগুন পাতার মত, আকৃতিটি একটু বিভিন্ন ধরণের। ঐ বেদীতেই অনেকানেক সাধু মহাপুরুষের পায়ের ধুলা পড়িয়াছে। গাছটি যে কত কালের তাহা ওখানকার কেহই জানে না। আমি ১৯১৫/১৬ সালের কথা বলিতেছি, এই বিশাল শমী বৃক্ষটি কত বড় বড় ঝড়-ঝাপটা খাইয়া এখনও নিজ শক্তিতে দাঁড়াইয়া আছে—ইনি যে কত কালের, কত কত ব্যাপারের সাক্ষী তাহা কেহ জানে না।

এখন ইহার চারিদিকে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেই বিশাল বটবৃক্ষ। ঠিক অষ্টাবক্র মুনির সিদ্ধাসনের উপরেই। তার পাশেই কুণ্ড। সর্বত্র কুণ্ডগুলি যেমন হইয়া থাকে, এখানেও তাই—কুণ্ডগুলি বাঁধানো, পাঁচ-ছয়টি সিঁড়ি নামিয়া কুণ্ডের জলে হাত দিতে হয়। অল্পবিস্তর সকল কুণ্ডই উষ্ণ। ঐই উষ্ণ প্রস্রবণগুলিই বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য, গোড়ায় এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না। যত পীঠস্থান বা তীর্থ আমাদের এই ভারতবর্ষে আছে সেগুলির স্থানমাহাত্ম্য যথার্থই উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিচারে নিঃশেষ সত্য বলিয়াই ইহা স্থির, যাহার মধ্যে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই কুণ্ডটি বক্রেশ্বর ভৈরবের মন্দির-পার্শ্বেই। এক সময়ে এখানে বহু তান্ত্রিক সাধকের অবস্থিতি ছিল। এখন, অর্থাৎ যখন কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি ওখানে উপস্থিত হইলাম, তখন দুইটি মূর্ত্তি ওখানে দেখিলাম, অবশ্য সে দুইটি আমায় কিছুমাত্র আকৃষ্ট করিবার যত্ন করেন নাই, শ্রদ্ধাও আমার কিছু হয় নাই—কাজেই ঘনিষ্ঠতাও হইতে পায় নাই। এই দুই জনের মধ্যে কোন্‌টি আসল, কোন্‌টিই বা মেকী তা চিনিয়া লইবার শক্তি ত আমার মত লোকের না থাকারই কথা,—তথাপি বিচক্ষণতার অভিমান ত আমার কিছু আছেই, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মনে করিলাম ইহার মধ্যে একজন ভাল, অপরটি মেকী। যেটিকে ভাল অনুমান করিলাম, অর্থাৎ প্রথমেই দুই-চারিটি কথা শুনিয়া, অপর জনের সঙ্গে তুলনায় কিছু ভাল বলিয়া লইতে আমার মন পছন্দ করিল, তাঁর নাম বৈদ্যনাথ বা বোদে পাগলা। আর যাঁর প্রতি আমার মন বিমুখ হইল তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম অনুকূল চন্দ্র। জাতিতে আগুরী অর্থাৎ উগ্র ক্ষত্রিয়। এখন রাঙ্গা কাপড় পরিয়া সেই নামটিতে আনন্দযোগে অনুকূলানন্দ হইয়াছেন। মূর্ত্তিই মানুষের প্রকৃতিগত গুণাবলীর পরিষ্কার আলেখ্য, অবশ্য দেখিতে যে জানে। যে জানে না, তাহার কাছে অনুকূলানন্দ স্বামী প্রথমেই গ্রাহ্য হইবেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের কোন আকর্ষণই নাই। কালো রং, ঢ্যাঙ্গা রোগা, গোঁফদাড়ী ভরা মুখ, গলার আওয়াজ তাদের ষড়জ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত তিনটি পরদার মধ্যেই খেলে, তাহার উপরে উঠিতে দেখি নাই। কিন্তু অপরটির মূর্ত্তি রাজসিক, শক্তিহীন হইলেও লাল রংটা এখনও আছে, খর্বাকৃতি, সম্মুখের নীচের পাটির তিন-চারিটি দাঁত নাই। তাহার কিছু কৈফিয়ৎ সঙ্গে সঙ্গেই আছে,—সকলেই বলে বাঁধিয়ে নিতে, ছোঃ, আমার ওসব পছন্দ নয়,—রামোঃ, কি হবে দুটো দাঁত বাঁধিয়ে, লোককে দেখানো যে আমার বয়স হয় নি। যদিও আমার দাঁত পড়ার অন্য কারণ আছে ;—আমার এই শ্রাবণে বিয়াল্লিশ

কম্‌প্লিট হবে। খুব অসুখ করেছিল কিনা!—খুব ভুগেছিলাম, বাঁচবার আশা ত ছিল না। উঃ সে কি ভীষণ যন্ত্রণা,—শালা ডাক্তারগুলো খুব আরক খাইয়েছিল, সেই থেকেই ত দাঁতগুলো গেল।

আরও একটি কথা তাঁর মুখ হইতে প্রায়ই বাহির হইয়া যাইত,—ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি যখন তখন কি কোনও শালাকে গ্রাহ্য করি। কোনো বেটাবেটীর সাহায্য আমি চাই না। তাঁর গলা মুদারা ও তারা দুই গ্রামেই চলে, সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ যথেষ্টই আছে, প্রায়ই তার পরিচয় পাইতাম।

আমাদের এই বদ্যিনাথ যেখানে সেখানে পড়ে থাকেন, কোথায় কখন থাকেন, রাত কাটান কখনও খোঁজ করি নাই। কিন্তু এই অনুকূলানন্দ থাকেন যেখানে সে স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দরজাহীন ঘরের একটি আনলায় তাঁর কাপড় চোপড় ঝোলানো থাকে। কম্বলের একটি পরিষ্কার বিছানা সেখানে দেখা যায়। সেটি শয়নের সময় পাতা হয়, অন্য সময় বেশ গুছিয়ে তুলে রাখা হয়। একটি মাদুর, তার উপরে একখানি আসন পেতে তিনি দিনমানে বসেন। কালীবাড়ীতে প্রসাদ পাবার ঘণ্টা বাজলেই বেশ উজ্জ্বল, মাজা একটি ঘটী নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। দেহগত সকল ব্যবহারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ একটি গোছালো গিন্নি-ভাব তাঁর সব সময়েই দেখা যায়।

সকালে তাঁকে নদীতীরে বেড়াতে দেখা যায়। প্রত্যহ তাঁর এ সৎ-অভ্যাস অনুযায়ী এ কাজটি ঠিকই হয়, ব্যতিক্রম হয় না, কোন দিন ত দেখি নাই। তার পর একটু চা পানের অভ্যাস আছে। তার জন্য তোড়-জোড়ের তাঁর অভাব নাই। গাঁজা, চরস তাঁর ঠিক সময়মত সেবন করা অভ্যাস আছে। সে সময় বদ্যিনাথকেও দেখা যায়, কারণ এই মহৎ অভ্যাস তাঁরও বড় কম দিনের নয়। আবার এই সময় ছাড়া দুজনের প্রীতিও থাকে না। বদ্যিনাথের মুখে কারো নিন্দা শোনা যায় না কিন্তু অনুকূলানন্দর মুখে বদ্যিনাথের নিন্দা শোনা যায়। বেটা ছোট লোক, রাজবংশী, বেটা মুখ্যু, ওর আবার কি হবে!—এই রকম।

বক্রেশ্বর ভৈরবের মন্দিরে এই দুই মূর্তির অধিষ্ঠানকালে, আমি যখন আসিয়া কিছুদিন থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলাম, বৈদ্যনাথ আনন্দ প্রকাশ

করিলেন, মুখে তাঁর বড় প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু অপর জন মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন: এখানে থাকা কি সুবিধা হবে? জায়গা কোথা, আমার এইটুকুর মধ্যে দুজনের ত জায়গা হবে না। শুনিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন: ক্যানে, জায়গার অভাব কি,—মন্দিরের পিছনে লম্বা উঁচু দাওয়া র'য়েছে ত বটে,—আরও কত ঘর র'ইছে, থাকবার ভাবনা হবেক ক্যানে?

অনুকূলানন্দ তখন বলিলেন: হাঁ, আমি তাই বলছি,—আমার এখানে জায়গা কম কিনা? দু'জনের থাকা—

বক্রেশ্বর মন্দিরের পিছনে লম্বা বারান্দা, তার ছাদ ঢালু, বেশ উঁচু দাওয়ার মত। দেওয়াল ও ছাদ সবই পাকা, বেশ মোটা খুঁটি, সেজন্য দাওয়ার সঙ্গে তার মিলটা বেশী, চওড়া প্রায় ছয় হাত, লম্বা চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেখানে অনেক লোকই থাকিতে পারে। সেইখানেই আমার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। দিনমানেও ঐখানে থাকিতাম।

তখন বর্ষা, শ্রাবণ মাস। প্রখর রৌদ্র বেশী দিন ভোগ করিবার সুযোগ হয় নাই। বাহিরে শিবালয়ের উচ্চ ভূমি হইতে নামিয়া কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ সারি সারি চলিয়াছে। চারিদিকেই প্রাচীর বেষ্টিত, একদিকে জলে নামিবার কয়েকটি ধাপ, সেদিকটা কতকটা খোলা। চতুষ্কোণ বড় চৌবাচ্চার মত। ফুটন্ত জল অবিরাম উঠিতেছে এবং একটি প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া পাপ-হরার অঙ্গে যাইয়া মিশিতেছে। সকলগুলিই এক রকম। কুণ্ডগুলির এক দিকে পথ, অপর দিকে বেলগাছ, তাহাতে ছোট ছোট ফল ধরিয়াই আছে। দুই-চারিটা আম, জাম, জামরুল গাছও আছে। কুণ্ডগুলি এবং পাপহরার মধ্যে যাতায়াতের পথ উঁচু-নীচু, ঘন তৃণগুল্ম আচ্ছাদিত, কেবল চলিবার স্থানটুকু কাঁকর মাটি, পাথরে ঢাকা। পাপহরার ওপারে দক্ষিণে শ্মশান, বাকি সকল স্থানই জঙ্গলময়, একেবারে নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বক্রেশ্বর পীঠস্থানের চতুর্দিকেই নানাপ্রকার ধ্বংসাবশেষ। মন্দির, আবাসস্থান, ইষ্টক-নির্মিত নানাপ্রকার গৃহ সকল যেভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়—উহা এক সময় ঘন জন-সন্নিবিষ্ট পল্লী ছিল,—বহু লোকের অবস্থিতির চিহ্নসকল এখনও জীবন্ত দেখিতেছি। এই ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব লোপ হইতে এখনও অনেক দিন যাইবে। অশ্বত্থ ও বট এই দুইটি বৃক্ষই খুব শীঘ্র শীঘ্র এই সকল কীর্ত্তি-ধ্বংস-লীলায় সহায়তা করিয়াছে। এখানে ম্যালেরিয়া নাই, কিন্তু মশার উপদ্রব অত্যন্ত এবং অসহ্য।

যদি প্রাচীন কালের কথাই ধরা যায়,—এই অষ্টাবক্র মহাযোগীর আশ্রমটি বড় কম ছিল না। এখানে কম করিয়া সহস্রাধিক আনুষ্ঠানিক যোগী, ব্রহ্মচারী, প্রবর্ত্তক, শিষ্য সেবকাদির অধিষ্ঠান ছিল। বহু ধনবান গৃহী, বণিক, নরপতির যাতায়াত ছিল। এখানকার যত প্রতিষ্ঠান, একসময় কাশী কোশল অবধি বিস্তৃত হইয়া যোগমার্গের কত শত সহস্র মানুষের বিশিষ্ট আকর্ষণের বস্তু ছিল। সাধনের যে সকল বিশিষ্ট ক্ষেত্র ভারতে আছে, এক সময় এ ক্ষেত্রটি তাহাদের তুলনায় বড় কম ছিল না।

॥ ১৪ ॥

বক্রেশ্বর শিবমন্দির, মহাযোগী অষ্টাবক্র স্থাপিত সেই পুরাতন মন্দির এটি নয় যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি বা বিগ্রহ সেই বটে। প্রাচীন মন্দিরটি প্রাচীন

কালেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তার পর আবার অবস্থানুযায়ী নির্মিত হইয়াছে। কয়বার হইয়াছে তাহা জানা যায় না। এখনকার মন্দিরটি অতি সাধারণ,
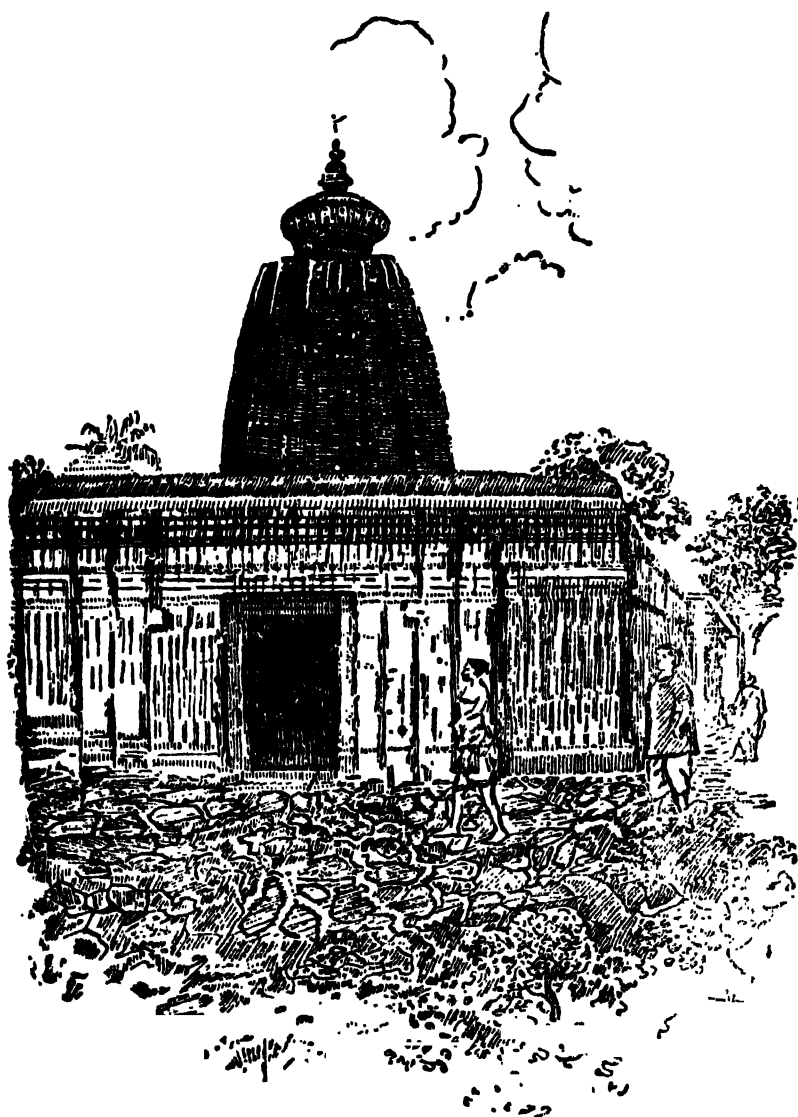
বাঁকুড়া মন্দির স্থাপত্যের সরলতম অনুকরণ ; কেবল চূড়া হইতে মধ্যস্থল পর্যন্ত পল দেওয়া আছে। তার পর সাধারণ ঘরবাড়ির দেওয়ালের মত। দ্বারের

কোন শিল্প-বৈশিষ্ট্য নাই। ভিতরে প্রবেশ করিলে ছোট অন্ধকার একটি সমচতুষ্কোণ নাটমন্দিরের অবয়ব। তার পরই অন্ধকারময় গর্ভগৃহ।

এই মন্দির-অধিষ্ঠিত প্রাচীন লিঙ্গের পূজার ব্যবস্থা পাণ্ডাদের উপর বহুকাল হইতেই আছে। পাণ্ডাদের বংশ কম নয়। তাঁহাদের পুতিতুণ্ড উপাধি, ব্রাহ্মণ-বংশীয়। এই উপাধির ব্রাহ্মণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কেবল দক্ষিণ বাঙ্গালায় আমার মাতুলেরা কয়েক ঘর বর্তমান। যাহা হউক এখানকার পাণ্ডারা সকলেই গৃহস্থ। তাঁহাদের এক এক ঘরের উপর পালাক্রমে এক এক দিনের পূজা ভোগরাগ প্রভৃতি নির্দ্ধারিত আছে। সেদিন-কার যাত্রিদলের নিকট যত কিছু পূজার জন্য আদায়, প্রণামীর টাকা পয়সা ইত্যাদি, সমস্তই সেই পাণ্ডার। প্রতিদিনই প্রাতে একদল পাণ্ডা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া হল্লা করিত, সেটা প্রায় আড়াই প্রহর অবধি চলিত। ভোগ ও আরতির কাজগুলি শেষ হইতে প্রায় দুইটা হইত। যাত্রিদল বেশী থাকিলে, বেলা আরও বেশী হইত। পূজার ব্যাপার যাহাই হউক না কেন, বক্রেশ্বর শিবের নিত্য পায়সান্ন ব্যতীত অন্য কোনও ভোগের ব্যবস্থা দেখি নাই।

ওখানে, মন্দিরের পশ্চাতে দাওয়ায় আশ্রয় লইবার পর দুই-চারি দিন গত হইলে একদিন কালীবাড়ী হইতে প্রসাদ পাইয়া আসিয়া বসিয়াছি,—একজন পাণ্ডা ছোট একটি থালায় ঢালা পায়সান্ন আনিয়া বলিল: প্রসাদ, নিয়ে নিন।

কোন পাত্র না থাকার কথা যখন আমি বলিলাম, তখন সে বলিল: এই পাত্রই এখন আপনার কাছে থাকুক, কাল নিয়ে যাব। বলিয়া চলিয়া গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি আমাদের বৈদ্যনাথ আসিতেছে। এইমাত্র এক সঙ্গেই আমরা কালীবাড়ীতে প্রসাদ পাইয়াছি। আমি ডাকিলাম এবং প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

বৈদ্যনাথ বলিল: তা হবেক্ নাই—আপনি খান কেনে। আপনার লেগে আইচে আমি লিব কেনে?—

আমি বলিলাম: এই মাত্র খেয়ে আসছি,—

বাধা দিয়া বৈদ্যনাথ বলিল: আমুও ত আপনার সঙ্গেই খেয়্যাচি।

তাহা হইলে কি করা যায়—শেষে দুইজনে মিলিয়াই প্রসাদটি শেষ করিতে হইল।

সেই অবধি প্রত্যহ একটি থালায় পায়সান্ন প্রসাদ আসিত, একদিনও বাদ যায় নাই। এখন বৈদ্যনাথকে লইয়াই কথা।

জিজ্ঞাসা করিলাম: বৈদ্যনাথ, তোমার ভৈরবী আছে শুনলাম।

আছেই ত, বটে। কাল বাদে পরশু যাবগা, লিয়ে আসব হেথায়। কেনে, আপুনি ভৈরবী লন নাই?—আপনাদের সাধন কেমন?

আমি বলিলাম: আমার অন্য পথ বৈদ্যনাথ, তবে তোমাদের ভজন সাধন দেখতেই এখানে এসেছি। একবার তোমরা আমায় চক্রে নিয়ে যাবে?—

—তাতে কি, আপুনি এলেই ত হয়, তবে আমাদের চক্রে গেলে পঞ্চ-মকার করতে হয়। আপনি করতে পারবেন?—আপনি ত মদ মাংস খান না।

আমি বলিলাম: শুধু দেখব। তখন বৈদ্যনাথ বলিল: তা হবেক কেনে, বাপু—অন্য বৈরাগীদের আমাদের ভিতর নিতে লারবো। বাধা আছে। তবে চক্রেশ্বর* যদি মন করেন তবেই হতে পারে।

---

* চক্রের মধ্যে একজন প্রধান থাকেন, তিনি চক্রেশ্বর।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ নদীতীরে ঐ শ্মশানে যে একজন উলঙ্গ সাধু থাকেন তাঁর কি ভাব ?

বৈদ্যনাথ ঃ ও যে অঘোরী,—উনি ত ক্ষ্যাপা বাবা, ও'র কথা ছেড়ে দেন।

আমি ঃ ও'র ভৈরবী নাই ?

বৈদ্যনাথ ঃ না, ও'র ওসব দরকার নাই. উনি সিদ্ধ।

আমি ঃ কতদিন উনি এখানে আছেন ?—

বৈদ্যনাথ ঃ আমি ত বছর দেড়েক দেখছি, উনি ত বরাবর থাকেন না, মাঝে মাঝে চলে যান।

আমি ঃ কোথায় ?

বৈদ্যনাথ বলিল ঃ তা বলতে লারী, চলুন না ও'র কাছে,—যাবেন ? আমি বলিলাম—যাব বটেই এক সময়, কিন্তু এখন নয়। সেদিন যে তাড়া করেছিলেন একজনকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে—আমার ভয় করে ওরকম ভয়ঙ্কর রাগী লোকের কাছে যেতে। তোমরা যখন যাও, কিছু বলেন না ?

বৈদ্যনাথ হাসিয়া বলিল ঃ—ও'র রাগ কোথা ?—রাগবেন কেন,—মাঝে মাঝে সকলে যে জ্বালাতন করে, বাবা, ওষুক দাও, তুসকো দাও, আমার রোগ সারিয়ে দাও—এসব বলে যে জ্বালাতন করে। তা একটু ভয় দেখিয়েছেন।

আমি বলিলাম ঃ উনি কি রোগ ভাল করতে পারেন ? কবরেজী জানেন বুঝি ?

বৈদ্যনাথ ঃ খার কোবরেজী, ও'র কোবরেজী জানতে হবেক কেনে,— ও'রা যে ভগবান। যাকে যা বলেন, যাকে যা দেন তা ঠিক হয়। সেবারে একটি মানুষকে একেবারে খেয়ে দিলেন ?

আমি ঃ খেয়ে দিলেন ? কি রকম, তাকে মেরে কাঁচা খেয়ে ফেল্লেন না কি ?

বৈদ্যনাথ বলিল ঃ তা হবেক কেনে, সে যে উয়াকে এখান হতে উঠবার লেগে কোম্পানির সাহেবকে বলেছিল গো। তাই তাকে খেয়ে দিচেন। তিন রাত্তির গেল না, কলেরা হয়ে মোলো গো। বাবাকে চটালেই মুস্কিল। সে মরবে, তাকে যমের ঘরকে যেতে হবেক যে।

আমি বলিলাম ঃ তা হলে কাজ নেই অমন লোকের কাছে গিয়ে, কি বল বদ্যিনাথ ?

বৈদ্যনাথ ঃ তা আপুনি চলুন না কেনে, কিছুই হবেক নাই। আপুনি ত ভাল মানুষ বটে।

আমি ঃ যদি যাই ত তোমারই সঙ্গে যাব, বুঝে সুঝে একদিন যাব। আচ্ছা, উনি ত দিনের বেলায় বেরোন না, সমস্ত দিনই কি ঐ কুঁড়ের মধ্যেই থাকেন ?

বৈদ্যনাথ ঃ তাই তো থাকেন, কদাচ কোন দিন বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু ঐ শ্মশান থেকে আর কোথাও যান না। এক একদিন সকাল থেকে জলেই আছেন। কখনও ডুবছেন, কখনও উঠছেন, কখনও বা ভেসে চললেন মড়ার মত। ও'য়ার কথা বলেন কেনে।

আমি ঃ আচ্ছা, তুমি কি ঠিক জান উনি তান্ত্রিক নন ?

—হাঁ গো, ঠিক জানব না কেনে,—তাহলে ত ভৈরবী থাকত। এতদিন ত এখানে রইছেন কখনও ত কোন ভৈরবীর সঙ্গে কিছু দেখলাম না। একবার এক ভৈরবী ক্ষ্যাপাবাবার কাছে গিয়েছিল, তখন ঘরের মধ্যে ছিলেন. তার পর বেরিয়ে এসে এক ঠেঁয়ে বসলেন গা। ভৈরবী মেয়েটিও বসল। তার পর, অনেকক্ষণ আমরা এদিক থেকে দেখছি,—বেলা শেষ হয়ে এসেছে. ভৈরবী চক্ষের জল মুছতে মুছতে চলে এল। তার পর আর কাউকে দেখি নাই।

আমি ঃ আচ্ছা, উনি খান কি ?

বৈদ্যনাথ ঃ খাবেন একবার রাত্রে। কোন রাতে হয়ত খেলেন না। দেখেছি যদি খান ত ঐ রেতেই খান।

আমি ঃ তুমি রাত্রে কখনও গিয়েছ ?

বৈদ্যনাথ ঃ হেঁ, যাব নাই কেনে, আমায় ত উনি ভালবাসেন বটে। দিনে যাঁই. রেতে যাঁই, আমায় কখনও কিছু বলেন না।

—ওঁর সাধন ভজন কি রকম দেখেছ ?—

—ওঁর আবার সাধনের কি, উ লাগবে কেনে, উনি ত সিদ্ধ,—ওঁর ও সব কিছু করতে হয় না।

—তোমায় কি বলেন ? কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে কি ?

—আমার কি দরকার, আমি জিজ্ঞাসবো কেনে ?—যাই, পেণাম দিয়ে বসি, আর তামাকটা আসটা পেসাদ পাই,—কখনও কারণ করলাম। তা এক কলসী খেলেও কে বলবেক যে বাবা কারণ খেঁয়্যাচে। একবার একজনরা শববাহ করতে আইছিলো, আমার সামনে দেখেছি, একটি কলসী খাওয়া করায়ে দিইছিলো। যেমন বাবা তেমনি বাবা, কিছুই নেশা হোলো নাই। কতক্ষণ পর একবার প্রস্রাব করলেন, ব্যস্। ওঁর কারণ-করা দেখে তাদের নেশা ছুটে গেল গা। বলে, বাবা, এমন কুথাও দেখি নাই।

—আচ্ছা বৈদ্যনাথ, তোমার এসব কি মনে হয়, ঠিক করে আমায় বল দেখি !

বৈদ্যনাথ মাথা চুলকাইয়া বলিল ঃ ওঁর শক্তি আছে বৈকি ! অথচ কোনও ভৈরবীও নাই, কোন শক্তি সঙ্গে রাখেন না। তবে সত্য বলতে কি,—ও সব ভূতসিদ্ধি মনে হয় বটে গো ! না হোলে এমনটা পারবেক কেনে ! কি বলেন আপুনি ?

—তোমার ওঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা খুব,—না ?

—তা হবেক নাই, অতটা ক্ষমতা, কিন্তু কোনও দোষের কথা বলতে লারবো। কোন দিন কিছু দোষ ত দেখলাম না মশয়। উনি শিব বটে গো। দেখবেন, আপুনি ত যাবেন, দেখবেন।

বৈদ্যনাথের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল বাড়িয়া গেল বটে কিন্তু ভয়ও তার সঙ্গে কম ছিল না। ভাবিলাম, বৈদ্যনাথকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র যাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আচ্ছা, কখন গেলে দেখার সুবিধে হবে বল দেখি ?

হাসিয়া সে বলিল ঃ হোই দেখেন দেখি, আপনার যখন ইচ্ছা তখনই যাবেন।

—আচ্ছা রাত্রে সুবিধা হয় না ?

—হবে না কেনে,—উনি ত ঘুমান না, ওঁর ঘুম নাই। আজ এতদিন আইচেন আমরা কখনও ওঁকে ত শুতে দেখলাম না।

—সারা রাত করেন কি ?

—কখনও চুপ করে বসে থাকেন, কখনও ঘুরে বেড়ান ঐ শ্মশানে জঙ্গলে, যেখানে খুসী।

—তবে চল, আজই রেতে যাব।

—আজ যে আমি সাঁইতে যাব গা, ভৈরবীকে আনতে, বললাম না?

—তা হলে তুমি এলে পর তখন হবে, কি বল?—

—তাই করবেন। আপুনি একলা যান না, কি হবে, খেয়ে ফেলাবে নাকি, বাঘ না ভালুক?—

—ঐ যে বললে, উনি খেয়েছেন একজনকে। কি জানি, আমার একলা যেতে ভরসা হচ্ছে না। কেমন একটা সংকোচ হচ্চে। —তা হলে থাক্, তুমি ফিরে এলেই হবে তখন।

আমি বোলে রাখি, বৈদ্যনাথ বলিল,—শেষে আমায় দোষ দিবেন না,—আমার দেরী হয়েও যেতে পারে। দুই-চার দিন হয়ত হবেক বিলম্ব্।

—এত দেরী হবে কেন—তুমি ত বললে তাকে নিয়ে চলে আসবে?

বৈদ্যনাথ বলিল: তবে আপনাকে বলি। তাকে চেলা কাঠের বাড়ি মাথায় খুব পিঠে দিইছিলাম, সেটা ঘা হোইচে। সে কেমন আছে জানলাম না। হয়ত বা হাসপাতালে লিয়ে যেতে হবেক।

—এমন মারলে যে ঘা হয়ে গেল?—

—তা হবেক নাই? কথা শুনে না যে। একগুঁয়ে মেয়ে বটে সে। বললাম, এখন যাস না, আমি দুচার দিন পরে রেখে আসবো গা। তা শুনবেনি আমার কথা। তাই দিলাম এক ঘা কসিয়ে—যা মরগা যা, চুলায় যা। সেই ত গেছে গো।

বৈদ্যনাথ পর দিন সাঁইথিয়া গেল, আমি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্ষ্যাপাবাবার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। দিনমানে তাঁহাকে বড় একটি কুটীরের বাহিরে আসিতে দেখি নাই।

সেদিন ঘোর ঘনঘটা বর্ষা নামিয়াছে। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিতেছে। কাপড় আর শুকায় না। আমার বারান্দায় ছাত হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িতেছে। একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। দুই-চারিজন যাত্রী আসিল। এবং এইখানেই আশ্রয় লইল। তাদের সঙ্গে একটি নারী। একটি ছেলেও আছে। সঙ্গে তাদের দুজন বেশ জোয়ান পুরুষ, দেখিয়া ভদ্র মনে হয়।

একজন আসিয়া কাছে বসিয়া বলিল: আজ খুব বাদল নেমেছে। তাই ত—বলিয়া আমি একটু সরিয়া তাহাকে স্থান করিয়া দিলাম। নিজে ঠিকমত জায়গা করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল,—এস, বস না, এই যে জায়গা আছে। কিন্তু ছেলেটি ও তাহার মা দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সে বেশ আরামে একটি বিড়ি ধরাইল।

আমি তখন বলিলাম: ওঁদের একটু স্থান করে বসতে দিন না,—দাঁড়িয়ে ভিজছেন যে, দেখছেন না?

বিড়িটা মুখে রাখিয়াই সে ব্যক্তি—হাত দিয়া এক কোণে দেখাইয়া বলিল: বস না, তোমরাও বস না কেনে।

বুঝিতে পারিলাম না এ দুজনের সঙ্গে নারীর কি সম্বন্ধ। দেখিলাম,—ইহার কথায় নারী একটুও নড়িল না, ঠায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। তা

দেখিয়া প্রথম লোকটি উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিল: চ্যান্দড়কলা! আবার এখানেও সদ্দর করে দিইচ। জায়গা ত রইয়েচে, যে‍ঁয়ে বস গা কেনে!

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না, বালকের হাত ধরিয়া মাথার কাপড়টা একহাতে একটু টানিয়া দিল মাত্র। তাহাতে সেই মরদটি আমার দিকে চাহিয়া বলিল: দেখলেন, এটি সহজ মেয়্যা নয়। এই কথা শুনিয়া নারী একটু চঞ্চল

হইল, এবং তাহার নিকটে একপা অগ্রসর হইয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। তাহাতে লোকটি একটু চীৎকার করিয়া বলিল : এখনও পাণ্ডারা আসে নাই,—তারা এলে তবে না বাবার কাছে পূজা দেয়া হবেক, ততক্ষণ তুমি দাঁড়ায়ে থাকবে নাকি? পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল : হাঁ মশয়, পাণ্ডারা কখন আসবে এখানে?

আমি বলিলাম : আজকে বড় বৃষ্টি নেমেচে কি না তাই হয়ত আসতে দেরী হয়েছে। না হলে অন্য দিন ত এমন সময় এসে পড়ে সবাই।

সঙ্গে তাদের একটি পুঁটুলি ছিল, সেটা ভিতরে রাখা ছিল, মেয়েটি তখন ছেলের হাত ধরিয়া ভিতরে দাওয়ায় উঠিয়া আসিল এবং সেই পুঁটুলিটির উপর বসিল। ছেলেটি এই অবসরে মায়ের হাত ছাড়াইয়া একটু খেলার চেষ্টায় আমাদের দিকে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

এতক্ষণে বৃষ্টি একটু ধরিল,—আর সঙ্গে সঙ্গেই পুতিতুণ্ডি মহাশয়েরা দুই-একজন করিয়া দেখা দিলেন।

পাণ্ডা তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনারা কুথা হতে আইচেন?

—আমরা দুবরাজপুর হতে আসছি,—মানত আছে বাবার কাছে।

॥ ১৫ ॥

বৃষ্টি থামিবার পর, পাণ্ডাদের আগমনে এবং আরও দুই তিন দল যাত্রীর আর্বিভাবে মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রাণময় হইয়া উঠিল। আজ যে ভাবে বাদলা নামিয়া প্রভাতের মূর্তি পরিবর্তিত করিয়া দিল, তাহাতে কেহ ভাবিতে পারে নাই, আজ এখানে অধিক জনসমাগম হইবে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, অন্য দিনের তুলনায় আজ লোকসমাগম অনেক বেশী। অনুকূলানন্দ স্বামী বেশী যাত্রী প্রার্থনা করেন। কারণ প্রাকৃতিক সহজ নিয়মেই, পাণ্ডাদের সুবিধা হইলে তাঁরও আপনা-আপনি অনেকখানি সুবিধা হইয়া যায়। যেহেতু যাত্রীমাত্রেই দেবতার পূজা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবস্থানের আশ্রিত সাধুদেরও লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে আকর্ষণটা দেবতা অপেক্ষা সাধুদের উপর বেশীই দেখা যায়, কারণ তুলনা করিলে মন্দির অভ্যন্তরে ঠাকুর-দেবতা অপেক্ষা বাহিরের সাধুদের বেশী জীবন্ত মনে হয়। তা ছাড়া পুত্রপ্রাপ্তি, স্বামী বশীভূত করা, ননদ বা শাশুড়ীর মুখ বন্ধ করা, জুয়ায় টাকা জেতা, উৎকট ব্যাধি আরোগ্য —এসব বর ত মন্দিরের ঠাকুরের কাছে পাওয়া যায় না,—লোক-কল্যাণের জন্য সাধুরাই এ সকল করিয়া থাকেন। আমাদের অনুকূলানন্দ মহাশয় চা, চরস, তামাক, গাঁজাদির খরচা এবং সময় সময়, দূরদূরান্তর তীর্থ ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ এই ভাবেই করিতেন—এবং বলিতেন ইহাতে কোনও দোষ নাই,—কারণ এরা ইচ্ছা করিয়াই দেয়। না দিলে আমাদের চলিবে কি করিয়া, ভগবান ত আমাদের প্রতিপালনের জন্যই গৃহীদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও একটি ব্যাপার এখানে আছে, সেটি ভৈরবী-সন্ধান। অর্থাৎ কোন তান্ত্রিক সাধুর যদি ভৈরবীর প্রয়োজন থাকে তিনি একবার এই সকল স্থানে অনুসন্ধানে আসেন। তাহা তন্ত্রমতের ভৈরবীদের মধ্য হইতেও পাওয়া

যায়, আবার গৃহস্থ নারী-যাত্রিগণের মধ্যেও পাওয়া যায়। কি রকম তাহা বলিতেছি।

তাঁর মূর্তিটি মন্দ নয় তবে ভৈরবের উপযুক্ত নয়—কৃশ, অনেকটা ক্ষীণ,—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের কাছাকাছি, দুর্বল শরীর, লাল কাপড় পরা, হাতে ত্রিশূল, কপালে সিন্দুরের প্রকাণ্ড এক ফোঁটা, অধিকাংশ-পাকা গোঁফ-দাড়ি। সঙ্গে একটি বোঁচ্‌কাও আছে—তার মধ্যে আসনাদি পূজার নানা উপকরণ আছে ; তিনি আসিয়া একস্থানে আসন করিয়া বসিলেন। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, আপন মনে নিজ কর্মেই ব্যস্ত। দুই-একজন তাঁহার কাছে যাওয়া-আসা করিতেছে, তিনি কিন্তু কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন না। ক্রমে একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যে তাঁহার কথায় বেশী মনোযোগী তাহা বোধ হইল না, কতক্ষণ পর সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল। আজ প্রথমেই নারী সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, লোকটি তাঁহাদের মধ্যেই একজন, চিনিতে পারা গেল। অল্পক্ষণ পরে তিনি আবার আসিয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

এমন সময়ে আমাদের প্রসাদ পাইবার-ঘণ্টা পড়িল, কাজেই উঠিতে হইল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দেরী হইল। আহার শেষে যখন আসিয়া স্বস্থানে বসিলাম তখন প্রায় দুইটা হইবে। দেখিলাম, সেই ভৈরব নিজ আসনে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, তাঁহার ডানদিকে কিছু দূরে নারী পৃথগাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁর সঙ্গে যে দুইটি ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরই একজন সেই ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে ধরিয়া, তার সঙ্গে কত কথা কহিতেছেন। কিছু খাবার তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কেমন, আরও খাবে? তোমায় আরও দেব,—চল, তোমায় ওদিকে নিয়ে যাই,—খাবার দেব, খেলনা দেব ; চল, বড় ভাল ছেলে তুমি।

বলিয়া ছেলেটিকে লইয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় ছেলেটি, মা, ঐ মা, বলিয়া একবার তার মার দিকে দেখাইয়া দিল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, বসিয়া-বসিয়া এই সব লক্ষ্য করা একটা মহাপাতক, আজ আর আমার আসন শান্তিপূর্ণ নয় —আমার প্রাণ আর কিছুতেই সেখানে থাকিতে চাহিল না, উঠিয়া পড়িলাম এবং মন্দির-প্রাঙ্গণ পার হইয়া বাহিরে আসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

অনেকগুলি যাত্রিবাহী গরুর গাড়ী হাজির হইয়াছে। গাড়োয়ানেরা সব খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত—কারণ তাহার পরেই গাড়ী ছাড়িতে হইবে। অনেকে বহুদূর হইতে আসিয়াছে—ফিরিতে রাত্র হইবে। আমি আরও দূরে, গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার মধ্যে সব মিটিয়া গিয়াছে, অনুমান করিয়া আমি ফিরিলাম। আসনে আসিয়া দেখিলাম মন্দির-প্রাঙ্গণ ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। আমি অল্পক্ষণ বসিয়াই নদীতীরে বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া উঠিলাম। বাহিরে আসিয়াই অনুকূলানন্দ স্বামীর ঘরের কাছে দুইজন ভদ্রলোককে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়াই অনুকূলানন্দ বলিলেন, এই যে, শুনছেন এঁদের কথা?

আমায় আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—এক ব্যক্তি বলিলেন, এখানে একটি জোয়ান মেয়্যা মানুষ, সঙ্গে একটি ছেলে, এসেছিল দেখেছেন ?—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : কি ব্যাপার বলুন দেখি ? অপর ভদ্রলোকটি বলিলেন : মশয়, আর বলবই বা কি। আমাদের ঘরের একটি বিধবা মেয়্যা তার ছেলের সাথে এখানে পূজা দিতে আঁইছিলেন, তারই তল্লাসে আমরা আঁইছি।

—সঙ্গে কি তাঁর আপনার জন কেউ ছিল না ?

—না—হাঁ, ছিল বটে, তবে তারা আমাদের কেউ নয়। আমি যেটুকু দেখিয়াছিলাম সমস্তই বলিলাম। শেষে ভৈরবের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত।

—এ্যাঁ,—শেষে ভৈরবের খপ্পরে পড়েছে —যাঃ, তারা কখন বেরিয়েছে, কোন্ দিক দিয়ে গেল মশয়—অ্যাঁ!

বলিলাম : আর আমি ত কিছুই জানি না।

তাঁহারা অতিদ্রুত প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তার দিকে দৌড়াইলেন।

অনুকূলানন্দ বলিলেন : দেখেছেন, কেমন মজা! আর ঢং করে খোঁজা-খুঁজি করা কেন? এ সব ত এখানে আক্চার—ছোঃ।

ব্যাপার এখানে এই পর্য্যন্তই,—তার পর সব চুপ্চাপ।

নদীতীরে গিয়া হাঁপ ছাড়িলাম বটে কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা বেদনার মতই কষ্টকর গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম। ছেলেটিকেই বা তাহারা কোথায় লইয়া গেল ? এমন একটা ব্যাপার এখানে এত সহজেই ঘটিয়া গেল, কেহ কিছুই অনুভব করিল না।

পরদিন সকালে বৈদ্যনাথ তাহার ভৈরবী লইয়া আসিল। মাথায় তাহার ব্যাণ্ডেজ, প্রকাণ্ড একটা জটা জানু পর্য্যন্ত লম্বা। বয়স প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হইবে। কালো-কোলো, মোটা-সোটা গড়ন, বেশ ভাল মানুষটি বোধ হইল। ডান হাতে ত্রিশূল আর তাহার বাঁ হাতে একটি বোঁচ্কা। দেখা হইতেই বৈদ্যনাথ বলিল : ঘা'টা খুব হঁইচে গো,—ভিতরে পোকা হঁই গেছে,—হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হবেক না কি,—দেখুন দেখি ?

আমি বলিলাম : ও এখন আর খুলে কাজ নেই, বাঁধা আছে ভালই আছে। এখানে ওরকম বাঁধা ত হবে না।

—হাঁ, তাই বটে গো,—বলিয়া সে আমার কথায় সায় দিল। তাহাদের ভৈরবী মিহি সুরে বলিল : ভিতরে পোকাটা লড়চে গো, বড়ই বেদনা হঁইচে।

যাহা হউক এখন খোলাখুলি ভাল নয় বলিয়া আমি আমার আসনে আসিলাম। এই যে এক অশান্তি লইয়া বৈদ্যনাথ হাজির হইল তাহাতে সেই অঘোরী বাবার সঙ্গে দেখা শুনার চিন্তা যেন নিবিয়া গেল। কি করিব,—এক সময় একলাই যাইব ভাবিয়া ঠিক করিলাম। মনের মধ্যে যেন একটু সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। উপস্থিত, বৈদ্যনাথের ভৈরবী ঘায়ের যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে,—তাহার প্রতিকার কিরূপে হইবে। কোন উপায় এখানে হইতে পারে কি না তাহার ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যনাথ যাকে দেখিতেছে তাহারই নিকট উপদেশ চাহিতেছে। ঠিক করিয়া কেহ কিছুই বলিতে পারিতেছে না, তবে সকলেই এই এক কথা বলিতেছে যে তাহাকে এখানে আনা ভাল হয় নাই। নিরুপায় হইয়া, কোন দিকেই কাহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি না পাইয়া বৈদ্যনাথ হতাশভাবে বলিয়া বসিল,—যা করেন বাবা বাক্সোমুনি, বাবা বক্কেশ্বর যা করেন, *এইখানেই থাকব গা।*

বলা যত সহজ, বিশ্বাস করিয়া সহ্য করাটা তত নয়। ভৈরবী যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে তখন বৈদ্যনাথ বলে: আবার কি সিউড়ি পানে যাব নাকি, সেই খানকে হাঁসপাতালে গেলেই ভাল হবেক, কি বলিস তুই ?

ভৈরবী বলে: যা করবার কর ক্যানে, আমি ত আর সইতে নারি।

পরদিন প্রাতে যখন আসন ছাড়িয়া বাহির হইলাম তখন দেখি, মন্দিরের পশ্চাতে একটি ভগ্ন অট্টালিকার বারান্দায় ভৈরবী শুইয়া আছে, একখানা মাদুর পাতা, মাথার শিয়রে পুঁটলি। আর বৈদ্যনাথ পাশে বসিয়া আছে,—মাথার ব্যান্‌ডেজ খোলা—মৃদু মৃদু বৈদ্যনাথ দু-একটি কথা কহিতেছে,—বল্‌, বল্‌, কথা বলিস নাই কেনে ?

যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, শুনিলাম তখন ভৈরবী বলিতেছিল: আমি রা কাড়বো নাই। আমায় দেখিয়া বৈদ্যনাথ সুর একটু চড়াইয়া জোর গলায়, ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল: দেখুন ত ঠাকুর মশয়, এত করে বলছি, তুই চল্‌, তোরে রেখে আসি গা—তা বলে রা কাড়বো নাই।

—মাথার বাঁধন খোলা কেন ? খুলে রাখা ভাল নয়,—আমি বলিলাম।

—কাল সারারাত হোতে যন্ত্রণায় মরচে—এখন একটু শুইয়েঁ পড়েছে।

—আপনি একবার দেখুন দেখি, বলিয়া ভৈরবী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। আমি কি দেখিব,—বুঝিই বা কি—মহা মুস্কিল!

মাথাটি আমার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া সে বলিল : দেখুন ত পোকাটোকা দেখা যায় কি না, ভিতরে যেন কিল্-বিল্ করে গো।

বেশ লক্ষ্য করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বুকটা ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিল। একটা লম্বা, গভীর প্রায় তিন ইঞ্চি, কাটা মুখটা কতকটা ফাঁক, তার মধ্যে একটা সাদা পোকা, প্রায় এক পর্ব লম্বা, কিল্-বিল্ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটা সন্না হইলে উহা টানিয়া বাহির করা যাইত, কিন্তু এখানে কোথায় সন্না পাওয়া যাইবে। যেই সে জীবটি ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তখন ভৈরবী—ঐগো, ঐগো, আমায় সারারাত ধরে খাঁইচে, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল : ওটাকে বার করে, দেন, ঠাকুর মশয়। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হঁইচে যে গো!

নিরুপায় হইয়া আমি বৈদ্যনাথকে বলিলাম : তুমি এঁকে সিউড়ির হাঁসপাতালে নিয়ে যাও। ডাক্তার দেখেই ব্যবস্থা করবে। এখানে থাকলে খারাপ হয়ে যাবে, ভিতরে পোকা হয়েছে যখন,—এর ব্যবস্থা করা দরকার।

তাই যাবোগা, বলিয়া বৈদ্যনাথ দাঁত মুখ খিচাইয়া ভৈরবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : তুই মরিস নাই কেনে, মরে যানা তুই, আমায় জ্বালাইতে আইচিস। হয় তু মর, নয় আমি মরি! ভাল আপদ হঁইচে।

ভৈরবীর আর সহ্য হইল না, আর চুপ করিয়া থাকিতেও পারিল না,—মনের ক্ষোভে এবং রাগে উত্তেজিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল : তুইই ত আমার এ দশা করলি,—তোর লাজ লাগে না, আবার রা কাড়িস্, ঐ মুখ নিয়ে গাল পাড়িস, তু রাক্ষস, আমায় পোড়ায়েঁ খাঁইচিস, খেঁয়ে দে আমায় তু।—মলে ত বাঁচতাম, একেবারে মেরে ফেল্ চুলায় দিঁয়ে নিশ্চিন্দ হঁগা যা।

বৈদ্যনাথের মুখে আর রা নাই,—মুখ শুখাইয়া গেল—গলার আওয়াজ তখন খাটো করিয়া বলিল : চল্, তোকে এখুনি দিঁয়ে আসবো গা,—

আমি বলিলাম : সেই ভালো; যাও তুমি, একটা গাড়ি দেখে নিয়ে এস—

ভৈরবী বলিল : আর গাড়ি কেনে বাবু—আমি হেঁটেই যাব গা, গাড়ি ভাড়া ও আবার কোথাকে পাবেক, এইটুকু ত পথ, আমি পায় পায় চলে যাব। আলগা করিয়া ব্যাণ্ডেজের কাপড়টা মাথায় জড়াইয়া দিলাম,—বোঁচ্কাটি বৈদ্যনাথ একহাতে লইল, আর একহাতে তাহার হাত ধরিয়া চলিল। কাল রাত হইতে কিছুই খায় নাই—এই ক্ষীণ শরীর লইয়া কেমন করিয়া আড়াই তিন ক্রোশ পথ যাইবে। একটা ছাতাও নাই। রৌদ্র অবশ্য তত ছিল না। মেঘলা আকাশে মাঝে মাঝে দেবতার আবির্ভাব, তাও অল্পক্ষণের জন্য। কিন্তু যদি বেশীক্ষণ রৌদ্র হয় তাহা হইলে চলা অসম্ভব হইবে। তখন কোথাও আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

উহারা চলিয়া গেলে আমি একবার পাপহরার তীরে শ্মশানের দিকে গেলাম,—মনটা খারাপ, আকাশের মতই মেঘাচ্ছন্ন। চক্ষের সম্মুখে এই সব বিসদৃশ ব্যাপার, আমি ত দেখিতে চাই না—কিন্তু দেখিতেও হইবে, অল্প-বিস্তর দুঃখ ও তাপ তাহার সঙ্গে মনের ভিতর আসিয়া লাগিবে। প্রতিবিধানের হাত নাই, সেইজন্য মন আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আমার 'অহম্' নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবে না। নিজের মধ্যে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেই হইবে। ঘরে

অশান্তি ছাড়িয়া এখানে এসব আবার কিসের দুর্ভোগ?—যেখানেই যাও না কেন এসব ত সঙ্গেই থাকে। ভিতরে থাকে বলিয়াই বাহিরে দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে হয়। এসব বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়। এই বুঝা না বুঝার একই ত ফল দেখিতেছি।

ওপারে দেখি সেই অঘোরী বাবা—একটা গাছের তলায় বসিয়া আছেন। যাই একবার, দেখি কি ভাব—ভয়ের লেশমাত্র মনে আসিল না। এখন একলাই আছেন। এই অবস্থায়ই যাওয়া ভাল। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

আমার দিকে একবার চাহিয়া আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কোন কথা বলিলেন না। আমারও প্রথমে কোনও কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। বসিয়া তাঁহার মূর্তিটি দেখিতে লাগিলাম।

স্থূল দীর্ঘ শরীর, শ্যামবর্ণ, মাথার চুল খুব ছোট ছোট, উদরে মেদের পরিমাণ কম নয়। তাহার উপর উলঙ্গ,—বিশাল চক্ষে নিম্ন দৃষ্টি, স্থির অচঞ্চল শরীর। যেন পর্বত একটি, গম্ভীর প্রকৃতির উদার বক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—কত কাল তাহার ঠিক নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়াই দেখিলাম। তিনি একবার একটু নাড়লেন, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন: এখানে কি মনে করে?

মুখে আমার কথা যোগাইল না, কি বলিব হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। কতক্ষণ পর উত্তর একটা মনে আসিল বটে কিন্তু এতক্ষণ পরে বলাটা শোভনীয় মনে হইল না তাই চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি কিন্তু আর চুপ করিলেন না, মুখ খুলিলেন: তোর কি চাই এখানে—শালা—তোরা ত বামনা, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর পা পুজো করবি, বছর বছর একটা করে জন্ম দিবি,—কোম্পানীর জুতো খাবি, মেগের কাছে এসে তম্বি করবি—থাকবি! এখানে কি রে শালা। বল্, এখানে তোর কি দরকার?—

তাঁহার এ প্রকার ক্রোধ বা কোপের ভাষায় আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। মনে হইল বৈদ্যনাথ যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক,—উনি কি রাগ করেন, ওঁর রাগ নাই। বাস্তবিকই তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ক্রোধের লেশ নাই, অথচ মুখের কথাটায় যেন কত না ক্রোধ এবং বিদ্বেষের রং লাগানো। যেন আগুনের আকার, অপূর্ব এই চরিত্র!

প্রাণের মধ্যে আমার এক অপূর্ব আনন্দের রোল উঠিল। যেন এক পাত্র অমৃতধারা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর ঢালিয়া দিল এবং উহার স্পর্শমাত্রেই এক ঘন শীতল প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গেল—আমি কতক্ষণ আপনার মধ্যে আপনি মাত্র রহিলাম, বাহিরের সঙ্গে কোনও যোগ রহিল না।

॥ ১৬ ॥

আশ্চর্য্য এই সাধুর ভাবটি। মুখে দুর্বাক্যের স্রোত চলিতেছে,—কেহ কাছে দাঁড়াইয়া শুনিলে ভাবিবে যে তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা,—ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের বশেই একজনের প্রতি তাঁহার এই অশ্রাব্য কটু সম্ভাষণ অনর্গল বাহির হইতেছে,—কিন্তু তাঁহার এই বাক্যবাণ যাহার উপর আসিয়া লাগিতেছে তাহার প্রাণের মধ্যে পরম প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন ভাবেরই উদ্দীপনা হইতেছে না।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম সেদিন বৈদ্যনাথ ইঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিল, অর্থাৎ ওঁর কি রাগ আছে ? উনি যে সিদ্ধ পুরুষ।—ইহা যে কেমন সত্য তাহা আজ এখন প্রত্যক্ষই অনুভব করিলাম। এ কি অদ্ভুত ভাবসন্ধি,—দুর্বাক্যের মধ্য দিয়া তিনি আমার প্রাণের মধ্যে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন। যেন আমার কত কালের, কত প্রিয়তম বন্ধু,—আপনার জন, কে ইনি ? যিনি এই প্রথম সম্ভাষণেই আমাকে একেবারে তাঁহার প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তার পর সেদিনের কথা আরও কিছু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কতকটা বলিব।

—ওরে শালা,—বল্ না, কি কত্তে এখানে এলি ? শালা, তুমি সাধু ঘাঁটতে এসেছ,—আমার সঙ্গে মাংটামো,—হারামজাদা, তোর সর্বনাশ হবে যে রে,—বল্ শালা বল্ ?—কি মনে করে এলি তুই বল্ ?—

এক একটি অপ্রীতিকর বাক্যের মধ্যে মহাপ্রীতির উৎস অনুভব করিতেছিলাম। যখন তিনি থামিলেন আমি আনন্দের নেশায় টলমল, আমার গা দুলিতে লাগিল। কি অদ্ভুত অবস্থা, একবার সম্মুখে একবার পিছনে দুলিতে দুলিতে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি কি যে বলিলাম তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম না,—কিন্তু তিনি তাহার পর যাহা বলিলেন তাহা আমার মনে আছে।

অঘোরী : আচ্ছা তুই আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে। এত ধর্মের—এত ব্যাপার থাকতে তুই তন্ত্রের কথা শোনবার জন্য, তন্ত্রমন্ত্রের সাধনপ্রণালী জানবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছিস কেন ?

আমি : লোকে তন্ত্রকে যতটা হেয় মনে করে, ঘৃণ্য মনে করে, আমার ধারণা, আর নিশ্চিত ধারণা, তন্ত্র তা নয়। এর মধ্যে মহৎ কিছু আছে আর নিশ্চয়ই আছে, যা আমায় জানতেই হবে। না জানতে পারলে যেন আমার মুক্তি নেই। এইই আমার ভিতরের কথা।

—তোর ধারণা যেটা সেটা তোর অনুমান ত ?

—হয় ত তাই কিন্তু সে অনুমান গভীর সত্যকে ভিত্তি করেই আমার বিশ্বাস।

—ও বিশ্বাসও একেবারেই ফাঁকা।

আমি বলিলাম : কেন ?

—তোর সত্য যে গভীর সেটাও ত তোর অনুমান। এখন অনুসন্ধান করতে গিয়ে, তোর মতে যেটা ভাল নয় এমন কিছু যদি দেখতে পাস তাহলে ত সেটা মানতে পারবি না বা বিশ্বাস করবি না—কেমন নয় কি ?

—তাহলে কি সত্য সত্য এমন কিছু আছে নাকি এই তন্ত্রসাধনের মধ্যে ?

—সেকথা ত নয়, এখানকার কথা এই যে, তুই এমনই একটা তন্ত্রধর্ম খুঁজিচস্ যার সঙ্গে তোর মনোগত ধারণার সম্পূর্ণ মিল আছে।

—তন্ত্রধর্ম সম্বন্ধে এতাবৎকালে যা শুনেছি ও পড়েছি তাতে মোটামুটি একটা ভাব ত ভিতরে গড়ে উঠেছে বটেই—আর তাই ত স্বাভাবিক ; আর সেটা যে আমার সংস্কারগত ভাব থেকেই উৎপন্ন তাও ত স্বাভাবিক।

—সবই স্বাভাবিক তা ত সকলেই মানে,—এখন তোর কথা তাহলে এই তো দাঁড়াচ্চে—তোর আদর্শ ধর্মমত যা তুই তন্ত্রধর্মের মধ্যেই পেতে বা সফল করতে চাইচিস ?—নয় কি ?

এর পর আর না বুঝিয়া থাকিবার যো নাই। যা সরল সত্য তা এই যে, আমার ধর্মাদর্শকে তন্ত্রোক্ত সাধনের মধ্য দিয়া সার্থক করিতে চাই, আর সেই জন্যই আমি তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গে অভিলাষী হইয়াছি। এমনি শুধু কৌতূহল-বশে যে জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা নয়, তার সঙ্গে আরও যে খানিক গুহ্য কারণ ছিল তাহা আজ এই কথোপকথন সূত্রে পরিষ্কার হইয়া গেল।

তখন আবার একটা প্রশ্ন হইল, তন্ত্রধর্মের উপর আমার এই যে সহজ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ—এর মূল কোথায়? আমরা শাক্ত বংশের সন্তান, আমাদের পিতৃপুরুষের এই ধর্মসম্বন্ধে অনেক সাধনলব্ধ জ্ঞান বা সিদ্ধির মহিমা সংস্কার-গত হইয়া আছে—আমাদের মত বংশধরগণের মধ্যে সময় ও সুযোগ-মত চিত্তক্ষেত্রে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং অনুসন্ধানে ব্রতী করায়। আমাদের রক্তের মধ্যে এই শক্তিমার্গের সাধনা বা উপাসনার বীজ বর্তমান রহিয়াছে।

এই কথায় আরও জানা গেল যে, একই সাধনের ধারা আন্তরিক ও ব্যবহারিক ভাবে বংশানুক্রমে চলে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশধরেরা অন্তরে অন্তরে দেশ কালোপযোগী বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়া লন তাঁহাদের বিশিষ্ট মনোধর্মের প্রেরণায়। ধর্ম যেমনই হউক না কেন, একটা বংশের মধ্যে তার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া গেলে তার ধারা বন্ধ হইয়া যায়,—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশের ধারাও লুপ্ত হয়। এই ভাবে সৃষ্টিতে বংশ-বৃক্ষের বীজ হইতে বিশাল মহীরুহে পরিণতি, শেষে কালের হাতে তাহা নিঃশেষে লোপ পাইয়া যায়।

—তন্ত্রমতের সাধনা দেখতে এয়েছ শালা,—জোচ্চোর। যে মতের উপর তোর শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিক টান নেই তার সাধনপ্রণালী দেখবার তোর কি অধিকার রে শালা চোর। তোকে কে তা দেখাবে?—অ্যাঁ,—বল্ শালা, সাধন প্রণালী, পদ্ধতি, প্রকরণ, দেখে তোর কি ফল হবে?

তাও ত বটে, প্রকরণ, প্রণালী বা সাধনপদ্ধতি দেখিয়াই বা আমার কি লাভ?—তার সিদ্ধির ফল যা, তার সঙ্গে ত আমার সিদ্ধির কোন ভেদ নাই, সেই অদ্বয় চৈতন্যে, নিত্যানন্দ ভাবে স্থিতি, আত্মায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি—নাই বা দেখিতে পাইলাম তন্ত্রমতের সাধনপদ্ধতি।

এই ভাবের কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল। তিনি আবার আরম্ভ করিলেন,—এই শালা, অমাবস্যার রাতে একলা শ্মশানেতে মড়ার বুকের ওপর বসে জপ করতে পারবি? তুই মদ খেতে পারবি, বল্ শালা,—মাছ মাংস তৃপ্তি করে খেতে পারবি,—সেঁটে খেয়ে দেয়ে, কোমরে জোর করে ন্যাংটো হয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গে লাগতে পারবি? তার পর উঠে নির্বিকার চিত্তে চন্দ্রামৃত পান করতে পারবি? শালা, তুমি তন্ত্রের সাধন দেখতে এসেছ শালা,—যোনিকীট!

বৈদ্যনাথের কাছে শুনিয়াছিলাম উনি অঘোরী,—তান্ত্রিক সাধনের কথা উনি জানিলেন কি করিয়া। অবশ্য জানা আশ্চর্য নয়—তন্ত্রের ব্যাপারে পূর্ণ সম্যক জ্ঞান ইঁহার যখন আছে—তখন আর ভাবনা কি?—মনে বড়ই আনন্দ পাইলাম—পর পর তিনি নিজ গুণে সকল কৌতূহল মিটাইয়া দিলেন। সে অবশ্য শেষের দিকে।

আমরা কি সকল ব্যাপার জানিবার অধিকারী? ভাবিয়া দেখিলে একথা বেশ বুঝিতে পারি, আগু বাড়িয়া আমরা অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাই, জিজ্ঞাসু হই, আবার তাই লইয়া বিজ্ঞের মত পাঁচ জনের সঙ্গে অনেক

তর্ক বিতর্ক ও মতামত প্রকাশও করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এ কথাটা প্রায়ই মনে আসে না, যে-বিষয়টি লইয়া আমি এতটা শব্দ করিতেছি, সেটির আলোচনায় কিম্বা সেই তত্ত্ব উপলব্ধিতে আমার কতটা অধিকার। আমি কতটা প্রস্তুত হইয়া এই গভীর তত্ত্ববিষয় দর্শনে অগ্রসর হইয়াছি।

আমাদের জীবনে সাধন, অর্থাৎ আমাদের জীবনে জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত যাহা কিছুই করিতেছি তাহাই ত সাধন। এ সংসারে স্থূল কর্মজীবনের সবটাতেই আমার প্রয়োজন, যেমন, চৈতন্য মার্গে মনঃশক্তির সহায়ে সহজ নিবৃত্তির পথ এবং অধ্যাত্ম জীবনের প্রয়োজন। এই দুইটিই যতক্ষণ আমার পূর্ণ একটি জীবনে বোধ না হইতেছে ততক্ষণ আমি কোন গভীর তত্ত্বে অধ্যাস লাগাইতে অনধিকারী। লাগাইলেই বা কি হয়? চীৎকার করিয়া ডাকিলেই কি সাড়া পাওয়া যায়? এখানে গলার জোরে কিছু হইবার নয়। বরং আওয়াজ খাটো করিয়া লক্ষ্য স্থির করিলে অনেক বেশি কাজ হয়। কত ভাগ্য-ফলে মানুষের স্বর নম্র হয়। বিজ্ঞান বা দর্শনের অভিমান-বিষে জর্জরিত মন একটা বিশাল আয়তন সত্তার আভাষ না পাইলে কি সহজে শান্ত হয়? আমি দেখিতেছি মহাশক্তিমান একজন পুরুষের কাছে বসিলে আমাদের মত একজন শান্ত হইয়া নিজ অক্ষমতায় সচেতন হইতে পারে। সাধুসঙ্গের ফলে আর কিছু যদি নাও হয় এটুকুও পরম লাভ।

এখন এই মহান্ শক্তিধর মানুষটির মুখে পর পর যে কয়েকটি কথা শুনিলাম তাহাতেই আমার মনের বক্র গতি সোজা হইয়া গেল।

—ওরে শালা বল্ ত, তোর বিদ্যে কতটুকু,—কটা পাশ করেচিস, কত বই পড়েছিস?—

আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম: আমার বিদ্যা কিছুই নেই—যেটুকু পড়েছি তা পরিচয় দেবার মত কিছুই নয়, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে—

—ওরে, এ শালার আবার মৌখিক বিনয়ও আছে—এ্যাঁঃ—বল্ দিকি ও সব ঢং ছেড়ে দিয়ে—তোর মনে এখনও পড়াশুনোর গোমোর আছে কি না? —সত্যি বল্‌বি রে শালা, খবরদার,—হাঁ।

আমি দেখিলাম যে তিনি আমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখিতেছেন,—বলিলাম: দেখুন, কখনও কখনও আমার একটু অভিমান আসে বটে কিন্তু তাকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিই নি। ছেলেবেলা থেকে দর্শন শাস্ত্র, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় যে যোগ-সাধন, সে সম্বন্ধে কৌতূহল আর পড়াশুনা বা আলোচনা করবার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল ছিল, আর তাইতেই এ পথে কিছু কিছু জ্ঞানের আভাষ যেন পেয়েছি মনেও হয় বটে কিন্তু আমার চিত্ত এখনও রাগদ্বেষ মুক্ত হয় নি,—আকাঙ্ক্ষা লোভ লালসা এ সব ঠিক আগেকার মতই আছে, আর এমন অবস্থা আমার ত হয়নি যাতে মনে হয় যে আমার সব পাওয়া হয়েছে কিম্বা স্থায়ী ভাবে আমার কর্মশক্তি চৈতন্যমুখী হয়ে অবিচ্ছেদে সেই দিকেই যাচ্চে,—কাজেই এমন অবস্থায় আমি যে মহা উদ্বিগ্নচিত্ত—এই অনুভবটাই বেশী হয়,—তাহলে কেমন করে আমি অহংকার মনে মনে পোষণ করতে পারি।

—ওরে শালা বেদো, এ যে বেশ আসল দোষের কথাগুলো সামলে বললি --সাধারণ লোকের চেয়ে তোর ধর্মোজ্ঞান বেশী আছে, এ কথাটি যে চাপা দিয়ে গেলি রে শালা। আমার কাছে লুকোনো?—অ্যাঁ।

—সে কথাও পূর্বে আমার বেশী বেশী মনে হতো বটে, এখনও হঠাৎ পূর্ব-অভ্যাসের ফলে কখনও কখনও হয়ত মনে এল, তবে আমি ও ভাবকেও কেটে দিই। এখন আমার বোধ হয় ও কথা আর বেশী মনে আসে না বা দাগ পড়তে পায় না।

—কেন ?—কি তোর কাটান মন্তোর বল্ ত দেখি ?—

—সেটা এই, এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে জীব মূলে স্বভাবে এক হলেও ব্যবহারে সকলকার জীবনের উদ্দেশ্য সমান নয়। প্রত্যেকের কর্ম ও ধর্মজীবন আলাদা, বিদ্বান, পণ্ডিত, মূর্খ, চাষা-ভুষা, উঁচু-নীচু সমাজে যত জীব, সবাই পৃথকভাগে জগৎ দেখছে, বিষয় ভোগ করছে। কাজেই এখানে এ অহংকারের স্থান নেই যে আমি ওর চেয়ে বেশী জানি বা আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন: তবু একটু আছে কিনা, ওরি মধ্যে সামান্য রকমের একটু,—অবিশ্যি অত বড় করে দেখা না দিক্ ; বল্ শালা ঠিক করে—ওরি মধ্যে একটু আছে কি না—

আমি বলিলাম: হাঁ বোধ হচ্চে যেন আছে। ঠিক বলেছেন আপনি—ওটা যেন—

তিনি চিৎকার করিয়াই বলিলেন: ঐটুকু এককালে প্রকাণ্ড হবে রে শালা, বিষের ছোবল মারবে—এখন তোলা রইল।

তার পর আবার বলিলেন: তোর গুরুগিরি করবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে কি না টের পেয়েছিস ? ঠিক বলবি,—বল্ শালা, কেমন ধরেছি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বিকট হাসিয়া আমার চক্ষের উপর তাঁর সেই তীব্র দৃষ্টির একটি আঘাত করিলেন। উহা আমার অন্তরে লাগিয়া আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলিল। বলিলাম:

অন্তরে, আবার দেখুন, আমার এ বিশ্বাসও আছে যে ইচ্ছা করলেই গুরু হওয়া যায় না। মানুষ সমাজেও অর্থকরী বৃত্তিতে যেমন অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, বেশ্যার কাজে সকলেই যথেষ্ট পারদর্শী হতে পারে না, তেমনি অধ্যাত্ম ধর্মে যে কেউ ইচ্ছা করলেই গুরু হতে পারেন না। পরমহংস দেবের উপদেশে এটুকু খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। ভগবানের অভিপ্রায় এর মধ্যে যদি থাকে তবেই সিদ্ধকাম হয়ে মানুষে গুরু হতে পারে। এ ছাড়া আমার আরও একটি বিশেষ ধারণা সম্প্রতি হয়েছে যে—অধ্যাত্ম পথে গুরু এক, সেই তিনি ছাড়া আর কেউ গুরু নেই, হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

তিনি বলিলেন: শালা আবার শাস্তোরের ঢেঁকুর তুলেছিস ?—বল্ শালা ঠিক করে,—ওরি মধ্যে, তাঁর শুভ ইচ্ছা কল্পনা করে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে দরকার হয়, তিনি যদি তেমনি বিধান করেন এই বলে, একটু গুরুগিরির ইচ্ছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত, বল্ শালা ঠিক করে—এমনি একটু ইচ্ছে, সরু শিকড়ের মত ভিতরে জেগে আছে কি না।

বলিলাম: সত্য—এটুকুও আছে যেন বোধ হচ্চে এখন। সর্বনাশ,—আমি কিন্তু এটা চাই না।

শুনিয়া তিনি এমন আকাশ-ফাটা হাসি আরম্ভ করিলেন বোধ হয় পাপহরার ওপার হইতে স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল, আমি কিন্তু উঠিতে চাহিতেছি না দেখিয়া তিনি বলিলেন,—কই উঠলি না যে।

আমি বলিলাম: খাওয়ার ইচ্ছা নেই, ক্ষুধাও নেই, তৃষ্ণাও নেই, সব যেন ভরে রয়েছে।

তিনি: যা যা শালা—নিয়মরক্ষে করতে হবে না,—তোর জন্যে যে সকলে বসে আছে?

কাজেই আমি উঠিলাম।

আহারের পর পাপহরার তীরে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন প্রায় আড়াই প্রহর বেলা। অঘোরী আর সেখানে নাই,—তবে শ্মশানের কিছু দূরে এক ভৈরব ও ভৈরবী সামনাসামনি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে দেখিলাম। দুজনেই জোয়ান। অঘোরীর সঙ্গে এদের কি কিছু সম্বন্ধ আছে?

আমার ইচ্ছা হইতেছিল একবার ওদিকে যাই, দেখি তিনি কোথায়, কিন্তু এই যুগল মূর্তি দেখিয়া আর যাইতে পা উঠিল না।

আমি অন্যদিকে যাইতেছিলাম। পুণ্ডরীক, কালীবাড়ির ম্যানেজার, তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন,—চলুন, আজ আপনার আসনে গিয়া কথাবার্তা কওয়া যাক্।

আহারের পর আমি নিকটেই এখান-সেখান করিয়া বেড়াইতাম। বলিলাম: চলুন একটু ঘোরা যাক্।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুণ্ডরীক চলিলেন। আমি যাইবার সময় সেই নবাগত ভৈরব দম্পতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এঁদের জানেন, অঘোরীর সঙ্গে এঁদের কিছু সম্বন্ধ আছে কি? অনুমান করিয়াছিলাম হয়ত চেলা হইবে। কিন্তু পুণ্ডরীকের মুখে শুনিলাম তা নয়,—এখানে এঁরা এই প্রথম এসেছেন। এখন আমরা দেখিলাম, আমাদের পিছনে পিছনে তাঁরা দুজন আসিতেছেন।

দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ দাঁড়াইয়া গেল। আমিও দাঁড়াইলাম।

তাঁহারা একজন আগে একজন পিছে, আসিয়া পুণ্ডরীকের সম্মুখে পেঁাছিলেন। ভৈরব প্রথমে কথা বলিলেন: আমরা কামরূপ থেকেই আসছি, এখানে কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা।

শুনিয়া পুণ্ডরীক যেন বিশেষ চিন্তিত হইয়াই বলিলেন: আমরা কালী-বাড়ির লোক, বক্রেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আপনি

মন্দিরে গিয়ে, দেখেশুনে একটি স্থান ঠিক করে নিয়ে থাকতে পারেন—এখানে সাধুসন্ত যাঁরা আসেন তাঁরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিয়ে থাকেন, কারো অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। বলিয়া পুণ্ডরীক ঠাকুরবাড়ির দিকে দেখাইয়া

দিলেন। তাঁহারাও সেই দিকে চলিলেন। তখন পুণ্ডরীক ভৈরবকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনাকে কি বলে আমরা ডাকব ?

তিনি বলিলেন :—আমার নাম সিদ্ধ করালী। বলিয়া তিনি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমরাও রাস্তার বাঁকের দিকে চলিলাম।

বাঁক ফিরিয়াই এখানে একটি সুন্দর দৃশ্য চক্ষে পড়ে। একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ এবং বট গাছ, একসঙ্গে দুইটি। তাহার তলে ক্ষুদ্র একটি মন্দির। এত ছোট যে তাহার মধ্যে মানুষ বা কোন জীবজন্তু ঢুকিতে পারিবে না। কোন বড় মন্দির গঠন করিবার পূর্বে,—প্রাচীন কালে এই ধরণের ছোট একটি মন্দিরের ছাঁচ মিস্ত্রিরা আগে গাড়িয়া লইত। পরে ইহা বড় মন্দির গাড়িতে সাহায্য করিত। বড় মন্দির গড়া হইয়া গেলেও ছোটটি আদর্শরূপে থাকিয়া যাইত। এ রকম অনেক স্থানেই আছে ; আর, ইহার সঙ্গে অনেক কিছুরই সৌসাদৃশ্য আছে। বড় একটা কিছু গড়িবার পূর্বে ছোট মনোমত একটি আদর্শ গড়া এ প্রদেশের প্রাচীন রীতি।

এই বক্রেশ্বর পীঠে এমন কোনও মহান শিল্প বা স্থাপত্যের চিহ্ন এখন নাই যাহা হইতে আমারা বুঝিতে পারি যে এ স্থান শিল্প-গৌরবে কোন সময় সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শ্যাওলা-ধরা পুরাতন ক্ষুদ্র আদর্শটি দেখিয়া কত কথাই না মনে আসিতেছিল।

কতকগুলি ডোমের মেয়ে গান গাহিতে গহিতে চলিয়াছে, নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া, সঙ্গে ছোট-বড় কয়েকটি ছেলেও আছে। গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইতেছে, মনের আনন্দে বেড়াইতেছে আর গান করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে আর তাহার ভাষা লক্ষ্য করিলে, সভ্যতা অভিমানী কাহাকেও দ্বিতীয়বার শুনিতে হইবে না। তাহাদের মনের মধ্যে আনন্দ—একটি অপূর্ব বন্য রাগিণীর সঙ্গে এই অশ্রাব্য শব্দগুলি মিলিত হইয়া তাহাদের কণ্ঠ হইতে যেন অমৃত ঝরিতেছে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সে গান প্রাণকে আকর্ষণ করে। কি করুণ সুর ! যে ভাষার মধ্যে প্রিয়কে যথেচ্ছাচারী, লম্পট এবং অক্ষম বলিয়া অনুযোগ করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির ব্যবহার-দোষে নারী স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, তাহার বর্ণনা যে গানে করা হইয়াছে, তাহার ভাষা নাই-বা লইলাম !

॥ ১৭ ॥

অপেক্ষা করা কষ্টকর, বিশেষত আমার মত যারা চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ তাদের পক্ষে। এই যে অঘোরীর কাছে একটু আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি, আবার কতক্ষণে দেখা হইবে এখন তাই চিন্তা। লোভ লাগিয়াছে। যেন তাঁর কাছে আমার গুপ্ত রত্নাগারের চাবি আছে, তিনি খুলিয়া দিলেই আমার সর্বার্থ-সিদ্ধি হইবে।

সন্ধানে আছি আবার কতক্ষণে দেখা হইবে। বাহিরে একবার আসিলেই হয়, গিয়া ধরিব। যে দু'জন ভৈরব-ভৈরবীকে দুপুরবেলা দেখিলাম তাহারা এখন দেখি তাঁহার কুটীরের দিকে আনাগোনা লাগাইয়াছে। দেখিলাম, ইহারা থাকিতে ত আমার সুবিধা হইবে না, আমি চাই তাঁকে নিরালায় একলা ভোগ করিতে। চলিয়া গেলাম নদীতীরে—অনেক দূর। যখন আর ইহারা থাকিবে

না তখন যাইয়া ধরিব। রাত্রেই খুব সম্ভব দেখা হইবে, তখন ত আর কেহ থাকিবে না, বেশ হইবে।

রাত্র এক প্রহরের মধ্যেই এখানকার সব নিশুতি, আর কেহ জাগিয়া থাকে না। বিশেষত এ জায়গাটা গাঁয়ের বাইরে। কেহ বড় একটা এদিকে ত আসে না, কেবল শবদাহ করিতে যাহারা আসে তাহারাই এদিকে রাত্রে থাকে। এখানকার নিস্তব্ধতা ভয়ংকর,—একটি উপভোগের বস্তু। কালো আকাশে অগুন্তি তারা জ্বলিতেছে—আর সে গাঢ় কালিমার ছায়ায় যেন পৃথিবী ছাইয়াছে। দূরে দূরে গাছগুলি ঘোর কালো, তার পর আকাশের ছবি। এই সময় একবার অঘোরীবাবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। কবিতার ভাষায় যেন অভিসারে চলিয়াছি—সাপখোপের ভয় এখানে খুব আছে কিন্তু আমার তা বড় একটা মনে আসে না। মেয়েলি কথা একটা শুনিয়াছিলাম ছেলেবেলায়—সাপের লেখা, আর বাঘের দেখা। যে বয়সে, যে রকম মনের অবস্থায় এটা শুনিয়াছিলাম—তাহাতে উহার সার সত্যটি সেই যে একেবারে অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া বসিল আর টলিল না। এখনও বিশ্বাস স্থির আছে যে মৃত্যুটা যদি সাপের কামড়েই হইবে এরূপ লেখা থাকে তাহা হইলে আর কোন রকমেই তা এড়ানো যাইবে না, আর যদি ভাগ্যক্রমে বাঘের সঙ্গে এই নিরস্ত্র-জাতির কাহারও চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে তবেই বুঝিতে হইবে ভবযন্ত্রণার হাত এড়াইবার সময় আসিয়া উপস্থিত। সুতরাং বিনা প্রতিবাদেই সম্মোহিত হইয়া অস্তিত্বলোপের সুযোগটি তাহাকে দেওয়াই ভাল।

পাপহরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, ওপারে শ্মশানে একটা চুলি জ্বলিতেছে। যে আলো হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় সৎকারের মধ্য অবস্থা, বেশ জোর আলো—তবে উচ্চশিখা নাই—চারিদিক হইতেই ছোট ছোট অনেকগুলি শিখা উঠিতেছে, জোর বাতাসে যেন এক একবার নিবিয়া যাইবার মত হইতেছে। দেখা গেল, চুলিটার একটু দূরে দুটি লোক। একটি উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরটি লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া। আর চুলির শিয়রে দাঁড়াইয়া অঘোরী—এক হাতে লাঠি, অপর হাতে চিমটা। আর কাহাকেও দেখা গেল না। ভাবিয়া লইলাম যে আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভবনা খুবই অল্প। অবশ্য দাহ করিতে শ্মশানে দুইটিমাত্র লোক আসে নাই। আরও অনেকেই আছে, তাহারা হয়ত কাছেই কোথাও আড্ডা করিয়াছে।

এখানে প্রায়ই অনেক দূর গ্রাম হইতে শব লইয়া সৎকার করিতে আসে। যাহারা আসে তাহারা এই সৎকারের সঙ্গে নিজেদেরও বেশ একটু কারণানন্দ দিয়া সৎকার করে। তাহাতে শোক-মোহের আঁচটিও তাহাদের গায়ে লাগিতে পায় না। এ অঞ্চলের সৎকার এই প্রকারই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে আমি কি করিব তাহাই কতক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। ফিরিয়া যাইব, না একবার দেখিব ভাবিতেছি—। বোমা-ফাটার মত একটা আওয়াজ হইল, শবের মাথাটি ফাটিল। এমন সময় দেখিলাম উলঙ্গ অঘোরী তাঁহার পার্শ্বে যে একটি নরকপাল পাত্র পড়িয়াছিল—ক্ষিপ্রহস্তে উহা চিমটা দ্বারা উঠাইয়া লইলেন এবং শবের মাথা হইতে যে গলিত তরল মস্তিষ্ক পড়িতে লাগিল—সেইখানে ধরিলেন। প্রায় আধ-পাত্র পূর্ণ হইল। তিনি হাতটি টানিয়া লইলেন, তার পর কুটীরের দিকে চলিলেন। আমি তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ওপারে

গিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন : এই শালা, তুই রাত দুপুরে এখানে কি করতে এলি ?—অ্যাঁ!

আমি বলিলাম : দিনমানে দেখা পাওয়া ত সহজ নয়, খুঁজতে হয়

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া তাঁর কুটীরের দিকেই চলিলেন, আমিও না দাঁড়াইয়া তাঁহার পিছু লইলাম। তিনি কুটীরে ঢুকিলেন, আমিও ঢুকিলাম।

ভিতরে আলো—একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাশেই একটা বড় মান-পাতায় ভাত বাড়া আছে, ধোঁয়া উঠিতেছে। হাঁড়িটিও পাশে রাখা আছে।

তিনি কপালপাত্রটি ভাতের কাছেই রাখিলেন। তার পর আমায় বলিলেন: তুই কি আমার খাওয়া দেখতে এলি নাকি—তিনদিন পরে আজ অন্ন ভোগ।

আমি বলিলাম: আজ আমি তাহলে আসি,—আহারের পর ত আপনি বিশ্রাম করবেন?

তিনি বলিলেন: এখানে বিশ্রামের কি দেখলি রে শালা,—তোদের মত আমরা খেয়ে উঠে মাগ নিয়ে শুয়ে পড়ি না রে শালা,—দেখ্ না, এসেছিস্ ত বসে দেখ্, খাওয়ার পর কি রকম বিশ্রাম। বোস্ ঐখানে, বোস্।

মাটির মেঝে একটি ময়লা মাদুর পাট করা পাতা আছে—তাহতেই আমি বসিলাম। এমন সময় দুইজন লোক দরজায় উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বাবা, কারণ এসেছে, এইখানেই সেবা হবে কি? তিনি বলিলেন: নিয়ে আয় এদিকে।

একটা মাঝারি গোছের কলসী আনিয়া তাহারা বসাইয়া দিল। ঘরের কোণ দেখাইয়া তিনি বলিলেন: পাত্রটা আন্ এদিকে। পাত্র আসিল। তিনি সেই কলসের উপর করাঙ্গুলী চালানা করিয়া তাহাদের বলিলেন: তোদের পাত্র কোথা? তাহারা পাত্র আনিলে তিনি উহাদের পাত্রটি ভরিয়া দিলেন, তার পর উহাদের পান করিতে আদেশ দিয়া কলসীতে চুমুক দিয়া সবটুকুই শেষ করিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—যাহারা কারণ আনিয়াছিল তাহারা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল—তিনি 'না' 'হাঁ' কিছুই বলিলেন না, তেমনি বসিয়া আছেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি কথা কহিলেন:

তোর মতলবখানা কি বল্ দিকি? আমি বলিলাম: ওখানে ভাত যে জুড়িয়ে গেল?

তিনি বলিলেন: যাক্‌গে, কারণানন্দ চলেছে, এখন খাবার ঝোঁক নেই,—তুই খেয়েছিস্?

আমি বলিলাম: হাঁ, রাত্রে সামান্য একটু জলযোগ করি, তা সে অনেক-ক্ষণ হয়ে গেছে।

তিনি বলিলেন: তা হোক, তোর ত পেটে খিদে আছে। আমি স্বীকার করিলাম। পরে বলিলাম: তা ক্রমে ক্রমে ক্ষুধা-বোধও আর থাকবে না।

—খাওয়ার জিনিস দেখলে লোভ হয় না? খেতে ইচ্ছা করে না?

—তা হয়ত হয়,—কিন্তু সংযমও দরকার? খাওয়ার ধান্ধায় ত থাকার দরকার নেই!

—সংযম কাকে বলে? ক্ষুধার সময় খাবার দেখলে খেতে ইচ্ছা হবে, তাই চেপে রাখার নাম সংযম নাকি?—কি বলিস্?

—লোভ এলে কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? তাহলে ত প্রবৃত্তির আগুন আরও জ্বলে উঠবে।

—তুই যে ক্ষুধার সময় জোর করে না খেয়ে থাকবি, আবার তাকে সংযম বলবি, এ যে অবাক কথা বলিস্—কোথা থেকে এ রকম সংযম শিখলি?

আমি বলিলাম: ক্ষুধার সময় যদি আমি আহার সংযম না করি তবে কখন সংযম অভ্যাস করব, খিদে পেলে পর পেট ভরে খেয়ে সংযম হয় নাকি?

তিনি: আচ্ছা, কাম-ইন্দ্রিয় সংযমের বেলা কি রকম সংযম অভ্যাস করিস্ বল্ ত?—সেও ত ঐ রকম, শরীরে মনে স্বাভাবিক কামের প্রবল উত্তেজনা রইল, ভোগের উপকরণও সমুখে রয়েচে, অথচ সেই সময় কষে ল্যাঙট এঁটে থাকার নামই তোদের সংযম নাকি,—কেমন?— খুলে আমায় বল্ দিকি?

—আমার প্রবৃত্তিকে যদি প্রশ্রয় দি তাহলে সংযম হবে কি করে?

—প্রবৃত্তিটার আসলে উৎপত্তি কোথায়? আমায় বল্ আগে।

—মনেই ত প্রথমে প্রবৃত্তিকে দেখতে পাই।

—তার পর?

—শরীরে তার ভোগ!

—তাহলে প্রবৃত্তির গোড়া ত মন, সংযম কোন্ খানে কাজ করে?

—সংযম ত মনেই হবে!

—বেশ ত বল্লি, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের বেলা কষে ল্যাঙট আঁটতে যাস্ কেন? তাতে কোথায় সংযম রক্ষা হয়?

—মনেই হ'ল আসল প্রবৃত্তি, কিন্তু শরীরেও ত বেড়া দিতে হয়?

—শরীরে বেড়া দেওয়ার ফলে কামের প্রবৃত্তি আর শরীরে আসে না, তুই এই কথা বলছিস্—বল্ দিকি ঠিক করে, এত বেড়া দেওয়ার পর তোর মধ্যে কোন প্রকার সুযোগ পেলে বা তিলমাত্র উপলক্ষ্য হলে কামের উত্তেজনা হয় কি না?

—তা হয়।

—স্বপ্নে স্খলন হয় কি না?

—কখনও কখনও হয় বটে।

—যুবতী মেয়ে দেখলে ইন্দ্রিয়-সুখের উপাদান বলে মনের মধ্যে রং ধরে কি না?

—তাও হয় বটে।

—তবে তোর সংযমের উপকারটা হয় কোন্‌খানে, ল্যাঙট-আঁটার ফলই বা কি? ভেবে দেখেছিস্?

—আমার ধারণা, এখন হয়ত কিছুদিন এমনই কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাবে, পরে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কোনও চাঞ্চল্য থাকবে না।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন: তুই কি মনে করেছিস্ যে কাম-ইন্দ্রিয়কে ল্যাঙট এঁটে জয় করে ফেলবি? তুই জানিস এই কাম প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় উত্তেজনাটা কি, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি?

—প্রজা-বৃদ্ধির জন্যই, সৃষ্টির ধারা রক্ষার জন্যই এই কাম প্রবৃত্তি, এইটুকু মাত্র জানি।

—একবার সংসর্গে একটি ফোঁটায় ত একটা সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু এত বড় উদ্দাম প্রবৃত্তি, এতটা শক্তি সারা জীবনেও যেন এর আশ মেটে না, এমন ধারা এক একটি প্রবাহ প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার সার্থকতা কি? প্রকৃতির তুল্য হিসাবী কেউ আছে নাকি? তিনি এমনটা করলেন কোন্ প্রয়োজনে?

—আমার মধ্যে এই একটি প্রশ্ন আছে, এখনও এর কিছু বিশেষ উত্তর

পাইনি। এর উত্তর আমি দিতে পারব না, আপনিই যখন এটা তুলেছেন- আমার মনে হয়, আপনার দয়াতেই আমি এর মীমাংসা পাব।

—আচ্ছা, বল্ দেখি কর্মেন্দ্রিয়ের প্রথম কোন্‌টি?

—বাক্, রসনা।

—শেষ ইন্দ্রিয় কোন্‌টি?

—উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গ।

তিনি বলিলেন: কর্মেন্দ্রিয়ের আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়ে যে যে শক্তির কাজ হয় সেগুলি কি বস্তুত পৃথক পৃথক মনে হয়?

—একটিই শক্তি,—কর্মের বেলায় পৃথক পৃথক যন্ত্রের মাঝ দিয়ে কাজ হচ্চে। এটি বেশ বুঝতে পারি।

—বেশ বল্লি, এখন বল্ মন আর প্রাণ এর বিশেষ কি?

—মনকে ইচ্ছাশক্তি বলতে পারি, আর প্রাণ, শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরীরের সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন করচে, কিন্তু মূলে পৃথক নয়, প্রাণেরই একভাগ মন হয়ে আমার যাবতীয় কর্ম্ম চালাচ্চে।

—বেশ, এখন বোঝ এই 'আমি' বলে যে সত্তা, কর্মজগতে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে এখানে কর্ম্ম-ভোগাদি করছেন এর মূলশক্তি, বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়ে উপস্থিত ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ক্রিয়া করচেন না কি? এটা অনুভব করতে কি কিছু গোলমাল আছে?

আমি বলিলাম: না, এটা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

তিনি: তাহলে বুঝে দেখ্ যে, আদি চৈতন্যশক্তি আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম-রূপে বুদ্ধি থেকে সুরু করে ক্রমশ সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্য দিয়ে সর্ববিষয়ে শক্তিমান করে রেখেছে। যোগশাস্ত্রের মত সেই আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত যার ক্রিয়া অবাধ, তাকে তুই কি মনে করিস্? তন্ত্রমতে সেই কুণ্ডলিনী।

এই যে আমাদের প্রাণ, কামময়, কাম-বীজই হ'ল আদি, এই শক্তি সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে স্থিতি বা পুষ্টি এবং লয় বা মুক্তি পর্য্যন্ত এক একটি জীবের জীবনে কাজ করছে। অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এর সঙ্গে। জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের জীবনই হ'ল এই কাম, একে তুই ল্যাঙট দিয়ে বশ করবি কি করে?

আমি বলিলাম: নীচ থেকে উপরের পথে, ধ্যান-ধারণার পথে চালাবার জন্য এই চেষ্টা, এ ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

তিনি: তোর মধ্যে জীবসৃষ্টির যে বীজ আছে তাকে বেরোবার পথ দিবি নি? প্রকৃতি তোর মধ্য দিয়ে যে কয়টি জীব-সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার অনুকূল পথে না গেলে তো ইষ্টলাভ কেমন করে হবে? তুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বা জগতের কি কল্যাণ করবি?

আমি বলিলাম: ধরুন, আমি যদি স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবার দিকে না গিয়ে উচ্চমার্গে আমার চৈতন্য শক্তিকে চালনা করি?

তিনি: আগে তোর প্রকৃতিগত কর্মবীজকে না ফুটিয়ে অন্য পথে চৈতন্য-শক্তিকে চালনা করতে পারবি কেন? সেটা যে অসম্ভব হবে, কেউ কোথাও কখনও তা পেরেছে কি? শালা বড় তালেবর হয়েছেন, স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবেন না! কেন? সেটা কি ফেল্‌না নাকি?

আমি: পুরুষার্থটা কি কিছুই নয়? আমার যদি তাতে ইচ্ছা না হয়?

তিনি: তাহলে বুঝব ধ্বজভঙ্গ হয়েছে,—তুই অপব্যবহার করে তোর ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট করেছিস্; তাকে ঢাকা দেবার জন্যে, লোকের চক্ষে ধুলো দেবার জন্যে ঢং করে সাধু সাজছিস্। আ মোলো, এ শালা বলে কি? প্রকৃতির বিশাল শক্তি-সমুদ্রের মধ্যে কোথায় একটা নগণ্য বুদ্বুদের আবার পুরুষার্থ? ওরে শালা, তুই যে তারই অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেই এসেছিস এটা কোন্ অহঙ্কারে ভুলে গেলি রে। স্থূল-সৃষ্টির বীজ থাকতে সংসার-আশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস-আশ্রমে গিয়ে কত কত সন্ন্যাসী বাচ্ছা কাটতি করে গৃহীদের ঘাড়ে হাগচে দেখতে পাস্ নি? তুই শালা যে আকাশ থেকে পড়লি দেখতে পাচ্ছি, অ্যাঁঃ—

আমি বলিলাম: প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমরা তার বিরুদ্ধে যেতে পারি না, বা আমরা তার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছুই করতে পারি না। আমি এই বলছি যে, যদি আমি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করতে যাই—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: তুই যেটুকু শক্তি নিয়ে এসেছিস আর সেই সঙ্গে তোর কর্মসংস্কার অনুযায়ী সকল ব্যাপার যেখানে ফোটবার সুবিধা হবে এমনি ক্ষেত্রে তিনি তোর জন্ম ও কর্মক্ষেত্রের যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তুই শিশুকালে মার কোলে যেমন মানুষ হয়েছিস, তোর অভাব অভিযোগ সকল ব্যাপার তোর মারই দেখবার ভার ছিল। তুই কি জানতিস্ কিসে কি হয়? ঠিক তেমনি বড় হয়ে গর্ভধারিণীর অধিকার ছাড়িয়ে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি নিয়ে যে তোর পথে চলেছিস্ বলে মনে করছিস্ সেটাও আর এক মার কোলে। শিশুকালের গর্ভধারিণী মা যেমন তোকে ধরা দিয়েছেন যে তিনিই তোর প্রতিপালনের কর্তা, তাঁর কাছ থেকেই তোর প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়েছিস্, যেন সহজ নিয়মে আপনা আপনি পেয়েছিস্, এখন বড় হয়ে, জ্ঞানবান হয়ে, তোর আত্মশক্তির উপর আস্থা বাড়াবার জন্যেই এই প্রকৃতি মা তোকে জানতে দিচ্ছেন না যে, তিনিই তোর সর্বকর্ম ও বুদ্ধির সহায়; তোর মনে হচ্চে যেন তুই আপনিই নিজ শক্তিতে যাচ্ছিস্, কর্ম কচ্ছিস্, ভোগ কচ্ছিস্, কত বড় বড় কাজ কচ্ছিস্। ঠিক এই রকম জানবি সকলকার ঘটচে। না হলে এটা বুঝতে পারিস্ না, যদি তোরই সকল ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকবে তবে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে তোর এত বাধা আসে কেন, বা কোথা থেকে আসে সেই বাধা। প্রকৃতি জননীর কাজই হ'ল আড়ালে থেকে তোর স্বরূপটি তোকে জানিয়ে দেওয়া, তোকে তোর আত্মস্বরূপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া।

আমি অনেকক্ষণ নির্বাক এবং স্থির হইয়াই রহিলাম. আর কোন কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইল না। তাঁর কথার মধ্যে আমার প্রকৃতিময় জীবনধারার স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম। তত্ত্ব উপলব্ধির আনন্দ পাইলে আর কে প্রশ্ন করিয়া ব্যাঘাত ঘটাইতে চায়? যিনি চান তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই, কারণ তখন আমার প্রশ্ন ত আসেই না। যেন সকল অভাবই পূর্ণ। মনে তখন ক্রমে ক্রমে এই ভয় আসে—যদি এই অবস্থা, এই অনুভূতি আবার কর্মক্ষেত্রে পড়িয়া হারাইয়া বসি।

তিনি কিছুক্ষণ পর বলিলেন: কিরে, তোর মুখ বন্ধ হয়ে গেল যে?

আমি তবুও চুপ করিয়া রহিলাম। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি

উঠিয়া ভোজনে বসিলেন, বলিলেন: তুই তাহলে ঐ নিয়ে থাক, আমি এবার কিছু খেয়ে নি।

নর-কপাল-পাত্র হইতে সেই শবের মাথার ঘিয়ের সঙ্গে অন্ন পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট অন্নগুলি পাতা-সুদ্ধ বাহিরে কুকুরের মুখে ধরিয়া দিলেন। আহার তাঁর শরীরের অনুপাতে এতই অল্প, দেখিলে বিস্ময় লাগে।

তিনি আসিয়া বসিলে আমি বলিলাম: আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশী খাই।

তিনি বলিলেন: আমার খাওয়া ত শেষ হয়ে এসেছে আর তোদের এখন কত খেতে হবে। কতক্ষণ চুপচাপ, তার পর তিনি বলিলেন: আচ্ছা বল্ ত আমায়, তোর ল্যাঙট এঁটে ত ইন্দ্রিয় জয় হবে, আর রসনা জয় হবে কি করে? রসনার তৃপ্তি তোর কাম্য কি না?

এঁর কাছে ক্ষুদ্রতম ছিদ্রটুকু—কিছুই এড়ায় না। বলিলাম: আমি বুঝি যে কার্মেন্দ্রিয় জয়ের সঙ্গে রসনার অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু মনে হয়, মাঝে মাঝে রসনাকে একটু প্রশ্রয় দিলে বোধ হয় তত ক্ষতি হবে না। আমি ত নিজে ইচ্ছামত খাদ্য সংগ্রহ করি না,—যেমন জোটে তার মধ্যেই রসনার সম্বন্ধে ঐটুকু হিসাব রাখি।

তিনি: দেখ্ শালা,—তোর ইচ্ছে করে উল্টো রাস্তায় যাবার ফল। যেটা তোর কু-রাস্তা, যে পথে তোর যাবার কোনও দরকার নেই, পাঁচ জনের দেখাদেখি সে রাস্তায় গেলে ভিতরে কত রকমের আপোষের হিসেব কল্পনা করতে হয়। —শালা জোচ্চোর।

আমি বলিলাম: আমি গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হবার জন্যে ত ঘর ছাড়িনি, সে উদ্দেশ্য কোন কালেই আমার নেই। কিন্তু সংযম যে আমার গার্হস্থ্য জীবনেও দরকার—

তিনি বলিলেন: দেখ্ তোর যতটা ক্ষুধা তোর খাবার প্রবৃত্তিও ততটাই হবে, আর ততটা খেলে তোর পুষ্টি হবে, উপকার হবে, শরীর নীরোগ থাকবে। কিন্তু লোভে পড়ে যদি রসনার সুখের হিসেবেই খাওয়াটা হয় তাহলে প্রকৃতির অবাধ্য হতে হ'লে—তার ফল রোগ। তোর যতটা প্রাণ অগ্নি বা হজম শক্তি—তুই লোভের বশে তার অতিরিক্ত বোঝা চাপালে তোর স্বাস্থ্যভঙ্গ যদি না হয় ত আর কার হবে? এই সহজ বুদ্ধির ব্যাপারটায় এত গণ্ডগোল কেন জানিস?

—যদি তাই জানব তাহলে এত ভুলই বা হবে কেন! এত দণ্ড ভোগই বা কেন?

—দেখ্, যৌবন এমনই একটা মধুময় কাল, মধু বলতে মদও বুঝায় রে,— বেশ সর্বশক্তিমত্তার একটা নেশায় জীবকে বিভোর করে। আর সুখের চরম হ'ল মৈথুন, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এক সঙ্গে ভোগ হয়। এর চেয়ে বড় পার্থিব সুখ ত তিনি আর কিছুতেই দেন নি। দুটি প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয় এক হয়ে যেন একটি সত্তা হয়ে যায়।

অন্যান্য যত কিছু সুখ, কোনটা শুধুই শব্দের, কোনটা স্পর্শের, কোনটা শুধু রূপ নিয়েই, কোনটা বা শুধুই রসে, কোনটি বা গন্ধে—কিন্তু কোনটাতে ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ সুখ নেই—এই এক মৈথুনেই সেটা আছে, আদি রস এই মৈথুন, সেটা সৃষ্টির মূল কারণ। জীব-সৃষ্টির প্রকৃষ্ট সময়ই হ'ল যৌবনে,

কাজেই সৃষ্টির কাজে এই মৈথুন পরম সুখময়। জীব-সৃষ্টির নেশা কাটলে তখন উচ্চ উচ্চ ভাবের বিকাশ, ভাবসৃষ্টি ও নানা প্রকার রসসৃষ্টি আরম্ভ হয়। তখনই চৈতন্যের প্রসার। তিনি এমনই একটা উন্মাদনা এই যৌন-সম্পর্ক মধ্যে দিয়েছেন যাতে করে সন্তান-কামনা না করলেও এতে তাঁর সৃষ্টি-প্রসারের কাজ হয়ে যাবে। এড়াবার যো নেই। মানুষ বুদ্ধি করে যত রকমই ফিকির করুক তাঁর উদ্দেশ্য ঠিকই সিদ্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: এই যে ইন্দ্রিয়-সুখের বিনিময়ে সৃষ্টির সহায়তার কথা বললেন, সে সুখটি ত শরীর আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোনও তত্ত্ব-অনুভূতির যে আনন্দ সে কি এই মৈথুনের চেয়ে উচ্চস্তরের নয়?

তিনি বলিলেন: তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপদ এইখানেই যে, মানুষের মধ্যে একদল, বেশ বড় একদল, আছে যারা ইন্দ্রিয়-সুখটাকেই মুখ্য বলে ধরে নিয়েছে। শুধু ধরে নেওয়া নয় একেবারে সংস্কারগত করে ফেলেছে—ধরেছে এমন করে যেন ঐ কাজের জান্যই বেঁচে থাকা,—

আমি বলিলাম: অবশ্য অত্যন্ত জড়বুদ্ধি মূর্খ প্রকৃতির—

বাধা দিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন: ওরে শালা বোকারাম, তুই যে আকাশ থেকেই পড়্‌লি!—তুই পাগলামী করিস্‌ নে। তোদের ঐ সভ্য ভদ্দোর ইঞ্জিরী-পড়া, এডুকেটেড বিদ্বান বুদ্ধিমান সমাজের মানুষই বেশী বেশী এই দলের। যারা যথার্থ অসভ্য বা মূর্খ, খেটে খুটে খায়, তারা অনেক সংযত ভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ করে, তারা এখনও প্রকৃতির বশে অনেকখানি চলে, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠ, এটা কি তোরা জানিস না, অথচ সহরে থাকিস্‌! আচ্ছা বল্‌ দেখি, পুরুষত্বহীনতা, অজীর্ণ, হৃদ্‌রোগ, স্নায়ুরোগ, পক্ষাঘাত, বাত, মূত্ররোগ, যক্ষ্মা—এসব রোগ ভদ্দোর লোকের বেশী, না ছোটলোকের মধ্যে বেশী?

—সেটা সত্য,—ঐ সব রোগ ভদ্দোর লোকের মধ্যেই বেশী,—তা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে বুঝা যায়।

—তুই এটা বুঝিস্‌ না, বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে বেশী পরিচয় না হলে, বেশী সভ্য না হলে,—ইন্দ্রিয়-সুখের এত ব্যভিচার আসবে কোথা থেকে? সরলবুদ্ধি অসভ্য মূর্খেরা ওসব অবৈধ ইন্দ্রিয়-চালনার প্রবৃত্তি, সাহস পাবে কোথা থেকে? এই শালা, তুই শয়তানের পরিচয় জানিস নি, সে যে বিদ্যাবুদ্ধিতে ভগবানের দোসর, সে কি মুখ্যু অসভ্যের দল নিয়ে ব্যবসা করে?

আমি: আপনি কি বলেন যে কার্মেন্দ্রিয় এবং রসনাদির সংযম সংসার থেকে একটু পৃথক বা আলাদা হয়ে সাধন করবার দরকার নেই?

তিনি: কেন ঘরে থেকে সংযমে বাধাটা কোন্‌ খানে। ঘরে যদি বাধা থাকে বাইরেই বা বাধাহীন হবে কি করে? যেটা যথার্থ বাধা সেটা ত তোর সঙ্গেই আছে, থাকবেও। তন্ত্রমতে যে সাধন সেটি যে তোর গার্হস্থ্য ধর্মেরই অনুকূল,—আমি তোকে তা গ্রহণ করতে বলিনি, তবে তুই নাকি তন্ত্রমতের সাধনের উদ্দেশ্য জানতে চাস্‌ তাই বলছি।

আমি: বাস্তবিক ধর্মের নামে বা সাধনের জন্য পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান, যেটা রাজসিক ও তামসিক ভোগ এবং অধর্ম বলেই আমরা জানি, ধর্ম বলে সেই সব নিয়ে সাধনের যথার্থ উদ্দেশ্যই বা কি জানতে কৌতূহল হয় বৈকি।

এক ধর্মে যেগুলি ত্যাগ করবার উপদেশ, অন্য ধর্মে সেই সকল সাধনের অঙ্গ বলে উৎসাহ দেওয়া কেন হ'লো সেটা কি আলোচনার বিষয় নয়? এ সব আমাদের সকলেরই ভালো করেই জানা দরকার,—আমার ত তাই মনে হয়।

তিনি বলিলেন: এটা ভালো বুদ্ধি,—কত বড় ভাগ্য-ফলে ধর্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ইচ্ছা হয়, তার পর ওসকল জানবার চেষ্টা মানুষের আসে—তাকে কি ফেলতে আছে? তুই দেখ না কেন, এমন সুন্দর ব্যবহারিক ধর্ম, এমন সহজ ও সত্য ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম আর কোথায় আছে? মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই তন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন, এতে কোনও অবান্তর, কোন বাজে আড়ম্বর নেই। দেখ না, মানুষের যৌবন এলেই সাধনের আরম্ভ,—সেই সাধনের এমন পুষ্টিকর স্বাভাবিক উপকরণ, মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাধনের এই অনুষ্ঠান আর কোন ধর্মে নেই, প্রবৃত্তিমার্গেই তন্ত্রের সাধনা, যা নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই।

সব ধর্মের যে উদ্দেশ্য, তন্ত্রের ধর্মেরও সেই উদ্দেশ্য,—মুক্তি, জীবের স্বরূপে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি। যখন পাশবন্ধ অবস্থায় থাকে তখন জীব, পাশমুক্ত হলেই শিব। এখন এই পাশ জোর করে ত মুক্ত হওয়া যায় না, এর একটি ক্রম আছে, সেই ক্রমে, সেই ধারায় চলতে পারলে পাশমুক্ত হওয়া সহজ হয়ে আসে। আর তাই হ'লো তন্ত্রের ধর্ম। যে চৈতন্যশক্তি এই জগৎ প্রপঞ্চ ভেদ করতে পারেন সেটি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রথমে সুপ্ত থাকে, অবিকশিত অবস্থায় থাকে। যেমন, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের জ্ঞান থাকে না, জাগ্রত হলে তবে 'আমি' জ্ঞান, জগৎ-বিষয় জ্ঞান আসে, সেই রকম এই কুণ্ডলিনী শক্তি যখন সুপ্ত, আত্মচৈতন্য, এ সকল জগৎ প্রপঞ্চের কারণ জ্ঞানও তখন সুপ্ত, অবিকশিত অবস্থায় থাকে। এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। তন্ত্রধর্ম আসলে যোগশাস্ত্র অনুগত ধর্ম, এর মধ্যে নৈতিক আবর্জনার কচ্‌কচি নেই বলেই নীতি-ধর্মের গোঁড়ারা তন্ত্র-সাধনকে ঘৃণা করেন, হীন ভাবেন।

আমি: নীতিকে আবর্জনা বল্লেন? সকল ধর্মের প্রথম ধাপই হ'ল নীতি, নয় কি?

তিনি: ঐ নীতি শাস্তোরের শাসনেই ত সকল ধর্ম বিকৃত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যেখানে সেখানে নীতির প্রয়োজন বা উপযোগিতা কোথায়?—প্রত্যেক ধর্মেই ঐ নীতির বোঝা চাপানোর ফলেই না মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে আর তাতেই না এত ভণ্ডামো, মিথ্যাচার সমাজে নির্লজ্জ ভাবে চলে যাচ্ছে, যার প্রতিবাদের শক্তি পর্য্যন্ত মানুষের আজ নেই। তন্ত্রের সাধনে সেই জন্যে নীতির এত বাড়াবাড়ি নেই, কারণ মানুষের স্বাভাবিক, প্রবৃত্তি নিয়েই এর আসল কাজ, আর তারই সঙ্গে সম্বন্ধ।

জীব-ধর্মে যৌবনে যে প্রবৃত্তিগুলি জেগে ওঠে তাই নিয়েই তান্ত্রিক-সাধন আরম্ভ। যৌবনে প্রথম আকাঙ্ক্ষার বস্তু কি? পুষ্টিকর খাদ্য। যে সময়ে যে সমাজে তন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল সে সময় মদ খাওয়া সাধারণের মধ্যে প্রচলন ছিল। শরীরে স্ফূর্তি বাড়াবার জন্যে এক সময় ঐ রকমের একটা না একটা নেশা বা মাদক জগতে সকল সমাজেই প্রচলন ছিল। ওটা দোষের ব্যাপার ছিল না। মদের দোষ আছে, সর্বকালেই আছে, সেটা কিন্তু যিনি খান পাত্রের সেই গুণেই ঘটে থাকে। যার যেমন প্রকৃতি বা গুণ মদ খেলে তার সেই ভাবেরই উদ্দীপন হয়। স্বাভাবিক শরীর, মনের স্ফূর্তির জন্যই

ওটার ব্যবহার তখন ছিল, এখনও আছে। সেই জন্য মদটাকে প্রথমেই রেখেছিল যেটাতে স্ফূর্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তার পর মৎস্য, মাংস। পুষ্টির খাদ্য-হিসাবে মৎস্য-মাংসের কথা কোন শক্তিকেই আর বেশী করে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

আমি : শাক্ত ছাড়া আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের—

তিনি : সকলেই শাক্ত,—যে শক্তি চায়, উপাসনা করুক না করুক প্রত্যেকে শাক্ত ; আমি জানি তখনকার দিনেও যেমন এখনও তেমনি সব মানুষই অন্তরে শাক্ত। জীবের প্রথম প্রবণতা শক্তিমুখী, যে অস্বীকার করবে সে ভণ্ড, মিথ্যাচারী।

॥ ১৮ ॥

অঘোরীর বচন বড় কটু। অনেকগুলি লোকপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু, যাঁহারা সাধারণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সাধু বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এখানকার তান্ত্রিক ভৈরব বা কাপালিকদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা নাই। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম—যে যে কারণে তাঁরা অশ্রদ্ধেয় তাহা আমার ভাষায় বলিতেছি।

তন্ত্রমতে সাধন-পথে অগ্রসর হইলে, ঠিক মত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন চলিতে থাকিলে, কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়। সেই সময়ের গুণে অনেকেরই অভিচার ক্রিয়ার উপর অত্যন্ত প্রবল অনুরাগ উপস্থিত হয়। মনের মধ্যে শক্তি-চালনার প্রবৃত্তি দেখা যায়। অবশ্য তাহা লোকের উপকারের জন্যই করা, এইরূপ একটা মনোভাব প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাবে যত কিছু রাগদ্বেষ তাহা ত তাঁহাদের মধ্যে আছে সুতরাং তাঁহারা নিজের স্বার্থে ক্রমশ তাহা প্রয়োগ করিতে থাকেন। প্রধানত চারটি প্রবল শক্তির চালনা তাঁহারা করেন এবং নিজের সর্বনাশ করিয়া উৎসন্ন যান। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ও স্তম্ভন। এ-ছাড়া অন্য যা কিছু তাও ভূতসিদ্ধির ফল। অনেকটা ম্যাজিক কিম্বা ভেল্কিবাজীর মত,—তাহা দেখিয়া অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি মানুষেরা মোহিত হয়,—ইহাতে কর্ম-কর্তাদের সাধন-জীবনে কিছু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু খুব বেশী হয় না। কিন্তু উচ্চ শক্তির চালনা যাঁরা করেন, আমাদের সবল মানুষের উপর শক্তি-প্রয়োগ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করেন,—তাঁহাদের আর দুর্গতির সীমা থাকে না। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের উপর হাত দিলেই তার ফল ভোগ করিতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে সে নিয়ম তো অলঙ্ঘনীয়—জীবের পক্ষে কল্যাণকর। তাহাতে যে কল্যাণ দেখিতে পায় না তাহার বুদ্ধির উপর কতকটা শয়তানী প্রভাব আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। বাস্তব যাহা কিছু তাহার উপর নিরন্তর অভ্যাসের ফলে অহং শক্তিগত হয়—তাহাই শয়তানী।

তন্ত্রের মধ্যে আত্মজ্ঞান বা মুক্তির সাধনাই মুখ্য—অভিচারাদি গৌণ এবং অবান্তর। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের মধ্যে যেমন সাধনাদির উপায় এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুন্দর উপায় বলা আছে,—আবার বিভূতিবাদও আছে কিন্তু সেটা ত মুখ্য নয়। তন্ত্রের পথে রজ ও তমোগুণী কতকগুলি সাধক আসিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গোপনে অভিচারের পথে যায়। অহং শক্তিমান—এই পরিচয় পাইয়া শিষ্য-সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য, অর্থ, নানাপ্রকার ভোগ সুখের

এবং প্রতিপত্তির লোভ তাহাদের জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠে। তখন কোথায় থাকে মোক্ষসাধন আর কোথায়ই বা থাকে ইষ্টলাভ। তখন রজ আর তমোগুণের মেলা অবাধে চলিতে থাকে। ফলে আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, তাহাদের যে দুর্গতি হয় সে আর বলিবার নয়।

সাধারণ মানুষে যে তাহাদের দেখিলে ভোলে, তাহার কারণ সাধন-অবস্থায় তাহাদের শরীরে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। মানুষ মাত্রেই, যাহাদের আত্ম-চৈতন্যের বিকাশ হয় নাই তাহারা রূপে সহজেই মজে। উজ্জ্বল চক্ষু, জটাজুট, শরীরের লাবণ্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, সেই রূপের প্রভাবে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়ে। কাজেই তাহাতে সাধনের অহংকার বাড়িয়া যায়। তার পর যাহা হয় তাহা লইয়া আলোচনায় ফল নাই।

আমি প্রশ্ন করিলাম ঃ সাধকের ভৈরবী রাখার উদ্দেশ্য কি ?

তিনি বলিলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষ-অভিমানী প্রকৃতি যাদের তাদের নারী-প্রকৃতির সংযোগের ফলে আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধের কাজের সহায়তা করে, দুটি আত্মার মিলনে যে মহৎ ফল উৎপন্ন হয় তাতে দুটি জীবনই সার্থক হয়। যথার্থ সাধকের লাম্পট্য-দোষ থাকে না, তাঁরা একটিতেই কাজ শেষ করতে পারেন। নরক ঘাঁটা ত উদ্দেশ্য নয়,—উদ্দেশ্য আমার বাহ্য কামময় জীবনের পরিসমাপ্তি, আপ্তকাম হওয়া। এমন সাধন এই তন্ত্রের মধ্যে আছে যাতে উর্দ্ধরেতা হয়ে, বিনা ভৈরবীতে কোন স্ত্রীসঙ্গ না করে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু সে সব এখনকার দিনে ত কেউ চায় না, স্থূল ইন্দ্রিয়ের এতটা মোহ যে তাদের মোটেই উঁচু পথে লক্ষ্য যাবেই না।

আমি ঃ ইচ্ছা থাকলে কেউ কি উর্দ্ধরেতা হতে পারে ?

তিনি ঃ তা কি করে পারবে। যাদের কর্মক্ষেত্রে জীব-সৃষ্টির অল্পবিস্তর যোগাযোগ রয়েছে—তাদের উর্দ্ধরেতা হবার সুযোগ ঘটবেই না। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম-প্রবণতা শেষ না হলে কেউ উর্দ্ধরেতা হতে পারবে না।

আসলে উর্দ্ধরেতা হওয়াটাই উদ্দেশ্য নয় ত, উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের আনন্দময় জীবন, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি। যখন আমাদের যৌবনে নারী-আসক্তি সহজেই আসে তখন তা থেকে জোর করে মনকে ফেরাবার প্রবৃত্তি তন্ত্র-শাস্ত্রে অনুমোদিত নয়। অস্বাভাবিক রাস্তায় যাবার কোন দরকার নাই। তা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যাদের মস্তিষ্ক উর্বর তারা একটা নূতন কিছু করবার বা দেখবার জন্যেই একবার বেয়েচেয়ে দেখে—যদি টপ্ করে একবার উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। যদি পরিমিত নারী-সঙ্গ করা যায়, তার ব্যভিচার না হয়, তাহলে মানুষের অধ্যাত্মমার্গে প্রাপ্য যতটা উন্নতি সবটাই নির্বিবাদে আসবে। তারা মানব-জীবনের ফল ষোল আনাই পায়। বাড়াবাড়িটা সকল সময়েই খারাপ। বেশীর ভাগ মানুষের ভোজনের ও ইন্দ্রিয়সুখের লোভ এতটা প্রবল থাকে যে জীবনের অন্যান্য কর্ম গৌণ হয়ে থাকে—তারা ঐ দুটির জন্যই অন্যান্য কাজ করে। তার ফলভোগও কম করে না, প্রকৃতি তাকে দিয়ে বিস্তর জীব-সৃষ্টি করিয়ে নেন, প্রতিপালন করিয়ে নেন—আবার সেই সন্তানের দুর্ব্যবহার দ্বারা তাকে দণ্ডিত করেন। মোটকথা তারা ইন্দ্রিয় সুখকে মুখ্য করে যে কষ্টভোগ করে তাতে সে-জীবনে তাদের চৈতন্য হয়ে যায় যে ওটা যথার্থই সুখের ব্যাপার নয়। শাঁস বাদ দিয়ে ছোবড়াটাই খাওয়া হয়েছে, ফলের যেমন ছোবড়াটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় তার পর [illegible]

সম্বন্ধ করতে হয়—তেমনি, এমন কত কত জীবের জীবনে সুখ ঐ খোসা বা ছোবড়াটি দিয়েই মিটছে। ছোবড়া বা খোসার মধ্যেও ফলের স্বাদ কতকটা আছে কিন্তু সেটা ত খাদ্য নয়। আবার অনেক ফল আছে যার খোসা বাদ না দিয়ে খাওয়া চলে। এই রকম ফল এমনই মধুর যে এর খোসাটারও আকর্ষণ আছে। ফল খোসা-সুদ্ধ খেলেও ভিতরে তার আসলটা শরীরের কাজে লাগে, অসারটা আপনিই বেরিয়ে যায়। এই কাম-ফলও সেই রকম, খোসাসুদ্ধ খেলেও সময়ে তা আলাদা হয়ে যায়। তাদের কথা বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলছি,—যাদের জীবনে যৌবনের ক্ষুধা ভোজন ও ইন্দ্রিয়-সুখে পর্য্যবসিত নয়, যারা আরও কিছু উচ্চ উচ্চ জ্ঞান এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাদের ঊর্দ্ধরেতা হওয়া শক্ত নয়। পরিমিত যৌন-সম্বন্ধ থাকলেও তারা যত বেশী উচ্চ আদর্শের পানে এগিয়ে যায় ততই তাদের রেত ঊর্দ্ধগামী হতে থাকে—তার ফলে তাদের নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হয়—আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়, জগতবাসীর সঙ্গে তারা প্রেমের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্থূল শরীরে যে মৈথুনের সুখ তার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। তারাই তখন সেটা বুঝতে পারে,—দেহাভিমানী মানুষে কি করে তা বুঝবে। তাদের তা বোঝাতে যাওয়া যে অন্যায়। যাদের চৈতন্য শরীরের গণ্ডী ছাড়ায় নি তাদের সঙ্গে ওসব প্রসঙ্গ চলে না। কাজেই, যত রকমের মানুষ এই সৃষ্টিতে আছে তাদের মধ্যে শরীরের ক্ষুধা ও রিরংসার কারবার যাদের জীবনে মুখ্য নয় তাদেরই ঊর্দ্ধরেতার ফলাফল ভোগ হয়। ঊর্দ্ধরেতা হয় বলে তাদের সঙ্গে নারী থাকলেও কসরৎ করবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্তিতাই তাদের উচ্চ উচ্চ শক্তি এবং জ্ঞানের অধিকারী করে দেয়। জগৎসমাজে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়, অনেকেই তাদের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। তাদের মধ্যেই পৌরুষ প্রবল হয়। এই পুরুষ ভাবই সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। একটা মানুষের পিছনে, তাকে তুষ্ট করবার জন্য কত আগ্রহ, এটা যেখানেই দেখা যাবে সেইখানেই বুঝতে হবে এই একটি পুরুষ, এতগুলি লোকের আশ্রয় হয়ে আছেন। তা যে কোন বিভাগেই হোক, —সেই ব্যক্তিকেই নায়ক বলা যায়।

—আচ্ছা তন্ত্রে বিবাহ আছে কি?

—আছে বৈকি। তবে সে বিবাহ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল। জাতি বংশ, গোত্র গাঁই এ সকলের অস্বাভাবিক বালাই নাই। শৈব-বিবাহ যথার্থ বিবাহ,—তার ফল কখনও এখনকার ভণ্ড আর্য্য বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের মত বিষময় হয় না।

আমি: বর্ণাশ্রমীদের ভণ্ড বলা যায় না, তারা মনে-প্রাণে যা বিশ্বাস করে সংস্কারমত তাই করে আসছে ত?

তিনি: ভণ্ড ছাড়া আর কি বলব। ব্রাহ্মণ-বংশের কথাই ধর্ না রে শালা। তোরা কতবড় ভণ্ড—বেদের মতও রাখিস্ আবার তান্ত্রিকমতও মানিস্। এক উপনয়নেই ত কর্মজীবনের সকল কাজ হতে পারে, সে পথের অনুসরণ না করে কুলগুরুর কাছে আবার তান্ত্রিক দীক্ষার কি প্রয়োজন? 'ওঁ'কার জপ করলে যে ফল পাওয়া যায় অন্যান্য বীজের-ক্রিয়াতেও সেই ফল পাওয়া যায়। মন্ত্রকে জাগ্রত করা সাধকের নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তা যে মন্ত্র হোক না কেন। এই ত গেল ধর্মজীবনের ভণ্ডামো। তারপর—

আমিঃ আগে ত বৈদিক-আচার প্রচলিত ছিল, কেন বলুন. দেখি এর সঙ্গে আবার তান্ত্রিকতা এল ?—

—আগে যখন শরীর মনের তেজ ছিল, পশ্চিম-দেশের জল-হাওয়ার গুণে তাদের সূর্য্য-উপাসনা-প্রধান ঐ বৈদিক জীবনেই নিষ্ঠা ছিল। তার পর নড়তে নড়তে তন্ত্রপ্রধান এই বাঙ্গলায় এসে পড়তেই ছন্নমতি ধরবার সুযোগ এল। বাঙ্গলার তান্ত্রিকদের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় হতে লাগল। তাদের সংসর্গের ফলে বেশীদিন থাকতে থাকতে তন্ত্রের ধর্মে বৈদিক ব্রাহ্মণের অনুরাগ দেখা দিতে লাগল। আগে ত তন্ত্রের কোন পুঁথিই সংস্কৃত ভাষায় বা অক্ষরে লেখা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা তাদের বিদ্যা প্রকাশ করলেন তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করে, আর সংস্কৃত-ভাষায় তাকে পুঁথিতে লিখে। তখন শিব আর্য্যদের নূতন অর্থাৎ শেষের দেবতা। ঐ শিবের মুখ দিয়েই তন্ত্রের যা কিছু মাহাত্ম্য বলানো হ'ল—ব্রহ্মাকে শ্রোতা করে,—আবার পার্বতীকে দিয়ে কতক বলানো হ'ল। এই ভাবে আগম-নিগম-এর সৃষ্টি করে তন্ত্রসারে তার চূড়ান্ত করা হ'ল। অথচ বৈদিক আচার ছাড়বার নয়, ওটা প্রাচীন, জাতিগত সংস্কারের ধর্ম, পৈতৃক ধর্ম তখন সহজেই আপোস হ'ল, গার্হস্থ্য-আশ্রমের পূর্ব পর্যন্ত বৈদিক দীক্ষার কাজ আর গৃহস্থ হয়ে দার-পরিগ্রহ করে তখন তন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে তান্ত্রিক মতে সাধন করতে বামুনেরা ব্রতী হলেন, নিয়ম করলেন। তার পর বৌদ্ধ-প্রভাব। বৌদ্ধেরা শেষের দিকে এই তন্ত্রমার্গকে প্রধান অবলম্বন করেছিল যে। এর আসল কথা হ'ল বৈদিক ব্রাহ্মণের দল ধর্মের কারবার চুটিয়ে করবার ব্যবস্থা করলেন এই তন্ত্রকে ধর্মাঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে। মন্ত্র হ'ল গুহ্য। ব্যাপার আরও চমৎকার হ'ল যখন ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম একত্র হ'ল, ক্রিয়াকর্ম বাড়ল। হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণদের উপজীবিকার সুবিধা এইভাবেই হয়ে গেল। তবে পূর্বের ব্রাহ্মণ যাঁরা তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন এর মধ্যে যথার্থই ধর্ম-জীবনের গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত সবটাই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল। কৃচ্ছ্র-সাধনের অসারতা সম্যক প্রতিপন্ন হয় এই তন্ত্রমার্গে। শঙ্কর আচার্য্য সেইজন্যই, প্রবাদ আছে যে তন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেন নি বা করেন নি। সূক্ষ্মভাবে তাঁরা বুঝেছিলেন ভোগ যোগ একত্রই ধর্ম। আর এই ক্রমই প্রকৃতির এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার স্বভাবের সঙ্গে মেলানো। জীবলীলার ক্রমবিকাশ এই তন্ত্রের আদর্শের মধ্যে ধরা আছে। তন্ত্রের প্রতিপাদ্য সকল তত্ত্বই দৃঢ় অবি-সংবাদিত নির্মল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আসলে বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব নীচু হয়ে গিয়েছিল বলেই তখন তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করা হ'ল। বৈদিক আচারবান আর্য্য ব্রাহ্মণ এদেশে এসে খুব বেশী দিন আর পিতৃ-পিতামহের আচার-জ্ঞান ও বীর্য্যে অধিকারী থাকতে পারলেন না। বাঙ্গলার মাটির এমনই গুণ। আবার বৌদ্ধধর্মের অধিকারে তন্ত্রের উন্নতি যতটা হয়েছিল অবনতিও কম হয়নি। অভিচারীর ক্রিয়াশক্তি এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেক কর্মে তার ব্যবহার হত। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, রাগ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ, নারীকে অবলম্বন করে সমাজের মধ্যে যথেচ্ছাচার, এ সকল অভিচার সহায় করে একেবারে চরমে উঠেছিল। তখন নারীসমাজে সতীত্ব বলে কোন আদরণীয় বস্তু ছিল না। আদরণীয় ছিল ভ্রষ্টাচার। তাই ধর্ম, তাই কর্ম, তাই কাম্য, তাই সব। এ

সকল বড় কম দিন চলেনি। এই তন্ত্রের ব্যভিচার শঙ্করাচার্যের দ্বারা একটা ধাক্কা খেয়েছিল, তার পর দ্বিতীয় ধাক্কা এল চৈতন্যদেবের সময়ে। সেই ধাক্কায়ই—এটির গোড়া একেবারেই আলগা করে দিলে। বাঙ্গলায় তখন থেকে তন্ত্রের প্রভাব হীনবল হতে হতে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে যেমন এদিকে তন্ত্রের ধর্ম উঠে গেল তেমনি বৈষ্ণব-ধর্ম সতেজে গজাতে লাগল, আর তন্ত্রের অনেকগুলি আবিষ্কার,—গুহ্য একাঙ্গ মৈথুনতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রভৃতি আত্মসাৎ করে নিয়ে অঙ্গ বাড়াতে লাগল। সহজিয়া, আউল, বাউল আদি সম্প্রদায় ত তন্ত্রের ভাঙা-হাটের মাল, বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মহাজনদের গদিতে জমা হয়ে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, তন্ত্রের সকল ব্যাপার এত গুহ্য কেন?

তিনি: প্রথমে গুহ্য ছিল না, প্রথমে তন্ত্রের সাধন সহজ এবং সাধারণের উপযোগীই ছিল,—কিন্তু যখনই এই মৈথুনাদির প্রকরণ নানাপ্রকার এবং অদৃষ্টপূর্ব ফলাফল আবিষ্কার হতে লাগল, তখন থেকে এটা গোপন করবার নিয়ম হ'ল, কারণ অন্য সম্প্রদায়ের কাছে এসব ক্রিয়া ঘৃণার বস্তু বলে, অবজ্ঞার বিষয় বলে ধারণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। অল্প লোকেই এর মধ্যে থেকে সার বস্তু পেয়েছে, বেশীর ভাগই বিপথে গিয়েছে, ব্যভিচার করেছে। কামের যত কিছু বিকৃতভাবের অভিব্যক্তি হতে লাগল, গুহ্য রাখাতে এই দোষ হয়ে গেছে, গোটা কতক সংকেত ছাড়া, এই কামরাজ্যের বিচিত্র রহস্য সাধারণের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। স্ত্রী-পুরুষে মিলে এই যে রমণ, এর মধ্যে শরীর-ধর্মেই সাধারণের প্রবৃত্তি। কিন্তু শরীর-ধর্ম-বর্জিত প্রেম বলে যে একটি স্বর্গীয় সুখ আছে তা সাধারণের কাছে গুপ্ত, অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত। সাধারণ মানুষের শরীরগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখের সংস্কার পুরুষানুক্রমে এতটাই প্রবল যে এই সব স্থূল শরীরের সম্পর্কশূন্য হয়েও কত বড় একটি সুখের উপায় আমাদের আছে—তার কল্পনাও যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আজ এই তান্ত্রিকদের কিম্বা এই সহজিয়াদের সর্বনেশে কাম-সাধনের বিকৃতি দেখলে অবাক হতে হয়। যে ধর্মে দু-একটি লোক সিদ্ধ হয়,—তার পর তার পদ্ধতি কতকটা বিকৃত হয়ে আসে, শেষে এই রকম শোচনীয় পরিণাম হয়—এ দেখে কি মনে হয় না যে এটা যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁদেরই জন্য। এই কারণেই আরও গুহ্য রাখার ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম: আমার মনে হয় এসব গুহ্য রাখা খুবই অন্যায়।

তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন: ওরে শালা, তখনকার দিনে কি এখনকার মত ছাপাখানা ছিল, না বিদ্যার এতটা প্রচার হয়েছিল যে সাধনের এ সকল গুহ্য রহস্যময় ব্যাপার সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণের কাছে পেঁছে যাবে। আর তাতে লাভই বা কী হত। হাজারে একটা মানুষ সাধনের পথে যায়, তা ছাড়া শরীরের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী, প্রাণশক্তির ক্রিয়া আর অনুভবের নানা স্তর, স্থূল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বা বুঝানো যাবে কি করে। অনুভবের কি ভাষা আছে? তার উপর কাম-মার্গের ব্যাপার কতই না জটিল,—লিঙ্গ থেকে মস্তিষ্ক অবধি প্রাণমার্গে তার ক্রিয়া; রেত বা ধাতুক্ষরণের কত প্রকার ভেদ, অন্তঃক্ষরণ বহিঃক্ষরণ, কেমনভাবে কোন্ কোন্ ক্রিয়ার ফলে, বহির্গতি বন্ধ করে অন্তরমার্গে গতিমান করা যায়, এ সকল ব্যাপার প্রকৃতি যখন গুহ্য রেখে দিয়েছেন তখন কেন তাকে অত প্রচার করবার জন্যে মাথা-ব্যথা তোর বল্ দেখি! এই কামকলা, যা নিয়ে এই বিরাট সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ব্যাপার

দিবারাত্র চলচে তার যত রহস্য, মানুষের শরীরের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা থেকে সুরু করে কামের উদ্দীপন, যে ভাবে দুজনের উপর দুজানের চেতন্য থেকে আরম্ভ করে মনের ভিতর দিয়ে শরীরের উপর টান—তার পর মৈথুনে দুটি এক হয়ে যাওয়া, তার পর প্রাণশক্তির ঘন স্পন্দনের উদ্দামলীলা, শেষে উভয়ের স্খলন। যে ক্রমে প্রথম থেকে শরীরের নানা সূক্ষ্ম নাড়িগুলির ভিতরে যে যে ভাবের ক্রিয়া হয়—তার প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রত্যেক ফলটি কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? এ সকলই অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার,—পূর্ণ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল তুচ্ছ বাস্তব প্রমাণ দিয়ে এসব লোক-সমাজে কি করে প্রকাশ করা যাবে? কামের প্রথম প্রেরণা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত যে সকল ব্যাপার তাই তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়; এ সকল কি করে সব মানুষকে ন'কড়া ছ'কড়ার হিসাবে বুঝোনো যাবে, তুই আমায় বল্ দিখি?

আমি: আচ্ছা, সহজ-বুদ্ধিতে মানুষের যৌবন এলে, নারী হলে পুরুষের উপর আর পুরুষ হলে নারীর উপর একটা আকর্ষণ হয় ত। সেটা কি শুধুই কামের ব্যবহার চরিতার্থ করবার জন্যে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: অন্য কথা পরে শুনচি, আগে একটা ভুল তোকে শোধরাতে হবে। তুই যে বল্লি নারী আর পুরুষ, ওটা হ'ল নারী-প্রকৃতি আর পুরুষ-প্রকৃতি, নারী ও নর এই কথা বলতে হবে।

আমি: ও আপনাদের কথার বাড়াবাড়ি—যে রকম বলেই হোক বুঝাতে পারলেই হ'ল।

তিনি: ফের শালা তুই না বুঝে পণ্ডিতি করছিস্! এ প্রকৃতির রাজ্যে পুরুষ কেউ আছে নাকি রে শালা। কথায় যাকে পুরুষ বলছিস্ সে ত প্রাকৃত জীব। লম্বা হাত খানেক করে লিঙ্গ থাকলেই কি পুরুষ হয়? অংশত পুরুষের যে গুণ তা নারীতেও ত আছে। দেখতে পাচ্চিসনে এক ভগবানকে সকলেই চাইচে!—কেন চাইচে? সেই একমাত্র পূর্ণ পুরুষ বলেই চাইছে। যদি কেউ পুরুষ এখানে থাকত সকলেই তাকে চাইত। পুরুষের প্রথম এবং প্রধান গুণই হ'ল সে সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই তাকে চাই, না পেলে নয়। পুরুষ এক, পুরুষে দুই সহ্য করতে পারে না, বিশ্বাস করে না। প্রকৃতির কোলে আমরা যত জীব সবাই এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মেছি প্রকৃতি পুরুষের গুণের অতীব ক্ষুদ্র কণা-প্রমাণ অংশ নিয়ে। তারি ঠেলা এমনি যে আমরা আবার আমাদের স্বতন্ত্র পুরুষ বলে পরিচয় দিচ্চি। কি লজ্জা! এক সদাশিব পুরুষ, আর কেউ পুরুষ আছে নাকি রে? গুণ ধরে বিচার করলে এই প্রাকৃত পুরুষের নারীর সঙ্গে সম্বন্ধের বেলা মাত্র ঐ গুণটুকু দেখতে পাওয়া যায়,—নারী-সম্পর্কে তার অধিকার পূর্ণ রাখতে চায়—সেখানে আর কারো অধিকার সে জানে না। নারীরও ঠিক ঐ গুণটি আছে,—সেও তার ভর্ত্তার অন্য নারী-সঙ্গ, পতির উপর অন্য মেয়েমানুষের প্রভাব সহ্য করতে পারে না,—এই যে পুরুষের গুণ এ ত মেয়ে-মদ্দ দুয়ের মধ্যেই রয়েছে। একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রেই এটার পরিচয়। মিলনের জায়গায় দুটি একতন্ত্র। মানে বুঝে কথা বললে ত গায়ে লাগে না, এখন আসল পুরুষ আর প্রাকৃত পুরুষের তফাত বুঝেছিস্?

আমি: এসব ত বৈষ্ণব-দর্শনের কথা বলেই আমার জানা আছে।

তিনি: সব দর্শনের মোদ্দা কথা এক যে রে শালা,—তত্ত্বে পেঁছিলে সবই

এক রকম। পথের প্রকরণ, পদ্ধতি যা আলাদা। তাই না তুই তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি দেখতে এসেছিস্‌ !

আমি ঃ শরীর-তত্ত্বের সঙ্গে সাধনের ত বিশেষ সম্পর্ক আছে।

তিনি ঃ সাধন ত শরীর নিয়েই, কাজেই সুস্থ শরীর সুস্থ মন না হলে সাধনের মানে হয় না। বিকৃত শরীরে সাধনের মানে শরীরের চিকিৎসা। কোবরেজী ওষুধের বদলে শরীরে ভিতরকার নিয়মের, বায়ুর গতি স্থির করে তাকে স্বাস্থ্যের তালে চালানো। সাধন-বস্তুটি এমনই কল্যাণকর যে, তাতে আর কিছু হোক বা না হোক শরীরে স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় আসবেই আসবে। সাধন করছে অথচ শরীর খারাপ, বুঝতে হবে মরণের সাধন হচ্ছে, জীবনের নয়। সাধনের প্রথম প্রত্যক্ষ ফল হ'ল স্বাস্থ্য,—আনন্দময় মানসিক অবস্থা। সকল বিষয়েই আনন্দে পরিসমাপ্তি! মহা দুঃখের ব্যাপার হলেও সাধকের প্রাণে সেই দুঃখের কারণ-জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়—তার ফল আনন্দ। এই দুটি হ'ল স্পষ্ট লক্ষণ।

॥ ১৯ ॥

বক্রেশ্বরের আকর্ষণ ইতিমধ্যে আমার অন্তরে গভীর ভাবেই রেখাপাত করিয়াছে, ঐ অঘোরী সাধুটিকে উপলক্ষ করিয়া। ধ্যান-জ্ঞান এখন তিনিই। কি গভীর আকর্ষণ তাঁর, সর্বক্ষণই অন্তরে তাঁহার মূর্তি এবং তাঁহার কথাই উঠিয়া অনন্যমনা করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁর প্রকৃতির অপূর্ব বিশেষত্ব। কখন দেখি এমন গম্ভীর যে সে মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে সাহস হয় না। কেমন একটা ভয়, যাহা তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আসিবার পূর্বে ছিল, সেই ভয় আমায় পাইয়া বসে। অথচ ভয় করিবার মত কোন ব্যবহারই তিনি আমার সঙ্গে করেন নাই। বিশেষভাবে বাহিরের মূর্তি দেখিয়াই এটা হয়। কথা কহিলেই আর সে-ভাব থাকে না। এমন চক্ষু তাঁহার, মনে হয় তাঁর পূর্ণ দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু চক্ষু তাঁহার সাধারণত অর্দ্ধনিমীলিতই থাকে, তাহাতে তাঁহার অক্ষি-গোলকটি যে কত বড় তাহা সাধারণের লক্ষ্য হয় না। উহা প্রত্যক্ষ হয় তখনই যখন তিনি ক্রোধের ভাবে কাহারও উপর দৃষ্টিপাত করেন। তখন সকলকেই চক্ষু নামাইতে হয়। অনেক সাধুমূর্তিই দেখিয়াছি—সহজ ভাবে নয়—বিশেষ ভাবেই দেখিয়াছি,—বালককালে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁহারা হামেশাই তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেন—তাঁহারাও সেই চক্ষুর বিশেষত্ব ধরিতে পারিয়াছিলেন কি না আমার সন্দেহ আছে। তার পর একটি পাঞ্জাবী সাধু হরিদ্বারে দেখিয়াছিলাম। তার পর ইঁহাকে দেখিলাম. পরবর্তীকালে তারাপীঠে বামা-ক্ষেপার মূর্তি দেখিয়াছিলাম—এই যে চারিটি মূর্তি, প্রত্যেকেরই পূর্ণজ্যোতি বিশিষ্ট বিশালায়ত চক্ষু—কিন্তু কারো সঙ্গে কারো চক্ষু-রেখার মিল নাই! প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইঁহার চক্ষু সর্বদাই রক্তবর্ণ এবং স্থির প্রশান্ত। তিলমাত্র চাঞ্চল্য তাহাতে নাই, বোধ হয় পলকও নাই। মনে হয় না ইঁহার চক্ষুতে কখনও পলক দেখিয়াছি। এত স্নেহ তাঁহার পাইয়াছি—তথাপি এক এক সময় তাঁহার মূর্তি দেখিলেই ভয় আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু কথা কহিলে একেবারে প্রেমের উৎস ছুটিত।

কখনও দেখিতাম এমন নিরপেক্ষ, যেন কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই,

কোনও কালে ছিল না, বা হইবেও না—এমন ভাবটি। জগতের সঙ্গে তাঁর যে কোনও সম্বন্ধ নাই ইহা বুঝিতে কাহারও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। তখন যদি কেহ কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়া আসে ত কথা কহিতেও তার সাহস হইবে না। একদিন এইরূপ একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পথে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন: এখানে এক অঘোরী আছেন, কোথায় থাকেন জানেন? তাঁহাকে লইয়া বাবার কুটীরের দ্বারে উঠিলাম। দেখিলাম, তিনি বসিয়া আছেন, একেবারেই উদাসীন, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। লোকটি প্রণাম করিয়া বসিল; তিনি কিন্তু স্থির নিশ্চল, কোন দিকেই দেখিলেন না, বা কিছুই বলিলেন না। দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। তার পর আমার মনে হইল হয়ত ইঁহার কোনও গোপনীয় কথা থাকিতে পারে, আমার সরিয়া যাওয়াই ভাল। চলিয়া আসিলাম। অনেকক্ষণ পর তিনি ফিরিতেছেন দেখিলাম। আমায় দেখিয়া তিনি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কি রকম মানুষ বলুন ত, আমার আসা ত বৃথাই হ'ল। উনি ত কিছুই বললেন না, আমারও কথা কইতে সাহস হ'ল না, প্রবৃত্তিও হ'ল না। আপনি জানেন উনি কি কথা কন্ না?

—কন্ বই কি! আপনার যা জিজ্ঞাসা—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: আর মশাই, অনেক কিছুই ত বলবার ছিল কিন্তু আমার তাঁর মূর্তি দেখেই ত হয়ে এল,—কথা কইব কি? ওঁর কাছে বশীকরণের কিছু পাওয়া যাবে মনে করেই ত এসেছিলাম—আর এতে যে ওঁর কতটা লাভ ছিল তা হয়ত তিনি বুঝলেন না, কাজেই আমায় ফিরে যেতে হ'ল।

কি রকমের লাভ জিজ্ঞাসা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উত্তরে তিনি বলিলেন: আমি এর জন্য ওঁকে দুই শত টাকা পর্য্যন্ত দিতাম।

হায় সাধুসঙ্গ-কামি!—তোমার পোড়াকপাল!

* * *

একদিন প্রাতে, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া অঘোরীর সন্ধানে বাহির হইলাম, দেখিব, সকালের দিকে কি ভাবে থাকেন, কি করেন ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখিব যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারিব। কুটীরে গিয়া দেখিলাম শূন্য কুটীর, দ্বার ত খোলাই থাকে, কখনও বন্ধ দেখিলাম না। বাহিরের পানে এদিক ওদিক চাহিতে দেখিতে পাইলাম—ভুলো ডোম, ঐদিক হইতে আসিতেছে, ইহাকে হামেশাই এখানে দেখা যাইত। অঘোরীর একজন অতি অনুগত ভক্ত। শ্মশানের কাজকর্ম করিত, দু'চার আনা পাইত আবার কারণ প্রসাদও পাইত। সে ছাড়া অঘোরী বাবাজীর সন্ধান আর কেহ তেমন করিয়া রাখিত না, কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: কোথায় তিনি?

সে বলিল: হোই দেখেন গা, কাল হতে পড়ে রইচেন শ্মশানে যেঁয়ে।

আমি পুনরায় বলিলাম: কাল রাত্রে সেইখানেই ঘুমিয়েছিলেন নাকি?—সে বলিল: ওঁয়ার কি ঘুম আছে নাকি, ওমনিই পড়ে রইছেন।

আমাদের কলিকাতা মহানগরীর সভ্য অধিবাসবৃন্দ যাহাদের পল্লীগ্রামের শ্মশানের অভিজ্ঞতা নাই,—নিমতলা, কেওড়াতলা, কাশীমিত্র অথবা কাশীপুরের শ্মশান ছাড়াইয়া যাহাদের অভিজ্ঞতা অধিক দূর যায় নাই—রাত্রের কথা থাক, দ্বিপ্রহর দিবালোকে পল্লীশ্মশান যে কি রূপ ধারণ করে তাহা তাঁহাদের বুঝানো

সহজ নয়। বিশেষত এই বীরভূমের শ্মশান। এমন ভয়ংকর শ্মশানের দৃশ্য বোধ করি অন্যস্থানে নাই। যাঁহারা বীরভূমের শ্মশান দেখেন নাই তাঁহাদের জানিয়ে রাখা ভাল যে, বীরাচারের প্রত্যেক স্থান তান্ত্রিক সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া প্রত্যেক মহাপীঠস্থান শ্মশান-সংশ্লিষ্ট।

আশপাশে জঙ্গল, নদীতীর অবধি বিস্তৃত। অস্থি, নরকপাল, দগ্ধ অঙ্গার, অৰ্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে। কাক, চিল, শকুন, শৃগাল,

কুকুরের অবাধ গতাগতি। ছোট ছোট শিশু বা বালক-শব এখানে অনেকেই দাহ করে না, গর্ত খুঁড়িয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে, তার পর চলিয়া যায়। শৃগাল কুকুরেরা সন্ধানী জীব, শ্মশান জনশূন্য হইবার পর-মুহূর্তেই মাটি আঁচড়াইয়া দেহটি বাহির করিয়া তাহারা ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলে। কেবল অস্থি-গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। ছোট ছোট গাছপালা চারিদিকেই, তাহার আড়ালেই ইহারা আপনার কাজ সারিয়া লয়। কোথাও কতকটা চুলির গর্ত কাটা, তাহার উপর আধপোড়া কাঠকয়লা ছড়ানো। কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়, কাণাভাঙা কলসীর ছড়াছড়ি। এমনই স্থান এখানকার শ্মশান।

অঘোরীর কুটীর হইতে কতকটা গিয়া দেখি তিনি কয়েকটি ছোট ছোট গাছের পাশে শবাসনে শুইয়া আছেন। একটি হাত মাথায়, উপাধানের কাজ করিতেছে। দেখিবামাত্র আমার মনে হইল যোগীশ্বর মহাদেব কি এইভাবেই শ্মশানে শুইয়া থাকিতেন? আপন ধ্যানে আপনি বিভোর হইয়া জগৎ প্রপঞ্চের কথা ভুলিতেন। এমনই অবস্থায় কি জগদম্বা আপন দক্ষিণ চরণ তাঁহার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছিলেন?—ভাবিতেছিলাম, কি ধাতুতে এসব মানুষ গড়া! বুঝিতে পারি না, কেমন করিয়া আমাদেরই মত একজনের এমন অবস্থা হয়! কেন বুঝিতে পারি না—বুঝতে বাধা কি? বাধা সেইখানেই যেখানে আমরা আত্মদোষ নির্দ্ধারণে উদাসীন, পরদোষ অনুসন্ধানে উদ্দাম এবং অতি-তৎপর। তাহার উপর যেখানে আমরা ভণ্ড, কাপুরুষ, প্রেমহীন, অতীব স্বার্থদুষ্ট মন লইয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ থাকি। কেমন করিয়া এ তথ্য সমাধান করিতে পারিব? এ তথ্য সমাধান না হইলেও কিন্তু ইহার আকর্ষণ কিছু কম অনুভব করি না। ভাবিতেও আনন্দ, প্রত্যক্ষ করিতেও আনন্দ, পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রকাশ করিতেও আনন্দ। যদিও জীবনে একবার, কয়েক-দিনের জন্য ইঁহার সঙ্গ পাইয়াছিলাম, তথাপি তাহার ফল জীবনের স্মৃতির মধ্যে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইলাম—কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি জানিতে পারিলেন কি না তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তার পর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গিয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে তিনি চাহিলেন, আমায় দেখিলেন বটে কিন্তু কোন কথাই নাই। আমারও কিছু বলিবার মত কথা ছিল না। বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণই কাটিল, এইবার তিনি নড়িলেন, একদিকের পা মুড়িলেন। আমার ধৈর্য্য কতটা তাহারই যেন পরীক্ষা চলিতেছে।

ব্যাপারটি যা মনে হয় হয়ত তা ঠিক নয়। বসিয়া বসিয়া কত ভাবিতে-ছিলাম, অবশ্য এই অঘোরীরই কথা। তাঁর সংসর্গে মূলে কিছ সংভাবের প্রেরণা অথবা সাধনপথে কিছু আলো পাইলাম কি না, কতটুকু স্থূল এবং অসৎ-এর মোহ কাটাইতে পারিয়াছি। তাহার উপর আত্মপ্রসাদ কোন উপলক্ষে কেমন করিয়া আসে, তাহারও লক্ষ্য করিতেছিলাম, সম্মুখের ওই আদর্শটিকে কেন্দ্র করিয়া আমার চৈতন্য ক্রমে কেন্দ্রস্থ হইতে লাগিল, বেশ বুঝিতে পারিতেছি, 'আমি' এই বোধটি মাথার মধ্যে কোন স্থানে অনুভব হইতেছে। চকিতের মধ্যে যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কি নিধিই হারাইলাম। হায়!

সম্মুখে অঘোরী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন,—আমার দৃষ্টির উপর তাঁর দৃষ্টি পড়িবামাত্রই আবার আনন্দে আকুল করিয়া তুলিল।

এমনই সময় সৎকারার্থে শব লইয়া একদল লোক আসিয়া একেবারে আমাদের অতি নিকটেই খাটিয়াখানি নামাইল। আমার অন্তরের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন,—পরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ বেরো শালা তুই এখান থেকে। কেন এখানে এলি তুই, যা চলে যা এখান থেকে, আমি এদের সঙ্গে ভাল থাক্‌ব,—তোর মত এরা মনে মনে অত শত হিসেব করে না। আমার এদের সঙ্গ ভাল লাগে। বেরো শালা, যা বলছি, তুই এখনই যা।

এমনই 'যা' 'যা' বার কতক বলিলেন যে আমায় উঠিতেই হইল, জোর করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুতেই আমার ওখানে বসা আর সম্ভব হইল না। ইহা লইয়া মনে একটু দুঃখ হইল বটে, কিন্তু আসনে পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকল রহস্য ভেদ হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম কেন তিনি আমায় ঐ সময় উঠাইয়া দিলেন।

আসিয়া দেখি মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা হাতে একটি লাঠি, এক বাউল মূর্তি নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ আবার কি ভাব!—মনটি বিরস ছিল, সদ্য সদ্য অঘোরীর তাড়া খাইয়া মনের বেদনা মুখে বেশ ভাল রকমই প্রকট ছিল।

—এ কি, আবার গোমরা মুখ কেন,—সাধু মানুষের হ'ল কি?

আমি বলিলামঃ এমন কিছু নয়, আপনি এখানে কোথায় এসেছেন, জানতে পারি?

তিনি বলিলেনঃ আমাকে ভাগাবার চেষ্টায় আছ কেন বাবা, আমি কি অপরাধ করেছি?

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলামঃ বসুন না, আমার সে অভিপ্রায় নয়। এমনিই আমি মনে করেছিলাম হয়ত অন্য কোথাও এসেছেন, কোনও পরিচিত—

তিনি হাসিয়া বলিলেনঃ তা বাবা, আমার পরিচিত ত কেউ নেই এখানে, তার জন্য তোমার ভাবনা নেই। অপরিচিত হলেও আমি বেশ সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি, এখানে শুনলাম যে দুই-একজন আছেন, তাই না আলাপ করতে আসা!

জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—হাঁ, তা পারবে না কেন, আমরা সহজ মানুষ, আমাদের সম্প্রদায় এখন মরে গেছে বাবা।

আমার মনে হইল,—এই মানুষটির সঙ্গে আলাপের জন্যই অঘোরী আমায় এত জোর করিয়া উঠাইয়া দিলেন। আরও মনে হইল, এঁর সঙ্গ আমার শুধুই অভিপ্রেত নয়, অন্তরের কাম্য। চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়া সহজিয়াদের কথা এক সময় কতই না ভাবিয়াছি।—এই সব ভাবিতেছি, বাউল একটি গান ধরিলেন,—

ডুব্‌তে কি সবাই পারে,
রূপসাগরে তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে।

এই গানের এক লাইন শুনিতে শুনিতে সংজ্ঞা লোপের উপক্রম হইল। আনন্দের প্রবাহ চলিতে লাগিল। সত্যই আমি ডুবিয়া গেলাম।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বাবাজী আসিয়া আমার আসনের নিকটেই বসিলেন। বলিলেন ঃ আপনি যে আমাদের আপনার জন দেখেই আমরা চিনতে পারি।

—আপনি কি জ্যোতিষ জানেন?

—আরে বাবাজি, জ্যোতিষ শাস্তোর কি এতবড় জিনিস, একজনের পরিচয় জানতে হলে শাস্তোর ঘাঁটতে হবে। আমাদের ওসব বালাই নেই। প্রেমের ঠাকুর হৃদয়ে সব সময়ে হানা দিচ্ছেন, কে কোন্ দলের মানুষ তা তিনিই জানিয়ে দেন।

আমি বলিলাম ঃ এখানে তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি দেখব, সাধকদের সঙ্গে মিশব বলেই এসেছি। এখন এমন এক সাধুর পাল্লায় পড়েছি—

—ওসব কেন বাবা, যে যে-রাজ্যের লোক নয় তার সেই রাজ্যে ঠোকর মারবার দরকার কি?

—জানতে ইচ্ছা হয় ত? আমি বলিলাম: জানলেই বা দোষ কি?

—দোষ এই যে খানিকটা ঘূর্ণি পথে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। আরও জেনে রাখ বাবা, তোমার সংসার বেশ ভাল রকমই আছে।

আমি বলিলাম: সে কি? আমার ইচ্ছা, এইভাবে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে জীবনের দিন কাটিয়ে দেব।

—মনে ত হয় বাবা, কিন্তু তা হতে দেয় কৈ! তোমার সত্ত্ব আর কিছু রাখবে না বাবা, সবটাই নিঙড়ে বার করে নেবে, তবে ছাড়বে।

—খুলে বলুন, আমি ভাল রকম জানতে চাই।

—আরে বাবাজি, তোমার এত কষ্টের, এত যত্নের বেক্ষোচোয্যো, কোথায় থাকবে এসব বাবা, যখন তিনি ঘানিগাছে জুড়ে পিষিয়ে তেল বার করে নেবেন। হাঃ হাঃ হাঃ।

লোকটা বলে কি, আমার এত যত্নের তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে?

—আরে বাবা, যন্ত্রটা যে আসলে প্রবাহকে বেঁধে রাখবার কাজেই রয়েছে, যেটা একেবারেই অসার—যার কোনও দরকার ছিল না। তা যখন এটা হয়েছে ভালই হয়েছে—এতে তাঁর একটা অভিপ্রায় রয়েছে যে। তা বাবা, জেনে রাখো, তোমায় ঘরে ফিরে অনেক পাড়ি দিতে হবে, সংসার ঘাড়ে করে।

এখন এ সব কথা আমার কানে ভাল লাগিতেছিল না, বরং বিসদৃশই লাগিতেছিল। তিনি সেটি বুঝিয়া ফেলিলেন: বলিলেন, চল বাবা, এখান থেকে একটু উঠে পড়ি, চল মন্দিরের আঙ্গিনায় যাই,—ফাঁকা আছে।

যন্ত্র-চালিতের মতই চলিলাম। তিনি বলিলেন: ঐ গাছতলায় জঙ্গলের মধ্যে একটি ভাঙা বিগ্রহ আছে, দেখেছ কি বাবা,—

—আমি ত দেখি নাই, কোন্‌খানে চলুন যাই,—

কুণ্ডের ধারে ধ্বংসোন্মুখী উঁচু ইষ্টক-নির্ম্মিত অলিন্দের সারি, তাহার উপর অসংখ্য গাছপালা শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার পাশেই জঙ্গল। সেই জঙ্গলে অনেকগুলি শৃগাল বাস করিয়া থাকে। তাহার পরেই কতকটা বনপথ।

আমরা সেই বনপথ ধরিয়া চলিলাম—পথে আমার আর কথা কহিতে ইচ্ছাই হইল না। ভবিষ্যতে আবার সংসারের আবর্ত্তে পড়িতে হইবে শুনিয়া অবধি প্রাণে আর আনন্দ নাই। সঙ্গী বাবাজী আমার দুঃখটি অনুভব করিয়াছেন বুঝিয়াছি। যখন তিনি দাঁড়াইলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: এইখানেই নাকি?

—হাঁ, আর একটু এগিয়ে আসতে হবে। এই দেখ বাবা,—

দেখিলাম সত্যই একটি অতি প্রাচীন পুরুষ-মূর্ত্তি ভগ্ন এবং স্থানচ্যুত। নীচের দিকে পদ্মাসনের কতকটা আড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলি গাছ শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার চারিদিকেই টুকরো টুকরো অনেকগুলি পাথর। বেদী যেখানে ছিল সেখানে একটি উঁচু ঢিপি ছাড়া আর কিছুই নাই। খুব সম্ভব এখানে একটি মন্দির ছিল। কোন সময় হয়ত এই বিগ্রহের পূজা হইত। তার পর ধ্বংসের বন্যা আসিয়া সব শেষ করিয়া দিয়াছে।

তিনি একখানি পাথরের উপর বসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন: এস ভাই, বসা যাক্,—আজ তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছি—ছেলেমানুষ কিনা

সংসার এখন রহস্যই হয়ে আছে কিনা, তাইতো এ কথায় এতটা বেদনাবোধ হয়েছে। আসলে কিছু নয় দাদা, সবই চমৎকার, যেমন এপিঠ তেমনি ওপিঠ।

বাউল বাবাজির গলাটি মিষ্ট, তাহার উপর ভাব-রসে তাঁর প্রাণটি পূর্ণ, সেইজন্য তাঁর গান শুনিলে চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। আমার সম্বন্ধে তাঁহার ভাবিষ্যৎ উক্তি শুনিয়া মনটি যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহা যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন নাচিয়া নাচিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া একটি গান ধরিলেন।

সহজ পথে উছট্ লাগে ওরে মন কাণা ;
(ও) তুই আপনি সহজ না হইলে সহজের পথ পাবি না।

এই গানটি সত্য সত্যই মন্ত্রের কাজ করিল। আনন্দের প্রবাহ চলিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মনের অবসাদ, বক্রগতি এবং জড়তা সব কিছু স্থির, সহজ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সহজ ব্যাপারকে জটিল করিয়া আমরা মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করি তাহা বুঝিয়া বিমল আনন্দে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দিল। অন্তরে নিজের গলদ ধরা পড়িলে এমনই হয়। আমরা নিজের কাছে কতটা যে অহেতুক অপরাধী, যদি একবার স্থির অবস্থায় অনুসন্ধান করি তাহা হইলে অন্তরে সবটাই পরিষ্কার দেখিতে পাই, যাহার ফলে অনেক অহেতুক দুঃখ এবং অবসাদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। আমার নিজের বেদনা ত এড়াইতে পারি, আবার অপরের বেদনা এবং দুঃখ অনেকটুকুই মোচন করিতে পারি। তার আরও সর্বোৎকৃষ্ট নিশ্চিত ফল এই লাভ হয় যে, আমাদের ব্যবহার অপরকে মনঃপীড়া দিতে পারে না। কিন্তু এমনই আমাদের সংসর্গজ সংস্কার, আমাদের 'অহম্' এমনই দুষ্ট ভাবের আবরণে কঠিন যে, তাহা সহজে ঘটে না। আমার গতির সঙ্গে বাহ্য বিষয়ের আপোষ করিতে মনকে লইয়া আমি এমনই ব্যস্ত এবং সমাহিত যে সে কঠিন আবরণ মুক্ত করা আরও কঠিন হইয়া পড়ে।

দুইটি পঙক্তি গান করিয়া থামিলেন। আমি বলিলাম: চলুক না, থামিলেন কেন? তিনি বলিলেন: ঐটুকুই যথেষ্ট, আর বেশীতে কাজ কি? তখন আমি বলিলাম: কেন বলুন দেখি আপনি দু'লাইনের বেশী গান করেন না? এই একটু আগে কেমন সুন্দর একটি গান ধরলেন, কি চমৎকার তার ভাব, কিন্তু ঐ দু'লাইন—তার পর চুপচাপ। কেন? সবটা গাইলে ক্ষতি কি?

তিনি একটু হাসিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন: আসল গান ত ঐটুকুই। গানের আসল কথাটা ত ঐ দুটি পঙক্তিতেই বলা হয়ে গেছে, তার পর যা, তা ত কেবল কথার ঝুড়ি, কবির রচনা আর বুদ্ধির কারিগরী। কথার গাঁথুনী বা বাঁধুনী দিয়ে আসল ঐ দু'লাইনের ব্যাপারকেই ফলাও ব্যাখ্যা করা হয়েচে ভাবের সামঞ্জস্য বজায় রেখে—সেগুলো না থাকলেও হত—কোন ক্ষতি ছিল না। ভেবে দেখ না দাদা, ঠিক কি না। কেবল,—

আমি বলিলাম: তা বোধ হয় অনেক সময়েই ঠিক বটে, তবে প্রথম দু'লাইনেই ত আসল ভবের সবটুক্ প্রকাশ হয় না, কাজেই পরবর্তী কথায় সেইটা—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: আরে দাদা ভাই—ও টেনে বাড়ানো হয় মাত্র,—আমার মনে হয় বাড়াতে গিয়ে ফল ভাল হয় না যদিও পোঁ ধরা হয়। আত্মচৈতন্যের প্রেরণা যেটি তা প্রথমটুকুতেই থাকে, তার পর কবির যেমন শক্তি আছে আবার সেই শক্তির ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারও ত আছে। আত্মার মধ্যে থেকে

যে একটি ভাবরসের প্রকাশ হয়, বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষণস্থির প্রকাশ, তাই হয় প্রেরণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পড়লে। প্রথমে যখন সেই প্রেরণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পড়েই একটি রূপ পায়, কবি তখন সেই অনুভূতি তাঁর সংস্কারগত বুদ্ধি দিয়েই ধরতে যান। সংস্কারের যে পুঁজি, তার অভিব্যক্তিই ভাষা, আর ভাষার উপর কবির আধিপত্যই সকলের চেয়ে বেশী। তখন কবি ভাষাকে ধরেই তাঁর প্রেরণাকে ব্যক্ত করতে যান। সত্যের পরশ টাটকা টাটকা ভাষার প্রথম উদ্যমকে ধরেই যেটুকু ব্যক্ত হ'ল, তার ভাবরস হয় গাঢ়; তারপর মূলে যে চৈতন্যের জ্যোতি তা ক্রমে ভাষার ছাঁচে যেমন ম্লান হয়ে আসে অমনি কবি তার সংস্কারগত বুদ্ধির তাপ দিয়ে তাকে অনেকটা সতেজ রাখবার চেষ্টা করেন, তাই সেগুলি পরবর্তী লাইনের মধ্যে থেকে বিস্তৃত হয় বটে কিন্তু তাতে আর সে গভীর ভাব থাকে না। কারিগরী, ভাষার বাঁধুনী, নীতি কথা, তত্ত্বজ্ঞান এ সব পাওয়া যায় প্রচুর কিন্তু আসলটা ফুরিয়ে যায়, বড় জোর সুরকে ভাষার সঙ্গে জোড়া হয় বলে কতকটা রেশ যেন থাকে মনে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে দু'লাইনই যথেষ্ট। ভাই, কেমন? কথাগুলো মনোমত হ'ল না বুঝি?

আমি হাসিয়া বলিলাম: হবে না কেন, কথা হয়ত ঐ বটে, তবে গানকে এত বড় করা হ'ল কেন? তারও ত একটা উদ্দেশ্য আছে?

তিনি বলিলেন: হাঁ হাঁ, তা ত আছেই! অনেকক্ষণ ধরে সুরের সঙ্গে বাক্য বা শব্দ-চাতুরী ভোগ করাও ত অনেকের উদ্দেশ্য থাকে কিনা? আরে ভাই, দেখতে পাও না, যারা যে জিনিষটা ভালবাসে, তার কথা সে বেশী করে বলতে চায়, কেউ শুনুক বা না শুনুক। একটু সত্যের স্পর্শ বা আভাষ যে পেয়েছে তাকে যথাশক্তি প্রকাশ করেই তার সুখ। ভাষা দিয়ে তাকে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে যতটা বাড়াতে পারে সে চেষ্টার ত্রুটি হয় না। দুনিয়ার মানুষে বড় বেশী কথা কইতে ভালবাসে, নয় কি? কোন একটি ভাবকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করতেই ত আমাদের জীবের মরণ ঘনিয়ে আসে! সময় কাটে কিসে, কি নিয়ে থাকা যায়, বল ত ভাই, হাঃ হাঃ—

এ এক প্রকার অদ্ভুত পাগল দেখিতেছি—

আমাদের কথা বেশ চলিতেছিল—এমন সময় দেখি পথের দিকে এক অপরূপ ভৈরবী মূর্তি; প্রৌঢ়া, রক্তাম্বরধরা ধীরে ধীরে আসিতেছেন। বাউল আমার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন; তাঁহার পিছনেই পথ, তার পরেই অনেকটা উঁচুনীচু জমি, গাছপালায় পূর্ণ। তিনি দেখিতে পাইলেন না, যিনি আসিলেন তিনি একেবারেই বাউলের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অপূর্ব মূর্তিটি—দেখিলে আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষত তাঁহার চক্ষু দুটি—এমন করুণা-মাখানো চক্ষু আমি দেখি নাই। পথশ্রমে রক্তাভ মুখমণ্ডল, তাহাতে যেন জ্যোতির্ময়ী। সে মূর্তি মহাপাপিষ্ঠের প্রাণেও শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। আমি তাঁহার দিকে অবাক হইয়া চাহিলাম, বাউল বাবাজী আমার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া পিছনে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন।

আঃ—মহেশ্বরী মায়ী! বলিয়া বাউল বিস্ময়-আবেগে চীৎকার করিয়া পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। আমারও প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা হইয়াছিল, তার পর যেন ভক্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না। এখানে ঐটুকুই আমার গলদ হইয়া গেল। ভিতরে প্রশ্ন উঠিতে বিলম্ব হইল না যে, কেন আমি প্রণাম করিতে পারিলাম না।

তাহার উত্তর এই যে, ভৈরবী-সম্বন্ধে আমি যে ধারণা এতাবৎকল পোষণ করিতেছিলাম তাহা মোটেই ভক্তির অনুকূল নয়। তান্ত্রিক সাধক এবং ভৈরবীদের উচ্চ স্তরের জীবন পবিত্র বলিয়া ধারণা এখনও আমার হয় নাই।

আরও একটি গূঢ় ধারণা আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে, ভৈরবীরা এক শ্রেণীর ভ্রষ্টা নারী, সমাজে পতিতা, তান্ত্রিক সাধক ছাড়া আর কোনও সমাজে তাহাদের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। এ পর্য্যন্ত কোন ভৈরবীই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নাই। সেই কারণেই এই ভৈরবী আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না। তবে এই ভৈরবী হইতেই আমার পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিতেছি।

দীর্ঘ প্রণামান্তে বাউল বাবাজী যখন উঠিলেন তখন ভৈরবী তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার কথায় যেন পূর্ববঙ্গের একটা টান ছিল যাহাতে বুঝিলাম তিনি সম্ভবত ও-দেশেরই মানুষ হইবেন। আমার দিকে লক্ষ্যও করিলেন না। তাঁহার গলার আওয়াজ কোমল বটে কিন্তু ক্ষীণ নারীসুলভ দুর্বল কণ্ঠ নয়। প্রত্যেক শব্দগুলি দৃঢ়, স্পষ্ট এবং পরিমিত। আমার জীবনে যত নারী দেখিয়াছি, দেশে-বিদেশে কোথাও এরূপ মাধুর্য্য এবং তেজস্বিতার একত্র সমাবেশ দেখি নাই। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ভৈরবী-সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করিতেছিলাম, অন্তরের মধ্যে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি কথা কহিতে কহিতে বক্রেশ্বর মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিলেন, আর বোধ করি বাউলকেও তাঁহার মনের অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া চলিলেন! আমার মধ্যেও তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণের একটি আকর্ষণ অনুভব করিলাম, কিন্তু আপাতত সে ইচ্ছা দমন করিলাম। বাউল একবারও আমার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় স্মরণে আনিতেও পারিলেন না। ক্ষণেক পূর্বে কত মতে কত আনন্দের কথা আমার সঙ্গে তাঁহার হইতেছিল, আমার সঙ্গে যেন তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল,—সে সম্বন্ধে আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। ত্যাগী মানুষ যাঁরা, তাঁদের ত এ রকম সামাজিকতা, বাহ্য সৌজন্যের বন্ধন নাই, যা না হইলে আমাদের সভ্য-সমাজে চলে না। আমি কি মনে করিয়া বা কোন্ অধিকারে তাঁহার নিকট এটা দাবী করিতেছি তাহা নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। একটু অভিমানের ধোঁয়া উঠিয়া আমাকে যেন বেশ কতকটা পীড়িত করিল। বাঃ, এ ত বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার, আমার জড়তা ত কম নয়, উহা এতটাই আমায় পাইয়া বসিয়াছে যে প্রবাসে সাধুসঙ্গ করিতে আসিয়াও আমার তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। মনের গোলমাল ক্রমে যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বাউল ও নবাগতা মহেশ্বরীর ভৈরবী চোখের আড়াল হইবার পর উঠিব কি বসিব ভাবিতেছি,—এখন মন অনেকটা গ্লানিশূন্য বোধ হইতেছিল। পথের দিকে লক্ষ্য করিতে দেখি, আবার একজন আসিতেছেন। তিনি ভৈরব, লাল কাপড় তাঁরও, হাতে সরু ত্রিশূল আর একটি লাল কাপড়ের বুঁচকি। হন্ হন্ করিয়া সম্মুখেই আসিয়া পড়িলেন। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতেই তাঁহার মুখের দিকে দেখিতেছিলাম,—তিনিও আমার মুখের দিকে চাহিয়া তার পর একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন: মহেশ্বরী মা এদিকে গেছেন, আপনি দেখেছেন কি?

—হাঁ,—মন্দিরের দিকেই গেছেন, এইমাত্র দেখেছি।—শুনিয়া তিনিও সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

আমারও আর বসিয়া থাকিতে হইল না। অল্পক্ষণ থাকিয়া উঠিলাম। সেখান হইতে বক্রেশ্বর মন্দিরে আসিতে পথে বাঁকের মুখে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ নজরে পড়ে। দেখিলাম, তাহার তলে ছায়ায় তিনটি মূর্তি। বুঝিলাম —বাউল আছেন, মহেশ্বরী আছেন আর এই মাত্র যিনি আসিলেন তিনিও আছেন। তাঁহাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাশ কাটাইয়া মন্দিরের রাস্তা ধরিলাম।

একেবারে আপন আসনে আসিয়া পেঁছিব এই ছিল অভিপ্রায়, কিন্তু যখন তাঁহাদের অতিক্রম করিতেছি প্রথমে মহেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তার পর

তিনি বাউলের দিকে ফিরিয়া কি বলিলেন। তখন বাউল উঠিয়া আমার দিকে আসিতে আসিতে গলা উচ্চ করিয়া বলিলেন : এই যে, এদিকে আসতে হবে যে একবার,—ও ভাই! তখন ঐদিকেই ফিরিতে হইল।

গিয়া দাঁড়াইতেই মহেশ্বরী ভৈরবী বলিলেন : এইমাত্র বাউলের কাছে তোমার কথা শুনলাম, যদি বিশেষ কিছু কাজ না থাকে ত আমাদের সঙ্গে একটু বসলে ক্ষতি কি? এখানে খণ্ড ভৈরব এসেছেন, এঁকে দেখলেও পুণ্য আছে। বলিয়া সেই নবাগত ভৈরবের দিকে দেখাইয়া দিলেন। পরিহাসের ভাবে যে কথাগুলি বলিলেন তা নয়, গম্ভীর ভাবেই বলিলেন। কিন্তু খণ্ড ভৈরব তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথাটা এই বলিয়া শেষ করিলেন যে, যদি দর্শনেই পুণ্য সঞ্চয়

করতে চান, তাহলে এই মহেশ্বরী মাকে দেখলেই তা হবে; বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।

এখন এতটাই অপ্রস্তুত ছিলাম যে এ ক্ষেত্রে কি বলিব আর কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ভৈরবীর দিকে জোড় হাতে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া একধারে বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরে ভৈরবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন : পূর্বাশ্রমের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে দোষ হবে কি?

বলিলাম : আমার পূর্বাপর একই আশ্রম, গৃহত্যাগও করিনি, সন্ন্যাসও গ্রহণ করিনি। আপনি যা খুসী জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

শুনিয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য হইলেন, পরে বলিলেন : তবে? এরকম করে তোমার ফকিরের মত থাকবার উদ্দেশ্য কি? বলিলাম : সাধুসঙ্গলাভ আর কি?

তিনি সহজে ছাড়িলেন না, বলিলেন : লছমনঝোলা, হরিদ্বার, কাশী,

প্রয়াগ, নাসিক এসব বড় বড় সাধুসঙ্গের জায়গা ছেড়ে এখানে, এ রাজ্যে কেন?

তখন তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তাতে লাভ? উত্তরে বলিলাম: লোকসানের কথা আগেই খতিয়ে দেখে কি কেউ কারবার করে? লাভের কথাটা যে আগেই লোকে ধরে নেয়,—না? তার পর যা হয় তা শেষে বোঝা যায়। অন্তত এতে কিছু লোকসান হতে পারে আগে থেকে হিসেব করিনি!

তিনি বলিলেন: সেইটিই ত কাঁচা কাজ হয়েছে। পাকা বুদ্ধি যাদের তারা গোড়াতেই লাভ লোকসানটা ভাল রকম করেই খতিয়ে দেখে তবে কাজে নাবে।

—আমি ত বলেছি যে এ কাজে কোন প্রকার লোকসানের সম্ভাবনা থাকতে পারে সে ধারণা এখনও হয়নি।

তিনি: ঐটে না হওয়াতেই ত আমার বেশী ভয় হচ্চে, হয়ত লোকসানটা গুরুতর হতে পারে। অঘোরীর কাছে গিয়েছিলে ত শুনলুম,—না? স্বীকার করিয়া মাথা নাড়িলাম।

ভৈরবী বলিলেন: তিনি তোমায় এবিষয়ে কিছু বলেন নি? তাঁর সাড়া পাওনি বুঝি?

—সাড়া হয় ত একটুখানি পেয়েছিলাম, তবে তাঁকে ত ইচ্ছামত পাওয়া যায় না, তাঁর নাগাল পাওয়া মুস্কিল।

ভৈরবী বলিলেন: তা হলেই হবে, তাঁর কাছে যাওয়াটা রেখ, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। ভয় পেয়ে যেন ছেড়ে দিও না,—ছেলেমানুষ কিনা তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

—অবশ্য ভয় মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু তবুও যাই, কিন্তু গেলেই তাঁর কাছে বেশীক্ষণ থাকতে দেন না। ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন: তাঁর ধমক খাওয়া আমাদের অদৃষ্টেও খুবই ঘটে,—আমরা খুব ভালই জানি,—বলিয়া বাউল এবং খণ্ড ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া যেন জিজ্ঞাসুভাবে একটু হাসিলেন, তাঁহারাও হাসিয়া সায় দিলেন। ভৈরবী তার পর বলিলেন: উনি ইচ্ছা না করলে কেউ ওঁর কাছে বসতে পারবে না। উনি ইচ্ছাময় মহাশক্তিমান মানুষ। তবে ওঁর তাড়ানোর মধ্যেও একটি উদ্দেশ্য থাকে। ওঁর তাড়া খেলেও লাভ আছে।

বুঝিলাম,—আজই তাড়া খাইয়া মহৎ কিছু লাভ হইয়াছে। যাহা হউক শেষে তিনি বলিলেন: এই দেখ, ওঁর জন্যেই এত কষ্ট করে আমাদের আসা।

খণ্ড ভৈরব বলিলেন: ওঁর টান কারো সামলাবার সাধ্য নাই, এই দেখুন না—ওঁর টানেই আমরা কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসে পড়েছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

খণ্ড ভৈরব বলিলেন: আমরা পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরেই ছিলাম, সেখানে মায়ের একটি আশ্রম আছে; সেইখান থেকেই আপাতত আসা হচ্চে।

তার পর খণ্ড ভৈরবের কথা,—এই লোকটির সংসর্গে আসিয়া একটি মহৎ লাভ হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার কথা আরও একটু বলিব। ঐখানে বসিয়াই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন যে এখানে কতদিন থাকিব। জানাইলাম: তার ঠিক নাই, মন উঠিলেই চলিয়া যাইব। তাহাতে তিনি বলিলেন: আমরা এখানে চার দিন থাকব। অঘোরীর সঙ্গে দেখা হলে স্থির হবে—আরও আগে

যাব কি না। এখান হতে আমরা কামরূপের কামাখ্যাপীঠে যাব,—সেখানে মহেশ্বরী মার কন্যার অভিষেক হবে। আমায় আরও বলিলেন : বক্রেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে আজ রাত্রে আমাদের চক্র বসবে। আপনি ত মন্দিরেই থাকেন? যদি

আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাহলে সন্ধ্যার পর একবার অঘোরীর কাছে যাবেন, অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। আপনার এ বিষয়ে কৌতূহল আছে জেনেই বলছি।

মহেশ্বরী মাতা বলিলেন : ও'র কি সে সব ভাল লাগবে? হয়ত বিপরীত ধর্ম, অনাচার, এ সব মনে হতে পারে।

বলিলাম : আমি ঐ সকল সাধনের উদ্দেশ্য জানতে ও দেখতেই ত এসেছি —যদি তন্ত্রোক্ত সাধনের প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠান না দেখতে পাই তা হলে এখানে আসা বৃথা হয়েছে বলেই মনে করব জানবেন।

হাসিয়া খণ্ড ভৈরব বলিলেন : সেসব আপনি সহজে দেখতে পাবেন না, তবে অঘোরীর কাছে যা দেখবেন তার কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর কোন গুহ্য নাই, তিনি সিদ্ধযোগী।

॥ ২০ ॥

আশার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঙ্গে মনের মধ্যে একটু ভয়ও ছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই কেবলি নিজ স্থান হইতে বাহির হইতেছি—ইচ্ছা, এখনই চলিয়া যাই কিন্তু এতটা আগে যাইয়া কিছুই লাভ নাই ভাবিয়া আবার ভিতরে যাইয়া বসিতেছি। আসনে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। আকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন ; বাতাসও মাঝে মাঝে জোর চলিতেছে। যেন ঝড় বহিতেছে। এইরূপ জোর বাতাসের জন্যই বোধহয় বৃষ্টি নামিতে পারিতেছে না, না হইলে পৃথিবী ভাসাইত এমনই মেঘাড়ম্বর। মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতেছে। এসব দেখিয়া মনে আমার উদ্বেগের সীমা নাই। বুঝি আজ বাদল নামিয়া আমার উপর বাদ সাধে !

রাত্রি প্রথম প্রহর কোন রকমে শেষ হইবার পরেই আসন ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আর থাকা যায় না। এই আসনের রহস্য এখানে একটু বলিয়া রাখি।

যে কোন ভাবের সাধন অবস্থায় আসনের তুল্য সহায় এবং মহাবন্ধু আর নাই। যে আসনে তোমার চিত্ত স্থির হইয়া, কোনও তত্ত্বে গভীর অভিনিবেশে সহায়তা করে, তত্ত্বদর্শন যে অবস্থায় সহজ হয়, সেই আসনের গুরুত্ব কতটা তাহা কাহাকেও বুঝাইতে কষ্ট হয় না। আসন একটি জীবন্ত সহায়, তোমার প্রাণের স্পর্শেই উহা জীবন্ত, যেন পৃথকভাবেই উহার শক্তি জাগ্রত হয়। যে আসনে বসিয়া তুমি দীর্ঘকাল কোনও ব্যাপারে সংযম অভ্যাস ধ্যান এবং ধারণা করিয়া থাক,—তোমার চৈতন্যের সঙ্গে তাহার ওতপ্রোত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া যায়। তাহার সংসর্গে আসিলেই তোমার চিত্তক্ষেত্র সহজেই স্থির ও সমাহিত হইয়া, লক্ষ্যে একাগ্র হইয়া ধ্যানের পথে প্রসারিত হয়। এমনই যে আসনের গুণ তাহার গৌরব এবং পবিত্রতার কথা আর বেশী কি বলিব, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আসনই সাধকের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু। এই আসন হইতে তাহার সিদ্ধি, ঋদ্ধি, কেবল আনন্দ লাভের অবস্থা হয়। মোট কথা, সাধকের যাহা কিছু উচ্চ অবস্থা সবই এই আসনের গুণে হয়। যদি কোন বিশেষ স্থলে, বাহ্যভাবের তরঙ্গে অন্তর ক্ষেত্র চঞ্চল থাকে তবে আসনে বসিলে উহা স্থির হয়, শান্ত হয়, আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাগ্রত আসনের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটি বলিবার জন্যই এতটা কথা প্রথমে বলা,—সেটি এই যে, যদি কোনও উৎকট আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে থাকে, যাহা কর্ম ব্যতীত কখনই শান্ত হইবার নয়, তবে, সেই অবস্থায় তোমার আসন কিছুতেই তোমায় তাহার উপর স্থির হইতে দিবে না, অর্থাৎ তোমার আত্ম-চৈতন্য সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য মনকে নিরন্তর স্থানান্তরে,

কর্মান্তরে যাইতে প্রবৃত্ত করিবে। যতক্ষণ না তাহার শেষ হয় ততক্ষণ কিছুতেই তুমি আর আসনে বসিয়া শান্ত হইতে পারিবে না। ঠিক এই কারণেই আজ আমি আসনে স্থির হইতে পারিতেছিলাম না, কেবলই শ্মশানক্ষেত্রে ভৈরবীচক্র দেখিতে প্রাণ ছুটিতেছে। আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যতবার মনকে বাহ্য বিষয় হইতে কুড়াইয়া নিজ ভাবে আনিবার চেষ্টা করিতেছি ততবারই তাহা নিষ্ফল হইতেছে, কাজেই এখন প্রবৃত্তির গতি ধরিয়াই চলিতে হইল, নিরুপায় হইয়াই বাহির হইলাম।

আন্দাজ রাত্র প্রথম প্রহর এখন সবে উত্তীর্ণ হইয়াছে বা হয় নাই, ভাবিলাম এখন শ্মশানে ত যাইব না, কালীবাড়িতে পুণ্ডরীকের কাছে গিয়া কতক্ষণ কাটাইয়া দিব, পরে গুটি-গুটি শ্মশানের দিকে যাওয়া যাইবে।

শ্মশানের দিকে চাহিতে-চাহিতে কালীবাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম সেথায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার। দূরে অঘোরীর কুটীরও অন্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে, কোথাও আলোর ফোঁটাটি মাত্র নাই। দেখিতে দেখিতে কালীবাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুণ্ডরীক একটি হ্যারিকেনের সম্মুখে খাতা পত্র লইয়া বসিয়া আছে, হাতে নস্যাধার একটি শামুক। আমাকে দেখিয়া নস্যদানীটি আগাইয়া দিয়া বলিল: আজ এত রাত্রে এখানে কি মনে করে,—হঠাৎ এমন ভাবে আবির্ভাবের কারণটা কি, জানতে পারি?

আমি বলিলাম: এত রাত্রি কোথায়? এখনও যে প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়নি, —আচ্ছা, আজ তোমাদের শ্মশানে কোন সাড়া শব্দ নাই কেন বল দেখি?

পুণ্ডরীক আপন কাজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল: আজ যে সেখানে খুব ধুম লেগেছে,—খানিক আগে সিদ্ধ করালী তাঁর ভৈরবী নিয়ে গেলেন,—বিকালে মহেশ্বরী মা এসেছেন, খণ্ড ভৈরব এসেছেন, আরও কে কে এসেছেন—সকলকে ত জানি না। আজ যে অঘোরী বাবার দরবারে চক্র বসেছে।— মহা উৎসবের ব্যাপার!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: উৎসবে এত অন্ধকার কেন?

পুণ্ডরীক: জানেন ত, তান্ত্রিকদের ইষ্টগোষ্ঠী অন্ধকারেই হয়ে থাকে। ওদের সবই ত গুহ্য ব্যাপার।

আরও একটু জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা তুমি কি কখনও কোন চক্রে উপস্থিত ছিলে?

পুণ্ডরীক: না, বাইরে থেকেই যা কিছু শুনেছি, চক্রের মধ্যে কখনও ঢুকি নি। আমার ভালই লাগে না ওসব। ওদের ভণ্ডামো, যথেচ্ছাচার আমার ভাল লাগে না। ওরা আবার কি ক'রে যে ওই সব কর্মগুলোকে ধর্ম বলে তা বুঝতে পারি না। ওদের সবই বজ্জাতি। মেয়েমানুষ নিয়ে আবার ধর্ম কর্ম সাধনা। ছি—

—আচ্ছা, অঘোরীকে কি মনে হয় তোমার?

—ঐ লোকটার কথা আলাদা।

—অঘোরীর আবার তন্ত্রের মধ্যে যাওয়া কেন বল দেখি? আমি ত বুঝতে পারি না কেন তিনি তান্ত্রিকদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা রাখেন।

—আমি শুনেছি যে উনি তন্ত্রের সাধনেই সিদ্ধ হয়েছেন। এখন উনি

কোন একটি বিশেষ ভাবের সাধনে বদ্ধ নন। ওঁর অবস্থা এখন খুবই উচ্চ একথা ত সকলেই বলে। আমি মোটে এই ত এখানে মাস দুয়েক এসেছি, এক ভাবেই ওঁকে দেখছি। কিন্তু কখনও ওঁর কাছে গিয়ে সাহস করে বসতে পারলুম না।

—কেন বল দেখি?

—কেমন একটা ভয় আসে। একবার প্রথম-প্রথম একটু ভরসা করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। একখানা কাঠ নিয়ে এমন তাড়া করলেন,—দে ছুট্। আর সেই থেকে কাছে যাবার চেষ্টা করি নি, দূর থেকেই নমস্কার করি। তবে আমাদের বোদে পাগলা (বৈদ্যনাথ) ওঁর খুব ভক্ত। তার কাছ থেকেই ওঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই।

এখানেও আর কতক্ষণ থাকা যায়?—আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। সুতরাং পুণ্ডরীকাক্ষ যখন বলিল,—আপনি এখন এইখানেই থাকবেন কি? —ঘুমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে—তখন আমি সুযোগ বুঝিয়া সেখান হইতে উঠিলাম। পুণ্ডরীকাক্ষ তৎক্ষণাৎ মশারী খাটাইল।

বাহিরে আসিয়া আমি শ্মশানের পথ ধরিলাম। গাঢ় অন্ধকার, কোলের মানুষও বুঝি দেখা যায় না। মাঝে মাঝে চিক্কুর হানিতেছে,—একে রাত্রি তাহাতে আকাশ কালো, একটিও তারা নাই। পাপহরা পার হইয়া শ্মশানে যখন পা দিলাম তখন গা-টা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। ভিতরে একটু ভয় যে হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। চলিতে লাগিলাম,—অঘোরীর ঘর পানেই যাইতেছি,—দূরে যেন মৃদু-মৃদু মানুষের গলার আওয়াজ পাইলাম। অঘোরীর ঘর অবধিও যাইতে হইল না, মধ্যপথে দেখিলাম,—কতকটা জমি জুড়িয়া সারি-সারি কয়েকটি মূর্তি বসিয়া আছে। ছয় সাত জন হইবে। কাহাকেও ত চিনিবার জো নাই, তবে তাঁহারা যে চক্রাকারে বসিয়া আছেন তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। মানুষ দেখিয়া অন্তরের সঙ্কোচ বা ভয় আর কিছুমাত্র রহিল না। তাহার পরিবর্তে সাহস এবং হৃদয়ে বল আসিয়া আমাকে শক্তিমান করিয়া দিল। এখন, আমি কি ভাবে এখানে স্থান করিয়া লইব তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। আমি যে সেখানে একজন বাহিরের লোক, গোপনে আসিয়াছি, —তাহা ত ভুলিবার নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, যাঁহারা বসিয়া-ছিলেন, আমার উপস্থিতির ব্যাপারটি তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিলেন কি না তাহা বুঝিতে পারিলাম না, বা তাঁহারাও লক্ষণে কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। আমি তাহাতে প্রথমে একটু বিমনা হইলেও শেষে সাহস পাইলাম। কিন্তু কোথায় যে আমার স্থান করিয়া লইব সেটা ভাবিতেও কতকটা সময় গেল। আমি বুঝিলাম, এই নির্বাক সাধকের দলে আমি কোন বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করি নাই। তাঁহাদের চক্র হইতে সাত আট হাত দূরে একটু উচ্চ স্থান দেখিয়া ছোট-ছোট কতকগুলি গাছের ধারে নিজ স্থান ঠিক করিয়া লইলাম এবং নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। যখন আমি বসিলাম—দেখিলাম, অঘোরীর ঘরের দিক হইতে একটি ভারি জিনিস দুই হাতে ধরিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে আসিয়া স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকাইল, তাহাতে সে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে এক স্থানে তাহার হস্তধৃত ভারি সামগ্রীটি নামাইয়া রাখিল। সেই ক্ষণপ্রভার আলোতে দেখিলাম চক্রের স্থানটি পরিষ্কৃত, যেন কেহ পূর্বেই

উহা সযত্নে মার্জিত করিয়া রাখিয়াছে। একটা ধুনুচিতে ধুনো ধূপ ও ধুনার গন্ধ বাহির হইতেছে। চক্রের মধ্যে অঘোরী বাবা নাই। যিনি অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সে ব্যক্তি অপর কেহ নয় আমাদের ভুলো ডোম, মদের কলস অর্থাৎ কারণপাত্র আনিয়াছে। সে এই বিদ্যুতের আলোকে একটি স্থান ঠিক করিয়া উহা নামাইয়া রাখিল এবং কিছু দূরে গিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই বিদ্যুৎ-জ্যোতির সুযোগে আমি যেমন উপস্থিত এখানকার সকলকে অস্পষ্টভাবে দেখিলাম, তাঁরাও আমার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেন কি না তাহা কিন্তু বুঝা গেল না। সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস চালাইতেছে, তাহার গোঁ গোঁ শব্দ এই শ্মশানক্ষেত্রের সঙ্গে খুব সুন্দর খাপ খাইয়া স্থান-মাহাত্ম্য বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা যে অলসভাবেই বসিয়া আছেন তাহা ঠিক নয়,—আমার বোধ হইল তাঁহারা স্থির আসনে কোনও কর্মে রত আছেন। সে কর্মটি জপ। অনুমান করিলাম যে, আসনে কর্ম আরম্ভ এই মাত্র হইয়াছে। অঘোরী বাবারই অভাব, তিনি কোথায়? এখানে সকলেই কর্মী, কেবলমাত্র আমিই দ্রষ্টা।

অন্ধকারে ক্রমশ একটু একটু নজর হইতে লাগিল, অবশ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার ছাড়া মোটামুটি এক রকম দেখা যাইতেছে। দেখিতেছি—আমার সম্মুখে, অবশ্য প্রায় দশ বারো হাত দূরে—খণ্ড ভৈরব, বামে মহেশ্বরী মাতা ভৈরবী, তাঁর পাশে সহজিয়া বাবাজী কতকটা তফাতে বসিয়াছেন। প্রায় দুই তিন হাত পরে সিদ্ধ করালীর আসন, বামে তাঁর নবীনা ভৈরবী, তাঁর পাশে অনেক কিছু উপকরণ সম্ভার, তাহার মধ্যে ভুলোর আনীত কারণ-কলসটিও রাখা আছে। তার পর কতকটা স্থান ফাঁকা, আসন পাতা আছে বটে কিন্তু শূন্য। তার পর একজন অপরিচিত ভৈরব ও তাঁহার ভৈরবী,—তার পর একটু তফাতে ভুলো বসিয়াছে। উবু হইয়া হাত দুটি ধরা। এই ভাবে চক্র বসিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে এক একটি কপালমাত্র এবং এক একটি তাম্রকুণ্ড রাখা আছে বোধ হইল।

আমি আসিবার পর প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে। এই সময়টুকুতে স্থান-মাহাত্ম্যের অনুভূতি বেশ স্পষ্টতর হইতেছে। বিশেষত যখন বাতাসের বেগ একটু কম হইতেছে অথবা একেবারেই বন্ধ হইতেছে, পালে-পালে মশা আসিয়া সর্বাঙ্গে আক্রমণ করিতেছে, তখনই এটি বিশেষভাবেই জানাইয়া দিতেছে। কি জানি কেমন করিয়া ইঁহারা স্থির আছেন। যাহা হউক ক্রমে দেখিলাম একদিক হইতে একটি বিরাট মূর্তি আসিয়া তখন ভুলোর কাছে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভুলোও দাঁড়াইল। আসনস্থ ভৈরব ভৈরবীগণ নিজ নিজ স্থান হইতে মস্তক নত করিলেন। ভুলো দণ্ডবৎ হইল। আমার বুকটি ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল। অঘোরী বাবা আসিলেন,—আমার উপস্থিতি তাঁহার নিকট কি ভাবে গৃহীত হইবে! আমায় রাখিবেন কিম্বা তাড়াইবেন, সেই ভয়ে ও উদ্বেগে মরিতে লাগিলাম। কেমন করিয়া এখানে শেষ অবধি স্থান পাইব, বা সব কিছু দেখিতে পাইব। ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছায় সংকুচিত হইতে লাগিলাম,—এমনই সময়ে আবার বিজলী হানিল। আমার সম্মুখে প্রায় বুক অবধি একটি ছোট ঝোপ, বুঝিতে পারিলাম না ঠিক

আমায় তিনি দেখিলেন কি না! কিন্তু আমি তাঁহার যে মূর্তি দেখিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। শরীরটি তাঁর মস্ত, উলঙ্গ, সম্পূর্ণই দিগম্বর। মুখমণ্ডল শান্ত, অপলক নেত্র। একখানা পুলবাঘের ছাল সেই শূন্য আসনে পাতা ছিল, বাউল বাবাজী উঠিয়া তাঁহার হাতটি ধরিয়া সেই দিকে ধীরে ধীরে লইয়া গেলেন এবং আসনে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তখন আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। পূর্বে বিশেষ লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম, সকলের গায়েই একখানি রক্তাম্বর জড়ানো, বোধ হয় মশার জন্যই,—না হইলে বাকী সকলেই উলঙ্গ।

অঘোরী যখন আসনে দাঁড়াইলেন তখন মহেশ্বরী মাতা গায়ের বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া হাতে উপকরণপূর্ণ একটি পাত্র লইয়া অঘোরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে পাত্রটি নীচে রাখিয়া প্রথমে প্রণাম এবং তার পর পাত্র হইতে কিছু উপকরণ তুলিয়া পাদপূজা করিলেন। অনুমানেই এ সব বুঝিলাম, উপকরণ প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। বরণের মতই একটি অনুষ্ঠান হইল এটুকু মাত্র বুঝা গেল। যাঁহাকে বরণ করা হইল তিনি অচলের মতই স্থির নির্বিকার। চারিদিক নিস্তব্ধ, অনির্বচনীয় গাম্ভীর্য্য সেথায় বিরাজিত। যাহা হউক বরণের কাজটি হইয়া গেলে অস্ফুট স্বরে ভৈরবী কি একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার মধ্যে পিতৃ-সম্বোধনটি মাত্র শুনিলাম। তাহাতে অঘোরী আসনেই বসিলেন। তার পর, এইবার ভৈরবী অঘোরীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, স্থির পুত্তলিকার মতই অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এখন অনেকটাই নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয় আছে যদি হঠাৎ অন্য কারণ উপস্থিত হয় যাহাতে আমাকে তাড়িত হইতে হয়। যেহেতু আমি তাঁহার ঠিক পশ্চাতেই রহিয়াছি—মধ্যে কতটা ব্যবধান।

যাহা হউক আমি দেখিতে লাগিলাম,—অঘোরী পাত্র-মধ্য হইতে উপকরণ লইয়া প্রথমে ভৈরবীর চরণপূজা করিলেন, তার পর মধ্যদেশে, তার পর বক্ষে, পরে কণ্ঠে, ললাটে স্পর্শ করিয়া পূজা চলিতে লাগিল। ভৈরবী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, অঘোরী তাঁহাকে পূজা করিলেন। তারপর (এমন সময় আর একবার বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল) দেখিলাম, তিনি পার্শ্বস্থ আধার হইতে, খুব সম্ভব চন্দন হইবে,—হস্তে লইলেন এবং প্রথমে চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যদেশে, পরে হৃদয়ে শেষে ললাট পর্য্যন্ত অনুলেপন করিলেন। তার পর তিনি স্থির হইয়া নিজ আসনে কতক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন।

যতক্ষণ তিনি স্থির রহিলেন ততক্ষণ আর কাহারও কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখা গেল না, সকলেই এই ভাবেই স্থির হইয়া রহিলেন—এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল। আশ্চর্য্য এইটুকু দেখিলাম, গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও মশক-দংশনে মধ্যে মধ্যে আমাকে নিতান্তই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, অঘোরী বা মহেশ্বরী ইঁহারা ত সম্পূর্ণই উলঙ্গ ছিলেন, কিন্তু শ্মশানের এই ভয়ঙ্কর মশক-দংশনের জ্বালা যে তাঁহারা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হইল না! আমার গায়ে মশা, যেটুকু ফাঁক পাইতেছে তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে জ্বালাইয়া মারিতেছে। কিন্তু আমার সম্মুখেই দুটি মূর্তি রহিয়াছে, তাহাদের কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। দুটি প্রস্তর মূর্তির মতই ইঁহারা স্থির হইয়া আছেন। অল্পক্ষণ নয়, অনেকক্ষণই নিজ ভাবে সমাহিত। ইহা কি বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার নয়? ইহা সত্য যে মন্ত্র স্থানে সাধনের এই

মহা বিঘ্ন, এই মশকের দৌরাত্ম্যে আমার ওখানে বসাই অসম্ভব হইত যদি-না পবনদেব মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাবে তাহাদের তাড়না না করিতেন। প্রথম শত্রু মশা, তার পর শেষের দিকে পিপীলিকার উৎপাতও কম হয় নাই। তাহারা বাহির হইতে কাপড়ের উপর, আবার কেহ ভিতরে প্রবেশ করিয়া কামড়ের উপর কামড়ে জর্জরিত করিতে লাগিল। আমায় অম্লানবদনে সব-কিছুই সহ্য করিতে হইল, যতক্ষণ না আমি সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিলাম। যাহা হউক অনেকক্ষণ পর কিন্তু আমি ক্রমশ শরীরের অনুভূতি হারাইতে লাগিলাম। যদিও আমার কোনও আসন ছিল না তথাপি আমি অল্প-পরিসর তৃণ-আচ্ছাদিত সমতল স্থান পাইয়াছিলাম।

এইবার বুঝিতে পারিলাম কেমন করিয়া সাধকেরা এই সব মশা-কামড়ের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সফল করেন। তোমার চৈতন্য যতক্ষণ দেহগত ততক্ষণই দেহের দুঃখ ও সুখের বোধ স্পষ্ট, জীবন্ত থাকিবে, যদি ঐ চৈতন্যকে কোনও একটি অন্তরা দেহাতিরিক্ত বিষয়ে সমাহিত করিতে পার তাহা হইলেই দেহের সকল আপদ চুকিবে ; দেহের কোন প্রকার অস্বস্তি অনুভব হইবে না।

ঐখানকার ব্যাপারে অঘোরীর তন্ময়তার উপর আমার ঐকান্তিক লক্ষ্য থাকায়, তাঁর অনুগ্রহেই খুব সম্ভব আমার দেহবোধ আর রহিল না, অনেক কিছুই হজম করিবার শক্তি লাভ করিলাম।

যাহা হউক আমি এখন নির্বিঘ্নে দেখিতে লাগিলাম। অঘোরী অনেকক্ষণ পর দু'বাহু প্রসারিত করিলেন এবং ভৈরবীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কোলে বসাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। দৃশ্যটি হইল ঠিক হরপার্বতী ছবির মত—অপূর্ব। এই অন্ধকারের মধ্যে পবিত্র এবং মধুর ভাব-রসের এ চিত্রটি সকলের প্রাণে একটি নিষ্কাম, শুদ্ধ এবং স্থির সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাব বিস্তার করিল। তার পর অঘোরী এবং ভৈরবী ব্যতীত সকলেই সমস্বরে কয় ছত্র মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। তার পর খণ্ড ভৈরব যেখানে ভুলো বসিয়াছিল তাহার দিকে ফিরিয়া তাহাকে কিছু বলিলেন। সে ব্যক্তি উঠিয়া সেই কারণের কলসটি আনিয়া অঘোরীর সম্মুখে রক্ষা করিল। কিন্তু তাঁহার বাহ্য চৈতন্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কোলে ভৈরবীকে লওয়া অবধি আমি একলক্ষ্যে তাঁহার দিকেই চাহিয়াছিলাম, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম না, ভৈরবীরও সেই অবস্থা।

কিন্তু আর ত কাহারও সে অবস্থা নয়। কাজেই তাঁহারা অনেকক্ষণই অপেক্ষা করিলেন, তার পর খণ্ড ভৈরব আর-আর সকলের অনুমতি লইয়া যন্ত্রের মধ্যেই কারণ শোধন করিয়া ভৈরবী ও অঘোরীর প্রতি উৎসর্গ করিলেন। আশ্চর্য্য, এই চক্রের অন্যান্য সাধকবৃন্দ তখন কপালপাত্রস্থ কারণ অঘোরীর মুখের কাছে ধরিলেন। অল্প কিছুক্ষণ ধরিয়াও তাঁহার বাহ্য জ্ঞানের কোন চিহ্ন না দেখিয়া মৃদুস্বরে কানের কাছে কিছু বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন। আমি ইহা দূষ্য মনে করিলাম। আমার ধারণা এইরূপ হইল যে তিনি যে-আনন্দ উপভোগ করিতেছেন অন্তরক্ষেত্রে, এই কারণ তাহার কাছে কিছুই নয়, সুতরাং এইরূপ আনন্দময় অবস্থায় তাঁহাকে উপাসনার মাত্র বাহ্য নিয়ম রক্ষার জন্য বিরক্ত করা কি ন্যায়ানুগ কর্ম ?—কিন্তু চক্রমধ্যে আর কাহারও ত সে অবস্থা হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে মদের নেশার আকর্ষণটি কিছু বেশী, এমন

কি অধৈর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। বাউল বাবাজী কেবল ইঁহাদের মধ্যে অচঞ্চল আছেন।

যাহা হউক ক্রমে অঘোরীর বাহ্য চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল। তিনি নিজ হস্তে পাত্র লইলেন, ভৈরবীর মুখের নিকট ধরিলেন, তার পর নিজে পান করিলেন। এটি হইল নিয়ম-রক্ষা।

এইবার সিদ্ধ করালী ভৈরবের পালা। তাঁহার ভৈরবীও গায়ের আচ্ছাদন ত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে করালী ভৈরব তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা, গন্ধানুলেপন শেষ হইলে সেইমত ধ্যান চলিল প্রায় আধ ঘণ্টা। কেন বলিতে পারি না, সম্ভবত মশার তাড়নায় হইবে—ভৈরবী মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। তার পর ধ্যানশেষে ভৈরব ভৈরবীকে কোলে লইয়া বসিলেন। কারণ-পাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈরবীকে কতকটা পান করাইয়া নিজে অবশিষ্টাংশ পান করিলেন। আমার পরিচিতের মধ্যে বাউল বাবাজী দেখিলাম কারণ-পাত্র হইতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ললাটে ধারণ করিলেন। পান করিলেন না বা তাঁহার পৃথক পাত্রও ছিল না। তার পর অপরিচিত ভৈরব ভৈরবীর সেইমত পূজা, ধ্যান, গন্ধানু-লেপন, শেষে কারণ পান চলিল। শেষে ভুলো হাত বাড়াইয়া কারণ-প্রসাদ গ্রহণ করিল তাহাও দেখিলাম। তিন তিনবার কারণ-পাত্র সেই চক্র প্রদক্ষিণ করিল। শেষে কলসটি অঘোরীর সম্মুখে ধরা হইল। তখন তিনি উহার কানা এক হস্তে ধারণ করিয়া গলায় ঢালিতে সুরু করিলেন, এবং সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইলে তখন রাখিয়া দিলেন।

তার পর অন্য পাত্র আসিল। খুব সম্ভব মৎস্য মাংসাদি আহার চলিল। ভোজনের পদ্ধতি অপূর্ব। প্রত্যেক ভৈরব ভৈরবীর মুখে প্রথমে আহার তুলিয়া দিলেন, তার পর ভৈরবী আবার ভৈরবের মুখে তুলিয়া দিলেন ; সেই ক্ষেত্রে খাওয়ার ব্যাপারে যে আনন্দ চলিতে লাগিল তাহা আর বলিবার নয়। আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

॥ ২১ ॥

একটা মত্ততা আসিয়া সকলকেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে দেখিতেছি। এই মত্ত অবস্থাতেই মুদ্রার প্রক্রিয়া চলিতেছে। কেবল নড়াচড়াটুকুই দেখিতে পাইতেছি, বিশেষ কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। কেবল বাউল বাবাজী, অঘোরী ও মহেশ্বরী ভৈরবীর স্বতন্ত্র অবস্থা। কারণ—পূজার পর হইতেই সেই যে ভৈরবী অঘোরীর কোলে বসিয়া আছেন,—তার পর মৎস্য মাংসাদি গ্রহণ, ভোজন পূর্ণমাত্রায় চক্রের মধ্যে চলিয়াছে, স্ফূর্তির মধ্যে ক্রমে চাঞ্চল্য, একটি উন্মাদনার ভাব অন্যান্য সকলের মধ্যে দেখা যাইতেছে, কিন্তু এ সকলের মধ্যে তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তাঁরা সুসংযত, নির্বিকার, স্থির এবং আত্মস্থ। যেন একটি প্রস্তরনির্মিত হর-পার্বতী,—এই বিগ্রহের সম্মুখে, আসবপানে উন্মত্ত কয়েকজন মানুষ ভোগের বিষয় লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। কাহারও সেই অপূর্ব সমাহিত মূর্তির দিকে লক্ষ্য নাই, নিজ নিজ বিষয় লইয়াই সকলে উন্মত্ত। এমন সময় হঠাৎ একবার চিক্কুরের চিকিমিকির আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষণেকের জ্যোতিই, একীভূত ঐ দেবমূর্তি দুটিকে যেন বিশেষরূপেই

প্রকট করিয়া দিল, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহার ফলও হইল অপ্রত্যাশিত রূপে চমৎকার। উলঙ্গ ভৈরব ভৈরবীগণের পান ভোজনের উল্লাস, কে জানে উহার গতি কোন্ দিকে ছিল,—ঐ পবিত্র যুগল মূর্তির প্রতি লক্ষ্যমাত্রেই সঙ্গে সঙ্গে সকলের চাঞ্চল্য কোথায় মিলাইয়া গেল এবং সকলের দৃষ্টি ঐ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। ফলে তাঁহাদের দেহও যেন স্পন্দনরহিত, এরূপ বোধ হইল। আসরের স্ফূর্তি, উত্তেজনা ত সকলের অন্তর হইতে নিভিয়া গেলই পরন্তু সকলেই যেন প্রস্তর মূর্তির অবস্থা পাইলেন। স্থির, শান্ত এবং সমাহিত।

কি অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়া গেল এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে। তবে উহা বহুক্ষণ রহিল না। ক্রমে দেখিলাম, অঘোরীর বাহ্যজ্ঞান হইল, তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তটি ভৈরবীর দেহ হইতে সরাইয়া প্রথমে মাটিতে, পরে আবার নিজ জানুতে রাখিলেন—মহেশ্বরী তখনও স্থির। তার পর তিনি আবার কিছুক্ষণের জন্য স্থির রহিলেন। এদিকে চক্রের অন্যান্য সকলে এতক্ষণ তাঁহাদের দিকে বোধ হয় স্থির অপলক দৃষ্টিতেই চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার এই হাতটি নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই যেন বাহ্যজ্ঞান হইল। তাঁহাদের মধ্যে যেন সাড়া দেখিলাম।

বাউল বাবাজির কথা একটু বলিব। তিনি ত মদ্য স্পর্শমাত্র করিলেন,—কিন্তু মাংস মৎস্যাদি যে কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে যখন সকলকে চঞ্চল, মদ্য পানের ফলে মত্ত ও বিহ্বল দেখিয়াছি তখন তিনি স্থির শান্তই ছিলেন। তিনি ভিন্ন মার্গের সাধক, কেন যে এ দলে যোগ দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে কথা পরেই বলিব।

এখানে তিনি আর ভুলো এই দু'জন মাত্র ভৈরবী-বিহীন,—আর ত সকলের পাশেই ভৈরবী দেখিতেছি। প্রসাদ, সকল রকমই ভুলো পাইল, সকলের সঙ্গে সমান ভাবেই নিজ অংশ গ্রহণ করিল, এ হিসাবে তান্ত্রিকদের কস্মোপলিটন্ বলা যাইতে পারে। উদার ভাবেই তাঁরা সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেন। শিবের সংস্পর্শে যত কিছু কর্মের উদ্ভব হইয়াছে সকলগুলিই উদার, সর্বপ্রকার জাতি ও সমাজগত সঙ্কীর্ণতা-শূন্য। এ ব্যাপারটা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্থানান্তরে উহার আলোচনা করিব।

এখন এই বাবাজির কথা যাহা বলিতেছিলাম,—এদিকে যখন সকলে কারণ-প্রভাবে সুখোল্লাসে উন্মত্ত, তখন আমি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিতেছিলাম, বাউল বাবাজী নিজ আসনে স্থির হইয়াই বসিয়াছিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে বামে ও দক্ষিণে একটু হেলিতে লাগিলেন, তার পর রীতিমত বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুই পার্শ্বে দুলিতে লাগিলেন। আর কোনও ভাব নাই, কেবল তাহাই চলিতে লাগিল যতক্ষণ না উপরি উক্ত ব্যাপারটি সম্পন্ন হইল। যখন অঘোরী মহেশ্বরীকে কোলে লইয়া স্থিরসুখাসনে আসীন, অন্যান্য ভৈরব ভৈরবী মৎস্য মাংসাদি ভোজনের পর মুদ্রা প্রক্রিয়ায় মত্ত, তখনও সারাক্ষণ বাউল বাবাজী সুখাসনে ঐরূপ দুলিতেছিলেন. তার পর বিদ্যুৎ চমকের ফলে সকলের অঘোরীকে লক্ষ্য এবং স্থির হইয়া কতক্ষণের জন্য তন্ময় ভাবে স্থিতি, তার পর বিচ্যুতি পর্যন্ত বাউল বাবাজীর দোল খাওয়া চলিতেছিল, শেষে এখন তিনি একেবারে স্থির হইয়া গেলেন, আর নড়াচড়া

—কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান নাই। মেরুদণ্ড একেবারেই সোজা, নিস্পন্দ শরীর, তিনি এইভাবে অনেকক্ষণ ছিলেন।

আমার মনের অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে। আমি যে তান্ত্রিকদের সাধন দেখিতে আসিয়াছি তাহা আর আমার মনে নাই। আমি কি দেখিতেছি বোধ হয় আমার সে জ্ঞানও এক একবার লোপ পাইতে লাগিল। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনার ফলেই কেমন যেন স্মৃতি লোপ পাইতে লাগিল। মনে কর ঘোর অন্ধকার, মেঘাবৃত আকাশে একটিও তারার বিন্দু দেখা যাইতেছে না, কোন প্রকার আলোকের সংশ্রব নাই, তথাপি আমি মানুষগুলির নড়া-চড়া দেখিতে পাইতেছি। দুটি চক্ষুর কতটা শক্তি অতিরিক্ত অপচয় হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে সঙ্গে যদিও কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম তাহারও ফল এমন কিছু হয় নাই। দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ অন্ধকার করিয়া আরও খানিকক্ষণ অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়। তার পর আবার সেই অন্ধকারের প্রভা চক্ষুতে অভ্যস্ত হইতে আরও কতক্ষণ চলিয়া যায়। যাহা হউক, এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। প্রথম হইতে আমি এ চক্রের মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা অবধি দেখিলাম। মুদ্রার মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু বাহ্য কর্মেন্দ্রিয়াদির প্রেরণা দেখিয়া আমার ধারণা হইল, মুদ্রা প্রকরণ মৈথুনের পূর্বাবস্থা। নানা ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা। তাহার মধ্যে প্রথমে শিবপূজায় ব্যবহৃত কতকগুলি পরিচিত মুদ্রাও আছে। আমার তখনকার মনের অবস্থায়, সেগুলির খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য করিতেও পারি নাই বা বিশেষ আকর্ষণও অনুভব করি নাই। সে বিষয়ে আমার মনোযোগী না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, চক্রমধ্যে যখন মুদ্র-প্রকরণ অনুষ্ঠিত হইতেছিল আমার মন তখন অধিকাংশ কালই অঘোরীর প্রতি নিবিষ্ট ছিল। তবে তাহার মধ্যেও যেটুকু দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

সুস্থ শরীর, সুস্থ মন যেমন পূর্ণ যৌবনের স্বাভাবিক পরিণতি, এই মুদ্রা-প্রকরণও সেইরূপ যৌন-ক্রিয়ার সহজাত পূর্ব সংস্কার। মদ্য, মাংস, মৎস্য ইত্যাদির পঞ্চ-মকার সাধনের পূর্ণ পরিণত অবস্থাই মুদ্রা সাধনের অবস্থা। স্ত্রী-পুরুষের সান্নিধ্য বশত উভয়েরই শরীর মন স্ফূর্তিতে যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠে তখনই মুদ্রার অবস্থা। এই মুদ্রার মধ্যে অশেষ সংযমের মধ্য দিয়া মৈথুনের সঙ্কেত বর্তমান। মদ্য মাংসাদির প্রভাবে শরীরের স্ফূর্তি পূর্ণ অনুভূত হইলেই যে তখনই মৈথুনের ইচ্ছায় কর্মে নিবিষ্ট হইতে হইবে তাহা নয়। ঐ মুদ্রাপথেই সংযমের দৃঢ় অনুষ্ঠানের সঙ্গে—শেষে মৈথুনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নির্দেশ।

যাহা হউক, অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ফলেই বোধ হয় এক্ষেত্রে সংজ্ঞা লোপ পাইতে লাগিল। আলস্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই, বা ইহা নিদ্রার পূর্বাভাষও নয়, তন্দ্রাও নয়। তখনকার দিনে রাত্র জাগরণ আমার পক্ষে সহজ ছিল। কাজেই এখনকার এই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন অবস্থা, তার অন্য কারণ থাকিতে পারে, অন্তত ইহাই তখন মনে হইতেছিল। কিছুতেই আর চৈতন্যকে জাগ্রত রাখিতে পারিতেছি না। এ কি হইল আমার! নিজ স্থানেই ঠিক বসিয়া আছি, শরীর স্থির অবিচলিত রহিয়াছে। এমনই সময়ে ঠিক মনে আছে, একবার একটা খুব জোর বিদ্যুতের তীক্ষ্ম আলোর সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতি, সংজ্ঞা লোপ পাইল।

অবশ্য সেই আলোকে একটা কিছু দেখিতে পাইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পারিব না। তবে কতকটা এইরূপ, যেন জ্যোতির্ময় একটি ক্ষেত্র, উজ্জ্বল-শরীর ,নিঃসংকোচ কতকগুলি উলঙ্গ দেবদেবীর মূর্ত্তি লীলাবেশে চঞ্চল ; তাঁহাদের মধ্যে অপূর্ব বিরাট এক হরগৌরীর মূর্ত্তি, হিমালয়ের মতই স্থির, ধীর এবং গম্ভীর, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সুখাসনে আসীন রহিয়াছেন।

কতকক্ষণ যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না, তবে ভোরের ক্ষীণ আলোকে পূর্বদিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে দেখিতে দেখিতে চক্ষুরুন্মীলন করিলাম। পূর্বস্মৃতি চিত্তক্ষেত্রে চমকিত হইতে না হইতেই আমি চারিদিকে একবার দেখিয়া আবার কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদিলাম। মাথাটি ভার হইয়াছে, শরীরে যেন জ্বর-ভাব অনুভব করিতে করিতে আবার যখন জাগিলাম তখন পূর্বাকাশ আরও কতটা ফরসা হইয়াছে, সম্মুখে কতকগুলি কাক সশব্দে পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতেছে, অপর কেহ সেখানে নাই। গত রাত্রির সকল কথা স্মৃতিতে উদয় মাত্র চারিপাশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ভুক্তাবশিষ্ট কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র, আর কোন চিহ্নই নাই।

শরীরটি এত ভার হইয়াছে, প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরও গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আনন্দ মোটেই ছিল না, একটা দুর্বলতা-জড়িত অবসাদে শরীর মন যেন অবসন্ন। তখনও উঠি নাই, বসিয়া বসিয়া গত রাত্রির সকল দৃশ্য যাহা আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়াছে দেখিয়াছি তাহাই ভাবিতেছিলাম।

দেখি সম্মুখে কতকটা দূরে ভুলো ডোম আসিতেছে, মাথায় গামছা-বাঁধা, খালি গা, কৌপিন-পরা নিম্নাঙ্গ। ক্রমে নিকটে আমার দিকেই আসিতেছে এরূপ বোধ হইল। আরও নিকটে আসিলে দেখিলাম তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি জবা ফুলের মতই লাল, কাঁচাপাকা গোঁফ জোড়াটি বিশৃংখল। হাতে তাহার বাঁশের লাঠিটি ঠিক আছে। আমার সম্মুখে আসিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে অশেষ ভক্তিপূর্ণ ভাবে প্রণামের অভিনয় করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল : ঠাকুদ্দা, বাবা বোলছেন যে—

জিজ্ঞাসা করিলাম : কি বলছেন বাবা ?

সে বলিল : বাবার কথা কি আমরা বুঝতে পারি !

বেটা মাতাল হইয়াছে, কিছু জ্ঞানগম্য নাই, বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম : তিনি এখন কোথায় আছেন ? সে বলিল : হোই ঘরকে আছেন বটে—বোলছেন, দেখ্যা আয়গা যা, হোথাকে আপুনি আছেন বটে।

আমি উঠিয়া পড়িলাম, বলিলাম : চল, যাই তাঁর কাছে।

সে বলিল : না না, তা হবেক নাই, তিনি বাবা তা ত বলেন নাই।

আমি বলিলাম : তবে তিনি কি বললেন ? সে বলিল : ওই ত বোললাম না ?

বৃথা তার সঙ্গে কথা কওয়া, এ অবস্থায় তাহার কাছে কিছু পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া আমি অঘোরীর কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ভুলো আমায় যাইতে দিবে না, সে আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল : এখন সেখানে যাওয়া হবেক না, ওখানে মা আছেন যে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : মা! কে মা? সে বলিল : মইসারী ভৈরবী মা। বুঝিলাম, মহেশ্বরী, তিনি এখনও সেখানেই আছেন। বলিলাম : তা থাকলেই-বা, আমি যাব।

সে বলিল : তা হবেক না বাবা, এক্ষণ তাঁরা নাংগা রইচেন যে, তুমি যাবেক কেনে সেথা, তাঁরা পূজা করছেন, আর করছেন।

তখন আমি নিরস্ত হইলাম। এখন যাওয়া সঙ্গত নয়।

ভাবিলাম, এখন আর ওখানে না গিয়া নিজস্থানে যাওয়াই ভাল ; পরে সময়মত একবার বৈকালে অঘোরীর কাছে যাইব, গিয়া জানিয়া লইব ব্যাপার কি! এই মনে করিয়া ফিরিয়া নিজ স্থানে চলিলাম। তখন আবার ভুলো পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল: তা হবেক নাই ঠাকুর মশায়,—আপনার এখান হতে যাওয়া হবেক নাই।

আমার হাসি আসিল,—ভাল আপদ দেখিতেছি, এ আমায় লইয়া করিবে কি? বেটা মদের নেশায় একেবারেই বেহেড হইয়া গিয়াছে। আমায় যাইতে দিবে না।

কি করিব তাহাই ভাবিতেছি। এমন বিপদে বাউল বাবাজী আসিয়া আমার সহায় হইলেন। তিনি অঘোরীর ঘরের দিক হইতেই আসিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি? আমি সকল কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন: অঘোরী বাবা ওকে বলেছিলেন দেখে আসতে শ্মশানে কোন শব দাহ করতে এসেছে কি না। আজ তাঁর একটি শবের প্রয়োজন আছে।

তখন আমি বুঝিলাম, বলিলাম: ভাগ্যে আপনি এলেন, না হলে মুস্কিল হতো। বৈরাগী বাবাজী বলিলেন: তিনিই ত আমায় পাঠালেন,—কারণ ভুলো ত এখন প্রকৃতিস্থ নাই, কাল রাত্রে তার প্রসাদটা গুরুতর রকমই পাওয়া হয়েছে, কাজেই কোন কাজে ত এখন ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না, তাই তিনি আবার আমায় দেখতে বললেন ; তিনি এমনই একটা কিছু আশংকাই করেছিলেন। যাই এখন ফিরে গিয়ে তাঁকে সব বলিগে। চল্ ভুলো,—কাজ আছে। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: আচ্ছা দাদা, এখন এখানে কাজ আছে, আবার দেখা হবে। বলিয়া চলিলেন।

ভুলো বেচারা অপ্রতিভের একশেষ,—সুড়্ সুড়্ করিয়া বাবাজির পিছন পিছন চলিল। কতকটা দূরে গেলে ভুলো কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিল, তার হাব ভাব দেখিয়াই অনুমান করিলাম।

আমি আর সেখানে কি করিব, আপন স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। মনে মনে বুঝিলাম, আজও হয়ত একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে। শবের প্রয়োজন যখন, তা ছাড়া মহেশ্বরী এখনও ওখানে রহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু আমার ত ইহাতে অধিকার নাই।

কাল রাত্রে চক্র-সন্নিধানে আমার উপস্থিতি এবং সমস্ত দৃশ্য যাহা আমার চৈতন্যলোপের পূর্ব পর্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা একে একে মনে উঠিতে লাগিল। সেইদিন প্রাতে আমার আর নিজ কর্ম কিছু করা হইল না। কেমন একটা নেশার মত অবস্থা, তাহার উপর মাথা ভার, গরম নিশ্বাস—যেন অবসন্ন ভাব।

অনেক কিছুই জিজ্ঞাস্য ছিল, যদি একবার অঘোরী বাবাকে নিরিবিলি পাইতাম। জানি না কবে, কখন সুযোগ হইবে। তবে নিজের মধ্যে তখন একটা মীমাংসার প্রবাহ স্বতই চলিতে লাগিল, তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি।

প্রথম কথা এই যে,—তন্ত্রের মধ্যে এই যে পঞ্চ-মকারের সাধনা তাহা সেই সময়ের জন্য, যে সময়ে সাধারণের মধ্যে মদ্য মাংস প্রভৃত পরিমাণে চলিত ছিল। মদ্য, মাংস ব্যতীত তখনকার লোকের আনন্দে জীবন-যাপনের ধারণাই ছিল না। তখন জনসাধারণের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতির এবং সংযত বুদ্ধির অভাব ছিল। তখনকার সমাজে মদ্য মাংস নিন্দনীয় ছিল না।

দ্বিতীয় কথা,—মদ্য, মাংসের সঙ্গে স্ত্রী-সম্ভোগ একান্ত সুখের বিষয় বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল। উহা ব্যতীত স্ত্রী-সম্ভোগ সম্পূর্ণ নহে, এ ধারণাও তখনকার দিনে বদ্ধমূল ছিল।

তৃতীয় কথা,—সাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম ধর্মের অথবা ঈশ্বর উপাসনার অভাব বোধ করিয়া যিনি প্রথম তন্ত্রোক্ত উপাসনা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তিনি জনসাধারণকে ধর্মে লওয়াইবার জন্যই অর্থাৎ ধর্মপথে প্রলোভিত করিবার জন্যই ইহাতে পঞ্চ-মকার সাধন যোগ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক মহৎ উপকার এই হইয়াছে যে অধ্যাত্ম ধর্ম এবং উপাসনা আমাদের দৈনন্দিন জীবন হইতে স্বতন্ত্র একটা কিছু নয়, পরন্তু আমাদের প্রতিদিনের সহজ জীবন-যাপনের মতই প্রয়োজনীয়, এই বোধেই তখনকার সমাজ ইহাতে আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ,—স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইয়ের তুল্যাধিকার তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য। নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই বুদ্ধির প্রতিবাদেই তন্ত্রধর্মের যত কিছু কর্মের নির্দেশ। নর অথবা নারী একা-একা কাহারও মুক্তি সম্ভব নহে। সাধন হইতে সিদ্ধির অবস্থা পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষ যুক্ত হইয়া প্রত্যেকটি কর্ম করিবে, —ইহাই ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ইহাই ধর্ম। ইহাতেই কল্যাণ, শুভ এবং সিদ্ধি, —অন্যথায় ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম।

পঞ্চম,—স্ত্রী এবং পুরুষ ব্যতীত মানুষের মধ্যে অপর কোন জাতির অস্তিত্ব তন্ত্রধর্মে নাই। সেই হিসাবে ইহা বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদ। কর্ম-সংস্কার হিসাবে অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম হিসাবে জাতির কথা, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, উচ্চ ও নীচের কথা তন্ত্রোক্তধর্মে পৃথক ভাবে বা অর্থে গৃহীত। সাধন-জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষ হিসাবেই তন্ত্রশাস্ত্রের ছোট বড় ভাব। তন্ত্রে মনুষ্য-সাধারণই পশু, ধর্মজীবনে উৎকর্ষ হইলে শক্তিমান হইয়া বীর আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তার পর দিব্যভাবের উৎকর্ষে দেব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাধক-জীবনের চরমোৎকর্ষই দেবভাব। এই অবস্থায় জীবই ব্রাহ্মণ, নচেৎ ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণ হইবে এ ভাবের বংশগত প্রাধান্যের কথা তন্ত্রের অনুমোদিত নয়।

॥ ২২ ॥

মূল তন্ত্রধর্মের মধ্যে শুধুই যে নর-নারীর সমান অধিকার তাহা নয়, ইহার মূলে নারীর কর্তৃত্ব দৈবানুকূল বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। নারীকে শক্তির প্রতীক বলিয়াই বলা হয়, যাহার অভাবে লোক এবং সমাজের প্রগতি অচল। তার পর তন্ত্রের সাধন, নারী ব্যতীত হইবার নয়। এই যে নারী, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধই মানুষের সাধন জীবনে অগ্রগতির প্রথম ধাপ। তন্ত্রমতে উভয়ের ইচ্ছার অভাব ব্যতীত বিবাহের অপর কোনও বাধা নাই। জাতি-বিজাতি, গোত্র, গাঁই-মেল, কুলিন, বংশজ, দান, পণ, অলঙ্কার ইত্যাদির মনুষ্যকৃত কৃত্রিম বাধা বালাই নাই। যেহেতু আসল তন্ত্রমতে সদাশিবই একমাত্র পুরুষ এবং আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্বতী বা কালীই তাঁহার একমাত্র শক্তি ও আধার। সৃষ্টির মূলে সমষ্টিরূপে পূর্ণ একাই এই দুই দেবতা, উপাস্য, গুরু যাহা কিছু সব। উপাসক জীব, শিব ও শক্তির ব্যষ্টিরূপ। প্রথম অবস্থায় জীব যখন বিষয়মুখী তখন পশু, সেই জন্য শিব পশুপতি। উপাসনার আসল

কথা জীবের পাশমুক্তির অবস্থায় আত্মার মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শিবরূপ সত্তার উপলব্ধি। কারণ, তাহাই জীবের স্বরূপ। শরীর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে জগৎ-সৃষ্টি বর্তমান, তাই জীব সৃষ্টিবৃদ্ধি এবং সৃষ্টিরক্ষার সহায়তা করিতে পারে।

অঘোরী বলেন যে, এই যে জীব-রূপী সামাজিক পুরুষ, তাহার সঙ্গে যে নারীর প্রণয় হইবে তিনি হইবেন তাঁহার স্ত্রী, সহধর্মিণী, উত্তর সাধিকা, ভৈরবী, যাহা কিছু সব। পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে উভয়কে গ্রহণের তাৎপর্য্য হইল উভয়ের জীবনগতি এক হইয়া যাওয়া, পুরুষের শক্তিমান হওয়া, নারীর শক্তিস্বরূপা হওয়া। উভয় জীবনেই সম্পূর্ণতার গতি প্রাপ্তি, চরম গতিমার্গের উপযুক্ত হওয়া, কর্মজগতে উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি ইত্যাদি। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য আছে, যে মহান্ ইচ্ছার নির্দেশ আছে যুক্তভাবে স্ত্রী-পুরুষ উপাসনা দ্বারা সেই ইচ্ছার গতিতে মিলিত হওয়া এবং মনুষ্য জীবনটি সার্থক করা। সেই জন্য বিবাহের পর গার্হস্থ্য জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার রীতি এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। তন্ত্রমতের ধর্মজীবন, দৈনন্দিন জীবনের সবটা লইয়াই। ধর্ম বা অধ্যাত্ম কর্ম পৃথক ব্যবহারের ব্যাপার নয়। ধর্ম জীবনময়, ইহাই তন্ত্রমতের প্রকৃষ্ট অন্তর্নিহিত সত্য।

কুমার-কুমারী অবস্থায় মানুষ অপূর্ণ ; সমাজে তাহাদের পূর্ণ কর্মাধিকার নাই, বিবাহিত হইলে তবে তাহাদের পূর্ণতা, কর্ম, ধর্মাদির সাধন গণনীয় হয়।

বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণ-সমাজে, তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি গ্রহণ করিবার পর ইহার স্বাভাবিক উপযোগিতা বুঝিয়াই বিবাহিত বা যুক্ত জীবনেই তান্ত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা এবং অবিবাহিত কুমার জীবনের বৈদিক দীক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন। বৈদিক দীক্ষার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব অধিক, এই ধারণাই তাঁহাদের ঐ নিয়ম প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহা স্পষ্ট ; তন্ত্রমতে, প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রে নিদ্রার পূর্ব পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলই উপাসনা, সুতরাং একটি যুক্ত জীবনের প্রাথমিক সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া (অর্থাৎ শুচি-অশুচি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাগ-দ্বেষ, ভয়াদি পাশ) মুক্তি পর্য্যন্ত আগাগোড়া সমস্তটুকুই একটি পূর্ণ জীবন বুঝিতে হইবে।

অন্যান্য বিধি-নিষেধ ছাড়িয়া যদি শুধু নরনারীর মিলন বা বিবাহবিধিটুকু মাত্র লইয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ইহার তুল্য উদার, স্বাভাবিক (অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুকূল) সঙ্কীর্ণতাশূন্য বিবাহপদ্ধতি জগতে আর কোথাও বিধিবদ্ধ হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম, যাহার ফলে সভ্য জগতে বিবাহ-ব্যাপার লইয়া এতটা ভয়ানক আন্দোলন, তাহা সম্প্রতিই হইয়াছে। কিন্তু নরনারীর স্বাভাবিক অধিকার এবং কল্যাণময় তন্ত্রমতের বিবাহ-বিধি আজ কত শত যুগ পূর্বে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিদ্বান শিক্ষিত সমাজের মানুষ আধুনিক পদ্ধতিতে তন্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেহই করেন নাই। দুই চারি জন য়ুরোপীয় পণ্ডিত যাহা করিয়াছেন তাহার মূল অন্য দিক দিয়াই নিরূপণ করিতে হয়, ভারতবাসী কেহ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তন্ত্র-সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়াই জানি। এখনও যাহা হয় নাই কখনও যে তাহা হইবে না তাহাও ত বলা যায় না। তবে আশায় থাকা ভাল।

যাহা হউক, এখন এই যে তখনকার দিনের (যখন তন্ত্রের প্রভাব পূর্ণরূপেই এদেশে বর্তমান ছিল) তন্ত্র-সমাজে প্রচলিত বিধি, মনোভঙ্গে বিবাহ বা সম্বন্ধ ভঙ্গ,—এখনকার এই দাসত্ব ধর্ম জর্জরিত ক্লিষ্ট হিন্দু সমাজের বিবাহ বিধির সঙ্গে তুলনা করিলে অনুমান করা শক্ত নয় যে তখনকার রাষ্ট্র বা সমাজ কতটা স্বাধীন এবং শক্তিশালী ছিল। পূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিমান সমাজ না হইলে তন্ত্রের মত ধর্মের জন্মলাভ সম্ভব নয়।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—যখন উভয়েই দেখিবেন পরস্পরের মধ্যে প্রীতি এবং আকর্ষণের অভাব, কেহ কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করেন না, পরস্পরের সংসর্গে বীতরাগ, তখন বুঝিতে হইবে উভয়ের ব্যবহারিক সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে। তখন উভয়েই পুনরায় মনোমত পাত্র বা পাত্রী সন্ধান করিয়া লইবেন। এক ভৈরব বা সাধক, সাধন-জীবনে একাধিক বহু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজ সাধন পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে। নারীর পক্ষেও তাই, ইহাই তন্ত্রের সত্যবিধি।

তন্ত্রের এই উদার বিবাহ-পদ্ধতি আর্য্য ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন নাই, ওটি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শুধু বিবাহপদ্ধতি নয়, তন্ত্রের জাতিহীনতা, অতিরিক্ত বাহ্য শৌচাচারের নিষ্প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি ছাঁটিয়া, কেবল নিজেদের বৈদিক সংস্কারগুলির সঙ্গে যেগুলি খাপ খায়, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া সেইগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তন্ত্রের পূর্ণ প্রভাব বা পূর্ণ রূপটি বৌদ্ধযুগের পর আর দেখিতে পাই না। যেগুলি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে মিলে নাই সেগুলি বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে অতি সুন্দররূপে মিলিয়াছিল। তাই বৌদ্ধধর্ম যতটা তন্ত্রকে আত্মসাৎ করিয়াছে অতটা কোথাও হয় নাই। আর্য্য হিন্দুগণ প্রথম হইতেই তন্ত্রের আংশিক অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নিজ ধর্মের মধ্যেও জাতির একটা পূর্ণরূপ দিতে পারেন নাই। বৌদ্ধযুগের পর তাঁহারা তন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুর ধর্মের সঙ্গে তাঁহাদের গৃহীত তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। সেই কারণেই একটি সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ শক্তিসম্পন্ন জাতির পরিবর্তে এক অভিশপ্ত সংঘশক্তি-হীন ভন্ড রাষ্ট্রপরিচালনায় দুর্বল জাতিই গড়িয়া গিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ জাতির চাতুর্বর্ণ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব আচার অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের গভীর প্রভাব মূলে থাকায়, তন্ত্রোক্ত ধর্ম গ্রহণকালে তাঁহারা সবটুকুই লইতে পারেন নাই, পাছে তাঁহাদের সমাজ ইহার উদার প্রভাবে ব্যভিচারদুষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়া ফেলে বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অধঃপতিত হয়। কিন্তু হায় দুর্দৈব,—তাঁহাদের প্রকৃতিগত সংকোচ এবং ক্ষুদ্রতাই তখনকার সমাজে প্রতিফলিত হইয়া এখনকার সমাজকে কতদিকে না উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারদুষ্ট, জগতের চক্ষে হীন করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ইহা চক্ষে পড়িলে কষ্টের কারণ হয় না কি?

অঘোরীর মুখে শুনিয়াছি, প্রাচীন বা মূল তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে তখনকার সমাজে নর-নারীর উদার ব্যবহারের যে সকল স্বাভাবিক সুন্দর রীতি-নীতির কথা বর্ণিত আছে ব্রাহ্মণেরা সে সকলের আমূল পরিবর্তন করিয়া নিজ ধর্মের, জাতীয় সংস্কার যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি ঢুকাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা শিবের মুখ দিয়া বলাইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণের প্রভাব তন্ত্রের মধ্যে বরাবর থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন—যাহা কস্মিন্‌কালেও

তন্ত্রের মধ্যে ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত সংস্কারকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই তন্ত্রোক্ত আসল ধর্ম এই বঙ্গে তথা ভারতে আর স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে পারে নাই। ফলে দুইটি ধর্মই নষ্ট হইয়াছে, তন্ত্রও গিয়াছে, বৈদিক আর্য্য হিন্দুধর্মও গিয়াছে। এখন যেটা আমাদের দেশে আছে তাহাকে তন্ত্রও বলা যায় না, বৈদিক ধর্মও বলা যায় না। তাই আমাদের এ সমাজের শক্তিও নাই, দৃঢ় ভিত্তিও নাই, নিজেদের কাছেও গ্রহণ করিবার মত কিছুই নাই, অপরের কাছে পরিচয় দিবার মতও কিছুই নাই।

অঘোরী বলেন, তন্ত্রের ভাব, ভাষা এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, পূর্ণ প্রাণে পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধিৎসা দরকার। যিনি প্রথম হইতেই মনের মধ্যে ঘৃণা, সঙ্কোচ, উপেক্ষা রাখিয়া অথবা বিদ্বেষদুষ্ট মনে উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা না করিতে পারিবেন, এই অপূর্ব ধর্মশাস্ত্র মধ্যে তাঁহার প্রবেশ অসম্ভব হইবে। অঘোরী দেখিয়াছি, অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের উপর ততটা নয়, যতটা দেশের বিদ্বান পণ্ডিতের উপরে নারাজ। আগে পরিচয় পাইলে, কখনও তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না, কাছে বসিতে দিবেন না। বলিবেন, তাহারাই দেশে ধর্মকে নষ্ট করিয়াছে। একদিন এই বীরভূমেরই এক পণ্ডিতকে কাঠ লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। কেন যে তাঁর এতটা ক্রোধ সাধারণে কেহ বুঝিতে পারে নাই, পরে বলিয়াছিলেন—পণ্ডিত পরিচয় দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন তন্ত্র-সম্বন্ধে তর্ক করিতে। যাহা হউক্, অঘোরীর কথাগুলি একটু কিছু বাদ না দিয়া, তিলমাত্র বিকৃত না করিয়া বিশেষ সাবধানেই আমি যথাসাধ্য সাধারণের কাছে ধরিতেছি। ইহা হইতে আসল তন্ত্রশাস্ত্রের কথা ধরিতে, বুঝিতে পারিবেন, যাহার সঙ্গে এখনকার প্রচলিত পুঁথি পুস্তকের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। তিনি বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ছাপানো পুঁথি পুস্তকের মধ্যে মোটে আসল ব্যাপার স্থান পায় নাই, কাজেই তাহার ভিতর হইতে সাধারণের সত্য উদ্ধার করিবার সাধ্য নাই। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি হইতে যে সকল কর্ম উদ্ভূত হইয়াছে সেই সকল কর্ম অবলম্বন করিয়াই তন্ত্রের সাধন শুরু হইয়াছে, পরে প্রকৃতির নিয়মেই তাহা হইতে নিবৃত্তিমূলক সাধন, শেষে সিদ্ধি ; তাহাও সহজ নিয়মের মধ্য দিয়া। সংস্কারান্ধ মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে না, ভোঁতা বুদ্ধি থাকার জন্যই, তন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়াটি যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে তাহাদের মাথা খারাপ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া তন্ত্রের সকল ব্যাপার গুহ্য বলিয়াই কোনও ছাপানো বইয়ে আসল কথা খুলিয়া লেখা হয় নাই, সঙ্কেতও বিশেষ কিছু নাই ; হাজার পণ্ডিত বিদ্বান হোক্, বুঝিবে কি প্রকারে ? গুরু বা আচার্য্য কৌল না হইলে, আর অনুগত শিষ্য না হইলে, দীক্ষা না হইলে কিছুই পাইবার যো নাই। এ পর্য্যন্ত তান্ত্রিক বলিয়া কারণের যন্ত্র বা মদের বোতল হাতে যাহাদের দেখা যায় তাহারা মদের জন্যই তান্ত্রিক,—সাধক নয়, যন্ত্রশাস্ত্র তান্ত্রিক সাধন একরকম লোপ পাইতে বসিয়াছে।

অঘোরী বলেন, তন্ত্রের জগতে বা অধিকারের মধ্যে ঘৃণার বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, মানুষের মধ্যেও কেহ অস্পৃশ্য নাই,—জাতির বেলা পুরুষ ও নারী এই দুই জাতি ছাড়া মানব-সমাজের মধ্যে আর কোন জাতি নাই। একথা এখনকার ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকরাও বুঝে কি না সন্দেহ। তার পর শবসাধন, পঞ্চমুণ্ডি আসন, মদ্য মৎস্য মাংসের ব্যবহার—এ সব ত আর্য্য ব্রাহ্মণদের ধারণায়

ভ্রষ্টাচার। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে শুদ্ধাচারের বড়াই দেখিয়াও কি সহজে বোধ হয় না যে, এসকল পৃথক একটি ধর্মের সাধন বা অনুষ্ঠান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। শুদ্ধাচারী আর্য্যেরা যতদিন বাঙ্গলায় আসেন নাই, ততদিন তাঁহাদের, এ ভাবের যে একটি ধর্ম-সাধন আছে, আর সেই ধর্মের সাধন-প্রকরণ তাঁহাদেরই একদল গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়িয়া তুলিবেন, একথা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশ ত চিরকালই পশ্চিম দেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাছে হেয়, ঘৃণ্য হইয়া ছিল, এখনও তাহার জের আছে। তার পর বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণেরা বসবাস করিয়া যখন স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িলেন তখন হইতে ত তাঁহারা পশ্চিমী জ্ঞাতি-ভাইদের কাছে একঘরে হইয়াই ছিলেন। তার পর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অনার্য্যই হইয়া পড়িলেন,—তাঁহাদের বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রহিল। তাঁহাদের বাহিরের সকল কর্ম, দশবিধ সংস্কারগুলিতে বজায় রহিল বৈদিক ব্রাহ্মণত্ব, আর বিবাহের পর তান্ত্রিক কুলগুরুর কান-ফুঁকের মধ্যে রহিল তান্ত্রিকত্ব। এই ত বাঙ্গলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের বংশের তান্ত্রিক ধর্ম, তাহার মধ্যে কেহ কেহ বংশ হইতে বাহির হইয়া তান্ত্রিক কৌল গুরুর শিষ্য হইয়া ভৈরবী লইয়া সাধন-জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে বড় একটা ঘটে না, বৈদান্তিক ধর্ম মাথা তুলিয়াছে।

তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রবাদ এরূপ যে বেদের প্রাচীনতা তন্ত্রের হিসাবে অনেক কম। এঁরা বলেন—বেদের উৎপত্তির বহু সহস্রাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। আমরা যে দরের মানুষ তাহাতে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার কল্পনাও বড় অখ্যাতির কথা, যদিও মনের মধ্যে একটা ছট্‌ফটানী থাকে ইহার সুমীমাংসার জন্য। অঘোরী বলেন, বেদ পুরানো কি তন্ত্র পুরানো একথায় সাধকের ত কোনই দরকার নাই। কিন্তু আমি তবুও এসম্বন্ধে তাঁহার কিছু নিজমত আছে কি না, বড়ই আগ্রহ দেখাইয়া শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন যে, বেদ আগে কি তন্ত্র আগে তা আমি জানতে কখনও চাই নি—আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কও নাই, তবে এটি ঠিক জানি না বেদাচারী ব্রাহ্মণরাই এদেশে এলে পর ক্রমে ক্রমে পরিচয় পেয়ে তন্ত্র ধর্ম গ্রহণ করে তন্ত্রের বিস্তর ব্যভিচার করে আসল তন্ত্রের মাথা খেয়ে কেবল ছোবড়াটা ফেলে রেখেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : কি ভাবে ?

তিনি : এই ভাবে যে, যেটুকু তাঁরা হজম করতে পারেন মাত্র সেটুকু নিয়ে তার উপর নিজেদের বৈদিক আচার, সংস্কার চাপিয়ে, কতক এভাবে কতক ওভাবে করে জগা-খিচুড়ী পাকিয়েছেন। এ ত আগেই বলেছি।

আমি : আপনার মত কি বৌদ্ধধর্মের পতনের পর তবে ব্রাহ্মণেরা তন্ত্র-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

তিনি : তাই ত বলি, বলি কেন, তাই যে ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণই আধুনিক অনেক তন্ত্রের বইয়ের মধ্যেই আছে। প্রথমেই দেখ না, তন্ত্রশাস্ত্রে জাতি বলতে নর-নারী, পশু পক্ষী, জলচর ভূচর খেচর এই সব, গোঁড়া ভণ্ড জাতির গুমুরে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ওর মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাত ঢুকিয়ে নিজেদের বৈদিক ছাঁচে তন্ত্রকে গড়ে নিয়ে আসল বা মূল তন্ত্র-ধর্মের উচ্ছেদ করে বসেছেন। এখন তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজতে গেলে বৌদ্ধ-ধর্মের পুঁথি খুঁজতে হবে,—সংস্কৃত ভাষায় আগম, নিগম, তন্ত্রসার তার পর তিনশো পঁয়ষট্টিটা তন্ত্রের যে বই, সে সব ঐ বেদাচারের ছাঁচে গড়া ব্যভিচারী ব্রাহ্মণদের

সুবিধামত শিষ্য যজাবার জন্যে তৈরী। ভাষা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে কত হাল্কা বাংলার ছাঁচে, আসলে সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ, বেদান্তের ভাব সব হুবহু নকল ছাড়া আর কিছু নাই। শিব আর পার্বতী বা ঈশ্বর বা ঈশ্বরী, বক্তা বা শ্রোতা, ঠিক যেন মহাভারত লেখার ছাঁচ নয় কি? মহাভারতের পর আর বৈদিক ব্রাহ্মণদের গুমোর করবার মত ধর্ম-সংক্রান্ত একখানিও বই রচিত হয়েছে কি? যা কিছু হয়েছে সব ঐ ছাঁচ বা নকল মাত্র।

ইনি বলেন যা, তা বড়ই অদ্ভুত লাগে, এখনকার তন্ত্রের সকল গ্রন্থই আসল তন্ত্রধর্মের পরিপন্থী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করবার পূর্বে তন্ত্রের ভাষা কিরূপ ছিল? কি ভাষায় তার প্রচার হ'ত?—আপনার কি ধারণা?

তিনি: অনার্য্য বলে আর্য্যেরা যাঁদের ঘৃণা করতেন, তাদের ভাষা দ্রাবিড়, সেই ভাষায় তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথি পুস্তক ত ছিল না, বেদের মতই লোকপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচার ছিল। সাধকদের স্মৃতির ভিতরেই বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির নাম-গন্ধও ছিল না, কারণ তন্ত্রের কারবার যে সব মানুষকে নিয়ে তার মধ্যে জাত কোথায়? সাধারণ মানুষের ধর্মকর্ম নিয়েই ত তন্ত্রের সাধন।

তখন আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: মন্ত্র ছিল ত? সে মন্ত্রের ভাষা কি ছিল?

অঘোরী বলিলেন: কিছু মন্ত্র ছিল বোধ হয়, সে সব হয় ত তাদের চলিত ভাষাতেই ছিল। তার পর বৌদ্ধেরা সে সব মন্ত্রের অর্থ, শব্দ পালিতে করলেন, ব্রাহ্মণেরা আবার তাই থেকে কতক সংস্কৃত ভাষায় করে নিলেন।

আমি: আচ্ছা, তন্ত্র নামটাই সংস্কৃত নয় কি?

তিনি: কত কত ভিন্ন ভাষার শব্দ সংস্কৃতের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ঢুকিয়েছে তার ঠিক আছে কি? ঐ রকমই একটি ব্যাপার এই নামের মধ্যেও ঘটে থাকবে।

আমি: মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, এ সকলই ত সংস্কৃত শব্দ।

তিনি: হাঁ হাঁ, আসল শব্দগুলির সংস্কৃত ভাবানুবাদ।

আমি শেষে বলিলাম: যদি তন্ত্রের মধ্যে যত মন্ত্র আছে সব মূলত সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত শব্দেরই হয় তা হলে স্পষ্ট এটি বুঝা যাবে যে তন্ত্রধর্ম ব্রাহ্মণদেরই সৃষ্টি?

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: আসলে তন্ত্র ত মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। কাজেই নাম থেকেই বুঝা যাবে যে তন্ত্র যেটি সেটি মন্ত্র নয়, তাকে মন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়েছে অনেক পরে। আর্য্য ব্রাহ্মণদের খপ্পরে আসবার পরেই না তার মধ্যে চতুর্বর্ণ আর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইত্যাদির কথা ঢোকানো হয়েছে বলেছি। নানা প্রকার অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, নিকৃষ্ট প্রভৃতি অধিকারীর কথাও তার মধ্যে চালানো হয়েছে, আসলে ও-ধর্মে অধিকারী ভেদ নেই, ধর্ম সকলকার জন্যই।

আমি: এ বড় অদ্ভুত কথা আপনি বলছেন, এ সব কথা পণ্ডিতেরা, বিশেষত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের শিষ্য যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষকেই মূল করে যাঁরা সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরা আপনার এসব মতামত হেয় বা উপেক্ষণীয় মনে করবেন।

তিনি : তা আমি কি করব—এ কতকালের কথা, এখন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায় পাব,—আমরা গুরুপরম্পরায় যা শুনে আসছি আর আমরা আলোচনা করে যা সত্য বলে ধরতে পেরেছি তাই ত বলেছি। ব্রাহ্মণেরা কত কত বাইরের জিনিস আত্মসাৎ করে নিজেদের সমাজে, আর ভাষার মধ্যে পুরে নিয়ে বড় হয়েছেন তার খবর কে রাখতে যাচ্চে। তন্ত্র, ভারতের ধর্ম বটে কিন্তু ব্রাহ্মণদের নয়, এটা যেন মনে থাকে।

আমি আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন : যাই-ই বলিস্ না কেন, তোর তন্ত্রের কাল আর নেই। যদি কখনও আসল তন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তার যেটুকু ব্রাহ্মণেরা নিয়ে তন্ত্র বলে চালাচ্চেন সেটুকু বাদে যে অংশটি ব্রাহ্মণেরা নেন নি,—তিব্বতে, চীনে, বৌদ্ধ-ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে—যদি উদ্ধার করা যায়, একটি দুটি জীবের জীবনব্যাপী সাধনা দরকার, তাহলে জগতের লোকে এককালে বুঝতে পারবে তন্ত্রধর্ম কি বিরাট ধর্ম। শিব কি উদার, সর্বজনীন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ এক ধর্ম থেকেই জগতের সকল জীবেরই যোগ, ভোগ শেষ করে মহা শক্তিশালী হয়ে আনন্দময় শিবই হয়ে যেত।

আমি বলিলাম : আচ্ছা, একই সময়ে সকল ব্রাহ্মণেই ত আর তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করে নাই, বাকি—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : বাকি-টাকি নেই, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজ এক সময় কৌলদের মুঠোর মধ্যেই ছিল। যাঁরা বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁরাও তন্ত্রকে হাল্কা ডোজে নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নিয়েছেন। সেটি হ'ল নিরিমিষ্যি তন্ত্র। গোপনীয় ব্যাপার বলতে নেই, আয় তোর কানে কানে বলি,—বড় গোঁসাইরাও তন্ত্রমতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। অন্তঃশাক্তং বহিঃ শৈবং সভায়াং বৈষ্ণবং মতং—এই হ'ল বাংলার ভণ্ড সমাজের ধর্ম। এই থেকেই বুঝে দেখ্ না কেন সংঘশক্তি এদের কোথা থেকে আসবে, দাসত্বই বা ঘুচে যাবে কি করে। যারা পরের কাছে দাসত্ব করে তাদের মুক্তি কোনকালে বা হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যারা নিজেদের মধ্যে ভণ্ডামীর দাস তাদের মুক্তি কোনকালে হবার যো কোথায় ?

তন্ত্র বলিতেই শিবতন্ত্র বুঝিতে হইবে অর্থাৎ শিব যে ধর্ম কর্ম সঙ্ঘের প্রবর্তক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : এ শিব কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই মহেশ্বরই ত শিব ?

তিনি : শিবকে ত প্রথমে বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণেরা পায়নি, স্বীকারই করেনি ভগবান বলে, ইনি অনার্য্যদের নায়ক, দেবতা ছিলেন, আর্য্যদের হিসাবে শিবের দল ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত। বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে তুলনায় শিব আচার-ভ্রষ্ট, অনার্য্য—যেখানে সেখানে থাকেন, যা-তা খান, কোনও নিয়ম নাই, শ্মশান তাঁর বড়ই প্রিয় স্থান, বস্ত্র পরেন না, একটা বাঘের ছাল জড়িয়ে আসেন যখন লোকালয়ে যান তা নয় ত উলঙ্গ। এমনই উদার স্বভাব, যার-তার ঘরে বিনা আহ্বানেই উপস্থিত হয়ে দুঃখ বা পীড়িত যারা তাদের সেবা করে, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে, নিজের ব্যক্তিগত যত্নে তাকে আরোগ্য দিয়ে তবে স্থান ত্যাগ করতেন। তাঁর অদ্ভুত যোগসিদ্ধির কথা যখন আর্য্যেরা শুনলেন, কী শীত কী গ্রীষ্মে কোনও বস্ত্র বা আচ্ছাদন অঙ্গে ধারণ করেন না, যথা ইচ্ছা তথা যান, দুমাসের পথ অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করেন, মাদক সেবন করেন,

নেশায় সব সময়েই চুরচুরে,—অনার্য্যেরা তাঁকে বলে ভগবান। সম্বৎসরের অর্দ্ধেক, যখন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ঋতু তিনি থাকতেন কৈলাসে, ও-দেশের লোকেরা তাঁকে ঐ সময়েই কাছে পেত; হিমালয়ে তিনি থাকতেন না, কারণ হিমালয় ছিল আর্য্যদের স্বর্গ, তাদেরই অধিকার। তবে এই হিমালয়ের এক মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন, আর্য্যদলের এক প্রজাপতির মেয়ে, তাঁর গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁর গলায় মালা দেবার জন্য অনেক তপস্যা করেছিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যখন তিনি কৈলাসে থাকতেন তখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর পূর্ব অর্থাৎ বাঙ্গলা বিহারেরও বহুতর ভক্ত হিমালয় পেরিয়ে তাঁর কাছে আসবার জন্যে তীর্থযাত্রা করে বেরুত। আর্য্যেরা এমন অদ্ভুত মানুষ পূর্বে দেখেন নি। তাঁদের নিজেদের দলের দেবতা আর নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের গুমরেই মরেন,—এ একটা অনার্য্য মুখ্যু, অশিক্ষিত মানুষ—আচার মানে না, বেদ মানে না, পূজো, হোম, যাগ, যজ্ঞ তার কোন অনুষ্ঠানই নেই এমন একটা লোককে আর্য্যদের চোজ্‌ন্‌ পিপ্‌ল অফ্‌ গড—অর্থাৎ ঈশ্বর-নির্বাচিত মানুষ, কি করে মানতে বা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে পারেন? তার পর উমার যখন বিবাহ হ'ল শিবের সঙ্গে, আর্য্যদেবতারা ত চটে খুন।—কি? এতবড় স্পর্দ্ধা শিবের, আর্য্য প্রজাপতির মেয়েকে বিবাহ করে! সমুচিত দণ্ড দেবার বা শক্তি পরীক্ষার এই তো সুযোগ! তাতেই দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার ঘটল, শিবের ঐশ্বরিক মহাশক্তির পরিচয় আর্য্যেরা যখন পেলেন তখন গরব আর রইল না, শিবের কাছে মাথা হেঁট করতে হ'ল, শিব তখন মহেশ্বর হলেন। যজ্ঞের ভাগ তখন থেকেই শিবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল।

আমি বলিলাম: সে কত দিনের কথা? তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন: পাঁজি-পুঁথি নিয়ে কি আমরা সে সময়ে বসেছিলুম রে শালা? ফের ওসব বাজে কথা কইবি না, তা হলে আর কিছু শুনতে পাবি না,—

আমি তখন,—না না, অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন—বলিয়া জোড়হাত করিলাম; তাহাতে তিনি যেন আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন: ফের শালা তুই আমার কাছে বাহ্য শিষ্টাচারের ভান করছিস্‌?

আমি বলিলাম: আমাদের ওটা কেমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আর ওসব কথা বলব না। এখন আপনি তার পর বলুন।—ইহাতে তিনি আর কিছু বলিলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে তিনি বললেন: তার পর আর কি, তখন থেকেই আর্য্যদের সমাজে শিবের পূজা-অর্ঘ্য এ সকল বন্দোবস্ত হ'ল। শিবকে তাঁদের দলে টেনে নিয়ে তাঁদের দল উন্নততর সভ্যতা পেলেন। শিবের কাছ থেকে তাঁরা আয়ুর্বেদ পেলেন, ধনুর্বেদ পেলেন, যোগ পেলেন। এসকল তাঁদের মধ্যে কস্মিন্‌কালেও ছিল না, হিমালয়ের মধ্যে থেকে শিব কত ভেষজ পরীক্ষা করে করে মানুষকে দিয়ে গেছেন, দুঃসাধ্য কঠিন রোগ সমূহের ঔষধ তখন কে জানত?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন, দেবতাদের ত অশ্বিনীকুমার ছিলেন, তিনি ত অনেককেই কঠিন কঠিন রোগমুক্ত করেছিলেন শুনা যায়।

তিনি: হুঁ, বহু পূর্বে তাঁরা করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের সে সব দৈব-শক্তির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল, লোক-সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁরা কিছু প্রচার ত করেন নি, তাঁদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দৈবচিকিৎসাও লোপ পেয়েছিল। তাঁরা স্থায়ীভাবে কিছু প্রবর্তন করে যান নি। শিব

মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ঐ সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের প্রবর্তক। তাঁর পূর্বে রসায়ন যে কত বড় অদ্ভুত আবিষ্কার তা কারো ধারণা ছিল না। পারদ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুভস্ম এসব শিবের দান। তার পর ধনুর্বেদের সিদ্ধ অস্ত্রাদি, কতকগুলি অস্ত্র বা বান, সম্মোহন, উদ্‌মোহন প্রভৃতি, যাতে করে যুদ্ধের সময়ে বিপক্ষের প্রাণহানি না করেও যুদ্ধে জয় হতে পারে, সে সকল শিবই আবিষ্কার করেছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধের এমনই সাংঘাতিক মারাত্মক অস্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যার প্রভাব তখনকার দিনে কারো সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। তার পর যোগশাস্ত্র সম্পূর্ণই শিবের নিজ আবিষ্কার। আর্য্যদের ধারণাও ছিল না যে সভ্য-সমাজের মানুষ না হয়েও, জ্ঞান, বিদ্যা না থাকলেও, সংস্কৃত দেবভাষায় বাহ্যভাবে স্তুতি, উপাসনা না করেও প্রাণ-ক্রিয়ার সংযমের দ্বারা ইচ্ছা করলেই সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার উপায় আছে। শিবের এই যোগপন্থার অপর নাম হ'ল তন্ত্র। এর অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করেই আর্য্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দেবতা বলে ধারণা করেছিলেন। যথার্থ জ্ঞানপিপাসু গুণগ্রাহী আর্য্যের দলই শিবভক্ত হয়েছিল, তখন বহুকাল ধরে এই শিবের প্রভাবই আর্য্য অনার্য্য দুই দলের মধ্যে বর্তমান ছিল। যতটা উপেক্ষা তিনি প্রথমে পেয়েছিলেন তার বহুগুণে ভক্তি সুদে-আসলে তখন থেকে এখনও পর্য্যন্ত আদায় করছেন। তার পর আরও আছে, এই যে সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগ-রাগিণী অধিকারে বিভিন্ন সুরের বৈজ্ঞানিক সাধনা, এরও আদি প্রবর্তক শিব। মোট কথা একা শিবকে পেয়ে আর্যসভ্যতা গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। শিবের যা কিছু অবদান, অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির বলে তিনি তখনকার লোক-সমাজকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যে তখনকার দিনে যে বিষময় শত্রু-সম্বন্ধ ছিল তা আমাদের ধারণাতেও আসে না। রামচন্দ্রের বহু পূর্বেই এই শিব উভয় শ্রেণীর মিলন-সেতু। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুটি জাতিকে নিয়ে এক বিশাল সভ্য-জগৎ সৃষ্টির বীজ এই শিবই রোপণ করে-শিলেন। তিনি সে যুগের এমনই একজন ছিলেন যাঁর গুণের, জ্ঞানের ও শক্তির পরিমাপ এখনও পর্য্যন্ত হয়নি! কাজেই শিব যে কত বড় দেবতা তার হিসাব করতে গিয়েই গন্ধর্বরাজ মহিম্ন-স্তবের মধ্যে ঐ যে কথাটি বলেছিলেন তার পর আর কথা নাইঃ

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলম্ সিন্ধুপাত্রম্
সুরতরুবর-শাখালেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালম্
তদপি তব গুণানামীশ পারং না যাতি॥

॥ ২৩ ॥

একবার মহেশ্বরী মায়ীর সঙ্গে কথা কহিবার, একটু বিশেষ ভাবেই আলাপ করিবার সুযোগের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম আজ তাহা উপস্থিত। খণ্ড ভৈরবের সঙ্গে তিনি বক্রেশ্বর মন্দিরের আঙ্গিনায় আসিয়া বসিয়াছেন, আর কেহই সেখানে নাই বটে তবে দূরে দুই-তিনজন মন্দিরের পাণ্ডা তামাকের ধূমপান করিতে করিতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মত্ত ছিল। তাহাদের কথা

কহিবার বিশেষত্ব এইটুকুই যে, দূর হইতে কেহ শুনিলে মনে করিবে যে একটা কলহ বা ঝগড়া চলিতেছে।

এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের বামে, ভূমির উপর একখানি মাদুর পাতা, তাহার উপরেই ভৈরবী উপবিষ্টা ছিলেন। যেদিকে মহেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া ছিলেন, সেদিকে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দিরের মত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি খুব ছোট মন্দির, বোধ হয় হাত বাড়াইলে তাহার চূড়ায় ঠেকে। মন্দিরের আকৃতি বটে, কিন্তু মন্দির নয়। ভিতরে কোন মূর্তি বা লিঙ্গ নাই। দুই হাত সমচতুষ্কোণ গৃহতলে একটি লোক আসন পাতিয়া বসিতে পারে মাত্র, মাথার উপরে হাতখানেক শূন্য থাকে। প্রবেশদ্বারও দুই হাতের অধিক নয়, শরীরকে যথেষ্ট সংকোচ করিয়া ঢুকিতে হয়। ভিতর বাহির শেওলায় চিত্রিত, বড় তীব্র একটা সাঁতানি গন্ধ কাছে দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়। ইহা একটি সাধন গৃহ। যখন বক্রেশ্বর পুরীর অবস্থা ভাল ছিল তখন উহা সাধন অর্থে ব্যবহার চলিত, এখন কিন্তু তাহার মধ্যে থাকা বা অল্পক্ষণ বসাও ভয়ানক বিপদ্‌জনক। আমি এক সময় ঘুরিয়া-ফিরিয়া এসব দেখিয়াছিলাম, কিছুক্ষল ইহার মধ্যে বসিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভিতরে এমনই একটা বিষাক্ত ভ্যাপসা গন্ধ যে পাঁচমিনিটও বসা গেল না। এখন যাহা বলিতেছিলাম. ঐ মন্দির মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল বোধ হয়, কারণ মহেশ্বরী ঐদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কি বলিতেছিলেন, তখন খণ্ড ভৈরব উঠিয়া সেই দিকে গেলেন। এই অবসরে আমি একটু বেশী আগাইলাম।

তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে আমায় আহ্বান করিলেন, বলিলেন : কয় দিন হতে তোমার কথাই মনে করছিলাম, বলি হয়ত কাল চলে যাব, আর দেখা হবে কি না ; তা দেখ ঠিক দেখা হয়ে গেল।

আমি নমস্কার করিয়া বলিলাম : আপনার দয়া।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : হাঁ তাই বটে, আমরা ত কেবলই মহৎ লোকের দয়াই চেয়ে আসছি। তা আর কতদিন এখানে থাকা হবে ?

আমি : এখনও ত যাবার ইচ্ছা হয় নি। অঘোরী বাবার সঙ্গ ত তেমন পেলুম না,—

তিনি : আমরাও কখনো তাঁর সঙ্গ বেশী দিন পাইনি, দুদিন কি বড় জোর তিনটি দিন এক সঙ্গে পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কাছে ঘেঁসতেই দেন না ; কাকেও খুসী হয়ে নিজে না ডাকলে কারো যাবার যো নাই।

আমি : সে হিসেবে মনে হয় তিনি আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন,—

তিনি : তাই ত আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হয়। খণ্ড ভৈরবও সেই কথা বলছিলেন যে, যে তাঁর সঙ্গ পায় বা পেয়েছে সেই লোককেই ঐ কথাটা বলতে শুনেছি।

আমি : আমার কিন্তু এখনও অনেক কিছু তাঁর কাছ থেকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : আমারও কিছু কম নেই, কিন্তু আসল কথাটা কি জানো, তোমার যা যা জানতে ইচ্ছা হয়, তাই যে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবে তা যেন মনে ভেব না, আমরা তা পাইনি। তোমার এখন ভিতরের ইচ্ছা যে তন্ত্র-সমুদ্রটি একেবারে পেটে পুরে উদ্গার তুলতে তুলতে ঘরে যাও ; বাবা, সেটি হবে না জেন।

আমি বলিলাম: আসলে আমার আরও অনেক কিছু জানবার আছে। তাঁর কাছে না হলে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এমনটি হবার সম্ভাবনা নেই।

তিনি: আচ্ছা, একটা কথা আমায় বল ত, তন্ত্রসম্বন্ধে যা হোক একটা কিছু, দেখি আমি তোমার মনের মত বলতে পারি কি না!

যখন প্রথমে ইঁহাকে দেখি তখন ভাবিয়াছিলাম না জানি কি গম্ভীর প্রকৃতি, হয়ত আমার মত একজন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই সাহসী হইবে না। হয়ত সামান্য কথায় উপেক্ষার ভাবে দুই একটা কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন। কিন্তু আজ প্রথম আলাপেই একেবারে আমাকে এমনই আপনার করিয়া ফেলিলেন, আমি সকল কাল্পনিক পার্থক্য ভুলিয়াই গেলাম। তাঁহার কথায় এখন আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম: আমার কিন্তু আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধে। অথচ আপনার সঙ্গে কথা কইতে প্রথম থেকেই আমার আকাঙ্ক্ষা। তার পর আপনার মহৎ সাধনার কথা—

তিনি: তাহলে তোমার মনে কিছু যথার্থ জিজ্ঞাসা ওঠে নি? তাই কি না?

আমি: তা বোধ হয় ঠিক নয়, কতকগুলি এমন বিষয় আছে যা আমি আপনার কাছে বলতে সংকোচ মনে করছি। সকল কথা সকলের সঙ্গে ত হবার নয়!

তিনি: আমাদের ধর্ম-সম্বন্ধে তুমি কি এতদিনের শোনার মধ্যে অঘোরীর কাছে একথা পাওনি যে লজ্জা, মান, ভয়, এসব না ঘুচলে তন্ত্রশাস্ত্রের মূল তত্ত্বে কেউ ডুবতে পারবে না। নিঃসংকোচ না হলে কিছু হবে না।

আমি: তা আমি শুনেছি, জানি সর্ব বিষয়ে সকল ধর্মেই ও কথা খাটে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: কোন নারীর কাছে বসে তন্ত্রধর্মের কথা শোনবার সুযোগ ঘটেনি, এই ত কথা?

আমি বলিলাম: এই কথাই ঠিক। আমার প্রথম কথা এই যে আপনি গৃহী না সন্ন্যাসী জানতে ইচ্ছা হয়।

তিনি: তন্ত্রধর্ম যিনি প্রবর্তন করেছিলেন তিনি এর মধ্যে গৃহী সন্ন্যাসী বলে কোন ভেদ রেখে করেন নি—যদিও এখন তা হয়েছে, বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্য্যের পর থেকে। কথাটি শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম: এখন তাহলে যখন গৃহী ও সন্ন্যাসীর ভেদ হয়েছে তখন আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনি কোন্ আশ্রমের?

তিনি: আমি বলে শুধু নয়, এখনও এমন একটি দল আছে যাঁরা মূল শিবতন্ত্রের মতে সাধন করেন, তাঁদের এখনও কোন দলের ভেদাভেদ নেই। আমি সেই দলের।

আমি: তাহলে আপনাদের সম্প্রদায় ছোট,—বেশীর ভাগ ত এখন গৃহী দেখি—

তিনি: তা আমি ঠিক বলতে পারব না আমাদের দল ছোট কি অন্য দল ছোট। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমরা কৌল তান্ত্রিকের শিষ্য। তখন আমি কৌল কাদের বলে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধাবস্থা হলেই কৌল। এইটুকু জানলেই হবে।

আমি: স্ত্রী ব্যতীত তন্ত্রমতে সাধন ত হতে পারে না,—

তিনি : তা ত বটেই, স্ত্রী পুরুষের যুক্ত জীবনই সম্পূর্ণ জীবন, তন্ত্রের অধিকারে প্রথম প্রবর্তকের একা একা সাধনা হয় না।

আমি : যদি কোন সাধকের স্ত্রীর সঙ্গে বেশী দিন ভালবাসা না থাকে,—দুজনের মিল না হয়,—তাহলে ত স্ত্রী পরিত্যাগ করারও ব্যবস্থা আছে শুনেছি।

তিনি : তন্ত্রে স্ত্রী বা নারী জাতিই শক্তি। স্ত্রী গ্রহণ বলে না, বলে শক্তি গ্রহণ, যার সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল, কিছুকাল পরে যদি দেখা যায় দুজনে মিলছে না, তাহলে উভয়ে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ত ভাল,—শাস্ত্রের বিধানের জোরে টেনে রাখার সার্থকতা কি?

আমি : তা ঠিক, কিন্তু ঐ নারী-শক্তিটির জীবনটি যে খারাপ হয়ে গেল?

তিনি : খারাপ হবে কেন? তার ত অপরের সঙ্গে পুনরায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ রয়েছে।

আমি : যদি সন্তান হয়, সে সন্তান কার কাছে থাকবে?

তিনি : যদি দুগ্ধপোষ্য হয় তবে মা ছাড়া থাকবে কি করে, সন্তান মার কাছেই থাকবে, পিতা তাদের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী থাকবেন।—

আমি বলিলাম : তার পর যদি অন্য লোকের সঙ্গে যান তাহলে তাকে আর সতী বলা যাবে কি, একজন ছেড়ে আর একজনকে ধরা, আবার তার সঙ্গেও যে সারা জীবন মিল থাকবে তার নিশ্চয়তা কি?

তিনি : যেখানে শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপার আর উদ্দেশ্য হ'ল সিদ্ধি, সেখানে তোমাদের সমাজে যাকে সতীত্ব বলে এ সমাজে তার কোনও মূল্য নেই। তা ছাড়া সকল সমাজে সকলেই সতী হয় না, কেউ অভাবে কেউ স্বভাবে অসতী হয়, তাতে বাধা দেবার কারো সাধ্য নেই। তার পর পুরুষের সতীত্ব বলে যখন কোনও ব্যাপার নেই তখন মেয়েদের বেলা এতটা সতীত্বের কি দরকার?

আমি : তাহলে ত ভ্রষ্টাচার হ'ল। সমাজের মধ্যে ঘোর ব্যভিচার উৎপন্ন হতে বাধ্য,—তাতেই ত সমাজ উৎসন্ন যাবে।

তিনি : এই সব কথা বুঝি তোমার জিজ্ঞাস্য ছিল প্রথমে? মেয়েমানুষ বলে আমার কাছে বলতে চাওনি, এখন ত বেশ বলছ দেখছি,—

আমি বলিলাম : আপনিই ত আমার সঙ্কোচটি কাটিয়ে দিলেন, তাই ত বলতে সাহস পেয়েছি।

তিনি হাসিয়া বলিলেন : বেশ ত, তুমি নিঃসঙ্কোচে সব কথাই বল না কেন, কিছুই বাদ দিও না, বল।

এমন সময়ে খণ্ড ভৈরব সেই ক্ষুদ্র মন্দির হইতে একজনকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে নবাগত ব্যক্তিকে দেখাইয়া মহেশ্বরী বলিলেন : ঐ দেখ একজন, তিনটি ছেলে ও একটি কন্যার জন্ম দিয়ে, খাওয়াবার ভয়ে পালিয়ে এসে এখানে গাঢ় প্রবেশ করে সাধন করতে লেগেছেন।

যিনি আসিলেন, শ্যামবর্ণ, রোগা, লম্বা, ছিপ্‌ছিপে—,কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ,—চক্ষুদুটিতে কুটিলতা আছে কিন্তু জ্যোতি নাই,—পরিধানে রক্ত একাম্বর,—ভয়ানক ময়লা,—তিনি আসিয়া মহেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিতে গেলে, ভৈরবী পা টানিয়া লইয়া বলিলেন : খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, থাক্, থাক্,—এখন আর কত দিন এখানে থাকা হবে?

তিনি বলিলেন : এখানে মনটা বেশ বসে গেছে কিনা তাই আমার আর এখন কোথাও যেতে ইচ্ছা নাই।

মহেশ্বরী বলিলেন : যখন তারা এখানে ধাওয়া করবে তখন আর এখানে এতটা মন বসবে কি ?

তিনি বলিলেন : এখানে তাদের আসবার দরকার কি। তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা ত হয়ে গেছে।

—কোথা হ'ল আবার, কৈ কিছু শুনিনি ত!

কেন, কালীকিঙ্কর ঘোষালের সঙ্গেই ত ঠিক হয়ে গেছে।

—সে আবার কে ?

—আমার একজন শিষ্য। সে বলে কয়ে নিয়েছে—তাদের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

এইবার দেখিলাম ভৈরবী একটু ভ্রুকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন,—এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন : তোমার লজ্জা না হয় নাই, যারা একজনের গলগ্রহ হয়ে থাকবে তাঁদের ত লজ্জা আছে। যাও তুমি এখান থেকে,—তোমায় যা বলবার ছিল তা এই,—এখানে পুরুষার্থ প্রয়োগ না করলে অপরকে সুখী করা ত দূরের কথা, তুমি নিজেও এক মুহূর্তের জন্য সুখী হতে পারবে না। কিছু দিন ফাঁকি দিয়ে তোমার সংসার আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে সুখটি ভাল করেই দেখ না কেন! সে দিকেও দরজা বন্ধ। তাঁর কাজ তুমি এড়িয়ে পার পাবে ?.

সে ব্যক্তি বোধ হয় আমার মত একজন অপরিচিত লোকের সম্মুখে এতটা আশা করে নাই,—ভৈরবীকে প্রণাম পূর্বক সুড়্ সুড়্ করিয়া চলিতে চলিতে—আপনি রাগ করছেন, আমি তাঁর কাজ ফাঁকি দিই নি, মা জগদম্বা জানেন, আমি সাধন করব বলেই, ক্রিয়া-কর্ম করব বলেই এসেছি। সঙ্কুচিত ভাবে এই কথাগুলি বলিয়া যে দিক দিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন। খণ্ড ভৈরবকেও হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। তখন ভৈরবী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন : তোমারও কি ঘরে সংসার আছে নাকি, ছেলে পুলে ?—

আমি বলিলাম : সংসার আছে বটে, ছেলে পুলে ত নাই।

মধ্যে এই একটা ব্যাপার হইয়া গেল ইহাতে আমাদের পূর্ব আলোচিত কথার সূত্র ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু তিনি এই ভাবেই আরম্ভ করিলেন।

—এই দেখ তোমার সম্মুখে এই লোকটা, যে ভাবে নিজের শক্তিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা এখনও বুঝতে পারচে না। প্রকৃতির প্রতিশোধের নিয়মের কথা ত জানে না।

আমি : প্রকৃতি জননী, তিনি ত দয়াময়ী, সন্তানের উপর আবার তাঁর প্রতিশোধ কি।

তিনি : বটে, তাঁর যদি তা না থাকবে তবে জগতে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ বলে এই ভাবটা এল কি করে? তিনি যত দয়ালু আবার ততই নিষ্ঠুর, নির্মম ; দণ্ড দেবার সময় তাঁর মূর্ত্তি বড় ভয়ংকর হয়ে যায়। তবে সেই দণ্ডের ফলও কল্যাণময়, তাতে তার অকল্যাণ হয় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোন কথাই হইল না। আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলাম : আমাদের যে কথাটা হচ্ছিল,—স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হলে,—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া তিনি ধমক দিয়া বলিলেন : হাঁ হাঁ,—তোমরা স্ত্রীলোককে খুব শাসনে রাখতে ভালবাস, হিন্দুশাস্ত্রে মেয়েমানুষদের সতীত্ব রক্ষার জন্য শাস্ত্রে খুবই কঠিন নিয়ম করা আছে, কিন্তু গোড়ার কথা যেটা সে দিকে বাঁধন কৈ?

আমি বলিলাম : পুরুষের পক্ষেও এক বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া আর কোন নারীকে ত মন্দ চক্ষে দেখতে নিষেধ আছে।

তিনি : নিষেধ ত আছে, কিন্তু নিয়মটির বাঁধাবাঁধি নারীর পক্ষে কি ভয়ানক জোর নয়? এটা হ'ল কেন, বলতে পার?

আমি : এ ত সহজেই ধরা যায়,—নারী ভ্রষ্টা হলে সমাজ যে একেবারে উৎসন্নে যায়, তারা একে কোমল হৃদয়, বুদ্ধি কম, দুর্বল জাতি বলেই বোধ হয় তাদের পক্ষে নিয়মটা এত গুরুতর করা হয়েছে।

নারীর দুর্বলতা-সম্বন্ধে আমার প্রত্যেক কথায় তাঁর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেছিল। পরে তিনি স্থিরভাবে বলিলেন : এমন কোনও সমাজ দেখাতে পার যেখানে কঠিন নিয়ম করে নর-নারীর ভ্রষ্টাচার বন্ধ করতে পেরেছে? এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা সাধারণ নিয়মের বশে থাকতেই পারে না। ভ্রষ্ট নর-নারী নেই এমন সমাজ নেই। ভ্রষ্টাচার যদি না থাকে ত সদাচারেরই বা অস্তিত্ব থাকে কোথায়, একটা আর-একটাকে অবলম্বন করে থাকে যে! সমাজকে ভ্রষ্টাচার থেকে বাঁচাবার উপায় এই তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেই আছে, হিন্দুদের অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। আসলে যখনই সমাজে পুরুষের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল, তখনই এই সব নিয়মের প্রবর্ত্তন। তার আগে যখন সমাজ শক্তিমান ছিল তখন ওসব নিয়মের কথাই ত ছিল না—এখন একবার ঘরে ঘরে যেয়ে দেখ না ; দেখতে পাবে কতটা ব্যভিচার দুই পক্ষেই আছে আর তা চাপা দেবার উপায়ও কত রকমের হয়েছে। আগে ত মেয়ে-পুরুষে সমানভাবে শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী ছিল, মেয়েদের পতি-নির্বাচনের পর্য্যন্ত অধিকার ছিল, স্বাভাবিক ভাবেই ছিল ত? সে সব উচ্চ আদর্শ গেল কোথা?

আমি বলিলাম : বোধ হয় যখন এই তন্ত্রধর্মের প্রভাবে শেষের দিকে দেশে ব্যভিচার হয়েছিল, যথেচ্ছা ব্যবহার সমাজে চলেছিল, বিধি নিষেধের কোন

আঁট ছিল না, সেই সময়েই হিন্দু-সমাজপতিরা এইসব নিয়ম করে সমাজকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচিয়েছেন।

তিনি: বাঁচালেন কোথা,—এ-সমাজের মধ্যে কর্ম-শক্তি, জাতিগত একতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইহলোকে জীবন-যাপনের উন্নত কোন পথ কি আবিষ্কৃত হয়েছিল? সে বর্ণাশ্রম ধর্মের বাঁধুনি আরও জোর করেই বিধিবদ্ধ হ'ল, তাতে করে কি উন্নতি হয়েছিল বল না?

আমি: একটা উদ্দাম সর্বনাশের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র, অবশ্য অন্য দিকে সমাজের আর কোন উন্নতি হয় নি। দেশ তখন ত পরাধীন হয়ে পড়েছিল। বিধর্মী যবন রাজার আশ্রয়ে এ জাতির কোন উন্নতি সম্ভব ছিল কি?

তিনি: নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করাই কি দেশ পরাধীন হওয়ার মূল কারণ নয়?

আমি বলিলাম,—দেশ পরাধীন হবার অনেক পরেই ত নারীর অধিকার বা স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল।

তিনি: এইখানে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে এটা দেখিয়ে দিতে হচ্ছে যে কোন সময়ে কোন সমাজেই নারী কর্তা ছিল না, প্রথম থেকেই কর্তৃত্বটা নারী-ধর্ম বিগর্হিত। পুরুষ-সমাজ যে দিকে চলে নারী-সমাজও সেই পথে চলে পুরুষদের অবলম্বন করে, প্রেমের ভিতর দিয়ে শক্তির প্রেরণা যোগায়। সৃষ্টিতে সর্বত্রই পুরুষের অধিকার স্পষ্ট চক্ষে এখনও প্রবল আছে। পুরুষই পরিচালক, এ ত আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাচ্চি। সমাজের যে-যে অবস্থায় পুরুষ নির্ভীক, কর্মশক্তিমান, বীর—নারীও ঠিক সেই ধারায় গুণবতী, শক্তিমতী। তার পর এক একটা ভাব, কর্ম-উদ্যম সমাজে এক এক সময় এসে সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে, সমাজের নর-নারী তাইতে অর্থাৎ সেই ভাবের আনন্দে অনুপ্রাণিত তাদের জীবনটি ভাসিয়ে দেয়। এই ভাবে একটা উন্নতমুখী ভাবধারা সমাজে কিছু দিন চলে। তার পর প্রত্যেক কর্ম বা ভাবই ঐখানে প্রতিক্রিয়ামূলক। তার ফলেই সমাজে একটা অবসাদ আসতে বাধ্য। তখন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। সেই সময়েই যাঁরা সমাজের চিন্তাশীল মানুষ, মহাপুরুষেরা এসে যথার্থ পথ নির্দেশ করেন। কোন্ পথে গেলে সমাজ বা জাতি রক্ষা পাবে তার ইঙ্গিত করেন। কিন্তু পরলোক ও অধ্যাত্ম ধর্ম এইটেই এ দেশের মাটিতে এমন শিকড় গেড়ে গেছে যে ইহলোকের উপকারী এমন অনেক বীর মধ্যে মধ্যে এসেও দেশের মধ্যে সঙ্ঘ বা রাষ্ট্রশক্তি জাগিয়ে স্থায়িভাবে তুলতে পারেন নি। বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে তন্ত্র-ধর্ম মিশে অনেক দিনই এ দেশের সমাজকে বেঁধে গেছে, এখনও তার জের চলেছে। তবে উপনিষদের তত্ত্ব বা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার মধ্যে বৈদান্তিক ধর্মের প্রভাব এখন সমাজের উপর খুব বেশী, জ্ঞানের যুগ চলেছে এটা, কাজেই বৌদ্ধ বা তন্ত্রধর্ম এখন তলায় পড়ে গেছে। তখনও যেমন এখনও তেমন সমাজে নর বা পুরুষেরই প্রাধান্য—কিন্তু মূলে পুরুষের সঙ্গে নারীর যোগ, তা ত অবাধ নেই, সেই যে বাধা তাইতে কি সমাজ-শক্তিকে পাছু করে ফেলে নি? তাইতেই কি এদেশের পুরুষেরা বহুল পরিমাণে কর্মশক্তিহীন হয় নি? আর সেইটিই কি অধঃপতনের মূল কারণ নয়?

পূর্বের কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:

নারীপক্ষে স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল বলেই কি সমাজে বা রাষ্ট্রের মধ্যে পুরুষেরা শক্তিহীন হয়েছে এই কথা বলছেন?

—সমাজে পুরুষ মানুষই যখন সর্বকালেই শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান, তখন সমাজকে সুশৃঙ্খলায় চালাবার কর্তাও যে পুরুষ আর উচ্ছৃঙ্খল করবার বেলাও কি সেই পুরুষের কর্তৃত্ব দায়ী নয়?

—এতে ত পুরুষের দায়িত্ব বুঝা গেল, কিন্তু নারীর স্বাধীনতা খর্বের জন্যই যে দেশ বা রাষ্ট্র শক্তিহীন হয়েছে তা ত বুঝা গেল না।

—পুরুষের সকল কর্মই ত একা তার নয়, সঙ্গে তার নারী আছে ত?

—তা নিশ্চয়ই আছে, স্ত্রীপুরুষ যুক্ত হয়েই ত একটি সম্পূর্ণ জীবন, তা বুঝেছি।

—তবে, যেখানে পুরুষে নারীকে তার অধিকার সীমাবদ্ধ করে দিয়ে নিজের ভাগে সর্ব দিকেই অবাধ শক্তি রেখে দেয় তাতে তার কি এক অংশে দুর্বলতা প্রশ্রয় পায় না? আর সে দুর্বলতা কি সমাজের গায়ে লাগে না, তার ফলাফল একটা নেই?

—কথাটা এই যে উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে গেলে নারীপক্ষে যে ব্যভিচার হয়েছে, নারীপক্ষে স্বাধীনতা থাকার জন্য যে সব অশুভ ফলাফল ঘটেছে তা থেকে দেশ বা সমাজকে বাঁচাতে হলে কি নারীপক্ষের অবাধ ব্যবহার সংযত করবার দরকার ছিল না?

—সেটাও যেমন দরকার ছিল পুরুষপক্ষেও ত তাদের সেই অবাধ ব্যবহারকে সংযত করবার দরকার তেমনই ছিল। তা না করে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে নারীকে দায়ী করে শক্তিমান পুরুষ-মোড়লেরা নারীর অধিকারকে সর্বদিকেই খর্ব করে, বাল্য বা শিশুবিবাহের নিয়ম করে কি নিজপক্ষের দুর্বলতাকে বেশী প্রশ্রয় দেন নি? আর তাইতেই কি দেশ বা রাষ্ট্রশক্তি আরও হীন হয়ে পড়েনি?

—আমার এটা বড়ই বিসদৃশ লাগে, চিরকালই পৃথিবীর সকল সমাজেই বিবাহের কাল যৌবনকে ধরেই নিয়মিত হয়ে চলেছে, এই ভারতে মধ্য যুগে হঠাৎ এর ব্যতিক্রম কেন যে হয়ে গেল তা ভেবে কূল পাওয়া দুষ্কর।

—বেশী ভাবতে হবে কেন, কূল ত হাতের কাছেই রয়েছে। যে জাতের পুরুষেরা নারীকে আদ্যাশক্তির শক্তি বলে ধারণা করে, বিবাহিত জীবনকে পূর্ণ এবং শক্তিমান জীবন এই বলে বড় গলায় শাস্ত্রের মধ্যে প্রচার করে গেছেন, তার পর শক্তিমান জীবনে পূর্ণ শক্তির ফলভোগ করেছেন, শেষে তারাই শক্তির ব্যভিচারে অবসন্ন হয়ে, শক্তিহীন হয়ে প্রতিক্রিয়ার বশে নারীজাতি গোজাতির সমান, ছাড়া পেলেই চরে খাবে, 'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু' এইসব ভাব তাদের মধ্যে যদি না আসে ত কার মধ্যে আসবে বল? আসন্নকালেই না বুদ্ধি বিপরীত হয়ে থাকে, জান ত একথা। কাজেই এই নারীকে সমাজ-জীবনে দাও পঙ্গু করে। শুধু পুরুষের ভোগের কাজে যেটুকু দরকার সেইটুকুই থাক। একবারে পঙ্গু করবার উৎকট উপায় হ'ল শিশু-অবস্থা থেকেই বেঁধে ফেলা। ওদের স্বাধীন ভাব বিকাশ হবার পূর্ব থেকেই মেরে দাও যত কিছু ব্যভিচারের বীজ। বাঘ বা সিংহকে বাচ্চা বেলা থেকে আফিং খাইয়ে শেয়াল কুকুর করার গল্প জান? সেই রকম আর কি।

—এর মধ্যে থেকেও কিন্তু অনেক অনেক নারী গরীয়সী জীবন পেয়েছেন দেখতে পাই।

—আহা, তুমি তোমার বাড়ীর ভিতরে কোন সময় যা খুশী যথেচ্ছাচার করতে পার, কিন্তু সব সময়েই কি সকলকার উপর তোমার আধিপত্য খাটে, না খাটবে? সব পুরুষেই ত শক্তিমান নয়! প্রকৃতির নিয়মের ব্যাভিচার—এক দু-চারজন শক্তিশালী লোক কোন সময় কোন সমাজে হয়ত করতে পারে কিন্তু তার কি শেষ নেই, অবসান নেই! শেষে তাঁর ইচ্ছাই ত পূর্ণ হবে! আসলে দেশের পুরুষে নিজেরাই ত সমাজকে গড়ছেন ভাঙছেন। স্ত্রী অথবা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই ত এক একটি জীবন, আর সেই জীবনের সমষ্টিই ত সমাজ বা দেশ। যখন সেখানে উভয়ের অবাধ স্বাধীনতার ফলে ব্যাভিচার হয়ে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ল, পুরুষেরা ইন্দ্রিয়-সুখটাকেই বড় করে, নারী বলতে যে শক্তি সেটা ভুলে সমাজে যথেচ্ছা শক্তির অপব্যবহারে গা ভাসিয়ে দিলেন। আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। তার ফল যা হয়, পুড়ে গেল তাদের বল বীর্য্য সদ্‌বৃত্তি, উদার ভাব সেই আগুনে। তখন বিকৃত সমাজকে পদানত করে,—সেটা কি বেশী আশ্চর্য্যের কথা? তাই ত হয়ে থাকে। বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা—জান ত একথা? তোমার দেশের পুরুষ মানুষেরা ত আর বীর ছিল না, সবটুকু তাদের বীর্য্যই ইন্দ্রিয়-সুখের পথে যথেচ্ছা নারীশক্তির অপব্যবহারেই নিঃশেষ করে ফেলেছিল; আর ধর্মের নামে—মহাপাতকের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আসলে অন্নে পূর্ণ দেশে ত কখনও অন্ন-সমস্যা ওঠে নি, তা উঠলে হয়ত এতটা অধঃপতন হ'ত না। যে দেশে অন্ন-সমস্যা আছে সেই দেশের মানুষে শক্তিশালী হয়। তারা নারীশক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করে, এমন করে হেয় করে না। নারীর মধ্যে শক্তির আবিষ্কার এইখানেই হয়েছিল আর তার ব্যাভিচারও এইখানেই চরম সীমায় উঠেছিল, এখনও তার জের পুরো দমে এইখানেই চলেছে।

আমি: এই দেশেই ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা এমনভাবে প্রচার হয়েছিল যা পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি।

তিনি: আহা তাই তো গো, ব্রহ্মচর্য্যের অপর দিকটাও ত আবার তাকেই না প্রচার করতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য থাকলে যা হয় তার দৃষ্টান্ত যেমন আছে, আবার তার ব্যাভিচারেও যা হয় তার দৃষ্টান্তও তেমনি রয়েছে,—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে! আসলে এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে একদল মানুষ তাদের জীবন দিয়ে এতগুলি অপূর্ব শক্তি আবিষ্কার করে গেল, তার পর যে দল এল তারা আবার জীবন দিয়ে তাই পরীক্ষা (এক্সপেরিমেণ্ট্) করে গেল, তার পর যারা এল তারা জীবন দিয়ে তার ব্যাভিচার করে গেল,—ফুরিয়ে গেল তিন পুরুষের সেই শক্তির খেলা। এইভাবেই ত চলবে।

আমি বলিলাম: আপনার কাছে আজ যে কথা শুনলাম, একথা আগে কারো কাছে বোধ হয় এমন ভাবে শুনি নি,—আমাদের দেশে নারী, এত পরাধীনতার মধ্যে কোণঠাসা হয়েও এখনও মহিমাময়ী,—আমি কোন পুরুষ জ্ঞানীর কাছে একথা শুনলে ত এতটা আশ্চর্য হতুম না।

তিনি: আচ্ছা উল্টে আমিও তোমার মুখে একটু মিষ্টি দিয়ে দি,—আমি বলি, তোমার মত ছেলেও আমি দেখি নি, এমন করে খোলাখুলি কেউ আমায় এসব কথা জিজ্ঞাসাও করে নি, বেশীর ভাগই সব কনো-শোরের দল। কাছে

এসে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না, একেবারেই কাহিল, যেন তাদের কিছু জানবার নেই, জানবার শক্তিও নেই, ইচ্ছাও নেই। গোঁফ-দাড়িওলা পুরুষ মানুষ অনেক রকমই দেখি ; একদল আছে, তাদের যদি কারো একটু রক্ত-মাংসের তেজ থাকে, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, অমনি দেখি তার চোখের দিকে, কুৎসিত ইন্দ্রিয়-সুখের লালসে রাঙা, যেন মেয়েমানুষের কাছে আর কিছু পাবার নেই, যেন আর কোন সম্বন্ধ নেই। তাদের মুখে আগুন লাগিয়ে দাড়ি-গোঁফগুলো পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। আবার আর একদল আছেন একটু কাহিল শরীর, কাছে এসে বসলেন ত একেবারেই ক্রীতদাস, যা বলব তাই একেবারেই সিদ্ধান্ত। তাদের দিয়ে যা খুশী করিয়ে নাও আপত্তি নেই। ঘেন্না ধরে গেছে এদেশের পুরুষ দেখে দেখে, পোড়াকপাল!

আমি : মাটি করে দিলেন আপনি, বেশ বলছিলেন, কোথা থেকে এসব পুরুষদের কথা এসে,—

তিনি : হাজার হোক, মেয়েমানুষ আমরা, কথা পাড়লে না ব'লে যে থাকতে পারি না,—জান ত মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না। আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল, তুমি হয়ত বিজ্ঞের মত, আমার কতটা পড়াশুনা আছে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসবে!

আমি : ছি-ছি—আপনার পড়াশুনার কথা আমার মনে হয় নি, তবে আমি ভেবেছিলাম যে আপনি আমাদের দেশে সাধারণ লেখাপড়া জানা বা পাশ-করা মেয়েরা যেমন হয় তা নন। আপনার মধ্যে একটা ঐশ্বরিক শক্তি আছে।

তিনি : একজন হাইকোর্টের জজ,—নামটি কি যেন—সারদা মিত্তির। তাঁর সঙ্গে গত বছর ভুবনেশ্বরে দেখা, ১৯১৭/১৮ সালের কথা। তিনি চেঞ্জে গিয়েছেন,—বড় দরের মানুষ তিনি, দেখেই বোধ হ'ল। তার পর কথায়-বার্তায় পরিচয় পেলাম, সাধন-ভজন প্রাণ খুলে করতে পারেন না, সেজন্য প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা তাঁর মধ্যে আছে। আমি তাঁকে বলেছিলাম ঐ যে আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা তাইতেই আপনার সাধনের কাজ হয়ে গেছে, আর কোন সাধনেরই দরকার হবে না। হাঁ, এখন সেই ছোকরাটির কথা বলচি! তাঁর কাছে একটি ছোকরা দেখেছিলাম—এম-এ পাশ, রোগা ক্ষীণ শরীর, যেন শরীরে তার কিছু সত্ত্ব নেই। একদিন সেই ছেলেটি আমার কাছে এসে উপস্থিত, কি ব্যাপার? না, আপনার পড়াশুনা কতদূর বলতে হবে। খুব পড়াশুনা না থাকলে আপনি কখনই এত বড় বড় কথা বলতে পারতেন না।

আমি তাকে বললুম : কৈ সারদা বাবু ত একথা আমায় কখনও জিজ্ঞাসা করেন নি? সে বললে,—তিনি না করতে পারেন কিন্তু আমি যতক্ষণ সেটা আপনার মুখে না শুনছি ততক্ষণ কিছুতেই স্থির হতে পাচ্চি না।

মহেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন : দেশের এসব ছেলেগুলো যদি চাষ-আবাদের কাজ শিখত কিম্বা ভাল করে শুভংকরী শিখে আড়তদারী কাজ শিখত ত ভাল হতো। তাদের বাপ মা পয়সার লোভে পড়তে দিয়ে তাদের মাথা খেয়ে দিয়েছে একেবারে। দেখে বড় কষ্ট হ'ল।

ভৈরবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন : এত কথা ত শুনলে, বল ত দেখি প্রতিক্রিয়ার কথাটা কি-রকম বুঝলে?

আমি বলিলাম : এই একটু বুঝলাম, আমাদের যত কিছু কর্ম, সাংসারিক

সামাজিক বা ধর্ম-সম্বন্ধে সকল ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, যার কখনও ব্যতিক্রম হয় না। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

—এটুকু ঠিক হ'ল,—তার পর নর-নারীর ব্যবহার সম্পর্কে?

আমি বলিলাম: নর-নারী যুক্ত হয়ে সংসার সমাজ বা ধর্মমার্গে কাজ করতেই আমাদের পরম প্রকৃতির বা ভগবানের নির্দেশ। যেখানে নারীকে তার পূর্ণ-অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষ সেই অধিকার নিজে গ্রহণ করতে যায় সে-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। সে-সমাজ জগতের কাছে, নিজের কাছেও হীন হয়ে থাকে, যেমন আমাদের এখন হয়েছে।

তিনি: নারীর পূর্ণ অধিকার বলতে কি বুঝেছ এখন আমায় বল ত বাবাজী।

আমি: চিরকালটা, জন্ম থেকে আমাদের সমাজে নারীর পূর্ণ অনধিকারই দেখে শুনে আসছি, তাদের এক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার যে কি একথা ভাবতে গেলে খেই হারিয়েই ফেলি যে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন: তোমার এই অকপট ভাবটি আমার বড়ই ভাল লাগে, সত্য বলছি। তোমার তন্ত্রশাস্ত্র মতে সাধন দেখবার আকাঙ্ক্ষার কথা থেকেই যখন এত কথা উঠছে, তখন একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—তন্ত্রের বই ত অনেক আছে, তা পড়বার ইচ্ছা না হয়ে সাধন দেখতে ইচ্ছা হ'ল কেন?

আমি বলিলাম: তন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের সমাজে বড়ই একটা কুৎসিত ধারণা আছে, আমার মনে হয়েছিল সত্যই কি এটা এত কুৎসিত! তাই দেখবার জন্যে, বুঝবার জন্যেই আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। তার পর বই পড়ার কথা বলছেন, তাও কিছু কিছু পড়েছি। আগমসার, নিগমসার, তন্ত্রসার, মহা-নির্বাণ তন্ত্র বলেও একটি গ্রন্থ আছে দেখেছি। কিন্তু এসব দেখেও আসল ধর্মের কিছু নির্দেশ পাই নি। বই পড়লে হয় না।

তিনি: তুমি কি সংস্কৃত পড়ে ভাল বুঝতে পার?

আমি বলিলাম: না, সামান্য রকমই পারি, তবে অনুবাদ আছে তারি সাহায্যে এক রকমে বুঝি নিই, বিশেষ কিছু বাধে না। কিন্তু বই পড়ে আসল কাজ হয় না, প্রাণের তৃপ্তিও হয় না। তাই সাধন দেখতে চেয়েছিলাম। এখন আপনি নারীর পূর্ণ অধিকার কি তাই বলুন—

তিনি: পূর্ণ অধিকার ঠিক করবার আগে পূর্ণ মিলনটাই হোক, তবেই ত তার অধিকারের প্রশ্ন? আগে যদি তার সঙ্গে তোমার মিলনই না হ'ল তবে ত অধিকারের প্রশ্নই নেই।

আমি বলিলাম: ধরুন না কেন পূর্ণ মিলন ঠিক হয়ে গেছে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন: তাহলে পূর্ণ অধিকারও ঠিক হয়ে গেছে।

আমি: তবে কি বুঝতে হবে যে পূর্ণ রকম মনের মিল হলেই পূর্ণ অধিকার আপনিই সাব্যস্ত হয়ে যাবে?

তিনি: সে কথা তোমার বুঝতে এতটা দেরী হবে আমি আশা করি নি। মনে কর মোটামুটি একটা কথা, যারা দুজনে দুজনের কাছে পূর্ণ রকমের উলঙ্গ হতে পারে তাদের মধ্যে কার কতটা অধিকার এ প্রশ্ন উঠতে পারে কি?

আমি: তাহলে আমার ধারণা পূর্ণ রকমের মিলন এমনই একটি বস্তু যা মানুষের সমাজে দুর্ঘট।

তিনি: হাঁ গা, পূর্ণ যখন বলছ তখনই কি একটা দুষ্ট জিনিসের কল্পনা কর নি? এখন পূর্ণ ছেড়ে খণ্ডের মধ্যে এস, এখানে কিছুই দুষ্ট নেই—

তিনি বলিতে লাগিলেন: এই মিলনের কথা, তার পর অধিকারের কথা। তন্ত্রমতেই আমি বলছি,—তবে পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী, হস্তিনী বা শশক, মৃগ ও বৃষজাতীয় পুরুষ স্ত্রী এ সব কথা বলব না। তন্ত্রের মধ্যে নর-নারী বিচার এমনই সুন্দর করে ধরা হয়েছে যার কোন প্রতিবাদ সম্ভব নয়। আচ্ছা, আমরা এটা ত বেশ দেখতে পাই যে সকলের সঙ্গে সকলের মিল হয় না।

—এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।

—বেশ, এ ত বুঝতে পার! যখন যৌবনের প্রভাব আসে তখন খোলা চোখে অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাতে মনে হয় সকলের সঙ্গেই সকলের একটা মিল যেন আছে। মনে কর দুটি অবিবাহিত কুমার-কুমারী কোন ক্ষেত্রে এক জায়গায় দেখা হ'ল। সেই প্রথম দেখাতেই তাদের মধ্যে যদি রূপের বিশেষ তারতম্য না থাকে তাহলে একটা ভাব এই দুজনের মধ্যে হয় কি না? প্রথমেই তাদের মধ্যে মনে হয় যেন উভয়ের মিলন সম্ভব, যদিও স্পষ্টভাবে তখন দুজনের সঙ্গে দুজনার কোন পরিচয়ই নেই।

আমি: তা হতে পারে।

তিনি বলিলেন: তা কিন্তু ঘটে না। কেন জান? মানো বা না মানো. জেনে রাখ যে, প্রকৃতির হাতটি পূর্ণভাবেই এই নর-নারীর মিলনের মধ্যে থাকে বলে। সেই জন্যই বাঙ্গালায় কথা আছে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে—এ তিন বিধাতা নিয়ে। এমন কোন মিলন তিনি ঘটাতে দেবেন না যাতে তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ হবে না। অর্থাৎ এমনই মিলনের যোগাযোগ তিনি ঘটাবেন যাতে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একথা সকলের আগে ভারতের তন্ত্রের ঋষিরাই আবিষ্কার করেছিলেন।

—বড়ই আশ্চর্য্য,—আগে, ছেলেবেলা থেকেই এ কথাটা মেয়েদের মুখে শুনে এসেছি, কিন্তু এমন করে সত্যভাবে এটা ধারণা করতে পারি নি।

—আরও আশ্চর্য্য কথা আছে এর পর, শোন,—মানুষ তাঁর সৃষ্টি, তাঁর রাজ্যে বাস করে, তাঁর অন্ন খায়, তাঁরই সৃষ্ট সকল সুখ-সুবিধাই ভোগ করে বটে কিন্তু আদুরে ছেলেকে বাপ বা মা যেমন অনেকটা বেশী অধিকার দেন তেমনি ভগবানের শেষ এবং চমৎকার সৃষ্টি এই মানুষকে আদুরে ছেলের মতই অনেক বেশী অধিকার তিনি দিয়ে ফেলেছেন,—বুদ্ধি, মন জাগ্রত আশা দিয়েছেন, অনন্ত সম্ভাবনা দিয়েছেন। কেবল সেটা কালের মধ্যে দিয়ে ফোটবার নিয়ম করেছেন বলেই রক্ষা, না হলে তাঁর এ সৃষ্টি থাকত না। মানুষ অনুকূল অবস্থা পেলেই তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধে যায়। এখন ধর, এমনই অবস্থায় যদি কোন মানুষ প্রকৃতির নিয়মের বাধা না মেনে ইচ্ছামত যে কোনও একটা নারীকে চায়, ভোগ দখল করতে চায়, তার জন্য উৎকট পুরুষার্থ প্রয়োগ করে, তখন তিনি কি করে তার ব্যবস্থা করেন জান? সেখানে সেই মিলনটুকু, মাত্র ইন্দ্রিয়সুখেই শেষ হয়ে যায়,—সে মিলনের ফলে তা থেকে কোন জীব উৎপন্ন হয় না, বংশ উৎপন্ন হয় না। ঐখানে আরম্ভ আর ঐখানেই তার শেষ করে সে মিলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

আমি ঃ তাই বোধ হয় আমরা দেখতে পাই যে অনেকের বংশ থাকে না, বন্ধ্যা হয়ে তারা জীবন কাটায়।

তিনি ঃ একই কারণ থেকে যদিও তা হয় না, তার অন্য অনেক কারণ আছে। এখন সে কথা যাক, যা বলচি, পুরুষের মধ্যে কারো কারো এমন দেখা যায় না কি যে একটা মেয়েতে তার কামের তৃপ্তি হয় না?

—এ ত আমরা খুব দেখতে পাই যদিও সংখ্যায় খুব বেশী নয় তারা।

—এর মধ্যে সভ্য-অসভ্য, বিদ্বান-মূর্খ, এসবের কিছু নেই, এ তাদের অন্তর-প্রকৃতি নিয়েই কথা। ঐ সব পুরুষ কখনও একটি বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে সুখী হতে পারে না, বা একটি নারীর সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে পারে না।

—তারাই নিকৃষ্ট জীব মনে হয়।

—তোমার মনে হতে পারে কিন্তু পরমা প্রকৃতি বা ভগবানের তা মনে হয় না, তাদের ভোগের অনুকূল শক্তি বা নারী তিনিই ত যুগিয়ে দেন। তার মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য থাকে যে। তাকে দিয়ে তিনি অনেকগুলি জীব সৃষ্টি ও পালন করিয়ে নেন। আমরা বাইরে থেকে মনে বিচার করে আমাদের সংস্কার-অনুযায়ী যে রকম বুঝি তার সঙ্গে আমারই ব্যবহারের সম্বন্ধ থাকে, তাঁর উদ্দেশ্যের ধার দিয়েও আমরা যেতে পারি না।

—তাহলে যারা অত্যন্ত কামুক, বহুস্ত্রী-পরায়ণ, ধর্মাধর্ম নেই এমন যারা তারাই তাঁর প্রিয় বলুন?

—এই সৃষ্টির মধ্যে দুটো দিক্ কি আমরা দেখতে পাই না?

আমি ঃ পাই।

তিনি অমনি প্রশ্ন করিলেন ঃ কি পাও বল দেখি?

আমি বলিলাম ঃ স্থূল, সূক্ষ্ম, অথবা বাহ্য ও অন্তর এই দুই দিকের কথাই ত বলছেন?

তিনি ঃ হাঁ, একটি হচ্ছে সৃষ্টিবৃদ্ধির প্রবাহ, আর একটি সঙ্কোচ অথবা অন্তরমুখী প্রবাহ—যেটি সৃষ্টি বা সমাজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। একটি হল ক্রিয়া, আর একটি তার প্রতিক্রিয়া ; এক দিকে তাঁর বাহ্য সৃষ্টিতে যে সব শক্তিমান জীবের মধ্যে দিয়ে অনেক অনেক বংশ সৃষ্টি করিয়ে নেন,—তারাই শাস্ত্রে বৃষজাতীয় পুরুষ। ষাঁড় আর কি! মানব সমাজের তারা ষাঁড়। উদ্দাম তাদের প্রবৃত্তি, সুস্থ বলবান শরীর ; ধ্যান তাদের দুটি জিনিসের উপর থাকে, নানাবিধ ভোগ, আর মৈথুনের ফলে বংশবৃদ্ধি। যে কোন রকমের মেয়েমানুষ, এদের কাছে একেবারে কেঁচো হয়ে পড়ে। এমনি এদের প্রভাব।

আমি ঃ তাহলে তারা নিম্নস্তরের জীব বলুন,—

তিনি ঃ না, না, তা ঠিক নয়,—ছ-টা পাস-করা বিদ্বানের বুদ্ধি দিয়ে এ সব হিসেব চলবে না, এর অন্য দিক আছে। আসলে গরু-সমাজে ষাঁড়ের যে খাতির, যে পদ, মানব-সমাজের মধ্যেও তারা তাই। তারাই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ শক্তিমান বলে প্রকৃতি তাদের ইচ্ছানুরূপ সকল সম্পদই যুগিয়ে দেন। তাঁর কাছে এরা আদরের ছেলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি বুঝে নিও। এই যে বাঙ্গলায় এক সময় বহুবিবাহ-প্রথা সমাজে চলেছিল সেটা তাঁরই একটি বংশ-বৃদ্ধির খেলা। ঐ সময়েই এ দেশে ঐ রকম বহুতর ষাঁড়জাতীয় মানুষ জন্মে বহু ভাবে এই ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বংশের বৃদ্ধি করেছে। ভবিষ্যতে একটা জাত গড়বার জন্যে তিনি প্রথমে ঐ রকমই করে থাকেন। এখন সেটা যেন

দোষের মনে হচ্চে, তখন ছিল গৌরবের জিনিস। তার পর, এটা হ'ল সৃষ্টির বাইরের দিকের বৃষ, আবার সূক্ষ্মের কথা আছে। এই বৃষ-জাতীয় পুরুষই অন্তর ক্ষেত্রে তত বড়। তখন তাদের আর বংশবৃদ্ধি লক্ষ্যটা থাকে না, সে লক্ষ্য সমাজকে সংঘবদ্ধ করবার দিকে গিয়ে পড়ে। সমাজ উন্নত করবার দিকে যায়। বড় বড় শক্তিশালী দল গড়ে। মৈথুনের ফলে যেটা বংশবৃদ্ধির সহায়তা করত, সূক্ষ্মভাবে সেটা প্রেমের টানে বহু লোককে তার কর্ম বা ধর্মের প্রভাবে এক করাই হয় তখনকার বৃষজাতীয় মানুষের প্রবৃত্তি। এই ভাবে দেখ না কেন জগতে দুই দিকেই বৃষজাতীয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় আছে। এই হ'ল তন্ত্রের মতে এক শ্রেণীর মানুষের প্রকৃতি।

আমি: আচ্ছা, এইবার বলুন—

তিনি: তাই বলছি,—এখন বুঝে দেখ, নারী প্রকৃতিও ত নানা রকম আছে। এক রকম মেয়েমানুষ আছে যাদের লজ্জা সরম খুব কম, পুরুষ ঘেঁষা, নিঃসঙ্কোচ ভাব, দৃঢ় শরীর, নারী-সুলভ দুর্বলতা মোটেই নেই। কোন ভাবে তারা চট্ করে গলে না, শাসন মানে না। খুব হুড়ে, যেন মদ্দা ভাব।

আমি: হাঁ হাঁ, নির্লজ্জ বেহায়া আমরা যাদের বলি,—

তিনি: হাঁ, তারাই প্রকৃতির প্রিয় সন্তান। তোমাদের চোখ যে অন্ধ, প্রকৃতি জননী বা ভগবানের উদ্দেশ্য তোমরা যে বুঝ না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণই হ'ল এই যে, যাঁকে তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন, যেটি তাঁর বিশেষ যত্নের জিনিস, তাদেরই তোমরা বল খারাপ। তোমরা যেমন নিজেরা পঙ্গু হয়ে পড়েছ—তোমরা চাও ঐ রকম পঙ্গু। আসলে যে শক্তি পরবর্তী জীবনে মহাকর্মে প্রসারিত হয়ে সমাজে অনেক কিছুই করবে, সে শক্তি প্রথম বয়সে কি করে জড়ভরতের মত নিস্তেজ শান্ত হতে পারে, এটা কি মনে আসে না তোমাদের?

আমি: আমরা চাই নারীকে নারীর মতই শান্ত দেখতে—

তিনি: পোড়াকপাল তোমাদের চাওয়ার, তোমরা চাইচ কোন্ অধিকারে? চাওয়া মানেটা কি বোঝ? শক্তিহীন না হলে চাইবার কি আছে কার? তোমরা চাইলেই বা দিচ্চে কে? শক্তিমান যারা হয় তারা চায় না, গড়ে; মনোমত গড়ে নিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সার্থক করে। ফের ওরকম পাগলামো করো না আমার সুমুখে—

আমি: আমাদের ধারণা এই যে, পুরুষের ভোগের জন্যেই নারীর সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং নারীকে পুরুষের মনোমত হওয়া চাই না কি?

তিনি: বাঘ-সিঙ্গিরাও চায় যে মানুষ আমাদের ভোগের বস্তু, তারা সুড়্‌সুড়্ করে চুপচাপ্ চলে আসুক আমাদের কাছে,—আমরা নির্বিবাদে আমাদের ভোগ মিটিয়ে নি। বাজে কথা উঠিও না, এখন আমার উঠতে হবে, সন্ধ্যা হয়ে এল যে।

আমি বলিলাম: মনে যেটা উঠছে বলে ফেলাই ভাল, মনে করেই বলেছিলাম—

তিনি: মনে যা ওঠে তাই কি বলে ফেলতে হয়? আহাম্মুক বনে যাবে যে সমাজে। মনকে এখনও বোঝনি বাছা। মনের পেছনে ছুটে চলেছ

এখনও—

আমি লজ্জিত হইলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন: আসলে যে ভিন্ন ভিন্ন নারী-প্রকৃতি আছে দেখেছ ত, তাদের প্রত্যেকেরই এমন বিশেষ বিশেষ গুণ আছে যে সে, ক্ষেত্রে যে জীব জন্মাবে তাদের মধ্যে ঐ সব বিশেষ গুণেরই বিকাশ হবে।

তাতে স্রষ্টার উদ্দেশ্যই সফল হবে, তুমি আমি যা হিসেব করব তা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে সে কথা না কওয়াই ভাল।—বুঝেছ?

আমি: আচ্ছা ধরুন, আমাদের যে ভাবে বাপ-মা কন্যা বা পাত্র নির্বাচন করে বিবাহ দেয় তাতে যেমন অনেক সময় মিলনটা ঠিক হয় না দেখতে পাওয়া যায়, আপনাদেরও তন্ত্রমতে ত স্বাধীন ভাবেই মিলন হয় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ত ঐ রকমের অমিলও হয়—তাহলে ঐ স্বাধীন আর পরাধীন হয়ে বিবাহ-মিলনের প্রভেদ রইলো কি?

—যে নর-নারীর প্রথম মিলন স্থায়ী নয় সেখানে বুঝতে হবে তাদের দু-জনেরই জীবনে অপর নর-নারীর সম্বন্ধ ঘটবে যাতে তাদের জীবনের সফল হবে। তবে এই যে স্বাধীন আর স্বাধীন সমাজের বিবাহ কথা বলচ, আসলে দুই সমাজের যে মিলন তাতেও তাঁর হাত আছে। যেখানে নর-নারীর মিলন সেইখানেই তাঁর হাত।

—গুপ্ত মিলন বলে একটা মিলন ত দুই সমাজেই আছে—তার ব্যাখ্যা কি?

—সেটার কথা ত বলেছি, পুরুষার্থের জোরে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যে মিলন তার ফল ভাল নয়।

—তাতেও জীব সৃষ্টি হতে পারে।

—যখনই কিছু সৃষ্টি হয় আর যদি তাতে জন্ম-মৃত্যু থাকে, সেখানে তাঁরই হাত আছে বুঝতে হবে। তবে স্বাধীন বা অধীন সমাজ হিসাবে ব্যবহারে তার ফল আলাদা।

॥ ২৪ ॥

আমাদের শৈব বিবাহের কথাই চলিতেছিল। আমি বলিলাম: এতটা উদার এই শৈব বিবাহ এ সমাজে ত চলল না। শুধু তা নয়, এখনকার দিনে এদেশের খুব কম লোকেই এই বিবাহের কথা জানেন। আমাদের মত বেশীর ভাগ লোকই জানে না যে শৈব বিবাহ বলে একটি পদ্ধতি এদেশে আছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-কথা আলোচনার পর থেকে এর কথা আমরা জানতে পেরেছি; তার আগে ত শুনিনি, জানিনি।

ভৈরবী বলিলেন: জানবে কি করে, বৈদিক আর্য্য হিন্দুর দল যে এ পদ্ধতি নিলে না, তাতে তাদের ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে বর্ণসংকরের উদ্ভব হবে যে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কেউ এড়াতে পারে না, পেরেছে,—সেই ত হিন্দু বামনদের গড়া সমাজ বর্ণসংকরময় হয়ে উঠেছে; প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নে, কত রকমেই না কত কত সংকর বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে, হচ্ছে,—কে তার হিসাব রাখছে।

আমি: এটা কি কম আপশোষের কথা, বিবাহের মত নিয়মের বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও এতটা ব্যভিচার! এক একবার মনে হয় যেন এ সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকলে ত আরো এসব বেশী বেশী হবে।

ভৈরবী: এখনও তুমি মেয়েদের ক্রীতদাসী করে রাখবার মোহ কাটাতে

পারিনি দেখছি। এটা বুঝতে পাচ্ছ না যে সর্বনাশ কোন্ পথে এসে তোমাদের পৌরুষকে ধ্বংস করেছে ; এত কথার পরও জাতির গোঁড়ামো, আর পুরানো বিবাহ-প্রথা, ভট্টাচার্য্যদের আধিপত্য আঁকড়ে ধরে আছ !

আমি : তা ঠিক নয়, যেটা বেশীর ভাগ পুরানো-তন্ত্রের লোকেরা মনে করেন তাঁদের যুক্তির দিক থেকেই কথাটা বলে ফেলেছি। আর আমাদের মত লোকের ভিতরে কিছু কিছু পূর্ব সংস্কারের বীজ ত রয়েইচে, এক একবার উঁকি মারে বৈকি ! দেখেছি যাঁরা সমাজ-সংস্কার চান তাঁরাও স্ত্রী-স্বাধীনতা একেবারে চান না, একটু আধটু চান, স্ত্রীকে বেশী রাশ আলগা দিতে চান না কারণ—

তিনি মুখের কথাটা কাড়িয়া বলিলেন : পাছে ভ্রষ্টা হয়ে অপরের সঙ্গে যায়,—এই ত ? ওসব ভণ্ড সংস্কারকামীদের কথা ছেড়ে দাও। অবিশ্বাসের চক্ষে যারা মেয়েদের দেখে, জেনে রেখ, তাদের স্ত্রীরাই বেশী অবিশ্বাসিনী হয়। আমি ত নারী, আমার চেয়ে ত তুমি মেয়েদের মনের খবর বেশী রাখ না। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা বেশীর ভাগই কাল্পনিক, পুরুষের হাতে পড়লেই, বয়সে যতই ছোট হোক আর বিদ্যা বুদ্ধিতে তোমাদের চেয়ে যতই কম হোক, মেয়েরা ঠিক বুঝে নিতে পারে যে কি রকম মানুষের সঙ্গে তাকে ঘর করতে হবে। প্রকৃতি মেয়েদের মধ্যে এই বুদ্ধিটি খুব বেশী করে দিয়েছেন। কাজেই এটা ঠিক জেনে রেখ যে, যে সকল অভাব তার স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ হয় না বা হবার নয়, তা সে কোন না কোনও সুযোগে অন্যের কাছ থেকে মিটিয়ে নিয়ে তার জীবনকে পূর্ণ করবে। প্রকৃতিই তাকে সে সব সুযোগ এনে দেবেন। আসলে চরিত্র, যেটি অন্তর-প্রকৃতি থেকে গড়ে ওঠে, তাকে শাস্ত্রবাক্যে বা হিতোপদেশে ঠেকিয়ে রাখবার উপায় নেই।

আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলাম,—তিনি দেখিলেন এবং বুঝিলেন,—পরে বলিলেন : স্ত্রীপরায়ণ কামুক, এদিকে হয়ত দিগগজ পণ্ডিত, যাঁরা নর-নারী সম্বন্ধে ব্যবহারমূলক যে শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন, নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের সমস্ত বিচারই কল্পনার বশে চলেছে, আসলে অধিকাংশই তার মিথ্যা। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় ঘটেনি, একজন দুর্বলচিত্ত পুরুষ তার দিক থেকে যেমন দেখায়, নারীকে সেই ভাবেই দেখে। নারী-মনের গুহ্য তত্ত্ব তাদের জানবার সম্ভাবনা নেই। একটা দৃষ্টান্ত দি,—একদল পণ্ডিতের মত এই যে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী কাম-রিপুর বশবর্তী। মাপ করে আবার তাঁরা দেখিয়েছেন—কেউ বলেন চারগুণ, কেউ ছ' গুণ, কেউ আট গুণ, এই রকমে গুণের মহিমা দিয়ে নারীর ইন্দ্রিয়-সুখস্পৃহার পরিমাপ করে দেখিয়েছেন। প্রকৃতি নারীকে যে ভাবে গড়েছেন সে সত্যের ধার দিয়েও যান নি। আসলে তিনি যদি নিজে অতটা সন্দিগ্ধচিত্ত ও কামান্ধ না হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে পুরুষের ছোঁয়াচ না লাগলে, শুধু সামান্যভাবে লাগা নয়, খুব বেশী রকমে না লাগলে নারীর উত্তেজনা ত দূরের কথা উদ্দীপনাও হয় না, হতে পারে না। অপরের ইন্দ্রিয়জ মোহের ব্যাপার দেখলে পুরুষের যেভাবে নিজের শরীর ও মনে লিপ্সা জ্বলে ওঠে নারীর তা অনেক পরিমাণেই কম হয়। নারী-মন একজনকে গভীরভাবে ভাল না বাসলে সংসর্গ-স্পৃহা তার মনে স্থান পায় না। তার পর যেখানে নারী প্রকৃতিভেদে নানা প্রকার স্বভাবের হয়ে থাকে সেখানে একেবারে নারীজাতি

মাত্রেই ঐ প্রকার স্বভাবের ব'লে প্রচার করাটা কত বড় মূর্খতা আর সেটা যে আমাদের ঐ সব পণ্ডিতদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্তমান আমরা তা খুব স্পষ্টই বুঝতে পারি। যাকে নারী অবলম্বন করে, তার সুখের জন্যই সে তার দেহ দেয়। এই ভাবটাই নারীর মধ্যে প্রবল, একজনের সুখের জন্য, ভোগের জন্য নারী তার সব দিয়েই সুখী। এই ভাবটা তাদের প্রকৃতিগত থাকে সেই জন্যই পুরুষেরা তাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করবার সুযোগ পায়, যা অনেক সময় নারীর বিরক্তির কারণ হলেও ভালবাসার খাতিরে অবাধে ঐ সকল সে সহ্য করে। পীড়ন বা অত্যাচার করবার প্রবৃত্তিই পুরুষের বেশী, আর তা সহ্য করবার ক্ষমতা নারীর অনেক বেশী, পুরুষের মধ্যে সেটা বিরল। এ সকল নারীজাতির প্রকৃতিগত গুণ, কটা পণ্ডিত শাস্ত্রকার এর খবর রাখতেন বা রাখেন! অবশ্য তারতম্য আছে এর মধ্যে—কিন্তু সমষ্টিতে যেটা প্রকৃতিগত গুণ সেইটাই ত ধরতে হবে। আসলে সংযম-ই যে নারীর বিশিষ্টতা। তবে সুযোগ পেলে পুরুষেরাও যতটা বিপরীত পথগামী হয় নারীর মধ্যেও তা হওয়া সম্ভব। সে সব ত অসাধারণ ব্যাপারের মধ্যে, তার কথা ছেড়ে দিতে হবে।

—আচ্ছা, এই যে নারীর প্রকৃতিগত গুণের কথা বললেন, এ সব কি আমাদের সমাজে নারী-পক্ষে কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে হয় নি?

—যখন এদেশে নারী-পক্ষে কঠিন নিয়ম ছিল না অথবা নারী-পক্ষে যে দেশে কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ নেই, মিলিয়ে দেখবে এই সকল নারীজাতির প্রকৃতিগত গুণ কি না। যেখানে নারীদের স্বাধীনতা, সেখানে বাইরের কাপড়-চোপড়া বদলাবার মত বাহ্য প্রকৃতির কিছু কিছু অদল বদল হতে পারে কিন্তু যে গুণের জন্য নারী—নারী, সেগুলি ঠিকই থাকে, তিনি যে ঐ রকম করে এই জাতিকে গড়েছেন।

—আচ্ছা, এবার বলুন আমাদের সমাজে যে বিবাহের চলন, তন্ত্রমতে সাধন করতে গেলে এ বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে সাধন কি হতে পারবে না?

—এখন যদি বিবাহিত কোন ব্যক্তি তান্ত্রিক সাধন হঠাৎ গ্রহণ করে, তাকে দেখতে হবে সেই স্ত্রীর উপর তার পূর্ণ ভালবাসা আছে কি না তার উপর আস্থা রাখা যায় কি না। সে স্ত্রীকে যদি গড়ে নেওয়া যায় তবে সেই স্ত্রী নিয়ে সাধন করবার বাধা কি? আসলে গোড়া থেকেই যাঁরা তান্ত্রিক তাঁরা তন্ত্রমতে স্ত্রী গ্রহণ করবেন। পূর্ণ যৌবনা, মনোমত শক্তি—যার সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছে তাকে নিয়ে সাধন চলবে। মোট কথা তন্ত্রে নর-নারীর স্বাভাবিক মিলনের নিয়মই ধরা হয়েছে। হিন্দুদের যে ভাবে বিবাহ হয় সেটা ত স্বাভাবিক নয়। যৌবনের পূর্বে যে বিবাহ, তার অনেক দোষ, কেবল একটা অমানুষিক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে হিন্দুরা তাদের সমাজের মধ্যে এই প্রকার বিবাহের প্রশ্রয় দিয়েছেন। ও বিবাহ সিদ্ধ নয়, অন্তত আমরা মনে করি না। প্রকৃতিও তা করেন না, এখন দেখ না কেন কেমন ভেঙে যাচ্ছে। ঠেকাবার শক্তি নেই কারো। এই বিবাহ ব্যাপারে তোমাদের হিন্দু-সমাজের হীনতা মনুষ্যত্বের সীমা বহুকাল থেকেই ছাড়িয়ে উঠেছে। জগতের চক্ষে কতটা হীন ছিন্নমতিগ্রস্ত জীব তারা। যে সমাজে বিবাহের পবিত্র মিলনের ব্যাপারের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ—সে কি একটা সভ্য সমাজ? যে দুরাচাররা এর প্রশ্রয় দিচ্ছে তারা চোর ডাকাতের চেয়ে বেশী দণ্ডনীয় নয় কি?—সত্য বল

দেখি? আমাদের বাঙলা দেশের নারীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের নারীর তুলনা কর, দেখতে পাবে—কাপড় চোপড়, আচার ব্যবহার এই সব বাইরের যে প্রভেদ তাছাড়া স্বাস্থ্যবান শরীর এ দেশে কত কম। এই যে এদেশের পথে ঘাটে মেয়ে দেখা যায়, তাদের রূপের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, শুধু শরীরের স্বাস্থ্যের দিক থেকে কতটা দুর্বল, এটা কি এদেশের মরদদের চক্ষে পড়ে না। বড় জাতের দেখাদেখি ছোট জাতেরাও এখানে শিশু ও বালিকা বিবাহ করে নিজেদের জাতের সমাজের সর্বনাশ করচে। মনে কর দেখি, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের চাষার একটা সাত আট বছরের বৌ। এ জাতের ছন্নমতির কথা ভাবতে পার,—ত্রিজগতের কোথাও এমন ধারা আছে? ছি ছি—বল, তোমায় বলতে হবে, তোমাদের হিন্দু-সমাজের গৌরব করবার কি আছে!—বল!

দেখিলাম মাতা একটু উত্তেজিত হইয়াছেন, বলিলাম: মা জগদম্বা কি সন্তানের এতটা দুর্গতি দেখবেন? এর কি কিছুই উপায় করবেন না?

—সন্তান হলে করতেন বোধ হয়,—কিন্তু এরা সব যে শয়তান! সমাজের উপর কর্তৃত্ব করবার শক্তি পেয়ে শয়তান হয়ে বসেছে, তাঁকে বা তাঁর সহজ নিয়মগুলি মানছে কোথায়? এরা যে সেই পাপ দানব অহঙ্কারকে নিজের মধ্যে প্রাণশক্তি দিয়ে তাকে জীবন্ত সংহারের মূর্তি করে তুলেচে, আর প্রত্যেক ধর্মমন্দিরের দ্বারে বসে যাত্রীদের শাসন করচে। প্রকৃতির নিয়মকে কি ভাবে ভাঙ্‌চে দেখতে পাচ্চ না, অকল্যাণকে কি ভাবে ডেকে এনেছে। তিনি প্রতি হাতেই কতই সামলে নিচ্চেন তা এই মোহগ্রস্ত সমাজের মানুষের চক্ষে পড়চে না। তাঁর নিয়মের পূর্ণ ব্যতিক্রম কোনও সমাজে ঘটতে পারে না।

—এই ত আমাদের হিন্দু-সমাজের মধ্যে ঘটে গিয়েছে দেখতে পাই। এ সমাজে শিশু, বালিকা, কিশোরী বিবাহ ত বহুকাল থেকেই চলচে, কঠিন অবরোধপ্রথা ত আজকালের নয়, এ সব ত অনেক দিনই চলচে এদেশে, হিন্দু-রাজ্যের পতনের পর থেকেই ধরতে হবে।

—যখন থেকে এ সব হয়েছে তখন থেকে তন্ত্র-ধর্ম ও সমাজ তার পাশে চলেছিল, সমাজের সর্ব স্তরের মানুষকে পঙ্গু করে নি—এক দিকের রাস্তা খোলা ছিল,—হিন্দুর গোঁড়া-সমাজে কঠোরতার মধ্যে থাকতে পারত না যারা, শিবের তন্ত্র-ধর্মের আশ্রয়ে তারা মুক্তভাবে জীবন কাটাতে পারত।

—কিন্তু চৈতন্যের সময়ে যে তান্ত্রিকদের পাষণ্ড বলা হত—

—ধর্মরাজ্যে তখন যে তিনি নূতন আলো এনেছিলেন। তন্ত্র-ধর্ম প্রথম অবস্থায় যেমন উদার ছিল বামনদের হাতে পড়ে শেষে ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল. তাই তখন ব্যভিচার ঢুকেছিল শিবতন্ত্রের সাধকদের মধ্যে, এ ধর্ম অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে এসেছিল তখন। তা ছাড়া ইংরাজেরাও আমাদের অর্দ্ধসভ্য, বর্বর ইত্যাদি বলে থাকে। এক ধর্মের গোঁড়ারা অপর ধর্মাবলম্বীকে পাষণ্ড বা বিধর্মী বলেই থাকে, মুষলেরাও হিন্দুদের অবিশ্বাসী, পৌত্তলিক কত কি বলে, যেন ভগবৎ-বিশ্বাস মুষলদেরই একচেটে সম্পত্তি।

—কিন্তু ইংরাজের আমলে তো তন্ত্রধর্মে ভাটা পড়ে গেছে অর্থাৎ সমাজ-শরীরের ভিতর হজম হয়ে গেছে বললেই হয়, এখন এই হিন্দুধর্মের পাশাপাশি মুক্ত সমাজ ত কিছু দেখা যায় নি,—

—কেন যাবে না, প্রকৃতির সহজ মুক্ত নিয়মের ধারা এ দেশে বা সমাজে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে বলতে চাও? প্রথমে ক্রীশ্চান-সমাজ এল, তার

পর সেই ক্রীশ্চান-সমাজ সেই বদ্ধ হিন্দু-সমাজের পাশে এসে গায়ে গা দিয়ে দাঁড়াল, অমনি ব্রাহ্ম-সমাজের আবির্ভাব। না হলে উদার প্রাণ মানুষেরা এদেশে বাঁচবে কি করে! সেই ঘেয়ো পূতিগন্ধময় গলিত সমাজের আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যকামী মানুষেরা, যাদের শক্তি আছে তারা কখনও থাকতে পারে? রাম মোহনের সময় পর্য্যন্ত তন্ত্রের প্রভাব দেশের সভ্য সমাজে ছিল। এখনও যে একেবারে নেই তা ত নয়। সুবুদ্ধি হলে, এর সংস্কার করে নিয়ে সমাজ-জীবনকে বলশালী করা যেতে পারে ত?

—করলে ত হয়, কিন্তু হিন্দুদের এখনও ব্রাহ্মদের উপর বিদ্বেষ রয়েছে, যদিও এখন অনেক হিন্দু স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে অনেক কিছু উদার ভাব আত্মসাৎ করেছেন। যাহোক, আমরা আসল তন্ত্রের কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এখন বলুন, বিবাহের কথা ছেড়ে দিয়ে, তন্ত্রে কিরূপ স্ত্রী নিয়ে সাধন চলতে পারে?

তিনি বললেন: আমার যে ওঠবার সময় হ'ল, ঐ যে খণ্ড ভৈরবও এসেছেন।

আমি বলিলাম: তা হোক, আপনি ত কাল চলে যাচ্ছেন, আজ আমায় আরও কিছু বলে যান।

খণ্ড ভৈরব আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: ও আবার তোমায় কি বলছিল?

তিনি বলিলেন: ও বলে, উনি অনর্থক আমার উপর রাগ করছেন, আমার আসল উদ্দেশ্যই হ'ল সাধন, অন্য মতলবে ত আমি এখানে আসিনি,—

বিরক্ত হইয়া মহেশ্বরী বলিলেন: ওর মুণ্ডু সাধন, ছাই-পাঁশ সাধনের উদ্দেশ্য। স্ত্রী ছাড়া সাধনা হবে কি করে, তাকে পরাশ্রয়ে ফেলে দিয়ে এসে—

—ও বলে যে, এখানে আর একটা ভৈরবী যোগাড় করে নিয়ে সাধন করবে—

ক্রোধে আরক্তচক্ষু ভৈরবী বলিলেন: ও ছাগলটাকে বলে এস, ও যেন নিজেকে ভৈরব বলে আর কারো কাছে পরিচয় না দেয়। ওর যা মতলব তার নাম ধর্ম নয়, তাকে এর ফলে মহা দুর্গতি ভোগ করতে হবে, সাধনের নামে সে মহাপাতক সঞ্চয় করছে—অনন্ত নরক তার জন্যে তোলা আছে। যাও, ওকে এ সব কথা বলে তারপর তুমি ওখানে চলে গিয়ে উদ্যোগ করে রাখ গে, আমি দু'এক দণ্ড পরে যাচ্চি।

তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার দিকে চাহিয়া ভৈরবী বলিলেন: দেখ, এই সব জানোয়ার মানুষ হয়ে এসেও ঠিক সেই জানোয়ারের মতই চলছে। ওর ধারণা হয়ে গেছে যে যখন তখন যথেচ্ছা শক্তিকে ত্যাগ করা যায়। এরাই ত ব্যভিচারী—এদের জন্যেই তো তন্ত্রের এমন মহৎ ভাব সাধারণের কাছে এতটা ঘৃণ্য হয়ে পড়েছে।

আমি বলিলাম: এই লোকটি যে সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছে তার মূল কারণ কি? অবশ্য ছেলেপুলে হলে তাদের মানুষ করবার ক্ষমতা নেই দেখে কারো ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরে পড়াটা সব সমাজেই একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আছে—আমরা তা দেখতে পাই,—কিন্তু এ লোকটি যে অন্যরকম বলছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

তিনি বলিলেন: একরকমের মানুষ আছে দেখ নি, যারা সংসারের

কোন দায় বা বোঝা ঘাড়ে নিতে পারে না, অথচ নানা ফুলের মধু পান করে বেড়াবার প্রবৃত্তি তাদের প্রবল,—এরা সেই লোক। এদের মাথায় এটা আসে না যে, শক্তি থাকতে কর্তব্য পালন না করলে সেটার প্রত্যবায় আছে, একটা দণ্ড আছে যা এড়ান যাবে না। মেয়েমানুষ নিয়ে ভোগ করতে পারব কিন্তু সন্তান হলে লালন-পালন করতে পারব না। ধর্ম বলতে, তাতে যেটুকু সুখ-সুবিধা আছে সেটুকু তারা নেবে, অসুবিধা হলেই সে ধর্মের সঙ্গে তার বনুলো না।

—আচ্ছা তান্ত্রিক হলে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা আছে ?

—টাকা উপার্জন এখনকার দিনে না করলে সন্তান প্রতিপালন, সংসারে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি করে ?

আমি বলছি, তন্ত্রমতের সাধন করতে গেলে কি অর্থোপার্জন সম্ভব, তা যদি হয় তার বৃত্তি হবে কি ?

সব ধর্মের মধ্যেই দুটি শ্রেণী দেখা যায়, প্রথম যারা ধর্মকে মুখ্য বলে ধরেচে—ঐকান্তিকতা যদি থাকে আর যৌবনের স্বাভাবিক ভোগলিপ্সার প্রবল আকর্ষণ না থাকে তাহলে অর্থ উপার্জনের প্রশ্ন ওঠে না, তারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় যেটুকু, তা সহজেই পায়,—আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বা সাধক যারা তাদের ধর্ম মুখ্য নয়, তাদের ধর্মও চাই, অর্থও চাই। তারা শক্তি নিয়ে সংসারী হয়ে পড়ে। ছেলেপুলে হয়, তাদের ভরণপোষণের জন্য কোনও একটি সংবৃত্তিকে অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নেয়। অর্থটা ভাগ্যের ফল, সম্পূর্ণ পুরুষার্থের ফল নয়,—আমি ত অনেক তান্ত্রিক দেখেছি যারা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করছে, মহাধনবান, বিস্তর লোককে খেতে পরতে দিচ্ছে, আবার সাধনও তার বেশ ভালই চলচে। সব ধর্মের মধ্যেই এটা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: এই যে লোকটির কথা হচ্চে, যার প্রতি আপনি এতটা বিরক্ত হয়েছেন, তার কি করা উচিত ছিল, কি করলে—

—হাঁ, হাঁ, বুঝেছি তোমার কথা,—ও যদি যথার্থ ধর্মকে রাখতে চায় তা হলে নিজ শক্তিকে নিয়ে দুরবস্থার মধ্যে থেকেই ওর সাধন করা উচিত ; তাতে ও যেটা এড়াতে চাচ্চে, ঝঞ্ঝাট বলে ছাড়তে চাচ্চে, সে সব গোলযোগও থাকত না, সব কেটে যেতে পারত, কারণ তা হলে ওর শক্তি ওর সহায় থাকত, দুজনের মনোবলে দুরবস্থা কাটাতে বেশী সময় লাগত না। এখন তাদের ছেড়ে ও করলে কি, নিজের শক্তি, যে সহায় হলে তার ইষ্ট লাভ সহজ হ'ত, তাকে ও শত্রু করলে,— তাতে ও নিজেই সর্বনাশের পথে এগিয়ে গেল, বিপদ ডেকে আনলে। এটা ও বুঝলে না।

আমি বলিলাম: স্ত্রীর বা শক্তির সঙ্গে মনোভঙ্গ হলে ত আপনাদের ধর্মে শক্তিত্যাগের বিধি আছে—

—মনোভঙ্গ একজনের হলেই ত হয় না, দুজনেরই হওয়া চাই, তবেই না তাতে ভাল হবে ? না হলে একজন স্বার্থপরতন্ত্র হয়ে একজনকে ত্যাগ করবে, যাকে ত্যাগ করতে চাইচে সে তাকে এখনও অবলম্বন করে আছে, ভালবাসা দিয়ে বেশ জোরেই টেনে ধরে আছে, তুমি ছাড়লেই কি সে ছাড়া সাব্যস্ত হবে ? জগদম্বার হিসেবে ত ওরকম গোঁজা-মিল নেই—তাঁর সহজ, সরল, সোজা হিসাব যে। ও বেটা আসলে ভণ্ড বদমাস, আমি ওকেও জানি, ওর শক্তিকেও জানি। সে বড় ভাল মেয়ে, সে ওকে ভালবাসে, ছেলে নিয়ে ওর সঙ্গে কত কষ্ট পেয়ে

ঘরও করে এসেছে এতদিন। পেট ভরে খেতে সে পায় নি, পরতে ভাল কাপড়ও কখন পায়নি, ওর কিন্তু রোজ মদ চাই, মাংস চাই, আরও সব কত কি চাই। এক জমিদারের গোমস্তার কাজ করত, একজন মহাজনের দোকানে হিসেব-পত্তর করে দিত, তাতেও দশ টাকা পেত। ঐ রোগ ওর কেবল আত্মসুখসর্বস্ব। আর-কারো দিকে দেখবে না। এদের ধর্মলাভ কি করে হতে পারে, একবার বুঝে দেখ।

এইতেই সন্দেহ হয়, প্রকৃতি মা, মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মিলনের যোগাযোগ সব সময় ঠিকমত ঘটান না। এরকম মিলনের বৈষম্য আমি বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি। বেশী কথায় কাজ কি—আমার পিতামাতার মধ্যেই দেখেছি। মা আমার শান্ত ধীর প্রকৃতি, মুখে কথাটি নেই, আর বাবা একেবারে চণ্ড ভৈরব, দুর্দান্ত প্রকৃতি।

—আমাদের চক্ষে বিসম লাগতে পারে, কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা ঠিক আছে। এর তত্ত্ব সব খুঁটিয়ে বলতে গেলে একখানা মহাভারত হয়ে পড়বে—তবে মোটামুটি সংক্ষেপে এইটুকু বুঝে রাখো, এই রকম বিসম মিলনের মধ্যে থেকেই অনেক সময় প্রকৃতি তাঁর মনোমত জীব সৃষ্টি করেন। এরকম সব জাতের মধ্যেই আছে। জাতসর্বস্ব হিন্দুদের মধ্যেও যেমন আছে আর একজাত মুসলমানদের মধ্যেও আছে। আবার খৃষ্টানদের মধ্যেও আছে ; যেখানে যেখানে মানব-সমাজ, সেখানেই এরকম মিলন-বৈষম্য দেখতে পাবে, তবে খুব বেশী নয়।

—আচ্ছা স্ত্রী-পুরুষের সকল মিলনের মধ্যেই যদি তাঁর হাত থাকে তাহলে আমাদের হিন্দুদের বদ্ধ-সমাজই বা কি আপনাদের তন্ত্রমতের মুক্ত-সমাজই বা কি—ফল ত দুয়ের একই কম হচ্চে !

—তা কি করে হচ্চে,—তন্ত্রমতের বা অন্য কোনও মুক্ত-সমাজের মানুষ যারা তাদের মধ্যে আত্মার প্রাধান্য, আর পচা হিন্দু-সমাজে মানুষের মধ্যে জাতের প্রাধান্য। একটিতে আত্মার নির্দেশই হ'ল অবলম্বন, মধ্যে আর কিছু নেই, অপরটিতে জাতটাই হ'ল বড় বা সেই সমাজে মানুষের প্রধান অবলম্বন —দুটি এক হ'ল কিসে? অন্যান্য স্বাধীন-সমাজে মানুষেরা আত্মধর্মী হয়ে থাকে, আর তোমার হিন্দু-সমাজের মানুষেরা পচা সংস্কারে পূর্ণ জাতিধর্ম আঁকড়ে আজও হাবুডুবু খাচ্চে আর বলছে আমাদের পরকালে স্বর্গ হবে। যাদের ইহকালে স্বর্গ নেই, পরকালে তাদের স্বর্গ কোথায়?—জাত বড়, না আত্মা বড়? বল না কোন্‌টায় বিবেক-চৈতন্য সাড়া দেয়?—

—তাই ভাবি কি করে আমাদের এতটা অধঃপতন হ'ল? পূর্বে যাঁরা জাতিগত পবিত্রতা রাখবার জন্য এ ভাবে সমাজকে বেঁধে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি এর পরিমাণটা ভাবেন নি?

—এর মূলে তখন স্রষ্টার একটা অভিপ্রায় ছিল। জাতিগত পবিত্রতার ধারা বংশানুক্রমে বজায় রাখবার লক্ষ্য যাঁদের ছিল তাঁরা সভ্যতার উচ্চস্তরেই উঠেছিলেন। সহজেই বুঝা যায় শেষে তাঁদের মনে একটা সন্দেহ স্থান পেয়েছিল যে আমাদের বংশধরের মধ্যে কালে এতটা পবিত্রতা হয়ত থাকবে না। তাইতেই উচ্চ জাতের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের বা বিধি-নিষেধের এতটা কড়া বাঁধন। তখনকার আদর্শ ধরে পবিত্রভাবে ধর্ম ও কর্মের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠভাবে জীবন-যাপন করেন যাঁদের এই অভিমান ছিল, তাঁরা সেই মতই জীবন কাটিয়ে গেছেন। জীবের এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পরমেশ্বরের ইচ্ছায় শক্তিমান হয় যতক্ষণ তার মধ্যে পবিত্রতা থাকে ; এই অভিমান, সমষ্টির মধ্যে প্রসারিত হয়েই

যা তখনকার ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিকে মানব-সমাজে জ্ঞানে গুণে এতটা বড় করেছিল। যখন পূর্ণ শক্তির বিকাশ তাঁদের মধ্যে হয়েছিল, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে দীপ্ত জাতির কোথায় যে একটা ফাঁক আছে যার মধ্যে দিয়ে অধঃপতন এসে জাতিগত গৌরবকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তা তখন ত ধরা পড়েনি।

—এ একটি অপূর্ব রহস্যের মত, একটি জাতি যেখানে উচ্চ আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠছে, তাতেও তাঁর ইচ্ছা বা শক্তি কাজ করচে, আবার ধ্বংসের বীজও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করচে, যাতে সে জাতি কালক্রমে বিপরীতভাবে পরিণত হয়ে গেল,—এর মধ্যেও তাঁর ইচ্ছাশক্তি কাজ করলে, অসম্ভবকে সম্ভব করে দিলে। চমৎকার ব্যাপার তাঁর এই ইচ্ছাশক্তির খেলা।

—তাইতো চমৎকারই লাগে, প্রথমে বড় ধাঁধায় পড়তে হয় ; কিন্তু এর মধ্যে কত কি ব্যাপার ঘটে যায় সে দিকে ত লক্ষ্য থাকে না। যে জাতটি গড়ল, উন্নত হ'ল, তার সভ্যতার মহিমা, পরিণতি দিক্‌ময় ছড়িয়ে পড়ল, বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তাঁদের কাজ ত এ জগতের মাঝে রয়ে গেল। তাঁদের জ্ঞান, কর্ম, মনের বিকাশ কোন্ কোন্ দিকে প্রসারিত হয়েছিল, সভ্যতা-অভিমানী জাতটির উন্নতির ছাপ, কত দিকে রেখে গেছে, এ সব যখন দেখি তখন বুঝতে পারি, সে জাতির সার্থকতা কোন্‌খানে অথবা এই সকল কর্মের মধ্যে দিয়ে কেমন করে তাঁরা তাঁদের জাতীয় জীবনকে সার্থক করে গেছেন। তাতেও তাঁর অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়েছে।

—তা হলে জাতি ত আছে, আর তাঁরই ইচ্ছায় গড়েছে ; তা হলে আমাদের হিন্দুদের এখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতের মধ্যে এমন দোষ কি হ'ল ?

একধর্মী মানুষ সমষ্টিগত হলে এবং এক সমাজগত হলে জাতি হয়। তার মধ্যে উচ্চ জ্ঞান, শিক্ষা বা উৎকর্ষ প্রাপ্ত মস্তিষ্কবান মানুষের বংশ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ভাবের নানা স্তরের মানুষের বংশ থাকে। আবার সাধারণ মানুষের চেয়ে যারা ছোট অর্থাৎ বৃত্তিতে ছোট ছোট কাজ করে, বিদ্যা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষও থাকে। সকল স্তরের মানুষই একটি জাতির মধ্যে থাকে ত! শুধু থাকা নয়, সে জাতির মধ্যে এই যে মহান্, সর্ব উচ্চস্তরের মানুষ, তার পর মধ্যস্তরের সাধারণ মানুষ, তার পর নিম্নস্তরের মানুষ, সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে একটি সংযোগ সূত্র আছে বা থাকে, তাতে জাতির শরীরে সকল স্থানেই শক্তিপ্রবাহ অপ্রতিহত চলে আর জাতিটি সর্বস্থানেই সেই শক্তি অনুভব করে, যেন একটি বিরাট শরীর। জীবিত স্বাধীন সকল জাতের মধ্যে এটা অনুভব করে। একটা জাতির সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে সকল স্তরের মানুষের আদান-প্রদান যোগাযোগ আছে—এ পোড়া হিন্দু-সমাজে তা নেই, ছোট বড়র যোগ নেই। এই দেখ না, যারা আগে সেপাই ছিল, সৈন্য হয়ে দেশরক্ষা করত, সেনা পরিচালনা করত—এই চাঁড়াল ডোম নমঃশূদ্র বাগ্দী তেওর—এদের সঙ্গে বামন কায়েত বড় জাতের মোটে যোগ নেই, কি একটা তুচ্ছ সূত্র বা ছুতো ধরে তাদের 'পঞ্চম' বলে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। অঘোরী বাবা বলেন কি জান ?

আমি বলিলাম : কি বলুন না,—

—অঘোরী বলেন, এরপর দিগ্‌গজ পণ্ডিত আচারী বামন কায়েতেরা চাণ্ডাল, বাগ্দীদের পায়ের ধূলা নেবে।

শুনিয়া আমার মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল,—তা হলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আর একবার আসতে হবে, তাহলে ওটা সম্ভব বটে।

ভৈরবী বলিলেন: নাঃ, তাঁর দরকার হবে না, তা ছাড়া চৈতন্য ত রাষ্ট্রশক্তির প্রাণসঞ্চার করতে আসেন নি, তন্ত্রধর্মের ব্যভিচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে আসল ধর্মমার্গে প্রাণসঞ্চার করতে এসেছিলেন, প্রেমভক্তির মহিমায় মানুষ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে এক হতে পারে তাই দেখাতে এসেছিলেন। তা ছাড়া মহাপুরুষেরা দুবার কেউ আসেন না। প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিলোম নিয়মের কথা জান ত,—যার জন্য একস্তরের মানুষকে ছোট বা হীন বলে আর একস্তরের মানুযে মনে করেছে,—এ অভিনয়ের পালা ওল্টাবে না কি? যখন তা হবে তখন আবার বামনে শূদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে। অঘোরী সেই কথাই বলেছিলেন, ওঁরা অনেকটা দেখতে পান যে।

পুনরায় বলিলেন: আমরা যাকে ছোট জাত বলি তাদের মধ্যেও কত মানুষ বিদ্যা বুদ্ধি আচারে বেশ শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠচে, সমাজের বাইরে তাদের সঙ্গে মেলা মেশায় দোষ হয় না,—ধোপার ছেলে অফিসের বড়বাবু হলে, ছেলের চাকুরীর জন্যে বামন জোড়হাত করে তার কাছে দায় জানাতে পারেন, কিন্তু সকালে উঠে ধোপার মুখ দেখলে তাঁর সর্বনাশ হবে, এতে কি এটা বুঝা যাচ্ছে না যে আচার এবং বিদ্যাই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, এই আচার ও বিদ্যার অভাবই তাদের ছোট করে রেখেছে বড় জাতের কাছে? তাদের মধ্যে বিদ্যার প্রসার হলেই তারা বড় হবে। কিন্তু এদেশে বড় জাতের মধ্যে এ বোধ জাগে নি। তারা এতটা জড়বুদ্ধি, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নজীর বার করছে যে, ডোম হাড়ি মুচি ধোপা এদের ভগবান্ ছোট করে সৃষ্টি করেছেন, তাই এরা ছোট, আমরা কেন তাদের সঙ্গে মিশব, তাতে আমরা ছোটই হয়ে যাব। এই যে বুদ্ধি, এ বুদ্ধির মূলে একটা ধর্মহীন, নীচ মনোভাব, আর ভগবানের সম্বন্ধে কত বড় মিথ্যা ধারণা রয়েছে এইটি বুঝা যায় না কি?

—এখন দেখুন আমাদের দেশে অনেকেই অসবর্ণ বিবাহ করছে, হিন্দু সমাজ তা মেনে নিতেও পারছে না, ত্যাগ করতে পারছে না। সমাজকে সংস্কার করে তার প্রসারতা বাড়াবার দিকে সংঘবদ্ধ চেষ্টাও চলছে না, ফলে একটা মহা অশান্তি এসে পড়েছে চারিদিকেই।

—প্রকৃতি থেকে যেটা ভাঙচে, মূঢ়বুদ্ধি মানুষে সেই প্রাণশক্তিহীন পুরানো রীতিই জোর করে আঁকড়ে ধরে নিজেদের অবস্থা আরও হাস্যাস্পদ করে তুলছে পাঁচজনের কাছে। এ সব দেখে শুনে তবুও যদি না বোঝে তবে ত ঘা খেতেই হবে, উপায় কি? স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যদি সত্যকার ভালবাসা হয়, প্রকৃতি সেখানে জাতধর্ম এসব দেখবেন না। তিনি শুভটাই দেখবেন। শুভ বা কল্যাণ যদি তার মধ্যে থাকে ত তিনি দম্পতিকে সে মিলনে সাহায্য করবেন। ভালবাসাটি সত্য হওয়া চাই। আরও এক রহস্য এর মধ্যে আমরা দেখেছি, —প্রেমে স্ত্রী পুরুষে আবদ্ধ হয়ে ঘর সংসার কর, সৃষ্টি বৃদ্ধি কর. তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু জাত ভাঁড়িয়ে যদি সমাজকে প্রবঞ্চনা করতে যাও তবে তাকে ধরে সমাজের কাছে মুখ পুড়িয়ে দেবেন। প্রকৃতি-জননী সন্তানের সব অত্যাচার সহ্য করতে পারেন কেবল ঐ ভণ্ডামোটি ছাড়া। ভণ্ডামো অর্থে সত্যের অপলাপ। ফাঁকা জাতের অভিমান যেটা, সেটা ত আসলেই মিথ্যা। অভিমান সেইখানেই সত্য যেখানে জীবনে পবিত্রতা থাকে। আমি সৎ হব, শ্রেষ্ঠ হব, এ অভিমান প্রকৃতি শুধু সহ্য করা নয় তা পূর্ণ করতে তিনি দু'হাতে সহায়তা করবেন, কিন্তু যেখানে অন্তরে গলদ পুরে রেখে বাইরে

শ্রেষ্ঠত্বের ঢং দেখিয়ে লোক ঠকাবার মতলব থাকে সেখানে তাঁর প্রতিহিংসাই কাজ করবে, সমাজের চক্ষে তাকে এমন হীন, হেয় করে দেবেন যা কোন কালেই সে কল্পনাও করে নি। এর দৃষ্টান্ত চারিদিকেই দেখতে পাবে ; শুধু রূপের খাতিরে ভোগলালসা চরিতার্থ করবার জন্য বিবাহ ব্যাপারে নয়, গৃহ বা সমাজের সর্ববিধ ব্যাপারের মধ্যেই তাঁর এই বিচার দেখতে পাবে। ব্যষ্টিভাবে, সমষ্টিভাবে সকল দিকেই ভণ্ডামো বা আত্ম-প্রবঞ্চনার উপর তাঁর তীব্র দৃষ্টি আছে।

আমি ঃ এখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে শিব কি বস্তু আমাদের দিয়ে গেছেন !

—আসল তন্ত্রধর্মে—বামনদের গড়া এখনকার তন্ত্রশাস্ত্রে নয়—শিবের রাজত্বে এ রকম কেলেঙ্কারীর পথই মেরে দিয়েছে, শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ কারো বামন কায়েতের বালাই নেই ; প্রেমের রাজত্ব একটি, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে আসলে তফাৎ নেই। জাত হারালে যেমন বৈষ্ণব হয়, জাত হারালে সেই রকম তান্ত্রিক বা যথার্থ শৈব হয়।

আমি বলিলাম ঃ সেই রকম জাত হারালে তবে ব্রহ্মজ্ঞ বা যথার্থ ব্রাহ্মণও হয়।

ভৈরবী বলিলেন ঃ এখনকার এই হিন্দুজাতের বামনের সঙ্গে ভদ্র চাঁড়ালের বা পঞ্চমের পার্থক্য কি ? ধর্ম কোথায় ? কার কাছে ? ব্রহ্মকে জানলে যে ব্রাহ্মণ হয় সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে হিন্দুজাতের বামনের এখন তুলনা করলেও পাপ হয় যে।

—আমার প্রশ্ন ছিল, কি রকম স্ত্রী হলে তাকে নিয়ে তন্ত্রের সাধন চলতে পারে ? এর উত্তর আমি এখনও পাই নি। কিন্তু এখন আমি এসব তন্ত্রের কথা শুনব না। আর একটা কথা আমাকে বলবেন ?

তিনি বলিলেন ঃ এখন ওঠবার সময় হয়ে এসেছে, কি বলবে চট্ করে বল, গুরুতর কথা হয় ত থাক।

আমি বলিলাম ঃ গুরুতর আমার পক্ষে ত বটেই, তবে আপনাদের পক্ষে না হতে পারে। আমার কথা এই যে, আমাদের এই হিন্দুসমাজ কি এইভাবে ধ্বংসের পথেই যাবে, এ সমাজ কি আর কখনও শক্তিমান ও উন্নতিশীল হবে না ? আপনারা কি মনে করেন ? আপনাদের দূরদৃষ্টি ত আছে !

তিনি ঃ আত্মপ্রবঞ্চনা আর শঠতাই যে এখন সর্বস্তরে প্রবল হয়ে উঠেছে, টাকাকে আত্মার চেয়ে, ধর্মের চেয়ে বড় করে ধরেচে প্রত্যেকে, আর ভূয়ো জাতের গোঁড়ামী আঁকড়ে ধরে আছে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকেরা। এখনও ছোট জাত বলে অবজ্ঞা করে চাষা-ভূষোদের রক্ত শোষণ করে নিজেরা পুষ্ট হচ্চে,—সর্বনাশের সকল লক্ষণই ত বর্তমান, আর ধ্বংসের বাকী কি !

আমি ঃ সকলেই ত আর ওরকম নয়, অনেকেই ত এখন দেশের এ অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

তিনি ঃ কটা ? সেই গোঁড়া সনাতনী ভট্চাজ্জির দল আর তাদের যজমান যত কেরাণীকুল, আর দেশের ভোগী বিলাসী গরীবের অর্থশোষক জমিদারকুল, দাসত্ব ছাড়া যারা অন্য উপায়ে উন্নতির কল্পনাও করতে পারে না তারা থাকতে কিছুই হবে না। যেখানে গুরু-পুরুত এসে আশীর্বাদ করে—তোমার একটি চাকরি হোক,—তারা থাকতে কি করে সমাজ শক্তিশালী হবে বল দেখি ?

কথাগুলি বলিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইলেন বোধ হইল, তার পর আবার বলিলেনঃ দেখ, এই সেদিন, এখানে আসবার আগের দিন, কল্‌কাতায় একদিন ত ছিলাম, কি দেখলাম জান? পটলডাঙ্গায় কলেজের দিকটায় গোলদীঘিতে যত সব জোয়ান ছেলেরা বেড়াচ্চে। লম্বা কোঁচা ঝুলচে, কেউ আবার সেটাকে বাঁ হাতে মুঠো করে ধরেছে, কারো-বা পকেটের মধ্যে পোরা আছে, ডান হাতে সিগারেট, ঝোলা পাতলা জামা, সকলেরি প্রায় গলা সরু, রোগা, কণ্ঠার হাড়, বুকের পাঁজর কতকটা দেখা যাচ্ছে,—মাথার চুল বড় বড়, পিছন দিকে ফেরানো, কারো বা তোলা, গোছাশুদ্ধ একেবারেই তোলা, গোঁপ-কামানো, ক্ষীণ শরীর, হাত ও কপালের শির বেরুনো, মাঝে মাঝে মাথা দোলাচ্চে আর চুলগুলো ছপ্‌ ছপ্‌ করে যেমন পাট করা ছিল ঠিক তেমনি পড়ে যাচ্ছে, কেবল সিঁথিতে সিঁদুরটা নেই—না হলে ঠিক মেয়েমানুষের মত চেহারা। তারা সব হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চে যেন ক্ষয়রোগের আসামী। তারাই ত ঐ সব ছেলে,—পরস্পর কি সব অসভ্য সম্ভাষণ হাস্য-পরিহাস করছে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কানে শোনা যায় না, এরা,—

আমি বলিলামঃ—এখন যেন একটু ফিরেছে, ভবিষ্যতে,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেনঃ আহা হা,—বাছা এটা বুঝছ না, এরাই ত ভবিষ্যৎ বংশের জন্ম দিচ্চে বা দেবে? এই দুর্বল, জড়, তরল বুদ্ধি, বিকৃত শরীর বাপ-মার ছেলেরা কি এদের চেয়ে ভাল হবে?—কি করে তা হবে বল দেখি?—

—কিন্তু দেখা যায় না কি, এর মধ্যে কেউ কেউ তাদের অবস্থার কথা বুঝেছে, আর উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেছে,—শোচনীয় দুরবস্থার জন্য দুঃখ-বোধ এসেছে, তারা ত উন্নত জীবনই চায়,—

—হাঁ, যারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করছে তাদের বংশধরের দ্বারাই কল্যাণ হবে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কতটুকু,—সাত কোটীর মধ্যে হিসাব কর দেখি বাছা, এতই কম যে চোখেই পড়ে না, গণনাতেও আসে না। মনে কর সৎ প্রবৃত্তি, শক্তিমান শরীর-মন, উন্নতপথে প্রবল্ গতিবিশিষ্ট ছেলের দল কতটা পরিমাণে বাড়লে তবে সমাজ জাগ্রতভাবে ক্রিয়াশীল হবে,—কে জানে কত দিনে হবে। যখন ঐ সব ক্ষয়াক্রান্ত শরীর ছেলেদের দেখি, তারা যতই পাশটাশ করুক বাপু, আমার ভয় হয় যে ভবিষ্যতে তারা দাঁড়াতে পারবে কি করে? তাদের বিবর্ণ মুখ-চোখের চেহারা দেখে মনে হয় অপরিমিত শক্তি ক্ষয় হচ্চে। না হলে এতটা বিবর্ণ হবে কেন, এতটা অল্প বয়সে বাড় কমে যাচ্ছে কেন? তাদের বাপ-মা বা শিক্ষকেরাও এসব কি দেখেন না,—পোড়া-কপাল! দেশের ছেলেরা হ'ল দেশের প্রাণ, তাদের যদি শরীর মন প্রকৃতি ভাল রকমে না গড়ে তা হলে কি করে কাজ হবে? ভগবানের অভিপ্রায় যে কি ঐ মেঘে ঢাকা আকাশের মতই।

॥ ২৫ ॥

মহেশ্বরী মাতা আজ চলিয়া গেলেন। এই যে কয়দিন তিনি এখানে ছিলেন, প্রত্যহ আমার সঙ্গে দেখা না হোক তাঁহার অবস্থানের সময়টি আমি একটি বিশেষ আনন্দ এবং উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছিলাম। আজ মনটা খারাপ ছিল

না বটে কিন্তু তাঁহার অভাবটাই বিশেষ মনে হইতেছিল। ঘর ছাড়িলেও মায়া মমতা ছাড়ানো যায় না। স্থানের উপর মায়া, ব্যক্তি-বিশেষের উপর মায়া বা মমতা এগুলি মানব-প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা। খণ্ড ভৈরব আজ যাইবার সময় বলিলেন : আপনার কথা আমাদের মনে থাকবে।

অঘোরী বাবার কাছেই আজ যাইব ঠিক করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরে একবার ঘুরিয়া আসিলাম, তাঁহাকে শ্মশানের দিকে দেখিতে পাইলাম না ; ঘরের দিকে গেলাম, সেখানেও নাই। গেলেন কোথা ? এদিক ওদিক দেখিলাম—শেষে ফিরিয়া আসিতেছি। ডোমেদের মেয়ের দল জঙ্গলে ঘুরিতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের গানের রেশ বহুদূর অবধি ভাসিয়া যাইতেছে। কালো রং বটে কিন্তু তাহার মধ্যে রূপ আছে, আকর্ষণও আছে। তাহাদের মাথায় কাপড় নাই, নিঃসঙ্কোচ, ধীর এবং স্বচ্ছন্দ গতি ; তাহাদের দেখিতে ভাল লাগে। এদিক ওদিক চাহিতেছে, অভীষ্ট বস্তু অন্বেষণে চঞ্চল নয়ন, তাহাতে তাহাদের গানের ছন্দ ভঙ্গ হইতেছে না। প্রকৃতির কোলে ইহারা মানুষ তাই ইহাদের আনন্দের অভাব নাই,—সভ্য জগতের অভাব, উচ্চাভিলাষের কোন ধার তাহারা ধারে না, তাই বোধ হয় তাহাদের বদনে অবসন্ন ভাবের ছায়া নাই। দুই একটি দিগম্বর শিশুও তাহাদের দলে আছে। আরও আছে কৌপীনধারী দুই-তিনটি যুবক আগে আগে, হাতে খুব লম্বা ছিপের মত, বোধ হয় পাখী ধরিবার আটা-কাঠি! বৃক্ষ-পত্র-শাখা সমাচ্ছাদিত পক্ষিনীড় অন্বেষণে ব্যস্ত তাহাদের নয়ন উপর দিকেই ঘুরিতেছে। মেয়েরা কাঠ কুড়াইতে এবং গোময় সংগ্রহ করিতেই আসিয়াছে—দুই তিন জনের হাতে টুকরীও রহিয়াছে দেখিতেছি। তাহারা গান করিতে করিতে বনান্তরালে লুকাইলে আমি কতক্ষণ পর নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

মন আমার আজ যেন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে, কাহারও সঙ্গ কামনা করিতেছে, কিন্তু এমন কেহ এখানে নাই যাহার কাছে যাইয়া দুদণ্ড আলাপ করি। যারা আছে অনুকূলানন্দ প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে ও বসিতে প্রাণ চায় না, কারণ তাঁহাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য এবং সাধনমার্গ পৃথক। একবার মনে হইল খণ্ড ভৈরব কাল যে ব্যক্তিকে ঐ ছোট সাধন-মন্দিরে দিয়া আসিলেন তাহার কাছে যাই। কিন্তু তাহার যে সব গুণের পরিচয়-কথা শুনিয়াছি, তাহাতে তাহার সঙ্গ করিয়া যে কিছু শান্তি পাইব তাহা মনে হইল না। কি করি, কোথায়ই বা যাই, একটু ওদিকে শালবনের মধ্যে ঘুরিয়া আসি।—চলিলাম সেই দিকে। প্রায় এক বা দেড় পোয়া পথ চলিয়া বনের ধারে পেঁাছিলাম। দেখি আমাদের ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্য এক খোন্তা হাতে বনের ধারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৌরবর্ণ, বেশ সবল যুবক, কালীমাতার নূতন পূজারী,—কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার সঙ্গে সামান্য রকম আলাপ হইয়াছিল। এখন খোন্তা হাতে এখানে কি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : কিছু তালমূলী সংগ্রহ করবার জন্যই এসেছি,—আপনি এখানে যে ?

আমি বলিলাম : কোনও উদ্দেশ্য নাই, এমনিই। আপনাদের এখানে এত দিন এসেছি, নিকটেই এমন সুন্দর একটি শালের অরণ্য, কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, আজ তাই ভাবলাম দেখে আসি।

তিনি প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন : বেশ, বেশ, চলুন দুজনেই আজ বন-

ভ্রমণে যাওয়া যাক। আপনি গাছ-গাছড়া চেনেন কি? আমি বলিলাম: যে দেশের লোকে ধান গাছে কড়িকাঠ হয় বিশ্বাস করে আমি সেই দেশের লোক —জানেন ত।

তিনি হাসিয়া বলিলেন: চলুন, আমি যেগুলি জানি আপনাকে দেখিয়ে দি।—

কি আনন্দ এই শাল বনের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। শাল-গাছগুলি খুব বড় হইতে পায় না, বিশ পঁচিশ ত্রিশ ফুট হইলেই কাটিয়া চালান দেয়। এখানে দেখিলাম পাঁচ ছয় ফুট হইতে প্রায় ত্রিশ ফুট গাছ। এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন জঙ্গল ইতিপূর্বে দেখি নাই। ঘন গাছের সার পর পর চলিয়া গিয়াছে বহুদূর —অন্ধকারের মধ্যে যেন তার শেষ। এই সকল সরল ঋজু বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ছোট ছোট বনৌষধি সকল। তার মধ্যে তালমূলী, শতমূলী, দশ বাহু চণ্ডী, অনন্তমূল প্রভৃতি অনেক প্রকার গাছ ভট্টাচার্য্য আমায় দেখাইলেন। শতমূলীর উপরের

দিকটা সামান্য একটু লতার মত, যেন মাটির উপরে ছোট একটি লতানে গাছ রহিয়াছে। খোন্তা দিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির তলায় বহুতর লম্বা লম্বা মূলগুচ্ছ দেখা যাইতে লাগিল। অনন্তমূলও অনেকটা ঐরকম, মাটির উপর সামান্য লতাপাতা বাহির হইয়া আছে, মাটির অন্তরে তাহার মূল অনন্ত ভাবেই প্রসারিত।

তার পর ভট্টাচার্য্য তালমূলী দেখাইলেন। পরিষ্কার জমির উপর সোজা বিঘৎ খানেক লম্বা সূচালো তালপাতার অঙ্কুরের মত এখানে সেখানে জাগিয়া আছে দেখা গেল। তলা অনেকটা খুঁড়িতে খুঁড়িতেই তাহার মূল বাহির

হইল। একটি শ্বেতবর্ণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মত সরু খানিকটা তাহার মূল। তিনি বলিলেন: খাইয়া দেখুন কেমন সুন্দর মিষ্ট। উহা মিষ্ট বটে, অল্প তিক্তাভাসও পাইলাম। এইরূপে শালবনের মধ্যে অনেকগুলি লতা-গুল্ম দেখিলাম যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। ছোট ছোট পাতা, শক্ত কাঠির মত ডাল, এক প্রকার লতানে গাছ দেখাইয়া তিনি বলিলেন: এই দেখুন বিশল্যকরণী। আমি বলিলাম: সে ত গন্ধমাদন পর্বতে হয়। তিনি বলিলেন: সেটা ত্রেতা যুগের কথা, এ যুগে ত এসব জঙ্গলেও পাওয়া যায় দেখি।

শালবনের মধ্যে এই বর্ষাকালেও নানা আগাছা কুগাছার জঙ্গল নাই। বিশেষত দেখিলাম ইহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গাছগুলির তলা যেন সযত্নে কেহ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যতদূর যাও ঝুপি জঙ্গলের বালাই নাই, পথ রুদ্ধ করিয়া কেহ দাঁড়ায় নাই। আমরা বনের মধ্যে অনেক দূর গিয়াছিলাম। বনের শোভা দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিলাম, এক সময় একলা আসিয়া মনের সাধে ইহার মধ্যে বেড়াইব, সম্পূর্ণ একটা দিন উদয়াস্ত ঘুরিয়া কাটাইব। এখন ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রয়োজন মত তালমূলী, আরও কত কি সব লইলেন। শেষে আমরা ফিরিলাম। এখানকার বনপথগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া নানা দিকে চলিয়া গিয়াছে। সকল দিক হইতেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। ওদিকে বনের ধারে সাঁওতালদের বস্তী, কয়েকজন কাঠ কুড়াইয়া বোঝা মাথায় চলিয়াছে।

এই বক্রেশ্বরের চারিদিকে বিশাল মালভূমি। দূরে বহু দূরে একটা পাহাড়ের নীল রেখা দেখা যায়। বিশাল প্রান্তরের শোভা অপূর্ব, দেখিতে দেখিতে আমরা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দূরে দেখি অঘোরী বাবার মত কে একজন, তিনিও মাঠ ছাড়িয়া রাস্তায় উঠিলেন। ভট্টাচার্য্য পাশ কাটাইতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আবার ওপথে কেন? তিনি আড়চোখে একবার অঘোরীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন: দেখছেন না অযাত্রা। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম: কি রকম? ভট্টাচার্য্য বলিলেন: বেটার জাত কুলের ঠিক নাই, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, থাকবার জায়গা শ্মশান, শাস্ত্র-জ্ঞান নাই,—বেটা আকাট মুখ্যু, মান অপমান জ্ঞান নাই—যাকে তাকে যা তা বলে বসে, মশাই,—কি বলব, ওকে দেখলেই আমার কেমন একটা ভয় হয়। আমি বলিলাম: ওর যে গুণগুলির কথা এইমাত্র বললেন সেটা সংস্কৃত ভাষায় বললে শিবের স্তোত্র হয় যে—

ভট্টাচার্য্য বলিলেন: হ্যাঃ, শিব না আরো কিছু, শিবের সঙ্গে ওর তুলনা, বেটা হাড়ি, মুচি, মুদ্দফরাসেরও অধম, জাতের ঠিক নেই,— ঐ যে, বেটা এদিকেই আসে যে মশাই, আমি আসি তাহলে। দ্রুত পাদবিক্ষেপে ভট্টাচার্য্য তাঁর বনৌষধির পুঁটলিটি লইয়া গ্রামের পথে ঢুকিয়া পড়িলেন, একবারও

পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন না। আমি ফিরিয়া দেখিলাম অঘোরী আমার পশ্চাতে।

ওবেলা খুঁজিয়া পাই নাই, এখন পশ্চাতে তাঁহাকে দেখিয়া প্রফুল্ল মনে জোড়হাতে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন, কখনও ত আপনাকে এদিকে আসতে দেখি নি। তিনি কোন কথাই কহিলেন না, যেন কেহ কিছুই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম বড়ই গম্ভীর, এমন কোন লক্ষণ নাই যাহাতে আবার কিছু সাহস করিয়া বলিতে পারি। মনে করিলাম রাস্তায় হয়ত কথা বলিবেন না। আমি তাঁহার পশ্চাতেই চলিতে লাগিলাম। পথে তিনি কোন কথাই কহিলেন না। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে শেষে যখন শ্মশানের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এখানে তিনি আসিয়া কোনও দিকে না দেখিয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন। একটু তফাতে আমিও বসিলাম। তিনি দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। অনেকক্ষণ চুপচাপ, কোন কথা নাই। আমি স্থির হইয়াই আছি, কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। ক্রমে একেবারেই স্থির এবং নিশ্চল হইয়া পড়িলাম। কতকক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন: কি দেখছিস্? আমি বলিলাম: একটি পুরুষমূর্তি। তিনি বলিলেন: শালা, কেবল আমাকেই ভাবছিস্, এখন বল্ দেখি সেটা তোর ভিতরে না বাইরে?

এই যে, ভিতরে না বাহিরে,—ইহার মধ্যে একটি ব্যাপার আছে যাহার একটু বিবরণ জানা ভাল। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা বাহিরেই দেখি অর্থাৎ, আমি একটি সত্তা অপর একটি সত্তা দেখিতেছি। তাহা হইলে দুইটি পৃথক অস্তিত্ব হইল—একটি দ্রষ্টা অপরটি দৃশ্য। এখন বুঝিতে হইবে, আমি বলিতে আমার অন্তঃকরণের সহিত (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং লইয়া অন্তঃকরণ) ইহা লইয়াই আমার যাহা কিছু বোধ,—ইহার বাহিরেই যাহা কিছু দেখা তাহাকেই ইনি 'বাহিরে' বলিতেছেন। আর ভিতরে বলিতে অন্তঃকরণ অথবা সূক্ষ্মভাবে 'আমি' বলিয়া আমার যে সত্তার বোধ তাহার মধ্যেই অর্থাৎ দ্রষ্টার সঙ্গে দৃশ্যের একীভূত হওয়া,—ইহাকেই ইনি বলিতেছেন 'ভিতরে'। আমি বলিলাম: বাইরে। শুনিয়া তিনি বলিলেন: ও কিছু না, তুই ঢুকে যা। ঢুকে যা তার ভিতরে। তার পর তিনি বলিলেন: তোর 'আমি'টা কোথা? আমি বলিলাম: ঠিক বুঝতে পাচ্চি না। তিনি যেন বলিলেন: থাক তুই ঐ রকম।

প্রথম আমি যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তন্ময়তার গুণে উহা চিত্তের মধ্যেই দেখিতেছি এইরূপ মনে করিতেছিলাম। তার পর যখন বলিলেন: ডুবে যা ওর ভিতর, তখন, আমি দেখিতেছি, এই বোধটি ক্রমে ক্রমে সেই মূর্তির মধ্যে অনুভূত হইতে লাগিল। পরে যখন বলিলেন: 'আমি'টি কোথা? তখন ধীরে ধীরে, 'আমি' বোধ বা অনুভবটি, সেই বিরাট মূর্তিময় হইয়া গিয়াছে—আমি তার তন্দ্রাভিলাষী নয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন এক হইয়া গিয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা শুনিতেছি, তাহাই স্পর্শ করিয়া আছি—তাহা রসময় এবং দিব্য গন্ধময়। প্রথমে গন্ধ গেল, তার পর রসবোধও গেল, তার পর ক্রমে রূপও গেল, কিন্তু অন্ধকার বোধ হইল না, বহু বিস্তৃত স্পর্শ-বোধের সঙ্গে 'আমি' আছি, আর অপূর্ব এক ধারায় ধ্বনিত শব্দের রেশও তার সঙ্গে

লাগিয়া আছে। কতক্ষণ পর শব্দও গেল—শুধু স্পর্শময় 'আমি'—তাহাও গেল, এখন শুধু 'আমি' এই বোধটুকু,—তার পর আর কিছুই জ্ঞান রহিল না।

কতক্ষণ পর যখন সেই শ্মশানক্ষেত্র আঁধারময় হইয়া গিয়াছে, তার মধ্যে আমি চক্ষু চাহিলাম। দেখিলাম তিনি নাই, কেহই নাই, একা আমিই আছি। কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। এইবার উঠিয়া পড়ি ভাবিতেছি, দেখিলাম তিনি আসিতেছেন। আর উঠিলাম না।

নিকটে আসিয়া অঘোরী জিজ্ঞাসা করিলেন: কিরে শালা, এতক্ষণ কি করলি। তোর 'আমি'কে দেখলি?

আমি বলিলাম: হাঁ, যেন কতকটা দেখলাম।

তিনি: কি দেখলি? আমি বলিলাম: শুধু 'আমি' আছি, এই বোধটুকুই ত ছিল। আর কিছুই ত—। বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: দেহ, নাম, রূপ এসব মনে ছিল? আমি: না। শেষে এ সব কিছুই বোধ ছিল না। তিনি তখন বলিলেন: ঐটুকুই তোর 'আমি', এখন বুঝে নে এই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে তোর আসল সম্বন্ধটা কি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: দেহত্যাগের পর মাত্র ঐটুকুই কি থাকে? তিনি বলিলেন: সকলকারই কি থাকে, যার সাধন আছে, 'আমি' সত্তার তীব্র অনুভূতি আছে, তারই থাকে, না হলে সাধারণের তাও থাকে না। এখন তুই বুঝতে পারচিস ত রূপ-টুপ দেখা ওসব বাইরের দেখা,—একটা কিছু রূপ দেখলেই চারটে হাত বেরোয় না!

আমার মধ্যে একটা নেশার মত ভাব তখনও ছিল, বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আনন্দময় একটি অবস্থা হইতে ফিরিয়া কি যেন গোলমালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

তিনি বলিলেন: তুই ভাবছিস্ কি, অনেক গোলমাল সৃষ্টিও করবি, আবার কাটিয়ে যেতেও হবে। সংসারে অনেক কিছু দেনা-পাওনা আছে তোর, হিসেব-নিকেশ না হলে তুই যাবি কোথা?

আমি বলিলাম: কারো সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখলেই ত চুকে যায়, আমি আমার অনুভূতি নিয়ে একলাই থাকি না কেন?

তিনি: তোর তা সাধ্য আছে কি? এখন বলছিস বটে, এর পর তুই প্রবৃত্তির খপ্পরে পড়ে নিজেই কত সম্বন্ধ পাতাবি। ঐ অবস্থা থেকে নেমে এলেই চেপে ধরবে সব তখন।

আমার তখন মনে হইল, 'আমি' আছি এই জ্ঞানটুকু সম্বল করিয়াই না মানুষে কত কাণ্ড, কত বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে,—

তিনি বলিলেন: হাঁ, এর মধ্যে তাহলে আর একটা হাত দেখা যাচ্ছে না কি,—যার উদ্দেশ্য সফল করতেই আমাদের এই সব কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে?

আমি বলিলাম: তা এখন বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু কর্ম করবার সময় আর কাকেও দেখা যায় না ত। তিনি বলিলেন: এই ত রহস্য—এইগুলো বুঝে নিয়ে যদি সব কাজে চালাক হয়ে যেতে পারিস, তবে ত বুঝি। সাধনা দুরকম আছে, এক রকম, শিবই যে শক্তির মধ্যে দিয়ে জগতের সকল কর্মের মূলে আছেন, মুখের কথায় নয়—এই বুদ্ধিটি যাতে পাকা হয় তারি জন্যেই

সাধনা, এতে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে সুখে সংসার-জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। অন্য সাধন হ'ল নিজের মুক্তি, কর্ম বা সংসার থেকে তফাৎ, নিজেকে একেবারে আলাদা করে ফেলা। সে হয় না, লক্ষ কোটির মধ্যে একটা হয় কি না হয়। কারণ মূলে তার ভুল থেকে যায়।

আমি: এখানে ত দেখতে পাই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেও কত কি নিয়ে এ কর্মজগতে সাধনা করছে—তাতেই কল্যাণ হচ্চে।

তিনি: কথায় কথায় যারা ভগবানের দোহাই দিয়ে কথা বলে, যেন ভগবানের সঙ্গে তার কত জানা-শোনা পরিচয় আছে, তাদের মাথা-খারাপ বলে ধরে নিতেই হবে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভালো। ভণ্ড ত তাদেরই বলে। এখানে কর্মক্ষেত্রে শক্তি ও বুদ্ধি নিয়ে কারবার. যার তা আছে সে মনে ভগবানকে স্মরণ করুক না করুক তাতে কিছুই আসে যায় না। বরং নিজের শক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সৎ উদ্দেশ্যমূলক কর্ম করে যায় যারা ভগবানের কথা মনেও আনে না, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁর হিসাবে,—অন্তরে তারা আনন্দ ভোগ করে, তারাই তাঁর প্রিয় সন্তান। শক্তিমান মানুষ যে তাঁর স্পর্শ পেয়েই রয়েছে; আর শক্তিহীন যারা ভগবান্ ভগবান্ করছে তারা বাহ্য জগৎ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলেছে। তার ফলে তারা যে অপদার্থ সেইটাই প্রমাণ করচে। সহজ কথাটি বুঝে নিতে পারিস্ ত? এখানে সব কিছুই দেওয়া আছে, বুদ্ধি আর শক্তির সাহায্যে যা তোমার চাই তা উপার্জন করে নিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর না কেন। আসলে শক্তির অভাব যাদের, দুর্বল মানুষ যারা, তারা শক্তিলাভ করবার জন্যেই ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার দৃঢ় হয়ে আছে যে, ভগবানকে ডাকলেই শক্তি পাওয়া যায়, দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে সেই ডাকাটা কার্য্যকরী হবে তাদের সে বুদ্ধি নেই। হিংসা বিদ্বেষের বশে একজনকে শাপ-মন্নি দিতেও ভগবানকে ডাকচে, নিজের শুভ চাই তার জন্যেও ডাকচে,—এই যে সব কারবারেই ভগবানের নাম নেওয়া আমাদের দেশে, স্থূলভাবে সূক্ষ্মভাবে সকল ভাবেই, বস্তুর সঙ্গে পরিচয় নেই কেবল নিজ স্বার্থে ঐ নামের ব্যবহার এটা যে কতটা শক্তিহীনতার পরিচয়, কতটা অধর্ম, অন্যায় একথা যদি তারা টের পেতো ত লজ্জায় মরে যেত। তারা স্বচ্ছন্দে সমাজে চলে যাচ্ছে কারণ সমাজের অধিকাংশই তাই। এর ফল কি জানিস্? এর পরিণাম?—

আমি: আমার পক্ষে কি তা জানা সম্ভব?

তিনি: এর পরিণাম এ দেশ থেকে ভগবানের নাম উঠে যাবে।

॥ ২৬ ॥

আজ কয়দিন হইতে অবিশ্রান্ত বর্ষার প্রকোপে ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীরটি আমার বড়ই খারাপ যাইতেছিল। পেটের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলাম, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হয় বেশী। আমাশা হইয়াছে মনে করিয়া কাঁচা বেল পুড়াইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া, গুড় দিয়া খালি-পেটে খাইতে বলিয়াছিল পুণ্ডরীক—তাহাই কয়েক দিন হইতে করিতেছিলাম। এখানে বেল গাছের অভাব নাই, চারি দিকেই গাছ, কাঁচা বেলও অনেক। বৈকালে একটি শ্রীফল পাড়িয়া নিকটেই কোন একটি কুণ্ড মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতাম, সেই অত্যুষ্ণ জলে

সারা রাত্রে উহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকিত, প্রাতে সকল কাজ শেষ করিয়া বেলটি লইয়া কালীবাড়ী হইতে কিছু গুড় সংগ্রহ করিয়া উপযোগ করিতাম।

বর্ষার সময় সারা গ্রামে মাটি ভিজিয়া উঠিয়াছে, সব সময়েই একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া আর গন্ধ এই পীঠস্থানের চারিদিকেই সর্বক্ষণ করিয়াছে। রাত্রে যেখানে শয়ন করি তাহার চারিদিকেই ছাদ দিয়া জল পড়ে, বৃষ্টির সময় স্থানটি ভাসিয়া যায়, কম্বলখানি আমার শরীরের তলায় ভিজিয়া উঠে। এই কারণেই আরও শরীরটা সারিতেছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সরিয়া পড়ি, কিন্তু এখান হইতে সরিলে অঘোরীকে পাইব কোথায়? তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে প্রাণ চায় না। কাল ভুলো ডোমের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, সে বলিল: বাবা ত আর এখানে রইবেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম: কোথায় যাবেন, জান? সে বলিল: একদিক দিয়ে চলে যাবেন গা, ওঁয়াদের আবার যাবার ভাবনা! কুথাও এক শ্মশানকে যেঁয়ে উঠবেন গা।

আজ সকালে আমার সিদ্ধ বেলটি হাতে লইয়া কালীবাড়ী গেলাম, ভোজন সারিয়াই শ্মশানে অঘোরী বাবার কাছে যাইব। দেখিলাম, মন্দিরের মধ্যে আমাদের সেই ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্য, পূজার যোগাড় করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন: দেখা হ'ল, ভালো হ'ল, আপনার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম।—পশ্চিম থেকে এক সাধু এসেছেন, বাঙালী সাধু, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, তাঁকে বলেচি, একটু পরে তিনি এইখানেই আসবেন। আমি বলিলাম: মহা ভাগ্য আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তবে আমি একটু ঘুরে কিছু পরে আসব, একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে অনুরোধ করিয়া তিনি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, আমিও বেল আর গুড়ের কাজ শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

শ্মশানে গিয়া দেখি আমাদের অঘোরী বাবা একটি গাছের তলায় বেশ প্রফুল্ল মনে বসিয়া এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। লোকটিকে আরও দুই একবার এখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। ইনি বাবার একজন মদের ইয়ার। যখনই তাঁহাকে এরূপ লোক-সঙ্গে দেখা যায় তখনই বুঝিতে হইবে মদের ব্যাপার ইহার মধ্যে আছে। না হইলে সাধারণ কোন সাধুর মত এক-স্থানে ভক্ত বা শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া কোন প্রকার সৎ-প্রসঙ্গ আলাপনে কালাতিপাত করিতে ইঁহাকে ত কখনও দেখিলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি,—ইনি কাহাকেও শিষ্য করেন না; মন্ত্র-তন্ত্রের কথা দূরে থাকুক,—কাহাকেও আমল দেন না, কেহ আসিলে তাহাকে দূর না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারেন না। যাঁহাদের আমল দেন মদ বা কারণ সম্পর্কে, উহার কাজ শেষ হইলেই দূর করেন; তখন একলা; আর রহস্য এই যে মদের সম্পর্কে যাঁহারা অঘোরীর কাছে আসেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তবেই আসেন, তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কারণ লইয়াও তাঁহার নিকটে আসিতে পারেন না। কারণ উপহার লইয়া যাঁহারা আসেন বা সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ ব্যতীত তাঁহাদের বাবার নিকট আর কিছু প্রার্থনার বালাই নাই। আমার মনে হয় ঐ শ্রেণীর লোক, মদ লইয়াই যাঁহারা বাবাকে কৃতার্থ করিতে আসেন, তাঁহাদের কারণানন্দ লাভ ব্যতীত আর কোনও প্রশ্ন নাই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য যাহা কিছু সমস্তই আত্মবিস্মৃতির ফলে অতলে ডুবিয়া কারণানন্দই জীবনের একমাত্র কাম্য ও ইষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন আমি যাইয়া সেখানে দাঁড়াইতেই সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল। অঘোরী বলিলেন: এখন আবার কি মনে করে আমার হাড় তুই ?

আমি একটু সাহস পাইয়া বলিলাম: আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনার সঙ্গে এদের মদ-যোগানো ছাড়া আর কি অন্য সম্বন্ধ কিছু নেই।

তিনি যেন একটু আশ্চর্য হইলেন, আমার মুখে এরকম একটা প্রশ্ন বাহির হইতে পারে তিনি আশাই করেন নাই। মন-মেজাজ এখন ভালই ছিল, তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন: এ সব আবার কি কথা বলছিস্, তুই বল্ ত, তুই কি করতে এখানে আসিস্ ? আগে আমায় তাই বল্ দিকি ?

আমি বলিলাম: আমি যা করতে আসি তা তো আপনার অজানা নেই। অনেক কিছু জানবার আছে আমার, তাই আসি। যা অপরের কাছে পাই না, তাই জানতে আসি।

তিনি বলিলেন: তোর একটা মতলব আছে, স্বার্থ আছে, যার জন্যে তুই আসিস্। এদের কিন্তু কোন স্বার্থ নেই, একটু মদ খাইয়ে আমাকে খুসী করতে আসে। কোন স্বার্থ নিয়ে এরা আসে না তোর মত। তাই তোর চেয়ে এদের আমি বেশী ভালবাসি।

আমি বলিলাম: এদের তাতে কি কল্যাণ হয়,—আপনাকে মদ খাইয়ে এদের কি লাভ ? ওদের না আছে সাধন, না আছে জীবনে একটা বড় উদ্দেশ্য !

তিনি: কার জীবনের কি উদ্দেশ্য তা তুই কি করে বুঝবি, তোর বুদ্ধি ত শুধু তোর মতলবের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা, তার বাইরে যা কিছু তার ভাল মন্দ তুই বুঝবি কি করে ? তোর ধারণা কেবল তোরাই উন্নতির পথে যাচ্ছিস্ আর ওরা সব অধঃপাতে যাচ্ছে, এই ত ?

আমি: ওরা নিজে মদ খেয়ে বা আপনাকে কতকটা খাইয়ে কি উন্নতি করচে তা তো আমি বুঝতে পারলাম না। আপনি কি বলেন, এতে ওদের উন্নতি হচ্চে ?

তিনি একটু যেন বিরক্তির ভাবে বলিলেন: তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি ; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয় ? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যে রকম তার সেই ভাবের কর্ম আর ভোগ এখানে চলবে ত ? এমন কতকগুলি জীব এ সংসারে আছে যারা তাদের কর্ম মোটেই বাড়াতে আসে নি, কমাতেই এসেছে, সেই জন্যেই তারা এমন সব ভাবের কর্ম নিয়ে জীবনের দিন কাটাচ্চে যাতে তা থেকে আর নূতন কর্ম-সৃষ্টি হতেই পাচ্চে না। লোকচক্ষে, অন্তত তোদের মত লেখাপড়া-জানা বাবু-লোকদের চক্ষে, হয়ত তা খারাপ ঠেকবে,—কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে। এ জীবন শেষ হলে তখন নিজের ধারা, তার আত্মার নির্দিষ্ট গতি পেয়ে যাবে, কোন অসুবিধা হবে না,—সব মানুষের কর্মের ব্যাপার তুই জানিস ?

বুদ্ধি আমার কতটুকু ক্ষুদ্র, অহং আমার অভিমানে নিজেকে অপরের তুলনায় কতটা বড় দেখে, ধরা পড়িয়া সংকুচিত হইয়া যায়। হায় আমার জ্ঞানের অহমিকা ! আমার মধ্যে গ্লানি আসিয়াছে তিনি বুঝিলেন,—অপার কৃপা তাঁহার আমার উপর,—এজন্য আমায় নিরুৎসাহ হইতে দিলেন না। প্রসন্ন

মুখে ধীরে ধীরে বলিলেন: একটা কথা মনে রাখবি, কখনও ভুলিস্ নি,—কারো উন্নতি বা অধঃপতন নিয়ে বিচার করতে যাস্ নি আর প্রচারও করিস্ নি কখনও,—তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে তুই যা দেখবি যা শুনবি, তা থেকে একটা কিছু মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস্ নি, ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস্, যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে, তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী, মহৎ বলে তুই যাদের কর্মের প্রকাশ কতকটা দেখেছিস্ তাদেরও যে রকম, আর অজ্ঞান হীনবুদ্ধি মূর্খ কুক্রিয়াসক্ত বলে যাদের দেখেছিস্ তাদেরও সেই রকম ; সকলকারই একটা আলাদা পথ আছে যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে, আপনাকে প্রকাশ করছে। আর জগদম্বা, আদ্যা প্রকৃতি, তিনি এমন করে এই সৃষ্টির মধ্যে সকলকেই ছেড়ে দিয়েছেন যাতে কারো সঙ্গে কারো ঠোকাঠুকি হচ্চে না। তোর সঙ্গে কারো যখন মিলন ঘটছে বুঝতে হবে সেটা উভয়েরই কর্মের একত্ব থেকেই হয়েছে, সেইটুকু মাত্র দুজনে দুজনকে বুঝচে, তাই নিয়েই বিচার, ঐটুকুই তোদের মধ্যে আলোচনার বিষয়,—কিন্তু তা ছাড়া উভয়েরই কতটা বিস্তৃত জীবনের ব্যাপার রয়েচে সেটা দুজনের কাছেই গুপ্ত, অব্যক্ত। এ সব তুই বুঝিস্ ? যখন তুই তোর নিজের পথ সবটাই দেখতে পাস্ নি তখন অপরের সবটা বুঝবি কি করে ? মানুষের উন্নতি-অবনতি বুঝা কি এতই সহজ মনে করিস্ ?

আমি নির্বাক। অন্তরে অন্তরে আমার কতটা অবসাদ তাহা আর কি বলিব ! ভবিষ্যতে কেমন করিয়া ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইব এ সকল ভাবনায় এক একবার ভিতরটা তোলপাড় করিতেছে। আমায় কেমন করিয়া প্রতারণা করে, কিছু না বুঝিয়াও সব বুঝিয়াছি এইভাবে হীন, অসমর্থ ও শক্তিহীন করিয়া দেয়--এক একবার এই কথাই ভাবিতেছি। আবার পরক্ষণেই এইমাত্র ইনি যে অদ্ভুত জীবনচক্রের কথা বলিলেন, কি অপূর্ব রহস্যের মধ্যে জগজ্জননীর সৃষ্টির প্রবাহ চলিতেছে। হায়, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমরা জীবনগুলি বলি দিতেছি কিসের লোভে ? কম্পিটিশনের হাওয়ায় আমরা কোথায় চলিতেছি। পুস্তকলব্ধজ্ঞান কর্মক্ষেত্রে অর্থ-উপার্জনের প্রতিযোগিতায় ক্লিষ্ট জীবন ইহাতেই যদি নিঃশেষিত হইল তাহাতে—

আজ আমার কি হইয়াছে জানি না. এখানে আসিয়া অবধি এমন সব কথা কহিতেছি যাহার ফলে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি করিতেছি, শেষে অনুশোচনায় পুড়িয়া মরিতে হইতেছে। এতটা শুনিয়াও কতক্ষণ পর আবার এক প্রশ্ন করিয়া বসিলাম। প্রথমে অন্তরের সঙ্কোচটা কাটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম: একটা কথা বলবেন ?

তিনি বলিলেন: তার জন্যে আবার এত ভনিতা কেন ? বল্ না—

মেজাজটা তাঁর আজ নেহাত ভাল. তাই সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম. —আপনি মদ খান কেন ? কথাটা বলিয়াই আমি অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলাম। এতটা কথার পর আবার এ কি একটা বিশ্রী কাণ্ড করিলাম। ছি ছি, সঙ্কোচে আমি এতটুকু হইয়া গেলাম।

যে মেজাজটি ভাল দেখিয়া আজ এতটা সাহস করিয়া একথা বলিয়া ফেলিয়াছি,—সে প্রফুল্ল ভাবটি তাঁহার এই একটিমাত্র কথায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। ক্রোধের ভাব মুখে প্রকট হইল, যথার্থই আমি এইবার ভয় পাইলাম।

অপরাধীর মত একবার অপরাধ স্বীকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কণ্ঠে কোন শব্দ আসিল না। তিনি বলিলেন: তোর কিরে শালা,—তোর তাতে কি? আমি মদ খেয়ে কারো কিছু অনিষ্ট করেছি তুই দেখেছিস্, শুনেছিস্ কোথাও, আমার খুসী আমি খাব,—বল্ শালা, তুই কেন একথা বলি আমাকে। এই যে তোকে বুঝিয়ে দিলাম এসব নিয়ে বিচার করিস্ নি।

অনেকটা জোর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম: আপনার মহান্ চরিত্রের মধ্যে ঐটুকুই আমার বড় অসঙ্গত ঠেকে—তাই বলে ফেলেছি।

মিথ্যাবাদী, শালা চোর, ঐটুকু মাত্র অসঙ্গত তাই বলছিস্? মনে ভেবে দে আরও কত কত অসঙ্গতির কথা তুই জানিস্, কত লোকে তোর মত আমায় ভূতসিদ্ধ পিশাচ বলে, কত কি বলে,—আমি জানি নি! পরে চীৎকার করিয়া বলিলেন: কুকুর তুই শালা, কুকুরের জাত তুই, নাই পেলে মাথায় উঠিস্। ছুঁচো কোথাকার, এতটা তোর স্পর্দ্ধা—তুই কি আমার বিচারকর্তা! বেরো তুই এখান থেকে,—তোর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই, বেরো এখান থেকে তুই—আর কখনও আসবি না, বেরো—বেরো বলছি এখান থেকে,—বলিয়া হাত দিয়া বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিলেন।

আমি প্রথমটা ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু শেষে কি জানি আমার ভয় ত ছিলই না কেমন এক রকম অনাসক্ত হইয়া গেলাম। তাঁহার শেষের কথাগুলির কোন ক্রিয়াই আমার মধ্যে হইল না। আমি উঠিলাম না, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে একটা শূন্যতা,—আমার যেন সমস্ত বোধ বা অনুভবশক্তি অসাড় হইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পর ক্রমে আমি যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, সাহস করিয়া একবার মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম আর কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের লেশমাত্র তাঁহার বদনে নাই, প্রশান্ত মুখখানি তাঁহার সহজ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। বুঝিলাম ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে একটু আগে এতটা চাঞ্চল্য দেখাইলেন উহা সত্য কি না ইহাই তখনকার বিচারের বিষয় হইল আমার মধ্যে। এমন সময়ে সেই ব্যক্তি মদ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দুটি বড় বোতল ও একটি পাত্র সম্মুখে রাখিয়া সে প্রণাম করিয়া বসিল। যখন দেখিলাম এখন ত এঁদের মদ চলিবে তখন আমি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলাম। যখন চলিয়া আসিবার জন্য পা বাড়াইয়াছি,—তখন অঘোরী আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন: এই শালা, কোথা যাস্,—বোস্ এখানে। তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতের সঙ্গে 'বোস্', এই কথাটিতে আমার শরীরটি যেন আপনিই বসিয়া পড়িল।

তার পর দেখিলাম সেই লোকটি একটা বোতলের ছিপি খুলিয়া হাতে দিলে,—অঘোরী বাবা মুখে উঠাইয়া যেমন করিয়া ডিস্পেপটিক্‌রা সোডা খায়, সেই বড় বোতলটির সবটুকুই আপনার গলগহ্বরে ঢালিয়া দিলেন। একটু মুখ-বিকৃতি নাই, কিছু নাই। তার পর সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় বোতলটির ছিপি খুলিয়া হাতে দিলে তিনি তাহাকে তাহার পাত্রটি আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাত্র আসিলে বাবা তাহাতে বোতলের এক-চতুর্থাংশ আন্দাজ মাল ঢালিয়া বাকিটুকু মুখের মধ্যে দিয়া নিজ উদরে গ্রহণ করিলেন। এইবার সেই ব্যক্তি পাত্রটি তাঁহার পায়ের কাছে মাটিতে ঠেকাইয়া ভক্তিভরে পান করিল। তার পর নিস্তব্ধ ভাবের রাজত্ব চলিল। সে ব্যক্তি কিছুক্ষণ বসিয়া বোতল দুইটি ও পাত্রটি লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এখন আমরা দুজনে মাত্র এখানে রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে তিনি কথা কহিলেন। আমার দিকে না চাহিয়া যেন আপন মনেই কথাটা বলিলেন : মদ খেলে কি হয়? আমি কিছুই বলিলাম না,—কোন কথাই মুখে আসিল না। তার পর আপন মনেই বলিতে লাগিলেন : অপরিমিত খেয়ে যদি লোকে মাতাল হয়, অন্যায় কিছু করে, সে কি মদের দোষ? শরীরে স্ফূর্তি, মনে আনন্দ যাতে হয়, সে কি খারাপ জিনিস? আমি খাব, আমার খুসী; যার খুসী হবে সে খাবে, তাতে তোর কি? যে মানুষ এমন জিনিসের গুণ বোঝে না, কেবল দোষই দেখে, সে কি রকম মানুষ? সংসারে আসে কেন মানুষ?—কাজ করতে আসে, ভোগ করতে আসে। যারা মদ খেয়ে আনন্দ পায়, কর্মশক্তি পায়, তারা কেন খাবে না? পাপ কিসে হয়? নিজের সুখ সুবিধের জন্যে যারা অপরের অনিষ্ট করে, যার মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষার বিষ রয়েচে, সে মদ খেলেও যা করবে, না খেলেও তাই করবে। তাতে মদের দোষ কি? মদের উপরে ঘৃণা রাখবার কি অধিকার আছে তোর? কোন্‌টা কার পক্ষে ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তা কি তুই জানিস্? তুই সভ্য, আর যারা মদ খায় তারা অসভ্য—এ বুদ্ধি কোথা থেকে এল তোর? এত অহংকার তোর লেখা-পড়ার! যার প্রকৃতি যা, মদের প্রভাব কি তার উপর যেতে পারে?

কতক্ষণ পর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন : তোদের শিক্ষিত সভ্য সমাজে যে সব পাতকের কাজ নিত্য নিত্য হচ্ছে, সে সব কি মদ খেয়ে ঘটচে? পাতকের কাজ তোদের লেখা-পড়া-জানা লোকে বেশী করে, না নিরক্ষর লোকে যারা নেশা-ভাং করে তারাই বেশী করে—দেখতে পাস্ না? তোদের সমাজে ধনবানের অত্যাচার কত বড়, ধনমদে কত লোক নির্ধনের উপর অত্যাচার করচে, বলবান দুর্বলের উপর পীড়ন করচে, সেখানে মদের বোতল কোথায়? বিষয়ের লোভে তোদের শিক্ষিত সমাজে কত লোক বিষ খাইয়ে মানুষকে হত্যা করচে শিশুহত্যা, বালকহত্যা, স্ত্রীহত্যা কত প্রকারের মহাপাতক সমাজের মধ্যে হচ্চে, সেখানে মদ কোথায়? যারা মদ খায় না তারা বেশী, না যারা খায় তারা বেশী পাতকে লিপ্ত, হিসাব করে দেখেছিস্ তুই? সাধু চরিত্র, যারা মদ মাংস স্পর্শ করে না অথচ ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে নিজ স্ত্রী, পরস্ত্রী, কুমারী, বিধবা তাদের কাছে কিছু ভেদ নেই, সব সমান—স্ত্রীলোক-ঘটিত এমন কোন কুৎসিত পাপ নেই যা করে না, সেখানে মদ কোথায়? জ্ঞান বুদ্ধির অহংকারে এমন উপকারী জিনিসের উপর এমন অবিচার করে যারা তারা কি ভাল লোক? কি অধিকার আছে তোর মদকে খারাপ বলে প্রচার করবার? সাধু চরিত্রের মানুষ যারা তারা মদ খায় না, এ কথা তোকে কে বললে? মদ খেলে অসাধু হয়, এই বা কেমন কথা? সাধু অসাধু ঠিক করবার মাপকাঠি হ'ল কিনা মদ? —এ সব কি বুদ্ধি! সমাজে মানুষের স্বভাব প্রকৃতিটাই যে আসল। কিসে মানুষের চরিত্র উন্নত হবে, শক্তিমান হবে, সরল অকপট হবে সেদিকে বুদ্ধি গেল না, বুদ্ধি গেল কিনা মদের দোষ দেখতে। সমাজে যেন মদই মানুষের প্রকৃতি স্বভাব গড়ছে, মদেরই যত দোষ?—এ্যাঁঃ।

এই পর্য্যন্ত এমন শান্ত সরলভাবে কথাগুলি বলিলেন, আমি প্রত্যেক

কথাটি স্থির মনোযোগের সঙ্গেই শুনিতেছিলাম। ইহার পর একবার তিনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া, বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন। বোধ হয় আমি মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছি কি না তাহাই বুঝিবার জন্য দেখিলেন। আমি এই সুযোগে তাহার চক্ষে এক অপরূপ বস্তু দেখিতে পাইলাম যাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। কি বিশালায়ত চক্ষু তাঁহার। এতদিন সঙ্গ করিয়াছি, তাঁহার নয়নের এরূপ বিশাল মূর্তি কখনও দেখি নাই। জবা ফুলের মত, সত্য সত্যই অতটা ঘোর লাল, মধ্যে বড় বড় দুইটি ক্ষীণ স্বচ্ছ নীলাভ তারকা,—তাহার মধ্যে এক ফোঁটা গাঢ় নীলবর্ণের মণি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—তাহার মধ্যেও যেন স্বচ্ছ তারকা ভেদ করিয়া লালের আভা প্রবেশ করিয়াছে। তার পর, সেই মণির ঠিক উপরেই অতীব উজ্জ্বল দিবাকর জ্যোতির সূক্ষ্ম একটি বিন্দু দেখা যাইতেছে। তাহাতে সেই চক্ষুর মধ্যে এক অমানুষিক তেজ উৎপন্ন করিয়াছে। উহা স্বচ্ছ, উহার উপর দৃষ্টি রাখা যায় না। সে মূর্তি দেখিয়া আমার চক্ষুও স্থির হইয়া আসিল, আমায় যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভয়ে নয়,—কারণ তাহাতে ক্রোধ হিংসাদি কোন প্রকার উগ্রভাবের ছায়াও ছিল না, ছিল কেবল তাঁহার শক্তির অসীম আকর্ষণ, দৃষ্টিপাতে একজনকে একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লইবার ধ্রুব শক্তি। অপূর্ব ভাবোদ্দীপক, পূর্ণ শক্তির আলোক উদ্ভাসিত সেই দিব্য চক্ষু দুইটি। তাঁহার রূপ এখনও আমার স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। আমার চক্ষের উপর তাঁহার সেই জীবন্ত বাঙ্ময় কটাক্ষ পড়িবামাত্রই অন্তরে একটি আঘাত অনুভব করিলাম। উহা আকস্মিক, বোধ হইল আমার অনুভব-রাজ্যের সবটুকুই যেন তোলপাড় করিয়া দিল, যাহার ফলে আমার সংজ্ঞালোপের মতই একটা অবস্থা হইল। কিন্তু তাহা ঘটিবার পূর্বেই তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমায় সজাগ করিয়া দিল। এই কথাগুলি আমার কানে গেল,—শুনছিস্ তুই, একটা তেজী ঘোড়া,—

চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন: ওদিকে নয়, ওদিকে নয়—আমার দিকে ; শোন—একটা তেজস্বী ঘোড়া মানুষের কত উপকার করে,—তাকে বাগিয়ে নিয়ে কত কাজ করা যায়, কেমন?

আমি তখন বুঝিলাম, বলিলাম: ব্যবহার জানলে, সাহস থাকলে করা যায় বই কি! যারা জানে তারা ত তা করেও থাকে,—

তিনি বলিলেন: তাই হ'ল। এখন, সেই ঘোড়ায় উঠলে তোকে ফেলে দেবে, কত রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে যাতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে, এই ভয়ে তুই আর ঘোড়ায় উঠবি না—এ কি রকম ভাব! ঘোড়া দেখলে শত হাত দূরে পালাবে—এ কি রকম শাস্তোর? তাদের এ দেশ ছাড়া কোন্ সভ্যদেশে এ রকম শাস্তোর আছে দেখতে পাস্? এ কি শক্তিমান দেশের শাস্তোর? পরিমিত মদের ব্যবহারে যে অশেষ উপকার হয়, এটা কোন্ সভ্য-দেশের মানুষে জানে না, মানে না? এই অলস অকর্মণ্য কাপুরুষের দেশে, যেখানে মানুষ একদিনের খাবার যোগাড় থাকলে সেদিন আর হাত-পা নাড়বে না, সেদিন কেবল খাবে আর ঘুমিয়ে কাটাবে ; দিনে ঘুম যে দেশের প্রত্যেক মানুষের ধাতস্থ, মজুরী করতে হলে কেবল কি ভাবে কতটুকু গতর ফাঁকি দেওয়া যায় যাদের লক্ষ্য,—মড়ক, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি যে দেশে সমানে লেগে আছে,

সেখানে এই মদ যে একটা মহাশক্তি, মহা ওষুধের কাজ করে, বুঝতে পারিস্‌ নি? আফিং, গাঁজা, চরস খেয়ে জড়ভরত হয়ে থাকবে, মরবে সেও ভাল, কিন্তু মদ ছুঁলে পাপ, শাস্তোরে লিখেছে; মদের উপর অভিশাপ আছে, কেমন?

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা কহিলাম, বলিলাম: শাস্ত্র এখন মানছে কে? এ সব যে শাস্ত্রের কথা তা কোন দিন মান্য হয়েছে বলে ত আমার মনে হয় না, এখনকার কথা ত ছেড়েই দিতে হবে। ব্রাহ্মণদের মদ অস্পৃশ্য, অবশ্য ঔষধার্থে ছাড়া। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের কথা জানি না, দেখিও নি। আমাদের সময়ে এমন কোন ব্রাহ্মণ-সংসার দেখেছি বলে মনে হয় না, যেখানে কেউ না কেউ মদে আসক্ত নয়। ছেলেবেলা থেকেই দেখছি ব্রাহ্মণেরাই ত শাস্ত্রবিধি বর্জন করবার কাজে অগ্রণী, কিন্তু মুখে স্বীকার করবার কাজে নয়। ভাবটা এই যে, আমরা যা খুসী করব, কারো কিছু বলবার আবশ্যক নেই। বললেই লাঠালাঠি ব্যাপার। বাল্যকাল থেকে মদ বলে এই শব্দটির উপর প্রকাশ্যে ঘৃণা করতে আমরা শিখেছি। মদ নরকের পথ পরিষ্কার করে, মদ্য পানের তুল্য পাতক নাই,—ও বস্তুটি অতীব ঘৃণ্য। কিন্তু আর আর নেশা—ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিম, চরস—এ সকল হিন্দুদের ভগবানের দরবারে পাস করা নেশার জিনিস, এসবে পাতক নেই। এসব কথা ত এখন সকলকারই জানা। আমার মনে হয়, এই যে আমাদের দেশে গৃহস্থ ইতর-ভদ্রের মধ্যে মদের চলন তার মূলে তন্ত্রধর্মের প্রভাব আছে। পূর্বে যেখানে পঞ্চ-মকারের সঙ্গে মদ সাধনের অঙ্গ ছিল, একালে সাধনের অঙ্গটা বাদ দিয়ে আর সবটাই রয়ে গেছে, কেবল মুদ্রার অর্থটা বদলে গেছে। এখন বোধ হয় দুর্ভিক্ষের বাজারে মাংস জোটে না বলে মুড়ি কড়াই-ভাজাটাই মুদ্রার নামে চলেছে। এই যা তফাৎ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তুই কখনও মদ খেয়েছিস্‌ বল্‌ দিকি!

আমি: প্রায় সাত বৎসর পূর্বে আমি দুই একবার খেয়েছিলাম।

তিনি: কি রকম বুঝলি তুই খেয়ে? আমি বলিলাম: কি রকম ভাব আমার মধ্যে হয় সেইটে দেখবার জন্য, বুঝবার জন্যই খেয়েছিলাম। দেখলাম আমি যা তাই-ই থাকি, কেবল শরীরের মধ্যে একটা স্ফূর্তি আসে এই মাত্র। যাতে মন দেওয়া যায়, খুব আনন্দে সেই কাজ করা যায়। মদ খেলে কোন অন্যায় অসঙ্গত কাজে আমার মন যায় নি এটা দেখেছি, কিন্তু অন্যের বেলা অন্য রকম দেখেছি। আমার একজন আত্মীয় মদে আসক্ত ছিলেন। তাঁকে দেখেছি মদ খেলেই মাতলামো আর লোকের উপর অত্যাচার করবার, লোককে অপমানিত করবার প্রবৃত্তি যেন ভয়ানক রকম জেগে উঠত। সহজ অবস্থায় বেশ লোক, কিন্তু মদ পেটে পড়লেই যেন আর একটা মানুষ, যেন একটা দানব হয়ে উঠতেন। আবার আর-এক রকমও দেখেছি, স্বভাবত ভয়ানক রাগী, উগ্র প্রকৃতির লোক,—বদমেজাজ, তাঁর জ্বালায় বাড়ীতে কারো শান্তি নেই, কিন্তু মদ খেলে একেবারেই বিপরীত; এমন শান্ত, ধীর, ভদ্র ব্যবহার তাঁর—দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। কি ব্যাপার বুঝা শক্ত।

তিনি বলিলেন: এইমাত্র তোকে বল্লুম যে, মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি যা তার উপর মদ যেতে পারে না। মানুষকে সরল অকপট করাই মদের ধর্ম। মানুষের প্রকৃতি যেটা মদ তাকে বাইরে প্রকাশ করে দেয়। ঐ যে তোর

আত্মীয়ের কথা বললি, সহজ অবস্থায় ভাল লোক, আর মদ খেলেই হয় দানব, সে লোকটার প্রকৃতিই তাই। সহজ অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে তার দানবমূর্তি ফুটতে পায় না, মদ খেলে যখন প্রাণ সরল অকপট হয়, নিঃসঙ্কোচ হয়, তখনই তার পরিচয় বেরিয়ে পড়ে।

আমি বলিলাম : কথাটা সত্য, আমরা জানি তিনি অন্তরে বড়ই ভয়ঙ্কর দাম্ভিক মানুষ। আচ্ছা তা হলে দ্বিতীয় লোকটির ব্যাপার—

তিনি : যার বাইরের ভাব উগ্র প্রকৃতির, মদ খেলে শান্ত ভব দেখেছিস্, তার অন্তর প্রকৃতি ভাল, সৎ ভাবই তার আশ্রয়, কেবল অভাব এবং অশান্তির জন্য, আবার এমনও হতে পারে লোকের ব্যবহারে হয় ত সে দাগা পেয়েছে,— তার প্রিয়জনের দুর্ব্যবহারেই তার মেজাজ শান্ত থাকে না, শান্তি পায় না। মদের গুণে তাকে যখন স্থির করে দেয় তখনই তার আসল প্রকৃতির বিকাশ হয়।

আমি : আপনি সাধারণ ভাবে ত মদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন, এখন তন্ত্রে এই মদের ব্যবহার সম্বন্ধে যুক্তিটা কি, মদটা কেন তন্ত্রের সাধনের মধ্যে স্থান পেলে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন : স্থান পেলে কি রে,—প্রধান স্থান বল্! তন্ত্রধর্ম কেবল কোন বিশেষ উচ্চশিক্ষিত সভ্য সম্প্রদায়ের জন্য নয় ত, এ যে যা কর্মজীবন থেকে মোটেই আলাদা নয়—এটা তুই ত জেনেছিস্! এখন গরীব দুঃখী, উচ্চ নীচ, সাধারণ অ-সাধারণ সকলের নিত্য ব্যবহারিক ধর্ম, দেশের সর্বসাধারণের দিকে চেয়ে দেখ্, দেখতে পাবি সবাই চাইচে আনন্দ, স্ফূর্তি—ধর্ম বল্ কর্ম বল্, যা কিছু প্রেরণা দেশের মানুষ অনুভব করচে, সুখকে লক্ষ্য করেই ত করচে? শরীরে সুস্থতা আর তার জন্যেই যে একটা সহজ স্ফূর্তি। এইটিই ত চাই প্রথম, এ না হলে কিছুই হবে না। কিন্তু এমনই সামাজিক মানুষের স্বভাব যে প্রকৃতির সহজ নিয়মের ব্যতিক্রম করবেই করবে।—অতিরিক্ত সুখের আশায় উন্মাদ হয়ে বাল্যাবস্থা থেকেই শরীরকে বিগড়ে ফেলতে অভ্যস্ত। শরীর-যন্ত্রের কি পরিণাম হবে এ ভেবে কেউ কাজ করতে নামে না। চারিদিকেই দেখতে পাবি বালক-অবস্থা থেকেই শরীরকে সংযত প্রণালীতে চালাবার, আর যৌবন-অবস্থায় কর্ম ও ভোগাদি ব্যাপারে সংযমের শিক্ষা, যেটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম লক্ষ্য তা অনেক কাল দেশ থেকে অন্তত সাধারণের মধ্যে থেকে উবে গেছে; আর তার ফলে জনসাধারণের শরীরও ভাঙতে সুরু হয়েছে, হিন্দু সমাজ শরীরও ভাঙতে সুরু হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই যদি শরীর ভাল না গড়তে পায়, উদ্দাম যৌবনে ভোগ ও কর্মের বেলা সেই শরীর ও মনের কি রকম গতিক হয় তা ত বুঝতেই পাচ্চিস্। এই তন্ত্রধর্মে প্রথমেই মদকে নিয়েছে এই কারণে যে, এতে নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার হয়; পরিমিত ব্যবহারে শরীরকে সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী এবং কঠিন কর্মক্ষম করে, প্রকৃতিকে অকপট করে মনকে নির্ভীক ও সাহসী করে তোলে। বিশেষত চাল বা ভাত থেকে বা ফলের রস থেকে যে মদ তৈরী হয় তার গুণ অসাধারণ। ভেতো বাঙালীর শরীরে তার উপকারিতা অনেক। তা হলেই ত বুঝতে পাচ্চিস্ কেন মদকে প্রথমেই ধরা হয়েছে, সাধনার প্রধান অঙ্গ বলে নেওয়া হয়েছে।

আমি বলিলাম: তাইতেই ত এত জড়বুদ্ধি মাতালের সৃষ্টি—ধর্মের নামে!

তিনি বলিলেন: তন্ত্রধর্মের মধ্যে মদ নিয়ে যে সাধন, তার ওরকম বিশৃঙ্খল ব্যবহারের নিয়ম নেই। নিয়ম হচ্ছে, ছোট্ট চায়ের চামচের এক চামচে হ'ল একটি পাত্র, অধিকারী ভেদে মাপ করে তার তিন, পাঁচ বা সাত পাত্র। সাত পাত্র হ'ল পূর্ণ মাত্রা—সে কতটুকু? তাতে অনাচার বা দূষণীয় কিছুই নেই। তাতে করে কাকেও মাতাল বা অজ্ঞান করে না। তবে কেউ যদি লোভে পড়ে নিয়মের ব্যতিক্রম করে, স্ফূর্তি পাবার জন্য বেশী বা অপরিমিত ব্যবহার করে, সেটি কি বস্তুর দোষ?

আমি বলিলাম: সেটি যদি এমনই লোভের বস্তু হয়,—

তিনি বলিলেন: এই যে ভাত, পেট ঠেসে বেশী মাত্রায় খেয়ে খেয়ে কত অনিষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে, বোধ হয় জনসাধারণের এতটা অনিষ্ট আর কিছুতে হয় নি—তুই তার কি করছিস্? দেখতে পাচ্ছিস্ না, এই যে অপরিমিত অন্ন আহার তার ফলে ভোজনের পর শরীর কি রকম অবসন্ন হয়ে আসে যে তাকে শুতে হয়, তাই থেকেই ত দেশজুড়ে দিবানিদ্রার উৎপত্তি হয়েছে। দেশে দশ-সেরী, পনর-সেরী, আধ-মুণ, এক-মুণ খাইয়ের উৎপত্তি—সে কি দেশের সৌভাগ্যের লক্ষণ? হাঘোরে মন্বন্তরা যে দেশে লেগে থাকে সেই দেশেই এ রকম অদ্ভুত অকর্মণ্য মানুষের উৎপত্তি হয়। তাদের দ্বারা কি কোন কাজ হয়, না কল্যাণ হয়? এ দেশে কেবল খাবার জন্যেই বেশ বড় একদল লোক বেঁচে থাকতে চায়, জানিস্ ত? পেটকে বাড়ালে যে কতটা শক্তির অপচয় হয় যাতে শেষে শক্তিহীন হতে হয়, সে কি ভুজুনীরা জানে? খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া আর কোন্ পরিশ্রমের কাজে তারা লাগে? ধর্ম-সাধনা তাদের জন্য ত নয়, এ ত বুঝতে পারিস্?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: এই তন্ত্র-মতের সাধনের ব্যাপারে মদ কি শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করতেই হবে?

তিনি: তা কেন,—যার শরীর সুস্থ সবল, পশ্বাচার আর বীরাচারের পর ত আর তার মদের প্রয়োজন বোধ থাকবে না। দিব্যাচারের মধ্যে গিয়ে পড়লে তখন তাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়।

আমি: স্বভাবতই যাদের মনে স্ফূর্তি আছে, শরীর সবল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে তাদের বীরাচারের বেলায়ই বা মদের প্রয়োজন কেন?

তিনি: তোকে ত বললুম যে, মদের যে সব গুণ আছে তার মধ্যে বিশেষ গুণ হচ্ছে মানুষকে নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ করে। বীরাচারের সাধনায় এমন অনেক কাজ আছে যাতে অমানুষিক সাহসের প্রয়োজন! মনে কর, ঘোর অমাবস্যার রাতে শব-সাধনার সময়, যখন হয়ত উত্তর সাধকও কাছে থাকবে না তখন ঐ মদই প্রধান সহায় হয়। তখনকার দিনে মহাশক্তি লাভের জন্য সাধকেরা যে সব ক্রিয়া-কর্ম করত তা শুনলে তোরা চমকে উঠবি। এখন অবশ্য দেশের মধ্যে আর সে সকল ভাব নেই, মতি-গতি বদল হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ লোকের জীবনধারার পরিবর্তন হয়ে গেছে।

শুনিয়া আমি ভাবিতেছিলাম। কতক্ষণ পর তিনি বলিলেন: আচ্ছা, তোর শরীর কেন এরকম দেখছি, জ্যোতিঃ নেই, যেন অসুস্থ বলে বোধ হচ্ছে—

আমি তাঁহাকে তখন ঠাণ্ডা লাগার ফলে শরীর অসুস্থ হওয়ার কথা বলিলাম।

শুনিয়া তিনি বলিলেন : এই দেখ, তোর পক্ষে এখন এই মদ উপকারী। যদি তুই দু-চার দিন একটু একটু করে খাস্‌ তা হলে অনেক উপকার হবে ; কিন্তু তুই ভিন্ন মার্গের লোক, তুই ত তা করবি নি—তাই বলি এখান থেকে চলে যা, এতদিন ত রইলি, যাহোক কিছু ত দেখা-শোনা হ'ল, এখন এখান থেকে চলে যা।

আমি বলিলাম : আপনার জন্যই এখানে থাকা, তা ছাড়া এখনও আমি ত যা চাইছিলাম তা পাই নি,—

তিনি বলিলেন : সেটি নিজে সাধনা না করলে পাবেও না। এবার আমিও যাব যে, অনেক দিন হয়ে গেল।

আমাদের এই সব কথা যখন হইতেছিল তখন বোদে পাগলা অর্থাৎ বৈদ্যনাথ আসিয়া উপস্থিত। বাবাকে প্রণাম করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিল : ননী (অনাদি) ভট্‌চায আপনাকে ডাকছেন, —কে একজন সাধু বাবা আইছেন, দেখেন যেঁয়ে।

আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না, অঘোরী উঠাইয়া দিলেন, কাজেই চলিয়া আসিলাম। মনে মনে তাঁর ঐ কথাগুলি ভাবিতেছিলাম যে পেট ঠেসে ভাত খেয়ে দেশের লোকের কি ভয়ানক অনিষ্টই হচ্ছে। কেমন করিয়া দেশের লোককে এ কথা বুঝানো যায়,—আর কে-ই বা বুঝিবে ?

নবাগত সন্ন্যাসী বাঙ্গালী, আধা বয়সী, খর্বাকৃতি. মাথাটি তাঁর প্রকাণ্ড এবং মুণ্ডিত, রোগা শরীর। চেহারায় ব্যক্তিত্বের আভাস নাই। আমি যখন আসিতেছি পিছনে বৈদ্যনাথ,—শুনিলাম তিনি অনুকূলানন্দজী এবং আরও

দুই একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন,—এই কি সাধু-সন্ন্যাসীর লক্ষণ! এত চীৎকার-মাৎ, এত গোলমাল কিসের? শান্তি নষ্ট করে কি সুখ হয় বল ত? তোমরা সাধু-সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দাও আর কাজের বেলায় এমন কেন? সাধুকে চেহারা দেখলেই চেনা যায়। এখানে তোমাদের দিন রাত এই রকম হট্টগোল চলে নাকি? সাধন-ভজন হয় কখন? ইত্যাদি।

সর্দারী-ভাবটি তাঁর যেন স্বভাবগত। তাঁর কথা শুনিয়া অনুকূলানন্দ চুপচাপ অবস্থায় সরিয়া পড়িলেন, বাকী যাঁহারা রহিলেন তাঁহারাও মৌনাবলম্বন করিলেন। এখন চুপ-চাপ, আর সে হট্টগোল নাই।

আমাকে দেখিয়াই নবাগত সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: এই দেখ একটি মূর্তি, দেখলেই আর পরিচয়ের দরকার হয় না, স্থির সৌম্যভাব, মুখে প্রসন্নতা, গাম্ভীর্য্য এক সঙ্গে,—চাল-চলনে প্রকট,—

আমি নমস্কার করিলে ননী ঠাকুর বলিলেন: এঁর কথাই আপনাকে বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে কথা কইবার মত একজন মানুষ এখানে ইনিই আছেন।

আমরা অগ্রসর হইয়া সেই বিশাল বৃক্ষতলে বৃত্তাকার বেদীতে যাইয়া উপবেশন করিলাম। তিনি বাক্যকুশল মানুষ, প্রথমেই আরম্ভ করিলেন:

আমি এখন সিমলা (শৈল) হতে আসছি। সেখানে প্রায় দুইমাসকাল ছিলাম। সেখানে যত বড় বড় অফিসার আছেন সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। গত মাসে বেরিয়েছি, ঘুরতে ঘুরতে প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, ভাগলপুর হয়ে আসছি। একবার বক্রেশ্বর আসবার ইচ্ছা অনেকদিনই ছিল, এবারে ভাবলাম দেখে যাই,—পূর্বে এ অঞ্চলে আসি নি কখনও,—কেবল এই অঞ্চলটাই ঘোরা হয় নি, না হলে আর কোন প্রসিদ্ধ স্থান ঘুরতে বাকী নেই। আপনি কতদিন এখানে আছেন?

আমি বলিলাম: এই দেড়মাস কাল প্রায় এখানে আছি।

শুনিয়া তিনি আমার নিবাস কোথায়, কতদিন বাহির হইয়াছি, কি প্রকার উদ্দেশ্য—এই সব কথা প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমায় আকুল করিয়া তুলিলেন। শেষে বলিলেন: দেখি আপনার হাতখানা। আমি হাতখানি বাড়াইয়া দিলাম, না দিলে উপায় ছিল না। বলিলাম: আপনার আবার এ বিদ্যাও আছে নাকি?

তিনি বলিলেন: আছে বৈকি, কিছু কিছু সবই রাখতে হয়।

অনেকক্ষণ দেখিয়া নানাপ্রকার ভঙ্গীতে হাতটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলেন: আপনাকে পুনর্মুষিক হতে হবে যে,—এই বৎসরখানেক পরেই।

আমি বলিলাম: আমি ত সংসার ত্যাগ করে একেবারে সন্ন্যাস নিই নি,—

তিনি: তা না হোক, এ সময়টা আপনার বৈরাগ্য-যোগ দেখছি, অন্তরে ত সংসারভাব নেই। আপনার দুই বিবাহ কি না? প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সকল সম্পূর্ণ হইলে আমি বলিলাম: আপনি হিমালয়ে ত অনেক ঘুরেছেন?

তিনি: হাঁ, প্রায় হাজার চার মাইল বেড়িয়েছি, এই পায়ে হেঁটে, নিঃসঙ্গ হয়ে—একলাই ঘুরেচি।

আমি: ওদিকে কোনও সিদ্ধ যোগীর সঙ্গ পেয়েছিলেন কি?

তিনি বলিলেন: হরিদ্বার থেকে আরম্ভ করে যতদূর যাবেন; সেই যোশী মঠ অবধি পেটভুখা সাধুই দেখতে পাবেন,—রোটী আর কম্বল চাই,—আর বেশ একটু প্রতিষ্ঠাপন্ন হলে, বেশী লোক পটাতে পাল্লে তখন তাদের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই বলবৎ দেখতে পাবেন। শাঁসালো ভক্তদেরই খাতির, সাধারণ বা গরীব গেরস্ত যাঁরা তাদের হরিতকী প্রসাদের ব্যবস্থা। এ আপনি হরিদ্বারের ভোলাগিরি থেকে আরম্ভ করে ও অঞ্চলের শেষ সেই হনুমান চটির উত্তরে নীরানন্দ বাবা পর্য্যন্ত একই রকম দেখতে পাবেন। মুখে গীতার শ্লোক, দুই চারিটি বাঁধা গতের আওড়ানি ছাড়া পেটে বোমা মারলে আর বেশী কিছু পাবেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সিদ্ধযোগী দর্শন ভাগ্যের কথা ত? আপনার দেখছি সে ভাগ্য হয় নি।

তিনি বলিলেন: সিদ্ধ যোগী-ফোগী কিছু না, সবই ভবঘুরের দল। যোগ-সিদ্ধই যদি হবে তা হা-অন্ন করে বেড়াতে যাবে কেন? আশ্রম-প্রতিষ্ঠাই বা করতে যাবে কেন?

আমি: মনে করুন সাধনের জন্য অনুকূল স্থানও ত চাই, রৌদ্র বৃষ্টি থেকে শরীরকে বাঁচাবার জন্য—

তিনি: হাঁ হাঁ—সে আমি বুঝি, সেই যদি বললেন, সে সব কাজের জন্য উপর হিমালয়ের মধ্যে কত শত গুহা আছে যার মধ্যে যতকাল ইচ্ছে কাটানো যেতে পারে। আসলে তা তো তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা চায় গৃহীদের কাছাকাছি থাকতে, এমন জায়গায় থাকতে যাতে গৃহী-মক্কেলদের সঙ্গে দহরম-মহরম বরাবর ঠিকমত চলে। এই আর কি।

আমি তখন আর কথা বাড়াইলাম না। ওদিক অনেকটাই ঘুরিয়াছিলাম সুতরাং জানাই ছিল। ওদিকে বদরী নারায়ণের বা কেদারের পথে অথবা গঙ্গোত্তরী বা যমুনোত্তরীর দিকে সিদ্ধ মহাপুরুষের স্থান আছে, ভাগ্যের যোগাযোগ হইলে দর্শন ঘটে। যাহা হউক আমাদের এই স্বামী, ইনি প্রায় সর্বজ্ঞ ভাবের মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে,—কেউ কিছু নয়, এই ভাব।

তারপর প্রসঙ্গের পরিবর্তন হইল, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ হইতে তিনি নামজাদা সরকারী কর্মচারীদের উপাখ্যানে নামিয়া আসিলেন। তিনি এখন বড়লাট, ছোটলাট, হাইকোর্ট জজ, বড় বড় সেক্রেটারিয়েট অফিসারদের পরিচয় এবং তাঁহাদের সঙ্গে কোন স্থানে তাঁহার কিরূপভাবে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কিরূপ বিশেষত্ব—সেই সকল বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় বড় কলেজের অধ্যাপকদিগের পর্য্যায় চলিতে লাগিল, শেষে তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার এবং জ্যোতিষ-চর্চার অধিকারের কথা প্রকাশ করিলেন। প্রথম হইতে এখানে তিনিই বক্তা এবং প্রধান; আমরা সব শ্রোতা। কেহ কেহ হাঁ করিয়া তাঁহার এই সকল প্রতিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার গল্প শুনিতেছিলেন। উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও উঠিতে, সাহস ছিল না। আমাদের বৈদ্যনাথও ইহার মধ্যে ছিল। শেষে সেই মানুষটি একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আলস্য ত্যাগ করিল, পরে বলিল: এ সব শুনে কি হবে, না কালী না রাম, সাধুদের এ সব কথা কেনে? যান যান, ছান করেন যেঁয়ে। এখনি কালী-বাড়ির ঘণ্টা বাজবে গা। তৈয়ারী হয়ে লন সব।

দুইটি কারণে মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। প্রথমটি এই যে, বহুবচন বাঙ্গালী সাধুটি আসিয়া সংবাদ-পত্রের মত রাজ্যের খবর এখানে আমার কানের কাছে ছড়াইয়া দিল। আমায় যে আবার সংসারী হইয়া সেই সাধারণ গৃহস্থের মত অদূর ভবিষ্যতে ঘরকন্না করিতে হইবে, মুক্তভাবে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারিব না, বন্ধভাবে সেই সংকীর্ণ স্থানে কাল কাটাইতে হইবে—এই ভাবিয়াই মনটা বেশী খারাপ হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখান হইতে যাইতে হইবে—এখানে যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, বুঝিলাম তাহাতে মনের সবটা পূর্ণ হইল না, অনেকটাই ফাঁক রহিয়া গেল। যাইবার সময় যেন একটা অশান্তি লইয়া যাইতেছি।

বাঙ্গালী সাধুটি এখানে একটি দিন ও একটি রাত্রি ছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার আসল কর্ম হইল এই মন্দির-সম্বন্ধে যা কিছু সকল ব্যাপারের খোঁজ করা। বাৎসরিক কত আয়, কত ব্যয়, কে এ সকল ব্যবস্থা করে, যাত্রীদের তরফ হইতে কত আয় হয়—এই সব খবর সংগ্রহ করিয়া লইলেন। কেবল বৈষয়িক কথা ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ তাঁহার মুখে শুনি নাই।

হয়ত আরও দুই চার দিন থাকিয়া যাইতাম, কিন্তু এই ব্যক্তির সংসর্গ আমার মনকে বিরক্ত করিয়া তুলিল, আমি আজই বৈকালে চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলাম। শরীর এখানে খুবই খারাপ হইয়াছে, সর্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ভার হইয়া থাকে ; এরূপ ব্যাপার আজ ছয় সাত দিন হইতেই চলিতেছে। এখান হইতে আমি লাভপুরে ফুল্লরা পীঠ এবং পরে অট্টহাস হইয়া তারাপুর যাইব সংকল্প করিলাম। এই সাধুটি ঠিক যেন আমাকে এখান হইতে তাড়াইতেই আসিয়াছিলেন।

যাইবার সময় কম্বলখানি পিঠে বাঁধিয়া লইলাম, হাতে জলপাত্র বা কমণ্ডলু, —একবার শ্মশানে লক্ষ্য করিলাম, অঘোরীকে দেখিতে পাইলাম না। উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াই বাহির হইলাম। সোজা পথে দুবরাজপুর ষ্টেশনের দিকে চলিলাম।

স্তিমিত সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত চারিদিকে বিস্তৃত বহু দূর অসমতল দিকচক্রবাল দেখা যাইতেছে। পথটি বড়ই সুন্দর। মুক্তির বাতাস ও আলোকের মধ্যে ষ্টেশনে পেঁীছিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ট্রেনে উঠিয়া সাঁইথিয়ায় উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি তান্ত্রিক সাধকের সমাধি আছে। ষ্টেশনের নিকটেই।

সমাধিটি প্রাচীন, চারিধারে শেওলা ও ঝুপ জঙ্গলে পূর্ণ। একটি প্রকাণ্ড বট গাছ আছে, তাহার অনেকটা বিস্তার। দেখিলাম, দুই তিন জন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি সমাধির ধারে বৃক্ষতলে বসিয়া একটি অশীতিপর বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কহিতেছে। আমি যাইয়া সেখানে পিঠের বোঝাটি নামাইয়া বসিলাম।

একজন জিজ্ঞাসা করিল : কোথা হতে আসা হচ্ছে ? উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : এখানে আজ রাত্রের মত একটু স্থান পাওয়া যাবে কি ?

সে কথার উত্তর না দিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল : কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? আমি বলিলাম : কাল প্রাতে লাভপুর যাব।

পার্শ্বেই বৃদ্ধার কুটীর, তাঁহার দাওয়ায় আমার থাকিবার স্থান হইল। বৃদ্ধা একটি ভৈরবী, তিনি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিলেন। সংসারে কে কে আছে, কেন এমন করিয়া বেড়াইতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রাতে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখান হইতে আমাদপুর লাইনে লাভপুর যাইতে হয়। প্রায় আটটা নাগাত লাভপুর পেঁাছিলাম। ফুল্লরা পীঠ ষ্টেশনের নিকটেই। দেবীর ছোট পুরানো মন্দির, সম্মুখেই থামওয়ালা প্রকাণ্ড নাটমন্দির, তাহার সম্মুখেই উপরে পাকা ছাদ আচ্ছাদিত

চাঁদনী, তার পর সোপানমণ্ডিত একটি সরোবর। তাহার উপরে, তিন দিকেই শ্মশান-ভূমি। দক্ষিণ পার্শ্বে কতকটা জঙ্গল। শ্মশানের সর্বত্রই নর-কপাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কঙ্কাল এবং বিভিন্ন অংশের অস্থি চারিদিকেই লক্ষ্য হয়। দিনমানে স্থানটি বড়ই মনোরম। শ্মশানের পরেই রেল লাইন।

আমি একবার চারিদিক দেখিয়া মন্দিরের পশ্চাতে যে কয়খানি চালাঘর আছে সেখানে যাইয়া বোঝা নামাইলাম। সেখানে পূজারী এবং তাহার সঙ্গে তিনজন ভদ্রলোক বসিয়া কথাবার্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এই স্থানে পূজারী বাস করেন এবং তাহার একাংশে ভোগ রান্না হয়। তাহার পশ্চাতে নীচু পাঁচিল-ঘেরা কতকটা স্থান—সেখানে শিবা ভোগ দেওয়া হয়। পোষা শৃগাল দুই তিনটি মাঝে মাঝে দেখা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বোধ হয় ভোগের কতটা বিলম্ব তাহারই অনুসন্ধান করিতেছিল।

পীঠস্থ দেবীমূর্তির সবটাই রক্তবস্ত্রে ঢাকা, কেবল মুকুটাবৃত মস্তক এবং মুখটুকু খোলা। প্রথম দৃষ্টিতে ইহাই যেন বোধ হয় কিন্তু নিকটে যাইলে কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। সিঁদুরের প্রলেপ প্রস্তরাংশের সবটাই জুড়িয়া আছে। কতক্ষণ মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া পূজার আয়োজন দেখিতেছিলাম। সেখানে গ্রামের মেয়ে দুই চার জন, তাহার মধ্যে বর্ষীয়সী বিধবাও ছিলেন। বোধ হইল প্রত্যহই ইঁহারা এখানে আসিয়া থাকেন।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর ভোগ হয়, দেবীর ভোগ হইয়া গেলে

প্রথমেই শিবা ভোগ হয়। নিত্য ভোগ আমিষ ও নিরামিষ দুইই হয়। পর্ব-উপলক্ষে এবং অমাবস্যায় ছাগ বলি হয়। প্রসাদ পায় অভ্যাগত যাঁরা থাকেন তাঁরা এবং পূজারী মহাশয়ের নির্বাচিত গ্রামস্থ প্রতিবেশিগণ। সকলেই তান্ত্রিক অর্থাৎ তন্ত্রমতের লোক। পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান এখানে অতি সাধারণ। প্রত্যহ যে পূজা এবং ভোগের ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে প্রায় বিশ বাইশ জন ব্যক্তি প্রসাদ পায়। প্রতি অমাবস্যা এবং অন্যান্য বিশেষ পর্ব যোগে বিশেষ পূজার ব্যবস্থাও আছে। তাহা ছাড়া--বাহিরের মানত বা মানসিক দিয়া পূজা প্রায়ই আছে। ভিন্ন গ্রাম হইতে মধ্যে মধ্যে পূজার উপকরণাদিসহ যাত্রিগণ উপস্থিত হয়, সঙ্গে বলির জন্য ছাগও থাকে। সেই মহাপ্রসাদের আকর্ষণে গ্রামস্থ দুই চারি জন ভক্তের বেশী আমদানী হয় এবং কারণানন্দের সঙ্গে প্রসাদ প্রাপ্তি ঘটে।

নাটমন্দিরটি--যেমন বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ স্থানে আছে--স্তম্ভশ্রেণীর উপর পাকা ছাদ, যাহা গ্রীক স্থাপত্যের অন্তর্গত ডোরিক্ শ্রেণীর। লোক জন এখন বড় কাহাকেও ইহার মধ্যে দেখিলাম না, ভিতরটা অত্যন্ত অপরিষ্কার, পায়রা ও বাদুড়ের ঘন অধিষ্ঠানে যাহা হইয়া থাকে। অথচ কতকাংশ জাল দেওয়া, তাহার পরই ঘাটের চাঁদনী। দুই দিকে দুইটি করিয়া চারিটি থামের উপর পাকা ছাদ। নীচে দুই দিকে প্রশস্ত মার্বেল পাথরের বেশ দীর্ঘ বসিবার আসন, যেখানে একত্র পাঁচ ছয় জন বসিতে পারে। তাহার পরেই সোপান শ্রেণী। জল হইতে মোটে তিনটি ধাপ জাগিয়া আছে ; জল নির্মল ও স্বচ্ছ, কাকচক্ষুর ন্যায়।

এখানে আসিয়া অনেকটা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলাম। কিন্তু স্থানের কোথাও একটু লক্ষ্মীশ্রী দেখিলাম না, কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই। সরোবর-সংলগ্ন স্থানটুকু ছাড়া সবটাই যেন শ্রীহীন, নির্জীব।

এই ফুল্লরা মহাপীঠ একটি অতি প্রাচীন তান্ত্রিক অভিচারের ক্ষেত্র। এক সময় এখানে বহুতর সিদ্ধ তান্ত্রিক আসন করিয়াছিলেন। তন্ত্রমতের অনেক অনেক সাধন এখানে হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু এই সরোবর-তীরের শ্মশান ব্যতীত তাহার আর কোন সাক্ষ্য নাই। বক্রেশ্বরের তুলনায় ইহার বিস্তৃতি কম এবং সংকীর্ণ। বক্রেশ্বরে যেমন সাধু সন্ন্যাসীর ঘন আনাগোনা আছে, এখানে সেরূপ নাই ; অথচ এ স্থানটি রেলের ধারেই. আসা-যাওয়ার খুব সুবিধা। এখানে গৃহী লোকের আনাগোনাই বেশী। বক্রেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে যেমন অনেকটা স্থান আছে, যেখানে অল্প-বিস্তর বাহিরের লোক থাকিতে পারে এবং থাকে, এখানে সেরূপ স্থানই নাই। শ্মশান-ক্ষেত্রও সংকীর্ণ।

এখন, আমি যখন এখানে ছিলাম কোন সাধু-সন্ন্যাসী দেখি নাই, কোন সাধককেও দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

প্রায় আড়াই প্রহরের পর পূজা ও ভোগ হইয়া গেলে শিবা ভোগ হইল এবং আমাদের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল। প্রায় বার তের জনের পাতা হইয়াছিল। বালক, যোয়ান, বৃদ্ধ--প্রায় সকলেই এখানকার লোক. বাহিরের লোকের মধ্যে আমি একজন, আর কোথাকার নায়েব এবং গোমস্তা দুই-এক জন ছিলেন।

প্রসাদ পাইবার পর এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দিনমান কাটাইলাম। অট্টহাসে

যাইবার পথের খবর করিলাম। এখান হইতে দুই তিনটি ষ্টেশন পরে পচণ্ডী ষ্টেশনে নামিয়া ক্রোশ দুই আন্দাজ চলিয়া যাইতে হয়। আজ রাত্রে এখানে কাটাইয়া প্রাতে অট্টহাসে যাত্রা করিব সংকল্প করিলাম। স্থানটি দেখিয়া এখানে বেশী দিন থাকিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। আমার মনে হইল, এখানে আর এমন কিছুই নাই যাহাতে কিছুদিন থাকিয়া যাইতে লোভ হয়।

একদল বালক দেখিলাম—আশেপাশের গৃহস্থ ঘরের ছেলে—যাত্রী দেখিলেই পয়সা চায় এবং পাইলে তাহা পান-বিড়ি খাইয়া উড়াইয়া দেয়। পড়াশুনা করে না। কেহ কেহ স্কুল বা পাঠশালায় যায় বলিল বটে কিন্তু দুপুর বেলাটা হো হো করিয়া কাটাইতেই দেখিলাম।

সন্ধ্যার পরে আরতি হইয়া গেল, আমার আহারাদির কোনও চেষ্টা ছিল না,—ঘাটের চাঁদনীতে কম্বলখানি বিছাইয়া শয়নের যোগাড় করিলাম। মশা এত যে গায়ে ঢাকা দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। ভিতরে জানিনা কেমন করিয়া কয়েকটা ঢুকিয়া জ্বালাইতে লাগিল। বহুক্ষণ ছট্‌ ফট্‌ করিয়া একটু ঘুম আসিল, জানি না কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম। হঠাৎ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একজন মানুষের উচ্চ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্থির হইয়া কিছুক্ষণ শুনিতে লাগিলাম, ব্যাপারটি কি! কতক্ষণ পর বুঝিলাম, একজনের কনফেশনের অর্থাৎ পাপ-স্বীকারের ব্যাপার। উঠিয়া বসিলাম।

লক্ষ্য করিলাম, নাটমন্দিরের বাহিরে, সোজাসুজি মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া একটি দৃঢ় স্থূলকায় ব্যক্তি-বিশেষ দাঁড়াইয়া। বেশ বুঝা যায় নাতি-দীর্ঘ খর্ব শরীর, কোমর অবধি কাপড়। অতি স্পষ্ট শব্দে এবং সহজ কথার ভাষার আত্ম-দোষ স্খালনার্থে মায়ের চরণে যাহা নিবেদন করিতেছে তাহা এইরূপ,—

মা জগদম্বা! তুমি ত অন্তর্য্যামী মা। সবই জান। আমি হিংসার বশে এ কাজ করি নি, প্রাণে মারাও আমার ইচ্ছা ছিল না, অন্ধকার রাত্রে অস্থানে লেগেই তার প্রাণ গেল। যে টাকার জন্যে এ কাজ করেছিলাম সে টাকাও সব ত পেলাম না, তাতে আমার জাতও গেল পেটও ভরল না। মেয়েটাও হাত-ছাড়া হয়ে গেল, কেমন করে পাঁচজনের ভিতর থেকে সে সরে পড়লো তাও বুঝতে পারলুম না। মা কালিকে! তুমি জান, মেয়েটার উপর আমার লোভ হয়েছিল। সে স্বীকারও পেয়েছিল, এ দায় থেকে উদ্ধার করে দিলে সে আমার কাছে থাকবে,—কিন্তু মা! তুমিই ঠিক জানো, সে কেমন করে সরে পড়লো। আজ আমি উপবাস করে আছি। অন্নজল মুখে দিইনি, কেবল একটু তালের রস খেয়ে দিনটি কাটিয়েছি, রাতও কাটাবো!

তার পর ঐ গিরীশের বোয়ের হাত থেকে গয়না খুলে নেওয়ার কাজে আমি একলা ছিলুম না, বরেন্দ্রও ছিল। সে ত কিছু করে নি, আমি একলাই ত সব করেছিলাম, কেন তাকে ভাগ দেবো মা! তাকে আমি ভাগ দিইনি, সেই জন্যে সে ভয় দেখিয়েছিল একথা প্রচার করে দেবে। তাই আমি তাকে খুন করবো ভয় দেখিয়েছিলুম বলে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মা! তুমি আমায় বরাবরই রক্ষা করে এসেছ, এবারেও রক্ষে করো মা! আমি তোমার দাস, তোমার পূজা না করে কোন দিনই কাটাই নি, জলগ্রহণ করি নি। আমি তোমার সেই সন্তান মা, যাকে তুমি ছোট বেলা থেকে রক্ষে করে এসেছ। দ্বারিকের মকদ্দমায় সাক্ষী দিয়ে তার উপকার করতে গেলাম পঁচিশটি টাকার

লোভে ; তুমি জান মা, সে আমায় টাকা দিলে না, মকদ্দমায় হার হ'ল তার। সে জন্য কি আমি দায়ী ? আমারও জেল হতো, এমনই বিপদে সে আমায় ফেলেছিল, তাই ত আমি তার মাল সরিয়েছি। সে বুঝতে পারলেও তোমার দয়ায় আমার কিছু করতে পারে নি ; এখন আমায় অন্য উপায়ে জব্দ করবার ফিকিরে আছে। তা তুমি সবই জান, তুমিই আমায় রক্ষে করবে, আমার ভরসা আছে। দোহাই চণ্ডিকে ! তোমার কাছে আমি কোন কাজ গোপন রাখিনি—কখনও রাখবো না। তোমার কাছে নিবেদন করলে আমার প্রাণটা হালকা হয়, বড় শান্তি পাই, মা। আমি এবার লক্ষ জপ করব মা, মানস করেছি, এ অমাবস্যা থেকেই সুরু করব মনে মনে সংকল্প করে রেখেছি। এখন তোমার দয়া। তুমি ছাড়া আর ত আমি কাকেও জানি না। ইত্যাদি—

এই ভাবে অনেকক্ষণ চলিল। আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম। এরূপ অপরাধ-স্বীকার জীবনে ইতিপূর্বে কখনও এদেশে শুনি নাই। আমার ধারণা ছিল না এরূপ ভাবে একজন পীঠস্থানে দাঁড়াইয়া নিজ অকর্মের অপরাধ অকপটে স্বীকার করিতে পারে। আমার ঘুম উড়িয়া গেল, লোকটা ডাকাত না কি? বসিয়া বসিয়া যাহা স্বকর্ণে এইমাত্র শুনিলাম তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে, অল্প অল্প আলোক হইয়া কতকটা দেখা যাইতেছিল। এই ষণ্ডামার্ক লোকটি, ইহাকে আমি আজ এখানে স্নান করিতে দেখিয়াছিলাম মনে হইল। লোকটির মোচার মত গোঁফ, ভরাট মুখ, বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু, তাহাতে জ্বালা আছে. মাধুর্য্য নাই,—দাড়ি কামানো, চুলগুলি খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মধ্যে

সংকীর্ণ একটি শিখা। চওড়া কালো পাড়ের সাড়ি একখানি পরা, নাভির নীচে কাপড়ের কষি-আঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধে গামছা একখানা। এ মূর্তি আজ স্নানের বেলা দেখিয়াছিলাম স্পষ্ট মনে পড়িল। আমাকেও সে লক্ষ্য করিয়াছিল।

মূর্তিটি তান্ত্রিক ভৈরবের মতই কিন্তু লাল কাপড় নয়, সাধারণ গৃহীদের মতই বিশিষ্টতাশূন্য ; নির্ভয় এবং নিঃসঙ্কোচ মূর্তি, এমন মানুষ প্রায় নজরে পড়ে না।

লোকটি এতক্ষণ আত্মনিবেদন করিয়া যেন কতকটা ক্লান্ত হইয়াই বসিবার জন্য চাঁদনীর দিকে আসিতে লাগিল। আমার একটু ভয় হইল। যদি টের পায় যে আমি শুনিয়াছি তাহা হইলে সে আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে। এখন একটু চাঁদ উঠিয়াছে, কতকটা আলোও হইয়াছে, আমায় ত দেখিতে পাইবেই। নিঃশব্দে আবার শুইয়া পড়িলাম। সে আসিয়া দেখিল একজন ঘুমাইতেছে তখন অপর দিকে

বিস্তৃত মার্বেল পাথরের আসনে উপবেশন করিল। তার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া সজোরে টান লাগাইল।

আমি অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া শেষে উঠিয়া বসিলাম। বলিলাম: উঃ, ভয়ানক মশা! তখন অম্লানবদনে সে ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া বলিল: বাবাজি, একটা বিড়ি ইচ্ছা করবেন নাকি? আমি 'না' বলিয়াই উঠিয়া চাদরটি ঝাড়িয়া লইলাম,—বড়ই মশার উপদ্রব। স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার ভাব দেখাইয়া—যেন কিছুই হয় নাই, সহজ মানুষের মত সে ব্যক্তি তখন—বাবাজীর কোথা থেকে আসা হচ্চে? কোথা যাওয়া হবে? বাবাজীর কি সম্প্রদায়? ইত্যাদি প্রশ্নে আপ্যায়িত করিয়া শেষে বলিল: এখানে এসে আপনাদের কিছুই সুখ হবে না,—সব অনাচার আর অনাচার। আর এখন মানুষের মা জগদম্বার ওপর সে ভক্তি নেই,—এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, স্বার্থপর, বুঝলেন কিনা? তা আপনি তারা পীঠে গিয়ে খুসী হবেন, সেথা জায়গাও ভাল পাবেন। সেখানে চক্কোত্তি মশায় আছেন,—শ্মশানে আজ পাঁচ ছ'বছর আছেন, বারো বছর হলে সিদ্ধ হয়ে তবে বেরোবেন।

আমি আর বেশী কথা বাড়াইতে চাই না দেখিয়া সে তখন বলিল: আপনি তা হলে শুয়ে পড়ুন। আমি চাদরখানি ঝাড়িয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। সে তখন উঠিয়া পূর্বস্থানে গিয়া দাঁড়াইল এবং হাতজোড় করিয়া স্তবপাঠ করিতে লাগিল—দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগদখিলস্য ইত্যাদি। পাঠ সম্পূর্ণ হইলে আবার নিজ ভাষায় আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। হে আদ্যাশক্তি, ভগবতি, মা জগদম্বে! আমার অশেষ পাপ তুমি ক্ষমা করেছ,—এ জগতে কোন্ বেটার পাপ নেই? বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারে কি যে তার পাপ নেই? তারা কি তোমার কাছে এমন করে মনের পাপ স্বীকার করতে পারে? যদি তা করে তা হলে কতটা ভাল হয়। মা জননি, জগৎ-প্রসবিনি কালিকে! তুমি ত ভক্তবৎসল, তোমায় যে প্রাণ দিয়ে ডাকে, তোমার কাছে নিজ দোষ স্বীকার করে, তাকে তুমি অভয় দাও মা!

॥ ২৮ ॥

পরদিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম। অট্টহাসে যাইব। মন্দির তখনও খোলা হয় নাই, পুরোহিত মহাশয় দ্বার খুলিতেই আসিতেছিলেন, দ্বার খোলা হইলে তখন আর একবার মূর্তিটি দেখিলাম। রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত এবং স্তূপাকৃতি যাহা সম্মুখে দেখিলাম সেটি কোন বিশিষ্ট মূর্তি নয়, তাহার অধিকাংশ ভাগ পুষ্প-বিল্বপত্রাদিতে আচ্ছন্ন, যদিও তাহাতে একটি মূর্তির ভাব আছে এবং কৌশলে অলঙ্কার পুষ্পমালাদিতে বিভূষিতও বটে। পুরোহিতকে তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: ইহা কিরূপ মূর্তি? তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ,—বস্ত্রে-ঢাকা যে মূর্তি, উহা বহুকাল হইতেই বাহিরে দেখাইবার নিয়ম নাই। স্নান ও বেশের সময় দ্বার বন্ধ করিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে বাহির করিয়া পূজা-অর্চনার পর পুনরায় ঢাকা দিতে হয়। পুরোহিত ব্যতীত সে মূর্তি আর কেহ দেখিতে পায় না।

সে মূর্তিটি কিরূপ? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারিলেন না। খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, উহা একখানি খোদিত প্রস্তর, তাহার মধ্যে মায়ের অস্পষ্ট মূর্তি আছে, সিন্দুরে সম্পূর্ণই রঞ্জিত;

এ মূর্তি যে কিরূপ তাহা পুরোহিতেরও স্পষ্ট ধারণা নাই। পূজার্চনা পূর্বাপর যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে তিনি সেই ভাবেই করিয়া যান। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না, এখন যেন লোকের মনে একটা প্রচ্ছন্ন রহস্যের ভাব সৃষ্টি করাই এ সকলের উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। এখানে যাহা, অট্টহাসেও তাই, আবার তারাপীঠেও তাই দেখিয়াছিলাম। অবিকল একই ব্যাপার চলিতেছে, তাহার কথা সময়ে বলিব। এখন এইটুকু বুঝিলাম, এখানে লালকাপড়-ঢাকা উপরের মূর্তির নীচে যেটি আছেন, যাঁহার স্নান-পূজাদি গোপনে করা হয়,—সেটি বহু প্রাচীন ভাস্কর্য কলার নষ্ট সৌন্দর্য্য, ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন; বহুকাল হইতেই আকৃতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্নাদি বিলুপ্ত একখানি সিন্দুর-রঞ্জিত প্রস্তরমূর্তি। ইহা কোন কালে কাহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কেনও বিবরণ কাহারও জানা নাই সুতরাং তাহার অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র; পুরোহিতের ধারণা যে সতী-দেহের যে অংশ এখানে পড়িয়াছিল উহাই পাথর হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্যই সিন্দুর-লিপ্ত করিয়া লোকচক্ষুর অগোচরে রাখা হইয়াছে। লোকে দেখিলে অমঙ্গল ঘটিবে। আমাদের কলিকাতার দক্ষিণে কালিঘাটে যে কালী মূর্ত্তি আছে সেখানেও এই ব্যাপার। লোলজিহ্বা ধাতুময় যে বিশাল মুণ্ড সকলে দর্শন করিয়া ধন্য হন, সেটি আসল মূর্ত্তিই নয়, আসল মূর্ত্তি পাঁচটি আঙুলের প্রস্তরময় আকৃতি, উহা একটি আধারে, উপরিস্থিত বিশাল ধাতুময় শরীরের অভ্যন্তরে বর্তমান। প্রায় সকল মহাপীঠেই একই রূপ ব্যবস্থা। বাহিরের খোলসটিকেই সকলে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

আসলে সতী-দেহের নানা অংশ নানা স্থানে পড়িয়াই যে বাহান্ন পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে, আমার ইহাকে মাইথলজী বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্তি হয় না, বরং ইহা সত্য এবং স্বাভাবিক বলিয়াই ধারণা। দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার যে ঐতিহাসিক তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ, যদিও ইহা প্রমাণ করিবার মত হিমালয়-পাণ্ডিত্য আমার নাই। তবে যে সকল সহজ অনুমান লইয়া সতী-দেহ হইতে বাহান্ন পীঠের উৎপত্তি এই ধারণা আমার বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে তাহার কতকটা প্রকাশ করিতে দোষ নাই।

পরবর্তী কালে, অর্থাৎ বীরভূমের পীঠস্থান গুলিতে ঘুরিবার প্রায় এক কি দেড় বৎসর পর যখন আমি তিব্বতে কৈলাস ও মানস-সরোবরাদি তীর্থ-পর্য্যটনের সুযোগ পাইয়াছিলাম তখনই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেখানকার কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যবহার এবং লোকাচার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বিশেষরূপেই ধারণা হইয়াছিল যে, আমাদের ভরতের, বিশেষত বাঙ্গলার সঙ্গে যখন এ সকল ব্যবহারের এতটা মিল এবং এতটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতেছি তখন সেখান হইতেই এ সকল এখানে আসিয়াছে। অবশ্য তখন ঠিক ধারণা করিতে পারি নাই, এদেশ হইতে সে সকল ওদেশ গিয়াছে কিম্বা তাহার বিপরীত। তার পর তন্ত্রধর্মের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিতের মতের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটিল, তখনই স্পষ্টরূপে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে তিব্বত হইতেই যত কিছু মূল তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভারতে তথা বাঙ্গলায় আসিয়াছে।*

---

* যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চান তাঁহারা Modern Review, Aug. 34, সংখ্যায় অধ্যাপক নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর Home of Tantricism প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন।

এখন, সতীর দেহাংশ হইতে ভারতে যে বাহান্ন পীঠের উৎপত্তি এবং যে কারণে ইহা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস তাহাই বলিতেছি।

তিব্বতে কোন অসাধারণ মানুষের দেহত্যাগ ঘটিলে সেই দেহের সৎকার নানা প্রকারেই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটি এই যে, মৃতদেহের পূর্ণ অংশ

অথবা-বিশেষ লইয়া তাহার উপর সমাধি অথবা স্তূপ নির্মাণ করা। কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত প্রভৃতি মহান্ ব্যক্তির মৃতদেহের কোন অংশই সেখানে ফেলা যায় না। এমন কি হাড়গুলি পর্যন্ত মালা করিয়া ধারণ করা হয়।

ভারতে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার নখ, চুল, দাঁত লইয়া কত কত স্তূপ নির্মিত হইয়াছে। অবশ্য সে সকল হয়ত তাঁহার জীবিত অবস্থায়ই সংগৃহীত, কিন্তু তিব্বতে দেহত্যাগের পরও এসকল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

এই প্রকার ব্যবহার যে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর ভারতে আচরিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট। তাহার পূর্বে ইহার অস্তিত্ব ভারতে ছিল না। এ প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত-সংলগ্ন কোনো স্থানে প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালে ভারতে আসিয়াছে বলিয়াই মনে করি। বুদ্ধ অপেক্ষা শিব অনেক প্রাচীন কালের মানুষ, আর কৈলাস হইল তাঁহার অতি প্রিয়স্থান, যাহা তিব্বতের মধ্যে বলিয়াই আমরা জানি, সুতরাং এ প্রথা তিব্বত হইতে ভারতে আসিয়াছে ধরিলে ভুল হয় না। কাজেই সে কালে সতীর দেহত্যাগের পর সেই শরীর বহুধা খণ্ডিত হইয়া ভারতের সর্বত্র ছড়ানো হইয়াছে—ইহা আমার মোটেই কাল্পনিক মনে হয় না। প্রথমে শিব-প্রচারিত তন্ত্রধর্মের প্রত্যেক কেন্দ্রেই উহা ক্ষুদ্র স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়াছে, ক্রমে তাহার উপর মন্দির উঠিয়াছে, পরবর্তীকালে তাহার মধ্যে মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই ভারতের মহাপীঠের আদি ইতিহাস।

পুরাণের কথা এই যে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব সেই দেবী-দেহ স্কন্ধে লইয়া বাহির হইলেন। তার পর, এক মতে, শিব সতীদেহের কেশ ধারণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ফলে যে-যে স্থানে ঐ শরীরের যে-যে অংশ পড়িয়াছে সেই-সেই স্থানে মহাপীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় মত এই যে, সতী-প্রেমে উন্মাদ শিব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া পর্যটন করিতে লাগিলেন আর নারদ শিবের অগোচরে চক্রের দ্বারা কৌশলে ঐ দেহ কাটিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে যে-যে স্থানে মহাশক্তিরূপিণী সতীর দেহাংশ পড়িল সেই-সেই স্থান মহাপীঠ হইয়া গেল। শেষে শিব যখন দেখিলেন যে সতীদেহ স্কন্ধে নাই তখন তিনি পুনরায় যোগে বসিলেন।

আসলে সতীদেহের অংশ-বিশেষ হইতেই যে একান্ন বা বাহান্নটি মহাপীঠের উদ্ভব তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, অন্তত তন্ত্রমতের যাঁহারা, তাঁহারা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

এখন পুরাণের সম্বন্ধে যেরূপ গভীর গবেষণা এবং আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, দক্ষযজ্ঞের সত্য ইতিহাস, তাহার কাল এবং স্থানাদি যথার্থ-রূপে নির্ণীত হইবে। তবে ইহাও সত্য যে, একশ্রেণীর পণ্ডিত এ সকল পৌরাণিক ব্যাপার রূপক ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ ধারণা হইতে বিচলিত হইবেন না।

আমি প্রাতেই অট্টহাস যাত্রা করিলাম। ঠিক মনে হইতেছে না, নিরোল অথবা পাচণ্ডি স্টেশনে নামিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিতে হইয়াছিল। মাঠের উপর দিয়াই পথ, মধ্যে মধ্যে ঘন বৃক্ষলতাপূর্ণ জনবহুল গ্রামও আছে। ঐরূপ দুইখানি গ্রাম এবং একটি ছোট খাল বা নদী নৌকায় পার হইয়া দশটা নাগাদ অট্টহাস মহাপীঠের মনোরম বৃক্ষলতায় পরিবেষ্টিত জনবিরল স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইলাম।

এখানে একজন বৃদ্ধ ভৈরব ও ভৈরবী আছেন। তখন ভৈরব পূজায় ছিলেন। ছোট একটি পুরাতন মন্দির, সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। পাশেই জঙ্গল। ফলের মধ্যে আমগাছ দুই তিনটি, লেবু ও কলাগাছ কয়েকটি দেখিলাম। পীঠস্থানের পাশেই ছাদ-আচ্ছাদিত একটি স্থান, নাটমন্দিরের ধরণ, অতিথি অভ্যাগতদের আশ্রয়,—মন্দিরের পাশেই ভোগ-রান্না ঘর। প্রাঙ্গণে একটি বটবৃক্ষ,

তাহার অনেকগুলি ঝুরি নামিয়াছে, উচ্চ শাখায় সারি সারি বাদুড় ঝুলিতেছে। সেই বৃক্ষের পার্শ্বেই ভৈরবের বাসস্থান, সম্মুখেই দাওয়া, তার পর চালাঘর। ভৈরব অধিকাংশ সময় দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, তামাক খান এবং দু-পাঁচজন

যাঁহারা আসেন তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করেন। সচরাচর নেশার মধ্যে চরস ও গাঁজাই এখানে বেশীর ভাগ চলে।

ভৈরব মহাশয় সরল, অকপট মানুষ। কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ক্রিয়াকর্ম

যদি করিতে পারি তবেই কারণ (অর্থাৎ মদ্য ব্যবহার) করি, না হইলে বৃথা কারণ স্পর্শ করি না। বয়স তাঁর অনুমান আটষট্টি, খর্বাকৃতি, দৃঢ় শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার সম্মুখভাগ কেশশূন্য, পশ্চাতে শিখা, দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে বড় বড় পাকা চুল, পাকা দাড়ি, পাকা গোঁফ, তাহার মধ্যভাগ অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে পীতাভ। পরনে রক্তাম্বর, ধীর শান্ত প্রকৃতি, মৃদুস্বরে কথা কওয়াই তাঁহার অভ্যাস। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। হাতেও রুদ্রাক্ষের তাগা, তাহার মধ্যে মাদুলী।

তাম্রশ্যামা ভৈরবী ঠাকুরাণীর বয়স ভৈরব অপেক্ষা ছয়-আট বৎসর কম হইবে। মোটা-সোটা শরীর, গিন্নিবান্নিগোছের ভাবটি। নীচের হাতে সোণার বালা, শাঁখা, নোয়া। উপর হাতে তাগা, আবার তাহার উপর ডোর দিয়া মাদুলী তিনটি। মুখে হাসি, সম্মুখের দুইটি দাঁত নাই। লাল কাপড়, তার পাড়ও ঘোরাল লাল, পূর্ববঙ্গের ধরণে ফেরতা দিয়া পরা। অভ্যাগত অতিথির প্রতি স্নেহ আছে, তাঁহার মধ্যে সেবা-যত্নের প্রবৃত্তি স্পষ্ট। দেখা মাত্রই বলিলেন: এসেছ ত বাবা দুদিন থাক, আমরা এই জঙ্গলে একলা থাকি, তোমাদের পেলে বড় আহ্লাদ হয়, মনে হয় আজ কি ভাগ্য!

ভাদ্র মাস, তাল পাকিয়াছে, দেখিলাম তালের আঁটি হইতে শাঁস বাহির করিতেছেন, তাহার গন্ধ চারিদিকে। কি জানি কেন বাল্যকাল হইতেই পাকা তালের গন্ধ সহ্য করিতে পারি না। নাকে কাপড় দিয়াছিলাম দেখিয়া বলিলেন: ও মা, তুমি কেমন ছেলে গো, তাল ভালবাস না! তাহলে কি হবে, তুমি তালের বড়া খাবে না বাবা?

আমি বলিলাম: বড়া হলে ভাল হবে, কাঁচা গন্ধটা বড় খারাপ লাগে আমার।

তিনি বলিলেন: এখন তালের সময়, পরমান্নের সঙ্গে তালের বড়া করে ভোগ দিতে হয়।

আমি এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইলাম, তার পর ভৈরবের কাছে গিয়া যখন বসিলাম তখন তিনি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন, তামাক খাইবার যোগাড় করিতেছেন। গিয়া বসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমার সংসারে কে কে আছেন?

বলিলাম: বাপ মা, ভাই বোন, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সবাই আছেন।

তিনি বলিলেন: হুঁ। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন: নিবাস কোথায়, জন্মস্থান? আমি বলিলাম: কলিকাতায়।

তিনি: গিরীশবাবুকে জান, থিয়েটারের গিরীশ ঘোষ?

আমি: হাঁ, তাঁর সঙ্গে যদিও পরিচয় নেই, তবুও তাঁকে অনেকেই জানে, তিনি বিখ্যাত লোক।

তিনি: তিনি ভক্ত লোক, প্রতি বৎসর এখানে অনেক সাহায্য করেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তিনি তন্ত্রমতের সাধনা কিছু করেছেন?

তিনি: তিনি নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক, গৃহীলোকের মধ্যে তাঁর মত সাধক খুব কমই হয়। তিনি অনেক সাধনা করেছেন।

আমি বলিলাম: আমরা জানি তিনি পরমহংসদেবের ভক্ত; সাধন-ক্রিয়াদি তিনি যে কিছু করেছেন তা আমরা জানি না।

তিনি : তোমরা তাঁর সাধন-ভজনের কথা জানবে কি করে, তন্ত্রমতে সাধন ত গুহ্য ব্যাপার। গুপ্তভাবে তাঁর অনেক সাধন আছে।

আমি : আজ আপনার মুখে তাঁর সাধনের কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম, আমরা শুধু তাঁকে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার বলেই জানতাম, তবে স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারি নি।

তিনি : তিনি ভণ্ড লোক নন, তাঁর দান বা সাধন-ভজন সবই গুহ্য। তিনি মার সাক্ষাৎ-কৃপা পেয়েছেন।

তাঁর এই কৃপা শব্দটি আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগাইল, কারণ এই কৃপা শব্দটি উচ্চারণে তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল। তাই আমি তাঁকে বলিলাম : আমার একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে লোভ হচ্ছে, বলব কি?

তিনি বলিলেন : যেই আমি বলেছি মায়ের কৃপা পেয়েছেন, অমনি তোমার বুঝি মায়ের কৃপার কথায় মনে হ'ল যে তাঁর ঐ কৃপাটি কেমন?

আমি বলিলাম : সত্যি, আমার ঠিক তাই-ই মনে হয়েছে।

তিনি : কৃপা বলতে যা বুঝায় তা কি তুমি জান না?

আমি : সাধারণত কৃপা বলতে আমরা দয়াই বুঝি। কামনার পূর্তি, কোন অসুবিধায় পড়লে সেই অসুবিধা দূর, অর্থের অভাবে অর্থপ্রাপ্তি, রোগে আরোগ্য, বিপদে ভয়ে উদ্ধার, এই সবই ত কৃপা বলে জানি।

তিনি এইবার তামাকটি জুতমত ধরাইয়া লম্বা একটি টান লাগাইলেন, তার পর কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ছাড়িয়া স্থানটি ঝাপসা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন : তবে ত সব জান দেখছি, আবার কি চাই?

আমি বলিলাম : ও যব ছেড়ে দিন, দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ, যাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্ম-সুখসর্বস্ব বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই জাগে নি, অভাবে পড়লে নিজ শক্তিতে অভাব মোচনে উদ্যমহীন যারা, তাদের বুদ্ধিতে ভগবৎ-কৃপা ত ঐ রকমই, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। এখন আসলে কৃপা-বস্তুটির স্বরূপ কি, গিরীশবাবুর কথায় আপনি কৃপা শব্দটি কি ভাবে ব্যবহার করেছেন তাই জানতে চাই।

তিনি বলিলেন : কৃপা যিনি পান, আর যাঁর কৃপা হয়, তাঁরাই ঠিক বোঝেন, অন্যের পক্ষে বোঝা মুস্কিল আছে,—তাই বলছিলাম,—

আমি বলিলাম : আপনি সরল ভাবেই বলুন না কেন।

শুনিয়া তিনি বলিলেন : এই দেখ, তুমি জিজ্ঞাসু হয়েছ, তোমায় সন্তুষ্ট করতেই হবে, না হলে অন্যায় হয়, অথচ ব্যাপারটি বুঝানো মোটেই সহজ নয়,—এখন আমি কি করি। আচ্ছা, স্বার্থপ্রণোদিত স্থূল বিষয়ের কামনাগুলি যে স্থূলবুদ্ধি মানুষের মধ্যেই ওঠে, এটা ত বুঝতে পেরেছ,—

আমি বলিলাম : ভগবৎ সম্পর্কেও দেওয়া-নেওয়ায় ব্যাপার যে বেশীর ভাগ হিন্দু-সমাজের মানুষের মধ্যে চলছে এ কথায় আর কাজ নেই, ও ত হয়ে গেছে—এখন বলুন।

তিনি : তাই এইবার বলি শোন,—আচ্ছা, দেওয়া আছে, নেওয়া বা চাওয়া নেই, এমন একটা ব্যাপার বুঝতে পার?

আমি : অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে উপাসনা আছে অথচ তার পরিবর্তে কোনো কামনা নেই, এই কথা বলছেন ত?

তিনি : হাঁ, তাই বলছি। ঐ রকম অনুরাগের ভাবটি যার এসেছে,

তার ইষ্টের দিকে নিঃস্বার্থভাবেই লক্ষ্য থাকে,—তার সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল ব্যবহারেই জগদম্বার দিকে সহজ ভাবের টান থাকে। অভাব-অভিযোগের ব্যাপার তার নিজ মনে বা সংসারে থাকলেও ইষ্টের কাছ থেকে অভাব-মোচনের কামনা তার মনেও আসে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: অভাব আছে, আবার অভাব-মোচনে শক্তিমান একজন নিকটেও আছে, অথচ তার কাছে অভাব দূর করতে যাচিঞা করতে ইচ্ছা হয় না, এটা কি স্বাভাবিক বলে বোধ হয়? শুনিয়া তিনি বলিলেন: তোমার এই স্বাভাবিক কথাটির ভাব কি আপেক্ষিক নয়? সকলকার পক্ষে কি বিশেষ একটি ব্যাপার বা মনোভাব স্বাভাবিক হতে পারে? ক্ষেত্র-হিসাবে ভাবের অনেক তারতম্য হয় না কি? যেমন আমার পক্ষে তামাক খাওয়া, গাঁজা খাওয়া স্বাভাবিক, তোমার পক্ষেও কি তাই? তেমনি একজনের পক্ষে ইষ্ট-পূজা বা উপাসনার সঙ্গে প্রার্থনা, অভাব-মোচনের কামনা যেমন স্বাভাবিক আর-একজনের কাছে সেটি অস্বাভাবিক।—কেন, এটা কি বুঝতে এতই কঠিন?

আমি বলিলাম: বুঝতে কঠিন নয় কিন্তু প্রায়ই এমনটি দেখা যায় না,—যাঁর এ ভাব হয় তিনি মহা ভাগ্যবান বলতে হবে।

তিনি: হাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি? এ ত সকলের কথা নয়, এ যে একজন বিশিষ্ট সাধকের কথা। এখন ঐ যে অনুরাগে, স্বভাবের টানে ইষ্টের উপর লক্ষ্য সাধকের হৃদয়ে সর্বক্ষণ তাঁর অস্তিত্বের অনুভব চলতে থাকে,—ওদিকেও, তার ফলে তাঁর ইষ্টেরও লক্ষ্য সর্বক্ষণ তার প্রতি রয়েছে, ক্রমে এটি সাধক উপলব্ধি করে থাকেন।—এটি বুঝতে পার?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, এর মধ্যে রূপের ব্যাপার আছে কি?

তিনি বলিলেন: এ শক্তি-উপাসনার ব্যাপার যখন, তখন রূপ ত নিশ্চয়ই আছে। রূপ ছাড়া শক্তি প্রত্যক্ষ হয় কি করে? সে রূপের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ অনুভবের ব্যাপার যে।

আমি: সে রূপ কি বরাবরই থেকে যায়?

তিনি: তা কি থাকে? তোমার এই যে রূপ, এ কি বরাবরই থাকবে? এখানে কোন বাহ্য দৃশ্য বস্তু চিরস্থায়ী ভাবে রূপ পায় না। তখনও রূপ সেই সাধকের মধ্যে বাহ্য ব্যাপার কিনা? পরে সেই রূপ আত্মশক্তির মধ্যে চলে যায়, যদি সাধকের সে অবস্থায় কোনও বিকৃতি না আসে। আনন্দের চাপে ও অবস্থায় তখন অনেকেই পাগল হবার যোগাড় হয়। বেশ শক্তিমান আধার না হলে, শক্তির সাধনায় যে সকল ভাব হয়, সে সব কি হজম করতে পারে, না ভোগ করতে পারে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তা হলে কৃপা কোন্ ব্যাপার,—বলুন?

তিনি: ভক্ত বা সাধকের লক্ষ্য ইষ্টরূপিণী জগদম্বার উপর স্থির হলে, ঐ যে মায়ের লক্ষ্যও তার উপর পড়ে, সেই লক্ষ্য সাধকের প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ ও শক্তির ধারা বহায়,—সাধক তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করেন তাঁর মহিমা। এই ভাবটিকে লক্ষ্য করেই মর্মীরা বলে থাকেন, অমুকের উপর ভগবৎ কৃপা হয়েছে বা মায়ের কৃপা হয়েছে।

আমি: তাহলে আসলে সাধকের ইষ্টের প্রতি লক্ষ্যের ফলে ইষ্টেরও যে সাধকের উপর প্রতিলক্ষ্য তাকেই ত আপনি কৃপা বলছেন?

তিনি: হাঁ তাই ত, তবে তুমি বাবা ঐ যে সব ছেঁটেকেটে শুধু লক্ষ্য

আর প্রতিলক্ষ্য বললে ওটা ঠিক আর প্রতিলক্ষ্য মাত্র নয়। সেই জন্যই আমি বলেছিলাম যে, কৃপা বুঝানো সহজ নয়, যে পায় আর যার কাছ থেকে পায় এরা যেমন এটি বুঝে, এমনটি আর কেউ বুঝতে পারে না, অন্য পক্ষে,—

আমি বলিলাম: আমাকে বুঝে নিতে হবে ত?

তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন: ঐ হয়েছে তোমাদের অল্পবিদ্যার দোষ, কেবল বুঝবো আর বুঝবো। পরে একেবারেই উচ্চ আওয়াজে বলিলেন: তোর সাধ্য কি যে তুই আধ্যাত্মিক ব্যাপার সব বুঝবি,—তোর সে শক্তি কোথা? তুই যেটা বুঝবি সে ত তোর মন-গড়া একটা কিছু করে নেওয়া, তাতে তোর জ্ঞান হবে কি করে? করে দেখ্ না রে বাপু, করে দেখলে তখন বুঝবি, তাতে যে তৃপ্তি হবে। তা নয়, কর্ম নেই, ক্রিয়া কিছু না করে কর্মেই সব বুঝবো—

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইলাম। সঙ্কুচিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—আমাদের জাতীয় জীবনের শিক্ষার ধারা বদলের ফলে পূর্বে অতি সহজে যেগুলি আমাদের মনে বিশ্বাস হইত এখন সেগুলি মনে বুঝিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক আসে। এক দিকে এটা যতটা ভাল অপর দিকে আবার ততটাই অশান্তির কারণ হইয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলাম: আপনার বিরক্তিতে আমি দুঃখ পেলাম;—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি তখন একেবারেই শান্ত হইয়া গেলেন, বলিলেন: আরে বাবা, তোমরা এখন নূতন ধরণের মানুষ। ইংরাজী লেখা-পড়া শিখে আর এক রকম হয়ে পড়েছে, ধর্ম-কর্ম সাধন-ভজনের ব্যাপারগুলি তোমাদের কাছে অপদার্থ পুরানো হয়ে গেছে;—এখন তোমাদের নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ছাড়া আর-সব কিছু নয় এই ভাবটা যেন দেখচি।

আমি বলিলাম: তাই কি ঠিক—যদি অপদার্থই বোধ হবে তবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করচি কেন? এখন আপনি যদি বিরূপ হন তাহলে ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করা চলে না। আপনারা প্রাচীন মানুষ, যা কিছু আছে তা আপনাদের কাছেই। যদি আপনাদের না সুধাব ত কাদের কাছে যাব।

তিনি খুসী হইলেন বোধ হইল, বলিলেন: তা কর না, কর না কেন? আমি বলচি ত বাবা—

আমি: আচ্ছা, আপনি বললেন যে, রূপ ধরেই তাঁকে লক্ষ্য করতে হয়। আর, গভীর লক্ষ্য হলে সাধকের প্রতিও তাঁর লক্ষ্য পড়ে। আবার সেই রূপ অর্থাৎ ভগবৎ-রূপ যা ভক্ত প্রত্যক্ষ করেন তা তখন বাহ্য। সাধকের অন্তরে সেই রূপের প্রকাশ হয় ত! তাহলে তা বাহ্য রূপ হ'ল কি ভাবে?

তিনি: সাধকের অহং বা আমি যে রূপটি দেখে সে রূপ বাহ্য নয় ত কি! আমি দেখছি যেটি সেটি ত আমা থেকে পৃথক্? তা যদি হ'ল তাহলে বাহ্য বা বাইরের বস্তু হ'ল না কি? যতক্ষণ ঐ ভাবের দেখা ততক্ষণ ভগবৎ-স্পর্শ বা তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ দূরের ব্যাপারই থাকে। তার পর সাধন গভীর হলে আত্মা বা আমি-সত্তার মধ্যে তাঁর প্রকাশ হয়ে আমি-সত্তাকে প্রসারিত করে দেয়, তখন আর বাহ্য রূপ বোধ থাকে না। তখন দিব্যাচারের পূর্ণতায় সাধকের সিদ্ধি (অষ্টসিদ্ধির কোন সিদ্ধি নয়), জীব হয় তখন শিব। জীব-সত্তাকে শিব-সত্তা স্পর্শ করলে তখনই সর্বার্থসিদ্ধি। তান্ত্রিক সাধনের সেই-

থালেই সিদ্ধি—এই সিদ্ধিই কাম্য বা লক্ষ্য। না হলে শক্তিলাভের জন্য অষ্ট সিদ্ধি অণিমা, লঘিমা এ সকল সাধকের কাম্য নয়।

আমি বলিলাম: রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় এ সকল পেয়েছি। কিন্তু আমরা জানি তন্ত্রের সাধন মানে শক্তিলাভের জন্য অষ্টসিদ্ধির অনুষ্ঠান।

ভৈরব বলিলেন: তা আছে বটে কিন্তু আমরা ঠেকে শিখেছি—অষ্ট-সিদ্ধিতে কিংবা আভিচারিক ক্রিয়া-কর্মে কিছু লাভ নেই। পরমহংসদেব যা বলেছেন তা ত ঠিক, তিনি যে মহা তান্ত্রিক ছিলেন, একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

এমন সময় ভৈরবী আসিয়া খবর দিলেন, সব প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়া ভৈরব মন্দিরের দিকে উঠিয়া গেলেন। তিনি চক্ষের অন্তরাল হইলে ভৈরবী বলিলেন: বাবা, ওঁর সঙ্গে তুমি কথাবার্তায় বেশী ঘনিষ্ঠতা ক'রো না,—উনি কারো বেশী কথা ভাল বাসেন না, একেবারেই জ্বলে ওঠেন, আবার তক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যান। বয়স হয়েছে কিনা?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: উনি এখানে কতদিন আছেন?

তিনি: আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর ত আমিই ওঁর সঙ্গে আছি, তার কত আগে থেকে উনি আছেন। এই রেল-টেল ত সেদিন হয়েছে। তখন এখানে ভয়ঙ্কর জঙ্গল ছিল, উনি এসে পরিষ্কার করিয়ে সব ঠিক করে নিয়ে নিজের আসন পাতলেন। কতলোক ওঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

আমি: ওঁর কি কোন শিষ্য সেবক আছে?

তিনি: না, উনি কোন চ্যালা করেন নি,—আগে দু-চার জনকে মন্ত্র দিয়েছেন জানি। এখন আর কাকেও দেন না, বলেন, ওতে কিছুই হয় না, দিনকতক মন্ত্র নিয়ে বেশ নিয়মেই চলে, তার পর কেবল মদ খাওয়া আর ফুর্ত্তি,—সাধনের কিছুই থাকে না। ধর্ম বলে অধর্মের ব্যবহারই চলতে থাকে, তাই উনি আর কাকেও আমল দেন না। তন্ত্রধর্ম এই ভাবেই লোপ পেয়ে গেল। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন,—ভোগের সময় হইয়াছে। এখানেও শিবা-ভোগ হয়।

দেখিলাম, এঁরা পুরানো তন্ত্রের লোক—এঁদের ধারণা জগৎ এখন উৎসন্নের পথেই যাইতেছে, তাহার উপর কলিকালের মাহাত্ম্য আছে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু বলেন,—কলিযুগ ধন্য! কারণ এ যুগে সহজেই ভগবৎ কৃপা লাভ করা যায়,—শুধু নাম করিলেই কঠিন সাধনের ফললাভ হয়। তন্ত্রধর্ম এখন যে শক্তিহীন হইয়াছে তাহা ত বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়ের ফলে, অথবা উদার তন্ত্রধর্মের ব্যভিচারের ফলে। যখন শাক্তধর্ম অন্তঃসারশূন্য—তখনই বৈষ্ণবধর্ম জীবন্ত হইয়াছে, জন-সমাজের শ্রেষ্ঠ, প্রবল এবং গৌরবের ধর্ম হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পর তন্ত্রধর্ম আর এদেশে জীবন্ত ছিল না। হীন, নিষ্প্রভ হইয়াই রহিল, এখন আমরা তার কঙ্কালটি দেখিতেছি। আর এই যে এখানকার ভৈরব,—এইরূপ দুই-একজন প্রাচীন তন্ত্রমতের মানুষ নিষ্ঠাপূর্বক ধারাটি বজায় রাখিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিশ্রাম,—আমি দেখিলাম তপোবন একেবারে নিস্তব্ধ, নিঝুম, জনমানবের চিহ্ন নাই,—এদিক ওদিক বেড়াইলাম, দেখিলাম স্থানটির প্রায় চারিদিকেই জল,—যেন একটি দ্বীপ। খেয়া নৌকা একখানি সর্বদাই ঘাটে লাগানো আছে। বর্ষায় খালটি জলপূর্ণ, কোনও দিকেই স্থলপথে এখানে আসিবার যো নাই। সেই কারণে এখানে খুব কম লোকেই আসে।

রেলের ধারে যে সব তীর্থ স্বভাবতই সেখানে যাত্রীদের ভীড় হয়—কিন্তু এসব পীঠস্থানে খুব বেশী লোকের সমাগম নাই। কালীপূজায়, শিবরাত্রিতে, দুর্গাষ্টমীতে লোকের যাতায়াত হয়।

বৈকালে যখন ভৈরব নিদ্রা হইতে উঠিয়া তামাক লইয়া বসিলেন, তখন ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। তিনি বলিলেন: বিশ্রামের সুবিধা হ'ল না বুঝি? আমি বলিলাম: এমন সুন্দর জায়গায় যদি বিশ্রামের সুবিধা না হয় ত কোথায় হবে—স্থানটি যেন মূর্তিমান বিশ্রাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: তোমার বুঝি দিনমানে শোয়া অভ্যাস নেই?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তার পর বলিলাম: এখানে এই মহাপীঠের যে মূর্তি তার ভিতরে আসল মূর্তিটি কিরূপ তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

তিনি বলিলেন: দেবীর অধরোষ্ঠ এখানে পড়েছিল, সেই অধরোষ্ঠ পাষাণ হয়ে আছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সেটি কত বড়? তিনি হাত দিয়া দেখাইলেন,—এত বড়! প্রায় দু ফুট লম্বা ও দেড় ফুট উচ্চ একটি পাষাণমূর্তি অনুমান করিলাম।

আমি বলিলাম: ফুল্লরা পীঠে কাল আমি ছিলাম,—সেখানেও দেখলাম বাইরে একটি মূর্তি, ভিতরে অপর একটি মূর্তি। ওখানকার পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি ভিতরের মূর্তির কোন নির্দিষ্ট রূপ বলতে পারলেন না; তিনিও ঠিক জানেন না যে সে মূর্তি কিরূপ। এত চেষ্টা করলাম কোন ফল হ'ল না।

তিনি বলিলেন: কি জানো, কত যুগ হয়ে গেছে, কে তার খবর রাখছে। কেউ কেউ বলে ওখানে মায়ের চোয়াল পড়েছিল,—এখন ত সে সব পাষাণ হয়ে আছে।

আমি বৈকালে তাঁহার সঙ্গে কাটাইলাম,—যে সকল কথা হইল তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা এইটুকু; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন এখন তন্ত্রধর্ম লুপ্ত হইয়া যাইতেছে?

তিনি বলিলেন: দেশময় আপামর সাধারণের মধ্যে ধর্মশক্তি জাগাবার জন্যই তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি। এই উদার ধর্মের মধ্যে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন ভেদ নেই, কাজেই একধর্মী হলে সকলকার মধ্যে একতা আসবে, সকলে সমান হয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে এক মহা জাতিতে পরিণত হবে, মহাশক্তিশালী হয়ে জগতের আদর্শ হয়ে থাকবে, এই ছিল তন্ত্রধর্মের উদ্দেশ্য; কিন্তু দেশের ব্রাহ্মণেরা সকলের মধ্যে ধর্মের একতা, ধর্মের নামে সমান অধিকার এসব চান না। তাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের একাধিপত্য কোন রকমে বাধা না পায়। তাঁদের নিজেদের মধ্যেই জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্মাঙ্গ সাধন, ক্রিয়া-কর্ম যা কিছুর বিধান এসব বাঁধা থাকবে, তাঁরাই থাকবেন, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য জাতির বিধাতা হয়ে,—কাজেই তন্ত্রধর্ম এখানে টেঁকতে পারবে কেন চিরকাল!

আমি বলিলাম: তন্ত্রধর্মের পর এই যে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় আমাদের বাঙলায় হয়েছিল, তার মধ্যেও ত মহা উদারভাব রয়েছে, ধর্মের ক্ষেত্রে সকলেই এক, উচ্চ নীচ ভেদ লোপ করবার ব্যবস্থা রয়েছে,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: সে সব থাকলেও আভিজাত্যের বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র কম আছে কি ব্রাহ্মণদের? বৈষ্ণব হলেও সভায় ত ব্রাহ্মণদের খাতির আগে, জগতের সকল রকম মানুষের সঙ্গে চৈতন্য বা নিত্যানন্দের প্রেমের সম্বন্ধ সত্ত্বেও এখন ঐ শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের আর খড়দহের সেই নিত্যানন্দের বংশের দুলালদের প্রভুপাদ, গোস্বামী ইত্যাদি উপাধি আর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই কি কিছুমাত্র কম আছে? তার পর আবার তাদের ফ্যাঁকড়া-ফেঁকড়ি কত সব; ব্রাহ্মণ গুরু-বংশের সম্বন্ধ নিয়ে এখনও যে বৈষ্ণব-সমাজ ব্রাহ্মণদের তাঁবেদারীই করচে দেখতে পাচ্ছ না? তাঁরাই ভগবৎ-নির্দিষ্ট সমাজের শাসনকর্তা বলে এখনও যে তরে যাচ্ছেন। প্রেমধর্ম থাকবে আবার
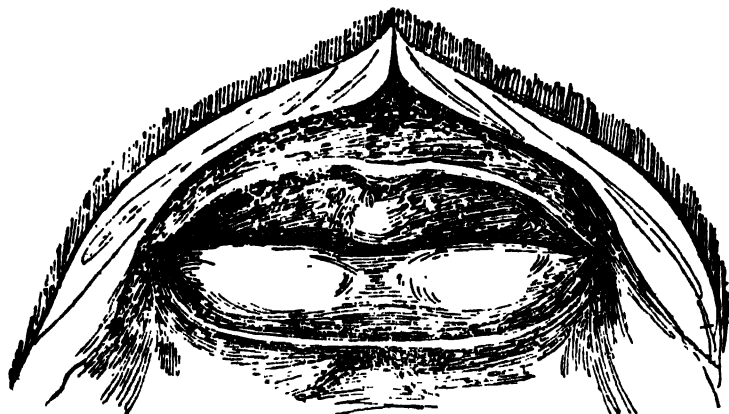
জাতের শ্রেষ্ঠত্বও থাকবে, এ কি রকম ধর্ম হ'ল? এ মাটির গুণ বাবা, এ মাটির গুণ, এখানে খাঁটি মাল বেশীদিন চলে না; এটা হচ্ছে ভণ্ড স্থান, স্থান-মাহাত্ম্যে মহাপুরুষের আবির্ভাবকালটুকুই যা কিছু চরম উৎকর্ষের কাল, তার পর যত দিন তাঁর প্রভাব থাকে—বড় জোর দু-পুরুষ—শেষে আবার যা তাই।

আমি বলিলাম: এখন দেখুন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই ইংরাজ-আমলে সকল ধর্ম যে আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করচে। এখন ত হামেশাই দেখা যায়—পণ্ডিতেরা, সকল ধর্মের নিষ্ঠাবান ভক্তেরা যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করছেন। যিনি যে ধর্মের মধ্যে আছেন তিনি সেই ধর্মের গভীরতা আর সারবত্তার কথা প্রচার করছেন। আমার মনে হয় এটি একটি অতীব শুভ লক্ষণ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তন্ত্রধর্মের কথা কেউ প্রচার করেছেন নাকি?

আমি বলিলাম: হাঁ, নিশ্চয়ই। মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের শক্তি-সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনেকগুলি বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর ছাত্র রেবতীমোহনের ব্যাখ্যাও শুনেছি। তর্কচূড়ামণি মশাই ত সিদ্ধ তান্ত্রিক বলে বিখ্যাত।

তিনি বলিলেন: বাঙ্গলায় তন্ত্রশাস্ত্রে একাধারে সাধক আর পণ্ডিত তাঁর মত আর এখন কেহ নাই।

॥ ২৯ ॥

ভৈরব বলিলেন: আগেও তোমাদের কলকাতায় অনেকগুলি বড় বড় তান্ত্রিক প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম শুনেছ? তাঁর কত গান আছে,—তার মধ্যে ঐ গানখানা আমরা কতদিন আগে গাইতুম—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী বোলে আমার অজপা যদি ফুরায়।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী সন্ধ্যা পূজা সে কি চায়,—
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।
দানব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়,—
মদনের যাগযজ্ঞ ঐ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।
কালী নামের কত গুণ কেবা জানতে পারে তায়
দেবাদিবে মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়।

আমি বলিলাম: পরমহংসদেবও ত গানখানা গাইতেন। তিনি বলিলেন: হাঁ হাঁ,—তখনকার বড় বড় পণ্ডিত,—কালীবর পণ্ডিত, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, তার পর মহেশ ন্যায়রত্ন—এঁরা মহাতান্ত্রিক ছিলেন।

আমি: বাঙ্গলার বড় বড় পণ্ডিতেরা তখনকার দিনে প্রায় অধিকাংশই তন্ত্রোপাসক ছিলেন শুনেছি, কেবল বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: না না, তাঁরাও প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক,—গোঁসাই বংশ যত আছে জানবে সবাই গুপ্তভাবে শক্তি-উপাসক। জানো না, অন্তঃ শাক্তং বহিঃ শৈবং সভায়াং বৈষ্ণবং মতং। অদ্বৈত বংশ, নিত্যানন্দের বংশ এদের সবাই প্রচ্ছন্ন শক্তি-উপাসক, এঁরা কেউ তন্ত্রধর্মকে ত্যাগ করে বৈষ্ণব হন নি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তাহলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।—

তিনি: তিনিও ত মহাতান্ত্রিক ছিলেন। পুরীতে গম্ভীরায় তিনি কি করতেন জানো? সেও স্পষ্ট করে চৈতন্যচরিতামৃতে লেখাই আছে। দিনমানে ভক্তদের সঙ্গে নাম-সংকীর্তন করতেন, আর রাত্রে অন্তরঙ্গ সঙ্গে রস আস্বাদন করতেন। এ রস কী রস জান? এ সেই কারণ-রস সে কি আবার বলে দিতে হবে? তিনি যে মহা কৌল ছিলেন।

আমি: কি সর্বনাশ! এ ভাবের চৈতন্যচরিত্র ত কখনও শুনি নি।

তিনি: কি করে শুনবে? এ সব যে গুহ্য ব্যাপার। বাইরের লোক এসব জানবে কি করে। বোষ্টোমেরা ত তাঁকে নেড়া সাজিয়ে রেখেছে, আসলে কি তিনি নেড়া ছিলেন? তাঁর বড় বড় জটা ছিল, নাচবার সময় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতো, এসব ত পুঁথির মধ্যে নেই, কেউ জানে না।

আমি: আমরা জানি পুরীতে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই তাঁর মনে ছিল না। রাত্রে রায় রামানন্দ আর স্বরূপ দামোদরকে নিয়ে পদাবলী কীর্তনের আনন্দে বিভোর থাকতেন।

তিনি: আর মাধবী দাসী কোথা থাকতেন? ঐ মাধবীকেই ত তিনি শক্তি করে নিয়েছিলেন, রাত্রে সঙ্গে নিয়ে চক্রে বসতেন। ওসব চাপা দিয়েছে

ওরা,—গুহ্য ব্যাপার কি প্রকাশ করতে আছে! এ ধর্ম ত প্রচারের ধর্ম নয়—গুহ্য ভাবে সাধনের ধর্ম। সে সব দিন এখন আর নেই।

একটু থামিয়া ভৈরব বলিলেন: এখন কৌল নেই। এখনকার দিনে, গৃহস্থ আশ্রমে থেকে তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে বিবাহিত জীবনে সস্ত্রীক যে সাধনা তাতেই যা তন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। না হলে ঘর-সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ভৈরবী নিয়ে যে সাধন সে কাল আর নেই রে বাবা। আর তাতে সিদ্ধিও নেই, ব্যভিচার বেড়ে যায়। তাই আমরা আর ওভাবে সাধনের উপদেশ দিই না। এখন উটকো, ঘরছাড়া কেউ এলে বলি,—মা কালীর মূর্তিকে ধ্যান করো গে যাও, তাইতেই সব হবে।

অনেকক্ষণ আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। শ্রীচৈতন্যের নিষ্কলঙ্ক দিব্য ভাবময় চরিত্রের উপর এই সকল বৃদ্ধ তান্ত্রিকেরা, কিরূপ বিপরীত ভাব আরোপ করিয়া চলিয়াছে তাহাই ভাবিতেছিলাম। সত্যই তিনি তান্ত্রিক ছিলেন কি? তান্ত্রিকদের শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে এই যে ধারণা, আমার মনে হয়, ইহার মূলে একটি রহস্য আছে। মহামানবকে কোন সম্প্রদায়ই ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মের অন্তর্গত বিশিষ্ট ভাবের আরোপ করিয়া তাঁহাকে আপন করিয়া লন। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন নাস্তিক বুদ্ধকেও হিন্দুরা অবতার গণ্য করিয়াছেন। আবার এদিকে বৈষ্ণবেরাও শিবকে ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, শিবের যত নাম একমাত্র রুদ্র নামটি ব্যতীত আর সবই বিষ্ণুর নাম;—বিষ্ণু ও শিব একই। ইহাতে ভেদজ্ঞান থাকিলে সাধন পণ্ড হয়। আবার তন্ত্রমতের প্রসারতাও কম নয়, তাঁহারা রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের আধার-শক্তি বলিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারকে তন্ত্রের মধ্যে পুরিয়াছেন। রাধাতন্ত্র একখানি বিশিষ্ট তন্ত্রের পুঁথি। তন্ত্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে রাধাতন্ত্রের স্থান নগণ্য নয়। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে রাধা ও কৃষ্ণের জীবন, কর্ম সর্বাংশেই তন্ত্রময়। তন্ত্রোক্ত শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের সামঞ্জস্যের ফল স্বরূপ বাঙ্গলায় আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি কত উপধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। এ কথা এখন অনেকেরই জানা আছে। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যেখানে যেখানে বৈষ্ণব ধর্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কথা আছে সেখানে সেখানেই একটি তন্ত্রমতের ব্যাখ্যা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে।

রূপ সনাতন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থমালা, চৈতন্য-চরিতামৃত, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কৃষ্ণকর্ণামৃত ভক্তমাল গ্রন্থাদি, তার পর এখনকার দিনে শিশিরকুমারের অমিয়নিমাইচরিত গ্রন্থের প্রচার এবং ইহাদের প্রভাব যদি আমাদের মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে তন্ত্রধর্মের প্রভাব বিশ্বাস করিতে বোধ হয় বাধা ছিল না।

যাহা সত্য এখন তাহার উদ্ধার অনিশ্চিত; কোন্ গহনে জানি না কিন্তু যথার্থ বলিতে কি মহাপ্রভুর মধ্যে তান্ত্রিকতা এখনকার দিনে কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রাণ চায় না। তবে যদি কখনও এমন দিন আসে, শ্রীচৈতন্যের মধ্যে তন্ত্রধর্মের প্রভাব নিশ্চিত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে, বৈষ্ণব ভক্তেরা কি তাহা বিশ্বাস এবং গ্রহণ করিতে পারিবেন? এখন ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এখন তন্ত্রোক্ত ধর্মের উপর শুধু অনাস্থা নয়, আভিচারিক ক্রিয়াদি এবং নীতিবিরুদ্ধ আচার তন্ত্রধর্ম সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধারণের বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিজাতীয় ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে ইহাকে আর

লোকের কল্যাণকর ধর্ম বলিয়া ধারণা করিবার উপায় নাই। মনে হয় যেন তন্ত্রধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মে চিরবিরোধ ; এই দুই ধর্মের গতি আদি মধ্য ও অন্ত সবটাই বিভিন্ন।

যাহা হউক, এখনও যখন তন্ত্রধর্ম এ দেশে বর্তমান আছে, নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই তখন মনে হয় কখনও কোন কালে ইহার স্বরূপ আবার মূর্তিমান হইয়া সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে। তখন সেই সত্যের আলোকে এ সকল বিরুদ্ধ সংস্কার দূর হইবে,—ইহা আমার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এখন আমি ভৈরব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনি যে কালীমূর্তি ধ্যানের কথা বললেন, এই কালী, তারা, মহাবিদ্যার মূর্তি সকল এ দেশে কতদিনে প্রচার হয়েছে, আর কার দ্বারা এখানে প্রচারিত ? যদি বিরক্ত না হন—

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন : অত খোঁজে কাজ কি তোমার, তোমার সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি। তোমার যে সবই বেয়াড়া ধরণের কথা দেখতে পাই,—এ্যাঁ।

আমি বলিলাম : দেখুন, আপনারা প্রাচীন লোক, আপনাদের কাছে আমরা যদি এসব না শুনবো তবে আর কার কাছে যাব বলুন ! জানেই বা কে এ সকল কথা। আমরা—

আর বলিতে হইল না, তিনি একেবারে তরল হইয়া গেলেন, বলিলেন : কি জান বাবা, এত লোক আসে এসব কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না, সেই জন্যেই কেমন কেমন ঠেকে। আর আমরা জানিই বা কি, মা জগদম্বার দয়ায় যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে, হবে—কেবল এইটুকু জানলেই হ'ল।

আমি বলিলাম : সেটা আপনার পক্ষে সত্য, আমাদের এখনও অনেক দেখতে হবে, শুনতে হবে, করতে হবে, না হলে আমাদের গতি কি হবে বলুন। যাক্, এখন যে কথা হচ্ছিল,—কেউ কেউ বলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রধর্ম আর মহাবিদ্যার মূর্তি-পূজা বাংলায় এসেছে, তার আগে এসব ছিল না।

তিনি বলিলেন : অতশত জানি না বাপু, আমরা মা কালীকে নিয়েই যা কিছু সাধন ভজন করে আসচি, তিনিই আমাদের সব। তবে শুনেছি আগমবাগীশই এদেশে প্রথম কালীমূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনিই খুব সম্ভব দশমহাবিদ্যার পূজা, উপাসনাও প্রবর্তন করেছিলেন।

আমি ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : তা হলে আগমবাগীশের পূর্বে কি এদেশে তন্ত্রের মতে দশমহাবিদ্যার প্রচার ছিল না ? আর তন্ত্রের প্রচারও কি ছিল না ?

তিনি : তন্ত্রধর্ম মহা প্রাচীন, বেদের পূর্বেও তন্ত্র ছিল। যেমন শিবের উৎপত্তির কথা কেউ জানে না, তেমনি তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তা কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। চীনদেশেও তন্ত্র আছে, কালী, তারাদি পূজার বিধি-ব্যবস্থা আছে। বশিষ্ঠদেব যখন এখানে তন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি শান্তি পান নি। তখন তাঁর ইষ্টের আদেশ হ'ল মহাচীনে গিয়ে চীনাচার সাধন করতে। তিনি মহাচীনে গিয়ে চীনাচার সাধন করেছিলেন, তার পর কঠোর সাধনের পর সিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখন শান্তি পেলেন। তন্ত্রের চীনাচারই হ'ল সর্বাপেক্ষা কঠিন আর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। তাতে সিদ্ধ হলে আর কিছুই করবার থাকে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম: এখানে কি চীনাচার সাধন হয় না?

তিনি: এখানে সে সাধন করবে কে? তার উপদেশ, নির্দেশই বা দেবে কে? উত্তর সাধক কোথা? যাকে চীনাচার সাধন করতে হবে, তাকে নিঃসঙ্গ হয়ে মহাচীনে যেতে হবে। সেইখানেই উপদেষ্টা আছে, সেখানে সব যোগাযোগ ঘটিয়ে নিতে পারলে তবে হবে সিদ্ধি। এক বশিষ্ঠদেবের কথাই আমরা জানি যিনি এতে সিদ্ধ হয়েছিলেন, না হলে কৈ আর কারো কথা ত শুনি নি। তবে এদেশে তন্ত্রের যা কিছু প্রচার তা আগমবাগীশের দ্বারাই হয়েছিল। তন্ত্রোক্ত যে দেবীর মূর্তি তাও তিনি এখানে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। কালীপূজা ত সহজ,—কিন্তু তারার পূজা বড় ভয়ঙ্কর, এখানে তাঁর পূজা হয় না। মহাবীর্য্যবান উচ্চস্তরের সিদ্ধ যোগী না হলে তারার পূজা আর কারো দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। গৃহস্থ সাধকের ঘরে তারার পূজা হতেই পারে না, একেবারেই নিষিদ্ধ।

—শুধু তারা কেন, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, ভেবে দেখুন কি ভয়ঙ্কর ভাবের মূর্তি,—কি ভয়াবহ কল্পনা।

কল্পনা কেন, মহাদেবকে মা যে ঐ সব মূর্তি দেখিয়েছিলেন! তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাধনায় ঐ সব মূর্তির ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া জ্যোতিষের গ্রহাচার্য্যেরা দুষ্ট গ্রহ বা গ্রহদোষ কাটাবার জন্য বা দুর্ভাগ্য প্রশমনের জন্য ঐ সকল দেবীর পূজা করে থাকেন।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে তন্ত্রের সঙ্গে জ্যোতিষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গ্রহাচার্য্যগণ এদেশে সকলেই তান্ত্রিক। তন্ত্রের অধিকার আমাদের বাঙ্গলায় বহুদূর প্রসারিত।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: বক্রেশ্বরের অঘোরীকে আপনি জানেন?

শুনিবামাত্র তিনি একবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিলেন, তার পর বলিলেন: তুমি তাকে জান? তার কাছে গিয়েছিলে নাকি?

—কিছুদিন বক্রেশ্বরে ছিলাম, তখন মাঝে মাঝে সঙ্গ পেয়েছি।

—সঙ্গ পেয়েছ! মারধোর খাও নি?

—আমার উপর অতটা হয়নি, তবে গালি-গালাজ, ধমকানিটা হয়েছে।

—তুমি ত দেখছি একটা ভবঘুরে, মহাডানপিটে ছোকরা; তার মত একটা দুশমন, একটা ম্লেচ্ছ, ব্যভিচারীর সঙ্গলাভের খেয়াল হ'ল কেন তোমার? সে যে একটা পিশাচ, রাক্ষস, তার ভিতর কি আছে বল ত?

বুঝিলাম অঘোরীর স্বরূপ ইঁহারও জানা নাই। সেখানকার সাধারণে যেমন তাঁহাকে বুঝিয়াছে—এই ভৈরব বাবাজীর অভিজ্ঞতা তাহাদেরই অনুরূপ। অপরাধ ইঁহার কিছু নাই, ওখানকার লোকে তাঁহাকে অত নিকটে পাইয়াও যখন পিশাচ বা রাক্ষস ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারে নাই,—উপরন্তু সেখানকার সাধারণ লোকের ধারণা এইরূপ ছিল যে অঘোরীর ঐ স্থানে অবস্থান সে গ্রামের অধিবাসিগণের অমঙ্গলের কারণ। ভাগ্যে তিনি শ্মশানবাসী, না হইলে লোকালয়ে তাঁর স্থান নাই।

যাহা হউক, বলিলাম: অঘোরী বলেন, তন্ত্রধর্ম অতি প্রাচীন, ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসবার পূর্বেও ছিল। ব্রাহ্মণেরা এসে এই ধর্ম গ্রহণ করে তাঁদের

মনোমত গড়ে নিয়েছেন, আর সংস্কৃত ভাষায় পুঁথি-পত্র লিখে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে প্রবর্তিত করেছেন।

তিনি বলিলেন: তুমি অবাক করলে যে হে,—সে বেটা অজামূখ্য, ক অক্ষর গো-মাংস। দুর্দান্ত মাতাল, ডাকাতি করতো কি না তারই বা ঠিক কি! জানোয়ার বেটার ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইবার ক্ষমতা নেই, বাপ বলতে শালা, ব্রাহ্মণ মানে না, জ্ঞানী মানে না, মুখে যার পচা কথা ছাড়া কথা নেই, সে বেটা আবার তন্ত্র-মন্ত্রের কথা কি জানবে!

তিনি বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন,—আমি অবাক হইয়া তাঁহার ভাব দেখিতেছিলাম। ধীরে ধীরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিজ মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন,—কতক্ষণ তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোনও কথা হইল না। অনেকক্ষণ পর যখন তিনি কথা কহিলেন তখন যেন আলাদা মানুষ।

তিনি বলিলেন: অঘোরীর আবার এ সব জানা আছে নাকি? তুমি কি বলচ? হতে পারে, কার ভিতর কি আছে তা জানব কি করে! জগদম্বার খেলা; আমরা শুনেছি সে নরমাংস খায়, পচা মড়া খায়, অতি বড় পিশাচ,—তাই তাকে কেউ ঘাঁটায় না।

বলিলাম: আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম, যদিও তাঁর ভোজনের ব্যাপারে কোন বিচার নাই সেটি আমিও দেখেছি। এখন আমাদের যে কথা হচ্ছিল—হয়ত আগমবাগীশই প্রথম তন্ত্রধর্ম এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবর্তন করেন। তার আগেও তা হলে এ দেশে অব্রাহ্মণদের মধ্যে তন্ত্রধর্মের চলন ছিল!

তখন ভাবিয়াছিলাম হয়ত ভারত হইতে তিব্বত, সেখান হইতে চীনে তন্ত্রধর্মের গতি হইয়াছে। কিন্তু এখন ভাবিতেছি অন্যরূপ: মহাচীন হইতে তিব্বত, তিব্বত হইতে বাঙ্গলায় তন্ত্রধর্মের আগমন খুবই সম্ভব। অথবা তখনকার দিনে তিব্বত হইতে চীন রাজ্যের সমস্তটাই কি ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট মহাচীন নামে পরিচিত ছিল?

তন্ত্রের সাধন দেখিতে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি! যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিছু জ্ঞান নাই, বেশী ভাবিতে গেলে কল্পনা আসিয়া পড়ে। তন্ত্রের উৎপত্তি-সূত্র যে আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

ভৈরব মহাশয় আমায় চিন্তামগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কি ভাবছ বাবা? তার পর একটু সুর করিয়া বলিলেন: ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়। অত ভাবনা কেন বাবা, মা বলে দুবার ডাক দিকি অনেকটা সুখ পাবে। তন্ত্রধর্ম কোথা থেকে এল, কি বৃত্তান্ত, সাত সমুদ্র তেরো নদী এ সব ভাবনায় কাজ কি ?

সেই রাত্রে আর বেশী কিছু কথা হইল না। রাত্রে সামান্য কিছু জল-যোগের পর দাওয়ায় শয়ন করিলাম। ভাবিতেছিলাম অনভিজ্ঞ গৃহী, যাহাদের ভোগাসক্ত মন, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, তাহারা ক্ষমার পাত্র, কিন্তু সাধু যাঁরা, একই ধর্ম-সম্প্রদায়গত, সাধকের সঙ্গে সাধকের পরিচয় নাই, এত নিকটে থাকিতেও একজনের উপর অপরে এতটা বৃথা বিদ্বেষ পোষণ করেন, কেন এমনটি হয়! এই সকল পাঁচ কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলাম। যেন, আমি একটি মূর্তি গড়িয়াছি, গড়া অর্থে আঁকা। বিশাল মূর্তি হইয়াছে, ধর্ম দেবতা। দেখিতে অনেকটা শিবের মূর্তি, কিন্তু ঠিক শিব নয়। কল্যাণময় মূর্তি, অলঙ্কারশূন্য—কোথাও কোনও অঙ্গে অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। সম্পূর্ণ সুগঠিত অঙ্গ তাঁহার, প্রশান্ত সস্মিত বদন, নিম্ন দৃষ্টি, মাথায় জটা বাঁধা, প্রশস্ত ললাট, ত্রিনয়ন। উজ্জ্বল নীলাভ শুক্লবর্ণ জ্যোতির্ময়, সম্পূর্ণই নগ্ন শরীর। একটু দূরে দাঁড়াইয়া যেন বিশেষরূপেই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলাম। কোন একখানি মূর্তি সম্পূর্ণ চিত্রিত হইলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া দর্শকের ভাবে অনন্যমনে নিরীক্ষণ করিতে শিল্পীর যে সুখ, ভাষায় তাহা বুঝাইবার নয়। বড় আনন্দেই দেখিতেছিলাম। মনে মনে একটি ঘন আত্মপ্রসাদও অনুভব করিতেছিলাম। এই অপরূপ মূর্তিটি ত পুরুষের নয় অথবা পুরুষও হইতে পারে, স্ত্রীও হইতে পারে। তার পর—ও কি? হঠাৎ দেখিলাম, অলঙ্কারশূন্য জ্যোতির্ময় শরীরের সর্বাঙ্গে যেন কাটা কাটা দাগ। এ কি হইল, আমি ত এরূপ করি নাই,—না কখনও নয়। তখন যেন আতঙ্কিত হইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, এখানে কেহ আছে কি না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্ব শরীর রেখা দ্বারা বিভক্ত। এ কি অভাবনীয় ব্যাপার, দেখিয়া আমার অন্তর বিষণ্ণভাবে পূর্ণ করিয়া দিল।

হঠাৎ খল খল হাসির শব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি এখানকার ভৈরবী। এক কোণে দাঁড়াইয়া আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এখন তাঁহার মূর্তিটি বড় উজ্জ্বল, বয়সও যেন কম, যৌবন-শ্রী মণ্ডিত। দাঁত পড়া নয়, মুক্তার মত দন্তপঙ্‌ক্তি মনোহর হাসির মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে। পরণে ঘোর রক্তবর্ণ বারাণসী শাড়ি, তাহাতে চরণ দুইটি, সুন্দর সুগঠিত বাহু যুগল এবং মুখমণ্ডল আরও যেন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। দৃষ্টিমাত্রেই আমার ধারণা হইয়া গেল, ইনি নিশ্চয়ই কোনও দেবী মানবীরূপে আমায় দেখা দিতে আসিয়াছেন। আমি প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এখানে?

তিনি আবার খল খল হাসি আরম্ভ করিলেন। এমন হাসির শব্দ আর কখনও শুনি নাই,—যাহাতে আমার অন্তরে একটি আতঙ্কের ভাব আনিয়া দিল। ভাবিতেছিলাম,—কিছু অমঙ্গলের পূর্ব সূচনা না কি? তিনি প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন: আমি তোমার কাজ দেখতেই এলাম।

তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম: আমি ত মূর্তির গায়ে ওরূপ দাগ দিই নি, এখন এ রকম হ'ল কি করে বুঝতে পারছি না।

তিনি: ধর্মের মূর্তি করেছ অথচ তার সর্বাঙ্গে টুকরো টুকরো রেখা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করো নি কেন? তা না করলে ধর্মের মূর্তি সম্পূর্ণ হবে কেন?

উত্তরে যেন বলিলাম: একটি মূর্তি গড়ে যে, সেই সুন্দর সৃষ্টির উপর সে কি ঘন ঘন দাগ কেটে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে পারে?

তিনি বলিলেন: সে না পারলে দাগগুলি আপনিই হয়ে যাবে।

আমি: কেন তা হবে? তিনি বলিলেন: তুমি ধর্মের একটি অখণ্ড মূর্তি আঁকতে চেয়েছিলে ত? কিন্তু পশুর রাজ্যে কোথায় দেখেছ ধর্মের অখণ্ড মূর্তি? কোনও দেশে, কোনও কালে ধর্মের অখণ্ড মূর্তি ত নেই; এমন কি একই দেশের একই মানব-সমাজে, একই ধর্মের মধ্যে কত ভাগ হয়ে আছে দেখতে পাও না?

আমি বলিলাম: যেভাবে ধর্ম এখন আছে সে ত আমার আদর্শ নয়, আমি যেটি দেখতে চাই সেইটিই ত আমার আদর্শ।

আবার কতক্ষণ তাঁর সেই খল খল হাসি, তার পর তিনি বলিলেন: বাছা ধর্ম ত বাইরের জিনিস; জাতি বল, সমাজ বল, মনোরাজ্য বল, সে সবই ত বাইরের, তার সঙ্গে তোমার আত্মার সম্বন্ধ কি? বাইরের একটা ভাবকে আঁকড়ে ধরে কল্পনায় তাকে পূর্ণ রূপ দিতে যাওয়া, খণ্ড খণ্ড ভাবকে একটা অখণ্ড ভাবের মধ্যে ধরে দেখাতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়? একজন যদি তা করে, সে করলেও কি সাব্যস্ত হয়?

আবার সেই খল খল হাসি। হাসির শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

॥ ৩০ ॥

প্রভাতের শীতল হাওয়ায় বৃষ্টি-ধারা উড়াইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে—সেই ঠাণ্ডায় বুকের মধ্যে একটা ধড়ফড়ানি লইয়া জাগিয়া উঠিলাম। আজই তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইব ঠিক করিলাম। তখনও শয্যা ছাড়িয়া উঠি নাই, আলস্য সম্পূর্ণরূপে শরীর হইতে ছুটে নাই, দেখি ভৈরবী আসিতেছেন। তিনি খুব ভোরেই উঠিয়াছেন অনুমান করিলাম।

আমাকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন: মুখ ধোয়া হলে চা খাবে ত, চা খাওয়া অভ্যাস আছে ত? আমি চা'য়ে অভ্যস্ত নই শুনিয়া তিনি বলিলেন: সে কি! সকালে চা খাও না, কলকাতার মানুষ এ কি রকম? আমরা দেখ জঙ্গলে থাকি, রোজ সকালে চা না হলে চলে না। চা না খাও গরম দুধ একটা খাবে? আমি বলিলাম: এখনই যাব ভাবছি। শুনিয়া তিনি প্রবল আপত্তি জানাইয়া বলিলেন: আজ ত নয়ই, যেতে হয় কাল কি পরশু যেও, লক্ষ্মী বাবা, আজ থাক।

মহা মুস্কিল হইল দেখিতেছি,—এ একপ্রকার জোর বাঁধন, এমন হইবে এখানে তাহা কে জানিত! অনেক সাধ্য-সাধনা মিনতি করিয়া বৈকালে যাইবার ব্যবস্থা করিলাম। সকালে যখন ভৈরবের কাছে তাঁহার কর্ম-অবসরে গিয়া বসিলাম, তিনি বলিলেন: তোমরা এত চঞ্চল কেন? যদি এত পরিশ্রম করে এক জায়গায় দেখতে শুনতে এসেছ তা ভাল করে স্থানের সঙ্গে পরিচয় হতে না হতেই ছুট্‌ফট্‌ করচ কেন যাবার জন্যে? অ্যাঁ—

বলিলাম: আমি বড় চঞ্চল একথা ঠিক,—তবে আসল কথা এই যে কোনও জায়গায় গেলে প্রথম দিনেই তার আবহাওয়া যদি ভাল লাগল ত থাকতে ইচ্ছা হয়,—না হলে থাকতে মন যায় না। এ রোগের ঔষধ কি?

তিনি: কি জানো, তোমাদের সুখটাই হ'ল আসল, সুখের পায়রা তোমরা সব, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকত এখানে, তা হলে চট্‌ করে চলে যেতে চাইতে না নিশ্চয়?

আমি: কথাটি কতকটা সত্য বটে, কিন্তু এখানে কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব, আর আমার শরীরও ভাল নয়, সেই জন্যেই আর এখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবে এসব উপেক্ষা করা যায় যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল হয়, আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনি : তুমি ত ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছ, তপস্যার যে অবস্থায় এসেছ, এখন তোমার পক্ষে শান্তি পাওয়া মুস্কিল। এ সব ছেড়ে যখন ঘরে গিয়ে বসবে, স্থির হয়ে সংসার-ধর্মে মন দেবে, তখনই তোমার আসল কাজ আরম্ভ হবে।

আমি : আপনিও কি মনে করেন আমায় গৃহস্থভাবে সংসার নিয়ে জীবন কাটাতে হবে? বক্রেশ্বরেও একজন একথা বলেছিলেন, তখন সে কথা আমার ভাল লাগে নি।

তিনি বলিলেন : বাবা, তুমি এখন পুঁজির যোগাড়ে বেরিয়েচ, কিছুদিন এই কর্ম কর, যখন বুঝবে, তখন ঠিক নিজ স্থানে গিয়ে বসবে। এখন এসব ত তোমার পুঁজি কুড়ানো হচ্ছে কিনা?—কেমন?

আমি : আমার মনে হয় তপস্যায় বাড়াবাড়ি করলেও ভোগের স্পৃহা ঠিক যায় না। সেই জন্যে বোধ হয় সংসারকে তখন বেশী জোরে আঁকড়ে ধরিয়ে দেয়।

তিনি : কে দেয় ধরিয়ে?—সে ত তুমিই নিজে। তুমি যে সংসারে, যে অবস্থার মধ্যে জন্মেছ সেইখানেই তোমার পথ ঠিক করা আছে। সে দিকে তোমার লক্ষ্য আছে কি?

আমি : তার মধ্যে নিজের পথ নির্বাচন করতে গিয়ে মহা বাধা দেখছি যে চারিদিকেই,—সেক্ষেত্রে না বেরিয়ে এলে উপায় নেই—

তিনি : সেই বাধাতেই যে তোমার আসল পথ নির্দেশ করে দিচ্চে, সেটা ত বুঝতে পার? যেখানেই বাধা বলে ঠেকচে সেইখানেই ত ঠিক পথের নির্দেশ। তখন সেই পথে গেলেই হ'ল—

আমি : তাই ত ঠিক ঘটচে, পর পর অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেখে আসচি।

তিনি : যখন কাজে মন বসে না তখন বাইরের যত কিছু গোলমাল বড় করে দেখায়। কাজে মন নেই, উঃ বড় গরম, ভারি তাত পড়েছে, অসহ্য—এ জায়গা ভাল নয়, ও জায়গা ভাল নয়, এখানে মাছি, ওখানে মশা, এই সবই তখন লক্ষ্য হয়। কাজের সঙ্গে মনের যোগ হলে তখন এ সকল চক্ষে লাগে না।

আমি ভাবিতেছিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন : তোমার ত স্ত্রী আছেন? তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কি রকম রেখেছ?

বলিলাম : এখন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, দেখতেই ত পাচ্ছেন এ অবস্থায় আর কি ভাবের সম্বন্ধ রাখা যায়?

তিনি বলিলেন : তোমরা নিজের দিকে এতটা চোখ ফেলে রেখেচ তাতে অন্য দিকটায় একেবারেই অন্ধ হয়ে আছ বলে সেটা দেখতে পাচ্ছ না মোটেই; সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়ার মতন।

আমি বলিলাম : নিজের দিকেই যখন সামাল দিতে পাচ্চি না তখন অন্য দিকে সামলাব কি করে?

তিনি : কেন, তিনি কি তোমার বিরুদ্ধ পথের মানুষ, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পার না? স্ত্রী হয়েছে যখন, তাই বলছি। আসলে বুঝি তুমি অর্থ উপার্জনের দিকে অলস?

আমি বলিলাম : দেখুন, টাকা টাকা করে বেড়ালে সৎসঙ্গ পাব কোথা, পাঁচটা বিষয় ত জানতে ইচ্ছা হয়—

তিনি: হাঁ হাঁ, বুঝেছি, জ্ঞান-উপার্জনে যার স্পৃহা আছে স্ত্রী কি তার বাধা হতে পারে? বাইরের বাধাটা কি যথার্থ বাধা? তোমার এই বুদ্ধি হ'ল শেষে?

আমি বলিলাম: অবস্থা যখন যেমন ভাবে মানুষকে নিয়ে যায় তখন তাকে সেই ভাবেই ত চলতে হয়। এখন স্ত্রীকে নিয়ে আমার কিছু করবার অবস্থা নয়। সংসারের বর্তমান অবস্থায় এখন স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি অবশ্যম্ভাবী।

তিনি: কত দিন তোমাদের বিবাহ হয়েচে?

বলিলাম: প্রায় বার তের বৎসর হবে।

তিনি বলিলেন: এই বার বৎসর তুমি তার সঙ্গে কিরম ব্যবহার রেখেছিলে?

বলিলাম: প্রথম চার পাঁচ বৎসর সে বালিকাই ছিল, বেশীর ভাগ বাপের বাড়ীতেই থাকত। তার পর যখন সে আমাদের বাড়ী আসে, তখন থেকেই আমার মধ্যে ঘর ছাড়বার ইচ্ছা, নানাদেশ পর্য্যটন আর সাধুসঙ্গের ইচ্ছা বলবৎ হয়ে উঠল। তা ছাড়া ইন্দ্রিয়সম্পর্ক না রেখে পবিত্র ভাবেই জীবন-পথে যাওয়া যায় কি না এটিও পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্য, সেই জন্যে সেটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

তিনি: এখন তা হলে এই ভাবেই চলুক, কেমন? তার পর সংসারে গাঢ় প্রবেশ করবে, কি বল? পুঁজি বাড়িয়ে চল যতটা পার, তখন কাজ দেবে।

আমি বলিলাম: সেটা ভবিষ্যতের কথা, তবে যদি পাঁচজনের মতই সংসার করতে হয় তখন এড়াব কি করে? তবে আমায় শেষে যদি সংসারেই ফেঁসে যেতে হয়, স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে টাকার যোগাড়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় ত বুঝব আমার অধঃপতন চরমে নেমেছে।

মনের মধ্যে জমাট আনন্দের ভাব থাকিলে প্রবীণ ব্যক্তি যেমন ভাবে চাপিয়া চাপিয়া হাসিয়া থাকেন তিনি সেইভাবে হাসিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন: জীবনের একটা পরিবর্তন এলে সেটিকে এমন হেয় ভাববে কেন! কোনটা যথার্থ হেয়, কোনটি শ্রেয় সে কি তুমি প্রথমে ধরতে পারবে? আমি যদি দেখি তুমি সংসারী হয়েছ, ছেলেপুলে হয়েছে, তা হলে আমি বুঝব তুমি এইবার ঠিক নিজের পথেই চলেছ, যথার্থ কল্যাণময় পথ পেয়েছ। মা জগদম্বার নির্দিষ্ট, অতি প্রিয়, সরল, পরম আনন্দময় সনাতন পথ।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বলিলাম: ঐ গতানুগতিক পুরাতন, জরাজীর্ণ, সংস্কারাভাবে ধ্বংসোন্মুখ পচা আমাদের এই শ্রীহীন সংসার-জীবনকে আপনি জগদম্বার অতি প্রিয়, পরমানন্দময় সরল পথ বলেছেন? বলিয়া তাঁর চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখি যেন অন্ধকারে ব্যাঘ্রের পূর্ণ বিস্ফারিত চক্ষুর মত জ্বলিতেছে,—তাহার মধ্যে কি শক্তির স্ফুরণ! আমি যেন এতটুকু হইয়া গেলাম। এই গত কাল হইতে দেখিতেছি তাঁহার চক্ষে এরূপ জ্যোতি দেখি নাই। সেই জ্যোতির মধ্যে যেন একটি অমানুষী সত্তা উঁকি মারিতেছে, এ কি মূর্তি? যেন অন্য একটি মহা সত্তা, বিরাট ভৈরব মূর্তি। আমার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন,—বোধহয় আমার বিস্ময়মিশ্রিত ভয়াকুল ভাব দেখিয়া, বলিলেন: যাঁর সৃষ্টি, তিনি যে সহজ নিয়মের মধ্যে দিয়ে সরল রাজপথ করে রেখেছেন তোমারা সে পথ এতটা হেয় ধারণা করো কোন্ সাহসে? কৈ এ পর্য্যন্ত কি কেউ অন্য পথ আবিষ্কার করতে পেরেছে? যে প্রতিক্রিয়ার বশে দুদিন তোমার পরিবারবর্গের আড়ালে থাকবে, আবার দ্বিগুণ আকর্ষণে সেই সকলের মধ্যে গিয়ে কড়া-ক্রান্তিতে সব ঋণ শোধ করতে হবে। হ্যাঁ, যদি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, কারো প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি না রেখে কিছু করতে পার তবে বলি বীর। তা নয় কাপুরুষের মত এটা আকর্ষণ, ওটা মায়া, সেটা অনিষ্টকারী বাধা, ওটা শত্রু, বিঘ্ন—এই সব ভেবে, নিজেকে পৃথক্ করে ধর্মপথের ধ্বজা উড়াতে যাবে, তার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ?

আমি বলিলাম: অবশ্য চিরজীবনের জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ী ছাড়ি নি। আমার কথা ধরি না—কিন্তু যাঁরা অবতারকল্প মহাপুরুষ, শুধু তাঁরা কেন—এমন কত কত মহৎপ্রাণ সংসারত্যাগী—

তিনি: হাঁ গো, তাঁরা সংসারকে ভাল করে দেখে শুনে, ভোগ করে, ভগবৎ শক্তির প্রেরণায় একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়বার জন্য ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু তাঁদের কি কোনও প্রত্যবায় ছিল? তাঁরা এমন কোন কাজ করেন নি যাতে প্রত্যবায়ভাগী হতে হয়। তাঁদের কথা আলাদা,—

তার পর বলিলেন: হাঁ, হয় বটে কারো কারো এ রকম, সংসার হতে একটু পৃথক থেকে পুঁজি বাড়িয়ে নিয়ে তার পর এসে বেশ পাকা হয়ে কর্ম-ক্ষেত্রে ঢোকা, এ খুব ভাল,—কিন্তু সংসার ত্যাগ, সংসার ত্যাগ বলে এই যে একটা জুয়াড়ীর কাণ্ড, বাপ মা মাগ ছেলে ঘর সংসার ছেড়ে এসে আবার এক সংসার পেতে টাকা কড়ি বিষয় আশয় কামড়ে থাকা এ যে মহা বিশ্রী ব্যাপার একটা! আমরা ওটাই খুব খারাপ দেখি।

আমি বলিলাম: এখনও আমাদের দেশে সাধারণের মনে সংসার-ত্যাগীর উপর একটি প্রবল শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি এমন অনেক সংসার-ত্যাগী গুরু আছেন, যাঁরা এক প্রকাণ্ড সংসার পেতে নানা প্রকারে অর্থোপার্জন করেছেন, —শিষ্য, শিষ্যা, সেবকাদি নিয়ে অনেক সংসারীদের পথ দেখাচ্ছেন,—দালালি, মামলা মোকদ্দমা, এ সব বৈষয়িক ব্যাপারও খুব বিস্তৃতভাবে আছে তাঁদের মধ্যে, অথচ সংসারত্যাগী বলে গৌরবও আছে।

তিনি বলিলেন: এখনকার সবই কারবার বাবা, সবই ব্যবসার চক্ষু দিয়ে দেখতে হবে। রাজা যখন ব্যবসাদার তখন এতদিন দাসত্ব করে তাদের কারবারী মনোভাবের কতটা হজম করেছে এ জাতটি আমাদের! গুরুগিরি বল, শান্তি স্বস্ত্যয়ন কবচ তন্ত্রমন্ত্র বল, জ্যোতিষশাস্ত্রী বল, চিকিৎসক বল, উকিল, ধর্ম-শিক্ষক এ সব এখন ঠিক ঠিক কারবারী ঢংয়েই ত চলছে। কালমাহাত্ম্য বাবা, কালমাহাত্ম্য,—গুরু গুরু—মা জগদম্বা!

কথা শেষ হইল—। কোন রকমে প্রসাদ পাওয়ার কালটুকু কাটাইয়া, সকল কাজ শেষ হইলে যখন ভৈরবী মাতা একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন,— আমি সেই অবকাশে খেয়া পার হইলাম।

পচণ্ডী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম প্রায় সাড়ে তিনটা—তখন গাড়ী

নাই। সন্ধ্যায় গাড়ী। বসিয়া বসিয়া অট্টহাসের সকল কথাই ভাবিতেছিলাম। একটি গাড়ী তখন বিপরীত দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল।

আধা বয়সী গৌরবর্ণ ভদ্রলোক একটি সুন্দর শিশু কোলে, একখানা তোয়ালে-কাঁধে, পায়ে চটি, আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে স্থানীয় লোক বোধ হইল। বোধ হয় কাহাকেও তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন।

নিকটে আসিয়া আমার মুখের দিকে এমন ভাবে দেখিতে লাগিলেন তাহাতে আমি একটা অস্বস্তি অনুভব করিলাম। উঠিয়া যাইব কি না, ভাবিতে-ছিলাম,—তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: বাবাজির কোথা থেকে আসা হচ্ছে? বলিলাম: অট্টহাস থেকে এই মাত্র আসছি।

—কোথা যাওয়া হবে?

—তারাপুর।

—আজ থেকে যান না আমাদের গ্রামে?

—হঠাৎ আমায় কেন আহ্বান কচ্চেন বুঝতে পাল্লুম না ত?

—সাধুসঙ্গ লাভ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য কল্পনা করচেন নাকি?

হাসিয়া বলিলাম: আমি সে রকম সাধু নই, আমার সঙ্গে আপনার কিছুই লাভ হবে না নিশ্চয়ই বলছি।

তিনি বলিলেন: তা আমরা দেখে নেব, এখন ত চলুন। উঠে পড়ুন দেখি।

শেষে যাইতে হইল। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কি করেন? তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন: শুনলে হয় ত অস্বস্তি অনুভব করবেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম: পুলিশ নাকি?

—হাঁ, ঠিক ধরেছেন; এখন আর ত কিছু ভাবনা নেই, নিঃসঙ্কোচে চলুন।

আমি বলিলাম: আমার মুখের দিকে যে ভাবে দেখছিলেন তাইতেই আমি ঐ রকমই একটা কিছু অনুমান করেছিলাম।

সত্যই,—ভয়ের কিছু ঘটে নাই উপরন্তু সুখস্বাচ্ছন্দে রাত্রিবাসের ব্যবস্থাই হইয়াছিল। তাহার গৃহে লইয়া গেলেন,—কয়েকজন প্রতিবেশী বান্ধব আহ্বান করিয়া প্রহরাধিক কাল কীর্তন গানের আয়োজন, যেন উৎসবের ব্যাপার করিয়া তুলিলেন। নিরোল গ্রামে কয়েকঘর পদকীর্তনীয়া আছেন, তাঁহারাই গ্রামের গৌরব। আমার মহাভাগ্যেই ঐ ভাবে সে রাত্রে পদকীর্তন শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

ভদ্রলোকের কোলে শিশুর কথা বলিয়াছি:—বরাবর কোলেই ছিল ঐ শিশু। এখন পদকীর্তনের পালা হইয়া গেলে, ঐ শিশুটিকে কোল হইতে নামাইয়া বলিলেন, এবার এই শিশুর গান শুনবেন? এস তো বাবা, সেই গানটা করো তো। আড়াই কি তিন বৎসর বয়স হইবে শিশুটির। বিস্ফারিত নয়নে সে বাপের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি আগে ধর। তিনি তখনই আরম্ভ করিলেন, পুত্রের কোমল কণ্ঠস্বর তাহার সঙ্গে মিলিল,—

সুধা মাখা হরিনাম, কে রে আনিল জগতে,—

ও নাম কোথায় ছিল কে আনিল রে—

গৌর নিতাই প্রেমের টানে, ঐ নামের বন্যে এনে
সারা জগৎ ভাসিয়ে দিল রে—ইত্যাদি।

সবটুকু গাওয়া হইলে পর, শিশু একগাল হাসিয়া, উদ্ভাসিত আত্মপ্রসাদ-পূর্ণ মুখখানি সমবেত প্রশংসমান শ্রোতার দৃষ্টি এড়াইতে বাপের বুকে লুকাইল।

এই ভাবে একটি পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে হরিভক্তির পরিচয় পাইয়া নিরোলে এক স্মরণীয় রাত্র কাটাইয়া পরদিন প্রাতে তারাপীঠের পানে যাত্রা করিলাম।

ইতি—প্রথম ভাগ

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

সিদ্ধযোগী বাবা মুক্তিনাথ

যোগীবর,—

চিনি নাই আমি,

শুধু আমি কেন,—অনেকেই চেনে নাই।

যে বা যাহারা, সমাজের ভ্রান্ত পথহারা দেখিয়াছে প্রত্যক্ষ তোমায় ;—

এ মহানগর মাঝে শ্রীমানী বাজারে, দ্বিতলের এক ক্ষুদ্র ঘরে,—

দীর্ঘ-শীর্ণ-কালো-দীন সৌন্দর্য্য-বিহীন মূর্তি তব,

চক্ষে কালোঠুলি সর্বক্ষণ, আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ গৈরিকে ঢাকি,

মুক্ত মাত্র পৃষ্ঠদেশ গরমের দিনে, একমাত্র দক্ষিণের

বাতায়ন করিয়া পশ্চাতে,—

অপরূপ ছাঁদে আপন আসনে বসি। ঠিক এই ভাবে

দেখাদেখি,

পরিচয় তোমায় আমায়।

তুমি ছিলে সিদ্ধযন্ত্রী, আরও—দক্ষ বীণ্‌কার,

জানেনা সকলে।

সেইদিন, মুহূর্তেকে চিনিলে আপন জনে, নিজ গুণে

কৃপা করি দিলে ধরা ;—

যন্ত্রবৎ করিয়া আমায়,—শক্তি-মন্ত্রে, তখনি বাঁধিয়া দিলে অন্তরের সপ্ত

তার,—

পরে দিনে দিনে, ধীরে ধীরে মুড়ের বাহার, তারপরে আলাপের সূক্ষ্ম

কারুকলা দেখাইলে মোর দেহবীণে করিয়া আশ্রয় ;—

ভৈরব রাগের পালা করে দিলে শুরু, গুরুভাবে হয়ে প্রতিষ্ঠিত ;—

নিজ হাতে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে সাধন দুয়ার,

রুদ্ধ ছিল এতদিন। আমার দ্বিতীয় জনম ঘটাইলে সেইদিন,—বিচিত্র

আলোকে উদ্ভাসিত দশদিক।

আমি আত্মহারা—তারপর দিলে মোরে ছাড়ি।

সেই হতে পথে দিনু পাড়ি, ঘর ছাড়ি কয়েক বৎসর,

তীর্থ পর্য্যটনে আর সাধুসঙ্গে কাটিয়াছে দিনগুলি,

তারি ফল সাহিত্যের এ নব উদ্যম।

এ তোমারি দান।

পথে আনি তুমিই দেখিয়েছিলে অনন্ত শক্তির রাজ্য ব্যাপ্ত চারিদিকে,
তারি মাঝে এক বিন্দু আমি,—
কতো কতো স্বামী, মহারাজ, কতো কতো মত, দেখিতে দেখিতে যেথা যাই
দেখি মোর পথ নির্দ্ধারিত,
গতি তার ইষ্টের মন্দিরে।
তারি ইতিহাস, এই গ্রন্থটুকু।
পূজা অর্ঘ্যরূপে আজ তোমাতেই উৎসর্গ প্রয়াসী,
ওগো মোক্ষরাজ্য-বাসী,—কত অকিঞ্চন আমি, মনে মনে জানো অন্তর্য্যামী,—
তোমা হতে প্রাপ্ত ধন, তোমাতেই করিয়া অর্পণ, কৃতার্থ হইতে চাই,
যথা গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।

অগ্রপশ্চাৎ কয়েকটি কথা

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম তারপর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের একটু ইতিহাস আছে যাহা পূর্বে ঠিক সুযোগ হয় নাই তাই বলাও হয় নাই। এখন সেই সম্পর্কে সকল কথা বলিয়া বিজ্ঞাপন শেষ করিব। অবশ্য এটা সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবার পূর্বের ঘটনা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা, যখন ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গই ছিল আমার তখনকার জীবনের প্রধান অবলম্বন, তখন অনেক কিছুই লিখিয়াছিলাম। শুধু লেখা নয় অনেকগুলি পেন্সিল স্কেচও করিয়াছিলাম। লেখার বেশী ভাগ পেন্সিলেই চলিত কালিতেও চলিত ;—কাগজ ছিল সর্বাপেক্ষা সস্তা বালির কাগজ ; সাদা ফুলস্কেপও কিছু ছিল আর নীল লাইনটানা চিঠির কাগজেও লেখা ছিল আমার বিবরণগুলি। মোট কথা তখন হাতের কাছে সহজেই যে কাগজ পাইতাম দেশ বিদেশে তাহাতেই কাজ করিয়াছি। তখনকার সকল কিছু পেন্সিল পোর্ট্রেট এবং লেখা হাজার পাতার কম নয়, জমা হইয়াছিল।

তারপর যাহা হইয়া থাকে, কালক্রমে ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গের তাত জুড়াইয়া গেল, কাজেই ঐ বিচিত্র বর্ণনা নানা স্থানের পর্যটন-কথা, তাড়াবন্দী অবস্থায় পুরানো বাড়িতে পুরানো বইগুলির সঙ্গে জীর্ণ কীটদষ্ট র‍্যাকের উপর পড়িয়া রহিল ; তখনকার মত দৃশ্যান্তরে গেলাম।

তখন নূতন উদ্যম, ছবি আঁকার বন্যা আরম্ভ হইয়াছে, সংসারপ্রবেশ ঘটিয়াছে--উপার্জনের প্রয়োজন এবং সুযোগ, শিল্পীর নবজীবনে প্রতিষ্ঠার যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

প্রায় দশটি বছর পরে, প্রথমে 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর প্রবাসীর আগ্রহে বাহির হইল। তখনও তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ তাড়াবন্দী অবস্থায় পড়িয়া আছে, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, যদি উহা আগেকার ঘটনা, এবং তন্ত্রের কথার উপর কারও আস্থা নাই বলিয়াই কোন উচ্চশ্রেণীর কাগজে প্রকাশ অসম্ভব ছিল। যাই হউক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে পরিচয় পাইয়া বান্ধবেরা বিশেষতঃ সচিত্র সাধুসঙ্গের কথা উত্তরায় প্রকাশ করিবার জন্য উত্তরা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তীই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারই আহ্বানে ও উৎসাহপূর্ণ ব্যবহারের ফলে উহা উত্তরায় প্রায় সাড়ে তিন বৎসর বাহির হইয়াছিল এবং পাছে গ্রন্থ বড়ো হইয়া পড়ে সেই জন্য হঠাৎ বন্ধ করিতে হইল ; যেহেতু নাটক বা উপন্যাস ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্য বেশী বড় হইলে প্রকাশকেরা গ্রহণ করিবেন না এই ভয়ই ছিল। অবশ্য গ্রন্থরূপে প্রকাশের যোগাযোগ অনেক পরেই ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য কোন কোন বন্ধু যেন একটু বিশেষভাবেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে একদিন বর্ষার সকালে কোন বিখ্যাত মাসিকের স্বত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট প্রকাশক মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এই মাসিকে প্রকাশের জন্য ছবি সম্পর্কে এমন মধ্যে মধ্যেই

যাইতাম। এখন গিয়া দেখিলাম, কর্তা তাকিয়ায় আধোশোয়া ভাবে আরামে পা ছড়াইয়া তক্তার উপর, তাঁর সামনেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক সুরেন গাঙ্গুলী মহাশয়,—শরৎবাবুর সুরেন মামা ;—বসিয়া আলাপে রত। আমার উপস্থিতে সুরেনবাবু খুশি হইলেন, অনেক দিন পরে দেখা এবং ফরাস হইতে নামিয়া কোলাকুলিও করিলেন। তারপর উভয়েই আসন গ্রহণ করিলে,—গাঙ্গুলী মহাশয় কুশল প্রশ্নের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, আপনার সাধুসঙ্গের কি হোলো, এখনও বই বার করতে পারলেন না? আমরা আশা করে আছি যে।

এমন সময়ে এই ভাবের একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে আমিও সহজেই বলিয়া ফেলিলাম,—এই যে, বই প্রকাশের কর্তা স্বয়ং রয়েছেন সামনেই ;—তারপর একটু প্রার্থনাসূচক বিনীত ভাবেই বলিলাম, একটু কৃপা করুন না দয়াময়! বইখানার একটা গতি করে দিন না!

ঐ সময়ে প্রকাশ মহাশয় ফেসিয়্যাল প্যারালিসিসের আক্রমণে ভুগিতে-ছিলেন। তখন অসুখটা সারিয়াই আসিয়াছিল, সামান্য একটু বাঁকা ভাব কথা-বার্তার সময় মুখে দেখা যাইত। যাই হোক,—এখন আমার কথা শুনিয়া তাঁর অভ্যস্ত অবিচলিত, স্থির, মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,—কি জানেন, ওটা যখন মাসিকে বেরিয়েছিল—তখন কতক কতক দেখেছিলাম মনে হচ্ছে,—তা মাসিকে সব কিছুই বেরোতে পারে ;—তা বলে সবই কি গ্রন্থ হয়? বলিয়া একটু থামিয়া একবার আমাদের উভয়েরই মুখের দিকে দেখিয়া লইলেন। পরে জানালার বাহিরে বাদলভরা আকাশের দিকে চাহিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—এই ধরুন বৃষ্টি বাদল, সারাদিন বাইরে যাবার যো নেই, ইচ্ছেও নেই, তা শুয়ে শুয়ে হাতের কাছে যা পাই তাই দেখচি, পড়চি, হাতের কাছে একখানা পাঁজি রয়েচে,—বলিতে বলিতে পাশেই একখানা লাল-খেরো-বাঁধানো পাঁজি ছিল সেখানা তুলিয়া লইলেন এবং তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতেই বলিতে লাগিলেন,—এই পাঁজিখানার মধ্যে হরেক রকম বিজ্ঞাপন, সেগুলোও তখন পড়চি, আর বেশ লাগচেও কিন্তু তা বলে কি ওগুলো ছাপিয়ে গ্রন্থ বার করা যায়?

এই ব্যাখ্যার পর তিনি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, তারপর একটি দীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আ—া—া বলিতে বলিতে একেবারেই উঠিয়া বসিলেন। এবং অন্য দিকে চাহিয়া ঐ প্রসঙ্গ একেবারেই ঝাড়িয়া ফেলিলেন। বুঝিলাম এটা বিদায়ের সংকেত। এমন অল্প কথার মানুষ দেখি নাই। সংযতবাক বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ঐ মানুষটির মধ্যেই দেখিয়াছিলাম।

অবশ্য বিধাতার বিধানে ইহার অল্পদিন পরেই গ্রন্থ বাহির হইল, এবং নানাদিকেই সমালোচনার ফলে বান্ধবেরা দ্বিতীয় ভাগের তাগিদ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উৎসাহ প্রচুর, যখন অযত্নরক্ষিত আবর্জনার মধ্যে তাড়াবন্দী পুরানো দপ্তর হইতে এই ধরনের একখানি গ্রন্থ সম্ভব হইয়াছে তখন দ্বিতীয় ভাগও সহজেই হইতে পারিবে। দ্বিতীয় ভাগ সুতরাং উত্তরায় আরম্ভ হইয়া গেল। তবে ঐ যে তারাপীঠের বামার কথার মাঝামাঝি আসিয়া হঠাৎ প্রথম ভাগখানি শেষ হইয়াছিল তাহার বাকী অংশ হইতেই দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিতে হইল। কারণ তারাপীঠের বামার কথা তখনও অনেকটাই বাকী ছিল।

ইতিমধ্যে আনন্দবাজার, যুগান্তর, হিন্দু, হিন্দুস্থান, কৃষক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রভৃতিতে পূজার সংখ্যায় অনেকগুলি নানা স্থানের বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে বাহির হইয়া গেল ঐ তাড়াবন্দী পান্ডুলিপি হইতে। এখন, উত্তরায় যখন শেষ হইল তখন সকলগুলি মিলাইয়া অর্থাৎ পূজার বিভিন্ন সংখ্যায় যাহা বাহির হইয়াছিল সেই সকল লইয়া এই দ্বিতীয় ভাগের আয়তন প্রথম ভাগের অনুরূপ হইবে এই বিশ্বাসেই দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশের তপস্যা আরম্ভ হইল। ভাগ্যক্রমে এখন প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণও নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

এখন যখন দুইখণ্ড প্রায় একসঙ্গেই প্রকাশিত হইতে চলিল তখন শৃঙ্খলা ও ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য যদি কিছু অদল বদল করিতে হয় এই-ই তাহার উপযুক্ত অবসর। প্রথম ভাগের শেষাংশে তারাপীঠের বামার সঙ্গ-কথার কতকাংশ প্রথম ভাগে এবং বাকী অংশ দিয়া মাসিকে দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে যখন দুই ভাগই নতুন করিয়া হইতেছে তখন দুই ভাগে খানিক খানিক বিবরণ না রাখিয়া সম্পূর্ণ তারাপীঠের কথা দিয়াই দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করাই ভাল! তারপর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে যে সকল বিবরণ আছে তাহার মধ্যে কতকাংশ এমন রহিয়া গিয়াছে যাহা প্রথম ভাগের প্রথমাংশেরই বিষয় ;—এই পরিবর্তনে গ্রন্থের কোন ক্ষতি তো নয়ই বরং গুরুত্ব বাড়িয়াছে, আমার বিশ্বাস-এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভেই একটি নূতন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

৭৭ রসারোড সাউথ
কলিকাতা ৩৩।

তন্ত্রমতে সাধনের উপযোগিতা

এ কথা সবারই জানা যে, তন্ত্রের আদি-গুরু শিব। সেই সম্বন্ধে তন্ত্রের উৎপত্তি আর ভারতে দক্ষযজ্ঞের সূত্রে শিবকে আর্য্যমণ্ডলে প্রধান দেবতা বলে স্বীকৃতি এবং সর্বত্র তাঁর প্রভাবের কথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। এখন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে সাধনের কথাই আলোচনা করব।

এক কথায় তন্ত্র-ধর্ম বলতে এই বুঝতে হবে যে, শিব প্রচারিত শক্তি-উপাসনা। যোগযুক্ত সাধনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমনই একটি উদার ধর্ম যার মধ্যে আর্য্য অনার্য্য নির্বিশেষে মানুষ-সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। এই তন্ত্র-ধর্মই যথার্থ সর্বজনীন ধর্ম, যা সর্বদেশে সর্ব অবস্থায় মানুষ সমাজের উপযোগী। তাই এক সময়ে এই ধর্ম সারা ভারতেই প্রসার লাভ করেছিল। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে, বাইরে থেকে প্রবেশ-পথ যেমন চারিদিকে বন্ধ, চারিদিকেই বিধিনিষেধের কড়াক্কড়ি, এ ধর্ম ঠিক তার বিপরীত। বৈদিক আর্য্য-ধর্মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্যতীত অন্য জাতির প্রবেশাধিকার নেই। এমন কি শূদ্র এবং মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, বেদে তাদের অধিকার ছিল না ; এবং এমনই সময় শিবের প্রচারিত ধর্ম এদেশে প্রবেশ করেছিল বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদস্বরূপ এবং সর্বজনীন ব'লে।

শিব বলেন, সুস্থ সবল নীরোগ শরীর, যৌবনের উদ্যম নিয়েই ধর্মের সাধন আরম্ভ। এটি বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে, যৌবনই ধর্মের, বিশেষতঃ অধ্যাত্ম ধর্মের সাধনোপযোগী কাল, সুতরাং তন্ত্রধর্মোক্ত সাধনেরও প্রশস্ত কাল। শিবের বিচারে জাতি বলতে স্ত্রী ও পুরুষ মানবের মধ্যে এই দুই জাতি। তাছাড়া মানব সমাজের বাইরে,—পশুজাতি, পক্ষীজাতি, পতঙ্গ-জাতি, কীটজাতি, উদ্ভিদ্‌জাতি এইভাবেই সৃষ্টির মধ্যে জাতির বিচার। আর মানুষ সমাজে কর্মের তারতম্য হিসাবে যে জাতির কথা তা বৃত্তির নাম ব'লেই তার ব্যবহার। না হলে উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ এসব মানুষের অধিকারের দম্ভ। শিবের চোখে একজন চামার বা একজন এখানকার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় একই, তাদের একই আসনে বসতে হবে তাঁর কাছে গেলে।

তারপর শিবের বিচারে জীবমাত্রেই মোক্ষের অধিকারী। স্ত্রী ও পুরুষ—এই দুই পৃথক জাতি হলেও অধিকার সমান। একা স্ত্রী বা পুরুষ অর্দ্ধ বা অসম্পূর্ণ সত্তা মাত্র। একটি নারী ও একটি পুরুষ উভয়েই প্রেমে আকৃষ্ট হলে প্রণয় উৎপন্ন হয়, এই দুটি তখন সৃষ্টি-শক্তিতে সক্ষম একটি পূর্ণ সত্তা! এই দুয়ে মিলিত জীবন এবং ঐ জীবনই সাধনের অধিকারী, একা সংসার সাধন অস্বাভাবিক। একা এ সংসারে কর্মজীবন চালনা করা, আয়ত্ত করা এবং সম্পন্ন করা গার্হস্থ্য নয় ; সন্ন্যাসীর ধর্ম।

নারী ও নরের মিলিত জীবনই সংসার। যার প্রথম প্রবৃত্তি হল সৃষ্টি অর্থাৎ প্রজা সৃষ্টি। আর তার প্রধান উপযোগিতা হল শক্তি লাভ করে উচ্চ উচ্চ শক্তির বিকাশের ফলে কর্ম এবং ভোগ আর উপভোগের শেষে আত্মজ্ঞানের প্রসার ও মোক্ষ-মার্গে গতি। এটা মনে রাখতে হবে যে, সব কিছুই প্রকৃতিকে ধরে অথবা অবলম্বন করে।

তন্ত্রমতের সাধন আর পশু জীবনে ভোগ,—সরল এবং সহজ—প্রাকৃতিক নিয়মানুগ। কর্ম প্রবৃত্তি জটিলতার সৃষ্টি করে জীবের জীবনে। কারণ ঐ কর্মের, ফলাশ্রয়ে ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মেই গতি হয় নানা জটীল পথে শেষে উর্দ্ধ বা অধোগামী করে তাকে। সেইজন্যই এ ধর্মে মানুষ সংযতভাবেই ভোগের সঙ্গে সাধনটি নিয়েই থাকে, যার ফলে হয় নিবৃত্তি ; বাস্তব জ্ঞানের উন্মেষ আর যথার্থ সাধনের ফলে সে হয় মুক্তির অধিকারী। মুক্তি হল পুনঃ পুনঃ দুঃখময় জন্ম, জীবন, জরা, মৃত্যু, নানা দুঃখময় কর্ম থেকে নিবৃত্তি, নিবৃত্তিই হোলো সাধনের ফলে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থময় অনুভবের নাশ। জীবের স্বরূপ হোল সচ্চিদানন্দময় শিবঃ, এই বোধের প্রতিষ্ঠাই হোলো সাধনের ফল।

তারপর সাংখ্যের মতে এই সৃষ্টির মধ্যে যেমন প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ, পুরুষ, নিষ্ক্রিয়—সেইভাবেই শিবোক্ত তন্ত্রেও বলা হয়েছে যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধিষ্ঠাত্রী এবং চতুর্বর্গ ফলদাত্রী ঐ আদ্যাশক্তি ভগবতী স্বয়ং। আর কারো সে শক্তি নেই যাতে জীবকে মুক্তি দিতে পারে। ঐ বৈদিক পুরুষ দেবতা উপাসনা, তাও প্রকৃতি বা শক্তি উপাসনা, কারণ জীবের, অর্থাৎ মানুষের বোধে এই যে পুরুষ, আর নারী, এই দুইটি প্রকৃতি বা শক্তিই। যাকে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান বা পুরুষ, যাঁকে ঈশ্বর বলা হয় এই পার্থিব জীব পুরুষ, সত্য এক হলেও ব্যবহারে সে বস্তু মোটেই নয়, কারণ জীবের সে অনুভূতিই নেই। তাই এই পুরুষ-সংজ্ঞা একটা হেঁয়ালীর সৃষ্টি করেছে। বৈদিক দেবতা সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদিকে পুরুষ বলা হয়েছে, কিন্তু আসলে এর মূল প্রকৃতির অন্তর্গত একটি একটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থ শক্তি মাত্র। এ নিয়ে যাঁরা যতই ঝগড়া করুন, আসল প্রকৃতির এই বিশাল সৃষ্টির অন্তর্গত মানব জীবের পক্ষে ব্রহ্ম বা পুরুষ যেমন ধারণার অতীত, আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী যে মহামায়া বা মহাশক্তি তাও জীবের ধারণার অতীত।

শিব বুঝেছিলেন যে বৈদিক দেবতার উপাসনা আসলে প্রকৃতির বা শক্তিরই উপাসনা তাই তিনি ও পথে না গিয়ে একেবারে মূলা-প্রকৃতি যাঁকে দেবতারা জগদম্বা বা বিশ্বজননী বলে স্তব করতেন তাঁকেই জীবের একমাত্র ইষ্ট ব'লে তাঁরই উপাসনায় জীবকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমাদের মধ্যে এই যে নারী আর নর-বোধটি এমন একটি মিশেলি জটিল ভাব যাতে করে আমরা আসল প্রকৃতি, যিনি এই সৃষ্টির মূলে থেকে এই বিশাল বিশ্ব-জগৎকে প্রসব রক্ষা এবং পরিবর্তিত করেছেন তাঁকে আর সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই প্রকৃতির অতীত অব্যয় চেতনা বা পরমাত্মা, উভয়েরই স্বরূপ নির্দ্ধারণে চিরবঞ্চিত। শিব বলেন, তুমি প্রকৃতিজাত বলে তোমার পক্ষে প্রকৃতিকে ধরা সহজ সেইজন্য প্রকৃতির নিয়মানুগ হয়েই তোমায় ক্রম-বিকশিত হতে হবে। অন্তে সেই মূলা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হলেই তোমার মুক্তি বা পুরুষ-অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটবে।

তন্ত্র শাস্ত্রে ক্রম-বিকাশের অপূর্ব সমর্থন আছে। তন্ত্রে বিবর্তনবাদ শুধু বাদানুবাদ নয় একটি জীবন্ত সত্য। আমাদের মধ্যে অর্থাৎ এদেশের এই তিনশো তেত্রিশ জাতের মানুষসমাজের মধ্যে যাকে আমরা সর্বনিম্নস্তর বলে মনে করি—যদিও আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠিটা বড় মোটা আর এবড়ো থেবড়ো তবুও আমরা এটা বুঝতে পারি—বুদ্ধি যাদের মধ্যে বিকশিত হয়নি তাদেরই আমরা ছোট বা নিম্নস্তরের মানুষ বলি, যারা নিজের শরীর মাত্র ভাঙ্গিয়ে খায় অর্থাৎ শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরাই আমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন-

স্তর। কিন্তু যথার্থ যারা শ্রমজীবী শ্রেণীর তারাই কি সর্বনিম্নস্তর?—সহরের শ্রমজীবীরা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান। সেই যে সুদূর পল্লীর কৃষক শ্রেণী, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন সে নিজেকে কখনও সর্বনিম্নস্তরে ফেলে না—সে বলে কাওরা বাগদী মেথর ভাঙ্গি এরাই সবচেয়ে নীচ। আমি প্রাচীন কালের সমাজের নিম্ন শ্রেণীর কথা ছেড়েই দিয়েছি, কারণ এখনকার দেশ ও কালের সঙ্গে তা খাপ খাবে না। আমাদের হিসাবে এই অবধি হ'ল সমাজের সর্বনিম্নস্তরের ধারণা কিন্তু শিব বলেন, দেহাত্ম বুদ্ধি যাদের তারাই সর্বনিম্ন-স্তরের জীব। অর্থাৎ দেহটাকেই আমি সত্তা বলে যারা ধারণা করে তারাই সর্বনিম্ন শ্রেণীর জীব—পশু তার অপর নাম।

তারপর—পরমা প্রকৃতি, এই চরাচর বিশ্বে শুধু কারণ বা নিয়ন্তা নন, স্রষ্টা ও পাতাও বটেন। মানুষের মন ও বুদ্ধি যতদূর যায়, বাস্তব ছাড়িয়ে কল্পনার গতি তার যতই প্রসারিত হোক না কেন, প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়ে তার যাবার যো-টি নাই। সেই পরমগুরু শিব বুঝেছিলেন, আর্য্যদের দেবতাবাদ শেষ অবধি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রাকৃত-গণ্ডীর মধ্যেই এনে ফেলবে। সেই-জন্য তিনি একেবারে সোজা প্রকৃতিকে ধরবার সোজা কৌশলটি দিয়েছিলেন যোগশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে। যার লক্ষ্য হোল প্রকৃতির রাজ্য ছাড়িয়ে চৈতন্য রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা লাভ। কারণ আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতির হাতে জীবের মুক্তির চাবী কাঠি। তন্ত্রমতের শ্রেষ্ঠ এবং স্পষ্ট অভিব্যক্তি বিবেকানন্দের একটি লাইনের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে যা শুনলে বৈষ্ণবেরা হয়তো অশান্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু তত্ত্বতঃ ঐ একটি লাইন একখানি বিরাট মহাভারতের ভাবকে প্রকাশ করেছে। আপনারা সকলেই জানেন তাঁর কবিতা, "নাচুক তাহাতে শ্যামা", তাতে তিনি বলেছেন, "সত্য তুমি, মৃত্যুরূপা কালী;—সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছায়া"। সত্য, সত্য, সত্য, আমি ত্রিসত্য করেই বলছি, এটি উপলব্ধ সত্য। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে ভগবানের কল্পনা যতই প্রসারিত হোক, মানব মন বুদ্ধি তার মধ্যে যতটা নিরাপদ আশ্রয়লাভ করে জনম জীবন সার্থক ও ধন্য করুক না কেন কিন্তু ঐ বিশালআদ্যাশক্তির অব্যক্ত মূল ভাবটি ধরবার অধিকার না হলে কৃষ্ণের পুরুষতত্ত্ব অজ্ঞাতই থেকে যায়। কাল্পনিক কৃষ্ণ, প্রকৃতিই থেকে যান,—তাই আদ্যাশক্তিকে না ধরলে সাধনকর্ম কোন উপকারেই আসে না। আর সেটি না ধরলে জগৎ-রহস্য আত্ম-চৈতন্যের উদ্বোধনই ফাঁকা থেকে যায়। এই আবিষ্কারের জন্যই শিব জগৎ-গুরু হয়ে আছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব শিবেরই। কপিল শৈব বা শিবভক্ত এবং শিবেরই উপাসক ছিলেন।

তন্ত্রের মধ্যে শিব সেইজন্যই প্রকৃতির অনুগামী হয়েই সাধন পথে চলতে উপদেশ করেছেন যা সর্বজনীন, সহজ পন্থা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর এই তিন আদি, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের দেবতার কোন একটিকে ধরলেও সেই প্রকৃতির অংশরেই ধরা হ'ল—কারণ মানুষ মনের ধারণায় যে পুরুষ প্রকৃতি—এ আদৌ প্রকৃতিই বুঝতে হবে। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চমৎকার বিভাগ করে দেখানো হয়েছে, কেমন করে সৃষ্টিতে প্রকৃতির মধ্যে এই পঞ্চীকরণ ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছিল, যার ফলে এই বিচিত্র জীব-জগৎ প্রকাশিত অর্থাৎ সম্ভব ও সার্থক হয়েছে।

তন্ত্রের সাধনা সারা মানব সমাজ অর্থাৎ সারা জগতের অধিবাসী মানব-সমাজ নিয়ে। অতি স্থূল বুদ্ধি মানব থেকেই তার আরম্ভ। শিব বিশ্বের

কল্যাণের জন্য সর্বনিম্নস্তরের মানব থেকে শুরু করে সর্ব-উচ্চস্তরের মানব পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেছেন তাঁর প্রবর্তিত পথে। তন্ত্র-মতে মানব প্রথমে থাকে পশুধর্মী,—তারপরে হয় বীর, তারপর হয় দেবতা। শিব বলেন, তোমায় কোন দেবতার আলাদা উপাসনা করতে হবে না, তোমার ক্রমোন্নতিই তোমায় দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে প্রকৃতির অনুগামী হয়ে চললে। মানব জন্মের সার্থকতা পরমাত্মা তথা শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। এখানে এইটুকু মনে রাখলে ভাল হয় যে, বৈদিক ধর্মেও বলা হয়েছে যে, জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারে দ্বিজ,—শেষে ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ। তাই বেদান্তের যে প্রতিপাদ্য,—জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ,—তন্ত্রেও তাই জীবে শিবঃ। এসব তত্ত্বতঃ সত্য।

এইভাবে দেখা যায়, শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বে দুইই এক ; এখন বৈদিক ধর্মে শিবের প্রভাব আছে কিনা এই নিয়ে বিবাদ আছে কিন্তু যত বড় বড় বৈদান্তিক সকলের শৈব, যার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের নামটা প্রথমেই মনে আসে, কারণ তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, আর যুগাবতার বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি একের নম্বর শৈব ছিলেন,. প্রমাণ আছে।

যাই হোক—তন্ত্রে শিব বললেন, প্রকৃতি নিয়মানুগ হলে মুক্ত হওয়া যায়, যে মুক্তি জীবের একমাত্র কাম্য। এখন দেখা যাক প্রকৃতির নিয়মানুগ পন্থাটি কি? কি রকম।

আমরা তো জীব।

আগেই বলা হয়েছে যে তন্ত্রশাস্ত্রে জীব প্রথম অবস্থায় পশু। সুতরাং ঐ পশু-ধর্মের নিয়মেই তোমায় সাধনাদি আরম্ভ করতে হবে। মানুষের উপর পশু কথাটা শুনে যাঁরা দ্বিধা করবেন তাঁরা যেন নিজে নিজের ব্যক্ত এবং গোপনীয় প্রবৃত্তি ও কর্ম এবং অতীত ও বর্তমান মনোভাবগুলির উপর একটু সজাগ দৃষ্টিপাত করেন। এখনকার কথা এই যে, পঞ্চম-কার নিয়ে সাধনাকে প্রকৃতির নিয়মানুগ সাধনা বলা হয়েছে। পশ্বাচারের এই যে কয়েকটি প্রাথমিক নিয়ম তাতে নারী ব্যতীত সাধন হয় না। যেহেতু প্রথম স্তরের যে মানব তাকে শক্তি আশ্রয় করেই অগ্রসর হতে হয় আর তন্ত্রে শক্তি বলতে নারীকে বুঝতে হবে, কারণ এই যে পুরুষ জীব ইনি আধখানা নারী বা শক্তি হয়ে তার আশ্রয় স্বরূপ, অপর অর্দ্ধ কেউ না দাঁড়ালে তিনি আধখানাই থেকে যাবেন,—সৃষ্টির অধিকারী হতে পারবেন না। কর্মজগতেও ঐ অর্দ্ধাবস্থায় তিনি কোনও কর্মে যুক্ত হতে পারবেন না। একটি নর আর একটি নারী এই দুটিতে মনেপ্রাণে ঐক্যবদ্ধ হলে, অর্থাৎ প্রেমে মিলিত হলে তখনই দুজনের মনে এবং প্রাণে এক সম্পূর্ণ সত্ত্বার উপলব্ধি আসবে, যাতে করে উভয়ের অস্তিত্বই সৃষ্টি শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। যাকে ইংরাজীতে বলে ডায়নামিক পাওয়ার। তারাই বলে তারা যে শুধু স্থূল-কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তা নয়, অব্যক্ত এবং মহৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শক্তিমান হয়ে তারা জীব অর্থাৎ তাদেরই মত প্রাণ ও চৈতন্যময় জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং অধিকারী হবে। মদ্য, মাংস্য, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পাঁচটি হোল পশ্বাচারের উপকরণ। আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্পষ্ট ভাষায় এই সভ্যসমাজের মাঝে ধর্মসাধনের নামে ঐ কয়টি উপকরণের নাম শুনে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলে মহা ভুল হবে। কারণ শুধু যে প্রাচীনকালে পশ্বাচারের অধিকারীদের সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই পরম লোভনীয় স্থূল ভোগের উপকরণ নিয়ে ধর্ম সাধন আরম্ভের

উপদেশ ছিল তা নয়,—এখনও এই নিয়ে সাধনের উপযোগিতা বর্তমান সমাজে পূর্ণভাবেই আছে। আমাদের এই বর্তমান সমাজ, নানা সভ্যতার প্রভাবে সর্বদাই বহির্মুখ, এই সমাজে যথার্থ যাদের দেবচরিত্রের মানুষ বলি, সে কয়জন? তারপর মনুষ্যত্ব-প্রবল যাদের মধ্যে কর্মবুদ্ধির বিস্তার হয়েচে, জ্ঞানের বিকাশ হয়েচে এমন মানুষ যাঁরা আমাদের দেশে বা সমাজে সাধারণের লক্ষ্যস্থল তাঁদের বাদ দিলে যে বিরাট এক স্তরের অস্তিত্ব এই শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত সমাজেই আছে, তাদের পশ্বাচারের অধিকারী বলে মনে করলে কিছু ভুল হবে কি? তাঁরা যাই হোক, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত,—তাঁদের মধ্যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনে প্রবল আসক্তি থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরা সহজেই পশ্বাচার সাধনের উপযুক্ত। তাঁরা এই সাধনের পথে এলে শুধু উচ্ছৃংখল ভোগবৃত্তি নয় সঙ্গে সঙ্গে সাধন কর্মের দ্বারা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, সেইজন্য এইটিই প্রথম স্তরের জীবের প্রকৃতির নিয়মানুগ সাধন।

আমাদের সমাজে পঞ্চ ম-কারে আসক্ত জীবের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে প্রাকৃতিক নিয়মেই এখনকার দিনেও পঞ্চ ম-কার সাধনের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা দুইই আছে। তন্ত্রমতের এই প্রথম সাধনই দেখিয়ে দেবে যে এর বিকৃতটা অর্থাৎ জঙ্গল, পালা, আগাছা বাদ দিলে এই ধর্ম কত উদার যা একটি মহাজাতির সর্বস্তরের লোকের উপযোগী, আর এর প্রবর্তক যিনি, তাঁর কি অসাধারণ দূরদৃষ্টি। সমাজের কেউই এই কল্যাণময় ধর্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে না। আর এমনই একটি উদারধর্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন যার প্রভাব এবং উপযোগিতা সর্বকালেই অনুভূত হবে।

মনে-প্রাণে ঐ পঞ্চ ম-কারের উপর আসক্ত অর্থাৎ স্থূল ভোগ-প্রবৃত্তি যাঁদের প্রবল, তাঁদের আরও একটা কথা জানা উচিত। তন্ত্র বলেন, পাঁড় মাতাল অথবা অপরিমিত মদ্য মাংস ও স্ত্রী-সেবী যারা, তাদের দ্বারা তান্ত্রিক সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, কারণ ঐ পঞ্চ ম-কারের ব্যবস্থা এমনই চমৎকার বিধি-পূর্বক নিয়ন্ত্রিত, যার মধ্যে উচ্ছৃংখলতার স্থান নেই। পঞ্চ ম-কারের সমতা রাখতে হলে মাত্রার বাইরে যাওয়া চলবে না। এমনই মাত্রা নিয়মিত আছে যাতে এ সকল বস্তু ব্যবহারের ফলে সাধকের মধ্যে স্বাস্থ্যপূর্ণ একটি সৎ ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মনের সমতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ধীশক্তি প্রবল হয়। এক কথায় যাকে আমরা প্রবল মনশক্তিসম্পন্ন বলি, সাধক তাই হয়ে যান এই সাধনের নিয়মেই। কারণ সংযমই সকল সাধনার গোড়ার কথা।

প্রকৃতির নিয়মানুগ সাধনায় উচ্ছৃংখলতার সাধন নেই, আগেই বলা হয়েছে। কারণ তন্ত্রমতে প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা কোথাও নেই, সবই সুনিয়ন্ত্রিত। তবে কোন মানুষ উচ্ছৃংখল হবে, বিশেষতঃ সে যখন ধর্ম-সাধনের দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চলেছে। আরও একটু কথা আছে। এখনকার সমাজে, বিদেশীয় বা বিজাতীয় যে এই বিচিত্র শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের আমলে চলেছে—যার প্রভাবে আজ আমরা একই সমাজে থেকেও বিচ্ছিন্ন সেটা মাত্র বিবাহ আদি সংস্কারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আমাদের মনে থাকে না, একমাত্র ধন বা টাকাকে অবলম্বন করে আমরা সামাজিকভাবে অচেতন থেকে অচেতনতর এবং বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি;—অর্থকরী যা কিছু তাহাতেই বিশ্বাস আর যা কিছু মহৎ, যা কিছু জাতীয় ধর্মের বিকাশ ও আত্মশক্তি বিস্তারের পন্থা তাতে অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধচিত্ত হতেই শিখেছি;—এ শিক্ষার কোনও

উপযোগিতা এই তন্ত্র ধর্মে ত নেই-ই পরন্তু অপর কোন ধর্মেও আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং তন্ত্রে সে তিনটি স্তর, সমস্ত মানুষ সমাজকে নিয়ে স্পষ্ট-ভাবে বিভক্ত হয়েছে, তা শুধু ভারতীয় নয় ; সর্বজনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এর ভিতর সকল অবস্থাই বর্তমান। পক্ষান্তরে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তথাকথিত ভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার্য্য যাঁরা তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করে করজোড় এবং নাকে খৎ দিয়ে তাঁদেরই ভাষায় বলছি যে ব্রাহ্মণ হয়ে এই ভারতবর্ষে না জন্মালে ঐ পবিত্র ধর্মে এবং বেদে আর কারো অধিকার নেই, একথা যারা আমাদের মনের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই গেঁথে দিতে চান, তাঁদের ঐ বাণীর মধ্যে কোন সত্যই নেই, আর তার সঙ্গে সহানুভূতিও এই তন্ত্র অথবা শিবের ধর্মের মধ্যে কোথাও নেই। যা হোক এখন বোধ হয় আমাদের এটা বুঝতে ভুল হবে না যে তন্ত্রমতে প্রকৃতির নিয়মানুগ যে সাধনা তার মধ্যে জটিলতা এমন কিছুই নেই, যাতে ঐ স্তরের মানুষ যাঁরা তাঁদের ধারণার ঐ পঞ্চ উপকরণের ভেতর দিয়ে সাধনাকে অন্যায় বা কঠিন মনে হবে। প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার নিয়ম থাকার জন্যই তাঁদের ভোগের মধ্যে দিয়ে সংযমের পথে তুলে দেবে পরবর্তী সাধনের মার্গে অর্থাৎ দ্বিতীয় বা মধ্যম স্তরে উঠবার পথটা সহজই হবে। এখানে আমি প্রত্যেক উপকরণের খুঁটিনাটি নিয়ম বা মন্ত্রাদির সহায়ে কেমনভাবে পাঁচটির ব্যবহার করতে হয় যে সকল তথ্য দিতে পারবো না কারণ তাহলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কুলারে না। মোটামুটি সাধারণভাবে তন্ত্রের সাধনা সম্বন্ধে প্রথম স্তরের পর এখন দ্বিতীয় স্তরের কথাই আলোচনার বিষয় আমাদের।

তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলেন, যৌবনকালই হল ধর্মসাধনের একমাত্র প্রশস্ত কাল এবং তার আরম্ভ যৌবনের উন্মেষ থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন পশ্বাচার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা ধরুন পাঁচ ছয় বৎসরের সাধনায় তার ক্রম পরিণতি কিভাবে গতি পেতে পারে সেটা দেখা যাক। এমন অনেকেই আছেন এখানে,—পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা হয়তো মনে করেছেন যে, আমরা যখন পঞ্চ ম-কার সাধক অর্থাৎ প্রথম স্তরের নই তার উপরের লোক, অর্থাৎ তাঁরা মদ্যপান করেন না মৎস্য মাংস খান না, আবার বয়সের গুণে মৈথুনে অথবা পঞ্চম উপকরণের উপরও স্পৃহা নেই, তাঁদের আমি স্পষ্ট বলতে বাধ্য হচ্ছি যে একমাত্র হরি নাম ছাড়া তাঁদের আর কোন গতি নেই, তাঁদের তন্ত্রধর্মের মধ্যে কোনও স্থান নেই। কারণ গোড়ায়ই বলেছি সুস্থ শরীর ও সবল মনই হলো ধর্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন। যাঁরা মনে করেন, ধর্ম জিনিসটা বৃদ্ধ বয়সের তাঁদের পক্ষে কোনও ধর্ম সঙ্ঘের সভ্য হয়ে মাসিক বা বার্ষিক বা এককালীন চাঁদা দেওয়া আর শুভ ইচ্ছা পোষণ ছাড়া আর কোনও কর্তব্য নেই। তবে এতে নিরাশ হবার কিছুই নেই কারণ হাতেরপাঁচ স্বরূপ শ্রীহরির নামটি তো তাঁদের হাতেই আছে। অবশিষ্ট জীবন তাঁরা ইচ্ছামত ভগবানের চিন্তায় কাটাতে পারেন। কোন, বাধা যদি তাতে পান তো সুমুখে চেয়ে দেখলেই হবে। জীবের সকল অবস্থায় ঈশ্বর-চিন্তার পথ সর্বকালেই মুক্ত আছে, সে হিসাবে পরমা প্রকৃতি বা জগদম্বার বিধান বড়ই উদার, একথা সকলেই স্বীকার করবে। এখন যা বলছিলাম, প্রথম স্তরে সাধক পঞ্চ ম-কার নিয়ে ধরুন পাঁচ বৎসর নিয়মিত সাধনের পর দেখা গেল তিনি এতে আর সুখী নন, স্বভাবতঃই তাঁর মনে এ কথাটা জেগেছে যে এটা তাঁর কাম্য নয়। একটা সত্য মনে

রাখলেই সকল কথাই সহজ হবে যে, প্রকৃতির এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, নিত্য নিত্য একই ভোগ কস্মিনকালেও কারো রুচিকর হয় না। কাজেই পাঁচ বৎসর পরিমিত ব্যবহারের ফলে বিরাগ আসাই স্বাভাবিক। এই নিয়ে জীবন কাটানো কখনই তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ এতে স্থায়ী সুখ বা আনন্দের বা উচ্চতর শক্তি লাভের যে কামনা জাগে, তা কিন্তু পাওয়া যায় না, কাজেই তার অধিকারী হওয়া যায় না। তখন তিনি যে অবস্থা পেতে চান সেটি এক মহাশক্তির লাভের অবস্থা। তাঁর ক্ষেত্রটি এবার কমবেশী প্রস্তুত হয়েছে, মদ মাংস স্ত্রী সম্ভোগে পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষার ও প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে ঐগুলি আর তার কাছে বড় বেশী লোভের বস্তু নয়, পশ্বাচারের ফলে এখন তার বীরাচারের যোগ্যতা এসেছে। তখন স্বভাবতঃই সাধকের লোভে পড়ল শক্তিমান হওয়ার দিকে, যে শক্তির দ্বারা উচ্চ উচ্চ কর্ম এবং ভোগ এই জীবিত কালের মধ্যেই সম্ভব হতে পারে।

আচ্ছা, আমাদের মুক্তির পথে প্রধান বাধাগুলি কি কি? অর্থাৎ কোন্ কোন্ অবস্থাটা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অন্তরায় হচ্ছে যা থেকে মুক্তি পেলে আমরা স্থায়ীভাবে সুখী হতে পারি বলে মনে করি? আমাদের জীবনে সুখের মূল বাধা যেগুলি, তন্ত্রমতে তার নাম হল পাশ। আটটি পাশ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘৃণা, ভয়, লজ্জা, মান, রাগ দ্বেষ। মতান্তরে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা। শিব বলেন, এই আটটি পাশই তোমায় আত্ম-চৈতন্যবিমুখ করে রেখেছে, যার ফলে তোমার যে কতটা শক্তি তুমি জানতে পার না। এই পাশমুক্ত হলেই তুমি হবে শিব। সুতরাং যে আচার পালন বা সাধনার দ্বারা তুমি পাশ-মুক্ত হবে তার নাম বীরাচার।

এখন ধরে নেওয়া যাক যে পশ্বাচার থেকে সাধক এখন শক্তিলাভ বা আত্মশক্তি স্ফুরণের পথে এগিয়েছেন বা এগিয়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছে। আর গুরু মুখে উপদেশের দ্বারা তিনি বুঝেছেন যে এই পাশগুলি যথার্থ তাঁর শক্তি লাভের অন্তরায়। কেন ও কি ভাবের অন্তরায় সে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন এখানে নেই, শুধু মোটামুটি সাধনের কথাই এখানে বলা দরকার। প্রত্যেক পাশটি থেকে মুক্তির জন্য পৃথক পৃথক সাধনা আছে। দেখা যাক দুই একটা নিয়ে যে তন্ত্র মতে পাশ-মুক্তির সাধনা কি রকম হতে পারে। ভয় একটি প্রকাণ্ড পাশ, যার কথা এখানকার উপস্থিত কাকেও বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে না যে সেই বস্তুটি কি? কারণ শিশুকাল থেকে প্রত্যেক সংসারী ঐ ভয়ের কারণে বা পিছনে কত শক্তি বা আয়ু ক্ষয় করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঘোর অমানিশায় শ্মশানে শবের উপর আসন করে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যে সাধন আছে, যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে সাধককে এগিয়ে যেতে হয় তা শুনলে হয়তো আপনারা এখানে বসেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। এই সিদ্ধির পর সাধকের আর এ পার্থিব কোন অবস্থায়ই ভয় থাকা কি সম্ভব? এইভাবে অন্যান্য পাশমুক্তির সাধনাও আছে।

ধরুন আর একটা পাশ ঘৃণা। এই ঘৃণা এখনকার দিনে শুধু নয় সে কালেও মানুষকে মুক্ত প্রাণের আনন্দ থেকে কতটা বঞ্চিত করে রেখেছে তা একটু অবহিত হলেই বুঝতে পারবেন। আমরা যে অবস্থার লোক, সেই সমাজের আর এক জনের উপর ঘৃণা পোষণ করা কিম্বা তাকে হেয় করা, এবং নানা রকমে তারই উপকার নিয়ে তাকেই ঘৃণ্য প্রচার করা এ কিরকম ব্যবহার? আমরা সমাজে, মেলামেশার পথ বন্ধ করে, শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবিকাশের প্রতি-

বন্ধকতা সৃষ্টি করে সমাজের কাছে মহা অপরাধী হয়েই রয়েছি, যার ফলে এখন সমাজ এতটা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এটা কে না জানে? ও তো গেল মানুষ মানুষকে ঘৃণার কথা, এমন বস্তু আমাদের চারিদিকেই ছড়ানো আছে একমাত্র ঘৃণার জন্য আমরা তার পুষ্টিকর প্রভাব এবং উপকারিতা থেকে চিরবঞ্চিত। এখন টম্যাটো, চিচিঙ্গা, পেঁয়াজ, রসুন, প্রভৃতি কত কত শাক সব্জীর উপকারিতা আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমার বাড়ীতে স্ত্রী ও মায়ের কাছে তা ঘৃণার বস্তু। এইভাবে ঐ এক ঘৃণা আমাদের কত রকমে সংকীর্ণ করে রেখেছে। ঘৃণা জয় করেছেন শুধু নয় এমন কি সর্বপাশমুক্ত হলে একজন কেমন হয় তা ভাগ্যক্রমে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং তাঁর সহবাসও করেছি। তাঁর অপূর্ব ব্যবহার এখানে দীর্ঘকাল লক্ষ্য করেছি। এই গ্রন্থেরই প্রথম ভাগে তা পাবেন।

এইভাবে অষ্টপাশ মুক্ত হয়ে বীর হতে হলে যে কঠোর সাধনা দরকার তা বোধহয় আর বলতে হবে না। সিদ্ধির পর যে শক্তির অধিকারী হওয়া যায় তা প্রকাশের ভাষা নেই। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার যত কিছু বিপদ ঐ সিদ্ধির পথে, কারণ সেই মহাশক্তি বিকাশের পর, আধার যদি হীন দুর্বলচিত্ত হয় তা হলে বিভূতি লাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। সেই বিভূতিই হয় তার কাল। যদি উপযুক্ত গুরু বা উত্তরসাধকের সহায়তা না থাকে তাহলে হয়তো তার এতবড় শোচনীয় অধঃপতন হতে পারে যা দেখলে আপনারা হয়তো চোখের জল রাখতে পারবেন না। তার কতক মত দৃষ্টান্ত বামাক্ষেপার প্রসঙ্গে আছে এই গ্রন্থেই। কিন্তু আসল কথা হল, ঐ অবস্থাটা পেরিয়ে গেলেই সে দিব্যভাবের অধিকারী হয়ে যায়। দিব্যাচারের কথা বলছি, এখন।

এই যে শ্রেষ্ঠ আচার, এর মধ্যে নিয়ম পূর্বক কোন কর্মানুষ্ঠান নেই। আনুষ্ঠানিক কর্মের বাইরেই দিব্যাচার সাধন। সম্পূর্ণ মানসিক ও চৈতন্য-ঘটিত ব্যাপ্যার—যার ফলে সমাধি আসে। এ জড় সমাধি নয়। এক একটি তত্ত্বে সমাহিত হবার শক্তি আসে। এই বিশ্ব জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা তিনি জানতে ইচ্ছা হলে জানতে পারেন না।

আপনারা হয়তো নানা প্রকার আভিচারিক ক্রিয়ার কথা শুনেছেন। সে সকল যে তন্ত্রের জঞ্জাল, পালা আগাছার মত তা পূর্বেই বলেছি। ঐ সকল অভিচার, মন্ত্রশক্তির সিদ্ধি পূর্বোক্ত তান্ত্রিক আসল সাধনের আগাছা। শিব কখনও নিজে ওসকল উপদেশ করেন নি। যে কথাটা আমাদের মত একজন বুঝতে পারে, এই যে শক্তির চালাচালি যার ভয়ঙ্কর ফল দু'পক্ষকেই ভোগ করতে হয়, এ সকল ব্যাপারের কুফলের কথা আমরা যখন বুঝতে পারি এতবড় একজন ধর্মের প্রবর্তক যে তা বুঝতেন না, তা আমার মনে হয় না। বৌদ্ধ তিব্বতে যে সকল ভয়ঙ্কর শক্তি চালাচালির ব্যাপার আছে এবং পূর্বে খুব বেশীই ছিল, হয়তো সেইখানকার একশ্রেণীর কাপালিক ঐ সকল এদেশে নিয়ে আসেন যার ফলে বাঙলায় কিছুদিন তন্ত্রধর্মের সাধকদের মধ্যেও তার অনুশীলন এবং সিদ্ধি চলেছিল।

মন্ত্র নিয়ে যে শক্তির সাধন আর তাতে যে সিদ্ধি আসে সেই সিদ্ধির ফলে সমাজের অসাধারণ কল্যাণ করা যায়। শিবের যে তন্ত্রধর্ম সেটি মোটেই অভিচারের ক্রিয়া সমর্থন করে না বরং বিপরীত, অনেকস্থলে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন।

মন্ত্র যে শব্দমাত্র নয় একথা এখন কাকেও বিশ্বাস করানো অসম্ভব। তবে এটা সত্য, বিদগ্ধজনের সহজেই বোধায়ত্ত হতে পারে যে ব্যক্তিবিশেষ ঐকান্তিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা মনঃ সংযমের ফলে ঐ শব্দ-মাত্র মন্ত্রটি জাগ্রত করে অভীষ্ট ফললাভ করতে পারবেন। তার নাম মন্ত্রসিদ্ধি। মন্ত্রটি আত্মশক্তির প্রভাবে জীবন্ত অর্থাৎ চৈতন্যশক্তিমান হয়ে সিদ্ধির সহায় হয়ে থাকে।

ঐ মন্ত্রশক্তিতেই আগে ডাকিনী যোগিনী হাঁকিনী কাকিনী প্রভৃতি শক্তির মহান বিকাশ এবং সিদ্ধিলাভের ফলে সাধকের সঙ্গে এ জগতের বহুবিধ দুর্লভ বস্তুসমূহের যোগাযোগ পর্যন্ত ঘটিয়ে দিতো। যথার্থ ইচ্ছাশক্তির প্রসার কতদূর গভীর হতে পারে তা ঐ মন্ত্রসিদ্ধির অধিকারেই জানা যায়। কিন্তু যেসব শক্তি সিদ্ধির ফলে জগতের কতই না কল্যাণী হতে পারতো মানুষের দুর্বল, হীন চিত্তের ফলে তার গতি বিপরীতমুখী হয়ে মহা অকল্যাণ সাধনের পরে ভারত থেকে লোপ হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই মন্ত্রশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল আর ঐ বৌদ্ধ ধর্ম ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ থেকে তা অন্তর্হিত হয়েছে। এখন তারই ঝড়তি পড়তি কোথাও কোন শক্তিধর সংযতাত্মা সিদ্ধ যোগীর কাছে থাকতে পারে কিন্তু তাকে আয়ত্ত করে সমবেত সমাজের কল্যাণের আশা নেই।

দ্বিতীয় ভাগ

॥ ১ ॥

তারাপুর আসিতে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে যতটা, বোধ হয় রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে তার চেয়ে একটু বেশী হাঁটিতে হয়। আমি এখানে মল্লারপুর হইয়াই আসিয়াছিলাম। মাঠের পথে, অনেকটা দূর হইতে তারা-মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। তারাপুর গ্রামখানি ধানজমি হইতে অনেকটাই উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। বর্ষাকাল,--পথে কাদা হইয়াছে। গ্রামখানি বড় অপরিষ্কার,—গ্রামের মধ্যে রাস্তাটায় দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মন্দিরসংলগ্ন স্থান, ক্ষ্যাপাবাবার কুটির। শ্মশান-ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত স্থান, দ্বারকা নদী পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শ্মশানে দেখিলাম ছোট্ট ছোট্ট জাম নীচে পড়িয়া আছে, এইরূপ জামগাছ এখানে অনেক।

গিয়া উঠিলাম একেবারেই বামার কুটিরে অথবা চালাঘরের সম্মুখের চালায়। বামার ভাল নামটি বামদেব। তিনি কুটিরের বাহিরেই বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধ এবং অথর্ব অবস্থা তখন তাঁহার, বসিয়া বসিয়া যেন ঝিমাইতেছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের এক বান্ধব একবার এখানে ক্ষ্যাপার কাছে আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কাছে যেসব গল্প করিয়াছিলেন তাহাতে মানুষটিকে পিশাচ-সিদ্ধ মনে হইয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহার নিজ মুখের একটা কথা এইরূপ ;—তাঁর কাছে বসে আছি, দেখলাম শ্মশান থেকে একটা কেলে কুকুর একটুক্রো মাংস মুখে করে এলো তিনি সেটা তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিলেন, খানিকটা আবার তা থেকে ছিঁড়ে বার করে নিয়ে কুকুরটাকে খাইয়ে দিলেন, খা, খা বাবা খা, এই কথা বোলে। এখন এ সকল কথা আমার মনে ছিল ; ভাবিতেছিলাম, সত্যই কি এই মানুষটি ঐ কাজ করিয়াছিলেন ? অবশ্য পাশ-মুক্ত হইলে মানুষের মনে ঘৃণার ভাব থাকে না, কোন দ্রব্য অথবা কোন ব্যক্তি অথবা কোন অবস্থার উপর ঘৃণার ভাবটা একেবারেই লোপ পায় জানা ছিল, সেইজন্য আরও বিশেষ করিয়াই দেখিতেছিলাম, ঐ মূর্তির মধ্যে যাহা আছে বাহিরে তাহার কিছু দেখা বা বুঝা যায় কিনা। যাহা হোক,—তিনি ঝটিতি একবার চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলাম কি বিশালায়ত চক্ষু—তাহাতে লালের আভা। অবাক হইয়া দেখিতে-ছিলাম। প্রথমে প্রণাম করি নাই। দুই একজন আরো যাঁহারা সেখানে

ছিলেন, তাঁহাদের একজন বলিলেন : ইনি ক্ষ্যাপা বাবা যে, প্রণাম করলেন না।
আমি তখন উঠিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার মূর্তিতে এমন একটি আকর্ষণ আছে যাহাতে প্রণামের কথা মনেই হয় নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কোথা হতে আসা হচ্ছে বাবা।

আমি অট্টহাসের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন : ওখানে গৌরী-কান্ত ভৈরব আছে নাকি? আমি বলিলাম : নামটি তাঁর জানি না তো। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে চলিয়া গেলেন। বাবার সঙ্গে দুই একজন ভক্তও গেলেন, আমিও উঠিয়া সরোবর এবং মন্দিরাদি স্থান দেখিতে লাগিলাম।

মন্দিরটি পুরানো, বাংলার বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্য—তাহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রাচুর্য ততটা নাই, পোড়া ইটের নানাপ্রকার গড়ন আছে, মন্দিরসংলগ্ন ভোগ রান্নার স্থান, বিশাল প্রাঙ্গণ—চারিদিকেই প্রাচীর। বক্রেশ্বর কালীবাড়ীর যে ভাবের সংস্থান তারামন্দির তাহাপেক্ষা অনেক প্রাচীন, উন্নত, সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ। স্থানটি দেখিয়াই আমার প্রাণে আনন্দ হইল,—ভাবিলাম, কিছুদিন এখানে থাকিব। মন্দির পার্শ্বেই একটি ঘাট-বাঁধানো রম্য সরোবর।

একটি ব্যক্তি শ্যামবর্ণ, মধ্য আকারের, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু দুটি—নামটি তার নগেন পাণ্ডা। তিনি ঘাটের চাতালে বসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে পাণ্ডাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী, নগেন পাণ্ডা এখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বলিতে হইবে না, ইনি একজন গোঁড়া তান্ত্রিক। গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কবচ। চরস আর গাঁজাই হইল সারাদিনের চলতি নেশা। 'কারণ'টা রাত্রেই চলে। একজন যুবা, বেশ ফর্সা রং, চক্ষু দুইটি তার কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রোগা শরীর, বড় বড় চুল, অল্প গোঁফ দাড়ি—তিনি বাবার কুটীরের সব সময় সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, আবার গাঁজা ডলাই-মলাই করেন আর শেষে বাবার প্রসাদ পান।

স্নানাদি সারিয়া লইলাম। শুনিলাম, দ্বিপ্রহরের পর মা'র মন্দিরে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা। এখনও অনেক দেরী দেখিয়া শ্মশানের দিকে বেড়াইতে গেলাম। বেশ বিস্তৃত শ্মশান। তাহার মধ্যে জাম গাছই যেন বেশী। পথ হইতে নদীতীরে অনেকটা লম্বা শ্মশানভূমি। চারিদিকেই নর-কপাল ও অস্থির ছড়াছড়ি। বামার সাধন-স্থানটুকু বেশ চওড়া করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেদিনটা এইভাবে দেখাশুনা করিয়াই কাটাইলাম। রাত্রে বাবার আশ্রম-কুটীরের চালার একপার্শ্বে শয়নস্থান ঠিক করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি একপার্শ্বে আর বাবার ঘরে সেই অধ্যক্ষ যুবাটি—অপর পার্শ্বে।

সকালে বাবা পুকুরঘাটে বসিয়াছিলেন—সঙ্গে পাণ্ডাদেরও কেহ কেহ ছিলেন। শরীর খারাপ যাইতেছিল কয়দিন, আজ স্নান করিবেন। একটি শিশু বালককে যেমন করিয়া স্নান করানো হয়, বাবাকে সেইরকম সকলে মিলিয়া স্নান করাইয়া দিল। তারপর বাবা একটু ধূমপান করিলেন।

আজ সারাদিন এত বাইরের ভক্তগণের আমদানি ছিল যে একটু শান্তিতে কথা কহিতে বা তাঁহার কাছে কিছু আসল কথা শুনিতে পাই নাই।

বৈকালে একটু ফাঁক পড়িল,—বাবা তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন,—আমি গিয়া বসিলাম। নগেন পাণ্ডা ও আরও সব কে কে ছিল যেন।

একজন আসিয়া বলিল : বাবা—বাবু আইচেন যে, তাঁর মেয়্যাও আইচেন, ছেল্যাকে নিয়া আইচেন—আপনাকে দেখাতে। মন্দির-বাড়ীতে আছেন, এই আসবেন এইখানে এখনি। মেয়্যা অর্থাৎ স্ত্রী।

বাবা কিছুই বলিলেন না, না—রাম, না—গঙ্গা।

কতক্ষণ পরে একটি ভদ্রলোক সঙ্গে স্ত্রী, কোলে একটি এক বৎসরের ক্ষুদ্র রুগ্ণ শিশু সন্তান, আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

বাবা বলিলেন : তোর ছেলেকে নিয়ে এয়েছিস্ ?—কিন্তু ওরকম নিয়ে এলে হবে না, তুই ওকে আমায় দিতে পারবি ?

ভদ্রব্যক্তি বড় কাতরকণ্ঠে তাঁহার চরণের প্রান্তে মস্তক-স্পর্শ করিয়া বলিলেন : বাবা এ আপনারই সন্তান, আমার নয়, যা আপনার ইচ্ছা তাই হবে বাবা—

আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ ত বল্লি,—এখন যা বলি, তাই কর দিকি ! ছেলেটার গা থেকে সব কাপড় খুলে নে—নিয়ে ঐ শ্মশানের উপর মাটিতে ফেলে রেখে আয় গা, যা।

শুনিয়া জননী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রাণে বল ছিল, তিনি বলিলেন : তোমার কান্না কেন ? যাঁর ছেলে তিনি যেখানে রাখতে বোলবেন সেইখানেই রাখতে হবে। চলো, ওঠো—

স্নেহ-কাতরা জননী মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেন : ওখানে শেয়াল কুকুর ঘুরে বেড়াচ্চে যে—কি ক'রে ওখানে.—

স্বামী কোন কথায় কান না দিয়া—চলো চলো, ওঠো—বলিয়া সন্তানকে কোলে লইয়া চলিলেন। জননীও উঠিতেছিলেন, বাবা তাঁহাকে বলিলেন : মা, ওখানে তুই যাবি কেনে, তুই হেথা বসে থাক, বাবা আসুন, এলে যাবি গা।

কাজেই তিনি বসিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্যে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই তাঁহার স্বামী আসিলেন। তখন বাবা বলিলেন : যা তোরা এখান

হোতে চলে যা, যেয়ে মন্দিরে বোস্‌গো যা। তাঁহারা আবার বাবাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাবা, তখন তাঁহারই একজনকে বলিলেন: দেখ ত বাবা কেলোটা কোথা?

একটু উঠিয়া সে ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়া বড় গলায় 'কেলো' 'কেলো' বলিয়া ডাকিলেন, অল্পক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন—সঙ্গে এক কালো কুকুর।

কুকুরটা ভয়ানক কালো, দেশী গ্রাম্য কুকুর হিসাবে বেশ বড়, চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিতেছে। সে আসিয়া বাবার কাছে সম্মুখের পা দুটি ছড়াইয়া তাহার উপর মাথাটি রাখিয়া দিল। বাবা তাহার গায়ে হাত দিয়া একটু আদর করিলেন তারপর যেমন করিয়া আপন অনুগতজনকে আজ্ঞা করেন, সেই ভাবে বলিলেন —যা কেলো, তুই শ্মশানে ছেলেটাকে দ্যাখ গা যা। শুনিবামাত্রই কুকুরটি উঠিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল। বাবা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যে সকল ব্যক্তি ওখানে ছিলেন—তিন চারিটি লোক, একটা আতংকে সকলেই যেন অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই।

আমার একবার মনে হইল—দেখিয়া আসি শিশুটি কি ভাবে শ্মশানে পড়িয়া আছে। কিন্তু কৌতূহল থাকিলেও বিস্ময় এবং একটা আতংক মিলিয়া এমন একটি ভাবে আমায় অভিভূত করিয়াছিল, আমি উঠিতেই পারিলাম না।

দ্বিপ্রহরের পর প্রসাদ পাইবার সময় ওখানে সকলে সমবেত হইলে দেখিয়াছিলাম, সেই ভদ্র ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে একটি বিষাদের ছায়া।

আমরা প্রায় পাশাপাশি বসিয়াছিলাম, কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল। পরিচয়ে জানিলাম, কলিকাতায় থাকেন এবং রেল অফিসে কর্ম করেন, নিজ বাড়ী জিরেট বলাগড়। সন্তান হইয়া বাঁচে না, চারিটি সন্তান শিশুকালেই গিয়াছে—এইবার তাই বাবার কাছে আনিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষেই বাবার শিষ্য, সাত বৎসর। বাবা বৈকালে যাইতে বলিয়াছেন ছেলেটিকে লইয়া—

প্রায় দেড়টা নাগাৎ প্রসাদ পাওয়ার পর যখন আমি বাবার কুটীরে আসিয়া বসিলাম তখন বাবা নিজ-শয্যায় শুইয়াছিলেন, ঘুমান নাই। পাশে একজন বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি শুইয়া আছেন; দুই একটি কথা অস্পষ্ট গোঙানির মত মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিতেছিল। তাঁহার আওয়াজই ঐরূপ, অবশ্য বয়স হইয়াছিল বলিয়াও বটে, তাহার উপর দাঁতগুলি বোধ হয় বেশীর ভাগই গিয়াছে—সেইজন্য কথা কহিতে গেলে গলার স্বর ঐরূপ অস্পষ্ট হইত।

যিনি বাতাস করিতেছিলেন, তিনি নিকটেই ছিলেন—আমি ছিলাম কতকটা দূরে, বাহিরের দিকে। সেই কালো কুকুরটি ছাড়া অপর চারটি কুকুর বাবার ঘরের দরজার নিকটেই শুইয়াছিল। একটি সাদা, একটি লাল, একটি হলুদ রং, অপরটি খয়ের রং—বোধ হয় উহাদের মধ্যে সাদাটি গর্ভবতী ছিল, সে মধ্যে মধ্যে বাবার কাছে যাইতেছিল; তখন বাবা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন। কুকুরগুলির উপর বাবার অসীম স্নেহ দেখিলাম। উহাদের নাম আছে। যথা—কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি, লালি এইরূপ।

বেলা তিনটা নাগাৎ বাবা উঠিলেন,—গাঁজা চলিল, তারপর বাবা আমার দিকে দেখাইয়া বলিলেন: ওঁকে দাও।

নগেন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন: উনি এ সব খান না। বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি ব্রহ্মচারী বট!

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম: না না আমি গৃহী,—আপনাকে দর্শন করতেই এখানে এসেছি।

শুনিয়া বাবা বলিলেন: তোমার কিছু অসুখ আছে নাকি?

আমি বলিলাম: না আমার শরীরে কিছু অসুখ নেই। তবে ভবব্যাধি যদি বলেন তা আছে।

বাবা: শরীরে অসুখ-বিসুখ কিছুই নেই, তবে আমার কাছে কি করতে এয়েছ?

আমি: অসুখ কি ব্যাধি না থাকলে কি আপনার কাছে আসতে নেই?

তিনি: কৈ, কঠিন রোগ না হোলে ত কেউ আমার কাছে আসে না। ঐ দেখ না, এক মরা ছেলে নিয়ে এলো গা, বাঁচিয়ে দাও,—আমি কি করবো, তারা-মা যা করবেন, তাই হবে। আমি কি ডাক্তার বটি?

তখন দেখিলাম, বাবার ভাবটি বেশ প্রফুল্ল।

কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে গরদের জামা-চাদর-পরা মোটাসোটা একজন ধনবান ভদ্রলোক আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন।

বাবা মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিলেন: কে, অমর্ত?

হাঁ বাবা! বলিয়া তিনি আবার প্রণাম করিলেন।

মেয়্যেটি ম'রা গেছে বটে?

তিনি বলিলেন: কি আর বোলব বাবা, মার ইচ্ছা। তারপর,—অসুখের সমস্ত ইতিহাস বিবৃতি, সে কথায় আমাদের কাজ নাই।

বাবা আমাদের বড়ই সরল লোক। এতটা বয়স হইয়াছে কিন্তু গম্ভীর বলিয়া ধরিবার যো নাই। আমাদের পক্ষে তাঁর ভাষা বুঝা শক্ত। কারণ একে ত বাবা পল্লীগ্রামের মানুষ, তার উপর তাঁহার কথা সংক্ষিপ্ত—বুঝিয়া লইতে

পারি, কিন্তু ব্যাখ্যায় বড় হইয়া যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঠিক বাবার উক্তিগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া বলিবার চেষ্টাই করিতেছি।

বাবা খুব রসিক লোক, বোধ হয় তাঁর প্রত্যেক কথাই রসিকতা-মাখানো। একটা কথা বলিয়া এমন ভাবে মুখের দিকে চাহিবেন, যাহাতে কথার সহজ রহস্যটি অনুভব করা যায়—তবে তিনি গম্ভীর, নিজে যেন ধরা দিতে চান না। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যও রহস্য-মাখানো। এইভাবে তিনি কথা কহিতেন। আজ

সকালে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কিছু শুনিব বলিয়াই বাবার কাছে গিয়া বসিয়াছি। একজন নিয়তই তাঁর কাছে আছে, উঠা-বসায় সাহায্য করিতেছে। ব্যাধি তাঁর বিশেষ-কিছু আছে বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু কেমন অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন, কথা সব সময়েই চলিতেছে, মাঝে-মাঝে অতি করুণ, হৃদয়ভেদী-স্বরে, মা, কিম্বা তারা, তারা, বলিয়া ডাকিতেছেন। চক্ষু যেন জল-ভরা, রক্তবর্ণ, তাহাতে জ্যোতি। যখন আমার দিকে চাহিলেন, মনে হইল একেবারে আমাকে গ্রাস করিয়া লইলেন। একটু ভয় হয় সে চাহনি দেখিলে ;—কিন্তু কথা শুনিলে সাহস আসে।

আমার দিকে চাহিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন, বাবা, বড় ছোটবেলায় ঘর ছেড়েছ,—গিন্নিটি কি মনের মত হোলো না বুঝি ?—

আমি চুপ করিয়াই থাকিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু জবাব দিতে হইল। বলিলাম: আমি ত ঘর ছাড়ি নি।

তিনি: ঐ হোলো, বৈরিগীর খাঁচা নিয়ে ত ঘোরা-ফেরা হচ্ছে। কিছু বলিলাম না দেখিয়া তিনি নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যথা,—বেশ করে ঝেড়ে, দমভোর যৌবনটা ভোগ করে এলে ভাল হোতো বাবা, বুঝছ না! দুটি চারটি ফলও হয়ত হোতো, জীবনের-রসটা ভাল করে ভোগ করলে যোগটা ভালই হোতো তাই বলছি।

এমন সময় কলিকাতার বাবুটি তাঁর সেই রুগ্ণ সন্তানটি কোলে, প্রফুল্ল-মনে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন, পশ্চাতে স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবার সহচর সেবকও গাঁজার কলিকাটি সেই সময় লইয়া বাবার হাতে পেঁাছাইয়া দিলেন। বাবা প্রফুল্লভাব বলিলেন:—কেমন তোর ছেলে ত বাঁচল?

সে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ-গদ স্বরে বলিলেন: বাবা, এ ত আপনার, আমার ছেলে কেন বলছেন?

বাবা বলিলেন: মা-ই বাঁচিয়েছেন—আমার কি সাধ্য—ও কথা বলতে নেই। তবে তোকে ত মানুষ করতে হবে। আমি ত ওকে মানুষ করতে পারবো না। যা—ঘরে যা, যেয়ে তারা মার নামে ওকে ডাকবি। সে ব্যক্তি তখন পকেট হইতে কি একটা বস্তু তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া কি ভাবিয়া আবার রাখিয়া দিলেন, পরে বলিলেন: ও বেলা যাবো তখন আমরা, এ বেলা প্রসাদ খাবো এখানে। তবুও বাবাকে ত কিছুক্ষণ দেখতে পাবো। বাবার সঙ্গে আমাদের—

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন: সব শালা চোর এখানে,—টাকা-কড়ি দিস না, কোথায় রাখবো। তার চেয়ে কিছু মাল দিয়ে যাস্। মাল অর্থে নেশার জিনিস।

বাবা এবার কলিকাটি লইয়া টান দিলেন, একটি কেমন আওয়াজ হইল। এমন কখনও শুনি নাই। প্রসাদ লইয়া সেবক পশ্চাতে বসিয়া গেল।

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: এই দেখ কেমন গেরস্ত সংসারী, সাধনও আছে মার কৃপায় আবার সংসারী, কাজকর্মও হচ্ছে। ছাড়াছাড়ি নেই, সংসারকে ভয় নেই। এমন না হোলে মার কৃপা হবে কেন? বাবাজীর গোড়ায় গলদ।

আমি বলিলাম: খুলে বলুন, তা হোলে বুঝতে পারবো।

তিনি: ঐ ত গোড়াতেই ভয়। ঘরে থাকবো না বাইরে যাবো। শেষে ভেবেছিস্ কি ধাধায় পড়তে হবে নি? মাকে ত জানো নাই বাবা—সে কেমন মেয়ঁ্য,—দেখবে তখন বুঝবে যখন ঘোরপাক খাওয়াবেক।

আমি বলিলাম: যদি বলি মা-ই ত সব করাচ্চেন।

বাবা তখন সেই ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন: এই দেখ্ ঠ্যাঁটা,—যদি মা-ই সব করে থাকে জানছিস, তবে অত হিসাব করে সব কাজ করছিস্ কেনে? মা-কে ধরে এক জায়গা বসে থাকগা যা না।

আমার এ সময় তর্ক-বিতর্ক আনার অভিপ্রায় নয়, উদ্দেশ্য বরং সাধুসঙ্গ করা—তার ফলে যদি কিছু পাওয়া যায়। বামাক্ষেপারও শরীর খারাপ। মনে

হয় ইহার পর এক বৎসরের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন আমি কলিকাতায়। যাহা হউক এখন আর কিছু বলিলাম না।

আমার যেমন ধারণা হইয়াছিল—অন্যান্য সাধু যেমন লোক-সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, কিছু জানিতে বা বুঝিতে চাহিলে বিশেষভাবে ধরিতে হয়, বাবার সে-সব নাই। কারণ বাবার সর্বদাই শিশুর মত ভাব, বিচার-বুদ্ধি পূর্বক কিছু বলেন বা করেন তাহা বোধ হইল না। যখন তিনি কারও সঙ্গে কথা কন, সে কথার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাহা বুঝা যায় না, আর তাঁর ভাষা এমন যে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না তাহা বলিয়াছি। যাঁহারা নিয়তই তাঁহার কাছে থাকেন তাঁহারা ব্যতীত অন্যস্থানের লোক চট্ করিয়া তাঁহার কথা ধরিতে পারেন না।

ভাবিলাম, ওখানকার একজনকে না ধরিলে তাঁহার সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হইবে না। নগেন পাণ্ডা বলিয়া একজনের কথা বলিয়াছি—বাবার সঙ্গ লাভের আশায় গিয়াছি এবং আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া এখানে কিছু সাহায্যের জন্য কাল অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমার মনে হইল তাঁহার পরিচিত এবং ভক্ত-বিশেষ ব্যতীত বাবা আর কাহাকেও তেমন আমল দিবেন না। কিন্তু নগেন পাণ্ডা বলিল যে উহা ঠিক নয়, বাবার স্বভাবই ঐরূপ, তাঁহাকে জোর করিয়া না ধরিতে পারিলে, নূতন লোক হোক বা পরিচিতই হোক কেহ সহজে তাঁর কৃপা বা স্নেহ পাইতে পারে না। তারপর যে ব্যক্তি যে ভাবের, যে দলের অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোক তিনি তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেই ভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহারও করিয়া থাকেন। নগেন বলিল, যদি আমি তামাক বা গাঁজা প্রভৃতি খাইতে পারিতাম তাহা হইলে সুবিধা হইত। অর্থাৎ সেখানে চট্ করিয়া স্থান পাইতাম, বাবারও অনুগ্রহ হইত। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, উহা ঠিক নয়।

যাহা হউক, এখন নগেন পাণ্ডা বাবাকে আমার সম্বন্ধে বলিল: বাবা, ইনি আপনার কাছে কিছু শুনতে চান, সেইজন্যই এসেছেন। শুনিয়া বাবা বলিলেন: ওঃ—কথা শুনতে এসেছে? এই-ত কথা হচ্ছে, শুনে যাও,—কিছু দক্ষিণে এনেছ? বাবা রসিক লোক। দক্ষিণে অর্থাৎ গাঁজা আমি বুঝিতে পারি নাই, নগেন বুঝিয়াছিল সেইজন্য বলিল, উনি ওসব পছন্দ করেন না, তা ছাড়া উনি ছেলেমানুষ, ওঁর কাছে ওসব কিছু নাই। উনি বেদাচারী।

বাবা বলিলেন: তবে কালী বল তারা বল, বাবা! মায়ের নামই সার, আর কি করতে পারবি বল। আমরা মদ ভাং খাই আর মায়ের চরণে পড়ে থাকি, মা যা করেন। আর কিছু কথাবার্তা তো জানি না। বলিয়া একবার, তারা-মা, এমন অপূর্বভাবে বলিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। যেমন শিশু মাকে ডাকে সেইরূপ তাঁহার মধ্যে একটি জীবন্ত এবং ব্যাকুল অনুভূতি।

তারপর বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন: হ্যাঁ, বাবা, তোমার গুণের কথা ত কিছু জানলাম না।

আমি বলিলাম: আপনার কাছে এসেছি, আমাকে দয়া করুন। আমার ত গুণ এমন কিছু নাই যার কথা বলে আপনাকে খুশী করতে পারবো।

তিনি বলিলেন: তা হোক, মুখে যে গুণের কথা লেখা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বাবা, লুকালে হবেক কেনে।

সস্ত্রীক ভদ্রলোকটি শিশু-কোলে, এই সময় বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মন্দিরের দিকে গেলেন।

এমন সময় বেশ হৃষ্ট পুষ্ট শ্যামবর্ণ শরীর, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চক্ষু, উজ্জ্বল কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, লাল কাপড়-পরা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে,—এক ব্যক্তি আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিল। বাবা নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন সজীব হইয়া উঠিলেন, বলিলেন: সাঁইতে থেকে এই এলি নাকি?

সে ব্যক্তি বলিল: মজুমদার মশাইও এসেছে, দুপুরে আপনার কাছেই আসবে বলে গাঁয়ের মধ্যে গেল। কাল সারা রাত ধরেই কাজ চলেছিল—দেখছি উয়ার মনের গতিক ভাল নয়।

বাবা বলিলেন: তবে উ মরবে গা, ক্রিয়া-কর্ম না করে শুধু কারণ খেয়ে ফুর্তি করবো বল্লেই কি মার দয়া হয়,—উয়ার কথায় আর কাজ নাই,—মা বুঝবেন গা। তু একটা মায়ের নাম কর—সেই ভাল হবে।

তখন সেই ব্যক্তি বেশ সতেজ গলায় রাজা রামকৃষ্ণের একখানি গান ধরিল,—

দীন-তারিণী, দুরিতবারিণী, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।

সে গানটি এমনই মধুর—শুনিতে শুনিতে বাবার চক্ষে আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। গানের শেষ লাইনটিও মনে আছে—

বৈশেষিক বেদান্ত নাহি পেয়ে অন্ত, অনন্ত তোমায় চিনিতে পারেনি।

তারপর বাবা বলিলেন: সেইটা বল্ ত! নগেন পাণ্ডা বলিল: কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে—সেইটা? তখন তিনি সেইটি ধরলেন—

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে বিষয়-বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়া মহতত্ত্ব, ছাড়ি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে।

গানখানি শেষ হইলে গাঁজা চলিল, বাবা প্রসাদ করিলেন। বাবা দুলিতেছেন, চক্ষে ধারা, আবার টানিতেছেন,—শেষে কাশিতে-কাশিতে ছিলিমটা ভক্তের হাতে দিলেন।

নগেন পাণ্ডাও প্রসাদ পাইল, পাইয়া উঠিয়া গেল। তখন বাবার দিকে চাহিয়া একজন বলিল: আপনার কাছে আমার কথা আছে বাবা। বাবা

বলিলেনঃ বল্ কেনে। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, ভাবটা এই যে আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমি সেখানে থাকায়, তাহার কথা বলিতে আপত্তি আছে। দেখিয়া আমি তখনই নদীতীরে শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া এক জাম-গাছের তলায় বসিলাম। ভাবিতেছিলাম এখানে কি করিতে আসিলাম, কেনই-বা আসিলাম। বাবার সাঙ্গোপাঙ্গ এমনভাবে ঘিরিয়া আছেন নিরিবিলি একটু যে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিব তার যো নাই। মনটা খারাপ হইয়া গেল। এখানে আর থাকিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলঃ বাবা আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

॥ ২ ॥

অন্তরে একটু বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম হয়ত বাবার দয়া হইয়াছে। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে না বসিতেই তিনি বলিলেনঃ বাবা, মনে দুঃখ পেলে তাই ডাকলাম। তা উ শালা আমায় যে চুরির কথা বলে—সে হয়ে গেছে উ কথায় আর কাজ কি, যা হয়ে গেছে তার কথায় আবশ্যক কি আছে। তু গান করিস নাকি? *ছিচরণ তু কি বলিস?

ঐ ছিচরণই গোপনীয় কথা বলিয়া আমায় উঠাইয়া ছিল। সে ব্যক্তি সায় দিল, বলিলঃ হ্যাঁ উঁয়ার কলকাতার গান একটা হোক না।

আমি তো অবাক, শেষে অব্যাহতি পাইলাম একখানা ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া। বাবা বলিলেনঃ তোর স্বরটা নরম বটে।

ঐ ছিচরণ দেখিলাম, তখন হইতে আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বাবার সভায় গাঁজা-প্রসাদ পাইয়া ছিচরণ উঠিল, আরও দুই তিন জন উঠিল। লোক কমিয়া গেলে আমারই সুবিধা। দুজন ছাড়া আর সব যখন গেল—আমি তখন বাবার কাছ ঘেঁষিয়া পায়ে হাত দিলাম। দিবামাত্রই বাবা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেনঃ ওরে শালা পায়ে হাত দিতে হবেক নাই, তু বলনা কি বলিস। পায়ে হাত দিয়ে আমার মন ভুলাতে আইচিস্, খোসামুদ্যা!

আমি বলিলামঃ আপনি তো মনের কথা বুঝেছেন, আপনি আমায় দয়া করুন। তিনি বলিলেনঃ তু-ত এখন দুচার দিন এখানে থাকবি, একটু ঠাণ্ডা হ কেনে, তবে সব হবে যেঁয়ে। মনটা তোর ভাল বটে।

আমি বলিলামঃ আপনি আমায় ঠাণ্ডা করে দিন। আমি বড়ই চঞ্চল!

তিনিঃ আমি করলে হবেক কেনে, তু আমার কথা লিবি কেনে। তোর এখন প্রাণটা ঘুরতে চাইচে, ঘুরতেও হবেক তোরে অনেক—তা বেশ, ঘোর না দিন কত। দেখ যেঁয়ে মায়ের কাণ্ডকারখানাটা। একটু থামিয়া মৃদুকণ্ঠে আবার বলিলেন, ঠাণ্ডা হতে চাস্তো আমি যা বলি তা শুন, আমি বলি, ঘরকে যা। ঠাণ্ডা হোতে আর জায়গা কোথা, কোনখানে ঠাণ্ডা হোতে হবেক নাই। তোর মা বাবা আছে?

আমিঃ হাঁ, বাবা, মা, ঠাকুরমা, দিদিমা—

* তাহার নামটি মনে নাই, হয় শ্রীচরণ গোবিন্দ কিংবা ঐ রকম একটা কিছু হইবে। আর চুরির কথা এই যে, বাবার কিছু টাকা কিছুদিন পূর্বে চুরি হইয়া যায়—সে কথা যথাসময়ে হইবে।

তিনি: আর বলতে হবেক নাই—ঐ হয়েছে—ঘরে যেঁয়ে বাপ মায়ের চরণ পূজা করগা, তাইতেই, সব পাবি গা, সব হবে। শুনিয়া আমার মনে হইল যে আমাকে ভাগাইবার জন্য এরূপ ভাবের কথা বলিতেছেন।

আমি তখন বলিলাম: দেখুন, একটা অন্তরের কথা আজ আপনাকে বলছি। সদা সত্য কথা কহিবে, কখনও মিথ্যা বলিবে না, কাহারও কিছু চুরি করিবে না, প্রবঞ্চনা করিবে না, পিতা মাতার সেবা করিবে, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে অথবা তাঁহাদের ভগবান জানিয়া মনে-প্রাণে অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের তুষ্ট রাখিবে ইত্যাদি ভাল ভাল কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি আর নীতি-পুস্তকে পড়ে আসছি কিন্তু প্রাণ ত চায় না তাঁদের দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে। ভগবানকে দেখতে পাই না, কল্পনায় তাই হয়ত বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করি—কিন্তু বাপ-মাকে চক্ষের সামনে নানাভাবে আমাদেরই মত সহজ ভাবেই পাই বোলে হয়ত ভগবানের মত ভাবতে কোন কালেই পারলুম না। কেমন যে একটা দুর্বলতা এসে পড়ে—মনে মনে ঠিক করলেও কাজে পারি না।

তিনি বলিলেন: কেন রে—

আমি বলিলাম: বাপ-মার উপর ভগবানের ভাব এনে যে ভক্তি তা আমার আসে না। আমি তাঁদের সৎ-পুত্র হোতে পারলাম না,—আমার বাড়ী ভাল লাগে না, তাঁদের সঙ্গ ভাল লাগে না।

তিনি বললেন: হ্যাঁ দেখ আমার দিকে,—যে যেমন ছেল্যা তার বাবা-মা —ভগবানও সেই রকম দেয়। তুই ঠ্যাঁটা হয়েছিস্ তাই উঁয়ারাও ত ঐ রকম হইচে। তু যদি ভাল,—সোজা রকম মানুষ হতিস্ উঁয়ারা ভাল হোতো। আসলে তু ত ভগবান চাস না, তুই হেথা-সেথা যাবি, আর করে বেড়াবি, এখন তাই তোর মন। তা তাই কর কেনে,—তবে বাপ-মাকে ভক্তি করে করবি, তাদের দোষ দেখে তাদের অমন হেলা করবি কেনে?

আমি: আপনার কথায় এখন তাই ভাল মনে হচ্চে—কিন্তু তাঁদের ভগবান বোলে ত ভাবতে পারি না—এইটাই বড় দুঃখ যে।

তিনি: মনে জানবি বুড়া বাপ-মাকে যে খেতে না দেয়, সেবা না করে সে শালা কোন দিনও ভগবানকে পাবে নাই।

আমি: বাবা আমার কাছে খেতে পরতে চান না—সে জন্যে ভাবনা নেই কিন্তু তিনি ত আসলে আমাদের এড়িয়ে থাকতে চান।—এখন আমরা মানুষ হয়েছি, আপনি চরে খাব, তাঁর কাছে আসবো না, কোন কিছু জানাবো না এই তিনি চান। তবে আমি উপার্জন করে যদি তাঁর হাতে এনে দিতে পারি —আর তাঁর কাছে কিছু আশা না করি তা হোলে তিনি সুখী হবেন।

তিনি: আমার কথা তুই ত নিছিস না,—আমি বলি তু তাদের সেবা করবি, তাদের প্রসন্ন রাখবি। তাতেই তোর কাজ হবেক।

আমি: আমার সেবা ত তিনি চান না—

তিনি: তু বড় ঠ্যাঁটা,—তিনি চাইবে কেনে। তু আপনি করবি গা।

আমি: দেখুন, সত্যি কথা, আমার এমন প্রবল ভক্তি নেই যে তিনি না চাইলেও আমার মনের জোরে তাঁকে আমার উপর সন্তুষ্ট করে নিজের জন্ম সার্থক করি। আমার মনে হয়, এখন তাঁর কাছ থেকে তফাতে থাকলেই ভালো হয়। দূরে থেকে যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা মনে রাখতে পারি কাছে থাকলে, নানা

প্রকার ব্যবহার দেখে তা পারি না। কাজেই তাতে লাভ নেই জেনেই আমি বাইরে দূরে দূরেই থাকি।

তিনি : দেখ্ তোর যখন বিয়া হইচে তখন তোর এমনটা ভাব তাঁদের ভাল লাগে নাই। তু ঘরকে যা চলে, মায়ের চরণ ধরে পড়ে থাকগা—সেই তোর এখন কাজ। টাকা আনবি, বাপের হাতে দিবি, সংসার ধর্ম্ম করবি, তাই ভালো।

বাবা এই সব কথাই বলিতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন তাঁর কথা আমার মনে ধরিতেছে না, তখন বলিলেন :

এই দেখ্ কেনে মানুষের বুদ্ধি—আমরা মুখ্যু, জানিস কিনা, কলেজে পড়ে পণ্ডিত হই নাই, শাস্তোর পড়ি নাই, কিছু জানি নাই, বল ত, বাপ মা বেঁচে থাকতে কোথায়, কেন শাস্তোরে ঘর ছেড়ে বৈরিগী হয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে? তোরা এমনই ঠ্যাঁটা হয়েছিস, ঘরের ভগবান ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মরিস—তোর কি লাজ লাগে নাই?

আমি : দেখুন, সত্যিই আমি যে হতভাগা তাতে কোন সন্দেহ নেই,—না হ'লে বাপ মাকে ভগবান বোলে ভক্তি না করতে পেরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? সময় সময় যেন বুঝতেও পারি যে হয়ত আমি ঠিক কাজ করছি না—কিন্তু বাপের উপর ভগবান বোলে ভক্তি যদি না আসে ত কি করি,—বলে দিন আমাকে।

—কেন হয় না বল দেখি তোর,—আমি ত ছেলে-বেলা থেকে বাবা যা বলতো তাই শিরোধার্য্য করেছি। বাপে বোললে—চল গানের পালা গাইবি গা, আমি তখনি গেছি। বাপে বোললে—ও কাজ করিস না, তখনি সে কাজে গুরুজ্ঞান করিচি। (গুরুজ্ঞান অর্থাৎ অনিষ্ট জ্ঞানে পরিত্যাগ) তু-ই পারিস না কেনে?

আমি বলিলাম : আপনার মত বুদ্ধি যদি আমার থাকবে, তাহলে আমার এমন অবস্থা কেন,—আমরা বেশী বুদ্ধিমান কিনা। বাপের মধ্যে অনেক দোষ দেখতে পাই। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এইসব নিত্য নিত্য দেখে আর ভক্তি থাকে না।

—আরে তু শালা, বাপের খুব ঠেঙ্গানী খেয়েছিস বুঝি?—আমি কি ঠেঙ্গানী খাইনি মনে করেছিস?—আমিও খুব খেয়েছি, মার হাতেও ঠেঙ্গানী খেয়েছি, তাতে কি হয়, দোষ করেছিস মারবেন নাই?

আমি : ভগবানের কি অমন কাম ক্রোধ আছে, তিনি কি তাঁর সন্তানকে এমনভাবে পীড়ন করেন?

—আরে এটা বুঝিস না, বাঁকা ত্যাড়া একটা নোয়াকে সোজা করতে হলে পিটতে হয়—সোজা হোলে ত কথা ছিল না, তুই ত্যাড়া বাঁকা ছিলি, তাই ঠেঙ্গানী খেয়েছিস—ভগবান যাকে বলিস তিনি ঐ মা তারা, ওই কি মারে নি বাবা? উ-ও ত মারে সময় সময়—যখন দেখে যে না ঠ্যাঙ্গালে ছেল্যাটা সোজা হয় নাই—তখন দেয় খুব করে বসায়ে।

আপনার কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি ব্যাপার, কিন্তু তখন ওসব ভাবতে পারি নি, তাঁদের দোষ বলেই ভেবেছি।

তিনি : আমি এত কথা কইব কেনে, তুই আপনি বুঝে লে না, তোর বুঝবার ইচ্ছা থাকলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন যেঁয়ে। তুর ভগবান আর কুথা

আছে, যাদের থেকে ঐ শরীর হয়েছে তিনিই তুয়ার ভগবান! মা যিনি গভ্যে ধরেছেন তিনি ঐ মা, তাই বলি, ঘরকে চলে যা—যে"য়ে করে দেখনা কেনে, ঠিক হবেগা।

আমি: তাঁরা চান আমি চাকরী করি উপার্জন করি—তাহোলে তাঁরা সুখী হন! কিন্তু আমার যে চাকরী করতে ভাল লাগে না।

তিনি: ঐ ত গাঁয়ের কুড়ের মরণ, কেনে তু চাকরী কর না তাতে দোষ কি?

আমি: চাকরী করতে আমার ইচ্ছা যায় না, কি করি বলুন দেখি?

তিনি: বাপ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ কি, তাঁদের দ্বারা ছেল্যার কতটা ভাল হতে পারে, তার ধারণা এখনকার সন্তানদের ত নাইই, আবার বাপ মায়েরও নাই। এইকথা বলিয়া বাবা একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার বোধ হইল ইনি দেখিতেছেন, আমি তাঁহার কথা কিরূপভাবে লইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন এমনটা হোল, বলুন, —আপনার মুখে শুনলে তবে যদি বুঝতে পারি।

তিনি তখন বলিলেন: তুই ঘরকে যেয়ে তাঁদের অনুগত হয়ে ভক্তি করে দেখ্‌গো যা, তাহলে সব বুঝতে পারবি।

আমি বলিলাম: জোর করে ভক্তি করা যায় কি? আমার প্রাণ যা-চায়, তা না পেলে তাঁকে কেমন করে ভক্তি করি—মনে হয় বাল্যকাল থেকেই আমার বাবাকে যমের মত ভয় করতে শিখেছি, তাঁকে দেখলেই আমার ভয় আসে মনে, তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারি না, তিনিও আমাদের কাকেও নিজের কাছে নিয়ে দু'দণ্ড বসতে চান না। বড় হয়ে কাজের জন্য যেটুকু যাওয়া, তাঁর নিজের দরকারমত ডাকেন, সেটি হয়ে গেলেই আর যেন কোন সম্বন্ধ নেই।

তিনি সব শুনিয়া বলিলেন: দেখ্‌ আমি মুখ্যু মানুষ, বড় বড় কথা জানিনি, সোজা কথা বলি শোন্‌। তোর মধ্যে যেসব ভাল ভাল ভাব, জ্ঞান, ভক্তির এই যে সব ধারণা জন্মেছে—সেটা তুই কি করে পেলি আমায় বল দিকি?

আমি: আমার বোধ হয় আমি যেমন ভাব, সংস্কার নিয়ে জন্মেছি সেই সবই এখানে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: ওরে ঠ্যাঁটা দুষমন কোথাকার, যে তোকে ছিষ্টি করেছে সে যদি তার গুণগুলা না দিয়ে ছিষ্টি করতো তা হোলে তু কোথা পেতিস বল দিকি আমায়? তোর ভিতরে যে যে গুণ আছে বোলে গরব করিস তু—সে সবই তোর জন্মদাতার দেওয়া—না হোলে তু পাবি কুথাকে —য্যা—

আমি: তবে সে জিনিসগুলি আমি তাঁর মধ্যে আমার মনোমতভাবে দেখতে পাইনা কেন?

তিনি: তাঁর মধ্যে অবশ্যই তা আছে, তুই বুঝতে পারিস নাই, তবে তার প্রকাশের ধরণ আলাদা রকম এই যা,—এই দেখ্‌ তোর মধ্যে ভগবানে সহজ ভক্তিও আছে, আবার সন্দেহও আছে—সেইজন্যে তুই জ্ঞানের দিকটাই ভাল মনে করেছিস, আর তাই পাঁচ জায়গায় অম্বল চেকে বেড়াচ্ছিস—তোকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তোর জন্মদাতারও ভগবানে সহজ ভক্তি আছে—আবার বিচার

করতে গেলে সন্দেহ অবিশ্বাসও আছে, তবে তাই নিয়ে সে কিছু যাচাই করে নি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, যার জন্যে তোর মনের মত ভাবগুলি তার মধ্যে দেখতে পাস নাই। আর ঐ যে তোর ভয় বলছিস্, ঐ ভয়টা তাঁর পীড়নের জন্যই হোক বা রাগী স্বভাবের জন্যই হোক সেটা ত ঐ ভক্তির আর এক ভাব। ভয় দিয়ে তোর সম্বন্ধটাকে জোর করে রেখে দিয়েছে। একটু বুদ্ধি করে ঐ বাপকে ধরলেই তোর সব-কিছু হয়ে যায়—তাতে তারও কল্যাণ হয়, তোকে সৃষ্টি করা সার্থক হয়।

আমি: আমি বেশ ভালই জানি তিনি আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না। তিনি আমাদের দূরে রাখতে চান।

একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—সেটারও মানে আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি তাঁর ভাব, দয়া করে বলুন শুনি।

তিনি: তিনি গোড়া থেকে যে সব ব্যবহার করেছেন সেগুলিকে তুই অন্যায়, অত্যাচার ভেবেছিস, সেগুলা সে ত জানে, তাঁর মনে আছে, তু ত সেগুলা তাঁর অপরাধ বোলেই ধরে নিয়েছিস, মন থেকে মিটাতে পারিস নাই, সেই কারণেই ত সে আর তুর সেঁষ নিতে চায় নি। আবার এদিকে দেখ কেনে, তু যেমন তাকে ভাল দেখিস নাই, সেও ত তুকে তার মনের মত দেখে নাই, তু ত তার মনের মত হতে পারিস নাই, সে কেমন করে ঘেঁষ দিবেক তুকে? তোর দিক থেকেও তাঁকে যেমন বিচার করেছিস, তাঁর দিক থেকেও ত তোকে দেখতে হবেক। তা তুকে যদি সে না ল্যায় তু মনে কোন খোঁটা রাখিস না। সে পিতা, জন্ম দিইছে ত, তার লেগে মনে কিছু গোল রাখিস না,—

আমি বলিলাম: যদিও একটা ভয় গোড়া থেকেই আছে বটে কিন্তু তার জন্যে আমি বরং নিজেকে তাঁর কাছে অপরাধী মনে করি কারণ আমি যে ঠিক তাঁর মনের মত হোতে পারি নি সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। দুঃখ এটুকু আমার মনে বরাবরই আছে যে বাবার সঙ্গে আমার একটা প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারলো না, যা অন্য অনেকের আছে। যেখানে কোন সংসারে বাপে ছেলেতে একটা ভালবাসার, প্রেমের সম্বন্ধ দেখি, আমার প্রাণটা হু হু করে ওঠে যে, আমার জীবনে সে সুকৃতি নেই। তবে আমি এটা জানি যে, তিনি আমার মনে মনে ভাল বলেই জানেন, মুখে প্রকাশ করেন না।

তিনি: দেখ্ দেহ ফুরালে সম্বন্ধ ফুরায় নি। তু যত ভাল, যত বড় হবি সে তুর বাপ হয়েই থাকবেক, শেষ অবধি দুজনায় প্রেম না হোলে চলবে নি। তু ঠিক জানবি তার তুকে চাই, সে তুকে ভুলবেক নি। হেথায় যতটা দূরে সে থাকে, সেই পরলোকে আর তা নাই, সব সোজা হয়ে যায়। আচ্ছা, জন্মদাতার কথা ত হঁয়্যা গেল, এখন মায়ের কথা বল দেখি, তু মাকে তো পূজা করতে পারিস? মাকে তুষ্ট করলেও জগদম্বাকে পাবি।

আমি: দেখুন, মা আমার খুব ধার্মিক আর ভালমানুষ, কিন্তু আমাদের সংসারে যত কিছু অশান্তি,—তার বেশীর ভাগ যিনি সংসারের কর্তা বা গিন্নি —তাঁদের উদার ব্যবহারের অভাবে কিম্বা সংকীর্ণতার ফলেই হয়ে থাকে। মেয়েমানুষের এইসব দুর্বলতা আমরা যদি উপেক্ষা করতে পারি তা হোলেই ভাল, না হোলে আমাদেরও তার মধ্যে জড়ায়, আর দুঃখের একশেষ করে। সেই জন্যেই আমার ধারণা হয়েছে যে সংসার থেকে বেরিয়ে না গেলে, সম্বন্ধচ্ছেদ

না করলে, কোনপ্রকারে আত্মকল্যাণ নেই! বাড়ীতে আমাদের নিত্যই অশান্তি, বাড়ীতে ত থাকতে পারি না কাজেই জননীকে সেবা আমার ঘটে ওঠে না,— মায়ের উপর আমার যে ভক্তি তা মনে মনেই থাকে।

তিনি বলিলেন: সে কথা নয়, অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে ঐ মাকেই জগৎজননী ধারণা করে তারই চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারলে, তোর আর অন্য কিছুই দরকার হবে নি।

আমি: যে সব তত্ত্ব আমি জানতে চাই তা তো মায়ের কাছে পাই না, তিনি লেখাপড়া বা জ্ঞান-বিদ্যার ধার ধারেন না;—বাবাও কখন তাঁকে শিক্ষা দেন নি কিছু, কাজেই আমায় সেইজন্যে বাইরে আসতে হয়।

তিনি: যদি মনে প্রাণে ঐ মাকেই ইষ্ট বোলে বুঝতে পারিস ত ঐ থেকেই তু যা যা চাইবি সে সবই তোর মাঝে আপনি ফুটবে গা। তা তোর সে সব ত হবে না, আপনার মাকে ইষ্টদেবতা করে ধরা, এ কি সহজ কথা, এ সবার হয় কি? তাই ত এত ঘোরপাক খেতে হয়। ঘরে আছে ভগবান, তু তাকে চাবি না। তু কর কেনে যা তোর মন লাগে। হ্যাঁ দেখ্—, বাপে মায়ে মেল না হোলে সন্তান মেল হবে কি করে। বাপের এক ধাঁচা (প্রকৃতি) মায়েরও আর এক রকম, তার ফলও হবেক তেমনি।

আমি: সত্য কথা,—আমার মা বাবার কথা আমি জানি, বলতে পারি। বাবা আমার ভয়ঙ্কর বলবান, উদ্ধত-প্রকৃতি, অনাচারী (ভোগী), আর মা আমার নিরীহ, ত্যাগী, শান্ত-শিষ্ট, নিরক্ষর, শুদ্ধাচারী, পূজা-তপস্যা-পরায়ণা, ভীরু স্বভাব—

তিনি: ঐ রকমই পনের গণ্ডা এখানে, কাজেই এ ভাবের ছেল্যা মেয়্যা জন্মাচ্ছে। হ্যাঁ দেখ্, তারা মা ঐ রকম মেয়্যাঁর সাথে ঐ রকম দস্যি পুরুষ-গুলার মেল করায়েঁ মনের মত মানুষ তৈরী করেন। আমরা তাঁর খেলা কি বুঝি, তিনি কি ভাবে কি রকম মানুষ তৈরী করেন—কোন্ কাজে লাগান তা কি আমরা জানি? মা মা, তারা—বলিয়া বাবা অন্তর্ম্মুখী হইলেন।

এমন সময় বাবার পরিচারক ব্যতীত সকলেই উঠিয়া গেল। আমি আরো কাছে সরিয়া বসিলাম। বাবা স্থির নিস্পন্দ।

কতক্ষণ পর আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন: তোর ভাল হবেক, ইটা তোর উঠতি জন্ম, মা তোকে ভাল পথেই নিয়ে যাবেন। তু তোর মা বাবা হোতেই উঁঠ্‌বি গা, বাপ তোর ভৈরব বটে?

আমি: তা ত জানি না—তিনি ত মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নেন নি—তিনি বলেন, যাঁকে ভক্তি হবে, গুরু বলে মানতে ইচ্ছা হবে তাঁর দেখা পেলে মন্ত্র নেবেন। আমার বোধহয় তাঁর মন্ত্রদীক্ষার উপর বিশেষ আস্থা নেই। বিশেষত কুলগুরুর উপর তাঁর মোটেই শ্রদ্ধা নেই, আর আমারও ঠিক সেই ভাবটা এসেছে। বাবা বলেন, ভগবান সকলকার, মনে মনে ডাকলেই হোলো।

তিনি: মদ ভাঙ্গ খায় বটে?

আমি: হাঁ, ওসব যৌবনকালে খুব বেশী ছিল, এখন অন্য ভাবে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: কোন্ ঠাকুরে তাঁর মন, জানিস তু?

আমি: তা ঠিক জানি না, তবে তাঁর মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প কখনও কখনও শুনেছি—রাম, কৃষ্ণ আর শিব, এই তিনের কথাই তিনি বিশেষ

বলতেন। যখনই যার কথা বলেন আমার মনে হয় সেই তাঁর ইষ্ট, কিন্তু কাজে অনাচারী—

তিনি: হ্যাঁ হ্যাঁ, তু শালাদের আবার আচার—শক্ত মনিষ আচার মানবে কেন,—তবে গুরু না হোলে ত কুণ্ডলিনী জাগবেন নাই!

এই কুণ্ডলিনীর ব্যাপার আমায় জানিতে হইবে, এখন বোধ হয় সুযোগ উপস্থিত।

॥ ৩ ॥

পর দিন একটু সুবিধা বুঝিয়া ক্ষ্যাপার কাছে গিয়া বসিলাম, তখন সেখানে আরও দু'তিন জন উপস্থিত। বাবা রসিক লোক, একটু রসিকতা না করিয়া কথা কহিবেন না, বলিলেন: চিল পড়েছে যখন, কুটাটা না লয়ে উঠবেক্ না। ছিলিম চলিতেছে—সেটা আর না বলিলেও চলে। এখন কাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথাটা বলিলেন, আমি বুঝিলাম,—কিন্তু আর কেহ মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া—একবার আমার দিকে, একবার বাবার দিকে চাহিতে চাহিতে কত কি ভাবিতে লাগিল কে জানে!

নগেন পাণ্ডা ছিল চালাক লোক, বুঝিল আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন.—খুশী হইয়া বলিল: কেমন, এবার বাবাকে পেয়েছেন দেখি।

আমি বলিলাম: বাবা যে সদাশিব, তা কি জানেন না!

এইবার বাবা একটু চেষ্টা করিয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁর সেবক আসিয়া ধরিয়া সাহায্য করিলেন এবং চালার বাহিরে লইয়া গেলেন, দুই তিনটি কুকুরও চলিল।

জন দুই-তিন গ্রামের লোক আসিতেছিল,—পথে বাবাকে দেখিয়াই প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন: তোরা কে বটিস? তাদের মধ্যে একজন বলিল: আমরা—পলুর পাতা নিতে এসেছি গুটিপোকার লেগে, হোই ওখানে গাড়ীতে চালান দিয়েছি, বলি বাবাকে দেখ্যা আসি একবার।

ইহারা গুটিপোকার চাষ করে, ভিন্ন গ্রামে থাকে,—মধ্যে মধ্যে গুটির জন্য পলু-পাতা যোগাড় করিতে দূরে আসিতে হয়। একেবারে অনেক দিনের খোরাক যোগাড় করিয়া গো-গাড়ী বোঝাই দিয়া লইয়া যায়। সেই সময় ফিরিবার মুখে একবার বাবাকে প্রণাম করিয়া যায়। বাবা এদের ভালবাসেন, স্নেহ করেন, আর অন্তরে অন্তরে আশীর্বাদ করেন। গাঁজাটা-আসুটা সাধ্যমত সেবার জন্য তাহারা কিছু দিয়াও যায়, কারণ বাবার আশীর্বাদের ফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। তারা বলে, বাবা জেন্ত দেবতা।

বাবা এখন তাহাদের বলিলেন: দিয়্যা যা কিছু গাঁজার লেগে,—শুনিবামাত্রই তাহাদের একজন কোঁচার খুঁট খুলিয়া কিছু পয়সা,—ডবল পয়সা, আর একটা দুয়ানি মিলাইয়া চার ছয় আনা বাবার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। বাবা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন: যা, তোদের গুটি তাড়ায় পাকবে, দেখবি।

এখানে যারা বসিয়াছিল—নগেন পাণ্ডা, আর দুই একজন, তারা ত প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া গেল। আমি অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার পাশে,

কেলো, ভুলো, লালী প্রভৃতি দুই তিনটি বাবার প্রিয় ভক্ত, পচা মড়া খাইয়া আসিয়া নানা ভঙ্গিতে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সে সকল খাদ্য তাহারা খাইয়াছে, জঠরে গিয়া বিষম দ্বন্দ্ব সুরু করিয়াছে, পাশে বসিয়া নানা-প্রকার শব্দ—চোঁ-চোঁ, গোঁ-গোঁ শুনিতেছি, আর দেখিতেছি, তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে বড় ছটফট করিতেছে, বেশ বুঝা যায় একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছে।

কতক্ষণ পর বাবা আসিলেন—আমি এবার কুণ্ডলিনীতত্ত্ব শুনিবার জন্য একটু কাছে ঘেঁষিয়া কেমন করিয়া কথাটা উঠাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

বাবা বসিয়াই,—মা, মা, বলিয়া দুইবার ডাকিলেন—সেই শব্দে আমার অন্তর কেমন করিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যত কিছু সঙ্কোচ সব কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমি সুরু করিলাম:—আপনি যে কুল-কুণ্ডলিনী জাগার কথা কাল বলেছিলেন,—

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ পর বলিলেন: মা যে ঘুমিয়ে আছেন ঐ মূলাধারে, তাঁকে জাগাতে হবে নাই? সে না জাগলে কে মুক্তি দিবে—কার সাধ্য?

আমি: আপনি আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন, খুলে না বললে আমি কি করে বুঝবো বলুন,—

তিনি: ক্যানে আমি তোকে ও গুহ্য কথা বোলতে যাবো, তুই কি দীক্ষা নিবি, না তন্ত্রমতে সাধন করবি, যে জানতে চাস।

আমি: ঐ সকল গুহ্যতত্ত্ব আমার জানবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি আমায় অপাত্র মনে ক'রে না বলেন, তবে আর কি করতে পারি। আপনার কাছেই পাবো এই ভরসায় অত দূর থেকে এসেছি। যদি আপনি আমায় বুঝিয়ে দেন তবে ক্ষতি কি হবে আমি বুঝতে পারি না।

তিনি: যে সাধন-ভজন করবে না, কেবল হেথা-সেথা বেড়াবে, আর পাঁচজনের কাছে পাঁচটা শুনবে তার কাছে এ সব বল্লে নষ্ট হবে যে,—

আমি: আপনি বোলতে চান কুল-কুণ্ডলিনী কেবল তান্ত্রিকদেরই শক্তি, অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধক যাঁরা, তাঁদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নেই, না তান্ত্রিক-মতে সাধন না করলে তাদের ও শক্তি জাগবে না কখনও?

তিনি: দেখ তু চালাক বটে,—খুব বুদ্ধির কথা বোলেছিস। কুণ্ডলিনী সবারই আছে, সবারই জাগবে, তবে সাধন করলে, আর সময় হোলে। কুণ্ডলিনী না জাগলে কারো কিছুই হবে নাই। এক স্থানে, ধীর হয়ে সাধন করলে তবে সে জাগবে। আবার সাধন না করলে ঘুমাবেক।

আমি: তাই ত আমার জানতে ইচ্ছা, কেমন ব্যাপারটি, এসব আপনার কাছে শুনতেই এসেছি। শুনলে উপকার ছাড়া অপকার ত হবে না।

তিনি: তবে কিছু গাঁজা নিয়ে আয়। অমনি শুনবি নাকি?

আমি: আমার কাছে কিছু পয়সা আছে, গাঁজা ত নাই। বলিয়া চার আনা বাহির করিয়া সেবকের হাতে দিলাম। তখন তিনি বলিলেন: সরে আমার আরো কাছে আয়। যেই তিনি ঐ কথাটি বলিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। চক্ষু তাঁহার করুণায় পূর্ণ এবং অমানুষিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল, যেন অনন্ত রহস্যের আধার, এমনই বোধ হইল, আর তাহা দেখিয়া

বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম। সাহস বা শক্তি যেন সবই লোপ পাইল।

কাছে গেলে তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন: চাদর খোল্, কাপড়ের কসি আল্‌গা করে দে। সেই সব করা হইলে তিনি হাত নামাইয়া একেবারে মেরুদণ্ডের শেষ যেখানে, সেখানে আনিলেন: দেখ্ আমি বলে যাই, তুই দেখে নে,—তা হোলে সব বুঝতে পারবি।

তাঁহার স্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চে, হৃদয় এক অনির্বচনীয় ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি সহজেই অন্তর্ম্মুখী হইয়া গেল,—আমি স্থির।

শিরদাঁড়ার নীচে যেখানে শেষ গাঁট সেই অস্থির উপর একটি আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া তিনি বলিতেছেন: ওরে তোর যে সে কাজ হয়ে গেছে,—তবে শালা তুই আমার সঙ্গে চালাকী করছিস বটে? শুনিয়া একটা ভয়ের ভাব আসিল, তারপর আনন্দ হইল। আমি বলিলাম: আপনি কি বোলছেন, সত্য বলছি আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস করুন।

তিনি: দেখ, তুই জানিস আর নাই জানিস, হয়ত জানতে নাও পারিস, এখানে আমি দেখছি যে তোর পাক খুলেছে। এই এখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সাড়ে তিন পাক দেওয়া সকলকারই থাকে। মায়েব যে সংসার-গণ্ডী এই-খানেই,—এই মায়া-মমতা, অহংকারের এমন কি যত কিছু ভোগ আর স্বার্থ এইখানেই তার প্রথম গাঁট। খুব বড় রকম গাঁট, এটা শক্ত করে বাঁধা আছে। যাদের খোলে—এই ছোট্ট সংসার-গণ্ডীতে আর তারা সুখ পায় না। ছাড়িয়ে যাবার জন্যে যখন ছটফট করে তখন গুরু বা সৎপুরুষের আশ্রয় পেলে এই-খানকার গাঁট খুলতে থাকে। এখানকার পাক খুললে প্রথম লক্ষণ তার এই দেখা যায় তার ভগবানে ভক্তি হয়, এ ছোট্ট সংসার থেকে মা জগদম্বার বিরাট সংসারে প্রবেশ করতে প্রবৃত্তি হয়। আর তার প্রকৃতি পাগলের মত সেদিকে ছুটতে থাকে। সংসারের ছোট খাটো কোন জিনিসেই আর কিছমাত্র সুখ থাকে না। এমন কি মাগছেলে, ইন্দ্রিয়-সুখ পর্য্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই সময় বুঝতে হবে যে পাক খুলে সোজা হয়েছে। আর সোজা হলেই তার মুখটা উপরের দিকে ফিরে যায়; তখন উপর-মুখো চলতে থাকে।

এই যে শিরদাঁড়ার সব নীচের জায়গা, এর নাম মূলাধার-চক্র—এইখানেই গাঁট, ঐ গাঁট খুলতে বড় গোল—ওটা খুললেই কুণ্ডলিনী আর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে না, সোজা হয়ে উপরের দিকে যেতে থাকে। মা, মা, তারা—

বাবা একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোর গুরুসঙ্গ কতদিন হয়েছে রে? আমি বলিলাম: প্রায় দু বছর হোলো। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: কি রকম অবস্থায় হোলো খুলে বল্ আমাকে।

আমি সব বলিলাম: ভগবান রামকৃষ্ণের কথাই প্রথম—তিনিই আমার জীবনে সর্বপ্রথম আকর্ষণ, প্রথম গুরু,—তাঁকে স্বপ্ন দেখা, কথা শুনা, তারপরে ঘরে কিছুই ভাল না লাগা, জীবন্ত গুরু কোথায় পাবো বলিয়া নানা স্থানে সাধু-দর্শন—শেষে কলিকাতায় স্বামী পরমানন্দের সাক্ষাৎ; তাঁর আকর্ষণ; তারপর ক্রমে ক্রমে দীক্ষা ইত্যাদি।* সব শুনিয়া তিনি বলিলেন: দেখছি

* প্রথম কথা তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ।

ঐ সময়েই তোর এটা হয়েছে,—এখন ত ঊর্দ্ধগতিই দেখছি—দেখিস সাধন যেন ছাড়িস না বাবা, তা হোলে আবার দমবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা,—আপনারা বলেন যে তান্ত্রিক সাধন-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে না গেলে কুণ্ডলিনী-শক্তি না কি কারো জাগে না। একথা কি সত্যি? অন্য কোন ধর্মের সাধনে তা হবে না?

তিনি: একথা তোকে কে বোলেছে—যত শালা অওগোণ্ডর কথা। তোর খিদে যদি পায় তখন ভাত খেলে তোর যেমন পেট ভরবে, ডালরুটি খেলে কি তার চেয়ে কম পেট ভরবে? আসল কথা যার যা জোটে তার তাই খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করতে হয় ত। এখানে কত রকমের মানুষ, কত রকমের খাওয়া, যে বলে ভাত ছাড়া আর কিছুতেই পেট ভরবে না সে নিশ্চয়ই গেঁও মনিষ—ভাত ছাড়া আর কিছু খাওয়ার ধারণা নাই। তারা মা ত এই সব ছিষ্টি করেছে—যত ধর্ম সব ত তারই ছিষ্টি। যার দেশে যে রকম খাওয়া চলিত সে তাই খাবে ত, ধর্মও ত সেই রকম?

আমি বলিলাম: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বোলতেন, এমন সহজ সত্য সুমুখে থাকতে তবু ধর্ম সাধন নিয়ে এত লাঠালাঠি আমাদের এ দেশে দেখা যায়।

তিনি বলিলেন: এক রাজার রাজত্ব,—তার মন্ত্রী আছে, লেঠেল সেপাই আছে, সেনাপতি আছে, গোমস্তা. চাকরবাকর, সংসারের কত সবই আছে। আবার গুরু-পুরুত ঠাকুর-বামনও আছে। যে যা কাজ করে তার প্রকৃতি, বুদ্ধি সেই রকমই হয়ে থাকে। যারা লেঠেল—তারা লাঠিবাজিই বোঝে ভাল, তা ধর্ম নিয়েই হোক বা ঘরের মাগ, ছেলে, পাড়াপড়শি নিয়েই হোক,—ওই রকমই তাদের বুদ্ধি।

ঠিক যেন রামকৃষ্ণের কথাই শুনিতেছি। বলিলাম: এখন, তারপর বলুন।

তিনি বলিলেন: কুণ্ডলিনী জাগেন মানে মানুষের মধ্যে যত ছোট ছোট হীনভাব আছে, মন সে-সব ছেড়ে বড়র দিকে লক্ষ্য করে। কারো যোগযাগ, করো বিদ্যা, করো ধর্ম, করো ভগবান,—করো বড় বড় কর্ম যাতে অনেক মানুষের ভাল হয়, ঐ সব দিকে প্রবৃত্তি যায়। জীবের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগার প্রথম লক্ষণই হোলো যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাকে হীন. কষ্টকর, ঘেন্নার জিনিস বোলে মনে হয়। সে কিছুতেই আর সে অবস্থায় থাকতে চায় না, পারেও না; বিষম ছট্‌ফটানী আসে—বেরিয়ে যাবার জন্যে।

আমি: তারপর?

তিনি: তারপর, এই যে মেরুদণ্ড,—এর মাঝ দিয়ে পথ আছে বরাবর মাথার ভিতর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু সে-পথে কি ঐ শক্তি নাড়ী ধরে একেবারেই যাবে? তা যাবে না, গাঁট খুলে যাবার পরও আর একটা চক্র আছে, স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে তাকে—সেইখানে ঠেকে যায়।

তিনি তাঁর স্পর্শ দিয়া স্থানটি দেখাইলেন, বলিলেন: এখানে ঠেকে গেলে সাধন চাই পেরিয়ে যেতে। যার যে-পথ সেই পথে এগিয়ে যেতে চেষ্টা লাগে না? বিনা চেষ্টায় কি বস্তু লাভ হয়? যারা যোগ-ধ্যান নিয়ে থাকে তারা ঐখানে একটু কঠিন তপস্যা করে। তান্ত্রিকদের কতকগুলি প্রক্রিয়া

আছে, গুরু দেখিয়ে দেন, তাই করলে চক্র পেরিয়ে যায়। এই দেখ এইখানে মূলাধার আর ঠিক তার উপর এই স্বাধিষ্ঠান।

আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আর শরীরের মধ্যে অপূর্ব এক ভাবের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমি ঃ যারা তন্ত্রমতে সাধন করে না ?

তিনি ঃ তাদের কথা তারাই জানে। তাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে যে চেষ্টা—তাই ত সাধন। সব ধর্মেই এই ক্রম আছে, একটার পর একটা পেরিয়ে যেতে হয়,—না হোলে একেবারে হুড়মুড় করে কি যাবার যো আছে ! ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে যেতে হবে।

আমি ঃ তারপর ?

তিনি ঃ তারপর মণিপুর চক্র বোলে আর একটি গাঁট আছে। নাভির বিপরীত দিকে মেরুদণ্ড যেখানে, এই দেখ্ হেথায়—বলিয়া, সেখানে স্পর্শ করিয়া দেখাইলেন—এটি পার হোলে তখন কাজ সহজ হয়। নূতন নূতন শক্তি তার মধ্যে জাগে আর তখন মনের আনন্দে সাধক আপন পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই মণিপুর অবধিই যা কিছু স্থূল তুচ্ছ ভোগের বাধা থাকে। এই মণিপুর চক্র পর্য্যন্ত মানুষের যত ছোট ছোট ভোগ আর কামনার ভাবগুলির প্রভাব প্রবল থাকে, কিন্তু যার লক্ষ্য বড় আছে মনের জোর আছে তাকে আর ওদিকে টেনে রাখতে পারে না, তবে খুব সহজেও একে পেরিয়ে যাবার যো নাই। যারা অসাধারণ মানুষ, খুব শক্তিমান, তারা কাটিয়ে যায়। যাদের মনের জোর কম তারা এই তিনটির মধ্যে পাক খায়,—মোটের উপর লক্ষ্য যার স্থির নয়,—মন উন্নত হয়নি, তার পক্ষে এ চক্র ছাড়িয়ে উঠা কষ্টকর। এর উপরে না উঠলে কেউ মানুষ হোতে পারে না,—তন্ত্রমতে এর উপরে উঠলে তবে বীর সাধক হয়, না হোলে পশু। পশুভাব যত কিছু তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ এই তিন চক্রের মধ্যে বাঁধা থাকে।

আমি ঃ এই তিনটি হোলো কঠিন, পরমহংসদেবের কথাতেও আছে। তিনিও বলেছেন গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, সাধারণ মানুষের মন এই তিন চক্রের ভিতর ঘোরাফেরা করে, আপনার সঙ্গে তাঁর কথার মিল—

তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, হাঁ, তিনি মাকে পেয়েছেন, সিদ্ধ মনিষ, তিনি এ সব ত জানেন। যে জানে সে বলবে নি ক্যানে !

আমি বলিলাম ঃ তা আমি বলি নি, আপনি মেরুদণ্ডের দিকে ঐ স্থান-গুলি দেখিয়ে দিলেন আর তিনি বলেছেন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—তাই বলছি।

তিনি ঃ কুণ্ডলিনী শক্তির আনাগোনার পথ হোলো ঐ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে—তিনি হয়ত সাধারণ মনিষের কাছে লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি বলেই বলেছেন। আসলে গুহ্য বা লিঙ্গ বা নাভি দিয়ে নাড়ীর পথ নয়, কি রকম জানিস, এই দেখ্ হেথা। তু সহজ মনিষ নয়, শালা চালাকী করে সব জেনে লিছিস। বলিয়া স্পর্শ করিলেন—আমি অপূর্ব সুখময় অনুভূতির সঙ্গে পর পর গাঁট অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এইবার বাবা সদয় হইয়া কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব দেখাইলেন। আর এখন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োজন নাই জানিয়া সরলভাবেই বলিতেছি। আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে আগা গোড়া একটি অতি সূক্ষ্ম পথ আছে। সেই পথই প্রাণের পথ বা

নাড়ী, আমাদের প্রাণশক্তি এই পথে নিরন্তর ঊর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি করেন। অতীব সূক্ষ্ম ইহার অস্তিত্ব।

ঐ প্রাণ বায়ু নয়, বা বায়ুর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে মেরুপথে সাধারণত প্রাণের গতাগতি। গতাগতি অর্থে একবার উপর হইতে নীচে মূলাধার আবার নীচে মূলাধার হইতে শত উপরে সহস্রারে যাতায়াত চলিতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। চক্ষের পলক পড়িতে যতটা সময় আমরা হিসাব করিতে পারি, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের সুস্থ শরীরে প্রাণের যে কতবার ঊর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি হয় তাহার ধারণা করিতে পারি না। ঐরূপ ক্রিয়ারত প্রাণশক্তিকে ধরিয়া যোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। তন্ত্রে ঐ প্রাণ-শক্তিকে মা, আর ঊর্দ্ধ-অধঃ গতি-ক্রিয়াকে নৃত্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ মা নাচিতেছেন, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই। বিজ্ঞানের ভাষায়, প্রাণের স্পন্দন ইহাকেই বলে।

এখন ঐ ক্রমে প্রাণশক্তিকে ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্বনিম্নে মূলাধার, যেখানে মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্ত, ঠিক তাহার উপর একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ আছে দেখা যায়, তাহাকেই যোগশাস্ত্রে মূলাধার-চক্র বলে। নিরন্তর স্পন্দিত প্রাণশক্তি সেই পথে বাহির হইয়া গুহ্যদেশে ক্রিয়া করেন। ঐরূপে মূলাধারের কিছু উপরে লিঙ্গমূলে মেরুপথের মধ্যে আর একটি দ্বার বা অতি সূক্ষ্ম পথ—প্রাণশক্তি সেই পথে নিঃসৃত হইয়া ঐ অংশে ক্রিয়া করেন, তাহার তান্ত্রিক নাম স্বাধিষ্ঠান-চক্র। ঠিক নাভির সোজা মেরুদণ্ডের মাঝে ঐরূপ আবার একটি সূক্ষ্ম পথ, তাহাকে মণিপুর-চক্র বলে। তাহার উপর হৃদপিণ্ডের সমসূত্রে মেরুপথে অপর সূক্ষ্ম দ্বার, যাহা হইতে প্রাণশক্তি ঐস্থানে অর্থাৎ ফুসফুস ও হৃদয়ে ক্রিয়া করেন। তাহার তান্ত্রিক নাম অনাহত-চক্র, যেহেতু আমাদের ধুক্-ধুকি বা হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া শব্দময় এবং মৃত্যু অথবা নির্বিকল্প সমাধি ব্যতীত কখনও সে শব্দ-ধ্বনি বন্ধ হয় না। তাহার উপরে, কণ্ঠের সমসূত্রে যে সূক্ষ্ম পথ প্রাণশক্তি সেই পথে নির্গত হইয়া কণ্ঠে ক্রিয়া করেন,—তাহাকে বিশুদ্ধাক্ষ্য-চক্র বলে। তাহার উপর শেষ চক্র—যেখানে মেরুদণ্ড আরম্ভ, চলিত কথায় সেই স্থান ভ্রূ দুইটির মধ্যে বলিয়া নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের আরম্ভ যেখানে সেই স্থান, অতীব সূক্ষ্ম ভাবের সৃষ্টি, যেখান হইতে প্রাণক্রিয়ার আরম্ভ, তাহার নাম আজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-চক্র। তাহার উপর আর কোন চক্র বা কর্মকেন্দ্র নাই। উপরে অনন্ত ব্যোম, দেহাতিরিক্ত অখণ্ড চৈতন্য সত্তা,—সেই পরমাত্মার রাজ্য,—তাহাকে সহস্রার বলা হইয়াছে। মেরু মধ্যগত সূক্ষ্মতম প্রাণপথের কর্মকেন্দ্ররূপে যে ছয়টি চক্র উহা ভেদ হইলে আত্মা পরমাত্মায় অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দভাবে মিলিত হন, সুতরাং সৃষ্টির পারে চলিয়া যান।

এখনও এই যে মেরুদণ্ডের আরম্ভ স্থানে প্রথম চক্র যাহাকে প্রজ্ঞা চক্র বলে,—যেস্থান হইতে প্রাণশক্তির ক্রিয়া শেষপ্রান্ত মূলাধার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে, ঐ প্রজ্ঞা-চক্রই প্রাণের আরম্ভ এবং লয়ের স্থান। ঐ স্থানটি নাড়ীচক্রের মধ্যে প্রধান, মহান এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ স্থান, যেহেতু ধারণা ধ্যান তত্ত্বনির্ণয়, উচ্চ উচ্চ অনুভূতি, প্রকাশ, আবিষ্কার, মোট কথা মনুষ্যজীবনের, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, প্রেরণা প্রভৃতি

শ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ্ যাহা কিছু ঐখানেই লাভ হয়। ঐ স্থানে উন্নত জীবের তৃতীয় নয়ন প্রকাশিত হয়।

এখন গুরুকৃপায় বুঝা যাইতেছে প্রাণের স্বাভাবিক রূপটি, যাহা, অতি সূক্ষ্ম ঊর্ধ্ব-অধঃ স্পন্দনময় আর, আশীর্ষ মূলাধারাবধি স্পন্দনের অবকাশে মেরুপথে সংযুক্ত দেহযন্ত্রের ছয়টি কেন্দ্র হইতে অবিরাম নিঃসৃত প্রাণশক্তি যাহা এই স্থূল শরীরের সর্বাংশ ক্রিয়াশীল রাখিয়াছে। আরও দেখিতেছি, প্রাণের দ্বিবিধ ক্রিয়া—এক হইল—স্থূল দেহাদি চালনা, অপর চিন্তা অনুভূতি প্রভৃতি মন বুদ্ধির ক্রিয়া—এই প্রাণ দুই ভাবেই অবিরাম ক্রিয়াশীল। ছয়টি কেন্দ্রপথে প্রবাহিত হইয়া যেমন দেহের প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে—সেই প্রাণ আবার প্রজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া অন্তঃকরণের যাবতীয় ক্রিয়াও সম্পন্ন করিতেছে—এই সকল কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে—বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই। এইবার কুল-কুণ্ডলিনীর সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভূতি এবং বিচারের সময় আসিয়াছে।

বিবর্তনবাদটিকে মনুষ্য-জীবনের মধ্যে আনিয়া ধরিতে হইবে। এই বিশাল জগৎ সৃষ্টির মধ্যে প্রাণী-জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি হইল মানুষ। যেহেতু দেখা যায় মানুষই সকল ইতর জীবের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে! এই যে মানুষ বংশ, নানা ভাবের বৈচিত্র্য লইয়া জগতের সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছে,—তন্ত্রশাস্ত্রে এই মানবের পরিণতি অনুসারে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা আছে। তাহা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ প্রথমে পশু, তারপর মানুষ বা বীর—তারপর দিব্য অর্থাৎ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশু হইতে মানব-শরীরে বিবর্তনকালে সেই জীবের উন্নত প্রাণশক্তির কতকাংশ আত্মারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়—যাহা ক্রমোন্নতির ফলে (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ কর্ম জ্ঞানাদির ফলে) জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হইয়া শেষে পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পশুভাবে মানবের প্রথম অবস্থায় জীব-প্রাণের উত্তমাংশ ঐ যে আত্মা, তখন সুপ্তভাবে অর্থাৎ অবিকশিত অবস্থায় মূলাধারে বর্তমান থাকে। মূলাধার বলিতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী বা প্রাণ পথের শেষ প্রান্তে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্র বা চক্র বোঝায়। প্রাণের মধ্যস্থতায় ঐ স্থান হইতে জীবাত্মার প্রথম মানব-জীবনের কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে এবং ঐ কেন্দ্রকে মূল করিয়া জীবাত্মার সর্ববিধ গতি নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া এবং প্রাণশক্তিরূপে আত্মার আধাররূপে ঐখানে অবস্থিত বলিয়া ঐ কেন্দ্র বা চক্রকে তন্ত্রশাস্ত্রে মূলাধার বলা হইয়া থাকে।

যেমন কালের মধ্য দিয়া জীব পশু হইতে মানব হয় তেমনই কালের মধ্য দিয়া ঐ আধারভূত প্রাণশক্তির মূল যে আত্মা, মনুষ্যত্বে বিকশিত হইবার প্রতীক্ষায় থাকেন. যেমন গর্ভস্থ শিশু মায়ের উদরে বাড়িতে থাকে ঠিক তেমনি। তখন আত্মার অবিকশিত অর্থাৎ ঠিক গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা. সেইজন্য তন্ত্রের মধ্যে এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সুপ্ত বলা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে স্থূল-ভাবাপন্ন পশু-প্রকৃতির প্রথম স্তরের মানুষের ঐ সুপ্ত আত্মা প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাড়ে তিন পাক দিয়া কুণ্ডলাকারে সাপের মত মূলাধারে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকেন! এই ভাবে ভোগ ও কর্মদ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞান বা চৈতন্য শক্তির সহায়তায় তাঁহার সম্যক পুষ্টি হয় তখন সেই আত্মা বিকশিত হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে জীবাত্মা স্বরূপে প্রতিভাত হইতে ক্রমবিকাশের অবস্থায় কতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন, পরে উপযুক্তরূপে শক্তিমান হইলে

তবে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা প্রাপ্ত হন। কালের মধ্যে শক্তিতে পটু হইয়া শেষে কালাতীত হইয়া যান। প্রকৃতিই এ শক্তি যোগাইয়া তাঁহার বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকেন, সেইজন্য এক সম্পর্কে শক্তিরূপা প্রকৃতি আত্মার জননী, পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তিনি হন প্রিয়তমা। কুল-কুণ্ডলিনী জাগরণের ইহাই সার কথা। মানুষের, দেহে আত্মা বন্দি ঐ পর্যন্ত থাকে যে পর্যন্ত কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিত না হন—এটুকুও জানিয়া রাখা ভাল।

যত কিছু শিবশক্তি-রহস্য রূপকের আকারে ইহার মধ্যে আছে যাহা সহজ সত্যকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে আমাদের তাহাতে প্রয়োজন কিনা সুধীজনে ভাবিয়া দেখিবেন।

ক্ষ্যাপা বাবা বলিলেন : তু এখন যা, হজম করগা—

আমি বলিলাম : ষট্‌চক্র মধ্যে আর আর ব্যাপার যে বাকি,—বাবা,—

তিনি :—তু এখন উঠে যা তো, কাল আসবি আবার, যা। দক্ষিণা চাই, —নিয়ে আসবি দক্ষিণা, অমনি হবে না এ সব অমনি অমনি হবার নয়, জানবি।

॥ ৪ ॥

দুই দিন আর ক্ষ্যাপার কাছে আমলই পাইলাম না। নানা প্রকারের মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে,—আর সে সমাজে যে সব কথা হয়, পরস্পর যে ভাবে সম্ভাষণ চলে তাহাতে সাধুসঙ্গের আশা ক্ষীণ হইয়া যায়। বাবার কোন দিকে লক্ষ্যই নাই, আপন মনে, আপন ভাবেই সমাহিতঃ—কেবল মাঝে মাঝে, মা, মা বলিয়া ডাকেন, আর যত গ্রাম্য কথার প্রভাব ঝাড়িয়া ফেলেন।

বাবার কিছু টাকা ছিল। কিছুদিন পূর্বের কথা,—এই টাকার যে ঠিক পরিমাণ কত তা নির্ণয় করিতে পারি নাই,—তবে, ওখানকার কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তিন চার হাজার টাকা হইবে,—টাকাটার কথা, যিনি তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন—অমুক পাণ্ডা ছাড়া সম্ভবত আর কেহ জানিত না। কারণ সেই ব্যক্তি তখন বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভক্ত বা সেবক ছিল। তারপর সেই টাকা বাবা তাঁহার আশ্রমের একস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া-ছিলেন। স্থান বাবা ব্যতীত আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই ধূর্ত সেবক পাণ্ডা কোনপ্রকারে তাহা জানিতে পারে। টাকা লোভের বস্তু, বিশেষত সংসারী মানুষের পক্ষে। ইহার লোভ সামলানো খুবই শক্ত। বেচারা উহার আকর্ষণ এড়াইতে পারে নাই। পাণ্ডা ঠাকুর খুব সাহসী লোক বলিতে হইবে যেহেতু তাহার এই কাজটি একেবারেই সেখানকার লোকের কল্পনার অতীত।

একদিন সকালের দিকে ক্ষ্যাপা বাবা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন,—সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার টাকাটা কোথায় গেল! সে দিন আবার অমুক পাণ্ডা অনুপস্থিত, বাবা ঠিক বুঝিতে পারিলেন, এ কাজ তারই, —অন্য কাহারও এতটা সাহস হইবার নয়। যখন অমুক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হইল, বাবা তাহাকে বেশ শান্তভাবে, পিঠে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন : টাকাটা বার কোরে দে, তোর ভালো হবে। কিন্তু যে ভালোটা সম্প্রতি হস্তগত, তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রকমের ভালোর গুরুত্ব বুঝা সকলের ধাতে সয়না, বিশেষত তার মত এক পাকা সংসারী মানুষের। কাজেই

সে ব্যক্তি তখন, বাবার টাকা হারাইয়াছে শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতেই পড়িল। তখন বাবার বুঝি তাহাকে একটু জব্দ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি থানা পুলিশ করিলেন। শেষে আদালতেও গড়াইল। তারপর যখন, তাঁহার কাহাকে সন্দেহ হয় জিজ্ঞাসা করা হইল, বিচারকের কাছে বাবা নিঃসংকোচে তখন সেই অমুকের নাম বলিয়া শেষে জানাইলেন—সে ব্যতীত আর কেহ একাজ করিতে পারে না, কারণ কেবল সেইই এটা জানিত আর কেহই ইহার কথা জানে না।

তারপর যখন সে ব্যক্তি দেখিল আর রক্ষা নাই, তখন যা হইয়া থাকে,—বাবার পায়ে জড়াইয়া কাঁদা-কাটা করিল।—বাবাও জল হইয়া গেলেন, বলিলেন: আগে বলিস নাই কেনে? বাবা শেষে তাহাকে এই দণ্ডদান করিলেন যে তাঁহার আশ্রমে সে আর যেন না আসে। দিন কতক দণ্ড ভোগের পর সকলে দেখিতে পাইল তাহার হাঁপানীর অসুখ হইয়াছে—আর সে বাবার আশ্রমের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আবার ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলেও তাহার কিছু সুবিধা হইল না, অসুখও সারিল না।

আমি যখন যাই তাহাকে প্রত্যহই বাবার দরবারে হাজির দেখিতাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বাবার সঙ্গে কথা কহিতেও দেখিতাম কিন্তু বাবার তেমন স্নেহের প্রকাশ দেখি নাই।

সেই অবধি বাবা, কাহারো নিকট কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, ঐ অর্থ যে অনর্থ,—দেখিস না?

যে ব্যক্তির কাছে এই সকল শুনিলাম সে বলিল: আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি সাধু লোক, মার কৃপায় কিছুরই অভাব নাই—আপনি কেন টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন? তাহাতে বাবা বলিলেন: ও সব ঐ বেটি মায়েরই ঘটাঘটি জানিস না,—টাকাটা আপনিই এলো, ভাবলাম এখন রাখি যখন কারো কাজে লাগবে তখন দেওয়া যাবে। তা হোলো ভালো, যার কাজে লাগলো সে মনিষটাকেও চেনা গেল। মায়ের টাকা, তিনিই ওটার ব্যবস্থা করলেন যেঁয়ে।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—

দুইটি দিন কাটাইয়া বাবা তৃতীয় দিনে সদয় হইলেন, আমিও কাছ ঘেঁষিয়া বসিলাম। আজ এখন আমি তাঁকে ধরিয়া বসিলাম,—আপনি খুলে বলুন যে সকলকারই কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগে কি না; বিনা সাধনে জাগে কিম্বা এই জাগার জন্য বিশেষ সাধনের প্রয়োজন হয়?

বাবা বলিলেন: যারা তান্ত্রিক, এই ধর্ম আশ্রয় করেছে, দীক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম সাধনও হোলো কুণ্ডলিনী জাগা নিয়ে। সবার গোড়াও বটে সবার শেষও বটে।

আমি: যারা অন্য ধর্মের লোক,—

তিনি: তাদের ধর্মের মধ্যেও এই কুণ্ডলিনী জাগাবার সাধন আছে, হয়ত তার চেহারা একটু আলাদা, কিন্তু সব-কিছু সাধনের গোড়ার কথাই হোলো ঐ কুণ্ডলিনী, ও না জাগলে কিছুই হবে নাই।

আসল কথা এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে শক্তি সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ গতানুগতিক ভাবের ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে প্রেরণা জোগাইয়া উচ্চতর জীবনপথে পরিচালিত করে তাহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। সে শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, পরে দেশ-কাল ও পাত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত হয়। ক্ষ্যাপা বাবা বলেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী আর যৌবন এই দুইটির সঙ্গে ঐ শক্তি জাগরণের প্রধান সম্বন্ধ। এই জন্য তন্ত্রোক্ত বামমার্গের সাধনে ঐ দুইটিই প্রধান। অনেকে বলেন, এই বামা ক্ষ্যাপা দক্ষিণ-মার্গের সাধক। এখন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে বহুকাল ইঁনি বামাচারী অর্থাৎ ভৈরবী লইয়া সাধন করিয়াছেন, এখানকার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি। নগেন পাণ্ডা বাবার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে অনেককাল কাটাইয়াছিলেন—তাহার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহা যথাসময়ে বলিব।

সাধারণত তন্ত্রের মধ্যে সাধনের দুইটি পথ,—বামমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। এই সাধন, দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে সহজ নিয়মেই বাঁধা। যখন তন্ত্রধর্ম এদেশে প্রবল ছিল তখন ঐ সকল সহজ প্রণালীর সাধন কতকটা সম্ভব হইত এখন কিন্তু সম্ভব নহে। এখনকার সমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও ভুল হয় না। যে ভাবে এখনকার শিক্ষা-দীক্ষা চলিতেছে তাহাতে সাধারণ দেশবাসী-জনের ও-ভাবে বামমার্গে সাধন চলিতেই পারে না। কারণ সমাজের যে অবস্থায় ইহা আচরণীয়—সে অবস্থায় সাধারণ-ভাবে প্রত্যেক নরনারীর নিজ নিজ জীবন-পথ নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। কোনও এক বিশিষ্ট ধারায় জীবনযাপনপ্রণালীর প্রভাব ইহার মধ্যে থাকিলে সাধনে সহজেই বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কারণ আসল তন্ত্রে, স্ত্রী-পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহা হিন্দু বিধি-নিয়মের বহির্ভূত। সেই কারণে আরও হিন্দুপ্রধান ভারতে তন্ত্রধর্মের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মের একটা আপষ হইতে পারিয়াছিল, পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিকাশ ঘটে নাই। সেকালে যাহা কিছু তন্ত্রোক্ত ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল—তাহা হিন্দু সমাজের বাহিরেই ঘটিয়াছিল। যাহা হউক কথা এই যে,—বামার কথা শুনিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ব্যাপারেই এখন আমার ধারণার মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইল তাহা এই যে,—যখন কারো জীবন আর কিছুতেই গতানুগতিকভাবে বন্ধ থাকিতে চায় না—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি ও স্থূল স্বার্থময় ভোগের মধ্যে তৃপ্তি পায় না তখনই তার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন। জাগরণের লক্ষণই হইল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মনের ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন—একথা পূর্বেই জানা গিয়াছে। এখন, সকল জাতির, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অন্তরক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটে তাহা জানা গেল। এই নিয়মেই মানুষ পশুভাবের প্রভাব ছাড়াইয়া—মনোবুদ্ধি-প্রধান হইয়া ক্রমে উচ্চ উচ্চ ভাবানুরূপ কর্মে অগ্রসর হয়। এই রূপে সে গুরুভাবে পেঁছায় এবং বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইহাই জগদম্বার সনাতন নিয়ম,—এই নিয়মের মধ্য দিয়া পার্থিব সকল জীবের গতিই নির্দিষ্ট। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী জাগরণ বৈজ্ঞানিক সত্য, সর্বকালে, সর্বদেশে মানুষ সমাজের-অন্তরক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল—ব্যষ্টিতেও যেমন ইহার ব্যতিক্রম হয় না, সমষ্টিতেও তাই। তবে সমষ্টির কথা বহুদূর।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই কথা দুইটি ব্যাপারকে সহজ করিবার জন্য আমিই লাগাইয়াছি—বাবা ও-কথা দুইটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি ভাবের মুখে বলিয়াছিলেন, একজন মানিষের যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে তেমনি মানুষ-গোষ্ঠির ভিতরও জাগে, তবে তখন সত্যযুগ আসে। ব্যাপারটি পরিষ্কার করিতেছি। বাবার কথা সাধারণ লোকে কিভাবে লইত তাহা আমি জানি না,

কারণ সাধারণ লোকে তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াই যে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে বা ধরিতে পারিবে তাহা আমার মনে হয় না। তাঁহার কথা প্রথমটা গ্রাম্য ভাষার সহজ সরল প্রকাশ বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু সেভাবে শুনিলে সাধারণে কেহই বোধ করি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর তাহা ছাড়া, তাঁহার কথার আক্ষরিক অনুসরণও খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষত যখন কোন বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা কন ; যাহা তিনি প্রায়ই করেন না। যেভাবে আমি (সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই) তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়াছিলাম—কদাচ কেহ এরূপ যোগাযোগ ঘটাইতে পারিয়াছেন। একথা তিনিই আমাকে কয়েকবার বলিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন সমষ্টির কথা এই যে,—

মানুষ প্রত্যেকেই ভিন্ন প্রকৃতির—প্রত্যেক জনই আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে কতকটা মিলে-মিশে থাকে তো? প্রত্যেকেরই একটি আলাদা শরীর, নাড়ী (সূক্ষ্ম শক্তি এবং প্রাণের যাতায়াতের পথকে তন্ত্রে নাড়ী বলে),—প্রাণশক্তি, বুদ্ধি, মন, আত্মা এইসব নিয়েই একজন মানুষ, তেমনি এই পৃথিবী জুড়ে একটি শরীর আছে আর সেই বিরাট শরীরেরও ঐসব নাড়ী, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা আছে, আমরা জগতের জীবকোটি তার মধ্যেই আছি। সাধারণ মানুষ যারা পশুত্ব নিয়ে আছে তারা এর কিছুই জানে না, যারা মানুষ বা বীর হয়েছে তারা আভাস মাত্র পায়, যারা দিব্যভাবে গিয়েছে তারা জানতে পারে, যারা একেবারে পাশমুক্ত হয়েছে তারাই প্রত্যক্ষ করে। এক সময় মায়ের ইচ্ছায় এখানকার মানুষগোষ্ঠির ভিতর কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, তখনই সত্যযুগের পালা পড়ে।

অর্থাৎ তখন এই হয় যে মানুষ-সমাজে তুচ্ছ স্থূল-ভোগাদির প্রভাব ছাড়াইয়া একটি বিরাট চৈতন্যের প্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহাকে সত্য-যুগের আবির্ভাব বলিতে হয়। যে যুগে মানবসমাজ আত্ম-তত্ত্বে অথবা ধর্মের চরম অনুভূতিতে মুখ্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকে সেই ত সত্যযুগ? যে যুগের ধর্ম, কর্ম, তপঃ, আচার সবই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দমুখী হইয়া গতিমান—সেই যুগই ত সত্যযুগ?

এখন কথা হইল, একজনের মধ্যে কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী জাগেন এই কথা লইয়া আজ অনেক কথা বলিলেন, তাহা বিশদ ভাবেই বলিতেছি। উত্তরে—তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ অধিকারী না হইলে কাহারও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে না, মূলাধারে ঘুমাইয়াই থাকে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনায় বলিলেন,—সকলকার জীবনে একবার ঐ শক্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু আবার ঘুমাইয়া পড়ে। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি জাগে তাহাই ছিল প্রশ্ন। এখন ইহাও জানিয়া রাখা ভাল এ ব্যাপারে তথাকথিত বিদ্বান মূর্খে ভেদ নাই অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যার স্থান নাই।

তিনি বলেন,—মানুষের যখন যৌবন আসে, সহজ ভাবেই তখন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য প্রাণ ছটফট করে। তারপর যখন তাদের মিলন হয়, ভালবাসা সহজভাবেই তাদের প্রাণের মধ্যে বিকশিত হয়—নাম তার প্রেম, প্রণয় এইসব, তখন তাদের জীবনে যে আনন্দ তা হিসাব করবার জিনিস নয়—তখনই কুণ্ডলিনী জাগেন। এই গেল স্বাভাবিকভাবে জাগরণের কথা—তারপর কিলিয়ে

কাঁঠাল পাকানোর মত কেউ কেউ আবার অল্পবয়স থেকেই অর্থাৎ যৌবন আসবার পূর্ব থেকেই ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ পাবার জন্যে লালায়, তারপর যৌবনের মধ্যে এসেও নানা উপায়ে লালসা মেটাবার চেষ্টা করে এমনও ত দেখা যায়,—তাদের কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে না। তাদের চঞ্চল চিত্তের মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখটুকু ছাড়া আর কিছুতেই লক্ষ্য থাকে না বলে তাদের অধোগতিই হয়ে পড়া স্বাভাবিক। যৌবন-বিকাশের সঙ্গে যাদের জাতীয়-সংস্কার অনুযায়ী সামাজিক প্রথায় বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিলন ঘটে, তাদের জীবনের মধ্যে যে আনন্দ, যে সার্থকতা বা যে বস্তু লাভ হয়, সে জিনিস ঐ লম্পটদের ত হোতে পারেই না। তাদের হয় কি, বেশী দিন ইন্দ্রিয় সুখকেই প্রবলভাবে ধরে থাকলে সামাজিক ন্যায় ধর্ম না মেনে কেবল ঐ একটা জানোয়ারী সুখের আস্বাদন করতে করতে প্রতিক্রিয়ার আবর্তে পড়ে যায়—সে সব লোকের যৌবনের শেষের দিকে একটা বৈরাগ্য আসে,—ঐ সময়েই কুণ্ডলিনী জেগে উঠেন।

আমি বলিলাম ঃ যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, যারা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় বললেন, তাদের ঐ অবস্থায় অনাচারের ফলে তাদের কুণ্ডলিনী শক্তি তখন কিভাবে কিরূপ অবস্থায় থাকেন ?

আমার এই কূট প্রশ্নটি শুনিয়াই তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন ঃ তাতে তোর কাজ কি রে শালা, ও-সব ব্যাজার কথা বলিস কেনে ? ওতে তোর লাভ কি ?

আমি তখন মিনতি করিয়াই বলিলাম ঃ দেখুন, আমরা গোড়া থেকেই সকলে সাধু প্রকৃতির মানুষ নয়, যৌবনের আগে স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু কিছু অন্যায় যে করি নি তা সাহস করে বলতে পারি না। আর এখনকার দিনে যে প্রকৃতির নিয়মেই আমাদের সকলকার যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হয়ে প্রেমানন্দে জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের যোগাযোগ ঘটছে তা নয়—সেই জন্যেই জানতে ইচ্ছা করে—

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ সত্য করে বল দিকি তোর কত বয়সে রসবোধ হয়েছিল ?

আমি বলিলাম ঃ বোধহয় নয়-দশ বছর বয়স থেকেই নারী রূপের প্রভাব, দেখাশুনায় অনুভব করেছি—

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তার আগে ?

আমি ঃ তার আগে মা, মাসিমা, দিদিমা, ঠাকুরমাদের মুখে রূপকথার গল্পে নানা-প্রকার বর্ণনায়, নায়ক-নায়িকাদের মিলন-বিরহের ব্যাপারে বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি মনে হয়। কোন কোন রূপবতী, দীপ্তিময়ী কিশোরীর রূপ, তাদের লাবণ্য মনকে আকর্ষণ করতো, তাতে মনের মধ্যে একটা অস্ফুট বেদনা অনুভব করতাম—এসব এখনো মনে আছে।

তিনি ঃ আচ্ছা আরও আগে, কত ছোট বয়সের কথা মনে আছে বলতে পারিস ?

আমি ঃ বোধহয় যখন আমার বয়স দু'বৎসর তখন আমার শরীরের উপর ভয়ানক একটা আঘাত লাগে—তখন থেকেই বোধহয় আমার সব কথাই মনে আছে।

তিনি ঃ দেখ্, শিশুকাল থেকেই যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঐ রসানভূতি

জাগে, তার বেশীর ভাগ কারণ মেয়েদের গায়ের গন্ধ, স্নেহবশে কোলে নিয়ে টেপাটেপি, চুমু খাওয়া, বুকে নেওয়া, নানারকমের কাতুকুতু দেওয়া ইত্যাদি। শিশু-ছেলে নিয়ে অসংযত যত কিছু আদর, আত্মীয়া মেয়েমহলে ঘটে থাকে আমাদের বাঙ্গালার প্রত্যেক সংসারে বিশেষত অ-শিক্ষিত মূর্খ মেয়েদের মধ্যে শিশু-ছেলেকে নিয়ে এমন অনেক ভাবের ঘাঁটাঘাঁটি হয়—যাতে অতি অল্প বয়স থেকেই বেশ স্পষ্টভাবে ওটা জেগে ওঠে আর সংস্কারকে প্রবল করে। এ সব প্রত্যেক ঘরে হয়, এ তো গোড়ার কথা,—ছোঁয়া-ছুঁই ব্যবহার যে ঐ সব রসের ব্যাপারে কত বড় শক্তিমান তার হিসাব নাই। শিশুরা ত অসহায় তাদের ত সহজে হয় ; বালক যুবা বৃদ্ধ লোকের শরীরেও ওর প্রভাব কম নয়। আচ্ছা এখন বল, সুর গান, বা বাজনার প্রভাব তোর উপর কি রকম ছিল। তোর গান ভালো লাগতো ?

আমি বলিলাম: শিশুবেলা থেকেই ভাল লাগতো খুব,—এত ভাল লাগতো যে ছেলেবেলায় পড়াশুনা ফেলে যাত্রা শুনতে ভালবাসতাম। একবার যাত্রা শুনলে দু'তিনদিন পড়াশুনায় মন লাগতো না।

তিনি বলিলেন: গান আমারও খুব ভাল লাগতো। খুব ছেল্যা বয়স থেকেই ভাল লাগতো। আমিও গান করতে পারতাম ভালো রে। গানও ত রস বটে—সব রসই এক রস হোতে—ঐ আদিরসই গোড়া জানবি।

আমি বলিলাম: এখন প্রসন্ন হয়ে বলুন যা জিজ্ঞাসা করেছি ?

তিনি যেন অবাক হইয়া বলিলেন: কি ?

আমি: ঐযে উচ্ছৃংখল যৌবনের,—

তখন স্মরণ করিয়াই বলিলেন: হাঁ হাঁ, ওদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি বে-বাগে জেগে ওঠে, তাদের মাথা খেয়ে দেয় যে,—

আমি: কি রকম, খুলে একটু বলুন, না হোলে বুঝতে পারবো কি করে ?

তিনি: বুঝতে পারিস নাই ?—তাদের লক্ষ্য থাকে ত শুধু ঐ শরীরের আয়েস, তাতে হয় কি, কেবল ঐ সুখের ইচ্ছাই খুব বেড়ে উঠে, কোনও মেয়্যাকে ভালবাসতে পারে না ; মেয়্যা দেখলেই কেবল ঐ সুখের কথাই মনে হবেক—তা ছাড়া আর কিছুই তার মনে হবে না। মায়ের সোজা নিয়মের দিকে তাকাতে পারে না, মন যেদিকে টানে সেই দিকেই যেতে হবেক তাকে। যখন ঐ ভাবে যেতে যেতে ইন্দ্রিয়-সুখ অনেকটা ভোগ হয়ে যায় তখন ভিতরে ভিতরে কুণ্ডলিনী পাক খুলতে থাকে তাদের মধ্যে তখন একটা অবসাদও এসে পড়ে, তেজক্ষয় হোলে পর।

আমি: তা হোলে ও-ভাবে উচ্ছৃংখল যৌবনের শক্তিক্ষয়েও কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন ?

তিনি: তা জাগবেন নাই ? তু যদি গোঁ-ভরে, লালস করে একদিকে অন্ধ হয়ে ছুটিস্ ত ধাক্কা খাবি না ? পথ না দেখে ছুটলেই পড়তে হবে যে। তখনই চৈতন্য হবে। যে কেউ ভুল করে গোঁয়ারের পারা, চোখে দেখে না, কানে শুনে না—একবাগে দৌড়ায়, ফলে তাকে এক জায়গায় ধাক্কা খেতেই হবে যে ; আর তখন চৈতন্য হবেক। ও শক্তি আর ঘুমায়ে থাকতে পারবে না, জেগে উঠবে। মায়ের রাজত্বে ওটি হবার যো নাই যে গো।

আমি : আর যৌবনের স্বাভাবিক গতিতে বয়সের সঙ্গে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বিবাহিত জীবনেও ত কুণ্ডলিনী জাগেন ?

তিনি : হাঁ, যদি দুঁয়ার মধ্যে ভালবাসা জন্মে থাকে তবেই হবে ;—না হোলে শুধু ইন্দ্রিয়-সুখের লক্ষ্যটাই বলবান হোলে শক্তি জাগে না। যেখানে দেখবি একজন আর একজনকে না ভেবে থাকতে পারে না, দু'জনার মধ্যে খুব টান ধরেছে—ঐখানেই শক্তি জাগার কথা বুঝতে হবেক।

আমি : তা হোলে একজনের মধ্যে প্রেমের বিকাশ হোলেও জাগে ?

তিনি : হাঁ, তা জাগবেক নাই, প্রেম কি সহজ কথা নাকি, সকলকার বিয়ায় কি প্রেম জন্মায় ? মায়ের কত অনুগ্রহ থাকলে তবে সে একজনা প্রেমের অধিকারী হয় ?

আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছা, আর কোন্ কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন বলুন না ? আপনার কথা শুনে আশা হয় যে তা হোলে সকলকারই কোন না কোন সময় কুণ্ডলিনী জাগবেন।

তিনি : দেখ, গুরু-লাভ হোলেই শক্তি জাগেন। সে-রকম গুরু হোলে চ্যালার শক্তি জাগিয়ে দিবেন যে।

আমি বলিলাম,—কেউ যদি গুরু না মানে ?

তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন : গুরু-কৃপা ছাড়া কিছু হবার যো আছে নাকি ! যখনই হবে, গুরুর কৃপা ছাড়া কি করে হবে ; বলিয়া উদ্দেশে তিনি যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিলেন : শালা গুরুর কৃপা মানবেন নাই—খৃস্তান হইছেন।

অনেক কষ্টে শেষে বুঝাইতে পারিলাম যে গুরুর কৃপা প্রাণপণ করিয়াই মানিয়া থাকি—এখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি বলিলেন : হাঁ দেখ—যদি কারো কঠিন বিপদ-আপদ আসে, কি কঠিন রোগ হয় যেমন মরণের কাল এলো মনে হবে, সে অবস্থায়ও তার কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন। আর অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র-ঘটিত মনঃকষ্টে পড়লেও ঐ শক্তি জাগে,—আর বাড়াবাড়ি করিস্ না—বুঝলি ?

তাহা হইলে ইহাই পাওয়া গেল যে কুণ্ডলিনী-শক্তি কার কিভাবে জাগিবে তাহার ঠিক নাই। মোটামুটি যে কয়েকটি অবস্থায় জাগে তাহা এই :—

১—স্বাভাবিক যৌবনকালে স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ে, মানবের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই ঐ শক্তি জাগে।

২—অস্বাভাবিকভাবে যৌবনের ব্যাভিচারে—উচ্ছৃংখল ভোগ-প্রতিক্রিয়ার ফলেও ঐ শক্তি জাগে।

৩—যাতে প্রাণের ভয় আছে এরূপ কোন কঠিন বিপদের মধ্যে পড়িলেও ঐ শক্তি জাগে।

৪—কঠিন রোগের মধ্যেও ঐ শক্তি জাগে।

৫—অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘটিত গভীরতম মনঃকষ্টে, অথবা যে কোন কারণে হোক—অসহনীয় দুঃখের ফলেও কুণ্ডলিনী-শক্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠেন।

ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আচ্ছা, কঠিন দুঃখ বা গভীর মনোবেদনার ফলে যদি শক্তি জাগতে পারেন তা হোলে বেশী কিছু সুখের ব্যাপারেও ত তা হোতে পারে ?

তিনি একবার তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন : হাঁ তা তো হোতে পারে বটে। কোনো সময় কারো জীবনে হয়তো এমন কিছু ঘটে যাতে তার আনন্দের সীমা থাকে না—এমন সুখ, যাতে সংসারের আর কোন সুখকে সুখ বলে মনে হবে না, তখনও ঐ শক্তি জেগে উঠবেন। সুখ হউক বা দুঃখই হউক মানুষের জীবনে বা প্রাণে যাতে জোরে ঘা লাগে তাইতেই জেগে উঠেন যে।

তাহা হইলে মানুষের অতি সুখের মধ্যে বা ফলেও ঐ শক্তি জাগরিতা হন ?)

॥ ৫ ॥

একটু থামিয়া ক্ষ্যাপা কতক্ষণ পর বলিতেছেন : যেভাবেই জাগুক না কেন আবার ঘুমাবার সম্ভাবনা আছে। যখন জাগলো তখন কিছুকাল খুব উচ্চ অবস্থা থাকলো—তারপর আবার ধীরে ধীরে অহংকার জেগে উঠল, মনে হোলো আমার এতটা উচ্চ অবস্থা হয়েছে—কৈ আর কারো ত এমন অবস্থা দেখতে পাই না—এই ভাবে আবার ক্রমে নেমে পড়তে আরম্ভ করলে—শেষে আবার ঐ শক্তি ঘুমিয়ে পড়লো ; এই রকমই ঘটে থাকে।

আমি বলিলাম : তা হোলে উপায় ?

তিনি : উপায়, পিছনে গুরু-শক্তি না থাকলে এমন ত হবেই। গুরু-শক্তি না পিছনে থাকলে কারো সোজা উঠ্‌বার যো নাই হেথা, মায়ের কড়া নিয়ম যে,—তবে লোকের চক্ষে গুরু-শক্তি দেখা দিক বা না দিক, ভাল মনিষের দিকে গুরুর দিন্টি থেকেই যায়—আবার তাকে তুলে দেন। কি-রকমটা হয় জানিস,—পতন হোলো পর তার আবার সেই অবস্থা পাবার লেগে প্রাণটা ছটফটায়,—তখন সে আবার একটু কণ্ট করে—সেই অবস্থা পাবার জন্যে, পেয়েও যায় শেষে অবশ্য। ও এমনই সুখ যে একবার সে সুখের আস্বাদ পেলে আর কিছুই ভাল লাগবে না। যার ও শক্তি জেগেছে সে বুঝে, অপরে কি জানবে ?

তিনি কতক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন : যেটা পরে মানুষকে বড় করে উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়, ছোট ছেল্যা অবস্থার মধ্যেও সেই রসাভাস দেখা যায়। ও সংস্কার ত মানবসমাজে আদি কাল থেকেই চলে আসছে। কারো খুব অল্প বয়সেই ইন্দ্রিয়ে বা মনে প্রকাশ পায়, তবে ওটা ঢাকবার জিনিস বোলে ঢাকাই থাকে ! আবার ওদিকে যে রসবোধ জাগে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, কোন সুযোগ সংযোগের ফলেই ত জাগে ? আবার সেই সুযোগ সংযোগের অভাবে আপনিই ঢাকা পড়ে যায় ছেল্যা-মেয়েদের মধ্যে। প্রকৃতি নিজেই ঐ রসঘটিত ব্যাপারকে গুপ্ত রেখেছে। যার প্রকাশ হয় তার নিজের কাছেই হয় সাধারণত অপরের কাছে গোপন থাকে। কোন কোন ছেলে বা মেয়্যার ও সংস্কার খুব তেজি দেখা যায় ত, তাদের খুব তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি। তাদের ভিতরে শক্তির প্রভাব বেশী থাকে বলেই ঐ সব ব্যাপারেও সাধারণের তুলনায় একটু আগেই প্রকাশ পায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : যাদের তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি বলছেন তাই বলেই কি তাদের রসবোধ খুব কম বয়সেই দেখা দেয় ?

তিনি : ওই আদিরসের অনুভূতি সূক্ষ্মভাবে সংস্কারগত হয়ে সকল শিশুরই মনের মধ্যে থাকে, সুপ্তভাবেই থাকে এটা বুঝিস ত ? তা হোলে, যেমন

যেমন চৈতন্যশক্তির বিকাশ হোতে থাকে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ভোগ আস্বাদনের শক্তি বাড়তে থাকে। যে শিশুর সব ইন্দ্রিয় সুস্থ, সবল, তাদের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে জেগে ওঠে—যখনই সুযোগ পায় বা যোগাযোগ ঘটে, তবে দুর্বল বা অসুস্থ শরীর যাদের তাদের তুলনায় সুস্থ ছেল্যাদের আগেই প্রকাশ পায়। সব বাপ মায়েতেই তা জানতে পারে সকলের আগে, যদি লক্ষ্য করে,—বাপ-মা থেকেই সন্তানে ওটা পায় কিনা।

আমি: আচ্ছা, তখন থেকে শিক্ষা দ্বারা ঐ সব শিশুদের ভিতর থেকে ও সকল ভাব দূর করতে পারা যায় না ?

তিনি: মরু শালা, শিক্ষে দিয়ে আগুনকে চাপবি কি করে, সেদিকে যা দিয়ে আগুনকে ঢাকা দিবি তাই-ই পোড়াবে যে। তুই বলিস্ কি রে বোকা, আদিরস, যা সৃষ্টির মূল শক্তি তাকে শিক্ষে দিয়ে উল্টে দিবি। একি কিছু বুঝবার বা জানবার জিনিস নাকি, বাইরের কিছু একটা, যা থেকে ওদের তফাৎ রাখবি। এ-যে ইন্দ্রিয়ের জেন্ত অনুভব, অন্য কিছুতেই ঢাকা পড়বে নাই। সব কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়,—ওটিকে আর কাউকে শিকুতে হয় নি।

ঐ শক্তিটাই সব শক্তির মূল, সেই জন্যই ওকে মূলাধার শক্তি বলে। যার যতটা ঐ শক্তি প্রবল তার অনুভব শক্তি অতীব তীক্ষ্ম হয়, ধী বা ধারণা-শক্তি প্রখর, অতি অল্প বয়সেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতের যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, গভীর তত্ত্ব সকল বিচার, সিদ্ধান্ত,—সব ঐ মূলীভূত আধার শক্তিরই ফল। যে শিশু ভবিষ্যতে মহা বিদ্বান বা জ্ঞানী বা কর্মী হবে, তার গোড়া থেকেই এমন কি বালক অবস্থার আগে থেকেই আদিরসের সংস্কার খুব প্রবল দেখা যায়। কিন্তু এমনই প্রকৃতির নিয়ম শিশু অবস্থা থেকেই সেই সব ছেলে মেয়েদের মনে এটা যে বিশেষ গোপনীয় এ সংস্কারও স্পষ্টভাবে তাদের মধ্যে দেখা দেয়,—তাই-ই শেষে এ ব্যাপারে সংযমের সহায়তা করে।

আমি: ঐ অবস্থায় তাদের সংযম বোলে কিছু একটা ফোটে কি ?

তিনি: যোগাযোগের অভাব আর সংযম এক জিনিস না হোলেও বাইরের চেহারাটা একই। যার দ্বারা মহৎ কিছু হবে, তাদের বেলা রসবোধ জাগলেও প্রকৃতি-জননী ঐ ব্যাপারে কাজের বেলা যোগাযোগের অভাব ঘটিয়ে দেন, শেষে সংযমে পরিণত হয়ে তার প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ পায়।

আমি: যোগাযোগের ঘটাঘটির ব্যাপারেও তাঁর হাত আছে নাকি, আশ্চর্য্য ঠেকে !

তিনি: দেখিস্ না, ঐ অবস্থায় সংযমের মত একটা কিছু যদি না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজে ছেলেরা অতি অল্প বয়সে, বালক বলে গণ্য হবার আগে থেকেই যৌন ব্যবহার লোক-চক্ষের সুমুখেই সুরু করে দিতো, লাজ-লজ্জা, কোন রকম সঙ্কোচ কিছুই থাকতো না। একটি শিশু হয়ত আর একটির সঙ্গে ঐরসের খেলা করচে এমন সময় যদি বয়স্ক কেউ সেথায় এসে পড়ে তখন স্বভাবতই তারা বিরত হয়,—তার সংস্কারে আপনা থেকেই একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে—তাই-ই পরে বয়সকালে সংযমের স্পষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটা সঙ্কোচ যদি ঐ শিশু বয়স থেকেই না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজ ছাগলের সমাজে পরিণত হোতো যে। আর এটা ঠিক জানবি কি শিশু, কি বালক-বালিকা, কি যুবক-যুবতী যতই গোপনে তাদের আদিরস-ঘটিত অথবা

অবৈধ ব্যাপারকে গোপন রাখতে যত্ন করুক না কেন প্রকৃতি সাহায্য না করলে সেটা গোপন থাকতে পারে না। প্রকৃতি ঠিক জানেন কার কোন্ কাজটা কতটা গোপন রাখতে হবে। তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে সব কিছু ঘটনাই গোপন বা লোকচক্ষে প্রকাশ পায়। নিজ সৃষ্টি রক্ষার জন্যই তিনি কোনও ব্যাপার প্রকাশ বা গোপন করেন। সমাজে এমনটা দেখতে পাওয়া যায় না কি যে এক ব্যাপার এমন বহুদিন গোপন থেকে পরে প্রকাশ পায়,—সংশ্লিষ্ট লোকেও তা জানতে পারে না,—যখন প্রকাশ করবার হয় তখনই তাঁর ইচ্ছায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন কর্মকর্তারা তার ফলভোগ করেন। সকল ব্যাপারেই এটা হয়ে থাকে, শুধু ইন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাপার বোলে নয়। গুপ্ত ততদিন যতদিন তাঁর অভিপ্রায়।

আমি বলিলাম: এ-ত বড় অদ্ভুত ঠেকে, প্রকৃতির হাত আছে এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে!

তিনি: তুচ্ছ, উচ্চ ওসব কথা নয়,—আমরা এখানে রয়েছি কেমন, ঠিক মায়ের কোলে শিশু যেমন থাকে ঠিক তেমনি। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখন মায়ের দৃষ্টিতে শিশুর সবটাই দেখা যায়। শিশু বরং মায়ের অনেকটাই দেখতে পায় না। আমাদের যতই কেন বিদ্যা-বুদ্ধি-চাতুরী থাক না ও-চক্ষুকে এড়াবার যো নাই।

আমি: আচ্ছা, সে চোখটা থাকে কোথায়, কোনখান দিয়ে তিনি এ সব দেখেন?

তিনি: ভেবে দেখ দেখি, কোনখান্ দিয়ে তিনি আমাদের সবটাই দেখতে পান?

আমি: ধারণাটা বড়ই শক্ত,—তবে আমার যা মনে হয় বোলতে ভরসা হয় না।

তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বল না, না হয় ভুলই হবে তাতে ক্ষতি কি,—আমি তো শেষে তোকে বোলতে পারব—

আমি বলিলাম: আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের চক্ষেই আমাদের সব কিছুই তিনি দেখেন।

তিনি: কি রকম, খুলে বল না।

আমি: ধরুন, আমরা যা কিছুই করি না কেন, ভাল বা মন্দ যত কাজ সে সব আমি করছি বোলেই ত করি,—আমাদের সব কাজ আমাদের ত ভালমতেই জানা থাকে। আর তিনি ত অন্তর্যামী, আমাদের সকল ব্যাপারই আমাদের মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জেনে ফেলেন। যা আমরা জানি তা তিনি সবই জানেন।

তিনি: হাঁ, এ ত ঠিকই বোলেছিস্—তু শালা সব জানিস্, ন্যাকা সেজে হেথায় এসেছিস্—বল্ দেখি ঠিক কিনা?

আমি: আচ্ছা, এটা খুব আশ্চর্য্য মনে হয় না কি যে. তিনি এতটা কাছে আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন অথচ আমরা তাঁর থাকাটা কল্পনায়ও আনতে পারি না। কোনও গোপন কাজ করে যেন একটা সংস্কার বশে মনে করি সকলের চক্ষু এড়িয়ে চতুরের কাজ করলাম।

তিনি: পশুজন্ম ঘুচলে পর তবে ঐ সব জ্ঞান হয়। (তন্ত্রে মানবের যে তিন অবস্থার কথা আছে; যথা—মানুষ প্রথমে পশু, তারপর বীর বা মানুষ.

শেষে দিব্য-শক্তির বিকাশে দেবতা,—সেই হিসাবেই এই পশুর কথা বলিতেছেন।) কুণ্ডলিনী না জাগলে ত সে দিকে যাবার পথ নাই। পশু-জন্ম আর বীর বা মানব-জন্ম এই দুইটা জন্মই দীর্ঘকালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সব কিছুই কালের ভিতর দিয়ে হবে যে। ছিষ্টির এতটা ভোগ, এতটা শক্তির খেলা এ সব ত ভোগ করতে, জানতে হবে—সে কি দুই এক দিনের ব্যাপার?

আমি: থাক্ ও সব কথা, এখন বলুন আমাদের মত মানুষ যাদের এ সব জানতে শুনতে ইচ্ছা হয়, সৎপথে যেতে প্রবৃত্তি হয়, কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠলেও এত বাধা আসে কেন, সোজা পথ পাওয়া যায় না কেন? উদ্দেশ্য ত সৎ আছে, অবশ্য অহংকার করে বলি নি,—

তিনি: না, না, অহংকার হবে কেনে, যথার্থ কথাই ত বলছিস্। হাঁ দেখ, তুই যে সৎ উদ্দেশ্যের কথা বলছিস্—এখন কতটা তুই ঐ সৎভাবকে আঁটালো করে ধরেছিস তা তো তুর জানা নাই। মনে হয়ত হোলো তুই সৎ ভাবেই চলেছিস, কাজে দেখা গেল কোন সুযোগ যদি এলো ত অসৎভাবেই ফেঁসে গেলি, এমন ত ঘটে।

আমি: হাঁ তা ঘটতে পারে বটে, সত্যি কথা গলদ আছে আমাদের এই সৎভাবে থাকার মধ্যে—এটা আমরাও দেখতে পাই যখন মনটা সরল থাকে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেও অনেক সময় পথের জটিলতা ঘুচাতে পারি না—

তিনি: একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে এখানকার সকলকার সব ব্যাপার যে,—কোনটি নিছক আলাদা নেই ত, কাজেই ব্যাপার সব জটিল চট করে কাজ হবে কি করে। তেমন তেমন জোর যদি থাকে ত তবেই জটগুলা কাটা যায়, ছেঁড়া যায়। তবে কুণ্ডলিনী জাগার সঙ্গে সঙ্গে এমনই একটা শক্তি পাওয়া যায় যে সব থেকে নিজের উদ্দেশ্যটি ঠিক আলাদা করে নেওয়া যায় তাইতেই ভাল হয়। তারপর পশুজন্মের সকল মানুষেরই মেয়্যাদের আসল পরিচয়টা পেতেই বিলম্ব হয় বেশী, তাইতেই অনেক কাল যায় যে। তারপর ধন-মান-টাকার কথা আছে, মেয়্যা আর টাকা এই দুটাই আগুন নিয়ে খেলা করার পারা। শুধু সহবাসের সুখটি লক্ষ্য করে মেয়্যাদের দেখলেই পুড়তে হবে।

আমি: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বলেছেন, তিনি সাধুদের ও দুটাই ত্যাগ করতে বলেছেন। কিন্তু দেখুন পুরুষদের বিপদটা এই ব্যাপারে খুব বেশী, মেয়েদের কিন্তু ও সব ভাবই নাই, তাদের মধ্যে সংযম এতটা বেশী বা লালস, অবশ্য ভগবানের ইচ্ছাতে, এতটা কম যে তাদের পতনের সম্ভাবনা খুবই কম। গোড়া থেকেই তারা সব ত্যাগ করতে পারে।

তিনি: না তা ঠিক না। ত্যাগ তারা মন থেকে সহজে করতে পারে না, তবে সব কিছুই ধৈর্য ধরে সইতে পারে; কিন্ত পুরুষের সঙ্গে পড়লে তারা ভালবাসার জন্যে সব কিছুই ছাড়তে পারে। অত দিনের ধৈর্য, অত দিনের ত্যাগ এক কথায় ছেড়ে দেয়—যদি পুরুষকে অনুগত দেখতে পায়। আসলে সরল মন বোলে তাদের ভোগাশক্তিও বেশী। মহাপ্রকৃতি মেয়েদের অতটা সহ্য করবার শক্তি যদি না দিতেন তা হোলে এ সংসার ছারখার হয়ে যেতো।

আমি বলিলাম: পশুভাবের মানুষ যারা তাদের কথায় আমাদের কাজ নেই। ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে ঐ যে কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন তখন থেকেই

ত মনুষ্যত্বের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাও আবার ঘুমিয়ে পড়ে বোলছেন যে—এ ত ভয়ের কথা ?

তিনি : হাঁ, যৌবনের সময় ঐ যে স্বাভাবিক কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগা, ও জায়গায় যদি সতর্ক না থাকা যায় তাহোলে আবার সুপ্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তারপর আবার যে জাগে সেই জাগাতেই মহৎ ফল লাভ হয়।

আমি : যদি বা জাগলো আবার সুপ্ত হবার সম্ভাবনা কেন ?

তিনি : প্রথম জাগায় ভাল ঘুম ছাড়ে না—ভেবে দেখ, যে সব প্রবৃত্তি এতকাল একজনের ধাতে স্থায়ী হয়ে বোসেছে তা কি একেবারেই বদলে যেতে পারে ? যেতে যেতে কতদিন যায় ; সেই জন্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেও একেবারেই সে-রকম ঘুমাতে পারে না, আবার জেগে উঠবার জন্যেই মুকিয়ে থাকে। মনে কর, পশুভাবের ইন্দ্রিয়, সুখের লালস, স্বার্থপরতা, অপরের সুখ-তুচ্ছ করে নিজের সুখ-দুঃখকেই বড় করে দেখা সে গুলো কি একেবারেই যায় ? প্রথমে যৌবনের কামজ-সম্বন্ধ নিয়ে নারী-সম্ভোগ, যার আকর্ষণ এতটা প্রবল থাকে সেটা থাকতে ত কিছু ভাল কাজ বা উচ্চ ভূমিতে গতি হবে না—সেই জন্য দ্বিতীয়বার যখন শক্তি জাগে তখন ঐ ভাবের কামজ-নারী-সম্বন্ধের উপরও একটা ঘৃণা এসে পড়ে।

আমি বলিলাম : ঘৃণা থাকাও ত ভাল নয় ; ঘৃণা লজ্জা এ সব তো এক-একটা পাশ, ঘৃণা যদি কোন জিনিসের উপর থাকে তা হোলে ত সেই পাশে বদ্ধ থাকাই হোলো ?—নয় কি ?

তিনি : অবশ্য প্রথমটা তা হয় বটে, সেটা প্রতিক্রিয়ার ফলেই হয়। কিন্তু তারপর আপনার প্রকৃতির সঙ্গে সেটা মানিয়ে নিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের আসল সম্বন্ধ জ্ঞান হোলেই সেই ঘৃণার ভাবটা উবে যায়—তাই হোলো কুণ্ডলিনী জাগরণের মুখ্য ফল।

আমি : তাহোলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল কি এই নর-নারীর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান ?

তিনি : মনে কর যখনই মানুষ বড় হয়ে নিজ শক্তিতে মহৎ ভাব সকল প্রকাশ করতে থাকে,—যেমন ঋষিকল্প মানুষেরা, আসলে তাদের স্ত্রীকে ত্যাগ করবার আর দরকার হয় না—তাদের এমনই একটা সহজ ভাবের স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ-জ্ঞান পাকা হয়ে যায় যাতে রক্ত-মাংসের দেহগত সম্বন্ধটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যায়। শুধু যৌন-সম্বন্ধ-জ্ঞান মাত্র নয়, জগতের সকল ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধটাও বদলে যায়। ঐ জ্ঞানই হোলো ঐ শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল। প্রথমে যে সব ভোগ আকর্ষণের বস্তু থাকে,—পরে চৈতন্যের আলোতে সে সকলের রূপ বা প্রভাব উল্টে যায় অথচ কোন বস্তুর লোপ হয় না। দ্বিতীয়, জাগরণে এই সব উচ্চ ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়—তা থেকে পতন নাই। তখনই এখানকার সকল বস্তুর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সার্থক হয়, তত্ত্বজ্ঞান ফোটে, সকল ভোগ সকল জিনিসের স্বরূপ দেখা যায়।

আমি : এ জগতে ভোগ আর কর্ম, শেষে জ্ঞান—এই ত এখানকার মোটা কথা ; অবশ্য শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ঠ ভেদ অধিকার নিয়ে কথা আছে।

তিনি : হাঁ, সাধারণভাবে ভোগ, কর্ম আর জ্ঞান এই তিনটিই আসল। ভোগের মধ্যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—নিয়ে যে ভোগ, তার মধ্যে মৈথুনে ঐ সব কটাই একসঙ্গে তৃপ্ত হয় বোলে যৌবনে তার আকর্ষণই সকলের বড়।

তারপর হোলো অর্থ বা ঐশ্বর্য ভোগ, তার পর শেষ হোলো জ্ঞান এবং লোক-কল্যাণ সম্পর্কে যত কর্ম আছে—গুরু ভাবে তার শেষ ফল হোলো জন এবং সমাজ থেকে শ্রদ্ধার আকাঙ্ক্ষা—গুরুপদে প্রতিষ্ঠাই হোলো এখানকার শেষ ভোগ বা কর্ম!

আমি: মোটামুটি ভোগ এই তিনটি হোলেও আমার মনে হয় চতুর্থ একটি আছে।

তিনি: কি?

আমি: আত্মজ্ঞান বা কোন বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তপস্যা বা কর্ম।

তিনি: আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিক যত্ন হোলো এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য তার ফলাফল শেষে ঐ গুরু ভাবের মধ্যে গিয়েই পড়লো-আলাদা হোলো কি করে?

আমি: কেন, এই জগত সৃষ্টির কৌশল পদার্থ-বিজ্ঞান ব্যাপারে সৃষ্টিতে কত কত মূল উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান-ও দেশের যত পণ্ডিত মহাত্মা এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের তপস্যায় জীবনপাত করছেন- কত কত আবিষ্কার করেছেন, তাতে,-

তিনি: তাঁরা কি লোকসমাজের উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে এ-সব করছেন না?

আমি: তা হোতে পারে—তবে মূলত সে সব কাজ ত প্রেরণা মূলক,-ভাব নিঃস্বার্থ ভাবেরই মনে হয়।

তিনি: তা হবে! কিন্তু প্রশংসা এর মধ্যেও তাঁদের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় আছে—কাজেই সেটা উচ্চ স্তরের ভোগের মধ্যেই এসে পড়লো। তারপর তাঁর তপোলব্ধ জ্ঞান, যা তিনি রেখে যেতে চান, সেও ত ঐ গুরুপদের পর্যায়ের মধ্যে পড়লো। ঐ মূল তিনটি থেকে পৃথক আর একটি তাকে কি করে বলা যায়?

আমি: তা ঠিক না হোক, এসব ত উচ্চ উচ্চ ভাবের অবস্থা বলতে হবে।

তিনি: তা তো হবেই, ঐ গুলোই ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভোগের মধ্যে এলো। তাতে দেখতে পাবি—ঐ সব উচ্চ ভোগের মধ্যে তাঁদের উঁচু অবস্থায় নারী, ধন বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলেও তার সঙ্গে কোন মলিন ভাবের সম্বন্ধই নেই। এটুকু বুঝে লাভ আছে।

আমি: তা বটে, ঐ-সব উচ্চ স্তরের মানুষ যাঁরা—তাঁরা সঙ্গে স্ত্রীও রেখেছেন অর্থও রেখেছেন, কিছুই ত্যাগ করেন নি। এতে আমার মনে হয় যে আমাদের ভারতে মানুষের ধাতে ত্যাগ ত্যাগ করে একটা যাপ্য বায়ু-রোগের প্রভাব আছে।

তিনি: এই দেখ্ না কেন, মেয়্যা মানুষই বল্ আর ধন বা অর্থই বল্ এদের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় হয়ে গেলে সে সব ত তার জীবনে সাধনের সহায় হয়ে যায়। হেথায় মেয়্যা-মরদের স্বরূপ-জ্ঞান হোলেই এদের সঙ্গে তোর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়ে যায়, তখনই জীবন সার্থক হয়। আর সেইটাই বুঝবার লেগেই না মেয়্যা-মরদের এতটা ঘাঁটাঘাটি। পশুভাবের যা-কিছু সবই এই

দেহকে নিয়ে—দেহজ্ঞান যাদের বেশী তারাই ত পশু, আর ভোগ-বিলাসের জঙ্গলের মাঝে দলবেঁধে ঐ পশুগুলোই ত চরে বেড়াচ্ছে, এটা ত বুঝেছিস?

আমি বুঝলাম: তা তো খুব ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই অগাধ পশুত্ব থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায় কি বলে দিন আপনি।

তিনি: আহা, এতটা শুনে, এতটা বুঝেও বোকার মত কথা বলিস কেনে! অনায়াসে পশুত্ব ঘোচাবার কত সহজ পথ এখানে রয়েছে,—শাক্ত হলেই পশুত্ব ঘুচবে, শক্তিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করলেই শাক্ত হওয়া যায়। শুধু এ দেশের মানুষের কথা নয় সারা পৃথিবীর মানুষের শাক্ত হওয়া ছাড়া পশুত্ব ঘোচাতে আর অন্য উপায়ও নাই। দেবীসূক্তে জানিস দেবী কি বলছেন?

আমি: সে আর জানবার দরকার নেই, এখন একটা শুভ খবর আপনাকে দি, শুনে সুখী হবেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষই শাক্ত হয়ে গিয়েছে। সহজ ভাবেই তারা অনেককাল আগেই শক্তিকে আশ্রয় করে জগদম্বার শ্রেষ্ঠ সন্তান বোলে পরিচয় দিয়েছে—কেবল ভারতবর্ষের হিন্দু বলতে যাদের বুঝায় তারা ছাড়া। দেশের এরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যে কোনও উপায়েই হোক শক্তিকে দেশের সকল হিন্দু অধিবাসীর ভিতর থেকে তাড়িয়ে জড়াবস্থা আনতেই হবে, না হোলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে শীঘ্র পরলোকে পেঁৗছে বৈকুণ্ঠ অধিকার করা যাবে না,—এরা বলছেও শাক্ত হয়ে কোন লাভ নেই—কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থটুকুই হোলো ভাববার জিনিস।

শুনিয়া ক্ষ্যাপা বাবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন: তাঁরা না হয় শীঘ্র শীঘ্র গিয়ে ভূতনাথের দল বাড়ালেন, কিন্তু যাদের সৃষ্টি করে গেলেন, তাঁদের বংশধরেরা,—তাদের জন্যে কি করে গেলেন?

আমি: তাদের জন্যে—যাতে তারা জগতের শ্রেষ্ঠ শাক্তদের চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে পদসেবা এবং পাদপূজা করে ধন্য হোতে পারে তার পাকা উপায় করে গেলেন, আর শেষে বাপ-পিতামোর পাকা মার্কামারা পথ ত আছেই—আর বাবা ভূতনাথও আছেন। যাক ওকথা...এখন আমার শেষ কথা একটু আছে দয়া করে যদি শেষ করে দেন,...সেটা এই যে তান্ত্রিকদের যেমনভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় অ-তান্ত্রিকদের কি ঠিক সেই রকম হয়?

তিনি: তান্ত্রিকদের কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগানো, আর তাকে প্রত্যেক চক্রের ভিতর দিয়ে তোলা—সে সব আলাদা সাধন, তাতে মজা আছে। সাধারণ মানুষ সে সব মজা পায় না। মনে কর, অনেককাল থেকে কত কত সাধক যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেক চক্রে পদ্মের কথা বলেছেন,—প্রত্যেক পদ্মের মধ্যে পৃথক পৃথক দলের কল্পনা আছে—প্রত্যেক চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী আছেন, বীজ-মন্ত্র আছে—যেমন যেমন এক একটি চক্র ছাড়ায় কুণ্ডলিনী-শক্তির নানা ভাবের বিকাশ অনুভব করা যায়। এ সব আলাদা সাধন—এর একটা মহৎ উপকার এই হয় যে শক্তির উপর আয়ত্ত বিস্তার করা যায়। অনুভব করা যায় ঐ শক্তি কখন কোন্ চক্রে কি ভাবে ক্রিয়া করছে—তার ফল কি হচ্ছে। তাতে ধী-শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, অন্যান্য শক্তির বিকাশ হয়! এই পদ্ধতি অতি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রত্যেক চক্রের মধ্যে থাকার ফলে যে যে ভাব হয়, যে যে স্ফুরণ হয় সে সকল অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দের স্ফুরণ হয় তার তুলনা নেই। তান্ত্রিক যাঁরা ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী

যথার্থরূপে সাধন করেন, তাঁদের সেটা বিশেষ লাভ যা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষে পেতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ঐ ধরণের কিছু কিছু সুবিধা আছে যা অপর দলে নাই। এ তো জানা কথা। তান্ত্রিকদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি নামে যা বলা হয়েছে তা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ। প্রথমে অবস্থা বিশেলষণ করেই ওকে কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে—ঐ শক্তি জাগরণের পর আত্মাতেই ওর চরম পরিণতি অর্থাৎ ওর শেষ, আত্মার সঙ্গে এক হোয়ে মিলে যাওয়ায়।

আমি : আপনার কথায় এ বিষয়ে আসল কথা এই বুঝা গেল যে, অধ্যাত্ম জীব-চৈতন্যকেই তান্ত্রিকেরা কুণ্ডলিনী শক্তি রূপে ধারণা করেছেন। তারই জাগরণ থেকে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত একটি অপূর্ব অধ্যাত্ম-সাধন পথ তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছেন, যার হদিস অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের কেহ পায় না। তন্ত্রে এই-ই পরম গৌরবময় সর্বার্থ সিদ্ধির পথ। জগতের যত ধর্ম-সাধনের পথ আছে, এটি তার মধ্যে একটি নিজ বিশেষ মহিমায় উজ্জ্বল, অনন্যসাধারণ একটি পথ যার কথা সভ্যসমাজের অধিকাংশরই অজ্ঞাত। কেমন এই ত? এখন বলুন জীবাত্মার সঙ্গে কুণ্ডলিনীর আসল সম্বন্ধটা কি?

তিনি : এখন জীব বলতে হবে, জীবাত্মা নয়। জীবের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, প্রথম অবস্থায় তাকে তার অংশও বলা যায় আবার তার প্রকৃতিও বলা যায়। যৌবনে যেমন মানুষ তার প্রেমের আধার-স্বরূপ জীবন সঙ্গিনীকে পেয়ে পূর্ণ হয়—আনন্দময় হয়, সেই রকমই এদের সম্বন্ধ, তারপর শেষে জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার আশ্রয় পেয়ে পূর্ণ হয়, সেই রকমই এই কুণ্ডলিনী, জীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এক হয়ে উভয়েই পূর্ণ হয়, যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ দুই-ই অপূর্ণ থাকে। তারপর, এটা বুঝতে হবে যে প্রথম স্তরের স্থূল মানুষের মধ্যে যে জীব, তা' শক্তিরূপেই অধিষ্ঠান করেন। তারপর নানাভাবে ভোগ-আবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেমন অবস্থা-বিশেষে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হন তখন দুজনেই দুজনকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কালের মধ্য দিয়েই এই শক্তির বিকাশ হয়,--বিকাশের পূর্বে জীব নিজেকে শক্তি মাত্র ভাবতে পারে, কারণ তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গেই তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ থাকে—তখন তার অস্তিত্বের সবটাই স্থূল। ক্রমে ইন্দ্রিয়-গ্রামের সঙ্গে মনাদি পুষ্ট হোলে পর,—কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্ভব হয়,--এই-ই চৈতন্য শক্তি,—সাধারণত একেই সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ বলে। প্রথমে ছিল ঘুমিয়ে—অর্থাৎ তার ক্রিয়া দেখা যায় নি—এখন জাগরণে তার ক্রিয়া দেখা গেল। আসলে জীবের চৈতন্য-শক্তিই হোলো কুণ্ডলিনী,—জেগে উঠে তার গতি হয় বিকাশের পথে অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রের পানে ;--সেই কেন্দ্র হোলো প্রজ্ঞাচক্র, যেটা প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা সবেরই কেন্দ্র, কি-না অধিষ্ঠান-স্থান ; মানুষের সব কিছু ধারণার স্থান হোলো ঐখানে। পূর্ণ যৌবনের প্রভাবে যেমন নারী তার স্বাভাবিক প্রাণের টানে ভর্তার সঙ্গে যোগাযোগ অপেক্ষা করে, মিলনের কাল যত নিকট হয়, ততই তার ব্যাকুলতা বাড়ে--তারপর হয় যোগাযোগ বা মিলন। একই সত্তায় পরিণত হয়ে, জীবের হয় পুনর্জন্ম, চৈতন্য শক্তির যোগে তখন তাঁর উপাধি হয় জীবাত্মা। তখন পরমাত্মার পূর্ণতা ও অনন্ত ভাবদুটি ছাড়া আর সব ভাব বা ঐশ্বর্য্য ফুটতে থাকে জীবাত্মার মধ্যে। অবশ্য এই ফোটার ব্যাপারে কত জন্ম-জন্মান্তর হয়, তার হিসাব রাখছে কে, ও দিকে জীবের স্থূল ইন্দ্রিয়জ ভোগের ঘোর

মেটাতেই কত জন্ম কাটে—তার ঠিক নাই। পরে জীবাত্মা পরমাত্মার লাগ পেয়ে সর্বজ্ঞ হন, পূর্ণ হন, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,—এই হোলো জীবাত্মার ইতিহাস ; আর রাধা-তন্ত্রের সার কথা।

আমি স্তম্ভিত,—নির্বাক বিস্ময়ে, অবাক হইয়াই রহিলাম কতক্ষণ।

বাবা বলিলেন : যাঃ, এখন আর জ্বালাস না তু, চলে যা।

আমি বলিলাম : তা ত হোলো, এখনও একটা কথার মীমাংসা হয়নি যে !

বাবা বলিলেন : আবার কি ? এর পর আরও কি কথা হবে রে শালা, তু বলিস কি ?

আমি : এর পরের কথা নয়, আগের কথা। নরনারীর আসল সম্বন্ধটা কি ? কেমন করে আমরা এই মোহ ঘটিত সম্পর্ক থেকে উদ্ধার পেতে পারি ?

তিনি বললেন : ও ত আপনিই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হবে, ও কারুকে বোলে দিতে হয় না। তোর ত বিয়া হয়েছে, সন্তান হয়েছে, তু ত সব জানিস,—কেমন করে জন্ম দিতে হয় সে কি তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে নাকি ?

আমি : সে ত একটা ব্যাপক মোহঘটিত ব্যাপার,—আসল সম্বন্ধটা তা হোলে কি ? জানতে ইচ্ছা হয় না কি ?

তিনি : ও ত শেষের কথা, এখন সে কথা কেন ? সময় হোলে মানুষে তা আপনি বুঝে।

আমি : দেখুন, আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার কত লাভ। আমরা যে সব তত্ত্ব জানতাম না তা আপনার কাছে শুনে আমাদের কত উপকার। কুণ্ডলিনীর কথা শুনে ভরসা হোলো যে প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই ও শক্তি জাগে—এমন কথা আগে কোথাও শুনিনি যে তান্ত্রিক না হোলেও শক্তি জাগে।

তিনি : ও সবই গুহ্য কথা, রহস্য প্রকাশ করতে নাই,—সব কি বলতে আছে রে ! আচ্ছা, তুই-ই চেষ্টা কর-না কেন ভাবতে, নরের সঙ্গে নারীর আসল সম্বন্ধটা কি ! আমি বরং একটু আভাসে তোকে সাহায্য করছি,—

ভেবে দেখ, ঐ মেয়্যারা কি রকমে ছিষ্টি রাখছে—তাকে প্রথমে তুই পেলি কোথা ? প্রথমে দেখ, তোকে মা হয়ে পেটে ধরলে, তারপর এই জগৎ সৃষ্টির মাঝে তোর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তোকে প্রসব করলে—তারপর বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করলে—তুই বড় হলি। যেমন যেমন তোর ভাব তেমন তেমন শক্তি পেলি, সামর্থ্য পেলি, শৌর্য্য-বীর্য্য পেলি, ক্রমে জোয়ান হয়ে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনতে লেগে গেলি ! আর একলা যেন থাকা চলে না, এতো সব থাকতেও কোনখানে বড় একা একা ঠেকে। তখন বৌ হয়ে এলো তোর জীবনের সাধ পূর্ণ করতে, সংসারের রহস্যময় নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য পড়লো, ভোগের নেশা লেগে গেল, একেবারে মশগুল। নেশার ঘোরে কত সৃষ্টি করে ফেললি,—তার সঙ্গে মিলে জগতের কত কিছু দেখলি, কত কিছু জানলি—যদি সঙ্গে সঙ্গে দিব্য-ভাবের খোঁজ পেয়ে গেলি তো ভাল, সব সম্বন্ধ সার্থক হয়ে গেল,—নিজের সঙ্গে সকলকারই স্বরূপ দেখতে পেলি ;—আর তা যদি না হোলো তবে মানুষ হয়েই রয়ে গেলি, পুরোনো ভোগের মকসো চলতে লাগলো, আর সে তোকে শান্ত রাখলে কোনো তাপ না লাগে, তোকে আগলে তোর সেবাতেই লেগে রইলো ! যত-কিছু তোর পাপ, তাপ, অসুখ, অশান্তি—আবার অপরদিকে তোর সুখ, সম্পদ, দুঃখ, উচ্চ-নীচ যত ভাব, তোর আদর

অনাদর, মান-অপমানের বেগ ধরে জীবন-সঙ্গিনী হোয়েই রইলো। তোর সৃষ্ট জীবগুলি বড় হোয়ে তোর জগৎ-সংসারকে সফল করলো,—তুই হলি কর্তা,—সে তোর পিছনে, তোর সব-কিছুর বোঝা নিয়ে সঙ্গী হোয়ে রইলো। তারপর কাল পূর্ণ হলে, যদি তুই আগে টেঁসে গেলি তো ফাঁকি দিলি ; আর যদি সে আগে গেল ত তোকেই বুঝবার ভার দিয়ে গেল যে সে তোর কে ছিল ? সে না হোলে তোর আসা, এত বড় হওয়া—এত কাণ্ড করার কোন সম্ভাবনাই ছিল কি ?

এখন বুঝে দেখ্ না কেনে তার সঙ্গে তোর কিসের সম্বন্ধ—বা কোথায় সম্বন্ধ।

আমি অনেকক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়াই রহিলাম। বাবা স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না বটে কিন্তু যে বস্তুর আভাস দিলেন সেটা ত সহজ বা সরল ব্যাপার মনে হয় না। একটি অস্পষ্ট বিশাল নগ্ন সত্য যেন মূর্তি ধরিয়া অন্তঃকরণের সবটা জুড়িয়া উঁকি মারিতেছে,—এ কি !

ইতিমধ্যে বাবার সেবক, ছিলিম প্রস্তুত করিয়া হাতে ধরাইয়া দিল এবং দূরে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল !

আমি ভাবিতেছি,—এক জীবনেই যেন চক্র সম্পূর্ণ হইয়া গেল—ব্যাস্ তারপর আর কোনই সম্বন্ধ নাই ! তারপর আবার মনে হইল ঠিক যেন বিরাট পথে পথিকের সঙ্গে পথিকের দেখার মত—মধ্যে কতকটা পথ একসঙ্গে চলিয়া শেষে আর যেন সম্বন্ধ নাই,—তাহা হইলে দার্শনিকেরা যেমন বলিয়া থাকে। একথাটা কিন্তু অত্যন্ত স্থূল।

ইতিমধ্যে বাবা কখন কলিকার কাজ শেষ করিয়াছেন লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, বলিতেছেন : না না, এক জন্মেই সব শেষ হবে কেনে, আসলে দুজনের শেষ একসঙ্গেই হবে যে !

শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : সে কখন, জন্মান্তরে নাকি ?

তিনি বলিলেন : জন্মান্তর ! ও ত দিনরাতের ব্যাপার ! তার হতে যদি তোর কিছু ভালো হয়ে থাকে তোর হতেও তার কিছু ভালো ত হয়েছে বটে ? তুইও যেমন তাকে চাস, সেও ত তোকে তেমনি চায়, তু যেমন তাকে ছাড়তে চাস নাই সেও ত তোকে ছাড়তে চায় নাই—দুজনা দুজনার কাজ গুছিয়ে লায় যে ! ছাড়াছাড়ি এই শরীরটাতে হোলো, কিন্তু বাকি সবই রইলো। যতক্ষণ না শেষের কাজ মিটে।

আমি : জীবন-সঙ্গিনী আবার জন্মজন্মান্তরেও ধাওয়া করেন নাকি ?

তিনি : ভয় করে নাকি তোর ? যথার্থই তুই যদি তাকে চাস, সত্যই তোর টান যদি থাকে তবেই তো ধাওয়া যদি তা না থাকে তবে কে তোকে ধরতে যাবেক, কার এত মাথা-ব্যথা বল্ দিকি ?—)

॥ ৬ ॥

তারাপীঠে বাবার সঙ্গ আরও কিছুদিন, বোধহয় দশ বারো দিন পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে যে কয়টি দিনের ব্যাপার আমার মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা বলিয়াই ক্ষ্যাপা বাবার প্রসঙ্গ শেষ করিব।

একদিন সকালে দেখি, তাঁর ঐ চালার মধ্যেই তিন চার জন ভক্ত, তার

সঙ্গে ক্ষ্যাপা বাবাও আছেন। বাবা একেবারে চুপচাপ বসিয়া আছেন, মনটা বোধহয় ভাল ছিলনা, কেমন একটা বিষন্ন ভাব তাঁর মুখে। শরীরটা বাঁকিয়া গিয়াছে,—সোজা বসিতে পারেন না, তাহার উপর অসুস্থ শরীর। কুকুরগুলি ঠিক কাছেই আছে, লালি, শ্বেতফুলি, কেলো, ভুলো এরা সব বাবার সাঙ্গপাঙ্গ। এদের সম্বন্ধে তাঁর যে ভাব তা অসাধারণ। অসাধারণ এইজন্যই বলিতেছি যে আমরা বা আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কুকুর পুষি অনেকটা সখের খাতিরেই, তাও আবার উহা য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণেই। আবার একদল বাড়ি হইতে চোর ছ্যাঁচড় তাড়াইবার জন্য পোষে, আবার এক শ্রেণীর গৃহস্থ কুকুর পোষে, পায়রা পাখি পোষে, বিড়াল পোষে, জীবে দয়া আছে তাই! তবে এই শেষের ভাবটা খুব কম লোকেরই হয়। কিন্তু ক্ষ্যাপা বাবা তাঁর এই কুকুরগুলিকে যেভাবে দেখেন তা ঠিকমত বিচার করিলে তাহাকে অপত্যস্নেহ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বাপ তার ছেলে ও মেয়েকে যেভাবে দেখিয়া থাকেন—কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি প্রভৃতিকে তিনি ঠিক সেইভাবেই দেখিয়া থাকেন একথা বলিলে কিছুমাত্র বেশী বলা হয় না। যাই হোক এই কুকুরের মধ্যে শ্বেতফুলি যেটি, সেটি সে সময় ছিল গর্ভবতী। আজ সকালে এখন দেখি বাবা তার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। আমি কিছুই আশ্চর্য্য হই নাই, চুপ করিয়াই দেখিতেছিলাম। হাত বুলাইতে বুলাইতে বাবা একজনের দিকে ফিরিয়া—বোধহয় নগেন পাণ্ডাই হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর কতদিন আছে বল দিকি এর বাচ্চা হতে? সে বলিল,—এই শীঘ্রই হবে বোধ হয়। বাবা বলিলেন, এইবার প্রথম কিনা তাই ভয় হয়—তা কি রকম হবে বল্ তো?

সে বলিল,—কোন চিন্তা নেই বাবা, মায়ের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক মনে হয় দূরস্থ ভক্তই হইবেন, তিনি বলিলেন, —এগুলি সব ঠিক যেন আপনার সন্তান—এমনটা আর কোথাও দেখিনি।

বাবা একবার সেই ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার সন্তান? ঐ তারা মায়ের সন্তান। এখানে যারা আছে সব তারা মায়ের। এরা কেউ ছোট জীব নয়। কৈ নিয়ে যাও দিকি এদের কোথাও এখান থেকে,—পারবেনা, কখনো পারবেনা। এরা সবাই মায়ের আশ্রিত।

এই পর্য্যন্ত ঐ কুকুর সম্বন্ধে কথা তখন হইয়াছিল,—তারপর আমি উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম, আমার কথা এখন হইবে না—এরা ত এখন কেহই উঠিবে না গাঁজা ডলাই মলাই হইতেছে, উহা শেষ হইতে অনেক দেরী,—অন্য সময় একবার চেষ্টা করিব। দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবার প্রবন্ধ আছে পূর্বেই বলিয়াছি।

দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম হইয়া গেলে বৈকালের দিকে গিয়াছি, তখন একা বসিয়া একটা বালিসে হেলান দিয়া,—আর কেহই নাই। উত্তম সুযোগ বুঝিয়া বসিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—আমি ত তুমার কথাই ভাবছিলাম—কি ব্যাপারটা বল দেখি?

আমি বলিলাম, আপনি যে ঐ কুকুরগুলিকে মায়ের আশ্রিত সন্তান বললেন, সেটা কি রকম তাই জিজ্ঞাসা করচি।

ওরা ত মায়ের আশ্রিতই বটে, ওরা সব মায়ের ভক্ত, জন্মজন্মান্তরের কর্মক্ষয় করতেই এখানে রয়েচে, ওরা সবাই সাধুলোক।

সাধুলোক ?—এই সাধুলোক বলতে আমি কি বুঝবো দয়া করে বলুন—

দেখ তোরা ভারি তর্ক করিস্, আমি ত বললুম—তবুও বুঝতে নারলি ? ওরা কত তপাস করেচে—কত সাধন করেচে তবে না এখানে মায়ের থানে এসে থাকতে পেয়েচে ? তুই থাক্ দিকি কতো দিন এখানে থাকতে পারবি ? তা হচ্চে না বাবা, মা তোকে রাখবেন না, তোকে যেতেই হবে।

আমি ত যাব যাব করেই এখনকার দিনগুলি কাটাইতেছি—মন ত উঠিয়াছে, বুদ্ধি কেবল আরও কিছু পাইবার আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া বিলম্ব ঘটাইতেছে !

সেদিন আর কোন কথাই হইল না—প্রকাণ্ড একদল যাত্রী প্রায় বারো-পনেরো জন মেয়ে-মরদ ছানা-পোনা সিউড়ি হইতে আসিয়া হাজির হইল ঐ আশ্রমে। আমি তো উঠিলাম।

বীরভূম ছাড়িয়া যাইব ঠিক করিয়াছি—এবার কামাখ্যা কামরূপের দিকে মন টানিতেছে। কিন্তু বামার কাছে যেন আরও কিছু পাইবার বস্তু আছে এই আশাতেই এখনও যাইতে পারি নাই। মনে হয় এমন মানুষ গেলে আর হইবার নয়।

অনেকেই জানেন না যে বামাই বীরভূমকে গত চল্লিশ বৎসর সাধন-কেন্দ্ররূপে জাগ্রত রাখিয়াছেন। এই জাগানোর একটা ইতিহাস আছে। বীরভূম এমনই স্থান যেখানে তন্ত্রধর্মের অভ্যুদয়কাল হইতে কোন না কোন মহাত্মা বা তন্ত্রমতে সিদ্ধযোগী, কোন না কোন সিদ্ধস্থান আশ্রয় করিয়া তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তি প্রসারিত এবং এই ভূমির লোকসমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন যাহা পরবর্তী সাধকগণের পক্ষে সিদ্ধিলাভের পথ সুগম করিতেছে। এই বীরভূমি কখনও দীর্ঘকাল সাধক সিদ্ধ কৌল শূন্য ছিল না। কতকাল হইতে যাঁরা যাঁরা এই বীরাচারের ক্ষেত্রে কোন না কোন সিদ্ধপীঠের সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভের পর বহুদিন পর্য্যন্ত তন্ত্রমাহাত্ম্য সজীব রাখিয়াছেন, --পর পর তাঁহাদের নাম একদিন কথা-প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপাবাবা বলিয়া দিলেন। সেখানে নগেন পাণ্ডাও ছিল। আগেই বলিয়াছি এই নগেন, যদিও লোকটার অধ্যাত্ম রাজ্যে বড় বেশী অধিকার হয় নাই কারণ তাহার পার্থিব কামিনীকাঞ্চনে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল তথাপি বাবা তাকে কতকটা আমল দিতেন। তিনি বলিতেন, হোক কেনে টেঁটা, মনিষটার বুদ্ধি আছে, চালাক বটে—অত বুদ্ধি কারও নাই। বাবা সেদিন পূর্ব পূর্ব সিদ্ধপীঠের সিদ্ধ-কৌলগণের নাম করিলেন ; আমরা সবাই আগ্রহপূর্বক শুনিতেছিলাম। যখন তিনি চুপ করিলেন তখন নগেন জিজ্ঞাসা করিল বাবা, আপনার পর আর কে এখানকার মাহাত্ম্য রাখবে ? উপস্থিত এমন ত কাকেও এখানে দেখি না। বোধহয় শেষ হয়ে গেল তন্ত্রের সিদ্ধি।

ঐটুকু শুনিয়াই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—মা তারার ইচ্ছা, তিনি আবার কাকেও রাখবেন থানে ;—কেন ?—আমাদের তারা, (অর্থাৎ তারানাথ, তাঁর শিষ্য) সে হবে না কেউ একজন ?*

* এ সম্বন্ধে বাবার মন্তব্য ভিত্তিশূন্য প্রমাণিত হয় নাই —তাঁর অন্তর্দৃষ্টিই তাঁহাকে দেখাইয়াছিল যে তারানাথ সিদ্ধ হইয়া কালে তন্ত্রসাধনার ধারা বজায় রাখিবে। তবে উত্তর-

শুনিয়া নগেন কি যেন একটা কথা বলিতে গেল কিন্তু তাকে বলিতে হইল না,—বাবা স্বয়ং যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ওটার একটা দোষ আছে বটে, —উ বড্ড রাগী মনিষ বটে,—ওটি থাকতে সিদ্ধি নাই।

নগেন বলিয়া ফেলিল, বড্ড অহংকার, দম্ভও আছে। শুনিয়া বাবা খুশি হইলেন না। বলিলেন—তারা মায়ের ইচ্ছা হয়ত—ওসব দোষ যেতে কতক্ষণ? ও গলদ থাকবে নাই ; এখন থেকে ওর লজর পড়েছে দেখিস নাই?

এই পর্য্যন্ত কথা। নগেনের একটু যেন ঈর্ষার ভাব ছিল তাহার উপর। তারা বাবাকে খুব বশ করেচে একথাও নগেনের মুখে একবার শুনিয়াছিলাম আসলে তারা একটু স্বাধীন প্রকৃতির লোক,—ওখানে তার মত শক্তিশালী আর কেউ নাই সেই জন্যই বাবা তাকে বেশী ভালবাসেন। এ বিষয়ে তারা,—হয়তো একটু অধিক মাত্রায় সচেতন ছিল। একবার মাত্র তাকে বাবার কাছে দেখিয়াছিলাম। তাহার শক্তির দম্ভ তখনই তাহার ব্যবহারে প্রকট ছিল।

যাক্‌ সেদিনের কথা ঐ পর্য্যন্ত। তারপর দিন সকালে বাবার আড্ডার কড়া তামুক চলিতেছিল,—বাবার আসনের পাশেই, একরকম গা ঘেঁষিয়া সাদা কুকুরটি শুইয়াছিল, সে এখন বাবার কাছ-ছাড়া হয় না। শুধু গর্ভবতী নয়, বোধহয় আসন্নপ্রসবা। বাবা বলিলেন,—শ্বেতফুলিটা কেমন দুর্বল বোধ হ‍ঁচে না রে?—

নগেন ছিল, রহস্য করিয়া বলিল,—এইবার আঁতুড়ের ব্যবস্থা আর একটা দাইয়ের দরকার যে বাবা?—

বাবা, বালকের মত সরল,—বলিলেন, তাইতো বটে রে, তু কেনে একটু তল্লাস কর না বাবা, গাঁয়ের মধ্যে তোদের ত জানাশোনা আছে সব? নগেন বলিল, ভাবচেন কেনে আপনি,—মা তারা সব ঠিক করে দেবেন। বাবা পরম আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন,—তা বটে তো, ঠিক তো, তবু কেমন ভয় লাগেরে —বাঁচবে তো? কটা বাচ্ছা হয়রে?—আমি ত দেখি নাই, তু জানিস?—

নগেন বলিল, তা দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত হয় বাবা।

আমার ভাল লাগিল না এইসব কথা, উঠিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছি,— বাবার নজরটা ক্ষীণ হইলেও সেই বড় বড় চোখ দুটি অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর ধরিলেন এবং মনের ভাবটি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিলেন, —বাবা এবার যাবার সময় জ্ঞানের পুঁটলী বোঝাই দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টায় আছ বটে? কুত্তোর কথায় কিছু জ্ঞান নাই, তাই উঠিবে কিনা ভাবচো বটে? —এ্যাঁ? না কি বলতো ঠিক করে।

বাধ্য হইয়াই সত্য বলিলাম। তখন বাবা কতকটা সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন—এই তো বুদ্ধি তুমার গো,—তাই বলচি। কুকুর কি মানুষ লয়, মা জগদম্বার সৃষ্টি লয় বটে?

আমি হাসিয়া বলিলাম, কুকুর মানুষ?—

বাবা বলিলেন,—মানুষ লয়?—এমন সময় ভুলো কোথা হইতে আসিয়া বাবার কাছেই তার ল্যাজের উপর বসিল এবং অতি সহজভাবে, বেশ বুদ্ধিমানের মত যেন বাবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাইল—মনে হইল এখানকার কথা

কালে তাঁহাকে আসন পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। শেষে তারার আসন ছিল বহরমপুরের গঙ্গাতীরে।

শুনিতে আসিয়াছে, সে যেন আমাদেরই একজন। আমি অন্তঃকরণের মধ্যে যেন সত্যই কিছু একটা অনুভব করিলাম,—অদ্ভুত অনুভূতি। বাবা বলিলেন, —কোলকাতার বাবু,—এসব তুমাদের কালেজের পুঁথিতে লিখা নাই যে গো।

তারপর কেলোও আসিল, সেও ঐ ভাবে ল্যাজের উপর বসিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। অন্য সময় দেখিয়াছি তার চক্ষু দুটি বড় ভয়ানক, যেন জ্বলিতেছে—কিন্তু এখন দেখি অতীব করুণ দৃষ্টি লইয়া মধ্যে মধ্যে মাথাটি নীচু করিয়া কুঁই কুঁই শব্দ করিতেছে। আমার ভয় ছিল কুকুরটাকে,—তার ভয়ংকর মূর্তি সময় সময় ওখানকার অনেক যাত্রীরই ভয়ের কারণ ছিল কিন্তু সে কখন কাহারও অনিষ্ট করে নাই। বাবা বলিতেন, ছদ্মবেশে কেলোটা চণ্ড-ভৈরব। তাহাকে অধিকাংশ সময়েই মায়ের মন্দির দ্বারে শুইয়া আছে দেখা যাইত। আরও একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি—বাবার কাছে সকলেই এক সঙ্গে জুটিত,—কিন্তু অন্য কোথাও, বাবার আশ্রমের বাহিরে আসিলেই তৎক্ষণাৎ সে সঙ্গ ছাড়া হইত। সে ছিল নির্বিবাদী,—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করিত না। অনেক সময় ভোজনশেষে কেহ পাতের ভাত ঘাটের ধারে ফেলিয়া দিল—কেলো আসিতেছিল এমন সময়ে দৌড়িয়া আসিল ভুলো বা অন্য কোন কুকুর। পাতার কাছে ভুলেকে দেখিবামাত্রই কেলো মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেল, তা সত্ত্বেও ভুলো গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। কালো বলিয়াই বোধহয় তার মধ্যে কতকটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল। সে যেন দল-ছাড়া আলাদা—এটা সবাই লক্ষ্য করিত। তথাপি সবাই তাহাকে, তাহার ভয়ানক কালো রূপটিকে ভয় করিত।

এইভাবে যখন কেলোর দিকে চাহিয়া বাবা আবার সেই কথাটা বলিলেন, এরা মানুষ নয়?

তখন নগেন পাণ্ডা বলিল,—বাবা আপনার কথার মর্ম এঁরা ধরতে পারচেন না,—একটু খুলে বলতে হবে।

বাবা বলিলেন, এর আবার খোলাখুলি কি আছে, যেমন তুমি আমি মানুষ তেমনি কেলো ভুলোও মানুষ, এর আবার লাকোনো কি আছে?

শুনিয়া আমি বলিলাম, আমরা এখানে যতগুলি আছি সবাই ত আপনার এগুলিকে কুকুরই দেখচি।

বাবা জোড় হাতে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমার কেন হবে, ওরা মায়ের ভক্ত,—মাই-তো ওদের ঐ মূর্তি দিয়েচেন? নয়? আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে তখন একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ধরোনা কেনে তুমি শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা লিয়া ভৈরব হয়েচ, সাধন ভজন কোরচো। ক্রমে ক্রমে তুমি বেশ এগায়ে যেতে লাগলে, শক্তি পেয়ে জোর সাধনা চোললো। ক্রমে তোমার শক্তির পর শক্তি পাবার লোভ জাগতে লাগলো। বীরের সাধনে লেগে গেলে, ক্রমে শক্তি লাভও হোলো—যেমনটি চাইছিলে মায়ের কৃপায়;—তারপর কাঁচা তান্ত্রিক সাধকদের যা হয়ে থাকে তাই হোলা তোমার—ইষ্টের দিক থেকে দৃষ্টি গেল কিনা শক্তি চালনার দিকে, ভোগের নেশা, অতবড় শত্রু সাধকের আর নাই যে বাবা, কাছে গুরু নাই যে সাবধান করবেন। তখন চার হাত পায় ভোগে লেগে রইলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির বশে—(এখানে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করলেন তা লিখিয়া সাধারণের চক্ষের সামনে ধরা যায় না) এমন সব জঘন্য, কুৎসিত ভোগে মেতে রইলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়ে, যা মানুষের নিয়মের বাইরে। শেষে

উবলে। মায়ের সৃষ্টির নিয়ম ভাঙ্গলে, তুমি এমন কাজ করলে যাতে মানুষের পর্য্যায়ে আর তোমাকে ফেলা যায় না। তখন মা তোমাকে দণ্ড করবেন নাই? তাইতো—(কেলোর দিকে দেখাইয়া) তাইতো এখন ঐ কেলো কুকুর হয়ে—মায়ের দুয়ারে পড়ে আছে। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর শ্মশানে যেয়ে আকাশের দিকে নাক উঁচু করে করে কাঁদে,—শুন নাই?—

অতটা লক্ষ্য করি নাই, এই কথা বলাতে তিনি বলিলেন, আজ শুনো কেমে, রেতের আরতি করে ভোগ শীতল হয়ে গেলে পর, এখানে বসেই একটু কান করে শুনলেই ওর কান্না শুনতে পাবে। এরা সব্বাই শুনেচে কতদিন, লয় নগেন বাবা?

নগেন বলিল, আমরা ত রোজই শুনি, উনি শুনে নাই কাজেই একটা নতুন লাগে বৈকি?

আমার মনে আর তিল মাত্র সন্দেহ রহিল না তাঁহার কথায়। যদিও সেই রাত্রেই উহা আমি শুনিয়াছিলাম। কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমার ধারণা ছিল যে মানুষ হইয়া ক্রমবিকাশের ফলে উন্নত পর্য্যায়ে পেঁাছিবার পর আর পশুযোনিতে অবনতি, অর্থাৎ বিলোমগতি সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। সুখ বা উৎকট দুঃখ ভোগ যাহা কর্মান্তিকের ফলে ভোগ হয় তাহা মানুষজন্মেই হবে।

আমার মনের কথাটা বাবা বুঝিয়া ফেলিলেন, বলিলেনঃ আরে বাবা গোলকধাম খেল নাই? ছয় চিতে নরকে গমন,—সাত চিতে রসাতলে গমন? —ঐ ত রসাতলের; নরকের কথা। তারপর আবার কবে ভোগ কাটবে কে জানে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ওর কি পূর্বজন্মের স্পষ্ট রকমের স্মৃতি আছে? বাবা বলিলেন,—যেটুকু থাকলে ওর পাতকের জন্য মনটা পুড়বে সেই-টুকুই আছে, আবার সব কিছুর দরকার কি? এক এক সময় এখানকার সব কথা শুনে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে দেখেছি, কতক কতক বুঝে বৈকি?—লয়; নগেন বাবা?

নগেন বাবা একটু ডিপ্লোম্যাসির সঙ্গে বলিলেন, বাবা আপনি যেমন এসব স্পষ্ট দেখেন বা বুঝেন আমরা ত তা দেখি না, আপনার কথায় বিশ্বাস

করি, তাই মনে হয় বুঝেছি। সে দৃষ্টি তো আমাদের নাই,—আশীর্বাদ করুন বাবা শেষ পর্য্যন্ত আপনাতে ভক্তি আমাদের অচলা থাকে। বলিয়া পায়ের ধূলো লইতে গেলেন। বাবা পা সরাইয়া লইলেন, বলিলেন—শালার মায়ের চরণে বুদ্ধি গেল না,—ভক্তি হোলো না, আমার এই ভাঙ্গা হাঁড়ির উপর ভক্তি দেখাতে এলেন—তু শালা চোর কোথাকার।

নগেনের মুখখানা ক্ষণেকের তরে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া গেল। কিন্তু এতগুলি লোকের সামনে অপ্রতিভ হইবার পাত্রই নয় সে, সপ্রতিভতাতে তৎক্ষণাৎ আবার বলিল, বাবা, আপনাকে ধরেই না মায়ের নাগাল পাবো, ঐ হাঁড়ি ভাঙ্গা হোক ফুটা হোক উয়াতেই এখন আমরা আমাদের খোরাক পাক করে নোবো।

শুনিয়া বাবা প্রসন্ন হইলেন,—বলিলেন: লগেন বাবাকে পারবার যো নাই,—কৈ বাবা, একটু তামুক চলুক না কেনে।

ভোগবিকৃতির কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! এতটা সাধনার পর ঐ অবস্থা? অনাচারের পরিণাম-ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে,—আমার অন্তরে ঐ প্রসঙ্গ লইয়াই প্রবল আলোড়ন চলিতেছিল। এই মহাত্মার কথাগুলি,—আমার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতি জাগাইয়াছিল,—এখন উহা যেন আঘাতের মতই পীড়াদায়ক হইয়া হয়তো বাহিরে, মুখে কিছু ভাব ফুটাইয়া থাকিবে, বাবা তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন আমার অন্তরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এখন তিনি সস্নেহে বলিলেন,—দেখতে হয়, বাবা! এই মনিষ জনম, কত বড় দুর্লভ পদার্থ,—এখানে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে যদি মা মহামায়াকে না জানলে, যদি খানিক উপর ভূঁয়ে না উঠতে পারলে তবে আর হোলো কি?

এ সত্য বচন প্রত্যক্ষের মতই শক্তিশালী,—ভগবৎবাণীর মতই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া ওখানকার সবাইকেই অভিভূত করিল। তিনি আবার বলিলেন,—মেয়ামানুষ, ধন, প্রভুত্ব করবার মোহ, এর পিছনেই সবাই দৌড়াচ্ছে নাই? বল না বাবা? উয়ার পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করতে করতেই পরমায়ুটুকু ফুরায় তো কি আর হোলো মনিষ হয়ে জন্ম—বুঝেই দেখ না কেনে, বাবা!—বলিয়া সবার দিকেই এক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

সত্য! হায় হায় আমরা কি অকর্মের পিছনেই না ছুটিতেছি, কি ভাবে জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছি। আমাদের মধ্যে সবাই তো নিজ নিজ দুর্বলতায় এক একবার সচেতন হইয়া উঠে,—বিশেষতঃ কোন কর্মফল প্রত্যক্ষ দেখিলে অথবা কোন আপ্ত পুরুষের বাণী শুনিলে বা তাঁহাদের সত্য অভিজ্ঞতার আলো দেখিলে। তখন কতক সময় হয়তো সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু বিশ্বাস কি আমার এই ভোগমুখী মন-বুদ্ধিযুক্ত 'আমি'-জ্ঞানকে? ভোগের পিছনে ছুটিবার ফলে পরিণাম কি হইতে পারে—এই জ্ঞান কতক্ষণ আমায় রক্ষা করিতে পারে, যদি কোন ভোগের অনুকূল অবস্থার যোগাযোগ ঘটে? ডুবাইতে কতক্ষণ ঐ সাময়িক জ্ঞানকে। ইচ্ছামত শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে সর্ব সময়ে বর্তমান. ইহার সঙ্গে ভোগ-প্রবৃত্তির যোগাযোগ—চাঁদে চূড়ার মতই,—বলিয়াই ধরিতে পারিলাম। সুধাময় তন্ময়তায়, মন বুদ্ধি শুদ্ধভাবে যখন উচ্চ-স্তরেই রহিয়াছে, অহংবুদ্ধি অধ্যাত্ম-চৈতন্যমুখী হইয়া বেশ কতক সময় রহিল, তারপর কর্মান্তরে যখন যাইতে হইল তখনও তাহার রেশ রহিয়াছে,—

কর্ম্মও চলিতেছে তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদও রহিয়াছে। এমনই সময়, যে রিপুর প্রভাবে আমি দুর্ব্বল, যাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে সময় সময় কায়মনোবাক্যে ছট্‌ফট করিয়াছি, শরীর মনে কঠোরতা পর্য্যন্ত কতই না করিয়াছি,—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়াই করিয়াছি,—সংসারকর্ম্ম সম্পর্কে আবার এমনই এক যোগাযোগের মধ্যে পড়িলাম, যাহার ফলে কাজে না করিলেও মনের মধ্যে বেশ অনেকটাই ঘুরপাক খাওয়াইয়া দিল। কোথায় নামিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই। অনুশোচনায় কাতর হইলেও পরিত্রাণ নাই। দফায় দফায় অতর্কিতে ঠিক আক্রমণ করিবেই। ভোগ প্রবৃত্তি যেন ওৎ পাতিয়াই বসিয়া আছে। প্রত্যক্ষই দেখিয়াছি যে যে-বিষয়ে দুর্ব্বল, অর্থাৎ জীবনের কোনকালে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি-প্রবল মনকে প্রশ্রয় দিয়াছে তাহাদের দ্বারাই প্রবৃত্তিমূলক সকল অকার্য্যই সম্ভব! গুরুশক্তির পূর্ণ আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহাদের পরিত্রাণ নাই।

বাবা আমার দিকে চাহিয়া, ঠিক যেন স্বচ্ছ দর্পণের মতই আমার মনের ছবি দেখিতে পাইতেছেন এইভাবেই করুণার্দ্র হইয়া বলিলেন,—ভয় নাই বাবা, তোমাদের ভয় নাই। মা যে তোমাদের সব সময়েই দেখছেন, তোমরা যে মায়ের শরণাগত।

সত্য সত্যই,—ঐ কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে বল, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনুভব করিলাম মহতের কৃপা। তাঁহার চরণে হাত দিলাম তারপর সেই হাত মাথায় রাখিলাম।

তারপর আজিকার মত উঠিব কিনা ভাবিতেছি, দেখি একে একে নগেন পাণ্ডা প্রভৃতি দু'তিনজন যাহারা ছিল সবাই উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি আর উঠিলাম না। কেবল বাবার সেবক ছোকরাটি রহিল। পরে বাবার হুকুমে সে ঘরের ভিতরে কি একটা কাজে গেল। আমি তখন কাছ ঘেঁষিয়া বাবার পা হাত দিয়া ধরিলাম, বলিলাম, শুনেছি আপনি কুমার ব্রহ্মচারী, কামজিৎ উৰ্দ্ধরেতা, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঐ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্তি পাই। ও প্রবৃত্তি আমার মধ্যে উৎকটভাবেই রয়েছে। তাই আমার ভয় খুব বেশী।

শুনিবামাত্র বাবা পায়ের উপর হাত দুটি নিজের দুটি হাত দিয়া ধরিলেন;—তারপর এক অদ্ভূত বিস্ময়ের ভাব তাঁহার ঐ বিশাল নয়ন দুটিতে ফুটিয়া উঠিল, এমনইভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমি কুমার ব্রহ্মচারী? কার কাছে শুনেছ বাবা? লগেন বাবা বলেছে বটে?

আমি বলিলাম, না, তিনি নয়, তবে এখানকারই একজন বলেছে।

বাবা বলিলেন, সে লতুন এসেছে বোধহয়,—জানে না, তুমায় ভুল বলেছে বাবা। আমরা তান্ত্রিক, এককালে ভৈরবী-চক্রে নিয়ম মতোই না ক্রিয়া করেছি? —পঞ্চ ম-কারের কোনটাই বাকি রাখিনি বাবা। তবে কখনও পাগল হয়ে ইন্দ্রিয় সুখের ভরাডুবি করিনি। বাবা এটুকু সত্যি মায়ের কৃপায়, ক্রিয়ার মধ্যেই সব শেষ করেছি, তা ঐ মদই বলো আর ভৈরবী মেয়েমানুষই বলো। গুরু ছিলেন কাছে, টিকি ছিল তাঁর হাতে বাঁধা, তাই পার হতে পেরেছি।

বাবা বলিলেন,—বালক-বেলা থেকে মাকে ধরেই পথ চলেছি, মাকে ধরে থাকলে আর ভয় নেই। ঐ মা-ই সকল সাধনই করিয়েছেন তন্ত্রের নিয়মে। গুরুরূপে কাছে কাছে থেকেই শেষ পর্য্যন্ত সাধন হয়ে গেলে তখন ছেড়েছেন, আর তখন থেকেই মায়ের কোলকে বসে আছি গা। কিন্তু উ বড় কঠিন।

একবার যে স্বাদ পেয়েছে তার আর গতি নেই। বাঘের ছা রক্তের স্বাদ পেলে আর রক্ষা নাই। সেইজন্য গোড়া থেকেই পথ বন্ধ করতে হয় যে বাবা, সে কি সবার হয়?—মা আমাকে দিয়ে সৃষ্টি করাবেন নাই, তাই আর ও কাজের দরকার হোলো না। হ্যাঁ দ্যাখো, বলিয়া আমার গা ঠেলিয়া বলিলেন: মন তোমার যতই সাধনের ভিতর বসবে,—ততই ওসব তুচ্ছ হয়ে যাবে। তুমাদের ত এখানকার মত তন্ত্রের সাধন লয়, তোমাদের শক্তি-চালাচালির ব্যাপার নাই—তোমাদের এসব ভয় নাই বাবা।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, হ্যাঁ দ্যাখো,—একটি মেয়্যা, নিজ স্ত্রী ভোগ করলেই তো গেয়ান হয়ে গেল, সুখটা এই রকম। ও সুখ দু'রকম হয় না, এক স্ত্রী সম্ভোগেই ওর দফা শেষ করে দিতে হয়। বুদ্ধিমান, যারা গুরুশক্তির আশ্রয় পেয়েচে যারা বুঝতে পারে রূপের মোহে মেয়্যামানুষ ঘাঁটা, ও নরক ঘাঁটা—নিবৃত্তিমার্গের মনিষকে মা ঠিক বুঝিয়ে দেন—ঐ ভাবের বুদ্ধি থেকেই সংযমের শক্তি আসে। এই সার কথা জেনে রাখ, বাবা।

আবার একটু থামিয়া বলিলেন,—হাঁ দ্যাখো, বাবা! একটা গূঢ় আছে এর মাঝে। পুরুষ অভিমান যাদের কঠিন, ষাঁড়ের পারা, তাদের হতে মা ছিষ্টি করায়ে নেন্, ঐ ছিষ্টির জন্যেই তাঁদের কামের আগুন বেশী থাকে। গাঁয়ে দেখ নাই, গাই গরু কতো, ষাঁড় একটা-দুটোই যথেষ্ট, তাতেই কত গরু হঁয়্যা যাবে।

বুঝিলাম।

আবার বলিলেন,—তবে ছিষ্টির বীজ ভিতরে থাকতে সংযম, মিথ্যা কথা, —সে কখনও হবেক নাই।

আজ এইখানেই শেষ।

॥ ৭ ॥

ক্ষ্যাপা বাবার কাছেই শুনিয়াছি,—

তারাপীঠের সঙ্গে রাজা রামকৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল বড়ই ঘনিষ্ঠ! এখানে তিনি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম এখানে আসিবার কথা এইরূপ শুনা যায়,—এক সময়ে যখন তিনি উচ্ছৃংখল ছিলেন, তখন রাণী তাহাকে সামলাইয়া চলিতে বলেন। অর্থব্যয়ে তিনি বিচারশূন্য ছিলেন। কতকগুলি বেকার, কর্মহীন অলস, ধর্মের ভান করিয়া তাঁহার কাছে আসিত এবং স্থান পাইত,—এইজন্য রাণী একটু কঠিন হইয়াছিলেন। তাহাতে অভিমানভরে তিনি, আর কখনও নাটোরে ফিরিব না বলিয়া, এখানে চলিয়া আসেন। রাণী কিছুই বলেন নাই বা বারণও করেন নাই। তাহাতে তাঁহার অভিমান দুর্জয় হইয়া উঠে।

এখানে আসিবার পর এক অমাবস্যার রাত্রে তিনি এই তারা মন্দিরের মধ্যেই আসন করিয়া সারা রাত্রি সাধনে কাটাইতে সংকল্প করিলেন। মন্দিরের ভোগারতির পর সবাই চলিয়া গেলে একলা উপস্থিত হইলেন,—এবং দ্বিপ্রহরে সন্ধিক্ষণে আসনে বসিয়া কর্ম আরম্ভ করিলেন। ক্রমে,—আসনেই তিনি যখন তন্ময় অবস্থায় জপে অভিনিবিষ্ট চিত্ত, দেখিলেন—মন্দির দ্বার খোলা, ভিতরে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মূর্তি। কিন্তু দেবীর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিতেই দেখিলেন, দেবীর স্থানে রাণী চতুর্ভূজা মূর্তিতে বিরাজিতা। বিস্ময়-অভিভূতচিত্তে বার বার দেখিতে লাগিলেন,—শরীর রোমাঞ্চিত হইল। প্রথমে ভ্রম মনে হইল,

কিন্তু বারবারই রাণীর চতুর্ভুজা মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু উঠিয়া আর সে মূর্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন দৈববাণী শুনিলেন, 'নাটোরে ফিরিয়া যাও, দেবীকে তুষ্ট করো, তিনি তুষ্ট হইলেই তোমার সর্বার্থসিদ্ধ হইবে। এই পীঠের দেবী, রাণী স্বয়ং।' রাজা পরদিনই নাটোরে ফিরিলেন।

পরে রাণী তাঁহাকে বীরাচার সাধনে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য শুনা যায় রাজা, সাধনের অর্ধপথে সাধনের ক্রম পরিবর্তন করেন। রাণীর ভালবাসা স্নেহ যত ছিল, শাসনও ছিল ততটাই।

ক্ষ্যাপা বাবার কাছেই এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। শরীর ভাল থাকিলে তিনি মধ্যে মধ্যে মহা আনন্দেই সিদ্ধ ও সাধকগণের পুরানো বৃত্তান্ত বলিতে ভালবাসিতেন। রাণীর প্রতি ক্ষ্যাপার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাকে আদ্যা-শক্তির অংশ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কাছে রাণীর কাহিনী অনেকেই শুনিয়াছে। শেষ জীবনে রাণী কাশীতেই থাকিতেন। একান্তে নিজভাবে মগ্ন ও নিঃসঙ্গই থাকিতেন। শেষে, তিনি অঙ্গে কোনপ্রকার বন্ধন রাখিতে পারিতেন না, বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য কারো তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার বা তাঁহার কাছে যাইবার অধিকার ছিল না। একটি দাসীমাত্র তাঁহার কাছে থাকিতে পাইত। শিশু বালিকার মতই তাঁহার স্বভাব হইয়াছিল। আপন-পর বিচাররহিত, তিনি দানে সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। রাত্রি থাকিতে, শীতের সময়েও একখানি কম্বল জড়াইয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িতেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করিতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত। সহজে উঠিতে চাহিতেন না। পূর্ব গগনে অরুণোদয়ের আভাস পাইলে তখন উঠিতেন ও কম্বলখানি জড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে বিশ্বনাথ মন্দিরের পথে যাইতেন। সঙ্গে দোলা বাহক প্রভৃতি থাকিত কিন্তু ক্বচিৎ ব্যবহার করিতেন। বিশ্বেশ্বর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেই দ্বারবান দ্বার বন্ধ করিয়া দিত। যতক্ষণ ভিতরে রাণী থাকিতেন দ্বার খোলার হুকুম ছিল না। সূর্যোদয়ের পূর্বেই নিজ মহলে ফিরিয়া আসিতেন। সেইজন্য দীর্ঘকাল কাশীতে থাকিলেও কেহ তাঁহার দর্শন পাইত না। সেখানকার সবাই তাঁহাকে দেবী বলিয়াই বিশ্বাস করিত। দান, তাঁহার নিত্য এবং নৈমিত্তিক দুই প্রকারই ছিল।

যখন ব্রাহ্মণ বা দণ্ডীভোজন হইত তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নিভৃতে নিঃসঙ্গ হইয়া বসিয়া বসিয়া সব কিছুই দেখিতেন,—কোন ব্যাপারে কোন খুঁত বা ত্রুটি হইবার যো ছিল না। ত্রুটি হইলে কঠোর ব্যবস্থা ছিল, সেইজন্য তাঁহার নিয়ম সমুদয় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত। তাঁহার প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তি নিজ দেশের সবার ত ছিলই পরন্তু বিদেশীয়গণেরও ছিল।

তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদে কাশীতে সবাই মাতৃহীন হইলাম বলিয়া কাঁদিয়াছিল।

বাবার কাছে অতীতের কত কথা, সাধক সিদ্ধ এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যাঁহারা ঐতিহাসিক মহান্ কর্মে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন, সেই সকল ব্যক্তি-বর্গের কথা এতই আছে যে উহা সংগ্রহ করিতে পারিলে উৎকৃষ্ট একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায় ;—কে সে সকল লইয়া মাথা ঘামাইতেছে ?—লোকে অনেকেই তো আসে। তাঁহার কাছে আছে ; থাকেও অনেকেই। কিন্তু বেশীর ভাগ

লোকের ঐ গাঁজার কলকে পর্য্যন্তই গতি, ঐ প্রসাদ পাইয়াই চলিয়া যায়। ধর্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিতে চায় না ইহারা। বাবাও বেশ কাটাইতেছেন দিনগুলি এদের সঙ্গে। কোনও বিরক্তি নাই।

ক্ষ্যাপার কাছে ইতিমধ্যে একদিন কাঠিয়া বাবার কথাও শুনিয়াছিলাম। "কাঠিয়া বাবা" নামটি কেমন করিয়া তিনি পাইলেন, শুনিয়া তিতিক্ষার অভ্যাস যে তখনকার দিনে কতটা কঠিন তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটা কাঠের বেড়, তিনি হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনী মিলাইয়া একটা গোল করিয়া দেখাইলেন, এতটা মোটা, প্রায় দু ইঞ্চি হইবে তার বেধ,—তাঁর কোমর বেড়িয়া সর্বক্ষণ থাকিত, তাহাতে কৌপিন বাঁধা হইত দুদিকে—পিছনে ও সামনে। ঐ কাঠের বেড় আজীবন তাঁর সাথী ছিল। সেই কাঠের বেড়টিই তাঁর নাম "কাঠিয়া বাবা" দিয়াছিল, গুরু তাঁকে কাঠিয়া নামেই ডাকিতেন। গুরু, তাঁর তিতিক্ষা অভ্যাসের প্রাথমিক ব্যবস্থা ঐ রূপই করিয়াছিলেন। ইহাতে অলসভাবে শুইয়া ঘুমাইবার যো ছিল না। হয় আসনে বসিয়া থাক, না হয়—দাঁড়াও, শয়নের সম্ভাবনা নাশ করিতেই এই অদ্ভুত উপায়। যদি আলস্য রাখিতে হয় তো আসনের উপর বসিয়াই তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে সাধন-জীবনে প্রবেশ করিয়াই শয়ন-নিদ্রার অভ্যাস চিরজীবনের তরে ত্যাগ করিতে হইল। সংযমের প্রথম দফা এইরূপ।

গুরু ছিলেন সিদ্ধযোগী,—তাঁর সিদ্ধি যোগমার্গেই, সুতরাং কাঠিয়া বাবা প্রথম হইতেই যোগমার্গে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাহ্য ব্যবহারে গুরুর মেজাজটা ছিল অত্যন্ত কঠোর রকমের। তিনি প্রথম হইতে বালক শিষ্যটিকে বড় কঠোর ভাবেই তাড়না করিতেন। কাঠিয়া বলিয়া ডাকিলেই কাঠিয়া বুঝিতে পারিতেন কি কারণে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। তিনি বলিতেন,—গুরুর প্রত্যেক আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতাম ; মনে মনে এই সংকল্প তখন প্রবল হইয়াছিল যে, কোন কাজে খুঁত রাখিব না,—এমন করিব যাহাতে তিনি নিশ্চিত সুখী হইবেন। কিন্তু এমনই ভাগ্য যে কিছু না কিছু খুঁত ঠিক বাহির হইত। প্রথম ছয়টি বৎসর আমি কোন মতেই তাঁহার মনোমত কিছু করিতে পারি নাই। আমার বোধ হইত, মনে মনে তিনি আমার কাজে নিষ্ঠা এবং অধিকার দেখিয়া বাস্তবিক সুখী ছিলেন—কিন্তু কখনও আমার প্রতি কোন ব্যবহারে রূঢ়তা পরিত্যাগ করেন নাই।

এইভাবে ছয় বৎসর পর, কাঠিয়া তখন আঠারো বৎসরের কিশোর, গুরু তখন হইতে তাঁহার সকল কর্মই যাহা এতদিন দেন নাই, তাঁহাকে করিতে দিতেন। তাঁহার নিত্য যোগাভ্যাস কর্মের জন্য যে সময়টি নির্দ্ধারিত ছিল, যাহাতে তাহার ক্ষতি না হয় এমন ভাবে বাঁচাইয়া গুরুর সকল কর্মই করিতে হইত। কিন্তু গুরু কখনও কখনও এমন সকল আজ্ঞা করিয়া বসিতেন যাহাতে যোগাভ্যাসের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। তিনি বুঝিয়া কোন কথা বলিতেন না। ক্রমে তিনি বিকট ভাবেই তাড়না আরম্ভ করিলেন,—সাধনক্ষেত্রে শিষ্যের তখন উচ্চ অবস্থা। কাঠিয়া নির্বিকারচিত্তে নিত্য নিজ কর্মের ক্ষতি করিয়াও গুরুর অভিপ্রেত প্রত্যেক কর্ম করিয়া যাইতেছেন। শেষে একদিন হইল কি,—এক তুচ্ছ অপরাধ উপলক্ষ্য করিয়া গুরু তাঁহার প্রকাণ্ড চিমটা লইয়া কাঠিয়াকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্বে এমন নির্দয় প্রহার কখনও করেন নাই। কাঠিয়া, তাঁর স্বাভাবিক সহ্য করিবার শক্তির সীমায় পেঁাছিয়া আজ দেখিলেন

তিনি আর সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত ঝরিতেছে। তখন এই বলিয়া গুরুর চরণে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন যে,—প্রভু! আজ আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার এ দেহ আপনারই, আপনি আমায় একেবারে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হোন।

গুরু তখন চিমটা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সবলে কাঠিয়াকে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সে স্পর্শে কাঠিয়ার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং পরক্ষণেই স্নিগ্ধ শীতল হইয়া গেল,—তিনি গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাতে অবিরাম করুণা ঝরিতেছে, আজ গুরুর অপর এক মূর্তি দেখিলেন যাহা কখনও পূর্বে দেখেন নাই। তখন সেই প্রশস্ত বুকের মাঝে কাঠিয়া নিরাপদে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্ষণেকের তরে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন।

তারপর গুরু শিষ্যকে লইয়া বসিলেন,—বৎস, আজ তোমার সিদ্ধির দিন,—আমি জানিতাম তুমি কাম জয় করিতে পারিবে কিন্তু কামজয়ী হইলেও ক্রোধ অবশিষ্ট প্রবল রিপু,—তোমার পক্ষে উহা সম্ভব কিনা ইহাতে কিছু সন্দেহ ছিল। প্রধানতঃ মুক্তির হন্তা ঐ দুইটি, একই রিপুর ঐ দুইদিক,—কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে, ঈশ্বরের মহিমা তোমার ভিতর দিয়া প্রচারিত হইবে বলিয়াই তোমার সিদ্ধির মুহূর্তে এতই কঠোর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ সাধকদের মধ্যে কদাচিৎ তোমার মত আধার পাওয়া যায়,—এসো, আজ সকল ভেদ ঘুচাইয়া আমরা একরূপে মিলিত হই।

ক্ষ্যাপা বাবা এ সকল তাঁহার মত করিয়াই বলিয়াছিলেন। যেমনটি শুনিয়াছি ঠিক সেই ভাষা দিয়া বলিতে আমি অক্ষম, তা ছাড়া অনেকেরই উহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে বলিয়াই আমার মত করিয়া বলিলাম। কাঠিয়া বাবার সঙ্গে বামার অখণ্ড বন্ধুত্ব বা একত্ব ছিল। উভয়ে ভিন্ন পথে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধির পর আর সিদ্ধদের মধ্যে উপলব্ধিগত ভেদ থাকে না। তাঁহাদেরও ছিল না। ক্ষ্যাপার মুখে যাঁহারা এসব শুনিয়াছেন তাঁহারা যেমন প্রকৃতির মানুষই হোন না কেন মুগ্ধ হইয়াছেন! সাধুর কথা সাধুর মুখে এমন মিষ্ট লাগে একজন সাধারণের মুখে তেমন লাগে না। সাধু না হইলে সাধুকে ঠিক চিনে না। ক্ষ্যাপা বলিতেন,—ক্রোধের মত এতবড় শত্রু সাধুদের আর নাই। গৃহস্থ লইয়াই সাধুদের জীবন বাঁচাইতে হয়, গৃহস্থের দ্বারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। গৃহস্থ যারা, তাহারা সর্বদাই নানাভাবে নানা কাজে ব্যস্ত, হয়তো সাধুকে ভিক্ষা দানে বিলম্ব হইল, অথবা ত্রুটি হইল, কত রকমে উহা হইতে পারে,—তাহাতে সাধু যদি ক্ষমাশীল অথবা উপেক্ষাপ্রবণ না হইয়া ক্রোধ-পরবশ হন তাহা হইলে গৃহস্থের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য শুধু কামজিৎ হইলেই হয় না—কামজিৎ হইলেও ক্রোধ অন্তরে সুপ্তভাবে প্রতীক্ষায় থাকে—সূত্র পাইলেই প্রবল হইয়া সাধকদের সর্বনাশ করে, সেইজন্য সাধু জীবনে ঐ দুটিকেই নিঃশেষে দমন প্রয়োজন।

ক্ষ্যাপা, ক্রোধের অপর ফলের কথা বলিয়াছিলেন যা যোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। কামজিৎ ব্যক্তি স্বভাবতই ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন। ঐ রেতঃ ঊর্দ্ধমুখী হইলেও যদি কোন কারণে ক্রোধ উৎপন্ন হয়—সঙ্গে সঙ্গেই আবার রেতঃ নিম্নমুখী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ক্রোধের সময়, শারীরিক প্রচেষ্টা বর্জিত

হইলেও এমন কি মুখে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে দ্রুত সঞ্চরণরত প্রাণবায়ুর দ্রুত স্পন্দনের ফলে, স্খলন স্বভাবতই হইয়া যায়, যদিও ইন্দ্রিয়পথে তখন বাহিরে যাইবার সুযোগ হয় না। এ সকল আভ্যন্তরিক ক্রিয়া যথাক্রমে ভিতরে ভিতরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। খিটখিটে স্বভাব যাদের (শর্ট টেম্পার), অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় অথবা ইন্দ্রিয়-চালনার ফলেই হইয়া থাকে,—অপর কোন কারণে একজনের স্বভাব ওরূপ হওয়া সম্ভব নয়। ঊর্দ্ধরেতা যাঁরা তাঁদের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ বুদ্ধি তাঁদের স্থির ও কারণমুখী হইবেই। ক্ষ্যাপা কারণমুখী বুদ্ধির চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন! 'ধরনা কেনে তু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস, একজন এসে পাশ থেকে তুকে ঠেলা দিয়ে এমনভাবে ফেলে দিলে যে তোর হাড়ের উপর বাজলো। এখন সাধারণ মনিষ হয়ত তাকে ফিরিয়ে মেরে বোসলো, কোন কথা বলবার আগেই তার রক্ত গেল মাথায় উঠে, জ্বলে উঠলো ক্রোধ, তাকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে মেরেই বোসলো। ধাতু তরল যাদের, তাদের ঐ ধরণের, প্রতিহিংসার ভাব কোন না কোন সূত্রে জ্বলে উঠবে গা। কিন্তু ধীমান, সুস্থ, ঊর্দ্ধরেতা যারা তাদের বুদ্ধি ও-ভাবের হতেই পারবে না;—সে মানুষ মার খেয়ে ফিরিয়ে মারতে যায় না,—বুদ্ধি তার ভাবতে থাকবে যে, কেন, কি কারণে ও এমন কাজ করলে? সেই কারণটি সে তৎক্ষণাৎ বুঝবে আর যদি সহজ প্রতিবিধান থাকে তাই করবে; হিংসার ভাব তার মধ্যে মাথা তুলতেই পারবে না। এরই নাম কারণমুখী বুদ্ধি।'

॥ ৮ ॥

আজ চলিয়া যাইব, তারাপীঠের উপর একটা আকর্ষণ বেশ অনুভব করিতেছি, মনটি যেন এখান হইতে যাইতে চাহে না। অবশ্য এখানকার মূল আকর্ষণই ঐ বামদেব। ক্ষ্যাপা বাবার আকর্ষণ এখন মনে অনুভব করিতে করিতে মায়ের মন্দির হইতে বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম এবং প্রণাম করিয়া বলিলাম, আজ ত যাব ঠিক করেচি তাই বিদায় নিতে এলাম।

হোই মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে এসো গা! বলিলাম, তা হয়ে গেছে। এখন আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ঐ কঠিন কাযের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই।

মেজাজ প্রফুল্ল ছিল। বলিলেন, হাসি পায় গে বাবা, তুমার কথা শুনে। ওটা গেলে রইল কি? তোমার শক্তি, আসল পদার্থইতো ঐটুকু। উয়াকে ইন্দ্রিয় সুখের পানে লাগিয়েছিল তাই বোকা বনেচ,—ঠকেচ। মূলাধার তোমার ঐ শক্তিকে ঐ যন্ত্র দিয়ে ব্যবহার করবে কেন? একে যৌবনকাল তার উপর মতিগতি উদ্দাম, একবার বেরোবার পথ পেলে তখন কালের গুণেই দৌড় করাবে। রাশ টান করতেও তুমি, আলগা দিতেও তুমি,—মনের জোর থাকলেই হয়ে যাবে বাবা।

একটু যেন ভাবিয়া, তারপর বলিলেন. হাঁ দ্যাখো, ওটা আদিমকাল থেকে ঐভাবে চলেছে কিনা, তাই এখন যেন মনিষ ওটাতে বাঁধা পড়েচে মনে হয়—যেন পরিত্রাণ নাই কিন্তু আবার এমন মনিষও ত আছে ঐ শক্তিকে চৈতন্যের দিকে চালিয়ে কতো উঁচা গতি পেয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিকাশের মূল হল ঐ শক্তি। ক্রমে তুমার শক্তির কেন্দ্রের পানে টেনে নিয়ে যাবে; মা জগদম্বার

কোলকে নিয়ে ফেলবে, তখন আর কিছু পাবার বাকি থাকবে না, বাবা। ভোগ, উপভোগগুলো শেষ হয়ে যাক, এর জন্যে কারো কাছে তুমায় যেতে হবে না ; মা তারা, আপুনিই তোমায় পর পর যা কিছু আছে তা সব জানিয়ে দেবেন। ঘরে বসে বসে পাবে সব।

আমি বললাম, যদি সত্য সত্যই ঐ ভাবটি আয়ত্ত করে ধরে রাখতে পারতাম তা হলে ভাবনা কি? আমরা এখন সমাজের মধ্যে বাস করি যেখানে ওটা ঐভাবে দেখতে বুঝতে আর করতে প্রবৃত্তিটাই অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। ইন্দ্রিয়সুখের ধারণা পাল্‌টে একেবারে ঐ ভাবকে উল্‌টে দেবার এবং উচ্চস্তরে কর্ম এবং চিন্তাশক্তি পরিচালনা করবার যে প্রবৃত্তি শিক্ষার দ্বারাই তার প্রবর্তন সম্ভব। কিন্তু সে শিক্ষাই নাই, ও ভাবের শিক্ষা এখনকার দিনে,—দেশবাসীর স্বপনেরও অগোচর,- নয় কি?

বামা উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন, কেনে বাবা, তোমাদের কোলকাতার মাঝেই তো তার ব্যবস্থা রয়েচে?

কোথা? আমি ত শুনি নি?

শুনবে কেনে, গ্রামের যোগী ভিক্ পায় না। তোমরা দেশ বিদেশ ঘুরে লম্বা চওড়া সাধু দেখে তবে ভক্তি কর, তার কাছ থেকে গীতার বুলি শুনতে ভালবাস। ঘরে যে ঠাকুর রয়েছে তাঁর কাছে সব পাওয়া যায়, কোথাও যেতেই হবে না, সেখানে তোমরা যাবে কেনে বাবা! সেদিকে নজরই পড়বে না।

কার কথা বলচেন? জিজ্ঞাসা করিলাম।

কেনে বাবা, ঐ রামকিষ্টো পরমহংসের নাম শুন না? পরে শ্রদ্ধাভরে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—তোমাদের গাঁয়ের যোগী যে গো। তাঁর কাছে তোমরা যাবে কেনে?

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম,—তিনি আমার ঐভাব লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—শেষে তিনি ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে কাছে রেখে কেমন করে কামিনীসংসর্গ, সাংসারিক ভোগের দিক থেকে মনকে তুলে নিয়ে ঈশ্বর পানে চালায়ে দিতে হয়, মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে ভগবানের চিন্তায়, তাঁরই কাজে লাগাতে হবেক এইভাবে তাদের তৈরী করে যান নাই? হোই হোথা, দক্ষিণেশ্বরের মায়ের হোথা তাঁর হাতে-গড়া ছেলের দল, এখন তারা কত বড় হয়েচে, বেলুড়ে মঠ দিয়েচে শুন নাই? বিবেকানন্দ, রামকিষ্ট মিশন করে কত দেশের কাজ করচে?—তুমি কি বাবা দেশকে থাক না?

ভাবিয়া দেখিলাম, ক্ষ্যাপা এই রামকৃষ্ণকে লইয়া আজ এক নূতন আলোকপাত করিলেন আমার মধ্যে। কৈ এভাবে ত ভাবিয়া দেখিনাই—পরমহংসদেবের ক্রিয়াকর্ম শেষের দিকে কোন্ পথে গিয়াছিল? অথচ শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত কতবার পড়িয়াছি, তাঁর ঐ অমৃতময় বাণী অন্তরে অনুভব করিয়াছি, ভক্ত রামচন্দ্রের রামকৃষ্ণচরিত পড়িয়া অন্তরে অধ্যাত্ম প্রেরণা অনুভব করিয়াছি—এমন কি বেলুড় মঠেও আমি অপরিচিত নই। মনের মধ্যে এই ধারণা হইয়াছিল যেন তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার তাহা জানিয়া গিয়াছি। আর জানিবার কিছুই নাই। সত্যই তো। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব বালকদের লইয়াই শেষের দিকে থাকিতেন, তাহাদের লইয়াই অপার্থিব আনন্দ পাইতেন, কি গভীর ভালবাসা দিয়া তাহাদের বাঁধিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তো পাইয়াছি—তাহাদের লইয়াই ত তিনি এক পবিত্র সংঘ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—তাহা হইতে

কি বিরাট কর্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে "রামকৃষ্ণ মিশন"। আমি ত যথার্থ আকাশ হইতে পড়ি নাই। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরিমহারাজ এঁদের সঙ্গে আমি পরিচিত। সময়ে সময়ে কত আনন্দই না করিয়াছি ঠাকুরের এবং স্বামীজীর তিথিপূজা উপলক্ষে বেলুড়ে রাত্রিবাস করিয়া। কিন্তু এই সকল-কিছুই ঠাকুরের শিক্ষার ফল, জীবের সেবা নারায়ণ জ্ঞানে,—একথা কে না জানে? অথচ ঠাকুরের শেষ জীবনের সঙ্গে পরিচয় অভাবে, ঐ সঙ্গের সব কিছুই তাঁহার শিক্ষার ফল এটুকু লক্ষ্য করি নাই। সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেই এরূপ হইয়াছে—বুঝিলাম।

শেষে বলিলেন, বাবা পথতো পড়েই আছে, যাচ্চে কে? কেবল তর্ক আর তর্ক, আর কেউ শিখায় না, কেউ বোলে দেয় না—এই রকম অভিযোগ; এই করতে করতেই তো বেলা ফুরিয়ে এলো বাবা, শিখবে কখন? ক্ষ্যাপার প্রকৃতির উদারতায় বিস্মিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত একজন সাধু অপরের কথায় শ্রদ্ধান্বিত দেখি নাই, ক্ষ্যাপার কাছে সবই সরল সত্য—ঈর্ষা-দ্বেষশূন্য মুক্ত আত্মা,—গুণগ্রাহী প্রকৃতি তাঁর। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কখনও যান নাই। এইখানে বসিয়াই সব কিছুই দেখিয়াছেন। অবশ্য মুক্ত পুরুষ তিনি, যা কিছু দেখিয়াছেন মুক্তভাবেই দেখিয়াছেন।

এবার তারাপীঠ হইতে বিদায় লইয়া নলহাটির দিকে যাত্রা করিলাম। পথে রামপুরহাট, রাত্রে রামপুরহাটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সারা পথটাই বামার কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি। সিদ্ধ তান্ত্রিক মানুষ, ও রকম আর হইবে না। যতক্ষণ জীবিত থাকেন ততক্ষণ অতি অল্প লোকেই তাঁহাদের সন্ধান পায়। তারপর যখন দেহত্যাগ করেন তখন স্মৃতিরক্ষার প্রবৃত্তি বলবান হইয়া, ঐদিকে তখন কর্ম্ম শুরু হয়। বামার সাধনস্থল এখনও আছে কিন্তু সেখানে বসিবার উপযুক্ত কেউ আসিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁর শিষ্য তারা,—তিনিও ক্ষ্যাপা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষ্যাপা পদবীধারী এক শ্রেণীর তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায় তাদের দলের সবাই ক্ষ্যাপা। ঐ তারা ক্ষ্যাপার সঙ্গে আমার মাত্র একবার দেখা হইয়াছিল। তখন তাঁর যোগবিভূতির কথা শিষ্যপ্রমুখ অনেক ব্যক্তির কাছে শুনিয়াছিলাম;—কিন্তু আমার নিজের ধারণা অনরূপ বলিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ আর উল্লেখ করিলাম না।

॥ ৯ ॥

রামপুরহাট থেকে নলহাটি গেলাম। এরা বলে এই মহাপীঠে দুর্গার গলার নলি পড়িয়াছিল, তাই দেবী নলাটেশ্বরী। মন্দির, নাটমন্দির এবং তৎসংলগ্ন যাত্রী-নিবাস কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জিত, পুরাতন, সংস্কারহীন অপরিষ্কার।

উপরের ঘরে একজন নবীন জটাধারী সন্ন্যাসী বসিয়া পুঁথি দেখিতেছিলেন একখানি জীর্ণ গুলবাঘের ছালের উপর, তাঁহার পাশে কয়েকখানি পুঁথি লাল কাপড়ে বাঁধা। আমি নমস্কার,—বলিতেই,—নমস্কার বলিয়া তিনি মুখ তুলিয়া আমায় দেখিলেন,—মিনিট খানেক মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া,—একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—হুঁ,—উঁউঁউঁ—ম, দীর্ঘটান হুম্ শব্দের পর, চক্ষু নামাইয়া পুনরায় পুঁথিতে মন-নিবেশ করিলেন। আমি কাঁধ হইতে

কম্বলখানি একদিকে নামাইয়া জীর্ণ মাদুরের উপর উহা পাতিয়া রাখিলাম, তখনই বসিলাম না। কমণ্ডলু রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম কিন্তু ঐ জটাজুট সমাযুক্ত হুম্ শব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগীর কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল। ঐ শক্তির বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ না করলে হয়তো কাছে বসিয়া কিছু কথাবার্তা বলিতাম। উনি হয়তো ভাবিতেছেন, ছেলেমানুষ আমি, সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইব তাই দৃষ্টিমাত্রই নিজ শক্তিমত্তার বিজ্ঞাপনটি ঐভাবেই দেখালেন।

বাহিরের চারিদিক দেখিয়া আমার মন বসিল না, ভিতর পানেই টানিতে লাগিল। হোক্ না ভণ্ড,—আমার কি, আমি ত কিছু পাইতে পারি,—একটু অভিমান ঘুচাইয়া নিকটে যাইয়া বসিতে ক্ষতি কি? আবার ফিরিয়া ভিতরে আসিলাম। এবার তিনি নিজেই আগে কথা কহিলেন,—বাবার তারাপীঠ থেকে আসা হচ্চে বুঝি?

বিস্ময় লুকাইয়া সপ্রতিভ ভাব দেখাইয়া বলিলাম,—আজ্ঞে হাঁ।—তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বৈদ্যনাথধাম থেকে আসচেন?

না,—কামরূপ থেকে আজ চার পাঁচ দিন হল এসেছি। দেখিলাম, আমার অনুমান ব্যর্থ হইয়া গেল,—এবার নিজেকে ছোট মনে হইতে লাগিল; মনে আরও এই কথা উঠিল যে ইনি সাধারণ ভৈরব শ্রেণীর শাক্ত নন। তা বলিয়া তারাপীঠের বামার মতও নন।

বাবাজী বুঝি কামরূপ যাবার ইচ্ছা?

এবার অকপটে সত্য স্বীকার করিলাম।

শুনিয়া বলিলেন, ওখানে উমাপতি বাবার কাছে যাবেন,—তিনি এখনও কিছুদিন ওখানে থাকবেন!

বলিলাম, নিশ্চয় যাবো।

তিনি কামাখ্যার উপরে ভুবনেশ্বরীতেই থাকেন। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, বাবার গুরুস্থান কোথা?

বলিলাম, শিঙের মঠ,—স্বামী পরমানন্দ আমার ইষ্ট—

জানি, কলকাতা, রামরাজাতলায় শঙ্কর মঠের স্বামী ত?

আপনি ত সব জানেন দেখচি, বলিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবেই বসিলাম।

আপনার প্রথম কিম্বা আসল গুরু ত তিনি নন,—তিনি আপনার উপগুরু, —নয় কি?

আপনি যথার্থই বলেছেন, কিন্তু যখন তিনি জীবিত তখন আসল গুরুও বলা যায় তো?—

তা হলেও তিনি আপনার আসল বা যথার্থ গুরু হতেই পারেন না,—

কেন? আপনি এমন কথাটা বললেন, বুঝলাম না।

কারণ যাঁর বৈত্তেষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি প্রাকৃত দুর্বলতা আছে আপনি জেনে-শুনে তাঁকে গুরুস্থান দিতে পারেন কি?—

বা, এতো দেখি,—সাঙ্ঘাতিক স্পষ্টবাদী মানুষ। বলিলাম, আপনি কি তাঁর ওরকম কিছু পরিচয় পেয়েছেন?

আপনি নিজ সিদ্ধান্ত গোপন করচেন কেন? আপনিও কি পান নি? তবে শেষে পেয়েছেন, আগে পেলে কিছুতেই সম্বন্ধ ঘটতো না—বলুন না সত্যি কিনা?

সত্য, সত্য, সত্য, আপনার প্রত্যেক কথাই সত্য—তাঁর কথা আর আলোচনায় কাজ নেই—

না, বলিয়া তিনি স্থির হইলেন। আমার মনে তখন আর একটা কথা উঠিল,—এসব কি উনি যোগসিদ্ধির ফলে বলচেন?

না, না, সহজ ব্যাবহারিক সত্যগুলি জানা বা প্রকাশ করার জন্য কোন সিদ্ধাইয়ের প্রয়োজন নেই, তবে স্থির ও সহজ বুদ্ধির প্রয়োজন আছে এটি সত্য।

আমার প্রথম বা প্রধান গুরু সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন?

আপনি জিজ্ঞাসা করেন ত বলতে পারি, তবে কেমন করে জানলাম একথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলব যে—তিনি আমারও ইষ্ট,—তাঁকে ধরেই আমার প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ,—আমার সব কিছুই তিনি—এখনও আছেন,—চিরকালই থাকবেন যতদিন আমার অস্তিত্ব থাকবে। আরও জানি, তিনি শুধু আপনার আমার নন,—তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁর স্থান সবার উপরে। অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে আমাদের।

আমার মনে হইল, ওসব পুঁথিপত্রগুলি কি? বা কেন?—

তার উত্তরে বলিলেন—তিনি ত বারণ করেন নি? নিজ সাধনের সঙ্গে ও সকল কিছু কিছু মিলিয়ে দেখতে হয়। তাতে ভালই হয়,—নিজের সাধনের উপর, নিজ নির্বাচিত পথের উপর বিশ্বাস বাড়ে।

এইবার আমাদের যথার্থই মিলন হইল,—বুঝিলাম ইঁনিও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত।

তখন জিজ্ঞাসা করিলাম জটাজুট রেখেছেন কেন? তিনি বলিলেন,—প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য তারপর সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী অবস্থায় রুদ্রাক্ষ ও জটাজুট ধারণের বিধি আছে, তাতে শক্তি সঞ্চিত হয়। আমাদের এতে শক্তির অপব্যবহারের সম্ভাবনা নেই। এইবার পর্য্যটন শেষ করে মঠে (বেলুড়) ফিরে যাব, শিখা-সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবো। রাখাল মহারাজ এই আদেশ দিয়েচেন।

—আমারও মঠে যাতায়াত আছে,—সেইসূত্রেই শুনেছি রাখাল মহারাজ এক সময় অনেক কিছু কঠোর তপস্যা করেছেন।

তিনি বলিলেন, ঠাকুরের সন্তান যাঁরা, প্রত্যেকেই কঠোর সাধনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের সাধন-কথা এতটা প্রচ্ছন্ন আছে যে বেশীরভাগ লোকেই জানে না।

সত্য,—কথামৃত এবং তাঁর সম্বন্ধে আরও অন্যান্য বই পড়ে মনে হয় যেন নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি যাঁরা তাঁর প্রিয় সন্তান তাঁরা সবাই যেন তাঁর আদরেই মানুষ হয়েছেন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কঠোরভাবেই সাধনা করেছেন। সাধনকে প্রচ্ছন্ন রাখাই এঁদের বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুরের মধুর ব্যবহার আর মধুর কথায় আমরা এতটাই মুগ্ধ যে, তাঁহার মধ্যে কতটা কঠোরতা ছিল সেদিকে লক্ষ্যই করিতে পারি না।

ইতিমধ্যে আমরা একটু মনের কথাও কহিয়া ফেলিলাম!

ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ অনুভূতি জাগিয়াছিল তাহাও এই সূত্রে তাঁহাকে বলিলাম,—ঠাকুরের শিক্ষা প্রণালীই ছিল অপূর্ব,—পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় এ নূতন। এতাবৎকাল, যা পড়ে শুনে বা দেখে এসেছি জগতের সর্বদেশের আচার্য্যগণ তাঁদের উপলব্ধ সত্য সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন,

শিষ্যবর্গকেও সদুপদেশ দিয়েছেন—শিষ্যবর্গও গুরু বা আচার্য্যকে শ্রদ্ধা বা সম্মান দিয়ে এবং সর্বদাই আজ্ঞাবাহী সেবকভাবেই গুরুর সঙ্গে সম্ভ্রম-গভীর সম্বন্ধ রক্ষা করেছেন কিন্তু ঠাকুরের ব্যবহারে তাঁর অনুগতজনের প্রতি প্রীতির তুলনা নাই! এত ভালবাসা, এভাবের ভক্ত-প্রীতি শ্রীচৈতন্যের পর আর কারো দেখা যায় নি।

ব্রহ্মচারীর নাম ভরত,—শুনিয়া তিনি বলিলেন,—প্রথম কথাটি আপনার বাস্তবিকই সত্য এবং অতুলনীয়। তাঁর শিক্ষা-প্রণালী আশ্চর্য্যরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ; —এমন অদ্ভুত শিক্ষাদান-প্রণালী আর কোথাও দেখা যায় নি। যাঁদের তিনি পরীক্ষা করে একবার আশ্রয় অথবা আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁরা চিরকালের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছেন। সবাই আলাদা আলাদা প্রকৃতির মানুষ, কাকে কি ভাবে চলতে হবে,—তারপর কথা, কারো আত্মভাব নষ্ট না করে, তার নিজ সংস্কারের ভেতর দিয়ে আপন পথে চালানো এ যুগের একটি পরমাশ্চর্য্য তত্ত্ব,—একথা ধারণা করতেও বহুদিন লাগবে।

আমি বলিলাম, এটা পদার্থ বা বস্তু-বিজ্ঞানের যুগ হলেও যে কল্যাণময় পন্থা তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন তা সর্বযুগে স্মরণীয় তত্ত্ব বোলে চিরদিনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে,—আমাদের পথের আলো দেবে তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ব্যবহার—দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, শেষ কাশীপুরের বাগানে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত।

তিনি বলিলেন,—রাখাল মহারাজ বলেন, ঐ প্রবল ক্ষয়কারী-ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্যেও, এমন কি তাঁর দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্তেও তাঁর প্রকৃতিগত পরমানন্দময় ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নি আমরা।

প্রত্যেক ভক্তটি, গৃহী হোন বা সন্ন্যাসীই হোন সবাই মনে করেন যে সর্বাপেক্ষা তাঁকেই তিনি বেশী স্নেহ করেন। মহাপুরুষ মনে ক'রে কেউ তাঁর কাছে যেতে সঙ্কোচ করেচে এমন কাকেও কত সহজভাবে আপন করে নিয়েচেন, তাতে তার জীবন সার্থক হয়ে গেছে—এমন কত কত হয়েচে।

এমন অভিমানশূন্য ভাব আর পাশমুক্তির এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিরল,— এইসব কারণেই তাঁকে মানুষ বলা যায় না—অবতার বলে নিশ্চয় করেছিলেন, —অগ্রগণ্য ভক্তবৃন্দ সব। অবতার বলতে আমাদের যে ভাবটি আসে তা নিছক কল্পনা,—সেই কারণে তা মিথ্যা—তাই তাঁকে আমার অবতার বলতে প্রাণ চায় না,—মনে হয়, তাঁকে বরং ইষ্ট বলতে পারি,—আমার ইষ্ট, তার চেয়ে আর বড় কি হতে পারে? যিনি ইষ্ট আমার, কত নিকট,—কত আপন ; সম্বন্ধটি সহজ হয়ে পড়ে।—কিন্তু ভগবান বা অবতার বলতে যেন কতদূর, আমা থেকে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে,—তাঁকে তফাতে রাখা হয়। ও আমি মোটেই চাই না— আমার এই ভাব। আপনার কি ভাব?—

আমি—আপনি যেমন সরলভাবে সহজেই তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের কথাটা এমনি করে বোলে দিলেন, আমি কিন্তু অতটা সরল হতে পারি নি। আমার মনে হয়, যখন ঠাকুর হলেন আমার গুরুমহারাজের ইষ্ট তখন আমার পক্ষে ত তাঁর কথা, তাঁর জীবন অতটা বিশ্লেষণ আলোচনার যেন অধিকারই নেই। তাঁর কথা আমরা সব ধারণাই করতে পারি না। বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব-সকল অত সহজ কথায় হলেও আমাদের পক্ষে কত কঠিন। তাঁর নিজ জীবনই ছিল বেদান্ত-তত্ত্বময়,—আমাদের পক্ষে কত কঠিন, তা ধারণা করা?

পর্য্যন্ত চলিল,—কিন্তু তাহার মধ্যে কোন কথা এমন হইল না যাহাতে তাঁহার যথার্থ স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। অবশ্য আমরা উভয়েই তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত একথা বলিলে ভুল হয় না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অনুভূতির তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারী ভরত রাখাল মহারাজকে অবলম্বন করিয়াছেন, ঠাকুরকে ঠিক ঠাকুরের মত স্থানে রাখিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিচার নাই, ঠাকুর যখন তিনি ঠাকুরই তাঁহার চরিত্র-কথা আলোচনার যোগ্যই নই আমরা, আমাদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ একমাত্র ভক্তির,—বিচারের নয়। আমার কিন্তু ভিন্ন ভাব। রাখাল, বাবুরাম, শশি, তারক, শরৎ, মাষ্টারমশাই, মহিনদা, রামলালদা এমন কি লাটু মহারাজ পর্য্যন্ত এঁরা সবাই আমার গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী, সবাই আমাকে স্নেহ করিতেন, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এক সময় সবার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পূর্ব পর্য্যন্তও ছিল,—(যথা সময়ে সে সকল কথা বলিব) কিন্তু তা বলিয়া ঠাকুর-চরিত্র আলোচনা কম ছিল না ;—আমার মূল উদ্দেশ্য ঐ ঠাকুর সম্বন্ধে সকল কিছু জানিবার জন্যই মঠে যাইতাম এবং ইঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখনকার বায়ুমণ্ডল, বেলুড় বা দক্ষিণেশ্বরে যাঁহারা যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা সবাই হয়ত অনুভব করিয়াছেন, ঐ সকল স্থান ঠাকুরের প্রভাবে তপ্ত ছিল—অন্ততঃ আমি এইরূপ প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করিতাম। জন্ম-উৎসব বা তিথি-পূজার কথা স্বতন্ত্র,—তখন আনন্দ-উৎসব সংক্রান্ত একটা বিরাট আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহাতে বিক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্থান নির্জন হইলে, অথবা বেলুড় মঠে দৈনন্দিন ব্যবহারে যাঁহারা রাখালমহারাজ প্রভৃতির নিজমুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সে কি বস্তু। জিজ্ঞাসার উত্তরে একরকম, আবার যখন নিজেরাই ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতেন তখন আর এক রকম,—যেন প্রত্যক্ষভাবেই ঠাকুরের সঙ্গলাভ হইত। শ্রীম-কথিত কথামৃত ছাড়া লীলাপ্রসঙ্গ, যাহা শরৎ মহারাজের অক্ষয়-কীর্ত্তি, রামচন্দ্রের রামকৃষ্ণ চরিত্র প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে আরও জানিবার প্রবল তৃষ্ণা জাগিত, সেই কারণেই মঠে বা দক্ষিণেশ্বরে রামলালদার শরণাগত হইতাম। সেই বাল্য বা কৈশোর হইতে ঠাকুরের কথা পড়িয়া এবং আলোচনা করিয়া (আজ আয়ুপ্রান্তে আসিয়া) যতই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততই দেখিয়াছি পর পর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়া গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্বে তাঁহার অস্তিত্ব ফুটিয়া যেন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইতে চাহিতেছে। এক এক সময় মনে হইয়াছে তিনি চিরদুর্জ্ঞেয়, তাঁহার ইতি করিবার যো নাই।

যাহা হোক নলহাটিতে,—ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই আমার সবটা সময় কাটিয়া গেল—আর কিছু দেখাশুনা হইল না,—ভালই লাগিল না,—পরে উভয়েই একসঙ্গে আজিমগঞ্জে আসিলাম,—তিনি কলিকাতার দিকে গেলেন, আমি আজিমগঞ্জে এক নবীন বন্ধু ফতে সিং কুটারীর আশ্রয়ে দিন দুই কাটাইয়া পরপারে জীয়াগঞ্জে আসিয়া কামরূপের পথেই রওনা হইলাম এবং তৃতীয় দিনে আমিনগাঁওয়ে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম।

॥ ১০ ॥

এপারে আমিনগাঁ ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম, পাণ্ডু ষ্টেশনে একখানি ট্রেন দাঁড়াইয়া, আসাম যাইবে। প্রথম ষ্টেশনই কামরূপ।

প্রাচীন কামরূপের মহিমার কথা ও ওখানকার তন্ত্রমন্ত্র জাদুবিদ্যার কথা ত আমাদের এই বাঙ্গলার বোধ হয় সকলকারই কানে শোনা আছে, আর তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, কামাখ্যা দেবীর প্রভাব আমাদের এ দেশের মানুষের উপর তখনকার দিনেও অনেক বেশী ছিল। বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণের কাছে কামাখ্যা-মাহাত্ম্য বা কামরূপ সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদের প্রভাব এখন যতটা নিষ্প্রভ মনে হোক না কেন আমার মত একজন কল্পনাপ্রবণ শিল্পীর মনের মধ্যে তখন উহার প্রভাব বেশ ভালো রকমই ছিল। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-অর্জনের উদ্দেশ্যে যাইতেছি তখন ঐ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব মানব মনের বৈচিত্র্যহেতু তখন এমন একটা স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ হইয়াছিল, যাহা সম্পূর্ণ একালেরই গুণ। তাহা তখন প্রবল ভাবেই আমার মধ্যে কাজ এবং অবস্থা বিশেষে আমায় রক্ষাও করিয়াছিল। যাহা হোক্, এখন আমি ত পাণ্ডু ষ্টেশনে পেঁৗছিয়া ঐ ট্রেনে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলাম যদিও আমার মত যাত্রীর এটুকু হাঁটিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তারাপীঠ ছাড়িবার পর শরীর ভালো ছিল না। কেমন যেন মাথার উপর সর্বক্ষণ একটা ভার অনুভব করিতাম। সেইজন্য ট্রেনে যাওয়াই ভালো মনে করিলাম।

যে গাড়ীতে বসিয়াছি তাহার চারিখানি বেঞ্চ্; দেওয়ালে লেখা আছে চব্বিশ জন বসিবেক। তবে তখন তাহাতে আট দশজন লোক, বা যাত্রী বসিয়াছিল। প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যবশত বসিয়াই একবার ভালো করিয়া সকল দিক দেখিয়া লইলাম, এইজন্য যে, কি ভাবের লোক সঙ্গ পাইয়াছি।

দেখিলাম, সম্মুখে একখানি বেঞ্চে অপরূপ একটি মূর্তি, তাঁহার দুই দিকে তাঁহারই সব ঝাঁপি-বোচকা ইত্যাদি, মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তি নিজ মহিমায় উপস্থিত সকলকারই আকর্ষণের বস্তু হইয়া আছেন। আরও দেখিলাম, সবারই লক্ষ্য তাঁহার দিকে ত নিশ্চয় ছিলই উপরন্তু তাঁহার সম্বন্ধেই যা কিছু কথাবার্তা মৃদুস্বরে তাহাদের মধ্যে হইতেছিল। তাহাদের লক্ষ্য বস্তুটি আমার পক্ষেও কম আকর্ষণের হইল না। কিন্তু মুগ্ধ হইবার ভার আমার অন্যান্য সহযাত্রীদের উপর দিয়া এখন তাঁহার কথাই একটু বিশেষভাবে বলিয়া লইতে চাই।

মাঝামাঝি লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, লোকটির মূর্তি মোটা সোটা নয়, অত্যন্ত সুস্থ এবং বেশ বলবান। বড় বড় চুলের সঙ্গে মাথায় জটার বোঝা, ঘন ভ্রূযুগলের নিচে উজ্জ্বল দুটি রক্তাভ চোখ আর কপালে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক বিভূতির উপর তৈলাক্ত সিন্দুরের বেশ বড় একটি উজ্জ্বল ফোঁটা! স্থূল অধরোষ্ঠ, তাহাতে অল্প মানান-সই গোঁফ্ এবং দাড়ি, ইহাই তাঁহার রূপের প্রধান বস্তু। পরনে লাল বস্ত্র এবং উত্তরীয় বা বহির্বাস, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, আবার প্রবালসংযুক্ত ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালাও আছে। দুই হাতের উপরে নানা রত্নসংযুক্ত বড় বড় রুদ্রাক্ষের তাগা। সব মিলিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে এই যে মূর্তিটি, তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। আরও একটি কারণে তাঁহাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব,—সেটি তাঁহার বসিবার ভঙ্গী। বেঞ্চিতে পা ঝুলাইয়া আমরা সাধারণতঃ বসি, কিন্তু তাঁহার বসাটা সে প্রকারের নয়। মেরুদণ্ডের সঙ্গে মস্তক এবং উপর শরীরটি সোজা কাঠের মতই শক্ত করিয়া রাখা, উহাকেই জালন্ধর মুদ্রা বলে। দুইখানি হাত জড়াজড়ি করিয়া বুকের উপর বন্ধ,—দেওয়ালে পিঠটি ঠেকানো আছে বটে, কিন্তু পা দুটি একেবারে

সোজা মেঝের উপর এমনই দৃঢ়ভাবে রাখা যেন কখনই নড়িবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নিচের দিকে, ঠিক যেন কতকটা দূরস্থ কোন একটি বিন্দুতেই আবদ্ধ,—বয়স তাঁহার পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যেই। তাঁহার ঐ দৃষ্টির মধ্যে আরও একটু বৈশিষ্ট্য দেখিলাম, চক্ষু দুটি মুখের সঙ্গে বেশ মানানো বটে কিন্তু তারা দুটি আকারে একটু ছোট বলিয়া রক্তাভ শ্বেতক্ষেত্রটি বেশ বড়ই দেখাইতেছে। মনে হয় তাঁহার সহজ চাহনিটা হয়ত মধুর ভাবেরই হইবে, কিন্তু বর্তমানে তাহা মোটেই সহজ ছিল না। প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাতে একটা প্রখর নিম্ন দৃষ্টি ঐখানেই যেন কতকটা ভয়ের ভাব আনিয়া দেয় সাধারণের মনে। আরও মনে হয় প্রত্যেককেই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার একটা উদ্দেশ্য তাঁহার মনে প্রচ্ছন্ন আছে! অন্ততঃ মনে মনে আমি ঐ রকমই তখন বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্মুখস্থ যাত্রীগণ যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা মুগ্ধ হইয়া মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যেই তাঁহার মাহাত্ম্য আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, ইহা আমি অনুমানের সাহায্য না লইয়াই বলিতে পারি।

দেখিতে দেখিতে দুই চার জন করিয়া যাত্রী আসিয়া পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বেঞ্চের সকল স্থানই পূর্ণ হইল ;—দেখা গেল, এখন একমাত্র ঐ ভৈরব মূর্তির বেঞ্চটি তখনও অনেকটাই খালি ছিল তিনি এবং তাঁর বোঁচকা-বুঁচকি সমেত। এমন সময় একটি ফুটফুটে গৌরবর্ণ, হাফ্‌প্যাণ্ট ও হাফ্‌হাতা খাকি সার্ট পরা, দাড়ি গোঁফ্ কামানো পরিষ্কার, বয়স প্রায় চব্বিশ পঁচিশ —যুবা-পুরুষ যাহাকে বলে এমনি একজন, হাতে এ্যাটাচিকেশ, পিছনে কুলির মাথায় পোর্ট ম্যাণ্টোর উপর বাঁধা বেডিং আসিয়া ঢুকিল। ঝটিতি এক দৃষ্টিতে কামরার সকল বেঞ্চের অবস্থা দেখিয়াই ঐ ভৈরব মূর্তির কাছে আসিয়া তাহার নিজ মালপত্র বাঙ্কের উপর তুলিয়া রাখিল, পরে কুলিকে বিদায় করিল। তারপর একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সকল দিকই দেখিয়া লইল। ইতিমধ্যে আরও দুজন আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিতেছে, তাহারা আসিয়া বসিতে সাহস করে নাই। এখানেও যুবার দৃষ্টি পড়িয়াছিল, যদিও তাহার একলার বসিবার জায়গা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে না বসিয়া জটাধারী ভৈরবের দিকে তাকাইয়া বলিল,—আপনার মালপত্রগুলো বেঞ্চের নিচে কিংবা উপরের বাঙ্কে রাখলে এখানে দু'চার জন বসতে পারেন, ওগুলো একটু সরান্ না?

না রাম না গঙ্গা, কোন কথাই নয়। এমন কি এতগুলি কথা যে তাঁহাকেই বলা হইয়াছে অথবা কথাগুলি তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে বাহ্যভাবে ইহার কোন লক্ষণই সেই অচলায়তনের মধ্যে পাওয়া গেল না। কোন অঙ্গও তাঁহার নড়িল না, ঠিক প্রস্তর মূর্তির মতই স্থির। যোগী বটে। তখন সেই যুবা পুরুষ আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই,—তাহলে আমিই সরিয়ে রাখচি, কিছু মনে কর্বেন না। বলিয়া ভৈরবের মালগুলি কতক উপরে কতক নিচে রাখিয়া দিল এবং যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল,—আসুন না বসা যাক্! সন্তুষ্ট চিত্তে এখন তাহারা আসিয়া বসিল, যুবাও বসিল। তখন দেখা গেল তবুও ঐ ভৈরবের পাশে আরও দু তিনজনের বসিবার মত জায়গা খালি পড়িয়া আছে। কতক্ষণে গাড়ী ছাড়িবে—এইবার আমার সেই ভাবনা হইল যদিও ভৈরব অথবা ঐ যোগীবরের একাসনে একই ভঙ্গিতে দৃঢ় উপবেশনের

দৃশ্যে আমার মনে নানা অদ্ভুত ভাবের আলোড়ন চলিতেছিল। এবার আর এক বিচিত্র ব্যাপার দেখিলাম, আমার পার্শ্ববর্তী সেই প্রথমাগত যাত্রীগণ যাহারা মুগ্ধ হইয়াই ঐ ভৈরবের কথা আলোচনায় রত ছিল, তাহারা বেশ একটু ভয় পাইয়াছে। তাহাদের মুখটি চূর্ণ এবং প্রত্যেকের চক্ষেই একটা আতঙ্কের চিহ্ন বিদ্যমান দেখিলাম। এই দৃশ্য নবাগত নির্ভীক ঐ যুবার চক্ষু এড়াইল না। আরও দেখিলাম সে উহাদের ভাবটা লক্ষ্য করিল এবং তাহাদের মধ্যে আলোচনা মনোযোগ-পূর্বক শুনিতে লাগিল। উহারা যে কেন ভয় পাইয়াছে তাহা সে ঠিক ধরিতে পারে নাই অথচ অন্তরে সে যে, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছে তাহাও বুঝা গেল তখনই, যখন সে ঐ ভৈরবের পানে চাহিয়া অতি মধুর ভদ্র ও বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি কিছু ক্ষতি করেছি আমি, কোন অসুবিধা হয়েছে কি আমাদের এখানে বসাতে?

কোন উত্তর নাই।

সেই দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট এবং ততোধিক দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ নিম্ন দৃষ্টিই তাহার উত্তর। যুবা যে কি ভাবিল তা সে-ই জানে। কোন উত্তর না পাইয়া সে তাহার বাক্সের ভিতর হইতে একখানি ইংরাজী পুস্তক বাহির করিল এবং দরজার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। আর এদিকে একদল, যোগীর জিনিসপত্র অপর একজনের দ্বারা নাড়ানাড়ি হওয়ায়, তাঁহার, কোপে কি সর্বনাশই-বা হয়, অস্বাভাবিক ব্যাপার অথবা অমঙ্গলজনক কিছু ঘটিয়া যায়, প্রতিক্ষণেই এইরূপ আশঙ্কা সবাই করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মুখ-চোখের ভাবগুলি দেখিবার মত।

অস্বাভাবিক তখনই কিছু ঘটিল না বটে, কিন্তু ঐ কম্পার্টমেণ্টের হাওয়ার মধ্যে বিষম ভাবের একটা কিছু তালগোল পাকাইতেছে, কেবলই আমার ইহা মনে হইতে লাগিল। তারপর এইবার ট্রেন ছাড়িবার আগে পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি স্ত্রী ও পুরুষ কিছু জিনিসপত্র কুলির মাথায় লইয়া আমাদেরই কক্ষে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িল। বলিয়াছি, প্রায় সব জায়গাই ভরিয়াছিল কেবল ঐ ভৈরবের বাঁ দিকে দুই তিনজনের স্থান তখনও ছিল; তাহারা সংকুচিতভাবেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না দেখিয়া ঐ যুবা তাহাদের আহ্বান করিল—আপনারা আসুন্ না এখানে, জায়গা ত রয়েচে, বলিয়া সেই দিকেই দেখাইয়া দিল। তাহারাও প্রসন্ন মনে আসিয়া ঐ স্থানে বসিল। আগে ভদ্রলোকটি আসিয়া বসিলে

পিছনে পিছনে নারী তাহার পাশে বসিল। এ পর্য্যন্ত বেশ সহজ ভাবেই সব কিছু হইল।

আমাদের ঐ জটাজুটসমাযুক্ত সাধু ভৈরবেরও কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। এই যে যাত্রীগণের ওঠা-বসা, জায়গা সকল পূর্ণ হওয়া, এ সকল যে তাঁহার গোচর হইয়াছে, বাহ্যে তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তাঁহার পাশেই একজন ভদ্র পুরুষ ; অবশ্য গায়ে গা ঠেকে নাই যথেষ্ট ফাঁক ছিল, তার পাশে একটি মেয়ে বসিয়া, এ সকল তাঁহার লক্ষ্যই নাই। মেয়েটির অল্প বয়স, বোধহয় আঠার বা কুড়ি হইবে। সুন্দরী, গৌরী কিন্তু হিন্দু ঘরের বিবাহিতাদের যেরূপ মাথায় কাপড় অথবা সীমন্তে সিন্দুর থাকে সে সব তাহার কিছুই নাই, অবশ্য নারী-মর্য্যাদার কোন অভাবও নাই। পুরুষটির চেহারা বড়ই কঠোর, কাপড়ের উপর সিল্ক কোট, বুকে সোনার চেন ঝুলিতেছে, গোঁফ আছে দাড়ি নাই, দৃষ্টি তাহার তীক্ষ্ম, স্থূল শরীর, বয়স প্রায় চাল্লিশ হইবে। উভয়ের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ হইতে পারে, মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম ঐ নারী, নিজ স্থান হইতেই স্থির, অবাক্ বিস্ময়ে একদৃষ্টে ঐ কঠোর ভৈরব-মূর্তির পানে চাহিয়া আছে। এইবার গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের বাঁশীও বাজিল। ক্রমে গাড়িখানি একটু দোলা দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক ঐ সময় প্রথমে মেয়েটির তাহার হাতখানি ধীরে ধীরে বুকের উপর রাখিল, --তখনও ঐ ভৈরবের দিকে দৃষ্টি তাহার নিবদ্ধ, তারপর—'উঃ, বাবা গো' বলিয়া একেবারেই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। গাড়ী তখন বেশ জোরেই চলিতেছে।

'কি হোল, কি হোল' বলিয়া তাহার সঙ্গী পুরুষটি তখনই ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিল, এবং এক হাতে তাহার মাথাটি পিছন হইতে ধরিয়া অপর হাতে তাহাকে আধ-শোয়া ভাবেই নিজের কোলে তুলিয়া লইল। এবং তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কেন এমনটি হইল, ইহা লইয়াই গাড়ীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এবং নানা মন্তব্য, নানা প্রকারের গোলমাল চলিল কতক্ষণ। ভৈরব কিন্তু তাহার মধ্যে যোগযুক্ত অবস্থায় দৃঢ়ই রহিলেন—তাঁহার সে অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

আমার পাশেই পূর্ববঙ্গের একটি কৃষক দম্পতী। পুরুষটি প্রৌঢ়, নারীটি ঠিক তা নয়, কিছু কম হইবে তাহার বয়স। উভয়েই যে ভাষায় কথা বলিতেছিল, 'বয়্যা বয়্যা আর ত পারা যায় না,—একবার জিগাও না উয়ারে, গারি কখন ছারবে?' তাহাতেই অনুমান করিলাম উহারা বরিশালের। তাহারা যে অবস্থাপন্ন তা তাহাদের পোশাক দেখিলে বুঝিতে পারা যায়! ক্রেপ শাড়ী কাপড় ও ভিক্টোরিয়া আমলের জ্যাকেট্ পরা দেখিয়া সকলেই বুঝিবে উহার কোনটিই পুরানো নয়। কামাখ্যা দেবী দর্শনেই যাইতেছে, পাণ্ডু ষ্টেশন হইতেই তাহারা একজন পাণ্ডা পাইয়াছিল এবং সে পাণ্ডাটি উহাদের বেশ হস্তগতও করিয়া ছিল। পাণ্ডাটি পাশেই বসিয়া আছে। উভয়েই অর্থাৎ যাত্রী-পুরুষ ও পাণ্ডা ঘন ঘন বিড়ি পুড়াইয়া বিকট গন্ধে ছোট ঘরটা তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কর্তার সঙ্গে পাণ্ডাঠাকুর কামাখ্যার মাহাত্ম্য এবং ওখানকার যা কিছু কথা এবং কয়দিন থাকিয়া কি কি কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে সেই সকল আলোচনা করিতেছিল, অন্যদিকে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। এখন গিন্নী কর্তাকে গা ঠেলিয়া ঐ দিকে লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিলেন, দেখ দেখ ম্যায়াটি বুঝি মারা যায়, ঐ ভৈরব বুঝি মেরে দিল।

—হুঁ মেরে দিব বল্‌লেই মেরে দেয়ান যায় না কি? ওর নিশ্চয় মূর্ছনা রোগ আছে—এইভাবে তাহাদের সবার দৃষ্টি যখন ঐদিকে পড়িয়াছে, তখন গৃহিণী অর্থাৎ ঐ কৃষক-গৃহিণী বলিল, কামাখ্যা যেতে না যেতে পথ্‌ থেকেই মারণ শুরু হোল, কেন মরতে তুমি আমারে এমন তির্থিথানে লইয়া আইলে। আমি যামুনা, গাড়ী ইষ্টিশানে আইলে চলো আমরা ফিরা্যা যাই। কর্তা বড়ই ফাঁপরে পড়িল, পান্ডার পানে চাহিয়া বলিল—এ কয় কি? ও ঠাকুর বাবা, এতদূর আইস্যা ফিরে যেতে হবে? মা জগদম্বা কখনও কি কারোর মন্দ করেন?

গিন্নী বলিল, মা করবে ক্যান? ঐসব ভৈরবগুষ্টি, তারাই যে মানুষের সর্বনাশ করে। ঐ মেয়েটি আর বাচবে কি? জিগাও না ওনারে?

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, ঠাকুর বাবা নিজেই বলিলেন,—এমন অথয়ম্ভব (অসম্ভব) কথা কেন বলেন বাবারা,—মারণ উচ্চাটন্‌ আর কোম্পানীর রাজ্যে হবার যো নাই। সেদিন এখন আর আসবে না। কার সাইধ্য কাআরে মারে,—তবে মা,—এই পর্যন্ত বলিয়া চক্ষু বুজিয়া জোড়হাত মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম পূর্বক মনে মনে একবার যেন মায়ের মূর্তি দেখিয়া লইয়া আবার বলিলেন, চিন্তা নাই, মা আপনাদের উপর সদয় আছেন,—চলুন, এই ত এলো।

॥ ১১ ॥

মেয়েটি অচৈতন্য, তাহার উপর দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ এমনই বিবর্ণ হইয়া গেল দেখিয়া অনেকেরই ভয় হইল হয়ত বা দেহে প্রাণ নাই। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঐ মুখে কতকটা যন্ত্রণার আভাস ফুটিয়া উঠিল, দেখিয়া বুঝা গেল যে, প্রাণত্যাগ ঘটে নাই,—জীবন আছে তাহার মধ্যে। গাড়ী হুহু শব্দে পূর্ণ শক্তিতেই চলিতেছিল।

এক ব্যক্তির ঘটিতে জল ছিল, সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল ও 'দেখি' বলিয়া আগাইয়া দিল জলপূর্ণ ঘটটা। তারপর শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। অবশ্য ইহার মধ্যেও যোগরূঢ় অবস্থায় আমাদের ঐ ভৈরব,—তাহার নিজ আসনে স্থির অচল, অটল ভাবেই অনমনীয় দার্ঢ্য লইয়া সেই কক্ষের মধ্যে সকলকার চক্ষে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর বস্তু হইয়া রহিল। একজন সেই দুঃস্থা নারীর সঙ্গের বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারা কোথায় যাবেন? বাবুটি বলিল,—গৌহাটি যাব আজ, কাল শিলং যাবো আমরা। এবার প্রথমাগত সেই সুট্‌-পরা যুবক জিজ্ঞাসা করিল, এ রকম মূর্চ্ছা ওঁর মাঝে মাঝে হয় নাকি? বাবুটি বলিল,—না মশাই এ রকম কখনও হয়নি। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আমি ত ওঁর অসুখ বিসুখ কখনও দেখিনি, তবে ওঁর রোবাস্ট্‌ হেল্‌থ অবশ্য কোনোদিনই নয়।

পান্ডু স্টেশন হইতে কামরূপ কামাখ্যা মোটে দু' মাইল। ট্রেন পেঁাছিবার পূর্বেই, যাহারা এখানে নামিবে, সবাই প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে আমাদের বেঞ্চির একজনের যে মন্তব্য আমার কানে গেল, তাহা এইরূপ—ভৈরবের কোপ পড়েছে, আমি আগেই জানতুম একটা কিছু হবে, এইরকমই একটা দুর্ঘটনার আশংকা আমার আগে থেকেই ভিতরে হচ্ছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—বোধ হয় উনি মেয়েটিকে মেরেই ফেলবেন। এখনও ওঁর হাতে-পায়ে ধরে তুষ্ট করলে বোধ হয় বাঁচতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—আর সময় কোথায়? এই ত কামাখ্যা এসে পড়লো। আর এক মিনিট।

এই সকল কথা শুধু আমি নয়, সেই স্যুট্-পরা যুবা ভদ্রলোকটিও শুনিয়াছিল,—সে ঘাড় তুলিয়া সবিস্ময়ে বক্তাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও বেচারার অপরাধটা কি শুনি? ওঁর জিনিস-পত্র যা কিছু সব আমি একাই সরিয়েছি, ওঁদের বসবার জন্য ডেকেছি, সেও ত আমি,—নিজে,—আমারই ত কোপে পড়বার কথা, যদি কোপে পড়বার যথার্থই কোন কারণ হয়ে থাকে?

অপরাধ মেয়েটির যে কি, অথবা কতটুকু আর যথার্থ কিছু আছে কিনা, একথা ত তাহাদের বিচারের বিষয় নয়,—তাহাদের আসল বিষয় হইল ঐ জটাধারী শিবের অবতার মহাশক্তিশালী তান্ত্রিকের জিনিসপত্র, যাহার প্রত্যেকটাই তাহারা দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া হয়ত মনে করে, উহা সরাইয়া রাখা, আবার তাঁহারই পাশে বসিয়া রেলগাড়ীতে ভ্রমণ,—এ সকল কর্ম গুরুতর অন্যায়। ওঁরা কি না করিতে পারেন? একজনকে মন্ত্র-বলে প্রাণে মারা ত ওঁদের কাছে কিছু শক্ত নয় বরং কত সহজ। ওঁদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল সাধারণ লোকের। এ সকল সিদ্ধান্ত ঐ সরলপ্রাণ সুকুমার যুবার মাথায় কখনও ঢুকে না। সে কোন উত্তর না পাইয়া শুষ্কমুখে নিজ স্থানেই বসিয়া সব দেখিতে এবং শুনিতে লাগিল। এদিকে ট্রেন তখন আসিয়া ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া গেল। তখন নামিবার ধুম পড়িয়া গেল। তখনও মেয়েটি সেইরকম—অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছে।

আমি একটু দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। গাড়িটা এখানে একটু বেশীক্ষণই দাঁড়ায় বহু যাত্রী এখানে ওঠা-নামা করার জন্য। ট্রেনখানা থামিতেই—ভৈরব উঠিল, ধীরে ধীরে আপন মনেই বেঞ্চের নীচে এবং উপরের বাঙ্কের জিনিসপত্র নামাইয়া পুঁটলী ঝাঁপি প্রভৃতি দুই হাতে জংমত ধরিয়া অচৈতন্য বালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং দ্বারপথে অগ্রসর হইবার পূর্বে একবার তীব্র দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থ ঐ বিব্রত ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া—আমি উপরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অতিথিশালায় আছি; যদি দরকার হয় খবর নিবেন। এই কথা কয়টি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ভৈরব লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

তাঁহার কথাগুলি যেন তাড়িতের কাজ করিল। যাহাকে বলা হইল সে ব্যক্তি যেন সম্মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই প্রথমাগত যুবকটি বাধা দিয়া বলিল, এত তাড়াতাড়ি উঠছেন কেন? কি হয়েচে আপনার? ওঁকে এখানে একলা ফেলে রেখে কি যাওয়া উচিত?

এই কথায় লোকটি চম্‌কাইয়া উঠিল এবং নিশ্চেষ্ট ভাবেই বসিয়া পড়িল। তারপর বলিল,—কিন্তু উনি যে যেতে বল্‌লেন?

এই পর্য্যন্ত আমি দেখিলাম এবং শুনিলাম, তারপর আমি নামিয়া পড়িলাম। আমায় যে এইখানেই নামিতে হইবে।

মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ সারাক্ষণই রহিয়াছে,—ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া এবং উপরে কামাখ্যা মন্দির লক্ষ্য করিয়া যখন চড়াইয়ের ধাপ উঠিতে লাগিলাম, তখনও মন স্থির হয় নাই। পাদমূল হইতে উঠিতেছি; দূর হইতে পাহাড়ের উপরে যে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী দেখা যায় উহা দেখিতে আশ্চর্য্য লাগে, কেমন করিয়া পর্বতশীর্ষে নারিকেল গাছ উঠিল, এ বৈচিত্র্য বোধ হয় আর

কোথাও নাই—তাহাও ভাবিতেছি, আবার গাড়ীতে সেই ভয়ংকর, অদ্ভুত, রহস্যময় ঐ যোগীর কথাও ভাবিতেছি,—এইরূপে অবসন্নপ্রায় শরীরে প্রায় সন্ধ্যার সময়ে মন্দির তোরণে পেঁৗছিলাম। পার্শ্বেই দেখিলাম ঐ নারিকেল বিক্রয় হইতেছে;—উহা দেখিয়া আমার তৃষ্ণা প্রবল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় কিন্তু পয়সা ছিল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উঠিয়া দেবী দর্শনের জন্য তোরণ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের চারিদিকেই প্রদক্ষিণ পথ। সেই
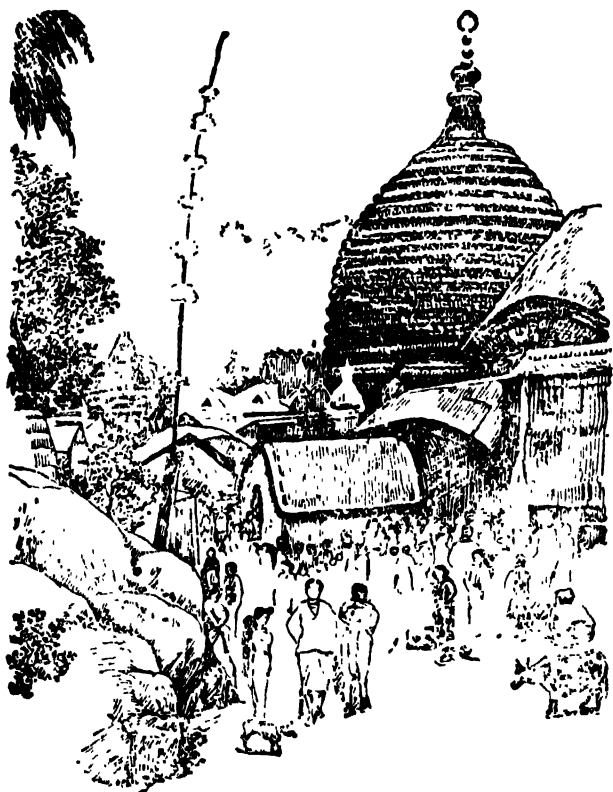
পথের একদিকে সারি সারি অন্ধকার, অপরিষ্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষশ্রেণী পড়িয়া আছে। উহার মধ্যে দু' একখানি একটু ব্যবহারোপযোগী, একটু সাফ। সুতরাং তাহাতে দুই একজন অত্যন্ত শ্রীহীন বুভুক্ষু সাধুমূর্তি আসনে বসিয়া আছেন, তাহাও দেখিলাম, আরও বুঝিলাম তাহাদের অন্তরেও শান্তি নাই,—তাহাদের দেখিয়া আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি আসিবে কোথা হইতে!

সন্ধ্যার সময় দর্শনার্থী যাত্রী-সংখ্যা নিতান্তই কম। সুতরাং দীপালোকে উজ্জ্বল গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ এবং ধাতু আবরণে ঢাকা একটি প্রস্তরখণ্ডকে দেবীজ্ঞানে প্রণাম-পূর্বক বাহিরে আসিলাম। এখন ঐ ঢাকা দেওয়া যা দেখিলাম তাহার কথাই চিন্তার মধ্যে ক্রিয়া করিতে লাগিল; পাণ্ডা বলিল, অম্বুবাচীর

সময়ে মায়ের রজঃস্রাব হয়। মায়ের ত মূর্তি নাই,—তাহাতে আবার স্রাব,—ঐ কথাটায় অন্তরক্ষেত্র বিজ্ঞানমুখী হইয়া ঐ তত্ত্বেই আবদ্ধ রহিল,—আর সব ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু মীমাংসা বা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলাম না। হায় আমাদের অধীত বিদ্যা!

যে কথাটি আমার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল তাহা এই যে, দেবী চিরজাগ্রতা, সৃষ্টিস্থিতি-নিধনকারিণী,—অনন্ত শক্তিরূপিণী, তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই, সর্বঘটে শক্তিরূপে জ্ঞানরূপে বিদ্যমানা, ব্যক্ত অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি সেই দেবী যে জাগ্রত তাহার প্রমাণ কিনা অম্বুবাচীতে রজঃস্রাব এই তত্ত্ব প্রচার পাণ্ডাদের এক অক্ষয়কীর্তি। বিশ্বাস যাহার হয়, ভাল, অথবা যাহার শুনিবা-মাত্র বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত এবং কৃতার্থ তাহাদের কথাও ধরি না,—কিন্তু যে হতভাগ্য উহা মনে প্রাণে বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বাস করিয়াছে এই ভাব দেখায় তাহাদের কথাই বলিতেছি। সে আর কেহ নয়, আমারই আশ্রয়দাতা বিপিন পাণ্ডা। তাহার আশ্রয়ে আমার সেদিন রাত্রে ভোজন এবং রাত্রিযাপন সম্ভব হইয়াছিল। নিতান্তই সরলপ্রাণ মানুষটি, মনে কোন গোল নাই—অকপট সাধু গৃহস্থ। সাধু এইজন্য বলিতেছি শুধু কথায় নয় তাহার প্রকৃতির মধ্যে,—তাহার উদ্দেশ্যমূলক কর্মেও সে সাধু; যতদিন কামাখ্যায় ছিলাম তাহার পরিচয় প্রায় নিত্যই পাইয়াছি। প্রথম প্রমাণ তাহার আমার নিকট কিছুই লাভের আশা নাই, অথচ অনির্দিষ্ট কাল আমায় প্রত্যহ মধ্যাহ্নে অন্নদানে বাঁচাইয়া রাখা। আর দেখিয়াছি তাহার যাত্রি-সংখ্যা কম নয়,--কিন্তু তাহাতে যাহা পাওয়া যায়,—বোধ হয় সংসার-যাত্রা নির্বাহ ব্যতীত কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না! প্রত্যেক যাত্রিদলকে খাওয়াইয়া দু'তিন দিন নিজ গৃহে স্থান দিয়া রাখিতেই প্রাপ্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়;—তাহাতেই আনন্দ।

কামাখ্যার প্রাচীন তীর্থ ইতিহাস বা মহাপীঠের যে কথা তাহা কে না জানে? সুতরাং কাজ নাই সে কথায়, অতীতের কথা না বলিয়া বর্তমানে আমার সঙ্গে যেভাবে এই পীঠস্থানের পরিচয় হইয়াছিল সেই কথাই বলিব। তার প্রথম হইল কুমারী বিদায়—এ তীর্থে কুমারীদের বড়ই প্রতাপ, তাহারা সব কিছুই করিতে পারে। কলিকাতার কালীঘাটে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বেও এইরূপই ছিল।

আট বৎসরের গৌরী হইতে ষোড়শী সপ্তদশী অথবা অষ্টাদশী পর্যন্ত পয়সার জন্য আমায় যেভাবে আক্রমণ করিল, সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাহাকে ঐ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে সে-ই জানে। আগে পাছে কাপড় ধরিয়া এক দল, দু'দিকে দুই হাত ধরিয়া দুই দল এমন ছাঁকিয়া ধরিয়াছে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতেছি,—ঠিক সেই বিষম দুর্যোগের সময়েই পাণ্ডা বিপিন ঠাকুর এক দল যজমানের অগ্রে অগ্রে মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়াই আমার দুর্গতি দেখিলেন এবং ঝড়োন্মত্ত কুমারী দলকে লক্ষ্য করিয়া—এই তোরা কি করচিস, সাধু দেখে চিনিস না, ওঁর কাছে কি পয়সা আছে?—যাঃ, ঘরে যা। বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। আমি সকৃতজ্ঞ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনই তিনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি নিকটে আসিয়া যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন এবং আমার সকল কথা শুনিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। শুধু সে রাত্রের জন্য নয়—যতদিন ওখানে থাকিব ততদিন

মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা তাঁর সংসারেই করিলেন। এইভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদ্যতা ঘনীভূত হইবার যোগাযোগ ঘটিল।

এখন আমায় বলিলেন, শিবসাগর থেকে আমার একঘর যজমান এসেছেন, আপনি এখানে একটু থাকুন তারপর এক সঙ্গে ঘরে যাব—বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ যজমান দল সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আগে আগে একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী, তারপর রোগা-শরীর, লম্বা, সার্ট পরা এক যুবক তাহার পিছনে, তাহার পশ্চাতে প্রায় বৃদ্ধ, দীর্ঘশরীর কর্তা, পার্শ্বে প্রৌঢ়া গৌরাঙ্গী গৃহিণী তাঁর—সর্বপশ্চাতে পান্ডাঠাকুর, বিপিনচন্দ্র হাতে প্রসাদীনির্ম্মাল্য লইয়া আসিতেছেন। সবার কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, গলায় জবার মালা।

কথা কহিতে কহিতে যজমান সঙ্গে পান্ডাঠাকুর বাসায় পেঁাছিয়া আমায় বাহিরের একখানি ছোট ঘরে বসাইয়া যজমানদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তক্তা একখানা পাতা ছিল তাহার উপর বসিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গেলাম। সেই ট্রেন হইতে সকল কিছুই মনে হইতে লাগিল।

—বাবা আপনারে ভিতরে ডাকেন,—বড়ুয়ামহাশয় আলাপ করবেন। প্রায় বারো বৎসরের একটি ছেলে আসিয়া যখন ডাকিল তখন আমার চমক ভাঙ্গিল, —তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বড়ুয়া মশায়ের নিকট ভিতর-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি ভদ্রতাপূর্বক উঠিয়া, প্রবীণ কোন ব্যক্তিকে যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা করে সেইভাবেই আমায় গ্রহণ করিলেন। নমস্কারান্তে উভয়ে বসিবার পর তিনি আমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশ্নগুলি সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা-মূলক, এমনই কঠিন যে উত্তর দেওয়া মুশকিল। বিবাহ করিয়াছি কিনা,—এবং স্ত্রীকে ফেলিয়া আসিয়াছি কেন?—সন্তানাদি হইয়াছে কিনা? পিতা, মাতা, ঠাকুমা, পিসি, খুড়া, জ্যেঠা ইত্যাদি জমজমাট সংসার ছাড়িয়া আসা আমার ধর্মানুমোদিত হয় নাই ইত্যাদি। আমি যতই কেন বুঝাইতে চেষ্টা করি না যে আমি সংসারশ্রম ত্যাগ করি নাই,—তিনি উহাতে কান দিলেন না দেখিয়া আমি মুখটি বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আর কিছু না হোক এটা লক্ষ্য করিলাম তিনি অত্যন্ত মায়ায় জড়িত সংসারী। তিনি নিজ পরিচয়ও দিলেন। তিনটি চা বাগানের মালিক,—সংসার ত্যাগ করিয়া এই কামাখ্যা দেবীর আশ্রয়ে বাস করিতে আসিয়াছেন। এইখানেই দেহত্যাগ করিবেন, যেমন আমাদের বাঙ্গালার লোকে দেহত্যাগ করিতে সংকল্প লইয়া কাশী, প্রয়াগ বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থধামে বাস করেন,—সেইরূপ। তবে সঙ্গে আছেন একটি নাতনী এবং ভাগিনেয় শ্রীমান জনকলাল, আর পতিব্রতা স্ত্রী —তিনিই সরলভাবেই যেন বিচারে তাঁহার কিছুই ভুল হয় নাই এরূপভাবেই আমায় বলিলেন, স্ত্রী আমার যখন পতিব্রতা তখন তাকে কোনমতে, কোন অবস্থায়ই ছেড়ে আসা যায় না।

যাই হোক রাত্রের মত একটি আশ্রয় পাওয়া গেল। এইটিই আজ শেষের কথা।

কামরূপ পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের নাম ভুবনেশ্বরী। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে প্রায় দেড় পোয়া পথ চড়াই উঠিয়া ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গে পেঁাছাইতে হয়। পীঠস্থান প্রাচীন, শৃঙ্গের উপরে অনতিপ্রশস্ত ক্ষেত্রে মন্দিরটি অবস্থিত দেখিলাম, মন্দিরের দেয়াল পাকা, উপরে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চূড়া বা ছাদ নাই,

কোনরকমে একটি চৌকা খিলানের উপর কতকটা আচ্ছাদন মাত্র। নাটমন্দিরটির দেয়াল পাকা বটে কিন্তু টিনের চাল দিয়া ঢাকা, তবে সম্মুখেই কতকটা ফাঁকা। এখানে সর্বত্রই ঐ টিনের ব্যবহার। মন্দিরের ধারে একখানা পাথরের উপর পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু পাথরের খোদাই একটি মূর্তি। তার কোন পরিচয় নাই।

নাটমন্দিরের একধারে এক বিহারী যুবা সাধু আড্ডা গাড়িয়াছে। দেখিয়া আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে অপরদিকে প্রায় সামনাসামনি আসন বিছাইলাম। মধ্যে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ পথ,—বেশ প্রশস্ত কতকটা স্থান রহিল। সে বেচারা আমায় পাইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। ছাপরা জেলায় তার ঘর, ঘর ছাড়িয়া দশ বারো বৎসর গুরুর কাছে কাছে ছিল, এখন গুরু বলিয়াছেন যে, তু যা, আপনা দেখ্‌লে। ঘুম ঘুমকে সমঝ্‌লে। তাই এখন পর্যটনের পালা চলিতেছে—উত্তর ভারতের বড় বড় তীর্থ শেষ করিয়া এখন বাঙ্গলায় প্রবেশ এবং কালী মায়ীজী দর্শন করিয়া কামাখ্যায় শুভাগমন হইয়াছে। এই বর্ষায় চার মাস থাকিবেন এই সংকল্প। বাবাজী নাথ সম্প্রদায়ের সাধু, নামটি তাঁর ধীরনাথ।

তাহার কাছেই উমাপতি সিদ্ধ ভৈরবের বার্তা পাইলাম, শুনিলাম তিনি এই ভুবনেশ্বরীর নীচেই থাকেন,—তাঁর স্থানটি সুন্দর,—সেদিকে কেউ যায় না, শান্তিপূর্ণ স্থান। শুনিলাম তিনি সন্ধ্যায় এই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরেই মধ্যে মধ্যে চক্র করেন। এখন বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছেন কয়েক দিন পরে আসিবেন।

যাহা হোক, এখন আসনখানি বিছাইয়া কম্বল ও কমণ্ডলুটি রাখিয়া নাটমন্দির হইতে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইলাম।

॥ ১২ ॥

দেবীর মন্দির একেবারেই শীর্ষদেশে অবস্থিত। সুতরাং মন্দিরের চারিদিকে আর প্রশস্ত সমতল জমি নাই; সবদিকেই ঢালু প্রস্তর খণ্ড সমাকুল জমি নামিয়াছে। মন্দিরের ঠিক পিছনে যাইতে হইলে পার্শ্বে সরু অপরিসর রাস্তা আছে। সেই অসমতল সরু গলি পথে আসিয়া মন্দিরের পিছন দিকেই দাঁড়াইলাম। সামনেই অনন্তবিস্তৃত আকাশ—আর নীচে,—একেবারে যেন মনু পাতাল ক্ষেত্রে নদনদী খর্বাকৃতি পর্বত মিলিয়া এক একাকার—ভুবনেশ্বরী হইতে যে দৃশ্য আজ দেখিলাম জীবনে তাহা ভুলিব না। একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মগ্ন হইলাম,—সেই রূপময়ের প্রাকৃত রূপের মধ্যে।

দূরে একদিকে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো, পাহাড়ের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, চারিদিকেই পর্বতমালা অতীব মনোরম, গাঢ় শ্যামল মূর্তি। ডানদিকে শিলং যাইবার রাস্তা। বিন্দু বিন্দু কত গাড়ী যাইতেছে, গাছের আড়াল হইতে দেখা যাইতেছিল। উপরদিকে পাহাড়ের শ্রেণী। সম্মুখেই গোহাটী, ঐ যে তাহার নীচে সেই বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র নদ যেন এতটুকু চওড়া একফালি রঙিন কাপড় আর তাহার মাঝে একটু বাঁদিকে ঘেঁসিয়া উমানন্দ শৈল। চারিদিক সবুজের ঘন আবরণে মনোহর, এ সবুজের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। কামরূপের ঠিক নিচেই পর্বত-পাদমূলে ঘন জঙ্গল দেখা যাইতেছে। সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের উপর ষ্টিমার চলিতেছে যেন একটি নারিকেলী কুলের শুষ্ক আঁঠিটি। কি উদার মুক্ত ক্ষেত্র আমার সম্মুখে। দূরে, কতদূরে শেষে গাঢ় নীলাভ ধূসরবর্ণের

পর্বতমালা, একটা মোহ আসিয়া যায় এ সকল দেখিতে দেখিতে। নাম ধাম গাঁই গোত্র কিছুই মনে থাকে না—অল্পক্ষণেই আপন অস্তিত্ব হারাইতে হয়। কোথায় রহিল এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার সংকল্প, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কোথাও নড়িতে প্রবৃত্তিই হইল না। ইহার কাছে আর কিছুই বড় নহে, চাওয়া-পাওয়া সব নিঃশেষে মুছিয়া গেল। কামরূপের এই ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গের উপর আসিয়া এইস্থানে যিনি একবার নয়ন মেলিয়া চারিদিকের এ দৃশ্য দেখিয়াছেন জীবনে তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। দ্বিপ্রহর নাগাদ নবীন ছাপরা-জেলা-নিবাসী সেই সাধুটি পিছন হইতে হাঁক দিয়া আমার তত্ত্ব করিল। তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিতেই,—হাতের আঙ্গুল কয়টি যুক্ত করিয়া নিজ মুখের দিকে তুলিয়া ভোজনের ইঙ্গিত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ক্যা ভোজন কা প্রবন্ধ নহি বা? আমি তখন উঠিলাম।

নীচে নামিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দশ, বারো বৎসরের একটি ফুট্‌ফুটে গৌরী, তার নামটি যাহাই হোক তাকে গৌরীই বলিব। আসিয়া বলিল,—বাবা, আপনার খাবার কথা বলে গিয়েছেন, আপনি বসুন। অল্পক্ষণেই বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল, সম্মুখেই অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত; অবিলম্বেই আমি বসিয়া গেলাম।—এই গৌরী কন্যাটি আমাকে নিত্যই খাওয়াইত এইভাবে, সেই ছিল আমার অন্নদাত্রী—যতদিন সেখানে ছিলাম, একদিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সেদিন বৈকালে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে আবার সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া আছি আর সন্ধ্যা দৃশ্য উপভোগ করিতেছি। মনের মধ্যে অশেষ চিন্তাপ্রবাহ যেন নিঃশব্দে ভাসিয়া চলিয়াছে—যতদিন ছিলাম এই স্থানই ছিল আমার আসন, সর্বদুঃখ-চিন্তাহর ও সর্বানন্দকর আসন, সেখানে প্রতিদিনই বসিতাম। এখন হঠাৎ পিছনে কথাবার্তার আওয়াজে ফিরিয়া দেখি বিপিন ঠাকুরের সেই শিব সাগরের যজমানটি,—বড়ুয়া মহাশয় আর তাঁহার সঙ্গে সেই কিশোরী নাতনী, পশ্চাতে ভাগিনেয় জনকলাল বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। আমার নিকটে আসিয়া সম্ভাষণ করিলেন;—কি বাবা, এইখানেই এখন রইলে না কি? আমি বলিলাম,—নাটমন্দিরেই আশ্রয় নিয়েচি। বেশ বেশ বলিয়া তিনি মেয়েটির দিকে চাহিলেন, বলিলেন, দেখেচ দিদি কি সুন্দর স্থান? আমি তাঁহাদের দেখিয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চলো দিদি, আমাদের কাজের সময় হয়ে এলো, এবার যেতে হবে। তারপর—আচ্ছা, বলিয়া আমার দিকে লক্ষ্য এবং দুটি হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখানে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পূজারী, তাঁর নাম দিগম্বর, ডাক নাম দিগু ঠাকুর, তাহার সহিত আজ আমার আলাপ হইয়াছিল। তাহাকে এখানকার গেজেট বলিলেই হয়, তুমি জিজ্ঞাসা করো বা না করো সে উপযাচক হইয়া নিজেই এখানকার যাহা কিছু সংবাদ তোমায় জানাইয়া দিবে। তাহার কথা পরে বলিব। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে সব দিক ঢাকিয়া গেল। দূরে পর্বত, নীচে নদী, নিকটে বনানী, ক্রমে ঝাপ্‌সা হইয়া এক অখণ্ড কৃষ্ণধূসরে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল সম্মুখে গৌহাটীর গায়ে খণ্ড খণ্ড দীপের মালা। ঘন কুয়াশার আঁধারের মাঝে খানিক অল্প ব্যবধানে মাঝে মাঝে ঐ আলোর বিন্দু পাহাড়ময় ছড়ানো রহিয়াছে।

অন্ধকারে বাগানে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর ফুল ফুটিয়াছে। নিস্তব্ধ চারিদিক, কোনদিকেই সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, বেশীক্ষণ আর এখানে থাকা ভালো নয়। আমার বান্ধব ধীরনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম জায়গাটায় সাপের ভয়ও আছে; এইসব ভাবিতে ভাবিতে নাটমন্দিরে ঢুকিলাম এবং আপন আসনে বসিয়া পড়িলাম। গর্ভগৃহের পানে চাহিয়া দেখি আমাদের বড়ুয়া মহাশয় ইতিমধ্যে একখানি লাল চেলী পরিয়া, স্কন্ধে উত্তরীয়,—ভুবনেশ্বরী মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আর পার্শ্বের দিকে অপর আসনে পূজার উপকরণ সাজানো, তাহার মধ্যে একটি কালো বোতলও আছে। বড়ুয়া গিন্নী একখানি কস্তা-পেড়ে গরদ পরিয়া বাম পার্শ্বে আসনে উপবিষ্টা, নাতনীটি তাঁহাদেরই পাশে বসিয়া আছে। ভাগিনেয়, মামার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

আমাকে দেখিয়া বড়ুয়া মহাশয় বলিলেন,—কি বাবা, আমাদের চক্রে আসবে না কি? আমি বলিলাম, চক্রে বসার যোগ্যতা আমার নাই,—তা ছাড়া আমার সাধনপথ পৃথক। শুনিয়া তিনি যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন,—এবং বলিলেন, আমার যেন ধারণা ছিল তুমিও একজন তান্ত্রিক, আর দীক্ষিত তান্ত্রিক।

ইহার পর ঘরের কপাট পড়িয়া গেল। যেখানে আমি থাকি, ঐ নাট-মন্দিরের কাছেই পশ্চিম পাশের দিকে অল্প একটু নিচের দিকে নামিয়া আসিলে একখানি টিনের চালওয়ালা বড় ঘর দেখা যায়। চারিদিকেই বারান্দা আছে। ঐ আশ্রমটির কথা পরে শুনিয়াছিলাম যে, উহা ভুবনেশ্বরীর যাত্রীদের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। এখন দেখিলাম আমাদের বড়ুয়া মহাশয় সপরিবারে ঐ আশ্রমটি দখল করিয়াছেন। বিপন পাণ্ডাকে ধরিয়াই ইহা সহজ হইয়াছে। অবশ্য এখন তেমন যাত্রী আসে না তাই; এখানে ত বসবাস নাই—রাত্রে ত কেহ থাকেই না, কেহ কোন খবর রাখে না—কাজেই সাধারণে কেহ কোন আপত্তি করে নাই। সাধারণতঃ যাত্রীরা ঐ কামাখ্যা দেবী দেখিয়াই নামিয়া যায়, অতটা উপরে কেহ উঠিতে চায় না, রাত্রিবাস ত দূরের কথা।

ক্রমে ক্রমে বড়ুয়া মহাশয়ের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, সেটি স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আকর্ষণে ঘটিয়াছিল যাহা আমি এড়াইতে পারি নাই। দিনমানে পাণ্ডার ওখানে খাইতাম, রাত্রে উপবাস করিতাম জানিতে পারিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রে কোনদিন একটু হালুয়া, কোনদিন বা কিছু ফলমূল অনুরোধ-পূর্বক খাওয়াইতেন এবং বলিতেন, রাত্রে নিরম্বু উপবাস তোমাদের মত জোয়ানের পক্ষে মারাত্মক।

বড়ুয়া মহাশয়ের শরীর দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার কোন ব্যাধি আছে।

অবশ্য ঠিক বলা কঠিন,—মনে হইয়াছিল তাঁর হাঁপানি আছে ; তাহার লক্ষণ মধ্যে মধ্যে কাশির সাঁই সাঁই আওয়াজে পাইতাম।

এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল—প্রত্যহই খবর লইতেছি দিগ্ন ঠাকুরের কাছে, উমাপতি ভৈরব এখনও বশিষ্ঠাশ্রম হইতে ফিরেন নাই। ইতিমধ্যে যাইয়া কৌলবাবার আশ্রমটি দেখিয়া আসিয়াছি। উহা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের নিকটেই, বেশী দূর নয়। উপর হইতে নীচে আসিতে প্রায় মধ্যপথে পড়ে, তবে একটু ঘুরিয়া পশ্চাদ্দিকে যাইতে হয়। তাঁহার আশ্রম হইতে ব্রহ্মপুত্রের এবং গৌহাটির দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখা যায়। বোধহয় আমরা আসিবার দুই সপ্তাহ পরে তাঁহার দেখা পাইয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর এক নাটকীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

এই কয়দিন হইতে দেখিতেছি, বড়ুয়া মহাশয়ের জামাই প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধীয় কেহ কেহ তাঁহার কাছে আসা যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাকে প্রত্যহই সকালে-বিকালে আশপাশের কোন স্থানে, নিকট ভূমিতেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন দেখা যাইত। সঙ্গে নাতনীটি থাকিত আর ভাগিনেয়ও থাকিত। জনকলাল ভাগ্নিনেয়টি তাঁহার আশ্রিত এবং অনুগত। তাহাকে সহায় করিয়াই বড়ুয়া মহাশয় কামাখ্যা বাস করিতেছেন একথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন। হাট-বাজার, যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ, জনকলালই করিত এবং বাহির হইলেই সঙ্গে থাকিত। লেখাপড়া বিশেস কিছুই হয় নাই, ভবিষ্যতে মামার অনুগ্রহের উপরই তাহার নির্ভর।

সেদিন প্রায় সারাদিনই বর্ষা, মাঝে মাঝে একটু ধরণ করিলেও প্রায় সাবা দিনই জল হইয়াছিল। বৈকালেও আমি আজ বাহির হই নাই—আপন আসনেই রহিয়াছি—সারা ক্ষেত্র ভিজিয়া উঠিয়াছে,—আমাদের শয্যার নীচে একটা চেটাই তার উপর কম্বল, উহাও যেন ভিজিয়া উঠিয়াছে। বড়ুয়া মশাই সন্ধ্যার পর যথানিয়মে যেমন অমাবস্যার রাত্রে চক্র করিয়া উপাসনা করেন, তাহা করিয়া গেলেন দেখিলাম। শনি মঙ্গলবারে এবং অমাবস্যার রাত্রে মাসের মধ্যে এই কয়দিন পারিবারিক চক্র করিয়া উপাসনা করিতেন ;—না হইলে অন্যদিন সন্ধ্যার পর নিজ গৃহেই সপরিবারে নিত্য সাধন-কর্ম করিয়া থাকেন। সস্ত্রীক ধর্মমাচরেৎ—এটা ছিল তাঁর মূল কথা।

একটি কেরোসিনের লম্প কোথা হইতে আমার বান্ধব ধীরনাথ যোগাড় করিয়াছিল, নিচে কোন গৃহস্থের নিকট হইতে একটু তেলও সংগ্রহ করিয়া সে প্রত্যহ শয়নের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আলোটা জ্বালাইয়া রাখিত, তাহাতে আমারও কাজ হইত সেজন্য তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমার সঙ্গে পেন্সিল ও খাতা বরাবরই আছে ;—দিনে আঁকা, রাত্রে লেখা—তাহারই আলোর সাহায্যে। কর্তাদের বন্দোবস্ত মত নাটমন্দিরে একটা আলো আছে ;—কিন্তু তাহা একটি লণ্ঠন। সন্ধ্যারতির পর দিগু ঠাকুরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আলোও চলিয়া যাইত। সেটা তাঁর ঘরের আলো হইয়া গিয়াছে।

ছাপরা জেলার বান্ধব আমার বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়,—যতক্ষণ না গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িত, ততক্ষণ তাহার গান চলিত। এক একটা গান তার বেশ ভাল,—মৈথিলী ভজন,—অতি মধুর। সে রাত্রে বর্ষা নামিয়াছিল,—কাজেই সকাল সকাল, তাহার ভজন শুনিতে শুনিতেই ঘুমাইয়াছিলাম,—নিশ্চিন্ত মনে গাঢ় নিদ্রায় তখন আমরা সুপ্ত। গভীর রাত্রে নাটমন্দিরের দরজায় ধাক্কা,—

টিনের দরজায় ধাক্কা,—সুতরাং আওয়াজটা বড় শ্রুতিসুখকর নয়। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—আর বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল একটা দুঃস্বপ্নের মত,—ততক্ষণে ধীরনাথজী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছে,—সম্মুখে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে বড়ুয়া মহাশয়ের নাতনী, পিছনে ছাতা লইয়া জনকলাল। ভিতরে আসিয়া সে বলিল, একবার চলুন,—মামার অবস্থা ভাল নয়, তিনি আপনাকে ডাকচেন। শুনিয়া উঠিতে উঠিতেই বলিলাম, নীচে কোন ডাক্তার নাই কি? সে বলিল,—এখন আপনাকেই তিনি ডাকচেন ;—আসুন আপনি একটু তাড়াতাড়ি। আমি একটা বিস্ময় উদ্বেগ এবং একটা আকস্মিক ভয়েও বটে নির্বাক, —দ্রুতগতি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মেয়েটি আগে আলো লইয়া।

চার পাঁচটি বালিশ উপর উপর রাখিয়া তার উপরে মুখ গুঁজিয়া হাঁফাইতেছেন, বুড়ি পাখা হাতে বাতাস করিতেছে আর বোধহয় কাঁদিতেছে। আগে ছিল জনকলাল,—কৈ সেই কলকাতার ছেলেটি কৈ?—এই যে এসেছেন, বলিয়া সে আমায় দেখাইয়া দিল। আমি যাইতেই বড়ুয়া মশাই ধীরে ধীরে মাথাটি তুলিয়া হাতের ইশারায় আমায় তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলে,—তাঁহার নিকটে গেলাম—হাঁপের কষ্ট সত্বেও ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজে তিনি বলিলেন,—ঐখানে কাগজ কলম দোয়াত সবই আছে, নাও বাবা,—যা বলি,—লিখতে আরম্ভ করো। একটু তাড়াতাড়ী করতে হবে বাবা, আমার সময় বুঝি আর বেশী নেই। একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—ইংরাজীতেই তুমি লিখবে আমি ভাষায় যা বলচি। তিনি চুপ করিলেন। আমি কোন কথা না কহিয়া তাহাই করিতে প্রস্তুত হইলাম। বিস্ময় ও ভয় যুগপৎ আমায় স্তম্ভিত করিয়াছিল।

ব্যাপারটি যা শুনিলাম ও লিখিলাম তাহা এই ;—তিনি সজ্ঞানে এই উইল করিতেছেন—শিবসাগর-নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বড়ুয়া, বয়স চৌষট্টি বৎসর—তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা, কোন পুত্র নাই, একটি ভাইপো, একটি ভাগিনেয় ও একটি নাতনী সুধামুখী ছাড়া আর কেহ নাই। তাঁর মৃত্যুর পর এদের মধ্যেই তাঁর সকল কিছুই ভাগ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা। সম্পত্তির তালিকা এইরূপ—(১) ডিব্রুগড়ের দুখানি বড় চা-বাগান। (২) শিবসাগরে প্রকাণ্ড বসত বাড়ি, (৩) দুখানি ফল শাকসব্জীর বাগান, (৪) গোহাটিতে দুখানা বাড়ি সারা বছর ভাড়া চলে, (৫) নিলফামারীতে একখানা বড় বাঙ্গলা যা রোল্যাণ্ড সেপার নামে সাহেবকে ভাড়া দেওয়া আছে আর (৬) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আঠারো হাজার টাকা পাঁচ বছরের স্থায়ী আমানতে দেওয়া আছে, (৭) আর সাড়ে ছয় হাজার আন্দাজ চলতি আমানতে আছে। এইসব সম্পত্তি তাঁর স্বকৃত উপার্জন, কেবল শিবসাগরের দুখানি ফল বাগান, আর শিবসাগরের বসত বাড়ি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবেই পেয়েছিলেন। সম্পত্তিগুলি তাঁর জীবিত আত্মীয়গণের মধ্যেই ভাগ করে দিতে চান, যথা,—দুই মেয়ে কিরণময়ী আর চিন্ময়ীকে ডিবুগড়ের দুখানি চা বাগান, ভাইপো অজিত বড়ুয়াকে শিবসাগরের বসতবাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাগান,—নিলফামারীর বাঙ্গলাখানি নাতিনী সুধাকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ সকল অধিকার সমেত দান করিলেন। গোহাটির একখানা বাড়ি, আর চলতি আমানতের সব টাকাই ভাগিনেয় জনকলালকে দিলেন। বাকি সকল কিছুই স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতাকে সকল অধিকার অর্থাৎ দান বিক্রয়ের অধিকার সমেত দিলেন। বড় জামাই শ্রীযুক্ত—তিনি এর্কাসিকিউটর—ইত্যাদি ইত্যাদি। ধীরে ধীরে এই পর্য্যন্ত বলিয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন। তারপর

আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—যেন কিছু বলিবেন। এমনভাবে কিছুক্ষণ গেল, তখন আমি বলিলাম,—আমায় কিছু বলবেন? ধীরে ধীরে বলিলেন, হ্যাঁ, বলবো, বাবা, তোমায় বলবো। কিন্তু তুমি কি আমার কথা রাখবে?—আমায় ভাবাইয়া তুলিল,—একি ফ্যাঁসাদ। তিনি নিরস্ত হইলেন না, বলিয়া চলিলেন,—তোমারই মত আমার একটি ছেলে ছিল, বাইশ বছর বয়সে সে আমায় পাগল করে চলে গেছে,—সেজন্য—বলিয়া চুপ করিলেন। তারপর আবার,—তোমায় দেখে অবধি আমার বড় মমতা হয়েচে,—আমার সেই মমতার দাবীতেই আমি তোমার কাছ থেকে একটা কথা চাই, বল বাবা রাখবে আমার কথা?

আমি বলিব কি, শুনিয়াই আমার ধুকধুকি কাজ বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। এ কি ভয়ংকর। বিদায়বেলা বৃদ্ধ আমায় লইয়া করিবে কি? আমায় নিরুত্তর দেখিয়া, তিনি অবশেষে বলিলেন—একখানি ছোট বাড়ি আমার গৌহাটিতে আছে, তার সঙ্গে বিঘা দশেক জমি আমি তোমায় দিতে চাই, তুমি সেটা গ্রহণ করো—তাহলে আমি শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। বল বাবা। —বলিতে বলিতে যেন ক্লান্ত হইয়া বালিশে মাথাটি রাখিলেন এবং কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই সময় গৌহাটি হইতে তাঁহার জামাই ডাক্তার লইয়া আসিয়া পেঁাছিলেন।

আমাকে এভাবে সামনে কালি কলম, লেখা কাগজ দেখিয়া হয়তো ব্যাপারটা অনুমান করিয়াও ফেলিলেন, তখন আমি বলিলাম,—তা হ'লে আসি। জামাই, মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, হাঁ হাঁ আপনি যান, আমরা সবাই আছি দেখবো—আমরা থাকতে ওঁর কিছু কষ্ট হতে পারে না,—যান আপনি,—

আমি উঠিয়া যখন দ্বারপ্রান্তে পেঁাছিলাম,—বাইরে—অন্ধকার—ভিতরে জামাই আসিয়া সব কিছু কাজই হাতে লইয়াছেন, তিনি বলিতেছেন শুনিলাম, —আমরা থাকিতে অপর কেউ এস্যা কাজ বাগায়ে লবেন,—এডা অথয়ম্ভব—।

ভোর হইয়াছে, আমি অন্ধকার নাটমন্দিরে পেঁাছিলাম। পরদিন শুনিলাম জামাই বাবাজী সবাইকে লইয়া গৌহাটি চলিয়া গিয়াছেন। শ্বশুরকে কামাখ্যায় এরূপ অসহায় ভাবে থাকিতে দিবেন না। আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম। ইহার দুই তিন দিন পর কৌল বাবা উমাপতি,—বাশিষ্ঠাশ্রম হইতে এখানে পেঁাছিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইতে আমার কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গেল।

॥ ১৩ ॥

বড়ুয়া মহাশয়ের কি হইল শেষ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না। সেজন্য অবশ্য কোন আক্ষেপ ছিল না তবে একটা কৌতূহল ছিল মাত্র।

সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরই নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া আপন আসনেই থাকি। দিগু ঠাকুর মন্দিরের পূজাপাঠ আরতি শেষ করিয়া চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত শান্তিতে কিছুই করিবার যো থাকে না, তাই প্রথম রাত্রিটা বিহারী বান্ধবের সঙ্গে নানা কথায় কাটাইয়া দিতাম। যে রাত্রে বাহিরের কোন সাধক,—অর্থাৎ কামাখ্যা হইতে তন্ত্রমতের কেহ চক্র অনুষ্ঠান অথবা অন্যবিধ ক্রিয়াকর্মের ব্যাপার

করিতে আসেন সে রাত্রে আমাদের বড়ই অশান্তিতে কাটাইতে হয়। যতক্ষণ না তাঁহারা বিদায় হন ততক্ষণ শান্তি থাকে না।

আজ এক বিচিত্র ব্যাপার। প্রাতে যখন দিগ্নু ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেখা হইল, খবর পাইলাম বশিষ্ঠাশ্রম হইতে কৌল বাবা ফিরিয়াছেন। সঙ্গে আরও একজন নূতন ভৈরব আসিয়াছে। যে ব্যক্তি আসিয়াছে সে কিন্তু তাঁহার আশ্রমে থাকে না, তাহাকে তিনি কামাখ্যা মন্দিরের আশে পাশে যে যাত্রী শালা আছে সেইখানেই রাখিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সঙ্গে এনেছেন অথচ আশ্রমে আনেননি কেন? তাহাতে সে বলিল,—বাবা আশ্রমে যাকে-তাকে তো থাকতে দেন না। কারণ,—বাবার সঙ্গে একজন ভৈরবী মা আছেন কিনা, সেই জন্যই নূতন কেউ এলে ওখানে থাকতে পায় না। তারপর, আমি আজই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব শুনিয়া সে বলিল,—আপনিও যাবেন, —আজ একটু ভিড় আছে কিনা?

সারাদিনই আজ কামাখ্যা মন্দিরের আশপাশে কাটাইলাম উমাপতির যদি নাগাল পাই, কিন্তু তা হইল না। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ ধীরনাথ ও আমার মিলনটি সন্ধ্যার পরেই ঘটে কারণ, ঐ সময়েই দুজনে আপনাপন আসনে বসিয়া নিত্যকর্ম সাধন করি। আমার আসন হইতেই গর্ভগৃহস্থ যন্ত্র,—যেথায় সিন্দুর-রঞ্জিত পাষাণ-প্রতীক, যাহা বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্থাপিত আছে সেই ভুবনেশ্বরী প্রতিমার ঊর্দ্ধাংশ দেখা যায়, আরও—যাঁরা পূজা করিতে ওখানে আসেন, বসেন তাঁদেরও কতকটা দেখা যায়।

ওখানে সন্ধ্যার পর আমি নিজ স্থানটিতে আসনে বসিয়া ভিতর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমেই যেন অন্ধকার-ঢাকা কোন রক্তবর্ণ পদার্থ চক্ষে পড়িল ;—তাহার আকার সুনির্দিষ্ট নয়, যেন ক্ষুদ্র একটি স্তূপ। ক্রমে দেখিতে দেখিতে চক্ষু কতকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে দেখিলাম একটি প্রস্তর মূর্তি সর্বাঙ্গ সিন্দুর প্রলেপে লাল হইয়া দূর হইতে ঐ প্রকার দেখাইতেছে। আগে এতটা ছিল না, আগাগোড়া সিন্দুর প্রলেপ আজই পড়িয়াছে। সম্মুখে পূজার আসনে তখন কাহাকেও দেখা যাইতে ছিল না,—কিন্তু সেই সিন্দুর রঞ্জিত মূর্তির বামপার্শ্বে দীর্ঘশরীর জটাজুট-সমাযুক্ত এক মূর্তি আসনে বসিয়া নিঃশব্দে কিছু করিতেছিলেন। ঐ মূর্তিই আমায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল! অন্য কোনদিকেই আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। অতীব বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া তাহার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম।

ধীরনাথও ছিল আমার সম্মুখের আসনে,—সে ছিল আমার দিকে পিছন করিয়া, দেয়ালের দিকেই তাহার মুখ। সে বলিল,—আজ ত মিল গহেল হো! তুমারা বো কৌল বাবা? বলিয়া আমার দিকে ফিরিয়া গর্ভগৃহ দেখাইয়া

দিল। ঐ ভিতরের জটাধারীই তাহা হইলে ভৈরব উমাপতি। কি আশ্চর্য্য, আজ সারাদিন নীচে কাটাইলাম তাঁহারই দর্শনের জন্য—কেহ তাঁহার পাত্তা দিতে পারিল না। আনন্দে আমার প্রাণ দীপ্ত হইয়া উঠিল যে আজই এই খানেই আপন আসনে বসিয়া,—তাঁহার দেখা পাইলাম, অদ্ভুত। তবে যতক্ষণ ক্রিয়াকর্মে রত আছেন, ততক্ষণ সম্মুখে যাইয়া হাজির হওয়া অন্যায় সেই কারণে এখন উঠিলাম না সুযোগ আজ আর আসিল না। এখন তারপর যাহা হইল তাহা বলিতেছি।

ক্রমে একটা সুর,—একতান সুরে ও ছন্দে কোন মন্ত্র উচ্চারণেই মতই ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে তাহার ছেদ আছে, কানে আসিতে লাগিল ;—কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। পরে অনুরূপ স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ শুনিতে শুনিতে আমার মধ্যে একটা গভীর তন্ময়তা আসিল, দেশ কাল পাত্র সকল কিছু বোধ যেন একাকার, এক সমাহিত সুধাময় ভাব আমায় উহাতেই ডুবাইয়া দিল।

বাহিরের দিকে খড়মের শব্দে যখন বাধা পাইয়া আমার মন সেইদিকে ফিরিয়া আসিল দেখিলাম একটি লোক খড়ম পায়ে সশব্দে আসিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিল। হাতে তাহার অনেক কিছু উপকরণ,—ফুল-বিল্বপত্রাদি শুধু নয়, একটি বারকোশে উপর্য্যুপরি রাখা নানা প্রকার দ্রব্য যাহা আমি ভালো দেখিতে বা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সম্মুখ দিয়া সে চলিয়া গিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পরই অত্যন্ত ধীরে,—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেঁটমুখে আর এক মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহার হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন। তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া রাত্রি আসিয়াছে। যে মূর্ত্তি আলো হাতে আনিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল সে নারী বোধ হয় ভৈরবীই হইবে। বোধ-হয়, এই জন্য বলিতেছি তাহার পরনে রক্তবস্ত্র নয়, লাল কস্তা পাড়ের সাদা শাড়ী, যুবতী অথবা প্রৌঢ়বয়স্কাও হইতে পারে কোনটি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। সাধারণ নারীর তুলনায় তাহার শরীর দীর্ঘ কিন্তু স্থূল নয় ; সহজ ধীর প্রতিমার মতই তাহার গাম্ভীর্য,—কপালে বড় সিন্দুর ফোঁটা, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, তাহাতে নিম্নদৃষ্টি—মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আবার যিনি আসিলেন তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইনি সেই ট্রেনের যোগী ভৈরব, কামাখ্যা আসিবার কালে পাণ্ডু হইতে একই গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তিনি এখানে উমাপতির কাছে আসিয়া জুটিয়াছেন। আমার কৌতূহল প্রবল হইল, চিত্তে এই কথাই তোলা-পাড়া চলিতে লাগিল যে ভিতরের উমাপতি ভৈরবের সঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধ কি ?

ভিতরে ঘন ধূপ-ধুনার ধোঁয়া,—উৎকট অবস্থা করিয়া তুলিল। বুঝিলাম, এখন তো ভিতরে চক্রানুষ্ঠান চলিবে, আমাদের সঙ্গে ত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। তাছাড়া এখনই দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে কাজেই আজ আর কোন মতে দেখাশুনা হইবার সম্ভাবনা নাই ;—সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা নিজ নিজ ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিলাম। তারপর শয্যাগ্রহণ ও এক ঘুমে সুষুপ্তির কোলে রাত্রি প্রভাত করিয়া উঠিলাম।

প্রাতঃকৃত্য শেষে আজ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া উমাপতির আশ্রমের পানে নামিয়া গেলাম। আগেই দেখিয়া গিয়াছিলাম : আমি আজ আর নিরাশ হইলাম না। দেখিলাম,—এক ভৈরব যুবা—আশ্রমের দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিতেছিল। বোধ হয় এখানেই দেখাশুনা হইবে ভাবিয়া

নিকটেই দাঁড়াইলাম। সে আমায় কোন কথাই বলিল না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—উমাপতি বাবা কি এখন বাইরে আসিবেন?

হ্যাঁ, এখনই আসবেন—বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং একখানি তোশক ও ব্যাঘ্রচর্ম আনিয়া সযত্নে পাতিয়া দিল, তারপর একটি রক্তবর্ণ বস্ত্রের তাকিয়া দিয়া গেল। আমি সেই পাতা মাদুরের শেষ দিকে বসিলাম। অল্পক্ষণেই উমাপতি বাবা আসিলেন।

সত্যই যেন মহাদেব। তাঁর গায়ের রং রক্তবর্ণ, দাড়ি পাকিয়াছে, গোঁফও অনেকটা পাকিয়াছে কিন্তু মাথার চুল বা জটা ও ভ্রূদ্বয় ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। কোমরে একখণ্ড লাল কৌপিন মাত্র বাঁধা, সম্মুখে ঝুলিতেছে। ঠিক দিগম্বর। সহাস্যবদন। দেখিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমায় বসিতে বলিলেন,—এবং ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে পরিচয় কথা আরম্ভ করিলেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর, পূর্বে এমন স্বর শুনি নাই। এই পরিচয়-কথার মধ্যে কিছুই বিশেষ কথা নাই, কেন আসিয়াছি, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি কোন কথাই নয়। মোটের উপর প্রায় এক ঘণ্টার উপর ছিলাম। আমি কি করিতাম, কখন কোথায় ঘুরিয়াছি মাত্র এইসব কথাই হইল। তবে তাঁহার স্নেহ পাইলাম, যখন ইচ্ছা তখনই আসিব—অনুমতি পাইলাম। তারপর নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দিরে তখন দিগু ঠাকুর আসিয়াছে। গত রাত্রের কথা তাহার গোচর করিলাম। ঐ ভৈরবীর কথা সে যাহা বলিল তাহা এই যে,—উমাপতির শিষ্যা তিনি,—মধ্যে ছিলেন না, আজ দুই তিন মাস যাবৎ এখানে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও আশ্রমেই আছেন।—আশ্রমের সকল কিছুই, নিত্য এবং নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের ভার তাঁহার উপর। উচ্চ স্তরের ভৈরবী এবং উত্তর-সাধিকা হইয়া অনেকেরই সাধনের ও সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিয়া অনেকে নাকি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তবে এখানে কারো সঙ্গে মেলামেশা করেন না। এমন কি, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না। দিগু বলিল যে, আমাদের সঙ্গে নিত্যই দেখা-শোনা, পূজা সম্পর্কে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে নিত্য ঘন ঘন যাতায়াত,—পূজার্চ্চনার সম্বন্ধে এতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও এক সঙ্গে তাঁর মুখে দশটি কথা শুনি নাই। যোগিনী-তন্ত্রের সাধিকা। আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, যাহারা ডাকিনী বা যোগিনী-তন্ত্রমতে সাধন করে, তাহাদের প্রথম ও প্রধান তপস্যা বাক্‌সিদ্ধির,—তাহাতে সিদ্ধ হইলে তবে অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় স্তরে পাদক্ষেপ সম্ভব হয়।

যাহা হউক, দিগুঠাকুরের কাছে ইহাপেক্ষা বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। লোকটা ন্যাকা-হাবা গোছের, ভাল মানুষও বটে। নিতান্তই সরল;—কৌতূহল তাহার একটা কোন বিষয়েই নাই, কিছু জানিবার বা জ্ঞান লাভ করিবার কোন আগ্রহও নাই। তার ভাবটা এই যে,—কি হইবে অতশত কথায়? সাধুসন্ত লোকের বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া ভাল নয়;—পাছে কোন রকমে তাঁহাদের কোপে পড়িতে হয়, আর মনে করিলে তাঁহারা মারণ উচাটন প্রভৃতি অনেক কিছুই করিতে পারেন। এই সকল স্থানে সাধারণের মনে এই প্রকার ভৈরব বা সিদ্ধ তান্ত্রিকদের উপর একটা ভয়ের ভাব আছে প্রায় সর্বত্রই দেখিয়াছি।

আমাদের কলিকাতা অঞ্চল হইতে তীর্থ করিতে যাঁহারা কামরূপ যাতায়াত করেন, দিনমানেই তাঁহাদের যা কিছু কাজ শেষ হয়—বড়জোর রাত্রে তাঁহারা দেবীর মন্দির হইতে আরতি দেখিয়া যে যাঁর নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিয়া

আহারাদির পর শুইয়া পড়েন, আর কোথাও বাহির হন না। তাহাতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য-বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই ভুবনেশ্বরী শৃঙ্গ হইতে রাত্রে অসংখ্য আলোকবিন্দু চারিদিকে ঘন বিক্ষিপ্ত—সারি সারি শ্রেণী-বদ্ধ দীপমালা—অলংকৃত গৌহাটির শোভা বর্ণনাতীত। একবার যাইয়া দেখিতে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রে সম্মুখে গৌহাটি নগরে আলোকমালা আর দিনমানে ঐ স্থান হইতেই ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য,—তার পর দূরে দূরে চারি-দিকেই ঘনশ্যামল পর্বতমালা, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পর্বতের স্তর, উপরে মেঘমালা শিরে ধরিয়া দিগন্তে চলিয়া গিয়াছে। এই ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পিছনে একখানা পাথরের উপর আসন করিয়া বসিলে সারা দিন ঐ সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায় বলিয়াছি। নীচে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল স্রোত, তাহার উপরে বড় বড় ফ্ল্যাট প্যাসেঞ্জার ষ্টিমার চলিতেছে। গতি তাহাদের ত ধরিবার উপায় নাই—অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে তবে তাহাদের গতি লক্ষ্য হয়। কতটা নীচে—প্রায় সহস্র ফিট হইবে ঐ নদীগর্ভ,—বড় বড় পাট, চা, প্রভৃতি বোঝাই ষ্টিমার, এমন কি কাছাড়ের বড় বড় ষ্টিমারগুলি যেন খুব ছোট ছোট দিয়াশলাই এর বাক্স অথবা ঘন একটু রেখার মত। নৌকাগুলি ত অনেক সময় চক্ষেই ধরা যায় না। ওখান হইতে উমানন্দ পাহাড় ও তদুপরি মন্দির চমৎকার দেখা যায়। পরে উমানন্দ গিয়াছিলাম। এখানে ভুবনেশ্বরীর শৃঙ্গ হইতে দেখিলে মনে হয় যেন চারিদিকে ঘনজঙ্গলজালে ঘেরা কতকটা জমি নদীর মাঝে চরের উপর পড়িয়া আছে। তীর্থহিসাবে উমানন্দ শৈলের বড় মাহাত্ম্য।

॥ ১৪ ॥

এখন কামাখ্যার বিপিনঠাকুর পাণ্ডার ঘরে যখন স্নানাদি শেষ করিয়া আহার করিতে গেলাম, কাল সন্ধ্যায় যে ভৈরবীকে ভুবনেশ্বরীতে দেখিয়াছিলাম দেখি আজ সে পাণ্ডার কন্যা গৌরীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে তক্তার উপর বসিয়া কথা কহিতেছে। গৌরী মেয়েটি অতীব শান্তস্বভাবা।—আমি খাইতে বসিলে সে ঘরের বাহিরে দ্বারের নিকটেই আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া দেখিয়া লয় আমায় আর কিছু দিতে হইবে কিনা। একে ত অন্ন বেশী পরিমাণে দেওয়া থাকে—তা আমার মত দু'জনের পক্ষেও বেশী—কাজেই আমার আর কিছুই দরকার হয় না। প্রথম দিন আহার দেখিয়া পরদিন হইতে প্রায় পরিমিত অন্ন আসে ; তবুও শেষে জিজ্ঞাসা করে আমার পেট ভরিয়াছে কিনা। তাহার ধারণা কলিকাতার লোকেরা বড় কম খায়।

যাহা হউক, আমি এখন আসিয়া দেখিলাম, আমার ঠাঁইটা করাই আছে, জলের ঘটিটা বাঁ-দিকে যেমন থাকে তেমনি ; পদ্মপাতা একখানি পাতা আছে, একটা কাঁচা লঙ্কা ও নুন তাহার এক কোণে। আমার আবির্ভাবে দুজনেই বাহিরে গেল। কাজেই আমি তক্তার উপর বসিয়া অন্নের অপেক্ষায় রহিলাম। ভৈরবীর হাতে একখানা পত্র ছিল, যেন ঐ পত্র লইয়াই তাহাদের মধ্যে কথা হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম আবার দুইজনেই আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল।

গৌরী,—এখন একপা আগে আসিয়া বলিল,—ইনি আপনারে কিছু বলবেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি বলবেন? ভৈরবী একটু আগাইয়া আসিল এবং হাতের পত্রখানা তক্তার উপর, যাহাতে সহজেই আমি লইতে পারি এমন স্থানে রাখিয়া বলিল,—এখানা পড়ে দেখেন।

খামের মধ্যে পত্র ছিল, বাহির করিয়া পড়িলাম,—

কামেগ্রাম, কাঁটালিপাড়া পোঃ আঃ (হুগলি)

এলোকেশী,—আমি অনেক সন্ধান করিয়া শেষে জানিতে পারিলাম যে তুমি কামাখ্যায় গিয়াছ—ও সেই বুড়ো ভৈরবের দাসী হইয়া আছ। আজ প্রায় এক বৎসর পর তোমার খোঁজ পাইলাম। কিন্তু আমি যে সেখানে গিয়া পেঁাছিব তাহার সামর্থ্য নাই,—গত দুই বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরিতেছি তাহার উপর হাতে একটিও পয়সা নাই। পথ্য জুটিতেছে না। আমি এখনও মরিতে চাই না, এখনও বাঁচিয়া থাকিব আর তোমার শাস্তি দেখিব। তোমার দুর্গতি না দেখিয়া আমি কিছুতেই মরিতে পারিব না। মনে করিও না যে আমি অশক্ত বলিয়া তোমাদের কাছে যাইতে পারি নাই কিম্বা পারিব না—আমি এখন দৈবের সাহায্য লইয়াছি,—এইবার তোমার সর্বনাশ করিব, তুমি আমার হাতে কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। এখনও বলি তুমি আমার কাছে ফিরিয়া এস, তাহা হইলে এখনও ক্ষমা করিতে পারি। জানিনা তোমার এ শুভমতি হইবে কিনা। উপরের ঠিকানায় পত্র দিবে এবং তোমায় অভিপ্রায় জানাইবে। আর যদি পনেরো কি কুড়িটা টাকা পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আমার ঔষধপত্র চলে, এখানে কিছু ধার হইয়াছে, তাহারা বড়ই জ্বালাতন করিতেছে। তুমি যেমন করিয়া পার টাকা নিশ্চয় পাঠাইবে।

ইতি— শ্রীঅঘোরনাথ ব্রহ্মচারী

জিজ্ঞাসার কথা অনেক; এই অদ্ভুত পত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই, কারণ এ ধরণের ভৈরব ও ভৈরবী-জীবনের কথা অনেক জানিতাম। শুনিয়াছিলাম কত, চাক্ষুষ দেখিয়াছি ত অনেক। ইহাদের উপর অসাধারণ ঘৃণা ছিল আমার। আমার মনে হইল দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ,—সমাজের জঞ্জাল। তবে ইহার শক্তি সম্বন্ধে দিগুঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে একটু বিশেষ কৌতূহল ছিল। এখন এই পত্র পড়িয়া,—একটা এমন গ্লানি আমার মনোমধ্যে উপস্থিত হইল যে, কথা কহিতে প্রবৃত্তি

হইল না। যাহা হউক, এখন পত্রখানা যেখান হইতে লইয়াছিলাম সেইখানেই রাখিয়া বলিলাম,—আমি কি করিতে পারি?

ভৈরবী এলোকেশী নামেই পরিচিত।

এলোকেশী, পত্রখানা হাতে তুলিয়া লইল, তারপর বলিল যে, আপনি যদি আমার হইয়া একখানি পত্র লিখিয়া দেন তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ত এখানে অনেকের পরিচিত আর কাকে দিয়েও লেখাতে পারেন, আর নিজেও ত লিখতে পারেন—? শুনিয়া সে বলিল, কাকেও কোন প্রকার পত্র লিখতে আমার নিষেধ আছে। আমি বলিলাম,—পত্র ব্যবহারই যদি করতে পারেন তবে শুধু লেখার নিষেধটুকু মানা কি ভণ্ডামী নয়? এ ভাবের কাজ আমার ভাল লাগে না। আমার কথা শুনিয়া তাহার মুখে যে ভাব প্রকটিত হইল দেখিয়া আমার অন্তরে অনুশোচনার সীমা রহিল না, এতটা কঠোর বাক্য আমার মুখ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইল ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম। এতটা তুচ্ছভাবে যাহাকে আজ এই কথা বলিলাম, যদি ঘুণাক্ষরে এই নারীর প্রকৃত পরিচয় জানিতাম তাহা হইলে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতাম। বিধাতার বিধানে এমন ভাবে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। শেষে বুঝিয়াছিলাম যন্ত্রবৎ কাজ করিয়াছি প্রকৃতি বা বিধাতার হাতে। আজ আমার সারাদিনের শান্তিটা নষ্ট হইল। অন্তঃকরণ আমার অত্যন্ত দুর্বল—সহজে কিছু ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না।

তাহার সহজ প্রফুল্ল মুখের উপর বিষাদের কালি তখনও লাগিয়া আছে,—তাহার উপর এখন একটু সপ্রতিভ ভাব চেষ্টা করিয়া টানিয়া আনিল, তারপর মাথা নত করিয়া বলিল,—আচ্ছা তাহলে থাক, আমি অন্য কাকেও দিয়েই এটা লেখাবার চেষ্টা করব। বলিয়া একেবারে বাহিরে চলিয়া গেল। এখন গৌরীর মুখের দিকে দেখিলাম। আগে তাহার প্রসন্ন মুখই দেখিয়াছি,—এখন দেখিলাম, তাহার মুখে একটা চাপা ঘৃণা, বিদ্বেষ, ও উপেক্ষা—আর ঐ তিনটি ভাবের উপরে ঢাকা একটা কর্তব্যবোধের সূক্ষ্ম আবরণ। দেখিলাম, আজ আমার ব্যবহারে দুই জনই আহত হয়েছে। অতঃপর সে অন্ন লইয়া আসিল।

যখন খাইতেছিলাম গৌরী আর দাঁড়ায় নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিতে ইচ্ছা হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, খাওয়া শেষ হইবামাত্র চলিয়া গেলাম না। আমি চলিয়া গিয়াছি মনে করিয়াই সে যখন আসিল তখন তাহাকে বলিলাম—আমার একটু অন্যায় হয়ে গেছে। শুনিয়া সে উপেক্ষার ভাবেই বলিল,—কি বলচেন? আমি বলিলাম, এখানে এত লোক থাকতে আমায় দিয়ে লেখাবার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি তাই হয়ত একটু কঠোর ভাবেই—

সে বলিল, এখানে অনেক লোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় একথা কে আপনাকে বললে?

বললাম, উনি যখন এতদিন এখানে রয়েচেন।

বাধা দিয়া গৌরী সতেজে বলিল, প্রায় আড়াই মাস এসেছেন,—কিন্তু ওঁর মধ্যে কি আছে তা জানেন কি?—কারো সঙ্গে মেলামেশা চুলোয় যাক, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন না। মাটির দিকে চেয়ে চলেন দেখেন নি? কেবলমাত্র আমাদের বাড়িতেই ওঁর যাওয়া-আসা আছে,—আর কোথাও তো যান না।

সত্য বটে, গৌরীর আজ অন্যমূর্তি দেখিলাম। যাহা হউক একথা সত্যই, তাঁহাকে যতটুকু দেখিয়াছি, মাথা তুলিয়া চলিতে দেখি নাই।

আমরা যখন কোন শক্তিশালী নরনারীর কথা শুনি তখন অনুমান আশ্রয় করিয়া প্রায়ই তাহাকে নিজ মনোমত করিয়া লই ; তাহাতে আসল বস্তুটি যে কতটা বিকৃত হয় তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। দিগুঠাকুরের মুখে যখন শুনিয়াছিলাম যে ঐ ভৈরবী সাধারণ নয়, মহাশক্তিশালিনী একজন উত্তর-সাধিকা,—তখন কল্পনায় যাহা গড়িয়াছিলাম আজ তাহার ঐ পত্র পড়িয়া কি জানি-কি-ভাবে সব ওলট-পালট হইয়া গেল। তারপর আবার ভাবিতেছি কি তুচ্ছ আমাদের লোকচরিত্র-জ্ঞান। এতদিনের অভিজ্ঞতায় এ সংযম আমার মধ্যে জন্মায় নাই যাহাতে একজনকে সমগ্রভাবে আমার কল্পিত সদসৎ-ভাবের উপরে যাইয়া তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্য দিয়া সহজভাবেই দেখিতে পারি। নিজ অভিজ্ঞতার অহংকারই আমায় এইভাবে অন্ধ এবং ধৈর্য্যহীন করিয়া তুলিয়াছে। এ গলদ আমার মনের মধ্যে আর চাপা রহিল না।

আমি গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ঐ অঘোরনাথ ব্রহ্মচারীকে যদি আমি এলোকেশী ভৈরবীর কথামত পত্র দি তাহাতে কিছু ভাল ফল হবে মনে কর ?

গৌরী বলিল, ভালমন্দ জানি না। তবে এলোকেশীর ঠিকানা যখন সে পেয়েছে তখন কেবলই পত্র লিখবে, শাপ গালাগাল দেবে, আর টাকা চাইবে। সেই জন্য আপনাকে দিয়ে এমন-ভাবে ও একখানি পত্র দিতে চাইছিল যাতে আর এইভাবে জ্বালাতন না করে।

শুনিয়া বলিলাম,—আচ্ছা তুমি ওকে বল আমি পত্র লিখে দেবো।

গৌরী বলিল, উনি আর কাউকে দিয়েই কোন পত্র লেখাবেন না ; চলে গেছেন উপরে ভুবনেশ্বরীতে ওঁর গুরু উমাপতি বাবা ভৈরবের কাছে সব কথা বলতে। তিনি যা বলবেন এখন উনি তাই করবেন।

আমি এই বলিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এই কাজটি আগে করলেই ত ঠিক হোত !

গৌরী বলিল, এসব অশান্তিকর ব্যাপার গুরুর কাছে বলতে চাননি, বরং যাতে না বলতে হয় সেই চেষ্টাই ত করছিলেন কিন্তু আপনি যখন এ কথা বললেন যে 'এ সব ভণ্ডামী' তখনই ওখানে চলে গেলেন।

আজ প্রাতে আমি উমাপতি ভৈরবের কাছে গিয়াছিলাম। বিশেষ কোন কথা হয় নাই বটে তবে পরিচয় হইয়াছে। বড়ই স্নেহের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছি আমার স্থান তাঁহার নিকটেই, অতি অল্প ব্যবধানে জানিয়াই 'যখন খুশী আসবে,' এ হুকুম যখন দিয়াছেন তখন আমি একে-বারেই কৌলবাবার কাছে গিয়া এখন উপস্থিত হইলাম।

গিয়া দেখিলাম, উমাপতি যথার্থই শিবের মত প্রসন্ন বদনে নিজ আসনেই বসিয়া আসেন। জটাজুট দুই পাশে ও মাথার পিছনে ছড়ানো, হাতে এক-খানা পাখা। এলোকেশীও ঐখানে আছে। পাখাখানি সে চাহিতেছে, কিন্তু উনি নিজেই নাড়িতেছেন, দিতেছেন না। সেখানে দিগুঠাকুরও ছিল। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমায় আশীর্বাদ করিলেন, মনে মনে। মুখে বলিলেন, এই আমাদের নূতন কুটুম্ব। ভৈরব এলোকেশীকে বলিলেন, তুমি এঁকে দিয়েই পত্র লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলে ?

সে বলিল, হাঁ বাবা।

বুঝিলাম ইতিমধ্যে সে সকল কথাই ইঁহাকে বলিয়াছে।

ভৈরব তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ওকে বেশ কথাটা বোলেচ তুমি। এড়াবার যো নাই।

এলোকেশী উমাপতি বাবার পায়ের উপর মাথাটি রাখিয়া পড়িয়াছিল। এবার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অনেক ত দেখলাম, তোমার মত উত্তর-সাধিকার শক্তি পেয়ে যে কিছু করতে পারলে না, তার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

এলোকেশী মাথা নীচু করিয়া বলিল,—দণ্ড ত পাচ্চেন, আজ দু'বৎসর রোগে ভুগচেন, শরীর ত ক্ষয় হয়ে আসছে, অন্য সাধারণ মানুষ হলে কখনও এতটা সহ্য করতে পারতো না।

দিগুঠাকুর এইবার প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। রহিলাম আমরা তিনজন। এখন উমাপতি এলোকেশীকে বলিলেন,—তোমার ঐ অঘোর ব্রহ্মচারী ত দূরের শত্রু, নিকটেই একটি প্রবল শত্রু সেটা লক্ষ্য করেচ কি? একটা বিজাতীয় ক্রোধ এলোকেশীর মুখে প্রকট হইল, চুপ করিয়া নখ দিয়া মাদুরের উপর খুঁটিতে লা গি ল,—দেখিতে দেখিতে বোধ হইল যেন তার চক্ষু হইতে টপ টপ শব্দ করিয়া দু'ফোঁটা জল মাদুরের উপর পড়িল। গুরু বলিলেন,—একি আশ্চর্য্য, কাঁদচো? এলোকেশী সেইভাবে নতমুখে বলিল, আপনি কান্না দেখলেন? পরে যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম; সে চক্ষে এক জ্বালা,—যখন মুখ তুলিয়া বলিলেন,—মেয়েদের শরীরটা নিয়ে

শিয়াল কুকুরের মত ছেঁড়াছিঁড়ি করতেই কি ঐ সব পশুদের তন্ত্রমতের সাধনা? তারপর, অনুযোগের সুরে সতেজে বলিলেন, আপনি কেন ওকে প্রশ্রয় দিলেন? দেখিলাম ভিতরের আগুনটা বাষ্পের মধ্যে দিয়া জল হইয়া বাহির হইয়াছিল।

উমাপতি বলিলেন,—এসব পরীক্ষার অবস্থা যারা পার হতে পারেনা তারা পশ্বাচার ছাড়ে কি বোলে। ঐ শিক্ষাটা দেবার জন্যই ওকে তাড়াইনি, তা ছাড়া ও যখন এখানে এসেছে তখন মায়ের একটা উদ্দেশ্য আছে আর তা আমি

পারিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তাই ওকে প্রশ্রয় দিয়েচি। তুমি তো জানো, তোমার উপর ওর কোন প্রভাব খাটবেনা,—তোমার জন্য নয়, অবলা সরলা বাইরের কোন কোন মেয়ের উপর যথেচ্ছা শক্তি প্রয়োগ ক'রে তাদের মধ্যে অশান্তি গ্লানি সৃষ্টি করবে এ কি ক'রে সহ্য করা যায়? প্রতিকারের জন্যই ওকে একটু আমল দিয়েছি। ওর সেদিকে চক্ষু খুললে দেবো বোলেই অপেক্ষা করচি, মা! তান্ত্রিকমতে সাধনের নাম করে, কাঁচা বয়সের মেয়েদের পিছনে আর ওকে ছুটতে হবে না। শুনলাম ইতিমধ্যেই পান্ডার এক মেয়েকে ও অভিচার করেছিল, মেয়েটি নাকি পাগলের মত হয়ে গেছে—আজই আমি দিগুর কাছে শুনলাম। আর শুনলাম, রেলেও একটি ভদ্রলোকের মেয়েকে প্রাণে মারবার যোগাড় করেছিল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া উমাপতি আমার দিকে চাহিলেন। এমনই সময়ে সেই ভৈরব আসিয়া দ্বারপথে দেখা দিল,—সেই রেলের ভৈরব।

উমাপতি, ভৈরবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—এসো তোমার কথাই ত হচ্ছিল এখন। ভৈরব আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। সঙ্গে সঙ্গেই এলোকেশী উঠিয়া বাহিরে গেলেন। তখন উমাপতি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—তুমিও এখন একটু বাইরে সিনারী দেখগে যাও বাবা! তিনি আজ সকালে পরিচয়কালে এখানকার দিব্য দৃশ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমায় শিল্পী বলিয়া জানিয়াছিলেন।

॥ ১৫ ॥

দেবী মন্দিরের পিছনে, সেই নির্জন স্থানটি,—যেখানে বসিয়া নিত্য আমি ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্যাদি উপভোগ করিতাম, বরাবর সেদিকে যাইতে একস্থানে দেখিলাম, এলোকেশী বিষন্নমুখে বসিয়া আছেন। একটু কথা কহিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কৌতূহলও ছিল, তাই একটু দূরে দাঁড়াইলাম। তাঁহার মধ্যে প্রথমে একটা সঙ্কোচের ভাব ছিল,—তারপর যখন তাহা সহজ হইয়া আসিল তখন এই বলিয়া আমি আরম্ভ করিলাম,—আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন বোধ হয়?

প্রথমে এই কথাটাই মুখে আসিল।

ভৈরবী বলিল,—এই বাঙ্গলার মধ্যেই সামান্য কয়েকটা জায়গায় গিয়েছি মাত্র,—তাছাড়া আর বড় একটা কোথাও যাইনি।

শুনিয়া আমি বলিলাম,—আপনি ত অনেক রকম সাধু দেখেছেন, এই যে ভৈরবটি,—কেমন মানুষ বলুন ত?

ঐ ত বাবার কাছে শুনলেন,—একটা পশুবিশেষ। ধর্মরাজ্যে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, কুমীর, শেয়াল, ছাগল প্রভৃতি জঙ্গলের মতই নানারকম পশু আছে ত?

আমার একটি কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল, এমন কি অদম্য হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—অঘোর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কিছু জানতে কৌতূহল হয়,—তিনি কেমন লোক?

শুনিয়া এলোকেশী যেন চমকিয়া উঠিল,—কিন্তু অল্পক্ষণেই স্থিরভাবে বলিল,—পত্রের মধ্যেই কি তার পাগলস্বভাবের পরিচয় নেই? তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল যেন চলিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া মনে এই দুঃখ

উপস্থিত হইল যে, আমার কথায় আবার তাহার মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। আমার এ-ভাবে কৌতূহল প্রকাশ করাটা ভাল হয় নাই।

আমার মুখের দিকে দেখিয়া এলোকেশী আবার বসিল। বসিয়া বলিল,—কিছু মনে করবেন না, আমি অত্যন্ত সংক্ষেপেই বলছি। যে অঘোরনাথের পত্র আপনি দেখেছেন, এক সময় উনি একজন কঠোর বীরাচারী ভৈরব ছিলেন, ঐ সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই ইনিই (উমাপতি) আমার গুরু। ইনি যখন চন্দ্রনাথে ছিলেন, অঘোরনাথ সেখানে আসেন। সেইখানেই আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। কোথা থেকে জানি না তাঁর মাথায় ডাকিনীসিদ্ধির কথা ঢুকেছিল, বীরাচারের সঙ্গে উনি ডাকিনীসিদ্ধির চেষ্টা করছিলেন ; তা গুরুদেবকেও বলেন নি। গোপনে আমায় তাঁর উত্তর-সাধিকা হবার জন্য এমন প্রবলভাবে সাধ্য-সাধনা আরম্ভ করলেন, আমি গুরুর পরামর্শ না নিয়েই তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই রাজী হয়ে এক সময়ে গোপনে তাঁর সঙ্গে ওখান থেকে চলে আসি। আসামের পরশুরামকুণ্ডের কাছে একটা স্থান অঘোরনাথ সাধন ও সিদ্ধির জন্য ঠিক করেছিলেন। সেখানে গিয়ে অল্পদিনেই সেই আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। আমি এ-সব কাজে পটু ছিলাম ; —আর অঘোরনাথ তখনও অবধি নিষ্কলঙ্ক, তেজস্বী, বীরাচারের উপযুক্ত সাধক ছিলেন। কিন্তু বীরাচার-সিদ্ধির পূর্বেই যে এই কাজে লেগে গেলেন সেইটিই ভুল করলেন। কারণ বীরাচারে সিদ্ধি না থাকলে ওপথে যাবার যো নেই। কিন্তু ওঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর সিদ্ধি নিশ্চয় হবে। আমার দিক থেকেও কিছু দোষ ছিল না,—আমি তাঁকে প্রথমেই বলেছিলাম বীরাচারসিদ্ধ না হয়ে ও সব করতে নেই। কিন্তু অঘোরনাথ চট্টগ্রামে গুরু তিলোপার কথা শুনেছিলেন—যিনি বীরাচার সাধন না করেই ডাকিনীসিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তিব্বতী গুরু যে পিছনে ছিলেন, আর তিলোপা যে আকুমার ব্রহ্মচারী একথা অঘোরনাথ মনেই আনলেন না। যাই হোক, তাঁর সাধন আরম্ভ হোলো।

মাত্র তিনটি দিন আসনে স্থির থাকতে পেরেছিলেন, তার পরই তাঁর পতন হোলো। প্রথম বিভীষিকা দেখতে লাগলেন, সেই সময় উত্তর-সাধিকার যা করণীয় তা আমি ঠিক মত করলাম—তার ফলে সে অবস্থা অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্র অসংলগ্ন উচ্চারণের ফলে আর নিজ শক্তির অহংকারে তাঁর মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। তাতেই তিনি পতিত হলেন। প্রবল উত্তেজনার বশে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হয়ে আমারও সিদ্ধির পথে যে বিঘ্ন উপস্থিত করলেন এ জীবনে আমার আর কোন সিদ্ধির আশা আছে কিনা জানি না। নিজেরও সর্বনাশ, আর বোধ হয় আমারও সাধন ও সিদ্ধির জীবন নষ্ট করে দেবার মতই করে এনেছিলেন। তারপর—পতিত অবস্থায় অর্দ্ধেক পাগলের মত চলে এলেন ওখান থেকে। ক্রমে আমার উপর তাঁর বিদ্বেষ, শত্রুতা, হিংসাবৃত্তি এমনই প্রবল হয়ে উঠলো, যে যাকে সামনে দেখতেন তাকে ডেকে নিয়ে এসে আমায় দেখিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন,—এই রাক্ষসী-পিশাচী সর্বনাশীই আমার সর্বনাশ করেচে। মাঝে মাঝে প্রহার করতেন, তারপর আবার কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতেন। এমন ভাবে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাছাড়া এতটা সহ্য করেও আমি তাঁর কোন কল্যাণ করতে পারবো না একথা যখন আমার দৃঢ় প্রত্যয় হোলো আমি তখন সেখান থেকে পালিয়ে

আসি,—অনেক দিন, অনেক কষ্টের পর মাত্র এই কয় মাস আগে এখানে এসেছি —সেই অবধি এইখানেই আছি। এখন তিনি আশা দিয়েছেন যে, তাঁর প্রবর্তিত নিয়মে থাকলে আবার আমার সিদ্ধির জীবন পাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রায় পূর্ণভাবেই আছে। তবে মনে কোন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কিন্তু অঘোরনাথের আর কল্যাণ নেই ; উনি বলেন ওর দম্ভ ও অহংকার যত, লোভও তত। ওরকম লোক কখনও কোন দিন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। ডাকিনী-সিদ্ধি অত্যন্ত ভয়ানক, এখন ওসব চেষ্টা করাও নিষেধ ; কারণ ঐদিকের সাধনায় সিদ্ধ গুরু পাওয়া যায় না। গুরু নিজে উত্তরসাধক না হোলে ওতে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। উনি বলেন, ও সকল এখনকার দিনে লুপ্তপ্রায়। এই পর্যন্তই আমার কথা।

এলোকেশী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

আমি কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তারপর ভাবিলাম এবার হয়তো ভৈরব চলিয়া গিয়াছেন এখন বাবাকে প্রণাম করিয়া নিজ আসনেই যাইব। যখন বাবার ঘরের পাশের দরজার কাছাকাছি গিয়াছি তখন ভৈরবের আওয়াজ পাইলাম। এখনও লোকটা যায় নাই, অথবা কথা শেষ হয় নাই। আমি দাঁড়াইয়া গেলাম, শুনিবার ইচ্ছা হইল। শুনিলাম, ভৈরব বিরক্ত ভাবেই বলিল, আপনি আমার পতনেরই কল্পনা করচেন, কেন আমার পতন আসবে? আমার মনমতো একটি ভৈরবী শক্তি লাভ হলেই তো তাকে নিয়ে আমি এক জায়গায় বসে যাবো, তখন বীরাচারের সিদ্ধি থেকে আমায় নামাতে পারে কে?

উমাপতি—নামাবে তোমার প্রকৃতি, তোমার ভোগ-প্রবৃত্তি, আবার কে নামাতে পারে? যে সাধক বীরাচারী হবে সে কি ঐরকম পশুভাবের গন্ডীর ভিতর থেকে সুশ্রী যুবতী মেয়েমানুষ দেখলেই তাকে টানতে যেখানে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে বসে?

তৎক্ষণাৎ ভৈরব বলিল—কেন? কোথায় আমি যেখানে সেখানে তা করেছি।

উমাপতি বলিলেন—কেন, আমি শুনেছি সেদিন এখানে আসার পথেই, রেলে বোসে বোসে একটি ভদ্র ঘরের মেয়েকে মরণ দশায় ফেলেছিলে তার উপর শক্তি প্রয়োগ করে? প্রতিবাদে ভৈরব বলিল—সে মেয়েটি দুর্বল ছিল তাই সে অচৈতন্য হয়ে পড়লো. তাতে আমার দোষটা কোথায়?

উমা,—কেন তুমি ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীর উপর শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে? করবার আগে ভেবে দেখনি কেন যে, সে কুমারী না বিবাহিতা. সঙ্গে যখন তার অভিভাবক ছিল? ভৈরব বলিল,—তার বিবাহিতার কোন লক্ষণই দেখিনি, কপালে বা সিঁথিতে সিন্দুর-চিহ্নমাত্র ছিল না।

শুনিয়া উমাপতি বাবা বলিলেন,—যখনই সে অচৈতন্য হোল তখনই তো বুঝেছিলে যে ব্যাপারটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,—তখনই কেন সামলাওনি? উত্তর নাই—। উমাপতি আবার বলিলেন,—বলনা, যখনই তুমি বুঝলে যে, তার প্রকৃতির সঙ্গে তোমার বিরুদ্ধ সম্পর্ক, সে তোমার শক্তি প্রতিহত করতে গিয়ে একটা সাময়িক দুর্বলতার জন্যই অচৈতন্য হয়েছিল, তখন পারলে না তাকে আকৃষ্ট করতে, তখন তার চৈতন্য সম্পাদন না করে, তার স্বামীকে তোমার কাছে আসবার জন্য ঠিকানা দিয়ে এলে কেন? আরো একবার শক্তি প্রয়োগ করবার মতলব নয় কি?

আশ্চর্য্য! তিনি কেমন করে এত খুঁটিনাটি জানতে পারলেন;—নিশ্চয় কোন প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টার কাছে শুনেছেন। ভৈরবের মুখে কথা নেই, রেলে যেমন ঘাড় হেঁট করে নিম্নদৃষ্টি দেখেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

উমাপতি আবার বলিলেন,—তারপর এখানে এসে কৈলাস পাণ্ডার মেয়েকে,—

বাধা দিয়া ভৈরব বলিল, সে তো কুমারীই ছিল। বাবা উমাপতি বলিলেন, —তা থাকলেই বা, তোমার মত একজন পশু, এই মহাপীঠের মায়ের গৃহস্থ-সেবকের কুমারীকে ভৈরবী করবার আশা করলে কি কোরে? তার প্রতিবাদ ও উপেক্ষা সত্ত্বেও তাকে স্পর্শ করতে গেলে কোন অধিকারে? তোমায় মতিচ্ছন্ন বোলব না তো কি বোলব? এখন তুমি আবার এলোকেশীকে ধরবার চেষ্টায় এখানে আনাগোনা আরম্ভ করেছ। তার আসল রূপটি দেখনি,—তাই সাবধান করে দিচ্ছি,—ওর কাছে যেও না। একজন মরতে বসেছে, তুমিও মরবে? ওকে তুমি চেনো না, আমি চিনি, তাই এত করে সাবধান করা।

তারপর চুপচাপ,—ঘরে যেন কেউ নাই। কতক্ষণ পর উমাপতি বলিলেন, এতটা জেনে, এতটা শুনেও তোমার মধ্যে চৈতন্য এলো না,—কোন্ পথে এই সব তুচ্ছ তোমার স্বভাবগত, মনের দুষ্প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্ত হয়ে শক্তি-সাধনে যথার্থ উন্নত হতে পারবে, তন্ত্রধর্মের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে, সে অনুসন্ধিৎসা এলো না, কি করে তোমার ভাল হবে? আশ্চর্য্য।

এইবার মুখ তুলিয়া সে বলিল, বললে আপনি বিশ্বাস করবেন? উমাপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন,—অবিশ্বাস আসবে কেন তোমার কথা সত্য হলে?

আমি এতক্ষণ ঐ কথাই চিন্তা করছিলাম, সত্যই, বড় করুণসুরে সে বলিল,—আমার যেটা গলদ আপনি আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনি আমার গুরু। এর পরও যদি আমি সংশোধনের পথে না যাই তাহলে আমার সর্বনাশের দেরি নেই। এখন থেকে আমি আপনার অনুগত হলাম, আপনি আমায় উপদেশ দিন কেমন করে সাধন পথে যাবো?

এখন দেখিলাম যেন মুখের ভাব পরিবর্তিত, তাহার মধ্যে রূঢ়ভাব আর তিলমাত্র নাই। দেখ, বাবা বলিলেন, ভৈরব ধরে একটা মন্ত্র নিয়ে কিছুদিন জপ-তপ করে নিজেকে খুব শক্তিমান মনে করেছিলে। শক্তি গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে সুশ্রী বা যুবতী মেয়ের পিছনে পিছনে ঘুরে তাকে অধিকার করবার চেষ্টাই যে তোমাকে অধঃপতনে নিয়ে চলেছে তা তুমি বুঝতে পারনি। এইভাবে কি শক্তি গ্রহণ করতে হয়? যার কাছে দীক্ষা নিয়েছ তিনি কি কিছু বলে দেননি? কতকটা যেন চিন্তিত ভাবে ভৈরব বলিল,—তিনি তো ঐ রকমই বলেছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে তোমার শক্তি খুঁজে পাবে। তাকেই উত্তর-সাধিকা করে নিয়ে সাধন করবে।

উমাপতি বলিলেন,—না না ও নিয়ম নয়—বাজারের শক্তি নিয়ে কাজ হবে না, জীবনটা মাটি।—তোমার যদি এ পথে আসতেই মন্ত্র ছিল,—নিশ্চয় তুমি কোন ভদ্রঘরের গৃহস্থের ছেলে, তোমার উচিত ছিল স্বসম্প্রদায়ের ভেতর থেকে বিবাহ করে ভালোবাসায় তাকে বেঁধে, শিক্ষা দিয়ে শক্তিতে পরিণত করা, তাহলে এইসব পাতকের মধ্যে পড়তে হোত না। এই উপায়টাই সহজ, নিরাপদ, তাতে সাধনের খুব সুবিধা হোত। তন্ত্রের উপদেশও তাই। সাধারণের কাছে তোমার মত লোকের পাতকের সীমা নেই—তন্ত্রধর্মের নাম তোমরাই ডুবিয়েছ।

তা নয়ত বাজারের ভৈরবী ধরে কি শক্তি সাধন হয়? বাজারের ভৈরবী ত বেশ্যার সামিল, কত পশুর পরিত্যক্তা হয়ে আর একটা পশু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার এই উন্মার্গগামী মনই তোমায় ডোবাবে দেখছি।

ভৈরব বলিল,—আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি, এখন আমায় রক্ষা করুন।

উমাপতি বলিলেন,—যদি সত্যি সৎপথে যেতে চাও, তাহলে ঘরে ফিরে যাও, গিয়ে বিবাহ করো। তারপর দুজনে এক সঙ্গে আমার কাছে এসো তখন বোলে দেবো। রাজী আছ?

নিশ্চয়। তাহলে আমায় গৃহী হতে বলছেন।

বাবা বলিলেন, তাইত বলছি।

ভৈরব বলিল,—তাহলে ছেলেমেয়ে হবে, তাদের পিছনেই তো দিন কেটে যাবে, অর্থ উপার্জন করতে হবে চেষ্টা করে।

কেন, ঐখানেই তো সংযমের পরীক্ষা তোমার হয়ে যাবে। ব্রহ্মচর্য্য করবে, সন্তান কেন হবে? প্রাথমিক ইন্দ্রিয় সংযম। প্রবৃত্তিকে সংযম করবে, ঐ শক্তি মন্ত্রজপ, ধ্যানে লাগাবে, যেটা ভাল হবে, তা সংযমের দিকে লাগাবে, তাতে আরও শক্তি বাড়বে, এইভাবেই তো চালিয়ে যেতে হবে। বলিয়া কিভাবে উদ্দাম প্রবৃত্তির স্রোতে না ভাসিয়া সংযত উপায়ে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে তাহাই অতীব মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, গলার আওয়াজ আর শুনা গেল না।

আমি ফিরিয়া আবার নিজ আসনে আসিব বলিয়া কতকটা আসিলাম। মনে এতটা আনন্দ হইয়াছিল, বাবা ঐ মূঢ়চিত্ত লোকটিকে ফিরাইয়াছে এই ভাবিয়া। আসিয়া কিন্তু সেইখানে আবার বসিলাম, শ্রদ্ধা জানাইয়া এবং প্রণাম না করিয়া ফিরিব না।

আশ্চর্য্য, উমাপতি বাবার শক্তি, ভাবিতে ভাবিতে যেন নিজ স্বার্থের কথায় আসিয়া পড়িলাম। তারপর, এতক্ষণে বোধহয় ভৈরবের কাজ চুকিয়া গিয়া থাকিবে, তারপর কি হইল জানিতেও একটা কৌতূহল যে ছিল না এমন নয়,—চলিলাম গুটি গুটি ঐ দিকে। কয়েক পা চলিতেই দেখি দুই মূর্ত্তিই পায়ে পায়ে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন!

একটু দাঁড়াইয়া গেলাম। শুনিলাম উমাপতি বলিলেন, তোমার ভাগ্য ভাল তাই ওর সঙ্গে প্রথমেই কথা কইতে যাওনি, আমার কাছেই এসেছিলে। এখন নিজের কল্যাণ চাও ত যা বললাম তাই করোগে; আর এক দিনও এখানে থেকোনা, এটা দেবীর কামাখ্যার নিজ প্রভাবধীন প্রিয় স্থান, এখানে তোমার মত ছাগল জাতীয় পশুর স্থান নেই। ছাগলের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত দেবী উপাসনার সম্বন্ধটা জানো তো? উত্তরে সে বলিল, কে না জানে ও কথা? উমাপতি বলিলেন,—জানো যদি তবে ঐ সব কুকর্মে লেগেছিল কেন? এ কামাখ্যায় ছাগল এলেই মায়ের কাছে বলি হয়ে যায়,—এটা কত বড় জাগ্রত পীঠস্থান তা তোমার জানা নেই? এটা বীরের স্থান, বীর হয়ে তবে এসো, দিব্য অধিকারী হতে পারবে।

তারপর প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া সে চলিয়া গেল। দেখিলাম আর যেন সে-মানুষ নয়।

*   *   *   *

পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া আমার সেই শিলাসনে বসিলাম। কি গুণে জানিনা ঐ শিলাসনেই আমার ধ্যান জমে ভালো। সর্বদুঃখহর এই আসনটি আমার ;—চক্ষু চাহিয়াই আমি ডুবিয়া যাই। অন্যস্থানে আসন করিয়া বসিবার পর চিত্ত স্থির করিতে অনেকক্ষণ যায়,—তবে জপ আরম্ভ করিতে হয়। তারপর কোনদিন বা ধ্যান আসে, কোন-দিন বা আসেই না। কিন্তু এখানে বসিলেই ধ্যান সহজভাবেই আসিয়া আমাকে আনন্দে ভাসায়,—কোন চেষ্টার অপেক্ষাই রাখে না। এই ধ্যানের অবস্থা পরম লোভনীয়, বিশেষতঃ আমার বর্তমান চঞ্চল-মতি এবং সময় সময় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এই ধ্যান আমাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া আমি ধীরে ধীরে উঠিলাম এবং উমাপতি বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

এখানে আরও একটু ধ্যানের কথা আছে। ধ্যানাবস্থার শেষদিকে যখন আসন ত্যাগ করা যায়, তখন স্পষ্ট ধ্যানাবস্থা থাকেনা বটে কিন্তু ধ্যানের রেশ থাকে। একটা নেশার মত অবস্থা। অন্তর ক্ষেত্র আনন্দে ভরপুর,—আর স্থূল অহংকার, তুষার প্রভাবে নির্জীব সাপের মত এমনই নিস্তেজ অবস্থায় থাকে তখন এই দৃশ্য-জগতের রূপ, যত কিছু বর্ণ ও আকারের সমাবেশ এই চক্ষু গ্রহণ করে—সেই সৌন্দর্য্যের রস অন্তরে এক অপূর্ব সত্ত্বার আভাস ওতপ্রোত অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয়। অপূর্ব এই শান্ত, সুখকর অবস্থাটি। মনের সংকল্প বিকল্পও মধ্যে মধ্যে থাকে, কিন্তু সেটা দ্বন্দ্বময় নয়, আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাহিরে, মধ্যে একটা স্বচ্ছ ক্ষীণ আবরণের অন্তরালে ঘটিতেছে। এভাবে মনের কাজ মধ্যে মধ্যে আমি লক্ষ্য করিতেছি বটে কিন্তু তাহাতে আমার বুদ্ধির সহযোগিতা নাই, বুদ্ধি তখন তৎগত, প্রাণ-চৈতন্যেই মিলিত আছে। বুদ্ধি বা বোধ স্বভাবতঃ আত্মচৈতন্য হইতেই তাহার উৎপত্তি সুতরাং তাহার প্রবণতা ঐ মুখেই, ঐদিকেই তাহার সহজ গতি, যার ফলে তত্ত্বজ্ঞান ও আনন্দময় অবস্থা আমাদের বোধের মধ্যে আসে।

অত্যন্ত জড়ের প্রতি আসক্তি বশতই মানুষসাধারণ,—মনের ধর্মকে সার করিয়া জগতে বাস করিতেছে, ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে তাই না আজ মানব-সমাজের এই বিক্ষিপ্ত দশা, পরম সুখে বঞ্চিত হইয়া স্থূল সর্বস্ব লইয়াই ধনের পিছনে সুখ খুঁজিতেছে। সহজেই এই জড়ের রহস্য ধরা পড়ে এই অবস্থায়, এই ধ্যান-সাহায্যে মানুষ সকল তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারে। পার্থিব অপার্থিব সবই।

যাহা হউক, এই অবস্থায় যখন বাবা উমাপতির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, ভৈরবী তখন ঘরের মধ্যে কোন কাজে ছিলেন—বারান্দা হইতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি, তিনি আমায় দেখেন নাই। হয়তো ঘরের মধ্যেই ঢুকিতাম যদি আশ্রমের স্বামীকে আসনে দেখিতাম। এলোকেশীর নাম ধরিয়া ভিতর হইতে কেহ ডাকিতেই ভৈরবী চলিয়া গেলেন। আমি দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছি, এখন ঘরের মধ্যে যাইব কিনা ভাবিতেছি, দেখিলাম ভৈরবী আবার একেবারে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বলিলেন, বাবা ঠিক বোলেছেন,—শিল্পী এসেছেন, তাঁকে বসাও। ভিতরে এসে বসুন, উনি একটু কাজে আছেন, শেষ হলেই আসচেন। আমায় ভিতরে বসাইয়া আবার চলিয়া গেলেন নিজ কর্মে। আমার আগমন তিনি ভিতরে থাকিয়াও জানিয়াছেন।

প্রথম লক্ষ্য আমার গেল এক কোণে পোঁতা দীর্ঘ এক ত্রিশূল। উমাপতি বাবার আসন ঐ ত্রিশূলের পাশে, বেশ পুরু গদির উপর প্রকাণ্ড একখানি বাঘ-ছাল বিছানো। সেই আসনের পাশেই বড় চৌকী, তার উপর রক্তবর্ণ বস্ত্র আচ্ছাদিত, এদিকে কতকগুলি পুঁথি লাল কাপড় জড়ানো লাল ডোর দিয়া বাঁধা, অন্যদিকে জবাকুসুম, রক্ত চন্দন ও সিন্দুরে লিপ্ত এক নর কপাল। এক-দিকে পুঁথি এবং অপর দিকে ঐ নর-কপাল এই দুইয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র এক কপাল-পাত্র, তার পাশেই একটি কৃষ্ণবর্ণ যন্ত্র রাখা আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। মেঝেতে খুব পুরু মাদুর পাতা আমাদের সাধারণের জন্য। বুঝিলাম বাবার কর্মস্থানটি ভিতরে,—সেইখানেই যথার্থ আসন।

বড় আনন্দেই বসিয়া আছি, ঘরে আর কেহ নাই, ঐ ত্রিশূলের দিকে আমার লক্ষ্য পড়িল। এমন ত্রিশূল পূর্বে কখনও দেখি নাই। ছোট বড় নানা আকারের ত্রিশূল বাল্যবধিই দেখিতেছি, সে জন্য নয়, এই শৈব অস্ত্রটির আকর্ষণ অন্যদিকে,—ইহা অতি প্রাচীন ; মনে হয়না এখনকার দিনে প্রস্তুত, —অথবা এখানকার কোন দেশীয় কামারশালাতে ইহা নির্মিত হইয়াছে—এমনই ইহার আকার ও গঠন পারিপাট্য যাহা সত্য সত্যই অপরূপ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। দণ্ড এবং তাহার উপরে তিনটি শূল. উহার সংযোগ-স্থল সুদৃঢ় এবং সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট সাধারণত এমন হয়না,—মনে হয় দণ্ড ও শূলত্রয় প্রয়োজন-মত পৃথক করা যায়। প্রাচীন কালের কোন অস্ত্রই এরূপ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভাজ্য আকারে দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় অস্ত্র শিল্পের ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দণ্ডটি ষট্পলা অর্থাৎ গোলাকার বা চতুষ্কোণ নয়,—ছ' কোণা, মধ্যস্থলে মুষ্টিস্থলও বিচিত্রভাবে নির্মিত। প্রায় পাঁচ ফুট দীর্ঘ দণ্ডটি তাহার উপর শূলত্রয়ের মধ্যম শূল প্রায় এক ফুট হইবে,—তিনটি ফলাই তীরের মত তীক্ষ্ণাগ্র, উহা লক্ষ্যভেদ করিয়া ক্ষেত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন না করিয়া সহজে বাহির হইবার নয়। অতি যত্নে রক্ষিত, বোধহয় নিত্যই পরিষ্কৃত হয় এমনই ইহা উজ্জ্বল, আদ্যন্ত ঝক ঝক করিতেছে কেবল উপরদিকের কতকাংশ সিন্দুরলিপ্ত। বিশুদ্ধ লৌহে

প্রস্তুত যাহা প্রাচীন ভারতীয় ধাতুশিল্পের বৈশিষ্ট্য, ইহা না বলিলেও-চলে। মনে হইল ইহা দিব্যাস্ত্র। নিকট-ব্যবধানে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, উঠিলাম। কাছে গিয়া দেখি মাটিতে পোঁতা নয়, মেঝেতে উপযুক্ত আয়তনে একটি গর্ত, গোড়ার দিকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ শূলটি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট, তাহাতেই ঠিক ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এতাবৎ যত ত্রিশূল দেখিয়াছি, আশ্রমের মধ্যে পোঁতা, না হয় দেয়ালে ঠেকানো,—ইহার ব্যবস্থাই পৃথক, প্রয়োজনমত সহজেই গ্রহণ করা যায় সুতরাং ইহা প্রতীক মাত্র নয় অথবা সাজানো জিনিস, যাহা লোক দেখাইতেই ভৈরবী ভৈরবীর স্থানে রাখা থাকে, তাহা নয়। অবশ্য পূজাবিধি সর্বত্রই আছে। আয়ুধ-পূজা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, এখনকার দিনে সম্প্রদায়-বিশেষ ব্যতীত বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবেই উহা অপ্রচলিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে উহা এখনও প্রচলিত আছে। মুগ্ধ হইয়াই দেখিতে-ছিলাম,—আর কত কি ভাবিতেছি। যাত্রা-থিয়েটারে শিবের বা দুর্গার হাতে ত্রিশূল দেখি,—কিন্তু যথার্থ ব্যবহার এখনকার দিনে আমরা কোথাও দেখিনা। উহা সাজানো একটা কিছু অথবা ধ্বংসকারী শক্তির প্রতীক হিসাবেই এখন চলিতেছে। ইতিমধ্যে এলোকেশী কখন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখি নাই।

দেখবেন স্পর্শ করবেন না যেন,—বলিয়া একটু নিকটে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এত করে কি দেখচেন? মনে যাহা উদয় হইয়াছিল তাহা বলিলাম।

আগে এমন ত্রিশূল কোথাও দেখেছিলেন?

দেখিনি বোলেই এত কাছে এসে দেখছি।

শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন, বাবা এখনই আসছেন,—তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ ত্রিশূলের কথা, তা হলে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। উমাপতি আসিলে, তাঁহার হাতে একটি বস্তু দেখা গেল,—তিনি উহা পাশের চৌকীর উপরে রাখিয়া আসনে বসিলেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কেমন ত্রিশূল? অপূর্ব,—বলিয়া আমি উঠিয়া প্রণাম করিলাম,—প্রতি নমস্কার করিয়া তিনি বোধহয় প্রসন্ন হইয়াই মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন কারণ দেখিলাম অল্পক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কর ধারণ করিয়া রহিলেন; তারপর তাঁহার ইঙ্গিতেই আমি বসিলাম,—এলোকেশী ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমার কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু অন্তরে প্রেরণা পাইলাম না। সিদ্ধ মহাযোগীর এমনই ব্যক্তিত্ব যে এখানে আসিয়া প্রথমেই কাহারও পক্ষে ইচ্ছামত কথা আরম্ভ করা সহজ নয়। আর পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও জানিতাম যে যথার্থ পিপাসুকে তাঁহারা কথা কহি-বার অধিকার বা অবসর দেন, যখন দেন, তখন নিজেই আরম্ভ করিয়া সহজ করিয়া দেন। তখনই কথা কহিতে হয়।

এলোকেশী মাতা একখানি পাতায়, কিছু জলখাবারই হইবে এবং শ্বেত-পাথরের গ্লাসে পীতবর্ণের পানীয় আনিয়া পাশে চৌকীর উপর রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্য কিছু আনবো কি?

ব্যস্তভাবেই আমি বলিলাম যে, আমি সকালের দিকে কিছু খাইনা—এমন সময় কিছু খাব না। কোলবাবা উমাপতি সহাস্যে বলিলেন,—ও আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হলে এখানে কিছু খাবে না। শুনিয়া আমি তো মহা

অপ্রতিভ। গোপন মনের একটা সত্য, এমন করিয়াও বলে ? কিন্তু আমায় তিনিই আবার এই বলিয়া তুষ্ট করিলেন,—কি জানো মেয়েমানুষ কিনা, তোমার সামনে বসে খাব আর অতিথি তুমি বসে দেখবে ? অথচ ওর মনেও এটা জানছিল যে তুমি খাবে না তাই, ও না কিছু এনে আগে জিজ্ঞাসা করলে। তাতে দায় থেকে খালাস, ভব্যতাও রক্ষা হল। এই আর কি।

ও সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া, বলিয়া ফেলিলেন, ঐ ত্রিশূলের কথা—যদি বলেন। তিনি খাইতে খাইতে বলিলেন, দাঁড়াও এ কাজটা শেষ করি, দুটো কাজ এক সঙ্গে সুবিধে নয়।

ইহার মধ্যে—যে সংযম ছিল,—আমাদের পক্ষে তা আদর্শ,—আমাদের আচার-ব্যবহারে কোন আদর্শের বালাই নাই।

॥ ১৬ ॥

জলযোগ শেষ করিয়া তিনি সেই পীত ও লোহিতাভ পানীয় গ্রহণ করিলেন। বাম নাকটি চাপিয়া ধরিয়া সহজেই চক্ষুদুটি বুজিয়া, উহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর পরিষ্কার জলে আচমন করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন,—পরে বলিলেন, এইবার তামাক ;—ও জিনিসটির সঙ্গে সঙ্গে কথা চলতে পারে,—কি বল ? আমায় কিছুই বলিতে হইল না তিনি আপনি বলিলেন, ওটা সূক্ষ্ম আহার,—বায়ুপথের বিঘ্ন উৎপাদন করে না, তাই তামাক খেতে খেতে কথা কওয়া যায়। তামাক আসিল, গুড়গুড়িতে লম্বা কাঠের নলে একটি রূপার মুখনল লাগানো, টানা চলিতে লাগিল আর কথাও আরম্ভ হইল। ত্রিশূলের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিশূলটী কার জানো ? আমি বললাম, আপনার আশ্রমে, আপনার আসনের পাশে আছে যখন, তখন ওটি অন্য কারো মনে করা যায় কি ? তিনি বলিলেন,—তা হলে জেনে রাখো, একমাত্র এলোকেশী মা-ই ঐটির অধিকারিণী, যিনি তোমায় এ সম্বন্ধে কিছু শুনবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বোলেচেন। এ পর্যন্ত ঐ মেয়েটিই ত্রিশূলটি যথাযোগ্য ব্যবহার করেছেন, অসাধারণ দক্ষতা তাঁর ঐ অস্ত্রটি চালনায়। বলিয়া একটু থামিলেন এবং তামাক খাইতে লাগিলেন।—আমার মনে হইল, ত্রিশূল চালনায় আবার দক্ষতার প্রয়োজন কি, আসলে খোঁচামারার ব্যাপার তো।—কিছুই বলি নাই। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা এলোকেশীকে দেখে কি রকম ঘরের অথবা কি প্রকৃতির মেয়ে তোমার মনে হয়, বল দিকি ?

কি রকম ঘরের, অর্থে বংশের কথাই বলচেন হয় তো ; আমি কিন্তু সে দিক দিয়ে কিছুই অনুমান করতে চেষ্টা করিনি তবে আমার কাছে ওঁর ব্যক্তিত্বই প্রধান আকর্ষণ ; তার উপর স্বাস্থ্য ও শ্রী একাধারে থাকায়, আর ওঁর সাধন-জীবনের স্বাভাবিক একটি গাম্ভীর্য্য তার সঙ্গে মিশে যেন দৈবশক্তিসম্পন্ন বোলেই মনে হয়। যদিও সম্প্রতি ওঁকে যে দু' তিনবার আমি দেখেছি, তাঁর মধ্যে অন্তরে যেন একটা দ্বন্দ্বময় অবস্থাই—আমার চক্ষে পড়েচে। অবশ্য তার সাময়িক কিছু কারণও হয় তো ছিল। কিন্তু আজ এসে এখানে আবার যে মূর্ত্তি দেখলাম তা এমনই সহজ এবং নিঃসঙ্কোচ যার সঙ্গে পূর্বে দেখা মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধই নেই। এ যেন আর এক মানুষ।

উমাপতি বলিলেন,—আগেকার কথা একটু শোনো ;—পূর্ববঙ্গের এক নমঃশূদ্র পরিবারের মেয়ে ; ওদের অবস্থা ভালো, ওর বাবাও শিক্ষিত ও বিলিতি

মনোভাবাপন্ন, ধর্মকর্মে আস্থাহীন, সরকারী বড় চাক্‌রে। বিদ্যাশিক্ষা ওকেও দিয়েছিলেন কতকটা ;—কিন্তু ও এতই চঞ্চল আর স্বাধীন প্রকৃতি যে এ দেশের মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোলেই মনে হয়, যেমন ধরো নির্ভীক চলা-ফেরা, বয়স্ক পুরুষদের কাছেও নিঃসংকোচ, গ্রামের মধ্যে বাপের বয়সী কারো কোন দোষের কথা স্পষ্ট ভাষায় তার মুখের উপর বোলে দেওয়াই ওর স্বভাব। সমবয়সী ছেলেদের তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না, বরং কোনো অন্যায় দেখলে কান ধরে গালে চড় বসাতেও ওর সংকোচ ছিল না। এই ভাবে চলছিল তারপর এক সময় ও স্পষ্ট করেই ওর বাপমাকে জানিয়ে দিলে যে ও বিবাহ ত করবেই না আর তাদের সংসারে কারো সঙ্গে ও থাকবে না। তখনই ওর বাপ মা ভয় পেয়ে গেলেন। যোলো বছরের ঐ ধিঙ্গি মেয়ে কোন্ দিন কি করে বসে,—এই তাঁদের ভাবনা। একমাত্র ওর শ্রদ্ধা বলতে যা কিছু আমারই উপর ছিল, তাই তাঁরা আমার শরণাপন্ন হলেন। যখনই ওদের গ্রামে যেতাম বিনা আহ্বানে আমার কাছে আসতো যেতো। কোনো কথা হতো না। প্রথম থেকেই ওর ধারণা ছিল যে তন্ত্রধর্মের সাধনে মহাশক্তি লাভ করা যায়,—জানি না কোন্ সংস্কার থেকে ওর এই মনোভাবটি এসেছিল। তাতেই আমার কাছে ও দীক্ষিত হবে, জেদ ধরলে। দীক্ষা পাবার পর তবে ও কতক শান্ত হল। সেই অবধি প্রায় চার বছর ও আমার সঙ্গেই আছে ;—যেখানে যেখানে আমি থাকি সেইখানে ও থাকে, আপন সাধন নিয়ে। ভয় ওর কিছুতেই নেই, আমার এই বাষট্টি বৎসরের জীবনে এমন একটি নির্ভীক নারী-প্রকৃতি দেখিনি। কাজেই আমার নিজের দিক থেকেই এমন একটি অপূর্ব জীবনের পরিণতি, আরও কিছু বিশেষ প্রকৃতির গুহ্য ব্যাপার আছে যা পরীক্ষার জন্যই ওকে আমি আপন করে নিতে চেয়েছি। ওর যে ভাবটি আমার কাছে সব চেয়ে বড় বোলে মনে হয়েচে, সেটি ওর জাতিবোধহীন প্রকৃতি, তন্ত্রধর্মের সারকথা। বন্ধুবান্ধব পরিচিত যারা ওর পরিবারের মধ্যে, তারা কেউ এ পর্য্যন্ত ওকে বুঝিয়ে দিতে বা ওর মনে এ বিশ্বাস আনতে পারে নি যে ওরা জাতে ছোট, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতের লোকেরাই বড়। ব্রাহ্মণদের মুখের উপর ও এমন কথা বোলেচে যার ঠিক উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি। যাই হোক ওর মত একটি জীবনে তন্ত্রের সাধনা যে একটি বিশেষ শুভ ফল দেবে তার পরিচয়ও আমি পেয়েছি। তুমি বোধ হয় মনে করলে আমি ওকে আমার মনোমত গড়বার চেষ্টাই করচি।

হয় তো তাই করতাম অন্য কেউ হলে,—কিন্তু আপনি এই যে বললেন ওর স্বাভাবিক জীবন-পরিণতি লক্ষ্য করবার জন্যই ওকে আপন আশ্রয়ে নিয়েচেন।

আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন ;—বিশ্ব প্রকৃতির কর্ম-রহস্য আমি অনেক ক্ষেত্রেই সহজে ধরতে পেরেছি ওর কাজের ফলাফল দেখে। এক বীজ-মন্ত্রটি দেওয়া জপ-প্রণালী বুঝিয়ে দেওয়া-ছাড়া কখনও আমি ওকে কোন কর্ম নির্দেশ দিই নি। ও কারো নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। ওকে ওর প্রকৃতি কি ভাবে পরিচালিত করচে ওর জীবনের দুয়েকটি ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া কিছুক্ষণ তামাকে মনোযোগী হইলেন।

তামাক যাঁরা খান, হুঁকা বা নল ছাড়িবার আগে তাঁহাদের সুখটান বলিয়া আরামের একটি টান আছে, এইবার তিনি তাহাই করিলেন ;—মুদিত নেত্রে

বেশ দীর্ঘকাল একটি টান দিয়া নলটি সরাইয়া রাখিলেন। তারপর বলিলেন, --এইবার শোনো।

প্রায় এক বৎসর কাটাবার পর, তখনও এলোকেশীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব আসে নি তবে ও নিজের সাধন-পথ ঠিক করে নিয়েচে ;—এমন সময় আমার গুরুদেব হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন বরিশালের আশ্রমে ; চট্টগ্রামের তিলোপার শিষ্য-পরম্পরা মহাকৌশলসর্বেশ্বর, যিনি কৈলাসে সিদ্ধাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে সিদ্ধিলাভ করে চট্টলে ফিরে আসেন। তাঁর অনেক রকম যোগ-বিভূতির কথা লোকের মুখে শুনে আমি তাঁর কাছে যাই। তিনি বলেন, ও সব বিশ্বাস কোরোনা, ওর মধ্যে কিছু নাই—কারো যথার্থ শক্তির পরিচয় ভেল্কি-বাজীতে নয়। আমায় দীক্ষা দিয়ে ছয়টি মাস সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলেন। তারপর বলে দিলেন, আর নয় এবার নিজে করে নিতে হবে নিজের পথ ;—তবে সময়ে দেখা হবে,—খুঁজতে হবে না, আপনিই যাবো তোমার কাছে। তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কি আরও বেশী হবে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না,—অথচ প্রত্যেক দিনটি আমার মনে হতো তিনি আমার সঙ্গেই আছেন, কোন দিনই তাঁকে বিস্মৃত হই নি। এখন এলেন এক অদ্ভূত ভাবে। আমার সঙ্গে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। তখন তাঁর খুব উচ্চ অবস্থা। পরমহংস ভাব, যেন বালকের স্বভাব হয়েছিল তাঁর ; যে সময়টুকু ছিলেন বাইরে কোথাও গেলে কৌপীন, না হলে সর্বদা উলঙ্গ থাকতেন। তবে তখনও ত্রিশূলটি সঙ্গে ছিল। একদিন ভোরবেলা, আশ্রমে, আসনেই আমি ছিলাম আপন ক্রিয়াকর্ম নিয়ে, একহাতে তাঁর ত্রিশূল, প্রথমে এসে সামনে দাঁড়ালেন যেন আমার ইষ্ট ; তারপর হিড় হিড় করে আমার হাত ধরে সবলে টেনে আনলেন ঘরের বাইরে ফাঁকায়,—আর মুখপানে চেয়ে রইলেন। তাঁর স্পর্শে-ই আমি তাঁকে চিনলাম। কোনো কথা নয় ; আবার আমায় জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে এনে ফেললেন—যেখানে এলোকেশী ছিল। তাঁকে দেখে এলোকেশী যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। ও কখনও কাকেও সেবা করে নি, আর তখনও ওর মধ্যে একটা উদ্ধত ভাব ছিল বোলে আমিও কখন তার সেবা চাই নি, নিই নি, নিতেও পারি নি কারণ, সেদিকে ওর প্রবৃত্তিরও অভাব ছিল। এইবার কিন্তু ওর প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, ও তাঁর সেবায় লাগলো আপনিই, তিনিও সেবা গ্রহণ করলেন। অথচ ওর সম্বন্ধে কোন কথাই, আমাকে ত নয়ই, ওকেও জিজ্ঞাসা করেন নি। তবে ওর ব্যবহারে তিনি যে প্রসন্ন হয়েচেন তার প্রমাণ পেতে দেরী হ'ল না। তিনটি দিন তিনি ছিলেন। শেষে যাবার বেলা ত্রিশূলটি ওকে দিয়ে বলে যান, এই ত্রিশূল এখন তোর ; অনেক শত্রু হবে তোর আপন-পথে চলতে আর এই ত্রিশূলই তোকে রক্ষা করবে তোর সিদ্ধির পথে, সকল আপদবিপদে সর্বদা এটি সঙ্গে রাখবি ! আর আমি যেমন তোকে উপযুক্ত জেনে এটি দিলাম, তুই যাকে উপযুক্ত মনে করবি তাকে দিয়ে যাবি। যখন হঠাৎ চলে গেলেন, আমাদের সব কিছুই বদলে দিয়ে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর আমি ভেবে দেখেছি হঠাৎ এভাবে তাঁর আসবার কারণ কি হতে পারে। ওঁদের মতো মহাপুরুষ. যাঁরা ভাগবতীশক্তির প্রত্যক্ষ মূর্তি তাঁদের কোন কাজ কখনও বৃথা হয় না। সময় সময় অন্যান্য কারণের মধ্যে আমার মনে হয় ওর প্রতি কৃপা করতেই তিনি এসেছিলেন। কারণ তারপর থেকেই ওর পরিবর্তন ; ওর সাধনে দ্রুত উন্নতি আমাদের সবার চক্ষেই পড়লো।

ওর উজ্জ্বল শ্রী, স্বাস্থ্যবতী বরাবরই—তার উপর ওর মধ্যে সাধনলব্ধ শক্তির আবেশ মিলিয়ে যেন অগ্নিশিখার মতই ও দীপ্তি সাধারণের মধ্যে একটি প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল। সে সময়টা আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম ওর জন্যে। বুদ্ধিমতী এলোকেশীও এটা বুঝেছিল, ওর প্রকৃতিও তখন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে—ও নিজেই তখন থেকে দিনমানে আশ্রমের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলে ;—কেবল একবার ভোরে নদীতে যেতো স্নানে আর গভীর রাত্রে ও অকলা নদীতীরে শ্মশানে যেতো ; তখনও পাশমুক্তির সাধনা করছিল ও।

ও অঞ্চলে মুসলমানদের একটা বড় দল আছে, হিন্দুর ঘরের মেয়ে ধরে নিয়ে যায়, পাশবিক অত্যাচার করে,—বাধা পেলে খুন-জখমও হয়ে যায়। তা ছাড়া হিন্দুদের ধন সম্পত্তি, গয়নাগাঁটি লুঠ করে, চুরি-ডাকাতির জন্যই প্রসিদ্ধ তারা। নমঃশূদ্রদের ওপর বিশেষ নজর,—তাদের মেয়ে পুরুষ সুশ্রী বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে থাকে বলেই হোক, বা যে কারণেই হোক হিঁদুদের মেয়ে ধরা ওদের যেন বংশগত পেশায় দাঁড়িয়েছে। ঐ সময়, অল্প দিনের ব্যবধানে দু-তিনটি মেয়েকে রাত্রে দল-বল নিয়ে এসে তাদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায়, সে খবর আমরা পেলাম। একটি মেয়ে আট দশ জনের অত্যাচারে মারা যার আর দুটিকে গ্রামের মধ্যে প্রতিবেশীদের ঘরে লুকিয়ে রাখে, এর কোন প্রতিকারই হয়নি। ওদের সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকজন মুসলমানের নজর পড়লো ওর উপরে, কিছুদিন থেকেই ওর পিছনে লেগে রইল তারা। ভোরে নদীতে ওর স্নানে যাওয়া আর অমাবস্যা, শনি ও মঙ্গলবারের গভীর রাত্রে শ্মশানে যাওয়া এসব সন্ধানও তারা রাখলে। অমাবস্যার গভীর রাত্রে, ও যখন শ্মশানে যাবে, পথেই ওকে আক্রমণ করবার মতলব করেছিল, আর সে রাত্রে তিনজন ছিল তারা। ওদের একটা কৌশল আছে, যখন হিন্দুর ঘরের মেয়েদের ধরতে আসে একেবারে সবাই একসঙ্গে আসে না। কয়েক জন চৌকী দিতে পথের মাঝে থাকে, আর দুজনে আগে ঠিক সময় মত গিয়ে ঘরের আনাচে-কানাচে ওৎ পেতে থাকে। রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে মেয়েরা সাধারণত একবার বাইরে পুকুরঘাটে আসে, সেই সময়টিই তাকে ধরবার সময়। তা ছাড়া হিঁদু মেয়েদের দুর্বলতা ওরা ভালই জানে, মুসলমান ছুঁয়ে ফেললেই ওরা মনে করে ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে ;—আর বাঁচবার চেষ্টাও করে না তারা। ভয়েতেই আধমরা হয়ে যায়, তাতে কাজ ওদের খুব সহজ হয়। আচম্বিতে একজন এসে জড়িয়ে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এসে মুখে কাপড় গুঁজে মুখটা বেঁধে দেয় তারপর দুজনে তাকে নিয়ে দ্রুত চলে যায়। যদি পথে কোন রকম বাধা পায় ত পথে চৌকীতে যারা থাকে তারাই সামলায়, ততক্ষণে মেয়েটিকে নিয়ে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারে। সে যাই হোক, সেই অমাবস্যার রাত্রে নির্ভীক এলোকেশী, পথে যেমন যায়, এই ভাবেই চলেছিল ; যে দু'জনে তাঁদের মধ্যে বলবান তারাই ওকে ধরতে এসেছিল আর একজন একটু তফাতে ছিল। ওর হাতের ত্রিশূলটি যে কত বড় শক্তি তা ঐ নরপশুদের জানবার সম্ভাবনাই ছিল না, হয়তো তারা আগে ভৈরবীদের হাতে ত্রিশূল দেখেছে কিন্তু সে সব তাদের রামদা, ভোজালে প্রভৃতি অস্ত্রের তুলনায় তো খেলাঘরের ব্যাপার, ওদের কাছে হাসির কথা। সুতরাং যেমন গৃহস্থের বৌ ঝি ধরে নিয়ে যায় বিনা প্রতিবাদে সেই ভাবেই ধরে নিয়ে যেতে পারবে সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিল তারা। কিন্তু

ফলে হলো কি ? ওর অঙ্গ স্পর্শ করবার আগেই একজনকে তার নাক আর কপালের মাঝে বরাবর এমন একটা আঘাত করলে যে, মাঝের শূলটিই একেবারে মাথার ভিতরে ঢুকে গেল, দ্বিতীয় জনকে বাঁ দিকেতে কাঁধ আর বুকের মাঝামাঝি ত্রিশূলের খোঁচায় যে ভাবে কাবু করলে, এ জীবনে সে আর সুস্থ হতে পারেনি। তৃতীয় ব্যক্তি এইসব দেখে পালালো আর সেই রাত্রে গিয়ে পুলিশে খবর দিলে। কাকেও কিছু না বলে এলোকেশী সোজা শ্মশানে গিয়ে নিজে কাজে মন দিল, তারপর যেমন আসে ভোরে আশ্রমে এলো। আমরা তখনও কিছুই জানি না।

পরদিন সকালে দারোগা মিঞা সাহেব দলবল নিয়ে আশ্রমে এসে মহাতম্বি লাগালেন ;—ও খুন করে পালিয়ে এসেছে। তখনই দেখা গেল, এলোকেশীকে, ঐ ত্রিশূলটি হাতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বোললে,—এখানে এস, আশ্রমের বাইরে এসে কথা কও। তারা যখন বেরিয়ে এলো তখন,—সাবধান, আমায় স্পর্শ করবার চেষ্টা কোরনা,—আমি নিজেই যাচ্ছি, বোলে এগিয়ে গেল, তারা পিছনে পিছনে চলল, হাত বাঁধলেনা।

হাজতে ও দু'তিনদিন ছিল কারো সঙ্গে কোন কথা কয়নি ; দারোগার-ও কোন কথার উত্তর দেয়নি। ঐ তিনটি দিন তিনটি রাত এক বিন্দুও জলস্পর্শ করেনি, নিরম্বু উপবাসী ছিল। ওর অবস্থা দেখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উদ্বিগ্ন হলেন। অনেক ভদ্রলোক, তা ছাড়া প্রবীণ উকিলেরা ওর পক্ষে দাঁড়াতে চাইলেন। ও বললে, আমার কথা আমিই বোলব, মধ্যে উকীল কেন ? ওর বিচার হোল ; সে এক অপূর্ব ব্যাপার।

আগাগোড়া পুলিশ দারোগার সাজানো বিবরণ শুনে পর, যখন জেলা জজ ওকে বলতে দিলেন, ও সকল ব্যাপার এমনই সুন্দর, অল্প কথায় সত্য ঘটনাটা বোলে গেল তা শুনে আদালত-সুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত। দায়রা জজ ওকে বেকসুর খালাস দিলেন। আর একথা স্পষ্টই বললেন, এই মেয়েটির আদর্শ অন্যান্য হিন্দু ঘরের মেয়েরা যদি অনুসরণ করে তাহলে এ জেলায় ঐ নারী হরণের অপরাধমূলক ঘটনা অনেক কমে যাবে।

ঐ ঘটনার পর ও বাড়ী বাড়ী গিয়ে হিন্দু পল্লীর মেয়েদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আরম্ভ করলে কেমন করে ত্রিশূল ব্যবহার করতে হয় শেখাতে, তা ছাড়া তাদের বলছিল যে তোমাদের পতিদেবতার সাহস যদি না থাকে, তোমাদের রক্ষা করবার মত বল না থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে ব্যবহার ত্যাগ করো, মনে করো তোমরা বিধবা, তাদের নিয়ে ঘর করলে তোমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হবে। একেবারে যেন আগুন ; ওর রকম দেখে আমি ওকে আমার চন্দ্রনাথ আশ্রমে নিয়ে এলাম, কারণ ওর উপর একদল মুসলমান প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল।

এখান থেকেই অঘোরনাথের সঙ্গে দেখাশুনা হয়। ক্রমে ক্রমে দেখলাম ও যেন কেমন একটু গুণমুগ্ধ হয়েছিল। অঘোরনাথের তীক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি,

বীরাচার সাধনের প্রবল নিষ্ঠা দেখেই ও উত্তরসাধিকা হতেও রাজী হয়ে ছিল। কিন্তু কোথা থেকে নায়িকা-সিদ্ধির প্রবৃত্তি অঘোরনাথের মাথায় ঢুকলো, তাইতেই সব নষ্ট হল। ওরা আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই গোপনে চলে গেল। তারপর সবকথা তো এলোকেশীর কাছেই শুনেছো।

সেই ডাকিনী সিদ্ধিতে পতনের ব্যাপার নিয়ে ওদের দুজনেরই অতিরিক্ত আত্মশক্তির দম্ভ অহংকার যেভাবে আঘাত পেলে, তাইতে এলোকেশীর চৈতন্য হোলো কিন্তু অঘোরনাথের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে, সামলাতে পারচে না। মোটামুটি এই হল ত্রিশূল সম্বন্ধে যা কিছু কথা। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাবা চুপ করিলেন।

অবশ্য এলোকেশীর মধ্যে যে পদার্থ আছে আজ যদি সুযোগ পায় তাহা হইলে তাঁহার কাজে সারা বাংলার নারী-সমাজ উন্নত হইতে পারে। একবার তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে,—তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু জানিতে লোভ হয়। কিন্তু আজ বেলা হইয়াছে উমাপতি বাবার আপত্তি থাকে সেইজন্য আর কিছু না বলিয়াই যখন উঠিলাম, তখন উমাপতি আপনিই বলিলেন—তোমার যখন ইচ্ছা আসবে আর এলোকেশীর সঙ্গে, যদি কোন বিষয় নিয়ে ইচ্ছে হয় নিঃসঙ্কোচে আলাপ আলোচনা কোরবে। তোমাদের ছাঁচ আলাদা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তবে একালের ধর্ম যেটা সেদিকে সজাগ থাকলে আর তুচ্ছ প্রবৃত্তির লোভে পড়বার ভয় থাকেনা। শেষে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, মেয়ে মানুষের দেহ ছাড়া কত উচ্চ স্তরের ভাব, প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে আছে এ নিয়ে একটু মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়। জানবার প্রবৃত্তি,—এখানে এসে জ্ঞানটুকুই সবার বড় কথা।

প্রণামান্তর চলিয়া আসিলাম।

॥ ১৭ ॥

পরদিন সুযোগ মত আবার গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে যখন এতটা অধিকার দিয়াছেন, সেই অধিকারের লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দায় হইল।

আমার কয়েকটা বিষয়ে একটু সংশয় আছে, একটু খোলাখুলি জিজ্ঞাসার অভয় দেন তো সাহস পাই। শুনিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—ঐ এলোকেশীর কথা তো? বলনা।

তখন আমি প্রথম দিন তাঁর যে প্রকৃতি, যে মনোভাব দেখিয়াছিলাম, বিপিন পাণ্ডার বাড়িতে অঘোরনাথের পত্র সম্পর্কে তাঁর মধ্যে যে দুর্বল ভাব ছিল, তার সঙ্গে তাঁহার এই ত্রিশূলধারিণীর যে পরিচয় পাইলাম তার যেন ঠিক মিল নেই, আজ আবার যে মূর্তি দেখিলাম তাহাতে তাঁহার আর এক রকম ভাব,—অদ্ভূত বৈচিত্রই দেখিলাম। তাঁর প্রকৃতির ইতি করিতে পারিলাম না, এই কথাই বলিলাম।

উমাপতি বলিলেন,—আমিও ওর প্রথমকার সেই তেজস্বিনী মূর্তির পরিবর্তন দেখেছিলাম যখন ও অঘোরনাথের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফিরে এলো। ঘনিষ্ঠ পরিচয় তখনই ঘটলো ওর প্রকৃতির সঙ্গে আমার। ওর মধ্যে নারী-প্রকৃতির একটা পরিণতি ঐ অঘোরনাথের সঙ্গগুণে ঘটেছিল। হয়তো

তাকেই ঠিক ওর উপযুক্ত সঙ্গী ধারণা করে নারী জীবনের উদ্দীপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ বা সাফল্যের প্রশ্রয় দিয়ে থাকবে মনের মধ্যে।

এইটুকু বলিয়া যখন তিনি একটু স্থির হইয়া আমার দিকে দেখিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—দুর্বলতার প্রশ্রয় বললেন কেন? উপযুক্ত বয়সে যৌবন ধর্মের গুণেই তো নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ ও মিলন ঘটে, এই তো প্রকৃতির নিয়ম, নয় কি?

উমাপতি, সাধারণতঃ তাই তো বটে, কিন্তু ও যে একটা ব্যতিক্রম অবশ্য সেটাও ঐ প্রকৃতির বৈচিত্র্য বোলেই বুঝতে হবে। তাই অল্পকালের জন্য ওর ঐ ভাবান্তর, নারী সুলভ কোমল বৃত্তির বিকাশ ফলে পুরুষের সঙ্গ-স্পৃহার দিকে যে মনের গতি তা স্বাভাবিক হলেও—এই জন্যে ওর পক্ষে সেটা দুর্বলতার প্রশ্রয় বলেছি যে, সাধারণ নারীর মত কোন পুরুষ-আশ্রয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা মাতৃত্বের টানে গর্ভে সন্তান ধারণ এমন কি দুঃখ দারিদ্র স্বীকার করেও সাংসারিক জীবন সার্থক করবার জন্য তো ও জন্মায়নি। তা ছাড়া ওর সাময়িক পতনের যেটি দ্বিতীয় কারণ তা হোল অঘোরনাথ, ওকে এমনই একটা মহা শক্তির লোভ দেখিয়েছিল, যে জন্য তার কথায় পূর্ণ বিশ্বাস কোরে আমার অগোচরে তার সঙ্গে যেতে ও তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনি। অঘোরনাথ ওকে এই কথাটা বুঝিয়েছিল যে, ওর সাহায্যে যদি সিদ্ধিলাভ হয় তাহলে এমনই এক ঐশ্বরিক শক্তি লাভ হবে যার ফলে অসাধ্যসাধন সম্ভব হবে, জন-সমাজের মধ্যে যা কিছু বিধি, ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা যাবে। যা কিছু করার ইচ্ছা তা সফল হবে, সাধারণ মানুষ কারো সে শক্তির কল্পনাই নেই। ঐ শক্তি লাভের লোভেই ও অতটা করেছিল। তার মত কল্পনা চালিত একজনের পক্ষে যা কখনও সম্ভব হতে পারেনা, অঘোরনাথ যে এমনই এক অসম্ভবের পিছনে ছুটেছে,—এটাও বুঝতে পারেনি। কেমন করে বুঝবে বলো? ওর সাধন কতটুকু? কাজেই ও সরল ভাবেই বিশ্বাস করেছিল তার সকল কথা। ফলে মন বা প্রকৃতি অনুসারে দুজনের দুই রকম পরিণতিই হোল। সে ধ্বংসের পথেই গেল, আর ও কঠিন আঘাত পেয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলো—আমার কাছে। তবে, এখনও তার প্রতি একটা অনুকম্পার ভাব ওর মধ্যে আছে; অঘোরনাথের এতটা অধঃপতন ও কল্পনাই করেনি, আর আমার মনে হয় ও তা এখনও চায়না।

আচ্ছা গতানুগতিক সাধারণ নারী-প্রকৃতি থেকে কিছু পৃথকভাবাপন্ন এবং মহা তেজস্বিনী হ'লেও উপযুক্ত পুরুষ স্বামী পেলে যে উনি তার সঙ্গে মিলে সংসার-ধর্ম করবেন না এমন কিছু বাধা আছে কি?

তিনি বলিলেন, ওর মধ্যে স্নেহ ভালবাসা—প্রেম এসব নেই, আছে মাত্র ইষ্টবোধের একটা আকর্ষণ, অঘোরনাথের উপর সেই আকর্ষণই এসেছিল, প্রেম নয়; ওর শরীর নিয়ে কেউ ভোগ করবে এ সংস্কার ওর নেই। অঘোরনাথের পত্রেই দেখেছো বোধহয় তার একটা ভয়ানক আক্রোশ, যেন প্রতিহিংসার ভাব আছে ওর উপর? উন্মাদের মতই ওর সর্বনাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেন, জান?

বলিলাম, আমার মনে হয়, উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায় নৈরাশ্যের ফলে ঐ ভাবে একটা মনের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, বুদ্ধির বিকৃতিও ধরা যায়—

না না ঠিক তা নয়। পতনটা তার হোল নিজের মধ্যে ইন্দ্রিয় মোহ

প্রবল, দুর্বার ছিল বোলে। তার ফলে ওর উপর আকর্ষণ ছিল গভীর, অথচ সেটা ঐ বিশিষ্ট সিদ্ধির প্রবল অন্তরায়,—সেই কারণে পতনের পর তার সেই দুরন্ত ইন্দ্রিয় ভোগটা ওকে দিয়ে, ওকে সহায় করে তৃপ্ত হতে চাইলে। সেটা তৃপ্ত হলে অঘোরনাথ হয়তো বেঁচে যেতো। কিন্তু তাকে ও কখনও অঙ্গ স্পর্শ করতে দেয়নি, তাইতেই সে পাগল হোল। সে বল প্রয়োগের চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সর্বদা ত্রিশূল ওর কাছে থাকায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলনা,—অথচ তার প্রতি ওর অনুকম্পা এতদূর ছিল, যাতে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে সেজন্য তাকে ত্যাগ না করে খানিক অত্যাচার সহ্য করেও তার সঙ্গে ছিল বেশ কিছু দিন। ফল হোল বিপরীত। বাইরের কেউ ঘৃণা কোরবে এসব গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। আমার গুরু-সঙ্গ লাভ যখন ওর হয়েছিল, যাবার সময় তিনি আমায় বোলেছিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ও কখনও কোন পুরুষের স্পর্শ সহ্য করতে পারবে না।

আমার মনে হয় ওর সূক্ষ্ম শরীর-যন্ত্রে হয়তো বা নারভাস্ সিস্টেমে কোন গলদ আছে—?

তা নয়, নিখুঁৎ শরীর ওর, তাতে প্রাক্-সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। তবে যে ভাবে বেড়ে উঠেছে সেটা, সেটাও বিপরীত। বর্তমান হিন্দু সমাজের উপর ওর যে প্রবল বিতৃষ্ণা, সমাজের বিধান অত্যন্ত ঘৃণ্য,—এ ভাবের কথাও বালিকা-অবস্থায় ওদের সমাজে অনেকবারই শুনেছি। একবার কালাপাহাড়ের কথায় ও বলেছিল, এইবার একটা কালাপাহাড়ের দরকার,—হিন্দুদের সমাজ ভেঙ্গে মুসলমানদের মত এক জাতের সমাজ গড়তে। জাতের বড়াই না গেলে, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য না গেলে আর ভদ্রস্থ নেই।

তন্ত্রমতের শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে উনি যে সিদ্ধির জন্য এখনও সাধনা কচ্ছেন তাতে উনি কি সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন ?

আসলে তন্ত্রধর্মের মূলে নরনারী যুক্তভাবে যে সাধন, তাইতেই উপাসনা বা সাধনার সার্থকতা—তা ওর হবে না। প্রাণে প্রাণে সহজ প্রেম-ধর্মের যে মূল পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, সেদিক দিয়ে ওর পথ নেই। ওর পথ কোন বিশেষ এক সিদ্ধির জন্য, বড় কঠিন। তবে যদি আবার কোন্ বাধার সৃষ্টি না করে বসে তাহলে, ওকে আর দুঃখ পেতে হবে না। শেষে উত্তরসাধক হয়ে আমাকেই সাহায্য কর্তে হবে। তারপর আর কারো সাহায্যের দরকার হবে না।

আমি বলিলাম,—অদ্ভুত এক নারী প্রকৃতি, এমন কখনও আগে কোথাও দেখিনি।

আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমাদের সমাজে এক রকম পুরুষ আছে যাদের পোটেন্সি যথেষ্ট থাকতেও নারী বিদ্বেষ প্রবল, নারীদেরও তো সেই রকম থাকতে পারে ?

আমি বলিলাম,—নিশ্চয়ই পারে,—কিন্তু পুরুষের প্রজনন-শক্তি থাকতেও কি নারী সঙ্গের উপর প্রবল বিতৃষ্ণা থাকতে পারে ?

তিনি তিলমাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিলেন,—কোন বিশেষ সংস্কারের প্রাবল্যে ধাতু স্খলনের নাড়ি-পথ বন্ধ থাকতে পারে। আবার এমনও হয় আমাদের যোগমার্গের বা অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য সাবধানের পথে সিদ্ধির সহায় হবে বলে উর্দ্ধরেতা হয়ে সাধকের তৈরী হওয়া, এসব আছে জানো তো ?

আমাদের ভারতের ধর্মমার্গে সংযমের কত শক্তি জানতো? শরীর থেকে আরম্ভ কোরে সূক্ষ্মতম মনের স্তর পর্য্যন্ত বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে,— যোগমার্গে যাকে উর্দ্ধরেতা বলে শুনেছো তো? সে সব ক্রিয়া চেষ্টা-সাধ্য, বালক অবস্থা থেকেই এর আরম্ভ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এক একটি জীবের পক্ষে ওটা সহজ। একে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম বলো আর যাই বলো, এমন কারো কারো পক্ষে হয় তো? তোমাদের পরমহংস দেবের প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের কথা জানোত? আচ্ছা, ভারতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, অন্য সকল দেশেও ভিন্ন সমাজের মানুষ যারা তাদের মধ্যেও তো ওভাবের পুরুষ হতে পারে, যাদের ইন্দ্রিয় বা যৌন-সম্বন্ধীয় বোধ,—বা ইন্দ্রিয়ভোগ স্পৃহা অত্যন্ত কম, এমন কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকেও তারা প্রজনন সম্বন্ধে সজাগ নয়। আসলে সেটা অন্য কোন বিপরীত বিষয়ে তীব্র অধ্যাসের ফলেও সম্ভব।

আমি বলিলাম, আমার ধারণা সকল সমাজেই ঐ ধরণের পুরুষ জন্মায় বটে—সেটা সাধারণ নিয়মের এক ব্যতিক্রম নয় কি?—তারা মহৎ কর্মী হলেও সংসার অথবা প্রজা বৃদ্ধির দিকে একান্তই বিমুখ।

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন—নিশ্চয়ই, তাই তো! প্রকৃতির নিয়মে সকল দেশেই ওইরকম পুরুষ আছে। এইতো আমাদের বৃটিশ জেনারেল, লর্ড কিচেনার, যিনি আমাদের ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন,—নারী সম্পর্কে তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণার কথা সভ্য জগতে কে না জানে।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম—আপনি কি করে জানলেন? স্বতঃই কথাটা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেন? তিনি বলিলেন, আমরা কি পৃথিবীর মানুষ নয়,—আমরা কি পৃথিবীর কোন খবর রাখিনা মনে করো?

আমরা মনে করি আপনারা দিনরাত আপনাদের সাধন বা সিদ্ধি নিয়েই থাকেন; জগতের অন্য কোনোদিকে কি হচ্চে না হচ্চে, অন্যান্য সমাজের লোকের প্রকৃতি-বৈচিত্র্য এসব খবর রাখেন কেমন করে, তার ইতি পাইনা যে?

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন,—মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সহজ সত্য নিজ সত্ত্বা বা বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে কেউ যদি ধারণা করতে পারে,—যেমন ধরো আমি মানুষ, আমার প্রকৃতি, আমার অন্তর্নিহিত শক্তি আর সেই শক্তি বিকাশের তারতম্য, নিজ পরিবেশের মধ্যে তার ক্রিয়া, অবস্থান্তরে তার ব্যবহার বা যোগাযোগ বৈচিত্র ধারণা করে নিতে পারা যায় তাহলে জগতের মানুষ-প্রকৃতির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ সিদ্ধ হয়ে গেল, মানুষ প্রকৃতি এবং ব্যবহার বৈচিত্র্য, মানুষের অনুরাগ-বিরাগ সম্বন্ধে আমার কিছুই অজানা থাকবেনা।

সেটা বেশ বুঝতে পারি, আমি বলিলাম,—কিন্তু লর্ড কিচেনারের কথাটা জানলেন কি করে?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, বিধাতার যে যোগাযোগ যেমনভাবে তুমি এখানে এসে পড়েচ, ঠিক সেইভাবেই অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, রাজনীতিক, শিল্পী, উকিল, ব্যারিষ্টার মায় আই-সি-এস অফিসারও এখানে পায়ের ধুলো দেন,— আমাদের সঙ্গ ভালবাসেন, আর সেই সঙ্গ উপলক্ষ্যে এসে আমাদের সঙ্গ দিয়ে যান। সমপর্য্যায়ের একদল মিললে তাদের মধ্যে নানা ব্যাপারের আলোচনা হয় তো? যতক্ষণ থাকেন নানা দেশের নানা প্রকার অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা হয়;—যেমন যার অভিজ্ঞতা; তাই শুনে আমাদেরও এখানে বসে বসে অনেক

কিছুই জানা হয়ে যায়,—জগদম্বার কত ভাবের কত লীলা-আস্বাদ করতে পারি তার ভিতর। কেমন দেখোতো যোগাযোগটা,—কোথাকার ব্যাপার কোথায় খবর এলো।

একজন ভব্যযুক্ত ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিলেন, আশীর্বাদ করিয়া উমাপতি বলিলেন,—এসো এসো,—আহা, বড়ুয়ামশাই, তোমায় এত শুকনো দেখছি কেন বাবা?—

ধীরে ধীরে বড়ুয়া কাঁচা-পাকা কেশপূর্ণ মাথাটি চুলকাইয়া একটু সংকোচের সঙ্গে বলিলেন—একবার তো আপনাকে যেতে হয়।

তোমায় শুকনো দেখ্‌ছি কেন? তার উত্তর হোলো,—আপনাকে যেতে হবে। তারপর যে কথা উমাপতি বলিলেন, তা আরও চমৎকার; কলকাতা থেকে জগদীশবাবু আসচেন বেড়াতে, শুনেছ? গিরিশবাবু এখানে এসে রয়েচেন আজ ক'দিন।

শুনিয়া বড়ুয়ামশাই বলিলেন, আমি তা জানিনা আপনাকে না নিয়ে আমি ফিরবোনা বলে এসেছি, বড়বাবু আশায় পথ চেয়ে আছেন।

তাঁর কথা শুনিয়া বাবা উমাপতি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া নিজ আসনে বসিয়া রহিলেন,—মুহূর্তের জন্য চক্ষু মুদ্রিত এবং প্রসারিত দক্ষিণ কর জানুর উপর রহিল;—তারপর বিস্ফারিত চক্ষে বড়ুয়া মশায়ের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা চল যাবো,—এলোকেশী এখানেই থাকবে। সঙ্গে আর কে যাবে? বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাহাতে আমি মনে করিলাম, যদি আমাকে সঙ্গে নেন তাহা হইলে আমার গৌহাটী দেখা হয়। তাছাড়া সেবার জন্যও তো একজন চাই?

তিনি আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিলেন,—না, না শুধু একলা যাবনা তাই,—তুমি যাও তো চলনা, গৌহাটী দেখতে চাও দেখবে, উমানন্দ দেখবে,—সবার উপর একটি হিন্দু সংসার দেখবে।

যন্ত্রবৎ তৎক্ষণাৎ রাজি হইলাম। এইভাবে সেদিন আমার গৌহাটী যাবার যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। বড়ুয়া মহাশয় গৌহাটীর বরদলই উকিল মহাশয়ের বিশ্বাসী কর্মচারী।

গৌহাটীর উকিল ভদ্রলোক শ্রীজানকীনাথ বরদলই,—এমনই ভক্তিমান সবাই জানে যে—গুরু সাক্ষাৎকার হইলে আর সেদিন ক্রিয়া-কর্ম করেন না। গুরু সেবাই তাঁর তপস্যা। সেই যে, আদালত, মক্কেল আইন প্রভৃতি লইয়া তাঁর দৈনন্দিন জীবন-কর্ম, তার ব্যতিক্রম হইয়া যায়। সকাল হইতে সকল সময়ে জোড়-হাতে গুরুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালনই তাঁর সর্বক্ষণের কর্ম। সেই কারণে গুরুর দীর্ঘকাল তাঁর ঘরে থাকা চলেনা। বড়ুয়া মহাশয়কে পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছারীতে যাবেন না বুঝি উকীল মশাই, এ ক'দিন?

না,—কাছারী তো নয়ই, বরং ঘরে মোকদ্দমা মামলার সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে মক্কেলদেরও যেতে বারণ করেন; গেলে দেখা করেন না। তাঁরাও জানেন যে গুরু এলে তাঁকে আর কেউ পাবেন না,—চলুন না—গেলেই সব কিছু দেখতে পাবেন।

বিংশ শতাব্দীতে এমনও আছে।

এখন এইখানেই ঐ প্রসঙ্গ শেষ করিতে হইল।

গুরু-সেবা, যা দেখিলাম, জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জানকীনাথ বরদলই মহাশয় উকিল ;—তাঁর স্ত্রী,—যেন নিখুঁত আর্য্য মহিলা ;—দুজনে আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন,—অপূর্ব মিলন, দেখিয়া আনন্দ হয়। কথা না কহিলে অথবা বেশভূষার ধরণ লক্ষ্য না করিলে তাঁহাকে পাঞ্জাব বা রাজপুতানার অধিবাসিনী বলিয়া সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া প্রথমে গুরুর চরণ বন্দনা করিলেন, তারপর স্বামী ও সহধর্মিণী, গুরুকে সামনে চৌকিতে বসাইলেন। দুজনেই গুরুভাসনে বসিয়া,—স্ত্রী কলস হইতে জল ঢালিয়া দিতে থাকিলে স্বামী পরিপাটীরূপে চরণ দু-খানি ধোয়াইয়া দিলেন। তারপর স্বামী জল ঢালিতে থাকিলেন স্ত্রী করাঙ্গুলি চালনা করিয়া পায়ের প্রত্যেক অঙ্গুলি এবং পদতলের প্রত্যেক অংশ অতীব যত্নের সহিত ধোয়া শেষ করিলেন। অতঃপর যাহা হইল জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। সহধর্মিণী তাঁহার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ বাহির করিয়া চরণ দুখানি পরিপাটি করিয়া মুছাইয়া দিলেন। নেহাৎ নিয়মরক্ষার মত কোন কাজই হইল না, আন্তরিক ভক্তি থাকিলে, প্রতিটি কর্মে যত্নের যে প্রত্যক্ষ রূপ এবং আন্তরিক ভক্তির প্রকাশ—আজ স্বচক্ষে তাহাই দেখিলাম! যাহা আজ আসামে দেখিলাম, আর্য্য সভ্যতার অন্তর্গত ধর্ম গৌরবে গর্বিত দাম্ভিক বাংলায় কোথাও তাহা দেখি নাই।

পা ধোয়ানো, তারপর রুক্ষ কেশ দ্বারা মোছানো হইয়া গেলে গুরুকে গৃহমধ্যে লইয়া পিঁড়ার উপর দাঁড় করান হইল, তারপর হইল বরণ। সে বরণ, বিবাহ-রাত্রে বরকে স্ত্রী-আচারের সময় যেমন করিয়া বরণ করা হয় ঠিক সেই প্রকার। গুরুদের নববস্ত্র উত্তরীয় নূতন পাদুকা, ছত্র সকল কিছুই চরণে উৎসর্গ করা হইলে পর তাঁহাকে বসানো হইল। প্রকাণ্ড রজত পাত্রে পরিপূর্ণ ফলমূলাদি এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রৌপ্যের বাটীতে পানা ও অন্যান্য বহু প্রকার পানীয় এবং স্তূপাকার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আয়োজন ছিল, গুরু উহার অতীব সামান্য অংশ কোন কোন পাত্র হইতে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পাত্রগুলি স্পর্শ করিয়া আচমনান্তে জলযোগ শেষ করিলেন। তারপর প্রসাদ পাইবার পালা, সে প্রসাদে কেহই বঞ্চিত হইল না।

এইবার স্বামী-স্ত্রী দুজনে গুরুকে একান্তে, একখানি গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন ; আমি বাহিরের একটি ঘরে যাইয়া বসিলাম। এখানে গুরু-আবাহন যাহা দেখিলাম তাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি, আমাদের বাড়ীতে অনেকবারই ভাটপাড়ার গুরু আগমন, মধ্যে মধ্যে মাসে দু' মাসে একবার আসা,--অনেকগুলি শিষ্যার মাঝে। পা ধোবার জল দিলে তিনি আপনিই পা ধুইলেন, তারপর গামছা কোথায়, ওরে একটা গামছা দিয়ে যা না। গামছা আসিলে নিজেই পা মুছিয়া দাঁড়াইলে একজন পিঁড়া পাতিয়া দিলে তিনি বসিলেন। প্রবীণারা, টাকা হাতে আসিয়া প্রণাম আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য শিষ্যারা টাকার যোগাড়ে গেলেন, কারো হাতে আছে কারো নাই, তাহাকে ধারকর্জ করিতে হইল। শেষের দিকে বাড়ীখানা নীলামে চড়িয়া, সংসারটি ছন্নছাড়া হইবার পূর্বে বাড়ির কাহারও নিকট আট-আনা ধার পাওয়া মুশকিল। গুরুর জলখাবার আসিল দু আনা, বড়জোর চার আনার মিষ্ট,--চারিদিকে প্রকাণ্ড একপাল ছেলে-মেয়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে, তাহার মধ্যে গুরু নত মস্তকে জলযোগ করিতেছেন। আমাদের কেহ বলিল না যে গুরু ঠাকুরকে প্রণাম করো। এ সকল দৃশ্যও দেখিয়াছি। ভাবিতে-ছিলাম,--কি অদ্ভুত পরিবার ও সমাজ আমাদের, এ অচল সামাজিক অবস্থার শেষ কতদিনে হইবে ভগবানই জানেন।

এইখানে আর একটি বস্তু দেখিলাম।

বরদলই উকীলের বাড়ীতে তাঁর গুরু আসিয়াছেন, গোহাটীময় রাষ্ট্র হইয়া গেল,--দুপুরে, বৈকালে, সন্ধ্যায় তাঁর বাহির ঘর প্রাঙ্গণ দরদালান ভরা লোক। আমি আর সবার কথা বলিব না, কেবল একদলের কথাই বলিব। বৈকালে অনেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সম্মুখে ঘেরিয়া আর প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া স্থানীয় প্রৌঢ়া বৃদ্ধা যুবতী আসিয়া বসিয়াছেন ; অন্দরের দরজা জুড়িয়া ভিতর দিকের বারান্দা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অভিযান। বয়স্ক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ গৃহীর দল কত রকমের কত প্রশ্নই না করিতেছে,--উমাপতি বাবা অন্তরে অন্তরে একটা পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। বিশেষতঃ এক ব্যক্তির কথা শুনিয়া। সে লোকটা একজন ব্যবসায়ী, বেশ জোয়ান চেহারা, মুখে তাহার দম্ভ, কথায় খুব জোর আছে। তার কথা ছিল এই যে, আমরা ওসব মানিনা বুঝিনা. বসে বসে জপ করা গীতা চণ্ডী পড়া ধর্ম-চর্চ্চার এসব সহজ উপদেশ সবাই দিতে পারে, এর জন্য আপনার কাছে আসবো কেন ? কিছু প্রত্যক্ষ শক্তির ক্রিয়া যদি দেখাতে পারেন তবেই বুঝি, না হলে বাজে কথায় ভুলিনা। বাবা হাসিয়া উঠিলেন,--তাহাতে সে চটিয়া গেল, তখন তিনি বলিলেন, কি রকম শক্তি-ক্রিয়া বলুন তো ?

তিলোপা টিলোপা যেমন মরা মানুষ বাঁচাতে পারতেন, কত কত অসাধারণ কাজ করতেন, সেইরকম সব ; বলিয়া সে লোকটা সবাইকে যেন চ্যালেঞ্জ করিতেছে এমনভাবে একবার তাহার সামনে পাশে যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের দিকে চাহিল।

বাবা বলিলেন,--ও সব কি আমরা পারি ? ও-সব সিদ্ধি মহাশক্তির সাধনা দরকার, আমরা তো তা করিনি, চাইওনি।

হুঁ, তবে তান্ত্রিক-সাধনা কি হয়েছে আপনার ? তাহার কথা শুনিয়া কয়েকজন, নির্লজ্জ কোথাকার, উঠে যাও এখান থেকে, মূর্খ,--বলিয়া সম্ভাষণ

করিল। কেহ কেহ বা, মহেশ টাকার গরমে মাথা-পাগলা হয়ে গিয়েচে ইত্যাদি গোলমাল করিতেই লোকটা দেখিলাম চোরের মত সুড়-সুড় করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তার এতটা তেজ কিছুমাত্র দেখা গেলনা। এমন সময় কয়েক-জন যুবা আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল—মনে হইল যেন কলেজের ছাত্র তারা। উমাপতি তাহাদের একজনকে দেখিয়া, এই যে আমাদের জ্যোতিষচন্দ্র,—এসো, এসো, বাবারা বলিয়া—অত্যন্ত খুশী হইয়াই তাহাদের নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং যত্নপূর্বক বসাইলেন। তাহারাও মহা আনন্দে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিতেই বাবা একজনের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাবা বলিলেন, এরা সব কলেজের ছাত্র ;—বড় ভাল ছেলে। দেখ আমায় ভালবাসে কেমন, আমি এসেছি শুনেই এসেছে ; কেমন ? কালীকিংকর—তোমার সায়েন্স চলছে কি রকম ? বলো, আমায় শোনাও কি রকম সব হচ্চে তোমাদের কাজকর্ম ? দেশের হাল-চাল সব বলো অনেক কথা শুনবো আজ তোমাদের কাছ থেকে।

এই ছাত্রদের আগমন আর এক দলের বড় মনরোচক হইল না ; অবশ্য তাঁহারা কেন্দ্র হইতে অনেকটা দূরে ছিলেন। চলেন, আজ আমাদের কথা কিছুই হবে না ; পোলারাই থাকবে এখন, কাজ আছে কিছু—বলিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়াই উঠিলেন। বাবার দৃষ্টি পড়িল সেদিকে,—কিছুই বলিলেন না শুধু প্রতি নমস্কার-টুকুই করিলেন।

কালীকিংকর ছেলেটি ভারি সুন্দর, শুধু সুপুরুষ নয়, সুগঠিত শরীর শ্যামবর্ণ বটে কিন্তু এমনই নম্র প্রকৃতি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এখন সে ধীরে ধীরে বলিল,—এখানে যেভাবে আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা হওয়া উচিত সেভাবে হচ্ছেনা, যদিও আমার পড়াশুনা এক রকম চলছে। এখনও আমরা ভয়ানক ব্যাকোয়ার্ড, দেখুন না যে পরিমাণে ছেলেদের সায়ান্সে যাওয়া দরকার তা যাচ্ছেনা আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ব্যায়সাধ্য ব্যাপার। যেমন তেমন করে বি. এ. পাশটা, তারপর চাকরীর চেষ্টা, মোট কথা—এই স্ট্যাণ্ডার্ড দাঁড়িয়েছে ভদ্রঘরের ছেলেদের। এরা বাংলার ছেলেদের পিছনে পিছনে ঠিক যাচ্ছে।

উমাপতি বাবা,—সোজা হইয়া বসিলেন তারপর যেন একটু ভাবিয়াই বলিলেন, কি বলব, আমি যা বলব তা তোমাদের মনঃপূত হবেনা। এখন তোমাদের লক্ষ্যই দাঁড়িয়েছে সায়ান্স, আর ডিসকাভারী, ইনডাসট্রিয়ালাই-জেসান,—মেটিরিয়াল প্রস্পারিটী, ওদেরই আদর্শে। যেন ও ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

জোতিষচন্দ্র বলিলেন,—এখনকার জগতে বাঁচতে গেলে ও ছাড়া আর পথই বা কি ? আর আমাদের আছেই বা কি,—যা নিয়ে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি ?

আমি আর কী বলব তোমাদের বলো, তোমরা যা বুঝেছ, যেভাবে দেখছ বর্তমান জগতে মানুষ সমাজের গতি, ভেবে-চিন্তে যেটা ভাল বলে মনে করেচ তাইতো কোরবে ?

না, না আমরা অতটা ভেবে চিন্তে, উদ্দেশ্য স্থির করে কোন কাজই করছি না,—গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি বোললেই ঠিক হয়। তা ছাড়া কিই-বা ভাবব বলুন, ভাববার কী আছে ?

আছে বইকি,—ধরোনা কেন, ইউরোপ আমেরিকার প্রগতি, পদার্থ-বিজ্ঞানচর্চ্চা ওদের আবিষ্কারের মধ্যে কি পদার্থ আছে তোমাদের জাতিগত সংস্কৃতির আলোয় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছ কি? ভাল হোক, মন্দ হোক ভেবে কিম্বা বিচার করে দেখতে দোষটা কি?

দোষ কিছুই নেই, কালীকিংকর বলিল,—দেখতে গেলে উৎসাহ পাইনা, অবসাদ আসে। ভারতীয় জাতিগত সংস্কৃতির যে কিছুই ধারণা নেই আমাদের,—আগাগোড়া শুনে আসছি আমরা গোলামের জাত, কুনো ব্যাঙ, বর্তমান জগতে উঁচু উঁচু সামাজিক আদর্শ, সায়ান্স ডিসকাভারী ইন্‌ডাষ্ট্রী, কালচার আর্ট ইম্যানসীপেশানের বিষয় কিছুই জানিনা, সেকালের কতকগুলি অচল পুরাণ মহাভারতের কথা যা যাত্রার দলেরই খোরাক, তা ছাড়া আমাদের তো কিছুই নেই আর, যা দিয়ে আমাদের জাতিগত সংস্কৃতি কিছু ছিল বুঝতে পারি!

একবার করুণ নয়নে যুবকের দিকে চাহিয়া উমাপতি বাবা বলিলেন,—তুমি যে আজ এই কথা বলবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই কারণ, বিজাতীয় শক্তির চাপে,—অধীনতার চাপে তোমাদের শিক্ষার গোড়াটা ভূয়ো হয়েই আছে যে—জাতীয় সংস্কৃতি, চিন্তাধারা শিক্ষার মূল উপাদান ছেড়ে একেবারেই সম্পূর্ণ বিজাতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষারম্ভ করার এই শোচনীয় পরিণাম। তোমাদের শিক্ষার আদর্শ ঠিক না হলেও তবুও তোমার যে কত বড় সংস্কৃতি-বান, কত উচ্চস্তরের সভ্যতার ফল তার প্রমাণ দেখ,—পরাধীনতা সত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষার আদর্শে তোমাদের গড়ে উঠবার সুযোগ-সুবিধা না হলেও ভিন্ন জাতীয় সমাজের আদর্শ সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আজ সেই সমাজের সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষায় প্রতি কর্মে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সাহস কোরতে পারো, সফলকাম হতে পারো, এটাই কি তোমাদের মহান সংস্কৃতি বা শক্তিশালী জাতীয় আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়? শুধু ছাত্র-জীবনের শিক্ষা দীক্ষার কথা বলছি না, আজ জগতের যারা শ্রেষ্ঠ জাতীয়তার দম্ভে এদেশের সভ্য সমাজকে এতদিন হেয়জ্ঞান করে এসেছেন,—দেড় শো বছর ধরে দাবিয়ে রেখে এমন কি আজও তোমাদের কাণঠাসা করে রাখলেও পাশ্চাত্য পদ্ধতির রাষ্ট্র পরিচালনা, ও সকল বিভাগেই এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তোমরা কতটা উন্নত, কতটা অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন এমন কি জ্ঞানবুদ্ধিতে তাদেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত একথা আজ জগৎ-সভায় নিশ্চতভাবেই প্রমাণিত! এ প্রতিভা শুধু শিক্ষার গুণেই বিকশিত হয়না, তোমাদের পিছনেতে সভ্যতার কত গভীর ক্ষেত্র ব্যাক-গ্রাউণ্ড বর্তমান—একথা কি বেশী করে বলা দরকার হবে? তোমরা কোন্ সভ্যতা-শক্তির উত্তরাধি-কারী এইটুকুই কেবল জানতে দেওয়া হয়নি!—সংস্কৃতির জননী সংস্কৃত-ভাষা-ভাষী যে জাতির সন্তান তোমরা, তোমাদের কী আছে আর কী নেই তা জানতে বেশী সময় লাগবে না, একবার যদি ওদিকে লক্ষ্য আসে। মোটকথা তোমরা যে কতটা শক্তিমান তা বুঝে নেওয়ার ভার আজ তোমাদেরই উপর, নয় কি?

কালীকিংকর হাত বাড়াইয়া বাবা উমাপতির পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, কি যে নির্মল আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল সকল ছাত্রের মুখে, উহা ঘরসুদ্ধ সবাই লক্ষ্য করিল। ঘরের অন্য সবাইও অমনোযোগী ছিলেন না। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল যারা ছিলেন সবাই একটা আনন্দের আস্বাদ পাইলেন তাঁর কথায়। কালীকিংকর বিনয় গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, যেভাবে কথাগুলি আজ আমাদের

আপনি বলিলেন, এমন সত্য, এত সহজ ভাষায় এর আগে কেউ আমাদের শোনায়নি। প্রোফেসারেরা তো এই ধারণাই আমাদের মাথায় ঢুকিয়েছেন যে ঐ বিশ্বজয়ী পাশ্চাত্য জাতিই এ-যুগের দেবতা! সেকালের যা কিছু হিন্দু সভ্যতার গৌরব একালে অচল।

শুনিয়া বাবা উমাপতি বলিলেন,—যার দেশের যে রকম সংস্কৃতি তা নিয়ে সে দেশের মানুষেই গর্ব করে থাকে, তা নিয়ে আমাদের অতটা গৌরবের ডঙ্কা বাজিয়ে নিজেদের অন্তঃসারশূন্য মনে করবার দরকার নেই। হয়ত এমন সময়ও আসবে যখন ওদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ভারতসন্তানও বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাটাই ভারতের সংস্কৃতির নীতিবিরুদ্ধ কে বড় হতে পারে এ রেসের ফল নিয়ে একজনের বা এক সমাজের মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব বিচার করা চলেনা; জাতীয় সভ্যতার সকল বিভাগই তো ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্র নয়।

আমাদের সায়ান্সের প্রোফেসাররাই বেশী বেশী ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, বিশ্বের উপাদান নিয়ে সেকালের ভারতের স্যাভেজ টিকি-ধারীরা নূতন তথ্য কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি। বলিয়া কালীকিংকর একটু হাসিল।

আরে বাবা, সৃষ্টির মৌলিক উপাদান নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও কম মাথা ঘামাননি। স্থূল সৃষ্টির উপাদান জড়ের প্রসার তাঁরা দেহ ছাড়িয়ে মন পর্যন্ত ধরেছেন, তারপর চৈতন্য, যার চরম হ'ল বেদান্তের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। থাক সে কথা, ওরা এখনও তো জড় নিয়েই ঘাঁটছে। ওদের সায়ান্সে প্রকৃতি জড় অন্ধ, ওরাও তাই জড়মুখী এবং চৈতন্যের দিকে অন্ধ হয়েই চলেছে গতির বেগ বাড়াবার প্রতিযোগিতায়। একটা গোড়ার কথা তোমরা ভেবে দেখলেই সহজে বুঝবে, জড় নিয়ে ঘাঁটলে তা স্থূল হোক বা সূক্ষ্মই হোক তোমার বুদ্ধিকে জড়ীভূত করবেই,—প্রকৃতির নিয়ম, সংসর্গজ গুণের কথা জানতো? তা থেকে এড়াবার যো নেই! মনের উচ্চগতি হতেই পারবে না জড় পদার্থ ধরে থাকলে। পদার্থ নিয়ে ঘাঁটো তোমরা এটা তো সহজেই বুঝতে পারো যে, ভারী জিনিস মাধ্যাকর্ষণের বড় আসামী? হাল্কা হলে তার গতি বিপরীত, উর্দ্ধমুখী? জড় পদার্থ নিয়ে আলোচনা বা অনুশীলনের ফলে মন তোমার নীচের দিকেই নিয়ে যাবে কারণ এটা জড়েরই ধর্ম। আমি বলছি কি, তোমাদের বুদ্ধি কেন চৈতন্যমুখী হোকনা, সেটা তোমাদের মনোবৃত্তির সহজ পরিণতি জাতীয় সভ্যতার অনুকূল, তাতে তোমাদের অনেক উন্নত করবে। তোমরা ওদের পেছনে পেছনে দৌড়বে কেন? পদার্থ-বিজ্ঞানের অনুশীলনে কি সার বস্তু লাভ হবে তোমাদের, ধন মান সুখ স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা, বাড়ী ঘর সম্পত্তি ভোগ আর বিলাসের চরমোৎকর্যই না হয় হোল। ততঃ কিম্?

মাধ্যাকর্ষণের বা জড় পৃথিবীর পানে টান তো স্থূল বস্তুর পক্ষে, মন ত সূক্ষ্ম বস্তু, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পদার্থ তত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তা বা অনুশীলন করলে মনও জড়ীভূত হবে কেন এটা তো বুঝলাম না,—এই কথাগুলি যেন একনিঃশ্বাসে বলিয়া কালীকিঙ্কর বাবার মুখপানে চাহিল।

তখন উমাপতি বলিলেন,—চিন্তাটা বড় জিনিস কিন্তু চিন্তার বিষয় তো জড়, সেই জড়ের গুণ মনে বর্তাবে না? বুঝে দেখ না, স্থূল ভারী ওজনের

জিনিস যেমন তার অনিবার্য্য নিচের দিকে গতি প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে, সূক্ষ্ম হলেও সূক্ষ্মভাবের জড়ীয় পদার্থ নিয়ে আলোচনা, বা অধ্যাসের ফলে সূক্ষ্ম ভাবেই যে মনেরও ভার বাড়ে তাতে অধোগতি অনিবার্য্য নয় কি? জড়ের ধ্যানে মনেও জড়তা আসবে এটা প্রকৃতিরই নিয়ম;

কালীকিংকর বলিল, মনের ভারী হওয়ার ফলে অধোগতিটা ঠিক ধরতে পাচ্ছিনা,—মনের ভার কী?

মনের ভার হোল বস্তুর সঙ্গে জড়ানো, তার স্থূল অভিব্যক্তি হোলো অধিকার স্পৃহা,—স্বার্থপরতা, লোভ, বস্তু অধিকারের আকাঙ্ক্ষাই কি সকল সমস্যার মূলে নেই? তারপর অধিকারের ফলে দম্ভ, কৃতিত্বের অহংকার, গর্ব্ববোধ এইসবগুলিই তো মনের ভার বা জড়তা। তাতেই তো মনকে নামিয়ে রাখে জড় পদার্থের দিকে। বুঝেছ?—

শুনিয়া কালীকিংকর বলিল, এক একটা ডিসকাভারীতে কিন্তু জগতের কত কত উপকার হচ্ছে সায়েন্টিস্টরাই তো সেই আবিষ্কারের হেতু, তার ফলে সে জাতের প্রতিষ্ঠা গৌরব সে তো কম কথা নয়?

এই বুদ্ধিটাই তোমার বর্তমান পরসভ্যতা আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। আচ্ছা বিচার কোরেই দেখনা কেন। একটা পদার্থ তত্ত্ব নিয়ে আবিষ্কারের ব্যাপারটা কী? ধরো কোন বিশেষ পদার্থ নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে নাড়াচাড়া করতে করতে—

কালীকিংকর বলিল, নাড়াচাড়া কী রকম?

উমাপতি বলিলেন, অনুশীলন বা অনুসন্ধান বা রিসার্চ্চ যাই বল তোমরা। স্বাধীন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক ধীমান প্রকৃতির অধিকারে এক শক্তিশালী পদার্থের তত্ত্ব বা পরিচয় পেয়ে গেল—যা আগে কারো জানা ছিল না। তারপর পরীক্ষার পর পরীক্ষার সাহায্যে—সফলকাম হয়ে ঐ তত্ত্বটি যথাসময়ে যথা সমাজে প্রকাশ করলেন; এইটিই হোল তাঁর আবিষ্কার, কেমন? গভীর ধ্যান, অনুশীলনের ফলেই ঐ সম্পদটি তিনি লাভ কোরেছেন সুতরাং মুখ্য ফল তার আনন্দ, তা লাভ হোল প্রচুর। কিন্তু তাছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠার পূর্ণ লোভ রয়েছে, তাঁর পর-ধন লোভের কথা। এইগুলি লাভ যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই। তাঁর সমাজে আবার ঐ আবিস্কৃত তত্ত্ব নিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটে লাভের অধিকারী হবার কাজ আরম্ভ হোল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জটীল যন্ত্র নির্মাণ-কার্য্যও আরম্ভ হোল। তারপরই আরম্ভ হোল ব্যাপক ভাবে কর্ম ও ধন-উপার্জনের প্রসার। জগৎ সমাজে এক শ্রেণীর মধ্যে এক চঞ্চল কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠলো। তাহলে দেখা গেল, জড় বা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিস্কারক প্রথমে পেলেন একটি গূঢ় পদার্থ তত্ত্ব। তারপর দ্বিতীয় ফল পেলেন আনন্দ, তৃতীয়ত পেলেন ধন, চতুর্থ দফায় পেলেন প্রসিদ্ধি বা ধন্য ধন্য রব, এবং তাইতেই তাঁর জীবন সার্থক হয়ে গেল। তারপর তার ফলে সমাজে হোল কী,—এক স্তরে সুখ-সমৃদ্ধির কারণরূপে প্রসারিত হোল এক প্রকাণ্ড ব্যবসায়,—আর জগতে অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে এক বিরাট প্রতিযোগিতা। একটি স্বাধীন জাতি অপর স্বাধীন জাতির একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মনোপলি দেখতে পারেনা, তার ফলে খুব অল্প সময়েই ঘোরতর যুদ্ধ, পৃথিবীর ছোট বড় কোন জাতিই তার ফলভোগে বঞ্চিত হবে না। আর সে ফল অমৃত

নয় নিশ্চয়ই। তা হলে প্রত্যেক সায়ান্টিফিক্ ডিস্‌কাভারীর ফলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে কি দেখা যাবে? ভেবে দেখতে বলি।

প্রজা বেড়ে যাচ্ছে, ইন্‌ডাসট্রিয়ালাইজেসন না করলে জাতির বাঁচবার উপায় কি? কালীকিঙ্কর বলিল, খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো?

একটা জাতির বেশী খেয়ে পরে বাঁচার অর্থ কি অপর জাতির সমরসজ্জা এবং মরণ পথে যাত্রা নয়?

অনেকক্ষণ সভা নিস্তব্ধ—কারো কোনো কথা নেই, কালীকিঙ্করকে ভাবাইয়া তুলিল;—কতক্ষণ পরে উমাপতি বাবা বলিলেন, কি বাবা, ওয়ারল্ড মার্কেট্ ক্যাপচার করবার ঘোড়দৌড়ের কথা ভাবচ?

ঠিক বলেচেন,—আচ্ছা আপনি বলুন তো. যার যেটুকু আছে তাই নিয়ে তারি মধ্যে সুস্থ হয়ে থাকতে পারবেনা কেন?

ঐ যে সায়ান্স, আর ডিসকাভারী, যার ফলে মনোধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ। তার ফলে পশুবলের প্রয়োগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা—ডিমোক্রাসীর অজস্র দৃষ্টান্ত যা আজ চারিদিকে ছড়াচ্চে,—পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে ইউরোপ-এমেরিকার জগতে শান্তি স্থাপনের কি অপূর্ব কৌশল? তোমায় হত্যা করে ভয় দেখিয়ে এমন কি ধ্বংস করেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমার শ্রেষ্ঠ অধিকার স্বীকার করা ছাড়া তোমার বাঁচবার পথ নেই। একেই জগতের অগ্রগতি বলবে?

তাহলে আমরা কি করবো, কোন্ পথে যাবো এই প্রশ্নই তো আসে?

আমি তাহাই তো বলছিলাম, পঁয়ষট্টি তলা বাড়ি, মোটর গাড়ি, ইলেকট্রিক রেল, পাঁচশো মাইল গতিবেগের এরোপ্লেন, ইউ বোট, টরপেডো, এককালে অল্প সময়ের মধ্যে শত সহস্র লোক হত্যার সহজ উপায়, সায়ান্স আবিষ্কারাদির প্রতিযোগিতা ওসব ওরাই করুক না, তোমরা ঐ স্রোতে ঝাঁপিয়ে নাই-বা পড়লে, —তোমরা সবাই ঐ পদার্থ বিজ্ঞানের দিকে নাই-বা গেলে? তোমরা সবাই না হোক কেউ কেউ উপযুক্ত অধিকারী বুঝলে চৈতন্যের ক্ষেত্রে নামোনা, তাই হবে তোমাদের স্বক্ষেত্র,—জড়াতিরিক্ত চেতনা, প্রাণ, এই পথে ভাবতে থাক, তাই নিয়ে যেসব আবিষ্কার হবে তাতে পদার্থ বিজ্ঞানের পাশবিকতার স্থান নেই, —জগতে কখনও কারো কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা নেই;—বরং সেই অমৃত-ফলে জগৎবাসী ধন্য হবে। ছাড়ো পদার্থ বিজ্ঞানের আবিষ্কার মোহ, এসো চৈতন্য রাজ্যে, ধন্য কর ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি—এর বড় উপদেশ আমার আর নেই।

॥ ১৯ ॥

কালীকিঙ্কর বলিল,—তাহা ঠিক, এইভাবেই তো হওয়া উচিত কিন্তু সুখী হওয়ার পথ তো রাখতে হবে?

উমাপতি বলিলেন, এই সুখী হওয়ার আসল স্বরূপটা বিশ্লেষণ করে দেখ দেখি, কী দেখবে?—জড় পদার্থেরই বাড়াবাড়ি, তারই মহিমায় যন্ত্র-সৃষ্টির ধারা ও ব্যবসার প্রাধান্য। সেই অপূর্ব ফলের স্বরূপ সমাজের ঐশ্বর্য্য বাড়ালেও সেই সমাজের মানুষ-বুদ্ধিকে বহুভাবে জড়মুখী করতেই সাহায্য করলে। একেই তো একদিকে জড়ের প্রভাবে, অপরদিকে জড়ের আকর্ষণে মানুষবুদ্ধি স্থূল,

অহরহ বিপথগামী হচ্ছে, শান্তি ও স্বস্তির খেই হারিয়ে ফেলেছে—অভাবের পর অভাব সৃষ্টি কোরে, অভাব বোধটা যেন চিরস্থায়ী ধর্মের মতো দৃঢ় করে তুলেছে তারি ফলে অস্থির, ব্যাকুল অজ্ঞান জনসমাজ ধনের পিছনে উন্মাদ-গতিতে ছুটে চলেছে স্থির পথে কাঁটা দিয়ে। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়ে গেল, জড়শক্তির উপাসনা আজ কোথায় নিয়ে চলেছে মানুষ সমাজকে, তোমার বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-এমেরিকার সভ্য মানুষ-সমাজের সেকথা ভেবে দেখবার মত ধৈর্য্য আছে কি কারো? কে বলবে কোথায় এর শেষ?

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল সভায়, অর্থাৎ পিনড্রপ্ সাইলেন্স যাকে বলে ভাই,—সবাইকে অন্তর্মুখী করিয়া তুলিল বাবার অপূর্ব ব্যাখ্যা। কতক্ষণ পরে উমাপতি প্রসন্ন মুখে শুধাইলেন,—কি ভাবচো বলতো?

তখন কালীকিংকর বলিল, এই কথাইতো ভাবছিলাম, যে ঐ পাশ্চাত্যেরাই কী যথার্থ শক্তিমান নয়? ওদের সায়ান্স ওদের বুদ্ধি,—এখনকার জগতে,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—তোমাদের অভ্যাসগত লক্ষ্যই হয়ে গেছে ওদের ওই মেটিরিয়্যাল সায়ান্স আর ডিস্কাভারীর গৌরবের দিকটা, ঐ দুটিতেই মুগ্ধ হয়ে আছ। তোমরা ধরে নিয়েছ যেন এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ঐটিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

কালীকিংকর বলিল,—আচ্ছা,—পঞ্চম পুরুষার্থটি কি? শুনে এসেছি অনেকবার কিন্তু জানিনা জিনিসটা কি বস্তু?—

বাবা বলিলেন,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি হল পুরুষার্থ—অর্থাৎ নর জন্ম নিয়ে এই সংসারে চেষ্টা দ্বারা লভ্য আর তাইতেই মানুষের জন্ম জীবন হয় সার্থক। আর ঈশ্বর লাভ এই চারিটি পুরুষার্থের বাইরের কথা, তাই তাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বোলেছে বৈষ্ণবশাস্ত্রে।

কালী বলিল, কি সুন্দর আমাদের শাস্ত্রের বিচার প্রণালী,—আমরা এসব দিকে চিরকাল অন্ধকারেই রইলাম।

বাবা বলিলেন,—সময় আছে, ইচ্ছা করলে সবই জানতে পারবে;—এখন যা বলছিলাম,—ভারতবাসী হিন্দু তোমরা, আজ তোমাদের ঘটে এ বুদ্ধি নেই যে জড় পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হলে মানুষের বুদ্ধিও জড়ীভূত হয়, জড়ধর্মী হয়; উচ্চগতি কখনও লাভ হয়না, হতে পারেনা। ভারতের আবিষ্কার যে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চলেছিল তাতে, জড় ও চৈতন্য দুটি পৃথক সত্ত্বা,—গুণে ও ধর্মে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত ফল-প্রসবকারী বোলেই প্রমাণিত; আর ঐ বুদ্ধিই যে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সমাজের মজ্জাগত। তোমাদের বুদ্ধি জড়-বিজ্ঞানের দিকে না গিয়ে কেন চৈতন্যমুখীই হোকনা, সেইটিই তো তোমাদের সত্ত্বার অনুকূল, তাতেই তোমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। পুনঃ পুনঃ এই কামনাই তো করি। ধনসম্পদ বৃদ্ধি, ভোগ, সুখ এসব হতে পারে, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতেও পারে স্বীকার করি, কিন্তু সেইটিই সবার বড় কথা কি? তাছাড়া দম্ভের পর্য্যায়ে পড়েছে ওদের ঐ সায়ান্স আর ডিস্কাভারী। তার ফলে মানুষ সমাজ থেকে অশান্তি উঠে গেছে কি, মানুষে মানুষে আপনবোধ জেগেছে কি? সমাজে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা আর বর্বরতার উচ্ছেদ হয়েছে কি? আমায় বুঝিয়ে দাও না?—

কালীকিংকর বলিল,—তাহলে আপনি কি এই কথাই বলেন যে আমরা জগতের এই অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে না চলে, পিছনে পড়ে থাকি?

উমাপতি। জগতের অগ্রগতি কাকে বোলচো? ঐ পঁয়যট্টিতলা বাড়ী, ইলেকট্রিক রেল, এরোপ্লেন, টর্পেডো ইউবোট, জলস্থল অন্তরীক্ষে উদ্দাম দৌড়ের পাল্লা, এইসব? আমি বলি কি, ওসব ওরা করুক না। সায়ান্স আর ডিস্কাভারী বলতে রাশি রাশি জটীল কলকব্জার সৃষ্টি তো? ধাতুর ব্যবহার আর লার্জস্কেলে নরহত্যা মহাশস্ত্র সৃষ্টির কাজ তা, ওরাই করুক না, তোমরা কারবার হিসাবে যেটুকু সমাজের কল্যাণের জন্য মাত্র সেইটুকু ব্যবহার করবোনা কেন; কম্পিটিশনে গিয়ে কাজ কি? লাঠালাঠি,—জাতীয় স্বার্থে নর-হত্যার ষড়যন্ত্র—ও কারবার ওদেরই থাকুক;—তোমরা, তোমাদের মাথা অন্যদিকে, যেদিকটায় ওদের জড়বুদ্ধি যায়না, সেইদিকেই চালাওনা? ভারতের নিজস্ব যে আবিষ্কার তাইতেই মাথা ঘামাও না?

কালীকিংকর তবুও বলিল,—খেয়ে-পরে জীবনদ্বন্দ্বে বাঁচতে হবে তো? প্রতিযোগিতার মধ্যে না গেলে কোন বিষয়েই উন্নতি হয়না,—সেই প্রতিযোগিতার জন্য জগতের এত উন্নতি সুতরাং আমাদেরও তার মধ্যে গিয়ে পড়তেই হবে। জগৎময় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই করে এনেছে আলাদা থাকবার যে কোন যো নেই! ইন্টারন্যাশনাল সিচুয়েশানই এমন,—আপনি তা ঠিক বুঝবেন না।

যোটি নেই! তিনি বলিলেন,—এইখানেই তো,—মাংসখেকো আর শাক-সবজী ডাল-ভাত খেকো বুদ্ধির তফাৎ। আমি বলি কি, ওদের অনুসরণ বা অনুকরণ, সায়ান্স, কেমেস্ট্রি নিয়ে জীবনদ্বন্দ্বে প্রতিযোগিতার প্রসার, জাতীয় উন্নতির নামে ঐসব যা কিছু নিয়ে একটা জাতির বা দেশের বৃহত্তর অংশই থাকুন না কেন, তারা ইনডাস্ট্রিয়ালাইজ করুক না কেন দেশকে? আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক নিয়ে আর একদল সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানপিপাসু যারা,—তারাই জীব চৈতন্য নিয়ে, জড়াতিরিক্ত চৈতন্য সত্তার পিছনে মাথা ঘামাক না; তাদের সকল কিছু শক্তি ধ্যান ধারণা নিয়োগ করুক না কেন? সেই শ্রেষ্ঠ যথার্থ জ্ঞান ও পরা-বিদ্যার্থীর দল চলুক না অনন্ত চৈতন্য-শক্তির ভাণ্ডার এক্সপ্লোর করতে? তোমরা সবাই মিলে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নামে ওদের জড়শক্তি, গতি ও যন্ত্রতান্ত্রিক জটিল উন্নতির পিছনে মার্চ করবে কেন? সেটা কোনক্রমেই তোমাদের জাতিধর্মের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হতে পারেনা,—তাই বলি নিজের পথে চলো, তাইতেই যথার্থ কল্যাণ তোমাদেরও হবে আবার জগতের হবে অশেষ কল্যাণ। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে,—ভারতের হিন্দু সংস্কৃতিকে এইজন্যই জগদম্বা, পরমাপ্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী এতটা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীইয়ে রেখে দিয়েছেন জগতের মহাদুর্দিনে সকল পীড়িত পথহারা সমাজের একমাত্র শান্তির উপায় বোলে; ভারতের এই হিন্দু মহাজাতিই জগৎ-সমাজে ঐ চরম সত্য প্রকাশ করবে—এটা তাঁরই অবশেষ বিধান। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানই জগতের কল্যাণ আনতে পারবে।—তাঁর কাজে ভুল হয়না, ভুল হয় আমাদের কাজে। জেনে রেখো—জগৎ সমস্যা সমাধানের কাজ এবার হিন্দুজাতির উপরেই পড়চে।

এ কথা শুনে কালীকিঙ্কর হাসতে হাসতে বললে,—তাহলে আমাদের সন্ন্যাস নিয়ে সব ছেড়েছুড়ে বনে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে বলুন?

তিনি বলিলেন—না, না, কিছুই ছাড়তে হবেনা তোমাদের, মডার্ণ সব

কিছু—লাইট, ফ্যান, সিগার, বাথরুম, লাইব্রেরী চেয়ার টেবিল সোফা যা কিছু দরকার তাই নিয়েই সহরের কোলাহল থেকে কেবল একটু তফাতে গিয়ে কাজ করবে। নির্জনতার মূল্যই সবচেয়ে বেশী সর্ববিধ চিন্তা ও ধ্যানের ব্যাপারে, নয় কি?—সেটা তোমাদের পাশ্চাত্য সায়ান্স গুরুরাও ত স্বীকার করে থাকেন। এতে অপমানবোধ কেন হবে?

আপনার কথায় এইটাই বুঝায় নাকি যে আমরা যেন সব কিছু শিক্ষায় ওদেরই অনুকরণ করতে চাইছি? তাই কি ঠিক?

তিনি—তাইতো চেয়ে আসচো, প্রথম যেদিন থেকে তোমাদের জাতীয় শিক্ষার বদলে সরকারী ফরমূলায় স্কুল-কলেজে শিক্ষা আরম্ভ করেছ। ওরা যেভাবে, যে দিকে নিয়ে যাচ্চে তোমরাও মেটেরিয়্যাল প্রস্পারিটির জন্য ঠিক ঠিক ওদের চিহ্নিত পথেই তো চলেছ আর তাতেই ইহ-জীবন সার্থক করতে বদ্ধপরিকর হয়েচ।—নয় কি?

শুনিয়া যুবা চুপ করিয়া রহিল।

উমাপতি বাবা পুনরায় বলিলেন,—ভেবে দেখো এখন সবাই মিলে—ঐভাবে সায়ান্স আর ডিস্কাভারীতে ডুবে গেলে কি ফল? যে মনোবৃত্তিতে ওরা, শক্তিতে সবার বড় হবার চেষ্টা,—মারাত্মক অস্ত্রবল, সৈন্যবল, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে আর নিজ সমাজেও যেমন পর সমাজেও তেমনি শান্তি নষ্ট করতে বসেছে তোমাদেরও তো সেইসব করতে হবে, যখন ওদের শিক্ষার ফাঁদে পা দিয়েচ? না, তোমার বেলা অন্য ফল হবে?—তাই তো বলছি তোমাদের যেটার সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক তাই নিয়ে মার্চ করো তোমরা।

সভা কিন্তু ভঙ্গ হইয়া গেল এই কথার পর,—কারণ বাবা এইবার ভিতরে যাইবার অনুরোধ পাইলেন। বরদলৈ এর ফুটফুটে পাঁচ ছয় বৎসরের সুন্দর কন্যাটি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, এখন চলুন ভেতরে আপনাকে দিদিমা আসতে বললেন, জল খাবার তৈরী হয়েছে যে। শুনিয়া হাসিতে হাসিতেই তিনি উঠিলেন—কিন্তু কালীকিংকরকে বলিলেন, আমার কাছে ভুবনেশ্বরীতে একবার যেও—কেমন যাবে তো? সে রাজী হইল। তারপর প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল।

ওখানে পরদিন উমানন্দ দেখিলাম। তবে উমানন্দ শৈলে যেসব ব্যাপার দেখিলাম, উহা কামাখ্যার মতই, কিছু বৈচিত্র্য নাই। সাধারণ যাত্রীরা যা দেখিয়া থাকেন সেই সবই দেখিলাম। উপরন্তু নৈসর্গিক দৃশ্যই আমায় সম্মোহিত করিয়াছিল। উমানন্দের বৈশিষ্ট্য জঙ্গলময় ঐ দ্বীপটি, মনে হয় ঐ জঙ্গলমধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা দিনমানের তীর্থযাত্রীরা দেখিতে পাননা। গৌহাটীর উপর হইতে উমানন্দ দেখিতে আমার চক্ষে অধিক রহস্যময় ছিল। যতটা সময় বরদলৈ উকীলের বাড়ীতে ছিলাম, কোন সময়েই উমাপতি বাবার বিশ্রাম ছিলনা, তবে আমি ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম অনেক কিছুই।

যাহা হউক আমরা তৃতীয় দিনে সন্ধ্যায় আবার কামাখ্যায় ভুবনেশ্বরীতে ফিরিলাম। উমাপতি বাবা তাঁহার আশ্রমে গেলেন, আমি নাটমন্দিরের চালায় আমার আসনেই ফিরিয়া গেলাম। কথা রহিল পরদিন প্রাতে বাবার আশ্রমে যাইব।

বিহারী নাথজীর সঙ্গে দেখা হইতেই, এই তিন দিনের গৌহাটী বাসের সকল কিছু খবরই দাবী করিলেন। সব কিছুই বলিতে হইল;—বিশেষতঃ

খাওয়া-দাওয়ার কথাটা, তাহার ভাষায় যাহাকে 'ভিচ্ছা' বলে তাহা কেমন হইয়াছিল ; দুইবেলা না একবেলা, এই খবরটাই তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল কাজেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বেশী করিয়া বলিতে হইল। উমানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সূচনাতেই, ওসব হাম জানতা হায় বলিয়া উড়াইয়া দিল।

কম্বলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলাম,—যে সংসারটি সম্প্রতি দেখিয়া আসিয়াছিলাম,—জীবনে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াই রহিল। এমন গৃহস্থ ক'টা হয়। সুন্দর শ্রী ঐ সংসারে ; সব কিছুই যেন মাধুর্যে উপচিয়া পড়িতেছে ; কি অপূর্ব শান্তিময় এ সংসারটি এই কথাই একজন সংসার-ত্যাগীর মনে আঘাত করে। বিশেষতঃ বাবার আগমনে প্রতিবেশীরা পর্যন্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া যেন সর্বার্থসিদ্ধি পাইয়াছিল! কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে যে গুরুভক্তি দেখিয়াছি তাহার পর—এই দৃশ্য, অন্তরক্ষেত্রে যে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিবে তাহাতে বিচিত্র কি ? কলিকাতার দরিদ্র সংসারের সাধারণ গৃহস্থ যেভাবে গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, দেখিয়া এখনকার দিনে ধর্মসংস্কার, বিশেষতঃ আমাদের মত যারা বিকৃত-ভাবাপন্ন সংসারী তাহাদের পক্ষে এ প্রথা উঠিয়া যাওয়াই ভাল মনে হইল।

॥ ২০ ॥

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই উমাপতি বাবার আশ্রমে ছুটিলাম। একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। দাওয়ায় ছিলেন এলোকেশী মাতা। শুনিলাম, জোরে জোরে একজনকে কি যেন একটা কাজের দোষ দেখাইয়া শাসন করিতেছেন ; মনে মনে স্মরণ ও মুখে নারায়ণ বলিয়া আমি তো গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্রই যেন ভৈরবীর, মুখে একটু বিরক্তিভাব প্রকাশিত হইল। তবে তৎক্ষনাৎ উহা সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —গোহাটীতে কি কাজ কোরলেন ? মেজাজ খোস্ নয় প্রশ্ন শুনিয়াই বুঝিলাম, —তারপর আমি অবশ্য বলিলাম যে, কোন কাজ করতে তো যাই নি, বাবার সঙ্গেই গিয়েছিলাম দেখতে ও শুনতে।

যাহাকে ধমক দেওয়া হইতেছিল তাহার নাম গিরিধারী—সে ব্যক্তি মহাবলবান, আধা-বয়সী, নিতান্তই ভাল-মানুষ গোবেচারা যাহাকে বলে তাই। আশ্রমের ভৃত্য, সুতরাং লাল কাপড় পরিত যেন সে একজন ভৈরব। এখানকার কর্ম তাহার আশ্রমের কাঠ কাটা জল আনা ইত্যাদি। এখন তাহার দিকে ফিরিয়া, —হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখিস কি। চলে যা তুই এখান থেকে! শুনিয়া ধীরে ধীরে সে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে,—যেতে কইলে তো যাই, না কইলে আগাম যাব কেমন করিয়া। তাহার কথাগুলি মনোমত হইল না তো বটেই—মেজাজটাও একটু গরম হইল। সে ক্ষেত্রে আমার উপরেই তার ঝাঁজটা পড়া স্বাভাবিক,—হইলও তাই। একেবারেই আমার উপর প্রশ্ন হইল,—অকর্মা যতো সব, দেশ-গাঁয়ের মুখ্য মরদদের নিয়ে কি করা যায় বলুন তো ? জানেন তো গাঁয়ের কুঁড়ে হয় যে, বৈরাগী হয়ে বেড়ায় সে—আপনাকেই বলচি, এ দেশ সে দেশ ঘুরে ঘুরে করছেনই বা কি ? তারপর সুরটা একটু

নরম করিয়া—আপনাকে মূখ্যু বল্‌চি, মনে করে চটে যাবেন না, হয়ত আপনি মূখ্যু নন, কিন্তু—

বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—যে অর্থে অকর্মা মূর্খের দলে আমাকে টেনেছেন তা সত্য,—সত্যই, সেটা আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়নি, কারণ মনে মনে তো জানি যথার্থ দেশের কোন কাজেই আমি আসিনি, অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত তো নয়ই। কিন্তু কি করি বলুন তো,—আমার মন, কিছুতেই ঘরে অথবা কোন একটা জায়গায় কিছুতেই দীর্ঘকাল বসেনা যে,—অকপট এই সত্য কথাটার প্রভাবে এলোকেশী তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন,--প্রসন্ন বদনে বলিলেন, আমি তো আর আপনার উপদেষ্টা হতে পারিনা,—কি করবেন তা আপনিই জানেন। তবে আপনি যেভাবে ভবঘুরের মত চলেছেন, আমার মনে হয়, আপনার মত লোকের বিবাহিত হয়ে গৃহস্থ জীবনের ভিতর দিয়ে কোন কাজে লেগে যাওয়াই ভাল। দেশের কাজ বলতে, মহৎ, যাকে বড় কাজ বলে সে তো কিছু হবেনা আপনাদের মত মানুষের দ্বারা। তারপর একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন তা,—আপনি তো ছবি আঁকেন, বেশতো শিখেছিলেন একটা কাজ। তাইতেই তো রোজগার করতে পারতেন, ছেলে-পুলেদের খাওয়াতেন, আর সুখে-দুঃখে ঘরকন্না কোরতেন,--ব্যাস্ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেতো, নয় কি ?—

আমি বলিব বলিয়া মুখ খুলিয়াছি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া এলোকেশী বলিলেন--থাক্ আর দরকার নেই। আমার কথাটা অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে, —আপনি আঘাত পেয়েছেন, বাবা আমায় বারণ করেছিলেন,—

কি বারণ করেছিলেন ? জিজ্ঞাসা করিলাম।

এলোকেশী বলিলেন—আমার স্বভাবই ঐ রকম কাকেও আঘাত না করে কথা কইতে পারিনা, বিশেষতঃ—এ দেশের মরদের উপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। উদ্দেশ্যহীন বাঙ্গালী ছেলেদের দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়। বাবা তা ভালই জানেন, তাই আমায় সংযত হয়ে কথা কইতে বলে দিয়েছিলেন ! --সবাই ঘৃণার পাত্র নয়,—বিশেষতঃ সৎভাবের লোক, সৎউদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করে যায় অথবা এখানে আসে,—তাদের উপর কখনও যেন শ্লেষ ব্যঙ্গ না করি। আপনার আনাগোনা আরম্ভ হবার পরেই যখন ঘনিষ্টভাবে যাতায়াত আরম্ভ করলেন, বাবার স্নেহ পড়লো আপনার উপর, তখনই একদিন তিনি বিশেষ সংযত হোতে বলে দিয়েছিলেন। এটাও জেনে রাখুন, এবার আমায় গৌহাটিতে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না, এই কারণেই। সেখানে পাঁচজন আসবেন যদি কিছু অসঙ্গত কথা বোলে ফেলি বা কাকেও আঘাত করি বাক্যবাণে—যেমন এখনি করলাম আপনাকে।

আমি বলিলাম--আঘাত হয়তো একটু লেগেছে, আমার নিজের দোষের কথা একজনের মুখে স্পষ্ট খোলাখুলিভাবে শুনলে সাধারণতঃ আত্মাভিমানে ঘা একটু সবারই তো লাগে, সেই হিসাবেই আঘাত, না হলে মিথ্যা তো আপনি একটুও বলেননি তাতে আপনার উপর শ্রদ্ধা তিলমাত্র ম্লান হয়নি।

আমার উপর আবার কারো শ্রদ্ধা তিলমাত্র আছে নাকি ? চণ্ডাল কন্যা, নীচ জাতি যে !

আমি বলিলাম,—এ আক্ষেপ আপনার কেন হবে ? আর জাতি মানুলেও আমি আপনাকে যখন শ্রদ্ধা করি বলেছি, তখন আমায় ওসব কথা কেন বলেন ? আমি তো আপনাকে চণ্ডাল বোলে হেয় ভাবে বা হীনচক্ষে দেখিনি,—তাতো

আপনি ভালই জানেন। শুনিয়া এলোকেশী বলিলেন ; বাবার মুখেই শুনেছি —জ্ঞানমার্গের লোক,—খোলাখুলি কথাই তো আপনি চান তাইই ভালোবাসেন, —আর সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন ; তা যদি একটু খোলাখুলি কথা কই, কিছু মনে কোরবেন না তো ?—কথাটা শুনিয়া আমার মধ্যে একটু অজ্ঞাত ভয়ের উদ্রেক করিল, আবার একটা আঘাত কোন্‌দিক হইতে আসে, সংকোচ বলিয়া কোন ভাবের বালাই এ নারীর মধ্যে তো নাই, তাহা আগেই জানিতাম এখন আরও ভালই জানিলাম—অথচ দেখিলাম, এ ক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া কথাটা আর অন্যদিকে ফেরানোও চলেনা ; কাজেই বলিলাম,—বলুন।

আপনি শ্রদ্ধা করেন বললেন,—তাই জিজ্ঞাসা করছি শ্রদ্ধাটা কিসের ? আমার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তো ?

এ যে একেবারেই বজ্র—শুনিয়া আমি অবাক, স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার মনে আসিল, একথাটা বলি যে, আপনি বোধহয় জানেন না আমি বিবাহিত, ঘরে আমার যিনি আছেন রূপে যৌবনে তিনি আপনার তুলনায় কিছু কম নন্, তাঁর প্রতি প্রীতি এবং ভালবাসাও কম নেই ! আর আমি গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েও ঘুরছিনে,—আমার গৃহস্থ ধর্মে মনুষ্যত্বের পথ খোলাই আছে ইত্যাদি। কিন্তু উহা বলিলাম না। চুপ করিয়াই রহিলাম। বলিতে পাওয়া অথচ না বলাটা লক্ষ্য করিয়া এলোকেশী বলিল, এক্ষেত্রে এটা সহজ, স্বাভাবিক তাই না আপনাকে জিজ্ঞাসা কোরেছি। আপনার বয়স তো বেশী নয়,—আপনার পক্ষে ত্রুটি হওয়া ভয়ানক অন্যায়, অথবা একটা অস্বাভাবিকও নয়, অঘটনও নয়, অথবা বিচিত্রও নয়, এটা তো স্বীকার করেন ? ইহারও কোন প্রতিবাদ করিলাম না দেখিয়া এলোকেশী আবার বলিল,— পঁয়তাল্লিশ, আটচল্লিশ, পঞ্চান্ন, বাহান্ন বছরের মান্যগণ্য ধার্মিক প্রৌঢ় গৃহী লোকের আমার শরীরের উপর যদি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা থাকে অথচ এদিকে যদি তিনি আবার আমায় মা বোলে সম্বোধনও করেন,—তাকে কি বলবেন ?

আমি বলিলাম,—আমার ধারণা,—ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে মানুষে আর পশুতে একটা মাত্র ব্যবধান আছে—সেটা সংযম।

শুনিয়া এলোকেশী, তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—এতবড় একটা জাতির সর্ব স্তরে সেটা আমরা আশা করতেই পারিনা। আমি বলিলাম, ভৈরবী নারীকে মা বলে ডাকা, আবার অন্যক্ষেত্রে ব্যবহারে তার সঙ্গে রমণী সম্বন্ধ, এ অদ্ভুত ব্যবহার তো আপনাদের তন্ত্রধর্মের মধ্যেই প্রচলিত নীতি, আমিও সেটা অনেক-ক্ষেত্রে দেখেছি যে। শুনিয়া এলোকেশী বলিল,—তাহলে আপনার জেনে রাখা ভাল আমার সঙ্গে সে ক্ষেত্রের কোন সম্বন্ধই নেই।

বলিলাম, তা জানি আর সেইজন্যই আপনার সঙ্গে এ কথা কইতে সাহস করেছি। দেখুন, বাইরের প্রভাব আমরা এড়াতে পারিনা,—আপনার গুণের সঙ্গে রূপকে আলাদা ভাবতে পারিনা,—আপনার গুণের সঙ্গে রূপকে আলাদা করে দেখাও স্বাভাবিক নয় কারণ তারও একটা প্রভাব আছে তো ? গুণগ্রাহী কোন মানুষের দৃষ্টিতে একজনের রূপ, তার গুণকে উজ্জ্বল করে দেখায়। একজনের মনে আবার এমনও দেখেছি গুণবান ব্যক্তির গুণের প্রভাবে তার কুশ্রীটাও অনেক সময় সুশ্রীতে দাঁড়ায় ; আসলে আমাদের দেখা, শোনা, ব্যবহার সব কাজেই অনেকখানি মনের পক্ষপাত অথবা কল্পনা থাকেই,—মানুষ সাধারণের প্রকৃতিই এমন ; এতো আপনিও স্বীকার করেন ?

হ্যাঁ স্বীকার করি,—আচ্ছা বলুন তো এবার, আপনি আমার কাছে কি জানতে চান?

আমি বলিলাম,—সত্য যেটা জানতে চাই তার আগে আজ এখনই আবার প্রশ্ন উঠছে একটা সেইটিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি,—বলুনতো আপনি আমাদের দেশের পুরুষদের এত ঘৃণা করেন কেন?

প্রথমে এতটা ছিলনা,—আমাদের গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জোর করেই ধরে নিয়ে যেভাবে অত্যাচার করে তা আপনাদের কলকাতার বাবু-ভায়াদের জানা নেই। কলকাতার বাবুরা কেউ কেউ বিশেষতঃ ওখানকার সমাজপতি যাঁরা গ্রামের ঐসব অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে পড়েন, অনেকেই পড়েন না, আমি জানি, ওসব তাঁরা জানতেও চান না। কাজেই আপনাদের কোন ধারণাই নেই যে আমাদের পূর্ববঙ্গে যেখানে ওরা দলে বেশী,—হিন্দু সমাজের মেয়েদের উপর তাদের সমাজের কী অদ্ভুত অত্যাচার। এ পর্য্যন্ত হিন্দুরা তার কোন প্রতিকার করতে সমবেতভাবে চেষ্টাও করেনা। আরও, আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় যখন কাপুরুষেরা এ-নিয়ে আদালতে নালিশ মোকদ্দমা করে।—তার কোনটা বা ফেঁসে যায়, কোনটায় বা আসামী দু' একমাস জেল খাটে, তারপর ফিরে এসে আবার তাদের ধর্মে-কর্মে মন দেয়। আর যে পোড়া-কপালীকে একবার ঘর থেকে নিয়ে গেল তার আর ঘরে স্থান হবেনা, তাকে হয় মুসলমানদের ঘরে যেতে হবে, না হয় বেশ্যাবৃত্তি। ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের এ বিধান পারেন বরদাস্ত করতে? পৃথিবীর কোন্ সভ্যদেশে এ বিধান আছে বলতে পারেন?

আমি কিছুই বলিলাম না। জানিতাম এ সকল মর্মস্থল-বিক্ষুব্ধ অনু-ভূতির খরস্রোত প্রবল ধারায় বাহির হইতেছে। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন—আমি পুলিশ বা সরকারী আদালতের রক্ষা কবচ প্রতিকার চাইনা বুঝতেই পাচ্চেন। সত্যিই ঘৃণা করি আমি দেশের পুরুষদের। অতি বড় কাপুরুষ না হলে পরের মুখ চেয়ে থাকতে প্রবৃত্তি হবে কেন?—আচ্ছা বলতে পারেন এরা বিয়ে করে কেন? কোন্ লজ্জায় স্ত্রী গ্রহণ করে যাকে রক্ষা কর্ত্তে পারবেনা? আমি নিরুত্তর—তিনি বলিয়া চলিলেন;—নারীকে অপমান থেকে বাঁচাতে গিয়ে মরেনা কেন ওরা!—দেখিলাম ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন। আমি শান্ত ভাবেই বলিলাম, আমি যখন এরকম দুটি সমাজের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে, কোন বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করি,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথা বুঝেছি,—সভ্য জাতির সংস্কৃতির গরিমা আছে একটু কিনা আপনাদের মধ্যে, তাই এতটা উদার মনোভাব পোষণ করতে পেরেছেন,—পশুসমাজ আর মানুষ সমাজ যেখানে একসঙ্গে বাস করতে হয় সেখানে ও-রকম মনোভাব কখনও কাজের হতে পারেনা। আমি বলিলাম, সেটাইতো আমি বুঝতে চাইছি আপনার কাছে,—আপনিই তো ভাল জানেন এবং বলতেও পারবেন এটার প্রতিবিধানের কথা। উত্তেজনা তাঁর কমিলনা, বরং এক ডিগ্রী চড়িয়াই উঠিল,—বলিলেন, পশুদের রোগে মানুষ রোগের ওষুধ দিলে চলেনা, তাদের ওষুধ তাদের ধাতে গ্রাহ্য হওয়ার মত হওয়া চাই।

আপনার সেই প্রেসক্রপসানটাই শুনবো বলে ধৈর্য্য ধরে আছি যে,—

টুথ ফর এ টুথ, নেল ফর এ নেল, বাইবেলের কথা জানেন না?

এলোকেশী মিশনারীদের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। আমি বলিলাম,— বাইবেলের তত্ত্বদর্শী শ্রেণীর যাঁরা, তাঁরাই বা কী বলেন, তাওতো জানেন। ওতে রোগের বিষ বা আগুন নেভাতে পারেনা, জ্বালিয়ে রাখতেই সাহায্য করে, ফলে সমাজ অধঃস্তরে নেমে যায়। এটা নিশ্চয় আপনি কখনই প্রার্থনা করেননা? কথা আমার শেষ হইবামাত্র ভৈরবী মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে দেখিলেন, অশ্রদ্ধার ভাব ছাড়া আর কোন অর্থ হয়না ঐ ভাবের। তৎক্ষণাৎ কি ভাবিয়া আবার আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া তিরস্কারের ভাবেই বলিলেন,—করি, করি, নিশ্চয়ই করি, জেনে রাখুন আপনিও, অন্ততঃ একবার আমি চাই এদেশের হিন্দুসমাজ অতটাই অধঃস্তরে নেমে আসুক। চাইনা অত উচ্চ আদর্শের বড়াই ঐসব নরপশুদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায়। দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে দেখিয়ে দিক ও-রোগের ওষুধ তাদের হাতেই আছে আর তা প্রয়োগ করতেও জানে তারা। কিন্তু আমি এটাও জানি তা ঘটতে দেবেন না আপনারা,—মাত্র দুটি কারণে, আপনারাই তাতে বাদ সেধে আছেন বরাবর।

আমি অবাক হইয়াই বলিলাম,—আমরাই বাদ সাধবো, মাত্র যে দুটি কারণে তা জানতে আগ্রহ প্রকাশ না করে পারছি না।

এলোকেশী বলিলেন, স্বীকার করতে পারবেন? যদি বলি ধর্মের নামে প্রবল হিংসাপরায়ণতা, নারীধর্ষণ, হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, পৈশাচিক বর্বরতার কাছে হিন্দুসমাজের পরাজয়, আর সেই গ্লানিই হিন্দু-প্রাণে একটা বিজাতীয় ঘৃণা সৃষ্টি কোরে ওদের অস্পৃশ্য থেকে অস্পৃশ্য কোরে রেখেছে হিন্দু-সমাজে,— বলুন না ওদের উপর হিন্দুদের যে ঘৃণা তার তুলনা আছে? আমি নিরুত্তর।

প্রমাণ চান? আবার তিনি আপনিই বলিতে লাগিলেন,—সহজ প্রমাণ দিচ্ছি,—ঘর জ্বালানো, ধন-লুণ্ঠন, হিন্দুনারী ধর্ষণ ত ওদের ধর্মের নাম ক'রে একথা ত জানেন। আচ্ছা, হিন্দুর তরফ থেকে মুসলমান হত্যা, মুসলমানের ঘরে অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন এসব হয়তো অনেক শুনেছেন কিন্তু কোন হিন্দু, ভদ্রসমাজের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, নিম্নস্তরের হিন্দু কেউ কখন কোনও মুসলমানের মেয়ে ধরে পশুবৃত্তির চরিতার্থতার পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন কি? এত ঘৃণা যে ওদের নারী পর্য্যন্ত নিম্নতম হিন্দুর কাছেও অস্পৃশ্য হয়ে আছে। বোধ হয় এক সমাজের সর্বউচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে ভরা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর আর এক সমাজের উপর এতটা প্রবল ঘৃণার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। অবশ্য এর মধ্যে যাঁরা, ভারতের বাইরে স্বাধীন দেশ, ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা। জাতির গোঁড়ামি হয়তো তাঁদের নেই।

আমি বলিলাম, তাহলে আমাদের পাড়ার দুলাল মিঞা, যুধিষ্ঠির মিঞা তাদের ছেলে,—কার্তিক, মানিক, এইসব ছোট ছোট মিঞারাও আমাদের ঘরের ছেলে-পুলের সঙ্গে হাটে বাজারে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কোচ্ছে দেখতে পাই।

তারা যেভাবেই হোক মুসলমান হয়ে পরে হিন্দু সমাজের মোহ কাটিয়েছে কিন্তু নামের মোহ কাটাতে পারেনি, এইটিই বুঝতে হবে। ওকথা যাক, এখন বলুন তো দেখি এতটা ঘৃণা অস্পৃশ্যতার ফলে হিন্দুর কী লাভ হয়েচে? লাভটা এতদিনের একত্রবাসের পরও এই অস্বাভাবিক জাতিবিদ্বেষের ভিত্তিতে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, দু' পক্ষের ভেদবুদ্ধিই দৃঢ় করে, তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে রাজনীতির ক্ষেত্রে,—নয় কি?

উত্তরে আমার কিছু বলিবার ছিলনা, শুধু বলিলাম প্রথম কারণটি তো শুনলাম এখন দ্বিতীয় কারণটি বলুন তো ?

এবার এলোকেশী ভৈরবী আসন পরিবর্তন করিলেন,— গরুড়াসনে বসিয়া, —বাঁ-হাত খানির উপর শরীরের ভার রাখিয়া, একাসনে অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত হইয়া যেমনভাবে মেয়েরা বসে সেইভাবে বসিয়া বলিলেন,—আপনাদের হিন্দু-সমাজ উচ্চসভ্যতার জাতীয় পবিত্রতায় প্রবল বিশ্বাসী, আত্মধর্মে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকতার গরিমা এবং সেই হেতু একটা জাতিগত পবিত্রতার দম্ভ তার এত বেশি যে, জগতের চক্ষে সেটা হৃদয়হীনতার পরিচয় হলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হিন্দুসমাজের কোন মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা মেয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী, মনে মনে যতই নির্মল হোকনা কেন, সমাজে তার আর স্থান নেই। তার স্বামী ইচ্ছা করলেও তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেনা। একটি প্রাচীন জাতির এভাবের সামাজিক এবং পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার গরিমা, বিশ্বজগতের সকল সমাজের পক্ষে অর্থহীন, দুর্বিষহ হলেও হিন্দুসমাজে এ এখনও অবাধে চলছে। এতটা অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিক সমাজ কোথাও দেখেছেন ?

আমি বলিলাম,—দম্ভ ? এলোকেশী দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, দম্ভই তো। বাইরের ভাবটা যেন পবিত্রতা রক্ষা কিন্তু মূলে প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির দম্ভ নয়তো কি ? আসলে ওটা শক্তিহীনতার নিষ্ফল আক্রোশ মাত্র,—প্রাচীন জাতীয় গরিমার স্মৃতিমাত্র সার। অপর পক্ষের পশুবল প্রতিরোধে যা চরম দুর্বলতার নামান্তর,—নৈতিক অধঃপতনের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই নয়,— তার ভাব ও ভাষা এই যে, আমাদের হিন্দুসমাজ এতটাই উঁচু আর মুসলমানেরা এতটাই পাপী, এতটাই হীন এবং আমাদের কাছে এতটাই ঘৃণ্য যে, আমাদের ধর্ষিতা মেয়ে নির্দোষ, নিরপরাধিনী হলেও তাকে উদ্ধার এবং গ্রহণ করাও দরকার মনে করিনা। সমাজে স্থান দিইনা, এমন কি কেউ তাকে উদ্ধার ক'রে যদি স্থান দেয়, তাকে পর্যন্ত আমাদের সমাজ থেকে বার করে পবিত্রতা রক্ষা করি। তাতে যদি তারা মুসলমান হয়ে যায় যাক,—হাজারে হাজারে তা আগে হয়ে গেছে আর এখনও হচ্ছে। তাতে পবিত্র হিন্দুসমাজ গ্রাহ্য করেনা। প্রতিবিধানের কথা,—উপেক্ষণীয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঐ ভাবের ঘটনা, এ সমাজের নারীদের উপর যাতে আর না হয়—যে সম্বন্ধে আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ করি ; ওসব কাজ দেশের শান্তিরক্ষকদের, তারা তাদের কর্তব্য করুক না করুক. উচ্ছন্নয় যাক আমরা কী জানি ? এইতো ব্রাহ্মণসমাজের মনোভাব ?—এখন বলুন,—এ মূঢ়তা জগতের কোন মানুষসমাজ বরদাস্ত করতে পারে ? নিরপরাধী মানুষের চেয়ে সামাজিক ধর্ম বড় ?

আমি আর কি বলিব, একথা তো আমার নিজেরই মনের কথা,—তবুও একটু বলিলাম, আচ্ছা দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙ্গার কথাটা ছেড়ে দিন,—

এলোকেশী ও কথা আমায় বলিতেই দিবেন না, বাধা দিয়া বলিলেন, না না ওটা ছাড়া হবে না, ঐটাই ওষুধ, ঘৃণায় অস্পৃশ্য বোধে দূরে রাখার চেয়ে ঢের ভাল।

এবার আমি জোর করিয়াই বলিলাম, শুনুন আমার কথাটা। একজনের দাঁতের বদলে শুধু অপরের দাঁত ভাঙ্গলেই তো হবেনা, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দাঁত ভাঙ্গাভাঙ্গির কাজটা যে হেয় অধঃপতনের পথ, কোন সমাজের পক্ষেই ওটা প্রশ্রয় দেবার মত নয় এই বুদ্ধি জাগাবার ব্যবস্থাও তো করতে হবে, তা না হলে

কি উপকারটা হবে সমাজের? চিরকাল ঐ দাঁত ভাঙ্গাভাঙ্গি পাশাপাশি দুই সমাজে প্রতিবেশীদের মধ্যে চলবে—এটা নিশ্চয়ই আপনি চাননা? আবার এই কথাটাই বলিলাম।

আমায় কি মনে করেন, কিছুই বুঝিনা আমি?

আপনি বোঝেন না তা নয়, নারীজাতির অপমান আর নিজ সমাজের পুরুষদের অক্ষমতার কথা ভেবেই খানিকটা পাগল, ক্ষিপ্ত করে তুলেছে আপনাকে, তাইতো ঐ প্রতিশোধের কথাটা অত ক'রে বলচেন। কিন্তু এটাও তো ঠিক, দেশের সমস্ত মুসলমানই তো এর জন্য দায়ী নয়? এ কাজ করে একদল লোক—তারা নিম্নস্তরের।

আবার রুষ্ট হইয়া এলোকেশী বলিলেন, ওসব পুরনো ছেঁদো কথা রেখে দিন, শুনলে আমার গা জ্বলে যায়;—ওদের সমাজের সমর্থন নেই, প্রশ্রয় নেই তো এ-কাজ চলেছে কেমন করে, বন্ধ হয়েছে কী এতদিনে? ও সমাজের মোল্লারা কি দস্তুরমত শিক্ষা দেয়না ওদের—যে রকমেই হোক হিন্দুদের সর্বনাশ করতে পারলেই ওদের ধর্মে খুব উঁচু স্থান, স্বর্গে যাবে ওরা? যেমন হিন্দু গোঁড়া-ব্রাহ্মণ সমাজের জাতিগত পবিত্রতার দম্ভ, তাদের সমাজের সমর্থন না থাকলে কি একজন স্ত্রী ত্যাগ করে? মুসলমান ধরেচে ছুঁয়েছে তাতেই তার জাত গেছে চলে? আপনাদের মূঢ় ব্রাহ্মণসমাজ কি শেখায়নি, কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমানে ধরলেই তার জাত যায়, আর সে হিন্দুসমাজে থাকতে পারবে না, এ সমাজ এতই পবিত্র?

আমি বলিলাম,—ওদের সমাজের মধ্যে হিন্দুদের উপর শ্রদ্ধা, প্রীতি রাখে, কখনই বিরোধ করেনা এমন দৃষ্টান্তও তো দেখা যায়—আমি তাইত বলতে চাইছিলাম।

এলোকেশী একটু ব্যঙ্গ ভাবেই আমার সুর অনুকরণ করিয়া বলিলেন,—হিন্দুদের মধ্যেও তো সাম্যবাদী আধুনিক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মুসলমানদের ওপর তিলমাত্র ঘৃণার ভাব পোষণ করেনা কিন্তু তাতে ক'রে হিন্দুর ঘরের মেয়ে ধরারও কোন ব্যতিক্রম হয়নি এতাবৎ কাল। আর ধর্ষিতা মেয়েরাও তাদের স্বামীঘরে অথবা সমাজে স্থানও পায়নি তো।

মনেপ্রাণে আমিও সেই কথাই জানিতাম। আমি নিরুত্তর, কিন্তু তিনি পুনরায় বলিলেন,—এখন কি বুঝলেন?

আমি চিন্তিত হইলাম, সত্যই কিছু যে বুঝি নাই—তাই বলিলাম,—আমি আপনার উপরের মতলবটুকু হয়তো ধরতে পেরেছি, কিন্তু তল পাইনি আপনার আসল উদ্দেশ্যের। একদিকে টুথ ফর টুথ, নেল ফর নেল বলছেন, অপর দিকে হিন্দুসমাজের বিজাতীয় ঘৃণা, জাতীয় সংস্কৃতির দম্ভঘটিত উপেক্ষার ফলেই যেন এটা চলচে, তাও বোলচেন তাতে কি বুঝবো বলুন?

এই বুঝবেন যে আমি একপক্ষে ব্রাহ্মণ-সমাজের বিজাতীয় ঐ ঘৃণা অপরপক্ষে ওদের দলপতি ও মোল্লা প্রচারিত ঐ বিদ্বেষ এই দুই বিষে বিষক্ষয় করে ওদের সমাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছি প্রাণ, মান, ধর্মভয় ত্যাগ করে, বুঝেচেন এক বার, খানিকটা সবল সামাজিক দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেই হবে,—দেশের যুবারাই তা পারবে। তবেই এ কলঙ্ক থেকে জাতির মুক্তি।

বলিলাম, আরও একটু সোজা করে যদি বলেন,—

উত্তেজিত এলোকেশী বলিলেন, আপনি হয় একটা মহা ভণ্ড, না হয়

আকাট মূর্খ দেখছি, আরও সোজা করে বলতে হবে? তাহলে শুনুন, তোমার পবিত্র সংস্কৃতির দেমাকে, একজনকে ঘৃণা-ভরে অস্পৃশ্য করে দূরে সরিয়ে রাখবে আর সে জীবিত মানুষ হয়ে সেই অবজ্ঞা মেনে নেবে, প্রকৃতির রাজ্যে তা সম্ভব নয়। যাকে তুমি ছুঁতে চাইবেনা সে তোমার গায়ে পড়তে,—গা ঘেঁষে চলতে চাইবে, এইটাই প্রকৃতির নিয়ম। ভেদটা মানুষের সৃষ্টি—মিলনটাই প্রকৃতির অনিবার্য্য বিধি।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, এ যুগে পাশাপাশি একটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ রেখে, এক দেশে গাঁয়ে ঘর করা চলেনা। জাতিগত পিওরিটী থাকবে মাত্র নিজ নিজ সমাজের মধ্যে, কালচারের ক্ষেত্রে হবে প্রীতির ভিত্তিতে; এক সমাজের সংস্কৃতি আর এক সমাজ গ্রহণ করবে যদি তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর কিছু থাকে। শেষে সব কিছু জগৎময় ছড়িয়ে পড়বে, এইটিই জগদম্বার মূল নীতি বা সৃষ্ট-রক্ষা পদ্ধতি।

তাহলে আসল কথাটা দাঁড়ালো কি; সরলভাবেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি করতলে দুটি আঙ্গুলের আঘাত করিয়া বলিলেন, একপক্ষে তীব্র ঘৃণা পোষণের পরিণাম আত্মসংকোচ, তস্য ফল শক্তিহীনতা অতঃপর ভয়াবহ অবসাদ—শেষে অস্তিত্বলোপ;—অপর পক্ষে ঘোরতর বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম হিংসাপ্রবৃত্তি অতঃপর বুদ্ধিনাশ যার শেষ পরিণতি অনিবার্য্য ধ্বংস। সুতরাং এই দুই ব্যাধি-বিষ যত সত্বর মানুষ সমাজ থেকে লোপ পায়, সমাজের মানুষেরা বুদ্ধিপূর্বক নিজেরাই তার ব্যবস্থা করবেন! আর আপনার বুঝে কাজ নেই; মাথা খারাপ করে পাগল করবার যোগাড় করেছেন—

কিন্তু একটা কথা এখনও পরিষ্কার হয়নি,—ঐ যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া বললেন ওদের সমাজে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটা মন্দের ভাল, ঘৃণা পোষণের চেয়ে অনেক ভাল, তাতে দুই সমাজই সামনা-সামনি দাঁড়াবে,—লেগে যাবে প্রত্যক্ষভাবে, তাইতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারবে। না হলে,—একজন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকবে আর অপরজন হিংসা, বিদ্বেষের বশে, চূড়ান্ত ধর্ম সাধন করচি ভেবে পিছন থেকে এসে আঘাত হানবে,—এটা আর এখনকার দিনে চলতে দেওয়া যায় না।

॥ ২১ ॥

দিগুঠাকুর আজ সকালে আসিয়া আর এক সাধুর পরিচয় দিল;—তিনি নীচের দিকে থাকেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি তান্ত্রিক? দিগুঠাকুর বলিলেন, তা জানিনা,—তবে তাঁর কাপড় লাল নয়, সাদা। গলায় রুদ্রাক্ষ, তুলসী, আর স্ফটিকের মালা। আরও আশ্চর্য্য করিল আমাকে এই বলিয়া যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান, আগেই বিপিন পাণ্ডার কাছে নাকি আমার কথা শুনিয়াছেন। সে বলিল, অনেক তীর্থ ঘুরেছেন, কামাখ্যায় ছয় মাস আর বৃন্দাবনে ছয় মাস এইভাবেই বহুকাল আছেন। তাঁর এখনকার স্থানটি ঠিক জানিয়া লইলাম। নীচের দিকে ব্রহ্মপুত্র দিয়া উঠিবার পথেই একটি কুটিরে একাই থাকেন, শিষ্য সেবক খুবই কম, নাই বলিলেই হয়। সাধক শ্রেণীর লোক, বেশ সৌখিনও বটে,—বোধহয় সিদ্ধ এখনও হননি। দিগুঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ক'রে জানলেন এখনও তিনি সিদ্ধি লাভ করেন নি?

তাই শুনিয়া সে বলিল,—এ আমার আন্দাজ, ভুল হতে পারে,—তিনি কাকেও আমল দেননা কিনা, তাইতো ভালো বুঝা যায় না। গেলে আপনি তাঁকে দেখে-শুনে হয়তো বুঝতে পারবেন।

ঐ সাধুর কথা কল্পনা-জল্পনায় সারাদিনটা বেশ কৌতূহলের মধ্যে কাটাইয়া, শেষে বৈকালের দিকে চলিলাম সাধু দর্শনাকাঙ্ক্ষায়।

মধ্যবয়সী, চক্‌চক্‌ করিতেছে ঘোরতর কালো কোঁক্‌ড়া চুলের রাশ, মাথায় সোজা সিঁথি, ক্রীমকলার সিল্কের চাদর জড়িয়ে-পরা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মূর্তি, ঘন ভ্রূযুগের নীচে জ্বলজ্বল করিতেছে কতকটা ভাষা ভাষা চক্ষু, কামানো গোঁফ দাড়ি, মনে হইল যেন বৈষ্ণব মূর্তি। দুই হাত বুকের ওপর আবদ্ধ, কুটিরের সামনেই পায়চারি করিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই উৎসাহিত হইয়া,—আসুন, আপনার সঙ্গেই কথা কইতে চাইছিলাম,— বলিয়া তাড়াতাড়ি একখানা কম্বলের আসন দেখাইয়া দিলেন। আর একখানি আসনও পাতা ছিল, আমি বসিবার পর তিনি নিজ আসনে বসিলেন। তাঁর সহজ ভদ্রতা আমাকে প্রথমেই আকৃষ্ট করিল। মনে হইল, যেন তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আমি একটু সংশয়াকুল মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার সঙ্গে কথা কইতে চাইছিলেন? আজ প্রায় একমাসের উপর হয়েচে আমি এখানে.—আপনার কথাতো শুনিনি।

তিনি বলিলেন,—আরে বসুন, বসুন, তামুক-টামুক, কিছু রঙ্গের অভ্যাস আছে নাকি? রং অর্থে নেশা। কথায় একটু পূর্ববঙ্গের টান। আমি বলিলাম,—

না, না, তামাক চুরুট চাইনা; এখনও বঞ্চিত আছি ও রসে,—আপনি খাননা. যদি অভ্যাস থাকে, তাতে শান্তির কোন ব্যাঘাত ঘটবে না আমার।

তিনি বলিলেন,—আমারও ওসব নেই তবে এখনকার দিনে বিশেষতঃ তন্ত্রের ক্ষেত্রে ওগুলি অভ্যর্থনার অঙ্গ কিনা তাই, — যাক্‌ আপনার গৃহস্থাশ্রম কলকাতায় তো,—ঐরকম যেন শুনেছিলাম বিপিন ঠাকুরের কাছে।

কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানা বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে—আশ্চর্য্য হইয়াই দেখিলাম,—পকেট হইতে কালো মলাটের একখানি পুরু নোট বুক বাহির

করিয়া লিখিয়া লইলেন, বলিলেন,—কি জানেন কখন কার দ্বারা কি কাজ হয় জানা তো যায় না, হয়তো আপনাকে দিয়েই কোন বিশেষ কাজ হতে পারে, কি বলেন ?

সাধুজীকে তো বেশ ঘোরতর বিষয়ী মনে হইতেছে,—এমন একজনের কথায় সায় দিতে মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। তাঁহার মনোমত উত্তরটা বাহির হইল না, এমন কি আমার মুখে কোন উত্তর আসিল না। কেবল মাত্র চাহিয়াই রহিলাম তাঁহার মুখের পানে। কিন্তু তাঁর সঙ্কোচের কোন বালাই নাই,—তিনি ছাড়িবার পাত্রও নহেন, এই বলিয়া আমায় উত্তর দিতে বাধ্য করিলেন যে,—আমার কথাটা কি এমন অসঙ্গত ঠেকেছে,—কখন কার দ্বারা কি কাজ হয় কে জানে,—একথা কি অস্বীকার করেন ? অথবা—এর মধ্যে কিছু মিথ্যে আছে নাকি ? নৈয়ায়িকের উত্তরে বলিতেই হইল, কথাটা যথার্থই, মিথ্যা নয়।

তাই বলুন ;—যাক্ আমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহস্থ না হোলে আমাদের তো চলেই না, তাই আমাদের অভাব-অভিযোগ তো তাঁদেরই দেখতে শুনতে হবে। কোলকাতার উপেন সাউ মশায়কে চেনেন ? মস্ত বড়লোক, শ্যামবাজারে খুব বড় কারবারী, লোকের দায়-আদায়-এর দিকে মহা-লক্ষ্য তাঁর ; —আর ধর্মভাবও তেমনি, জ্ঞানও অসাধারণ,—অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আমি বলিলাম,—এখন আসল কথাটা যদি আমায় শুনিয়ে কৃতার্থ করেন। শুনিবামাত্রই তিনি আবার আরম্ভ করিলেন,—হাঁ তা বলছি, আপনার পিতা আছেন শুনেছি। তিনি হাইকোর্টের উকীল না ব্যারিষ্টার,—কি যেন ? আমি বলিলাম, না তা নয়,—তিনি একজন কেরাণী মাত্র। আমার কথা শুনিয়া তিনি একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন তা হাইকোর্টের ক্লার্ক যাঁরা, মফঃস্বলের একজন বড় অফিসার-লোকের মতই ক্ষমতা তাঁদের কে না জানে একথা।

দেখিলাম, আজ আমার এই সুন্দর বৈকাল মাটি। আলাপের প্রথমেই একটা অপ্রীতির ছাপ পড়িয়া গেল মনের মধ্যে, এখন কেমন করিয়া অব্যাহতি পাইব ? নির্বাক রহিলাম। জানিনা হয়তো মনের অগোচরেই, হা ভগবান, এই কথাটি আক্ষেপের মতই বাহির হইয়া গেল আমার মুখে।

তিনি—আপনি ভগবান মানেন ? আমার ধারণা ছিল আপনারা জ্ঞান-মার্গের লোক, লেখাপড়া শিখেছেন।

আমার কেন যে দুর্মতি হইল, তর্কে লাগিয়া গেলাম ;—উপায়ও ছিলনা। মনে হইল, ইঁহার কথা মানিয়া লইলে অন্যায় হইবে, তাই,—আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনি মানেন না, তবে আপনি কিসের সাধু, কোন উদ্দেশ্যে, কি নিয়ে ভজন-সাধন করেন একবার বৃন্দাবন একবার কামাখ্যা আশ্রয় করে ?

তিনি দৃঢ় উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া এবং বক্র হাসিয়া বলিলেন,—যে বস্তু নাই, যাকে মানাবার জন্য এতগুলো মিথ্যার অবতারণা করতে হয়,—যে বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ, এখনও পর্য্যন্ত প্রমাণ হোলনা যার অস্তিত্ব, নির্বিবাদে তাকে মানাটা মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া নয় কি ? কামাখ্যা ও বৃন্দাবনে থাকার কথা বলচেন ? এই দুই জায়গায় আমার মন শরীর ভাল থাকে।

আপনি শঙ্করাচার্য্যেরও ওপরে যান দেখছি ? এতবড় বৈদান্তিক তিনিও ভগবান, বিষ্ণু, শিব, মানতেন, নারায়ণও মানতেন। দেবদেবী সব মানতেন. আপনি মানেন না—সুতরাং ধন্য।

শুনিয়া তিনি বলিলেন, পরিহাস করছেন দেখি, আপনি কলকাতায় বাবু কিনা?

আমি বলিলাম,—সবাই সব কাজের উপযুক্ত নয় জানেন তো? তর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই আর আপনাকে পরাস্ত করবার কথা বোলে লজ্জা দেবেন না; তা ছাড়া আমি জিজ্ঞাসু মাত্র।—যেটুকু বলে ফেলেছি সেটা আমার দুর্বলতার ফলেই, একথা মনে করে লজ্জিত হচ্ছি, এখন আমায় অব্যাহতি দিতেই হবে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অতি অদ্ভুত সাধু—দেখি, এ একটা টাইপ,—এমন একজনের পাল্লায় আগে কখনও পড়ি নাই। খপ্ করিয়া আমার ডান হাতখানি ধরিয়া তিনি, বসুন, বলিয়া আবার বসাইলেন। যে কারণেই হোক ইহার পর জোর করিয়া চলিয়া যাওয়া আমার অভদ্রতা মনে হইল। ভাবিলাম, শেষটা কি হয় দেখাই যাকনা কেন,—সব কাজের সমস্তটাই যে মনোমত বা প্রীতিপ্রদ হইবে এমন কি কথা আছে? যাইহোক, এখন তিনি আবার আরম্ভ করিলেন।

আচ্ছা, বলুনতো, ফুল চন্দন বিল্বপত্র, তুলসী দিয়ে বিগ্রহ মূর্তি, শালগ্রাম পূজা করা,—তারপর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে শীতল দেওয়া, শেষে নিজেরাই প্রসাদ পাওয়ার নাম কোরে সেগুলি খাওয়া, ভগবানের নামে ঐ ভাবের উপাসনায় আপনার জ্ঞানের উন্মেষ কখনও হতে পারে? অথচ যাঁরা এইভাবে উপাসনা করচেন তাঁর সংসারে যত রকমের স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এসব নীচ কাজে দিবারাত্র নিযুক্ত আর প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে ভগবান ছাড়া কথাই নেই তাঁদের মুখে; এসব ভণ্ড আচার আপনি সমর্থন করেন?

আমি বলিলাম,—ঐ সকল কর্ম যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পন্ন হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনার কি বলবার আছে?

তিনি বলিলেন,—বেশ বলেছেন, তারপর?

তারপর? আমি বলিলাম, যাঁরা বলেন,—শিবোঽহম্,—আমিই ব্রহ্ম, আমি আত্মা, আমি অদ্বিতীয়, অথচ তাঁরা যদি সর্বক্ষণ আত্মসুখ-ভোগের জন্য অর্থের পিছনে দিবারাত্রি যাপন করেন, স্বার্থবুদ্ধি ও বিষয়-কামনা যাদের এতটা প্রবল তাদের আপনি সহ্য করতে পারেন?

তিনি বলিলেন, আমরা ব্যবহারে যা কেন করিনা, ব্রহ্মতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্ব যে সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা চরম তত্ত্ব সে বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে? আদর্শ যে আদর্শই।

আমি বলিলাম,—ভগবৎভক্ত বা ঈশ্বরবাদীরাও তো ঐ কথাটা বলতে পারেন?

তিনি যেন একটু বিরক্তিপূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাবেই বলিলেন,—কি বলছেন আপনি? মানুষের মূর্তিতে ঈশ্বর কল্পনা, আর তত্ত্বজ্ঞানের চরম অদ্বৈততত্ত্ব একই কথা,—একথা আপনি বলেন? স্বীকার করেন?

আমি বলিলাম, এটিতো শেষ কথা, অদ্বৈতজ্ঞান চরম তত্ত্ব! আপনিই ভেবে দেখুন তাহলে কথাটা সেই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট,—উঁচু নীচু বা ছোট বড় নিয়েই তর্কে এসে দাঁড়াল? কিন্তু তার মীমাংসাও তো শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ধর্মে নিজ মুখের বাণীতে দিয়ে গেলেন;—তিনি কি বলেননি যে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই তো ব্রজের ব্রজেন্দ্র সুন্দর; আসল তত্ত্বই তো রূপকের মধ্যে ঢাকা,—

সাধক নিজের সাধনা দিয়ে নিজ নিজ অধিকার হিসাবে উপলব্ধি করে নেবে ; এখানে তর্কের অথবা নিজ মত প্রতিষ্ঠার অবসর কোথায় ?

তিনি। আপনার যে দেখি নারদীয় ভক্তি ?—

আমি বলিলাম,—যথার্থই সে বস্তু পেলে জীবন সার্থক মনে করতাম।

তিনি। আসল কথা কি জানেন, ঐ ভাববাদীরাই ধর্মের সর্বনাশ করেছে, এসব নিয়ে অশিক্ষিত মূর্খ চাষা-ভূষোরাই চলবে, ভদ্র শিক্ষিত সমাজে ঐসব এখনকার দিনে অচল। হরি সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয় একথা শিক্ষিত লোক বলবে ?—এ্যাঁ—সে কেমন ঈশ্বর ?

আমি। সর্বাধিক সভ্যতার মুখোশ ঢাকা পাশবিক বা মানসিক দুর্বলতার মূর্তিমান প্রতীক যারা তারা শিবোহম বলে এটাও কি অত্যন্ত অদ্ভুত নয় ?

শুনিয়া তিনি উপেক্ষার ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

আর আমার কিছু বলবার নাই, এখন আমায় বিদায় দিন, নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই—বলিয়াই আবার আমি উঠিলাম।

তিনি—তা পারবোনা ; আমি আজ আপনাকে পেয়েছি, হয় প্রীতিতে বাঁধবো, না হয় একেবারে অশ্রদ্ধার আস্পদ হয়ে থাকবো। এখন বলুন, আপনার ধর্মসম্বন্ধে আসল বক্তব্যটা কি ? আমি বলিলাম, তা আপনার নাম শুনে জানতে এসেছিলাম আপনারই কাছে ? তিনি বলিলেন,—আমার এতদিনের গভীর ধর্ম-সাধনা, অভিজ্ঞতাই যখন আপনি নাকচ কোরে দিলেন তখন আপনি কি আর সহজে ধরা দেবেন ? ঈশ্বর অবতার, নারদীয় ভক্তিতে আপনার বুঝি বিশ্বাস ? হঠাৎ গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু মনে করবেন না যেন।

আমি—আপনার আত্মশক্তি যেমন সহজেই আপনাকে অদ্বৈততত্ত্বে গভীর-ভাবে সমাহিত করেছে, আমার দুর্বল অস্তিত্বে তা সম্ভব হয়নি ; শ্রীগৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারকল্প পুরুষের জীবন এবং ধর্মাচরণ গোড়া থেকেই প্রভাবিত করেছে আমাকে। একথা বলতে কোন সঙ্কোচ নেই। আমার প্রকৃতিগত দুর্বলতাই এখানে।

তিনি—দেশের এতবড় সর্বনাশ বুদ্ধদেবের পর আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি ; তাঁর প্রচারিত ধর্মবোধ, সর্বধর্মসমন্বয় বার্তা সর্ব-প্রদেশের মধ্যেই সর্বজনীন দুর্বলতা এনেছে ; হয়তো বা শেষ দিকে একটু ধর্মমোহ কাটাতে সহায়তা করছিল এই ইংরাজ-রাজত্বে ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তিতে কিন্তু রামকৃষ্ণ এসে সে পথটাও একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে গেলেন।

আমি—আচ্ছা, এরপর ধর্মের নামে সমাজনীতির চর্চাটা বন্ধ করলে হয়না, এভাবে এ প্রাচীন কামরূপের মধ্যে আপনার মত একজন বৈদান্তিক মর্ডান সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়তে হবে এ কল্পনা আগে করিনি।

শুনিয়া তিনি যেন একটু গৌরববোধ করিলেন ;—একটু হাসিয়া বলিলেন,—এখানে সাধু, ধর্মপ্রাণ কাকেও পেয়েছেন ? কাকেও পাবেন না, এখানে যা পাবেন সবই সেকেলে পচা তান্ত্রিক নর্দমা-ঘাঁটা সাধু, গতানু-গতিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে। সাধু এখানে কাকে বলবেন ?

তৎক্ষণাৎ বলিলাম, কেন, আপনাকে ?

তিনি—রহস্য করচেন দেখছি ? এবার তাঁর এই ভাবের মন্তব্য শুনিয়া অন্তরে ব্যথিত হইলাম, কিন্তু তবুও আমি উমাপতি বাবার কথা বলিলাম। তাঁকে কি আপনি সাধু বলেন না ?

ওহো, যার সঙ্গে ঐ এলোকেশী আছে তো? বুড়ো বয়সে মেয়েটাকে বেশ হাত করেছে। কি রকম মনে হোল দুজনকার সম্পর্ক?—

সেটা আপনার কাছেই তো আমার জানবার কথা, আমি তো নতুন এসেছি এখানে, কেমন করেই বা জানবো?

মিস্টিরিয়াস,—সাধারণ লোকের সঙ্গে লোকটার ব্যবহার ভাল, মধ্যে মধ্যে এখান থেকে সরে যেতে হয় তাঁকে নিয়ে,—তখনকার কথাই তো বিশেষ—

আমি উঠিয়া পড়িলাম, আর বসিব না।—এখন আমি যেতে পারি বোধ-হয়?

তিনি—দেখুন, আমি এখানে নতুন আসিনি, উমাপতি কৌল যতদিন এখানে আছেন আমি ঠিক ততদিন না হোক তার কাছাকাছি হব নিশ্চয়—এখানে আছি। আপনার চেয়ে বেশী জানি আমি তাঁকে, এটা স্বীকার করেন?

আমি এই ধারণাই করিলাম যে,—নিজ দম্ভ অহঙ্কারে রাঙ্গানো মন লইয়া বাবাজী, প্রথম হইতেই হয়তো সযত্নে উমাপতি বাবাকে তফাৎ করিয়া রাখিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে নাই কাজেই যথার্থ পরিচয় ঘটিবে কোন সূত্রে? এক তীর্থে থাকিলে কি ফল? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হইল নিজের জ্ঞান বুদ্ধির দম্ভই এক্ষেত্রে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে এমন একজন মহাসাধুর সঙ্গ-সংযোগে। গৃহীলোকের এ ভুল মার্জনীয় কিন্তু একজন সাধুরও ঐভাবের ভুল?

আমি বলিলাম—তাতে আমার বিশেষ কিছু লাভ বা লোকসান নেই,—আপনার পায়ে ধরে বলছি আমার প্রতি কৃপা করে নেগেটিভ ভাবগুলো ছেড়ে যাতে আমি কিছু লিখতে পারি এমন কিছু বলুন, দোহাই আপনার।

এইবার তিনি আসনে স্থির হইয়া বসিলেন,—তারপর বলিলেন,—দেখুন, ধর্ম-জিনিসটার মত জটিল বিষয় আর কিছুই নেই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ও-জিনিসটাকে বুঝে থাকে। হয়তো আপনার সঙ্গে কোন কোন বিষয় আমার মত মিললো সেই পয়েন্টেই দুজনে আমরা এক মত, কিন্তু সকল পয়েন্টে কখনই এক হতে পারিনা। যে বলে ধর্মবস্তু সম্প্রদায়গত, তাকে ভূগোল পড়ানো উচিত আর দুনিয়াতে যত মানচিত্র আছে দেখানো উচিত—

মানচিত্র দেখানো উচিত কেন?

এটা আর বুঝলেন না, তাদের ভগবান বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অনন্ত শক্তিমান জ্যোতির্ময় ঈশ্বর বলে মূলে একজন, যাকে আদর্শ বলছিলেন আগে, সে রকম একজন মূর্তিমান দেবতা আছে তো? তার মূর্তির চেয়ে দেশের মানচিত্রগুলি অনেক বেশী প্রত্যক্ষ সত্য এইজন্য যে, যত দেশে যত মানুষ সমাজ আবার সংখ্যায় তত সংখ্যক ভগবান কল্পনা, বিপুল পৃথিবী দেখে ভুল ভাঙ্গতে পার; নিজ দেশেও যেমন নরনারী, বাইরের সমাজও তেমনি বিপুল এই ধারণা স্থির হলে পর তাদের চৈতন্য হবে।

আমি সংকল্প করিলাম যতক্ষণ থাকিব আর কথা কহিব না। আমার গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—আপনি ভাবচেন বুঝি, কি আপদের ভোগেই পড়েছি, নয় কি?

কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না, বলিলাম, সত্যই বলেছেন।

তিনি বলিলেন, আসুন এবার স্বরূপ কথা কওয়া যাক কেমন?—আপনি তো বুঝতেই পাচ্ছেন আমার বৈদান্তিকতাটা আসলে ভণ্ডামো?

আমি—তা ঠিক না হলেও এর মধ্যে আপনার অন্যান্য ধর্মে বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয়টা আছে।

চমৎকার একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন—যদি বলি আমি বৈষ্ণব?

তাহলে আমি বলব পরিহাস করছেন। আর কোন কথা না কহিয়া তিনি ঘরের মধ্যে গেলেন, অল্পক্ষণেই একটি হার্মোনিয়াম, নূতন, সযত্নরক্ষিত, ঝকঝকে সুন্দর যন্ত্রটি আনিয়া আপন আসনের সম্মুখে রাখিলেন, তারপর স্থিরাসনে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, তারপর কিন্নরকণ্ঠে গান ধরিলেন। এমন এক সুন্দর বৈষ্ণব মূর্তি তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল যাহা কথায় বলিবার নয়। অনেকটা কলিকাতায় গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বোধহয় সর্বজন-পরিচিত সেই শচীনন্দনের মতই দেখিতে হইল। কলিকাতায় গোড়ীয় বৈষ্ণব সভায় প্রায় অধিবেশনে তাঁর গান শুনিতাম, এবং বহুবারই শুনিয়াছিলাম এবং মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কলিকাতার গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের উৎসবে বা ভাগবত পাঠের আসরে শচীনন্দনের মুখে যিনি কীর্তন শুনেন নাই তিনি এক অপূর্ব সুযোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। যাহা হউক এখন তিনি গাহিলেন—

গোরা করুণাসিন্ধু অবতার,
নিজ নামে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি,—ভক্তজনে বিলাইল হার।

এই গানই আমায় মুগ্ধ করিয়া রাখিল। শিশুকাল হইতেই গানের আকর্ষণ আমার মধ্যে সহজ এবং সর্বকালেই বর্তমান; তা ছাড়া গান হইল আমার সাধনার অঙ্গ। এখানেও বেশীর ভাগ সময় একলা থাকিলে গানেই কাটিয়া যায়, আর অতীব আনন্দে এবং অবলীলাক্রমেই দিনগুলি আমার কাটে।

গানখানির পর আমার দিকে চাহিয়া তিনি আর কিছুই না বলিয়া আবার একখানি পদ আরম্ভ করিলেন,—

এমন সুধা-মাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেচে,
ও নাম একবার শুনে আমার হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে।
আমি কতবার তো শুনেছি ও নাম
(হরিবোল, হরিবোল) কখন তো আমার এমন হয়নি পরাণ,—
এখন কি জানি কি এক দিব্য আলোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে॥

এ গান কাশীর দণ্ডী স্বামী প্রকাশানন্দের। শ্রীচৈতন্যে আত্ম সমর্পণের পর তাঁহার তখনকার ভাব লইয়া রচিত। শুনিলে রোমাঞ্চিত হয় শরীর, আনন্দাশ্রুর কথায় কাজ নাই।

॥ ২২ ॥

এই গান দু'খানির পর যন্ত্র রাখিয়া,—জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন এবার বিশ্বাস হয়েছে তো —আমি বলিলাম, একটা অদ্ভূত নাস্তিকের অভিনয় করলেন কেন প্রথম থেকে?

আমার আপন ধর্মের গুহ্য কথাটা কেন যাকে তাকে বলতে যাব? তাছাড়া

বেশ লাগেনা কি? বিপরীত আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে একবার ঝালিয়ে নিতে? আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমি বলিলাম,—বোধহয় ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ আছে যার, তার সঙ্গে প্রাণ খুলে সব কথা তো চলবেনা,—তাই প্রথমেই আমায় একটু পরীক্ষা—নয় কি? তিনি বলিলেন,—ঠিক বলেচেন,—গোড়াতেই একথা জানা দরকার যে, নিশ্চিতভাবে বা নিঃসংশয়ে যাঁর চিত্তে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণিত তার সঙ্গেই না এসব আলোচনা চলতে পারে? আমি বলিলাম,—বেশ হয়েছে, ভগবৎবিশ্বাসী হতে হবে এইতো আপনার কথা? তা বুঝেছি, এখন বলুন,—অনুগ্রহ করে—জীব ও ভগবানে আসল সম্বন্ধের কথা। যখন আমরা দুজনেই ভক্তিমার্গের কথাই কইচি আর যখন শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের উভয়েরই আদর্শ ধর্মোপদেষ্টা—তখন আর গোপন করবার কিছুই নেই আশা করতে পারি?

তিনি—ওসব কথা তো তিনি পরিষ্কারই বলেছেন; জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল,—জীব আর ঈশ্বরে নিত্যসম্বন্ধ বেদান্তেরও ঐ কথা তো—

আমি কহিলাম,—এমন নিত্য আনন্দময় সম্বন্ধ জীব ভুলে গেল কেমন করে?—কি ভাবে,—কে তাকে ভুলিয়েছে? এই প্রশ্ন আমার মধ্যে সবার বড় প্রশ্ন,—আমায় বুঝিয়ে দিন,—এই নিত্য সম্বন্ধের বিকৃতি হ'ল কি করে যে জীব তাঁকে অস্বীকার পর্য্যন্ত ক'রে বসলো?

তিনি—এইখানেই মায়াবাদের কথা, মায়াতে পড়েই জীব ঈশ্বরবিমুখ হয়ে গেল।

আমি—ঐখানে তো কথা, মায়া আবার কে? সে ছিল কোথা, এলো কোথা থেকে, কেন এলো?

তিনি—মায়া তাঁরই প্রকৃতি, তাঁতেই ছিল, কেমন করে এবং কেন যে এলো এর মধ্যে হাজার মাথা খুঁড়লেও জীব তা ধরতে পারবেন। কেন? বর্তমান অবস্থায় জীবের মন স্থূল ভোগমুখী, পদার্থ-তান্ত্রিক বলে। জ্ঞানের বিকাশ হলে বুদ্ধি যখন কারণমুখী হবে, তখনই আত্মানুভূতির সুযোগ আসবে। এসব সাধারণ বিকৃত অহংবুদ্ধিতে ধরবার ছোঁবার যো নেই যে, দাদা! এটা তো বুঝতে পারেন? ইচ্ছা ক'রে বোকা সাজবেন না যেন।

তা বুঝিতে পারি, কিন্তু আমাদের মন বুদ্ধি তো নিরস্ত হতে চায়না, এটাও স্বভাবের নিয়মেই ঘটে তো? আমাদের অস্তিত্ব তো তিনি ছাড়া নয়?

সত্য কথা। তাহ'লে এটাও বুঝতে হবে যে, যাদের বুদ্ধিতে সূক্ষ্মতত্ত্ব-

সকল ধারণার অধিকার হয়েছে তাদেরই ঐ তত্ত্ব জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে থাকে। তবে এটুকু সাবধান হতেই হবে, যেন মস্তিষ্ক (ব্রেন) দিয়ে এসব তত্ত্ব বুঝতে যাবেন না। তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কেন, বলুন তো খুলে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠসহায় দুটি বস্তু আছে, যারা আমাদের সংসার-জীবনের প্রত্যেক কর্মে গতি দিচ্ছে। সে দুটির একটি মন, অপরটি বুদ্ধি—স্থূল কথায় —একটি মস্তিষ্ক, অপরটি হৃদয়। যা কিছু বাস্তব সম্বন্ধমূলক ব্যবহার স্থূল, সূক্ষ্ম,—সকল কিছুই মস্তিষ্ক বা মনধর্মের অন্তর্গত, সেইজন্য দর্শন শাস্ত্রে মনকে জড় বা বস্তুতান্ত্রিক বলা হয়েছে কারণ জড় ছাড়িয়ে চৈতন্যের অধিকারে মনের গতি নেই,—সে-রাজ্যে বুদ্ধি বা হৃদয়ের গতি। হৃদয় বলতে য়্যানাটমি-ক্যাল হার্ট বা হৃদ্‌পিণ্ড যেন বুঝবেন না, বন্ধু। ওটা পার্থিব স্থূল, সূক্ষ্ম-মন এবং অপার্থিব ভাবানুভূতির কেন্দ্র হোলো হৃদয় ; জীবের এই হৃদয়ই তাঁর (অর্থাৎ ঈশ্বরের) লীলার আসন।

তাহলে ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু তার সঙ্গে মনের সম্বন্ধই নেই ?

তাইতো, নিশ্চয়ই নেই। তত্ত্ব ত ধর্ম হৃদয় বা চৈতন্য রাজ্যের অধিকারের কথা, তাইতেই তো, হৃদয়কমল মধ্যে নির্বিশেষম নিরীহম্—বলেছে। মনে করুন ঐ দুটি মোক্ষম মন্ত্র আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পেয়ে থাকি, তাই নিয়ে আমরা এ সংসারে বেসাতি করি। বাস্তব ভোগের প্রভাব তো মানব-মন থেকে সহজে যাবার নয় বরং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে প্রত্যেক জীবের মধ্যে। মন-প্রধান মানবের, মনের দাসত্ব কত জন্ম করতে হয় তার হিসাব কে করেচে ? প্রকৃতির রাজ্যে বিষয় ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনের প্রভাব ক্ষীণ, বিষয় ভোগে বিরাগ আন্তরিক হলে পর তখন, বুদ্ধি বা চৈতন্যের রাজ্যে গতি পাওয়া যায়, —উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসমূহ হৃদয়ের ক্ষেত্রেই অনুভব হতে থাকে, তার চরম পরিণতি আত্মতত্ত্বে, তখনই জন্ম মরণ ভীতি ভ্রংশি সৎ চিৎ স্বরূপম্ সকল ভুবনবীজম্ ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে। তবে প্রত্যক্ষ এবং মানবজন্ম সফল হয়। এই আর কি, বুঝলেন তো ?—

আমি—তা হলে এবার,—যাদের বুদ্ধি চৈতন্যমুখী হয়েছে তাদের ভগবান লাভের পথ সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের স্থির নির্দেশ বলুন।

তিনি—যদি চৈতন্যদেবের নির্দেশ জানতে চান তাহলে আপনাদের ঐ সংজ্ঞা (সর্বময় ঈশ্বরনির্দেশক শব্দটি) একটু বদলাতে হবে। ভগবান বা পরমেশ্বর না বলে ওখানে কৃষ্ণ বলতে হবে তাঁকে।

আমি—এই দেখুন এখানে একটা ধোঁয়ার সৃষ্টি হল ;—যদি কেউ ভগবান পরমেশ্বর বা রাম, শিব বলে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন—আপনি তো গুরু নানকের, রামানুজ শঙ্করা-চার্য্যের মত বা তুলসীদাসের মত জানতে চাননি,—চেয়েছেন আমাদের চৈতন্য-দেবের মত জানতে, কাজেই তাঁর আদর্শ সংজ্ঞা হোল কৃষ্ণ ; তাঁর প্রচারিত ঐ বস্তুটির নির্দেশ তাঁর মনোমত নামেই নিশ্চয় করতে হবে তো ? তিনি ঐ কৃষ্ণকেই জীবের পরমাশ্রয় বলে নির্দেশ করেছেন আর একমাত্র সহজ প্রেমের উদ্ভব হ'লেই তাঁকে ধরা যায়, অন্য কোন সূত্র নেই তত্ত্বটি ধরবার। —এই সত্য প্রকাশ করে আমাদের ধন্য করেছেন। তাঁর ধর্মতত্ত্ব এইভাবেই বলতে হবে।

তাহলে দয়া করে আর একটু বলুন,—ঐ সহজ প্রেম কেমন করে জন্মাবে যাতে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্তি বা লাভ ঘটবে? শুনিয়া তিনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন, সে হাসি আর থামেনা—চক্ষে জল আসিয়া গেল সেই হাসির ধমকে, আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। একটু থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত হাসি কেন?

তিনি বলিলেন,—ও বস্তু জীবের সাধ্য নয় দাদা,—মাথা ঘামিয়ে, যোগ-জপ-তপ, যত রকমের যৌগিক ক্রিয়া-কৌশল মানুষের জানা আছে তা সব প্রয়োগ করলেও না,—তাই কৃষ্ণ-কৃপা লাভ সহজ প্রেমের সাধ্য এই কথাই বলছিলাম। আর হাসি এলো এই ভেবে—যারা মনে করে বুদ্ধিবলে বা কঠোর তপস্যায় তাঁকে মেরে দেবো, তাদের পক্ষে ও দরজা দৃঢ় বন্ধ।

প্রেম বুঝতে পারি, কিন্তু সহজ প্রেম বলছেন কেন?

ওটা আপনিই উৎপন্ন হয় তাই সহজ,—চেষ্টা করে করা যায়না;—তাই.—

অর্থাৎ আপনা থেকেই যার হ'ল তারই হবে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ, যার সেই প্রেম নাই সে বঞ্চিত থাকবে এইটি বিধান?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই? তাইতো ঐ কারণেই বস্তুটি দুর্লভ বলেছে। মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।

তবে কি ঐ বস্তু গোঁসাই, বাবাজীদের একচেটে সম্পত্তি হয়ে থাকবে, যাঁরা চৈতন্য দেবের কৃপা পেয়েছেন, সাঙ্গপাঙ্গো বলে প্রচারিত, তাঁদের বংশধরদের মধ্যে?

যদি ঐ প্রেম তাঁদের কারো জন্মে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা পাবেন,—না হলে নয়।

কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে মন্ত্রদীক্ষার ব্যাপারে আছে তো দেখেছি, গোসাঁই গুরুরা তো দীক্ষা দিয়ে থাকেন, গুরুর প্রাপ্য আদায় করেন তাও দেখেছি ও শুনেছি—তান্ত্রিক গুরুর মতই তাঁদের ব্যবহারক্রম।

তাঁদের ঐ সাধারণ ব্যবসায়ী গুরুর পর্য্যায়ে ফেলে বিচার করবেন। তবে বংশের একজন ভগবানের কৃপা লাভ করার ফলে বংশ ধন্য হয়, সেই বংশের মধ্যে একটা সততার প্রভাব অথবা উচ্চ ধর্ম-সংস্কৃতির ছাপ থাকে,—এটা তো সর্বত্রই আছে, মানুষ-সমাজে। এক দরিদ্র বংশে কোন কৃতী, ধনবান জন্মালে অথবা কোন সাধারণ গৃহস্থের সংসারে অসাধারণ ব্যক্তি জন্মালে বংশ উজ্জ্বল হয় আর তার বংশধরেরা সেই নাম ভাঙ্গিয়ে খায়, এটা তো এখানকার সর্বত্র সামাজিক বিধি, নয় কি? তাই যদি হয় তাহলে যে বংশে একজন ভগবৎ-ভক্ত বা তত্ত্বদর্শী জন্মালো তাঁর বংশধরগণ কি উন্নত হবেনা সমাজের একদল সেইভাবে ভাবিত লোকের চক্ষে? আর সেই সমাজেই কি তাদের প্রসিদ্ধি দেবেনা? তাতেই তাদের সুখ যে। তারপর,—এইখানেই একটি গুহ্য আছে, সেটি বলব কিনা আপনাকে,—একটা প্রশ্ন।

এই যে বলছিলেন, মাত্র প্রেম, সহজ প্রেমেরই অধিকার এই কৃষ্ণপ্রেম লাভের ব্যাপারে? তবে আবার গুহ্য কি?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবে মন্ত্রশক্তি বলে একটা কথা আছে তা জানা আছে কি? না থাকে তো শুনুন বলি,—পূর্বাপর গুরু-পরম্পরায় মন্ত্র চৈতন্য,—অর্থাৎ মন্ত্রকে আত্মশক্তিতে চৈতন্যময় করার প্রথা ভারতের ধর্মমার্গের একটি পরম আবিষ্কার।

তাহলে আমাদের উপায় ?

সেই কথাই বলুন,—পথে আসুন। এই কথাটিই যথার্থ রিয়ালিষ্টিক। তিনি বলিলেন,—বেশ,—এখন, এটাতো অনুভব করেছেন যে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত রাধা তত্ত্ব, অর্থাৎ রাধার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এ তত্ত্ব ধারণা বা অনুভূতি জীবের সাধ্য নয় অর্থাৎ অহংসর্বস্ব জীবের চেষ্টার দ্বারা হবার নয়,—তাহলে আমার কী হবে ? এখন একটু ভেবে দেখুন আমি বলতে কি বুঝায়—এই যে আমি,—সে কে ?

জীবতো নিশ্চয়ই ; তবে হয়তো একটু উন্নত। কি হিসাবে, কতটা উন্নত ? এই হিসাবে যে, হয়তো তার মুমুক্ষুত্ব এসেছে, সংসারের সুখ দুঃখ আর ভালো লাগেনা ; বৈরাগ্য ভাব এসেছে তার,—অর্থাৎ কি ভাবে এই গতানুগতিক স্বার্থপর কামান্ধ জীবনধারা থেকে কেমন করে মুক্তি পাব ? এই ইচ্ছা প্রবল হয়েচে। এই যখন কথা তখন তাদের জন্যই সখীভাবে সাধন, অথবা সখী-অনুগামী হওয়া। কারণ, প্রথম অবস্থায় রাধার নিকট তুমি পেঁছিতেই পারনা আর রাধার নাগাল না পেলে রাধানাথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কারণ তুমি জীব অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার জীবভাব—আর জীবধর্ম বর্তমান, ততক্ষণ রাধাভাব বা রাধাতত্ত্ব বস্তুতঃ তোমার অগোচর, সুতরাং দুর্জ্ঞেয়। আবার রাধা হলেন কৃষ্ণময়, ভাষা বা শব্দগত অর্থ দিয়ে অথবা মস্তিষ্কের সাহায্যে তত্ত্ববোধ যেমন অসম্ভব,—দুর্জ্ঞেয় জটিল হয়েই থাকে, তেমনি যতক্ষণ তোমার মধ্যে জীবভাব অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চন মোহ বর্তমান, রাধাতত্ত্ব তোমার বোধ—আয়ত্তের বাইরে। জোর করে বুঝতে গেলে নরনারী সম্ভোগের ভাব আরোপ, অন্য পরে কা কথা, এমন কি বৈষ্ণব সাধক সাধারণের পক্ষেও এই রাধাতত্ত্বের তুল্য বিপদ বা বিভ্রান্তকর ব্যাপার, তথা অধঃপতনের পথ আর নাই। আর সেই কারণেই সহজিয়া ধর্মের আজ এতটা অধঃপতন। রাধা কখনই একটি নারী নয় অথবা কৃষ্ণ তোমার মত একটি পুরুষ নয়। রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত ব্যাপারে পরিণত করার বিপদ সাধারণ নয় ; —চিন্তাশীলতা থাকতেও সাধন রাজ্যের নিম্নস্তরের মানুষ তাই আজ বঞ্চিত হয়ে আছে এই মহান তত্ত্বানুভূতির ক্ষেত্রে।

তাহলে এ প্রশ্ন আসে, রাধা কি বস্তু, রাধা কে ? কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য অবলম্বন নেই যার। কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁর অন্য বোধ নাই। সেইজন্য রাধা পরমতত্ত্ব কৃষ্ণের প্রকৃতি। আধার-তত্ত্বই রাধা, রাধাতেই কৃষ্ণের বিহার বা অধিষ্ঠান, ভাষায় বলতে গেলে রাধা হলেন একটি আধার তাতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারো স্থান নেই। কৃষ্ণতেই পূর্ণ রাধা, একমাত্র রাধাতেই তিনি ঘনীভূত। তারপর অধিকারীর কথা, কারণমুখী বুদ্ধি হয়েছে যার,—সত্ত্বগুণাশ্রয়ী যে বৈরাগ্যবান পুরুষের তুচ্ছভোগ্য বস্তুর অসারতা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, কেমন করে এই সীমাবদ্ধ পদার্থ-তান্ত্রিক কর্ম-জগতের প্রভাবমুক্ত হওয়া যায় এই ভাবের মুমুক্ষুত্ব এসেছে যাঁর, তিনিই অধিকারী।

জীবের প্রথম মানুষ হয়ে সমাজে আসার কথা জানেন তো ?—প্রথমে তো সে থাকে প্রায় পশু। মানুষ সমাজে, নানাস্তরের সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাত, জন্ম-মৃত্যু, নানা কর্মফল ভোগের পথেই ক্রমে ক্রমে সোজা বা সরল হতে থাকে। কত জন্মের পরে সে স্থিতধী হয়ে সমাজের কল্যাণ-চিন্তার উপযুক্ত হয়।

আমি বলিলাম, আপনার আসল বক্তব্য, জীব-প্রথমাবস্থায় বুদ্ধির দিক দিয়ে স্থূলবুদ্ধিই থাকে, এই তো ?

তিনি বলিলেন, শুধু বুদ্ধি নয় মনেও সে কম পশু থাকেনা,—আপনার সমাজের চার পাশেই অজস্র দেখতে পান না, তাদের হিংস্র ব্যবহার, দুর্দমনীয় পশুবৃত্তির দৌরাত্ম্যে আপনার সময় সময় শান্তি-স্বস্তিতে সমাজে জীবন যাপন তো প্রায় অসম্ভব করে তোলে ? অথচ চেহারায় বা পোশাক পরিচ্ছেদে তারা ঠিক মানুষ নয় কি ? এখন সাধারণতঃ জীব কৃষ্ণবিমুখ অর্থাৎ জীববুদ্ধি কারণমুখী হয়না। কারণমুখী বলতে,—প্রথমে তার মাত্র নিজ ভোগ-সুখেতে কেন্দ্রস্থ থাকে স্থূল স্বার্থপর বুদ্ধি, তারপর ক্রমে মানুষ সমাজগত সূক্ষ্ম-বুদ্ধি তারপর এই যে বিশাল সৃষ্টি, দৃশ্য-অদৃশ্য পদার্থের সঙ্গে মানবের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ অশান্তিকর উৎপত্তি বা কারণের দিকে যখন বুদ্ধি তার প্রসারিত হয় তখনই তাকে কারণমুখী বুদ্ধি বলে, যে বুদ্ধি কারণরূপে এক স্রষ্টাকে আশ্রয় ক'রে সারা মানুষ সমাজে প্রসারিত হতে থাকে। তাকেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে ধর্মবুদ্ধি বা কৃষ্ণে রতি বোলেছে। তাহলে প্রথমে কৃষ্ণবিমুখ, তারপর ক্রমে জন্ম জন্মান্তরে তার ধর্মবুদ্ধি বা কৃষ্ণে রতি জেগে ওঠে এই কথাই শাস্ত্রে বলেছে। সেই ধর্মের চরম বিকাশ প্রেমধর্মে, সে অবস্থার যে অনুভূতি বা চরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার তা হ'ল রাধা তত্ত্বে। এই হোল সার কথা।

আমি বলিলাম—আপনি রাধার কথা একটু বিশেষ করে বলুন।

তিনি। রাধা, কৃষ্ণের প্রিয়তমা পরমা প্রকৃতি, তাঁরই হৃদয়-আঁধারে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। তারই রূপক হল বাসকসজ্জা, বিরহপীড়িত অবস্থায় আত্যন্তিক আকর্ষণ, যাতে কৃষ্ণ না মিলিত হয়ে পারেন না। রাধা-টান কৃষ্ণকে টানেন যে টানে কৃষ্ণ যুক্ত না হয়ে পারেননা, অচ্ছেদ্য ভাগবতী নিয়মেই আধেয়কে আধারের ঐ টানেই এনে উপস্থিত করায়। মূলে কিন্তু আধেয় কখনই আধারশূন্য হননা ; মায়ার বশে কখনও কখনও আধারের মনে হয় যেন আধেয় কৃষ্ণ বুঝি আপন আসনে নেই। আবার তাই বিরহ, অর্থাৎ কোথা অনুসন্ধান, ফলে আবার মিলন। এই ভাবে তাঁদের আত্মলীলা চলতে থাকে। এই যে একবার মিলন--পরক্ষণেই বিরহ, জীব কি করে ধারণা করবে সে মিলনে কি হয় ? বিরহ-ব্যাকুলতাই বা কি ? আসলে বিচ্ছেদই জানিয়ে দেয় যে মিলন কি বস্তু। মিলন-তত্ত্ব নির্বাক তন্ময়তায় উপলব্ধি হয় মাত্র, তা হোলো—অনুভূতির পরা-কাষ্ঠা। জীব, রাধা, কৃষ্ণ, এই তিনটি বস্তু, বোধের মধ্যে যদি ধরা যায় তাহলে কি দাঁড়ায় ? পৃথিবীর মানুষ, শক্তি বা প্রকৃতি আর ঈশ্বর,—এই ত্রিতত্ত্ব মূলে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ,—স্থূল ভাষায় এইটুকু বলা যায়। মানুষ অরূপ ভাবতে পারেনা, চায়ও না রূপ ছাড়িয়ে যেতে। তাই তার রূপ-কল্পনা।

অরূপের রাজ্য, কল্পনায় অনুভব করতে পারেন ? জ্যোতিও তো রূপ, --জ্যোতির আকার, বিস্তার আছে তো ? সেই জ্যোতি যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তাহলে আকার থাকবে কি আশ্রয় করে ?

প্রথম প্রথম চক্ষু বুজিয়ে যে জ্যোতি দেখা যায় তা দিনমানে সূর্যের আলোর প্রতিক্রিয়া। সূর্যালোকের যে স্মৃতি আমাদের মধ্যে চিত্রিত থাকে অন্ধকারের মধ্যে তা নানা বর্ণের নানা আকারেই ফুটে ওঠে। ঐ সকল প্রকৃত বর্ণানুভূতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেটে গেলে, তখন ইষ্টে তন্ময়তা থেকে যে জ্যোতিদর্শন হয় তাই যোগীদের ব্রহ্মজ্যোতি।

আর বৈষ্ণবদের ? সেই গোলক যে ক্ষেত্রে হরি গোলকবিহারী। ঐভাবে সেখানে জ্যোতির্ময় রূপ। রূপাপিপাসুরা সেখানেও রূপ দেখেন। অবশ্য শেষে তা আর থাকেনা, চৈতন্যে সব কিছু লয় হয়ে যায়। প্রবর্ত্তক অবস্থায় ঐকান্তিক সাধনের ফলে,—সাধনে মগ্ন হলে অনেক কিছুই দর্শন হয়। সে দর্শনের বর্ণনা ভাষায় করতে গেলেই মিথ্যা হয়ে যাবে, ভুল হয়ে যাবে। কারণ প্রতিপাদ্য শব্দের অভাব আর ভক্তি শাস্ত্রে যে সকল শব্দ সাধক, ভক্ত বা যোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে তা নিয়ে সাধারণ সাহিত্যিক অথবা বহিরঙ্গ কাকেও বুঝিয়ে তদ্ভাবে ভাবিত করা যায়না।

একথা সত্য ;—পরমহংসদেবও নরেন্দ্র, রাখাল, রামচন্দ্র, বাবুরাম, প্রভৃতি প্রিয়তম ভক্তদেরও বলতে পারেননি। সবাই বসে বসে তাঁর সমাধি দেখেছে কিন্তু তিনি যে কি দেখচেন বা কি অনুভব করচেন তা চেষ্টা করেও বলতে পারেননি। শ্রীচৈতন্যদেবেরও তো ওই ভাব হতো ?

রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতি, মাধবী প্রভৃতি এদের নিয়ে গম্ভীরায় রাত্রে যখন তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণ আবার কৃষ্ণভাবে রাধার রসাস্বাদন করতেন সে বিষয়টি লোকসমাজের ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ একজন বৈরাগী, যতই বুদ্ধিমান, যতই বিষয়বিমুখ সৎভাবের মানুষ হোননা,—জপতপাদি বাহ্য সাধনের মধ্যে যতই অগ্রসর হোননা কেন এমন কতকগুলি তত্ত্ব এবং অনুভূতির কথা আছে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার মধ্যে যা সর্বসাধারণের কাছেও যেমন, ঐ শ্রেণীর সাধকগণের কাছেও তেমনি প্রচারের বিষয় নয়। প্রথমতঃ অনধিকারীরা তা কোনমতেই তৎ-তৎ-স্বরূপে নিতে পারবেনা। তার অনুশীলন না হলে নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করে না নিলে তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা বৃথা। পিয়োরিট্যানিক স্পিরিট নিয়ে, সব কিছু অনুভূতি গোপন না রাখার যে ধারণা, সবকিছুই প্রচার বা হাজির করার য়ুরোপীয় নীতি, অনধিকারী অধিকারী ভেদ বিবর্জিত হয়ে সব কিছু প্রকাশিতব্য এটা ভারতীয় ঈশ্বরবাদ বা ধর্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বা রসতত্ত্বের বিষয় নয়। যেমন ধরুন, বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি থেকে শুরু ক'রে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈততত্ত্ব বিবরণ—সাধারণ ভাষা দিয়ে যতটা সম্ভব প্রকাশ করা গেল, অধিকারী বিচারক্ষম পণ্ডিত যারা, উচ্চতত্ত্ব সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণনিপুণ, নির্মলচিত্ত, যাঁরা উপযুক্ত তাঁদের বুঝালেন, তাঁরাও যতটা সম্ভব বুঝলেন। তারপর অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তু বা পরমাত্মার স্বরূপের কথা যখন এল তখন কি ভাষায় বুঝাবেন ? তখন চুপ করতেই হবে। যাকে বুঝতে হবে তাকে তৎতৎভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, সেইভাবে ব্যাকুল হয়ে মগ্ন হতে হবে তবেই বুঝবেন ঐ সত্য পরম অব্যক্ত, মানুষ ভাষায় কখনও তাকে প্রকাশ কর্ত্তে পারবেনা। যিনি ডুববেন তিনি পাবেন।

॥ ২৩ ॥

আমি—তাহলে ধর্মতত্ত্ব, জন্ম মরণশীল মানবের যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার,—যতই আলোচনা করা যায়, যতদূর মানুষের জ্ঞানানুভূতির কথা চলে তাতে এই কথাই কি প্রমাণিত হয়না যে, আসলে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা ঈশ্বর উপলব্ধি সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ব্যাপার ?

তিনি—এ বিষয়ে সংশয় কোথা ? আত্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি—এই অসংখ্য

জীব-সমাজে দল বেঁধে হবে কেমন করে যখন বর্তমান কালে, জগতের সকল মানবসমাজ স্বার্থ, ভোগ আর সাম্যহীন ধনমদে অচৈতন্য? অবশ্য মাত্রাভেদ আছে। এমন নির্মল চরিত্র, নির্মল মন, বুদ্ধি, ভোগ রতি ও স্বার্থপরতাশূন্য মহাপ্রাণ মানুষ কোথা? তাই না কোনো সমাজে, কোনো কালে একজন যথার্থ সত্যসন্ধ,—আপ্ত পুরুষ জন্মালে তাঁর জীবিতকালে কিছুটা, তারপর তাঁর তিরোভাবের পর বহুলাংশেই মানুষ সমাজের টনক নড়ে ওঠে, হায় হায় একজন দিব্য ভাবের মানুষ এসেছিলেন আমাদের মধ্যে—আমরা এতটা স্থূল-বুদ্ধি যে তাঁকে বুঝতেই পারিনি? তখন হায় হায় পড়ে যায়,—অতঃপর অনুসন্ধান চলে কি রেখে গেলেন তিনি;—কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কার করে নিজ জীবনে আচরণে ও ব্যবহারে প্রকাশ বা প্রচার করে অপরিশোধনীয় ঋণে আমাদের আবদ্ধ করে গিয়েছেন। মানব-সমাজের গতি কতক অংশে চিন্তাশীলতার পথে তাঁর ক্রিয়া-কর্ম ও উপদেশ বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু দেখা গেল ঐ মহাপুরুষের আবিষ্কৃত তত্ত্ব তাঁর ভক্ত বা শিষ্য একশ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হলেও তাদের মধ্যে বিচার এবং অনুভূতির তারতম্য অগাধ;—শেষ পর্য্যন্তই তাঁরাই প্রকাশ বা প্রচার করলেন যে, আমরাও সম্যক ধারণা করতে পারিনি তাঁর উপলব্ধ সত্য। তবে আমরা তাঁর কৃপা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, কেউ কেউ তাঁর ব্যবহার্য্য জিনিস পেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সৃষ্টির ক্রম দেখলেই তো বুঝতে পারা যায়, প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন—মন, বুদ্ধি, ব্যবহার, আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যন্ত। তাই,—সব কাজ দল বেঁধে হতে পারে, চুরি, ডাকাতি, ঘর জ্বালানো, নারীধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড স্বার্থত্যাগ যা কিছু,—রাজ্যজয়, রাজ্য-প্রতিষ্ঠা, সভা-সমিতি, ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যা কিছু স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত, এসব দল বেঁধে হয়। মানুষের দল সকল সমাজেই বাঁধা—সৎ ভাবে সমাজ নীতিতে বাঁধা, গার্হস্থ্য ধর্মের মূলকথা কেউ কারো ক্ষতি করবে না সবাই সুখে থাকার ব্যবস্থা—এসব দল বেঁধে হয়। স্বার্থসম্পর্কীয় সব কিছুই এই নীতির অধিকার পর্য্যন্ত সম্প্রদায়গত হতে পারে, —কিন্তু যেখানে নরনারী সম্পর্কে প্রীতি বা প্রেমের জন্ম—তা দলবদ্ধ বা সম্প্রদায়গত নয়, সেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার,—আর অধ্যাত্ম ধর্মও ঠিক তাই। সৃষ্টি,—ঐকান্তিক প্রেমের ফল—সৃষ্টির মূল প্রেম,—কাম হ'ল প্রেমের বিকৃতি।

আমি—সত্য, এই প্রেমের ব্যাপার, মানুষ যৌবনে যে বস্তু প্রথম উপলব্ধি করে—সেই প্রেম কামজ হলেও—তার মধ্যেও কতটা ত্যাগ,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—ওর মূল কিন্তু অধ্যাত্ম। সুস্থ যৌবনে, পুরুষ মানবের যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম, শক্তি ও স্বাস্থ্যপূর্ণ মন ও বুদ্ধির সকল ক্রিয়া স্ফূর্তিজনক হয়, তখনই নিজ সত্ত্বার উপর প্রবল আস্থার ফলে জীবনের সার্থকতা অনুভব,—অপ্রতিহত সাফল্যের আশা—বীর্য্য ও মাধুর্য্যে চিত্তে তার স্বর্গের আস্বাদ কিন্তু,—সাধারণ মানুষ—প্রকৃতির গতিতে তার জীবনধারা যে বাঁধা—তার অধিকার অনুসারে ভোগ প্রবৃত্তির আকর্ষণে নারীসঙ্গিনীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ফলে ঘটে যায় মিলনের যোগাযোগ। স্থূল-বুদ্ধি যাদের তারা সৃষ্টি বুদ্ধির পথেই চললো, কারো বা স্বার্থজড়িত কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হোলো; —হয়তো মন থেকে অনেক কিছু আবর্ত সৃষ্টি করলে কর্ম উপলক্ষে, তারপর যার উচ্চ জন্ম, অভিজ্ঞতার অধিকারে মনের সীমা ছাড়িয়ে বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করে এই যৌবনের সূত্র ধরেই তার অধ্যাত্ম চৈতন্যের স্ফুরণ হতে

গেল—ফলে তার শক্তি তাকে জ্ঞান বা মুক্তির পথে নিয়ে গেল প্রকৃতির নিয়মেই ;—যার শেষ পরিণতি তত্ত্ব জ্ঞানেতে বা ইষ্ট লাভে।

জগতে এখনও ঐ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি। এই তত্ত্বের আলো ধর্ম জগতে এক সময় প্রকাশিত হবেই। তাই না এই সকল অপার্থিব সম্পদ লুপ্ত হয়নি, এখনও ভারতের ভাণ্ডারে ধরা আছে। অধ্যাত্ম বিদ্যা বা বিজ্ঞান গুরুমুখী। অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বা গুরু যাঁরা, নিজ ইষ্ট লাভের পরে উপযুক্ত অধিকারী পেলে তাকে ঐ সিদ্ধমন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন এবং তা দিয়েও থাকেন যার ফলে, অধিকারী সাধকের পক্ষেও সেই তত্ত্বলাভ সম্ভব হয় ; এই ধারা আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনেও এর প্রমাণ আছে। ঈশ্বর পুরী গোসাঁইয়ের কাছ থেকে ঐ সিদ্ধমন্ত্র যখন তিনি পেলেন, ঐ সিদ্ধ-মন্ত্র তাঁর ক্ষেত্রে পড়ে কি ভাবের ক্রিয়া উৎপন্ন করেছিল তা, তাঁর জীবন ইতিহাসের পাতায় ধরা আছে। সেই দাম্ভিক নিমাই পণ্ডিতের কি অদ্ভুত অবস্থান্তর ঘটলো, প্রেমের উন্মাদনায় তাঁর গার্হস্থ্য জীবন ওলোট-পালট করে তাঁকে জাতি-কুলের মোহ কাটিয়ে পথে বার করে ছেড়েছিল। তারপর তাঁর জীবিতকালের মধ্যে কত শত সহস্র ব্যক্তি বা অধিকারী ভক্ত তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে ঐ মন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের শক্তি সঞ্চার তত্ত্ব, এ জগতের কতবড় এক বিস্ময়, ভবিষ্যতকালে বিজ্ঞান জগতের আলোচনার জন্য তোলা রইল। থাক সেকথা এখন, সেই মন্ত্র-শক্তি তাঁর কাছ থেকে সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে—তারপর তাঁদের উপযুক্ত শিষ্য-পরম্পরায় পেয়েছেন। এখন শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, ঐ সিদ্ধমন্ত্র যাঁরা যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ, সেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি যে নিশ্চিত হয়েছিল সে বিষয়ে আর সংশয় কোথায় ? এ সকলও প্রকৃতির সহজ নিয়মেই ঘটেছে, প্রকৃতির যে নিয়মে সৃষ্টির সকল কর্ম চলছে,—জীবের ঈশ্বরানুরক্তিও প্রকৃতির সেই সহজ নিয়মেই ঘটে থাকে।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলি অথবা স্বয়ং ভগবান যাই-ই বলিনা কেন, আমাদের এই মানুষ সমাজে সাধারণতঃ প্রকৃতির যে নিয়মে মানব চৈতন্যের মধ্যে ধর্ম বিবর্ত্তন ঘটে তাঁদের মধ্যেও দেখতে পাই সেই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। অবতার-কল্প, সিদ্ধ মহাপুরুষ বা পরমহংস যাঁরা, সবার জীবন লক্ষ্য করে দেখবেন, লোক সমাজের গোচরে হোক বা অগোচরেই হোক, সাধন-ক্রম তাঁদের ঠিকই আছে—চিরদিনের ছক-বাঁধা প্রকৃতির নিয়মানুগ হয়েই তাঁদের প্রত্যেককে চলতে হয়েছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা পরমার্থতত্ত্ব গুরুমুখী,—সুতরাং দেহধারী মাত্রই ঐ নিয়মে তাদের অগ্রগতি। তাই আমরা এটা সর্বত্রই দেখতে পাই যে, অন্তরের মধ্যে কোন জীবের গতানুগতিক এই মিথ্যাপূর্ণ সংসারে অরুচি ; এবং সত্য-লাভের জন্য একটা ব্যাকুলতা এলে তখন কোন তত্ত্বজ্ঞ বা আপ্তপুরুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তারই ফলে, তার সত্য নির্ণয়ের পথে গতি নির্দ্ধারিত হয়, চিত্ত স্থির হয় এবং সিদ্ধিলাভের পথ সুগম করে।

আমি বলিলাম,—এই তথ্য আমি পূর্বে কয়েকটি মাহাত্মার কাছেও পেয়েছি আর এ সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। এখন এইটুকু বুঝিয়ে দিন, সকল মন্ত্রই কি একই বস্তু নির্দেশ করে ?

তিনি বলিলেন,—তা কি করে হবে ? প্রথম স্বরবর্ণ আকার থেকে ব্যঞ্জনবর্ণের হ কার পর্য্যন্ত বর্ণমালা সবই তো মন্ত্র,—কেতাবে ছাপা হয়ে গেছে,

কে আপনি তার মধ্যে থেকে ইচ্ছামত নিয়ে সাধন করে দেখুন না প্রত্যেকটি কি বস্তু নির্দেশ করে? শুনিয়া আমি বলিলাম,—কথাটা হয়তো আমার ঠিক বলা হয় নি;—আমি এইটিই জানতে চেয়েছিলাম,—সকল বীজ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু কি একই?

তিনি—তা কি করে হবে? গোড়ার কথাটা এখানে ভুললে চলবে না, ধরতে হবে, তা এই যে, যেমন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বীজও তাই। আর এটাও জানা উচিত যে, বীজ হল শক্তি, বীজ কখনও ঈশ্বর বা ভগবান বা ব্রহ্মবস্তু নয়। সাধকের প্রকৃতি অনুসারে বীজের ক্রিয়া,—যেমন ক্ষেত্র অনুসারে বীজের ক্রিয়া, যেমন ক্ষেত্র অনুসারে বীজের কাজ। বীজের শক্তি বলতে এখানে এই বুঝতে হবে যে,—চৈতন্য সিদ্ধ বীজ অর্থাৎ যে বীজ মন্ত্র পেয়ে সাধক নিজ-শক্তিতে চৈতন্য সঞ্চারিত করেছেন, তাইতেই সে বীজ শক্তিশালী এবং জাগ্রত হয়ে অভীষ্ট ফল দিতে পারে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটি যেমন বীজের মধ্যে সঙ্কুচিত থাকে এটা স্থূল পদার্থ পর্য্যায়ের দৃষ্টান্ত;—যে শক্তিতে একজন অধিকারী বা সাধকের ইষ্টলাভ হবে জাগ্রত বীজমন্ত্রের মধ্যে সেই মহাশক্তি নিহিত আছে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়লেই আমরা তার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। বীজ-মন্ত্রের সাধন ফলে সাধক তাঁর ইষ্ট মন্দির দ্বারে পেঁছে যান,—ঐ দ্বার পর্য্যন্তই বীজমন্ত্রের গতি। তারপর সাধকের ইষ্টলাভ, তত্ত্বলাভ, বা সত্যলাভ তাকে যাই বলুননা কেন, দ্বার ভেদ করে মন্দির প্রবেশ ও ইষ্টের মিলন,—সে কথা সাধকের নিজের ব্যক্তিগত কথা, আমাদের পক্ষে তা একেবারেই অবান্তর। আমরা বাইরে থেকে আমাদের বর্তমান ক্ষুদ্র, ভোগায়তন শরীর মন, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি নিয়ে কিছুতেই সেই পরাবস্থার ইতি করতে পারবো না।

এতটা শুনিয়াও একটু আবদারের ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, কেন আমরা বুঝতে পারবো না?

তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ কোনও কথাই কহিলেন না;—ঠিক যেন আমায় এইটুকু বুঝিবার অবকাশ দিলেন যে আমি কতটা অসংযত-বাক, এবং আমি কি অসংগত প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছি। যখন সত্যই তাঁর এই ইঙ্গিতের মর্ম উপলব্ধি করিলাম, ঠিক তখনই তিনি প্রসন্ন মনে বলিলেন—এটি কি এখনও বুঝতে পারেননি যে,—যে মহাভাগ্যবান, শক্তিশালী আধার, ঈশ্বর তত্ত্ব হৃদয়ের ধারণা করতে চলেছেন যে সাধক, তাঁর শরীর, তাঁর মন, তাঁর সত্ত্বার তখনকার চৈতন্যময় অবস্থা? তাঁর হৃদয় মন, তাঁর সাধন গতিতে. ক্রমে ক্রমে কতটা উচ্চভূমিতে আরূঢ় অবস্থায় ইষ্টমন্দির দ্বার পর্য্যন্ত পেঁছেছেন;—আপনি আমি কি সে অবস্থা কল্পনা করতে পারি? তা যখন সম্ভব নয়;—

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, আর বলবেন না,—আমি অনুতপ্ত।

না, না, সে কথা নয়,—অনুতাপের কথা কেন এখানে? আসলে অধ্যাত্ম বিদ্যার কতকগুলি প্রাথমিক তত্ত্বকথা বড় সহজেই শুনতে পেয়েছেন কিনা তাই আরও তারপর,—তার শেষটা জানতেও কৌতূহল অদম্য হয়ে পড়েছিল, তাইনা মুখে ঐ কথাটা আটকালো না, ফট্ করে ব্যক্ত করতে পারলেন? যদি কখনও সে সৌভাগ্য হয়, সিদ্ধমন্ত্র পেয়ে স্তরে স্তরে ঐ ভূমিতে উঠতে পারেন তখনই ঠিক ঠিক বুঝবেন অবস্থাটি—সত্যিই অনির্বচনীয়। এই জন্যই মহাপ্রভু

ইষ্ট-গোষ্ঠীর কথা,—সমপর্য্যায়ের সাধক বা ভক্তদের মধ্যেই রাখতে উপদেশ করেছেন। না হলে ভাব নষ্ট হয়। বোঝেন তো?

আমি সসংকোচে বলিলাম—তান্ত্রিকদের সাধন কিছু কিছু দেখেছি,—সেই জন্য আমার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের, (তাঁর গম্ভীরার অন্তরঙ্গ স্বরূপ রামানন্দ বা শিখি মাইতি এঁদের কথা নয়) রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, প্রবোধানন্দ, লোকনাথ, ভূগর্ভ, রঘুনাথ প্রভৃতি যাঁরা যথার্থ তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ও বৈষ্ণবভাবে উদ্বুদ্ধ এবং বৃন্দাবনের মোহান্ত বোলে পরিচিত তাঁদের সাধন-প্রণালী কি ভাবের জানতে একটা আন্তরিক প্রবল বাসনা বহু দিনই আছে,—আজ আপনাকে পেয়ে যেন বাধাহীন সহজ আকাঙ্ক্ষা ঠেলা দিচ্ছে, ফলে এতটা নিঃসঙ্কোচ হতে পেরেছি ; তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন?

আমার কথা শুনিয়া সরল মৃদু হাসিতে আমার মনের সকল সঙ্কোচ, তখনকার সকল গ্লানি উড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—যখন নিশ্চয়ই বুঝেছেন বলে নিশ্চিত বুঝিয়ে দিলেন তখন আর অনিশ্চিতের সম্ভাবনা কোথা?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রধান আমাদের মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ বলে যে সব মহাত্মার নাম করলেন,—তাঁরা প্রত্যেকেই ভুবনপাবন,—মহাশক্তির আধার, তাঁরাই তো বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক। তাঁদের বৈরাগ্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংযম, এককথায় তাঁদের সাধন জীবন,—তা অসাধারণ—অভিনব, পূর্বাপর প্রচলিত সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং সাধন-প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য,—তাঁদের ইষ্ট রতি, তাঁদের দৈনন্দিন সাধনাবস্থার জীবন-যাপন প্রণালী এমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যময়, —তারপরে সিদ্ধির পরবর্তীকালে,—মনোহর প্রচার-পদ্ধতি আলোচনায় মন পবিত্র হয়। তাঁদের সকলকার জীবন-কাহিনী সংগৃহীত হলে অপর একখানি মহা-ভারতের মতই আশ্চর্য্য গভীর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। আধুনিক ধর্মরাজ্যে তাঁদের সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কিছুই মহাশক্তির উৎস। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকেই উদ্ভাসিত একথা এখনকার পণ্ডিতবর্গ সবাই জানে কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীগণের গ্রন্থ-সকলের মধ্যে এমনই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, না হলে ভাগবতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করাও সহজ হোতনা, তারপর শ্রীচৈতন্যের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের গূহ্য তত্ত্বও বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পরবর্তী সাধক-সমাজেরও অগোচরেই থেকে যেতো। তবে শ্রীমৎ ভাগবতের উপর ভিত্তি হলেও শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমধর্ম সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব আচার্য্যদের গ্রন্থ, সাধারণ শিক্ষিত যারা, প্রেম ভক্তি বা হৃদয়ের উৎকর্ষহীন এখনকার বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতজনের জন্য নয়,—বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বপিপাসু উচ্চ হৃদয় না হলে কেমন করে সেই দুর্লভ তত্ত্বসকল একজনের বোধগম্য হতে পারে?

আমি মুগ্ধ হইয়াই শুনিতেছিলাম,—আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের মধ্যে এতবড় একটি বিরাট ধর্মবিপ্লব ঘটিয়া গেল,—মাত্র ছয় শত বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে,—এখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজের এই মহান সাহিত্য সম্পদের উপর লক্ষ্যই পড়ে নাই।

তিনি বোধহয় আমার মনের কথাটি বুঝিয়া বলিলেন ;—একটা কথা জেনে রাখুন,—এমন দিন শীঘ্রই আসচে যখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়,—দেশের প্রচলিত ধর্ম ও তার সাধন প্রণালী, প্রাচীন কালের এবং তখন থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত পরিণতির ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অনুসন্ধানে

তৎপর হবেন। তার ফলে সারা জগতের ধর্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হবে। তার প্রমাণ আমরা এখনই পাচ্ছি,—আপনি এটা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, বর্তমান শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই এদেশের বিশেষতঃ তন্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধিৎসা অসাধারণ ভাবেই প্রকাশ পাচ্চে। এ দেশের শিক্ষিত যাঁরা, আমাদের কি ছিল ; এইটিই মূল প্রশ্ন তাঁদের। দুশো বছর ধরে—এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রাণের তৃপ্তিকর কিছু না পেয়ে, তারপর বর্তমান সভ্যতার নামে মহা-পাশবিক প্রজাধ্বংসের আকার প্রকার দেখে এক গভীর নৈরাশ্যের ফলেই উদ্ভূত এই অনুসন্ধিৎসা, একথা আমার দৃঢ়মতেই ধারণা জন্মেচে দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে। পাশ্চাত্যেও মনীষীগণ তাঁদের নিজ দেশের সভ্যতার রূপ দেখে নিরাশ হয়ে—কোথা শান্তি কোথা প্রীতি বোলে ব্যাকুল প্রাণে চারিদিকেই লক্ষ্য করছেন। কোথা সেই সত্যের আলো, যে আলো এই সভ্যতার ঘোরান্ধকার থেকে মানুষ-সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে,—এই তথ্যই এখানকার সকল সমাজের প্রজাবর্গের,—কেমন করে এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, সমাজনীতি তথা আত্মরক্ষার নামে পরপীড়ন নীতি থেকে বাঁচা যায়, এই হয়েচে সমাজের আকাঙ্ক্ষা এবং অভীষ্ট বস্তু।

॥ ২৪ ॥

আমি বলিলাম,--এক কথায় জীব ও ঈশ্বর, ভক্ত ও ভগবান অথবা মানুষের সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টার যা কিছু গভীর সম্বন্ধ থাকতে পারে তা ভাগবত-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেই দেখিয়েছিলেন ;—শ্রীচৈতন্য তারই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন মধুর অথবা কান্তভাবের মধ্যে। আবার তারই চরম অভিব্যক্তি হল রাধাভাবে ;—কেমন এই তো শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মূলতত্ত্ব ?

আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছুই বলিলেন না ; তাঁহার ঐভাব দেখিয়া আমি একটু সংকুচিত হইয়া পড়িলাম, যেন দম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে মনে হইল, তৎক্ষণাৎ সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলিলাম ; অতীব গুহ্য ঐ পরম তত্ত্ব গভীরতম বস্তুর প্রতি লক্ষ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ;--শক্তি না থাকলেও মোটা-মুটি কথাটা জেনে রাখা ভালো, এই মনে করে বলছিলাম।

এইবার অখিলবন্ধু বলিলেন—মহাভারতের যুদ্ধ, তারপর বৌদ্ধ-ভারতের ইতিহাস সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রধর্মে প্রভাবিত ভারত,—তারপর তারই ব্যাভিচারের মুখে শঙ্কর, রামানুজ, মাধবাচার্য প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে ভারতে নানা শাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যায় সমাজকে শান্ত রাখা তারপরও কত কত ঐতিহাসিক রাজাধিরাজের অধিকার, এই দীর্ঘকালে ভারতভূমির সকল সমাজের মধ্যেই কত রকমের ওলট-পালট হয়ে গেল—বৈষ্ণবধর্ম বেঁচেছিল, রামায়ৎ সাধু, উত্তর ভারতের ও গৌড়ীয় বিষ্ণু উপাসক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়টি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু মহাভারতের কেশব অথবা ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীমৎভগবত-গীতার উপদেষ্টা পার্থ-সারথির কথা ভারতের হিন্দুরা প্রায় ভুলেই ছিলেন দীর্ঘকাল,—কেবল তখন স্মৃতির মধ্যে মথুরায় কেশবজী, দ্বারকায় দ্বারকানাথ বিট্ঠল আর উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দির, এর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্বটুকু কোনরকমে বজায় ছিল। সুতরাং ব্রজ বা বৃন্দাবন আর ব্রজেশ্বরকে মনে রাখতে পারেনি সাধারণ অসাধারণ

ভারতের নানা ধর্মমার্গের মানুষ, মধুর কৃষ্ণ নামটি পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল। মন্দিরস্থ বিগ্রহের পূজাপাঠও গতানুগতিকভাবে চলছিল ; তার মধ্যে প্রাণ ছিল না। তারপর বৌদ্ধ ভারতের শিল্প-গৌরবময় যুগের শেষদিকে উত্তরাখণ্ডের উপর সেই যে বর্বরতা, বিজাতীয় বর্বর দস্যুদলের চরম অত্যাচার হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন, ধ্বংসের উন্মাদনা ; বিশেষতঃ শিল্পমহিমায় উজ্জ্বল মথুরার কেশব মন্দির তৃতীয়বার ধ্বংসের পর আর নির্মাণ হল না, বৃন্দাবনও তো অজগর বনের পর্য্যায়ে পড়েছিল। মথুরার সে রত্নমণ্ডিত কেশব মন্দিরের আর কোন চিহ্নই নাই। আসল কথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়টাই অত্যন্ত সংকুচিত, আর ঐ প্রেমের ঠাকুরটি কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ ঐকান্তিক ভাব ও ভক্তিপ্রবণ পুরীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে, ধুক্‌ধুক্ করছিলেন। এমনই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হলেন। যথাসময়ে ঐ পুরীসম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে সিদ্ধমন্ত্র নিলেন। তারপর ঐ কৃষ্ণ নামটিতে এমনই চুম্বকশক্তি প্রয়োগ করলেন—যার ফলে বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া তর তর ধারায় আরম্ভ হয়ে গেল ; নামের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম-শক্তির পরশে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো দেশের বৈষ্ণব সমাজ ; চব্বিশ বৎসরের যুবা মূর্তি,—তিনি এসে দাঁড়ালেন সবার সামনে, সারা ভারতের মুহ্যমান ধর্মসমাজ তাঁকে প্রত্যক্ষ করলে। তখন তিনি করলেন কি? সবার দৃষ্টি সবলে আকর্ষণ করে ঐ প্রেমের ঠাকুর, জীবের পরম গতি, পরমাশ্রয়, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপের পাদে ফিরিয়ে দিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠলো ভারতের জনগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মূর্তি। তাঁর এই যে প্রভাব, দ্বিভুজ মুরলীধরের রূপ আর কৃষ্ণ নামটির প্রভাব এখনও কিছুমাত্র যে কমেনি তার প্রমাণ শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, এখন পর্যন্ত ভারতের সর্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে শিল্প, কাব্যসাহিত্য ও সঙ্গীতে, হিন্দুজাতির সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র পূর্ণ করে প্রধান পুরুষরূপে জ্বল জ্বল করছেন।

এ গেল একটা দিক,—

তারপর আর একটা দিক,—বৃন্দাবন আবিষ্কার,—সে যে কি কঠিন কাজ, তার হিসাব এখনকার দিনে সম্ভব কি? শুধু এইটুকুই আমরা ধারণা করতে পারি যে, ঐ কাজে গোড়া থেকেই তাঁর মনটি পড়েছিল। সে কর্ম কি সহজ? তখন তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে,—প্রেমের প্রথম জোয়ার,—নবদ্বীপের শ্রীবাসের অাঙ্গিনায়, প্রেমের আলো জ্বালিয়ে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠের ভাবে,—নাটের লীলা চলছে। এইবার পথে বার হবেন কাঁথা করঙ্ক নিয়ে ঐ প্রেমের দেবতাকে সবার গোচরে এনে দিতে প্রেম ধর্মহীন ব্যভিচার-প্রবণ দেশের সমাজে,—ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন চলচে। তখন—সর্বপ্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পেলেন যার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিঃসঙ্কোচ, ভবিষ্যৎ বৈষ্ণব মহাজনদের আশ্রয়,—ধ্যান ও সমাধির স্থান ব্রজভূমি আবিষ্কারের কাজে পাঠালেন। শক্তিসঞ্চার করে তাদের দৃঢ় অনন্যকর্মা এবং উপযুক্ত করেই পাঠালেন। তারা চলে গেল যেন চৌম্বকশক্তি লোহকে টেনে নিয়ে গেল। তাঁদের বৃন্দাবনে উপস্থিতি এবং আমরণ প্রেমমার্গে সাধনের ইতিহাস সাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত। তারপর শ্রীচৈতন্য,—মহাপ্রভু হয়ে সংসার ত্যাগ করে নীলাচলে কাটালেন কিছুকাল ;—তারপর বার হলেন দক্ষিণের পথে। দুই বৎসর ধরে সারা দক্ষিণ হয়ে পশ্চিম ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ, যার নাম বজানো। তীর্থভ্রমণের নাম করে সর্বতীর্থের মধ্যে শক্তিসঞ্চার

করে প্রেমধর্মের সুধায় ভারতের মাটি ও মানুষকে সঞ্জীবিত করে আপনাকে বিলিয়ে এলেন ঐ দুই বৎসর ধরে, কেউ বাদ গেলনা। সে শক্তি সঞ্চয়ের ইতিহাস এখনকার কজনের জানা আছে? তারপর আবার ফিরে এলেন নীলাচলে।

দুই বৎসর পরে যথাকালে স্বয়ং বৃন্দাবন যাত্রা করলেন বারাণসী হয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পথে। বৃন্দাবন এসে যা করবার তা করলেন। কিসের টানে বৃন্দাবন থেকে যে ফিরে এলেন তা তিনিই জানেন, আমরা কেবল এই-টুকুই জানি যে মধ্যপথে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রবোধানন্দ প্রভৃতি এঁদের পাঠালেন বৃন্দাবনে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ছাপ মেরে, তারপর ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি ভুবনপাবন মহাপুরুষগণের আগমন, বৃন্দাবনে নিজ নিজ স্থান নির্বাচন ও গভীর ধ্যানে ডুবে যাবার পালা। তাঁদের সাধন ও সিদ্ধির জীবন জগতের ধর্ম ইতিহাসের মধ্যে অভিনব ও পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। তারপর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৃন্দাবনের সব কিছুই যেন জেগে উঠলো। দেখতে দেখতে লুপ্ত বৃন্দাবন সারা ভারতের প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে গেলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাবহারিক স্মৃতিশাস্ত্র, মহাকাব্য ও দার্শনিক অমূল্য তত্ত্বগ্রন্থসকল, বৈষ্ণব সাহিত্য,—সম্পূর্ণ প্রণয়ন করা হলো, ঐ শ্রীবৃন্দাবনের মাটিতেই,—শেষে গৌড়ের ধন গৌড়ে এসে পেঁাছে গেল—অতীব রহস্যজনক অদ্ভুত নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তারপর আর কি, বাঙ্গলায় তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে মহাকীর্তনের মধ্যে দিয়ে অমরার আবহাওয়ার সৃষ্টি, বাঙ্গলার সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? শুধু বাঙ্গলার কেন, সমস্ত উত্তর ভারত-ভূমি শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে ভরে উঠলো, দেশের হৃদয়ে মনে এক শক্তিময় প্রেমভক্তির উৎস খুলে গেল। সে কথা যাক। এখন এইটুকুই দেখতে হবে যে ঐ আটচল্লিশ বৎসরের জীবনে মূলতঃ কি পেয়েছিলাম আমরা, ধর্মের গুহ্যতম রহস্যের কথা ছেড়ে দিয়ে যে অংশ থাকে তা সবাই কি ধরতে পারবে? বৃন্দাবন আবিষ্কার আর সেই তীর্থের মধ্যে ভুবনপাবন মহাপুরুষগণের যে আবির্ভাব, তাঁদের দান সব কিছুই শ্রীচৈতন্যের নিজ দান। প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসে তুলনাই নাই সুতরাং দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করে শুধুই একটু গভীর-ভাবে ভেবে দেখতেই বলব।

আশ্চর্য্য ব্যাপার;—এই কামাখ্যায় মহাতান্ত্রিকদের অভিচার এবং বীরা-চারের আড্ডায় এমন একটি বৈষ্ণবের সঙ্গের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলাম যে বাবা উমাপতির আশ্রমে যাওয়া কয়দিনের জন্য আমার বন্ধই রহিল। আজ সকালে অর্থাৎ ভোজন-সময়ে নীচে কামাখ্যা মন্দির পার হইয়া পাণ্ডার ঘরে যাইব,—মন্দিরের সামনেই উমাপতি বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি আনন্দে আমায় আলিঙ্গন করিলেন। পিছনে এলোকেশী মাতা ছিলেন। আমি যে কয়দিন যাইতে পারি নাই এ সম্বন্ধে বাবা কিছুই বলিলেন না। কিন্তু এলোকেশী ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন—এবার খুব ভাল, মনোমত সাধুই পেয়েছেন? —বুঝিলাম দিগু ঠাকুর সব ফাঁস করিয়াছেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—জানতেই তো পেরেছেন।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—উনি কার কাছে গিয়েছিলেন—তুমি জানলে কি করে?

জানি, উনি আজকাল অখিলবন্ধুর কাছেই যাওয়া-আসা করছেন।

বাবা বলিলেন,—বৈদান্তিক সাধু,—আমার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। বেশ সরল মানুষ, ওঁর বৃন্দাবনেও একটি আশ্রম আছে না ?

বলিলাম,—হাঁ, আমিও শুনেছি।

বাবা বলিলেন, তোমার শরীরের দিকে একটু নজর রেখো বাবা,—যেন দুর্বল দেখাচ্চে।

আমি বলিলাম,—সত্যই মাথা, গা-গতর বড় ভার ভার লাগে ; যেন জ্বর-ভাব মনে হয় সকালের দিকে।

তিনি আর কিছু না বলিয়া চলিলেন মন্দির মধ্যে, প্রবেশের পূর্বে কেবল আমায় বলিলেন, সাবধান।

এলোকেশী বলিলেন,—সেটা ওঁর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। বলিয়া বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিলেন।—আমিও একটু চিন্তিত হইলাম, সত্যই শরীর আমার ভালো নয়। এখানে আবার অসুখে পড়িব নাকি ?

যথা সময়ে পাণ্ডার বাড়ি গিয়া যথাস্থানে বসিলাম,—গৌরী থালা হাতে অন্ন লইয়া আসিল। ভোজনে বসিয়া গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমায় কি খারাপ দেখাচ্চে ? সে বলিল, হাঁ, আপনি রোগা হয়ে গেছেন, কালো হয়ে গেছেন এই কদিন ধরেই দেখচি। ভাল কথা, একখানা চিঠি এসেছে আপনার, বলিয়া চলিয়া গেল ও ভিতর হইতে একখানি খাম আনিয়া দিল। দেখিলাম বন্ধু মদনমোহনের লেখা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, বাবা মুক্তিনাথের কথা লিখিয়াছে, তিনি আমায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আর যে সব কথা সে তো কেবলই বন্ধুত্বের অনুরোধ,—ঘরে এসে সংসার ধর্ম করো, সহধর্মিণী স্ত্রীকে লইয়া, তাহা হইলেই সবাই খুশি হইবে।

উপরে পৌঁছিলাম, দেখি দিগু ঠাকুর আজ বড়ই ব্যস্ত। তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে, বারকোশে পূর্ণ করিয়া নানাপ্রকার উপকরণ গর্ভগৃহে লইয়া যাওয়া হইতেছে, দুই তিনজন উটকো ভৈরবমূর্তি আমার আসনের উপর বসিয়া মহা স্ফূর্তিতে নানা কথায় ব্যস্ত—দেখিয়া আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। দিগু ঠাকুর আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আমায়, শুনেন—বলিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল মন্দিরের পিছনের দিকে। সে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল,—দেখেন বাবা,—আজ এখানে অভিচার ক্রিয়া হবে ; আপনাকে আগে জানায়ে রাখি, অবশ্য রাত্রে আপত আসনেই শুইবেন, আর ভিতরে ক্রিয়া-কর্ম যা কিছু চলিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অভিচার-ক্রিয়া কি জন্য ? দিগু বলিল,—আমি তো সব ঠিক জানিনা ;—তবে শুনচি যে নীচে একজনের নাকি কঠিন বেরাম পড়েছে তাই—তার জন্যই ক্রিয়া হবে, তাঁর ছেল্যাই সব কিছু খরচ-পত্র করচেন। আমি বলিলাম, অসুখ আরোগ্যের জন্য অভিচার-ক্রিয়া,—এ তো কখনও শুনি নাই। দিগু ঠাকুর, এবার যেন একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিল ;—শুনেছি সে বুড়া মারা গেলে অনেক টাকার মালিক হবেন যিনি, এই-ক্রিয়া-কর্ম করাচ্চেন তাঁর সেই পুত্তুর। নীচে এ-কথা আর কেউ জানেনা, সেখানে বলা হয়েচে যে স্বস্ত্যয়ন-শান্তি হচ্চে।

বৃদ্ধ পিতাকে আপদ-জ্ঞানে লোকান্তরিত করবার ব্যবস্থা শক্তিশালী পুত্রের পক্ষে স্বাভাবিক, বোধ হয় এটা সর্বদেশেই আছে। আমাদের দেশের ইতিহাসের পাতায় বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর আমল থেকে চলে আসচে, কিন্তু সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, ধনবান ঘর-গৃহস্থের মধ্যেও যে এদিকে এটা চলে, তা দেখে মনে হোলো আর বেশী দিন এভাবের চোরা-গোপ্তা পিতৃহত্যার কাজ চলবে না, নাজী অথবা কম্যুনিষ্টরা এসে পড়ল খোলে, এর মধ্যে কাপুরুষ পুত্রেরা আড়াল থেকে যেটুকু পারে করে নিক সমাজের মাতব্বরদের চক্ষে ধুলো দিয়ে। আমার কিন্তু এখনই একটা অস্বস্তি লাগল, একেবারে বাবা উমাপতির আশ্রমের পানেই চললাম তাঁকে জানাতে সকল কথা। গিয়ে দেখলাম তিনি মন্দির থেকে এখনও বার হননি কাজেই আমি অখিলবন্ধুর কাছে গেলাম আর যা কিছু শুনেছিলাম নিবেদন করে মনটাকে হাল্কা করে ফেললাম।

তিনি—বলেন কি? ও কথায় অপনি এত ভাবচেন কেন, মনে বিশ্বাস করেন কি ঐ অভিচার ফলপ্রসূ হবে? ওসব ক্রিয়া-কর্ম ফলপ্রসূ হয়?

আমি বলিলাম, আমার বিশ্বাস হয়। কি জানি একটা সহজ বিশ্বাস আমার প্রথম থেকেই আছে। শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তার সঙ্গে সঙ্গে এই সহজ বিশ্বাসটাও রাখুন যে, এই মেদিনী, এই জীব-সমাজ-সৃষ্টিটা,—শয়তান বা দৈত্য দানবের নয়, এটা ভগবানের জগৎ। তাঁর অভি-প্রায়ের বিরুদ্ধে কারো কাকেও হত্যা সম্ভব নয়। আদ্যশক্তি ভগবতীর সজাগ দৃষ্টি থাকে জন্ম মৃত্যু ও মিলনের ক্রিয়াগুলির উপর—তাতে আর কারো কর্তৃত্ব নেই।

আশা হইল মনে, হয়তো ব্যর্থ হইবে অভিচারকবর্গের কাজ ঐ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে। আমায় চিন্তিত দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, এদের অর্থাৎ এখনকার এই ধরনের তান্ত্রিকদের—অধঃপতনের চরম হয়ে এসেচে। কতটা অজ্ঞান এরা তাই ভাবি;—যে জগদম্বাকে অদ্বিতীয় সৃষ্টি-স্থিতি-নিধন-কারিণী বলে জানচে আবার তাঁকেই পূজায় প্রসন্ন করে নিজ স্বার্থে আর এক-জনের প্রাণ-হননের অনুরোধ করচে, ঘুষ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধি, একথা একবারও তার মনে হোলোনা যে সে ব্যক্তিও ঐ মায়েরই রক্ষিত, সর্বজীব-রক্ষার দায় তাঁরই।

দিন তিনেক বাবা উমাপতির আশ্রমে আর যাই নাই,—অখিলবন্ধুর সংসর্গেই মস্তু হইয়াছিলাম। বৃষ্টি-বাদল ত লাগিয়াই আছে। এই কামরূপে ভুবনেশ্বরীই উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ। এখন জলে জলে মাটি নরম হইয়া নাট মন্দিরের মেঝে পর্য্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে;—গা-গতর বেশ ভারী বোধহয়, মাথাটাও ভার হইয়া থাকে আজ দুই তিনদিনই অনুভব করিতেছি। আজ সকালেই মাথা ভারী, নাক বুজিয়া আছে, বেশ জ্বরভাববোধ হইল; হাত পায়ের প্রত্যেক গাঁটে বেদনা। মনে হইল, আজ সারাদিন কিছু না খাইয়া লঙ্ঘন দিলেই সুস্থ হইব।

আমার বিহারী বান্ধব, প্রভাতে উঠিয়াই রাম রাম করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসিয়া—খবরদারজী, বলিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন;—তার পর বিশেষ ভাবেই আমার মুখের পানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু চিন্তিত মনেই বলিলেন, আঁখতো বহোত লাল হুয়া, তবিয়ৎ কুছ সুস্থ মালুম হোতা কি নহি?

জিজ্ঞাসার ভাবটা সহানুভূতি পূর্ণ, বলিলাম, জ্বর একটু হইয়াছে ; মাথায় বেদনা ইত্যাদি। সে বলিল, বহোত বরখা, আজ বাহার মৎ যাও, ভোজনকা প্রবন্ধ হাম করেগা।

আমি উপবাস করিব বলায় সে বলিল,—নহি জী, পাহাড়দেশ মে উপবাস আচ্ছা নহি, খানাই চাহিয়ে সব বিলকুল ঠিক হো জায়গা, আপ চুপচাপ সোতে রহিয়ে ;—বলিয়া গাঁজা টিপিতে বসিয়া গেল। তার পর দলাই মলাই হইয়া গেলে বেশ চিন্তিত মনেই টানিতে লাগিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেখিলাম।

বেলা দশটা নাগাদ জ্বরটা বেশ ঘটা করিয়া আসিয়া পড়িল। প্রবল শীতবোধ হওয়ায়, পাতা কম্বল গায়ে ঢাকা দিলাম। তখন ধীরনাম বাবা বলিলেন,—আরে আপকো ভি পাকড় লিয়া ;—অব দেখো। গেয়া বরষ হাম পাঁচ মাহিনা শো গিয়া থা। সুতরাং আমিও সারাদিন শুইয়াই রহিলাম। প্রবল জ্বর ছিল, কেমন আচ্ছন্নভাবেই কাটাইলাম। জ্বরে আচ্ছন্ন থাকার মধ্যে যেন সমাধির সুখ আছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কাঁসির ঘণ্টার আওয়াজের রেশ কানে লইয়া জাগিয়া উঠিলাম। দেখি বাবা উমাপতি আমার মাথার শিয়রে বসিয়া। বোধ হয় ইতি-মধ্যে প্রবল বৃষ্টি হইয়া থাকিবে, পায়ের উপর কম্বল ভিজিয়াছে। বেশ ঠাণ্ডা। বাবা আমার মাথায় হাতটি রাখিয়া বলিলেন,—আজ রাতটা কোন রকমে কাটাও, কাল সকালেই জ্বর একটু কম পড়লে, —আমার কাছে নিয়ে যাব। কি বল বাবা,—এখন জ্বরটা যেন বড্ড বেশীই মনে হচ্ছে।

এমন সময় দিগুঠাকুর মন্দির হইতে নির্মাল্য লইয়া বাহির হইল এবং আমার মাথায় ঠেকাইয়া ওখানকার সবারই কপালে স্পর্শ করাইয়া, কাঁকাল বাঁকাইয়া দাঁড়াইল,—তারপর মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—এটা কালাজ্বর না কি, তাই ভাবি। উমাপতি বাবা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—তোমার ভাবনার দরকার কি, নিজের কাজ শেষ করোগে যাও। আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—এখানে থাকা ঠিক নয় ; সকালেই ওখানে নিয়ে যাবো, কেমন !

আমি বলিলাম,—এইখানেই থাকবো, কাজ কি নাড়ানাড়িতে ?

না না, সেটা ঠিক হবে না,—বৃষ্টির ছাট্ আসে, ফুটো টিন দিয়ে জল পড়ে, অসুস্থ অবস্থায় এখানে থাকা মোটেই ভাল নয়।

জ্বরের ধমকে আমার মাথায় একটা রোখ চাপিয়া বসিল,—বলিলাম, না না, আপনার আশ্রমের আরামে আমার কাজ নেই, এইখানেই থাকবো। তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন আমার ঐ দুর্বল মস্তিষ্কের কথা, তাই তৎক্ষণাৎ

বলিলেন,—তুমি এখানেই থাকো কোথাও যেতে হবে না ; বলিয়া আমার কপালে হাত দিয়া দুদিকের রগ টিপিয়া ধরিলেন। আমার এমনই আরাম বোধ হইল, চক্ষু বুজিয়া রহিলাম,—একটা তন্দ্রার মতই অবস্থায় যেন এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম ; আজ রাত্রে এখানে আমাদের কিছু ক্রিয়া-কর্ম আছে ; আজ অমাবস্যা কিনা।

গভীর রাত্রে চারিদিক থম থম করিতেছে, বাহিরে অন্ধকার,—কিন্তু গর্ভ-গৃহের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, ধূপ-ধুনার গন্ধে ভরপুর,—ভুবনেশ্বরীর মন্দির মধ্যে নানা প্রকার শব্দ শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিলাম, কিন্তু চক্ষু বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না। অনেক লোক একত্র ধীর গম্ভীর উদাত্তস্বরে পৃথক পৃথক মন্ত্র পাঠ করিলে যেমন শুনায় সেইরূপ নানা মন্ত্রের সুর এক প্রকার কানে আসিতে লাগিল। প্রত্যেকের স্বর বা সুর আলাদা বটে কিন্তু সবগুলি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে, যখন চক্ষু এক এক বার মেলিতেছিলাম তখন ঐ সুরের অপরূপ স্বয়ং-উজ্জ্বল বর্ণাভা লক্ষ্য করিতেছিলাম।

সুরের একটা বর্ণ, সংমিশ্রিত রূপ আছে শুনিয়াছিলাম এখন তাহাই দেখিতে লাগিলাম। গোলাকার, ডিম্বাকৃত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, নানা আকারের বর্ণচ্ছন্দ মিলিত সুর-ধ্বনি তরঙ্গাকারে, শ্রেণীবন্ধ অবিচ্ছিন্ন, এক বিচিত্রছন্দে বায়ু মণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল শূন্য পথে। নানা বর্ণে উদ্ভাসিত সুরের স্রোত চলিতেছে, বিচিত্রছন্দে উপরদিকেই তাহার গতি। অতীব নির্মল ঐ শব্দময় বর্ণস্রোত দৃষ্টিমাত্রই আমার প্রাণের মধ্যেও যেন ঐ সুরের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া আমায় আনন্দ সাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে কোন এক পুণ্যভূমির পানে লইয়া চলিয়াছে। নানা বর্ণের, তাহার মধ্যে গোলাপী, নীল, হালকা ও গাঢ় সবুজ পীত, পিঙ্গল আবার কোন কোন অংশ শব্দময় গোলক ঘোর লাল, কত রং-এর মেশামেশি তা আর কি বলিব। ক্রমে ক্রমে আকারের পরিবর্তন, আকার ও বর্ণের পরিবর্তন এমন আশ্চর্য্য জীবনে কখনও দেখি নাই। তারপর শেষে একটি ভয়ঙ্কর হুঙ্কারের সঙ্গে যেই একটি মন্ত্র উচ্চারিত হইল অমনি বিদ্যুতের মত একটি সর্বগ্রাসী আলোক তরঙ্গ আসিয়া পূর্ব-উচ্চারিত আলোকাকৃতি শব্দসমষ্টিকে এক ঝাপটে ঊর্ধ্বমুখে উড়াইয়া লইয়া গেল। আমার আর সজ্ঞা রহিল না। নানা মন্ত্রের সুর তরঙ্গ তার সঙ্গে ঐ আলোকময় শব্দ ধারা দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে যেন একটা নেশার ঘোরে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। অবস্থা আমার যেন নিত্যানন্দময়, আর বাবা উমাপতিকে স্বয়ং শিব মনে হইতে লাগিল।

প্রভাতে উঠিয়া বসিলাম, একবার বাহিরে যাইব—আনন্দের রেশ তখনও যেন বেশ অনুভব করিতেছি। জ্বর তখনও রহিয়াছে—ভাবিতেছি। কি যে ভাবিতেছি, জানিনা,—তাহার মধ্যে—কত কি ভাব মনে উঠিতেছে, মিলাইতেছে। দিগুঠাকুর আসিয়া বলিল, তাইতো আপনারে আবার জ্বরে ধরলো, এখানকার —এ বড় বিশ্রী জ্বর—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া। মন্দিরের মধ্যে চলিয়া গেল নিজ কাজে। তারপর আমার সঙ্গী বিহারী সাধু নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং রাম নাম করিতে করিতে হাই তুলিতে লাগিলেন। মন্দিরের সম্মুখেই বাঁ দিক ঘেঁষিয়া কিছু দূরে একটা রবার গাছ আছে তাহার তলায় বসিয়াই নিত্য মুখ ধুইতাম। আজও সেখানে বসিয়া মুখটা ধুইয়া লইলাম।

আকাশে মেঘ ছিল, আজ আর সূর্য্যোদয় দেখা যাইবে না, বাহিরে যাইব কিনা ভাবিতেছি—সেই আনন্দের নেশাটা তখনও রহিয়াছে। ভাবিতেছি কি?—রাত্রে, মন্দির মধ্যে কাহাদের মন্ত্রের শব্দ পাইতেছিলাম;—ছবির মত শব্দের একটা একটা রূপ, অপূর্ব আকার বর্ণময় ঊর্দ্ধগতি দেখিতেছিলাম, কল্পনায় তাহা আবার দেখিবার জন্য চক্ষু বুজাইয়া রহিলাম। জ্বরের ধমকেই ঐসব কাল্পনিক কত কি দেখিতেছিলাম, চঞ্চল খেয়ালী মনের ব্যাপার তো,— মন গড়া অনেক কিছুই দেখা যায়।

চক্ষু খুলিতে দেখি প্রতিমার মতই স্থির সেই চণ্ডালকন্যা এলোকেশী ভৈরবী, ডান হাতে একটা কিছু ধারণ করিয়া ঠিক আমার সামনে চার পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়াইয়া। আমায় চক্ষু খুলিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, বাবা এই চরণামৃত পাঠিয়ে দিয়েছেন, খেয়ে নিন, অসুখ সেরে যাবে।

কি জানি কাল যখন জ্বরাবস্থায় উমাপতিকে দেখিলাম, তাঁহার কথা শুনিলাম, উত্তরে যে একটা অস্বাভাবিক জেদের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে, পরে আমি নিজেও কম অনুতপ্ত এবং সেই সঙ্গে কম আশ্চর্য্য হই নাই। এতটা শ্রদ্ধা গেল কোথায়? কেন আমার মনে শ্রদ্ধার পরিবর্তে প্রতিবাদের ভাব আসিল, ভাবিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু মন স্থির ছিলনা, পারি নাই। এখন আবার সেই জেদ, প্রতিবাদের মতই আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৈরবীর কথা শুনিয়াই বলিলাম, ও-সবে আমার কোন দরকার নাই; জ্বর আপনিই ভাল হবে।

শুনিয়া ভৈরবী আমার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল, না, না,—ও জ্বর আপনি সারবে না,—দীর্ঘকাল ভোগ হবে, দিনে দিনে শরীর ক্ষয় আর নিস্তেজ করে দেবে আপনাকে,—এখানকার জ্বর সহজ নয়, কি জানেন আপনি?—বলিয়া, নিকটে আসিয়া, আমার কপালে হাত দিয়া অল্প জোরে ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা পিছনদিকে বাঁকাইয়া বলিলেন, হাঁ করুন দেখি। নির্বিকারে সুবোধ বালকের মত হাঁ করিলাম; চরণামৃত ঢালিয়া দিলে গলাধঃকরণ করিলাম। উহা প্রসাদী উগ্র কারণবারি, যথার্থ সুরা, জল নয়। যেই ওটি খাওয়ানো হইল, বিনা বাক্যব্যয়ে এলোকেশী চলিয়া গেলেন;—ঠিক ঐটুকু মাত্র তাঁহার কর্তব্য ছিল। ঔষধ খাইয়া প্রথমে আমার গা-টা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, তারপর অল্পক্ষণেই ঠিক হইয়া গেল। কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলাম। মনেও একটা বল আসিল, ভাবিলাম হয়তো বা এইবার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। মনে আবার তাঁহার প্রতি শিবভাব আসিল। উমাপতি বাবার কৃপা হইয়াছে আমার উপর বুঝিয়া শান্ত হইলাম। তারপর কল্পনায় কত কি ভাবিতে ও দেখিতে লাগিলাম সে কথায় আর কাজ নাই। জ্বর কিন্তু ছাড়িল না, অবিলম্বেই যেন আরও প্রবল হইল; মাথা যেন টলিতে লাগিল। তবুও শুইলাম না;—মনে মনে সেই জেদ আবার চাপিয়া বসিল কিছুতেই শুইব না। মনের কাজ চলিতে লাগিল অবিরাম,—সংকল্প ও বিকল্প।

অদ্ভুত ব্যাপার, এই যে এলোকেশী কোন্ অধিকারে আমার সঙ্গে এ-প্রকার ব্যবহার করিলেন? আমি যেন বালক, অসুখের বেলা ঔষধ খাইব না বলিয়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমার মা যেভাবে নিঃসঙ্কোচে ঘাড় ধরিয়া খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া যান এ যেন সেইভাবেই আমায় খাওয়াইয়া গেলেন; ভাবিয়া অবাক্ বিস্ময়ে যেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত রহিলাম, তারপর কত কি ভাবিতে লাগিলাম। কেমন যেন একটা অপূর্ব পরিচিত ক্ষেত্রে অপূর্ব

এক অনুভূতি আমার চিত্তে ক্রিয়া করিতে লাগিল, তাহাতে যেন মধ্যে মধ্যে বিহ্বল হইতে লাগিলাম। এইভাবেই ক্রমে আমার ক্লান্তি এবং তাহা হইতে শয়নে প্রবৃত্তি হইল, যেন আর বসিতে পারিলাম না, শুইলাম—আবার সুপ্ত হইলাম।

উমাপতি বাবার সঙ্গে এখনও আমার সকল কথা হয় না, তাঁর কাছে আমার অনেক কিছু জানিবার আছে। এই কথা কয়টি মনে মনে পরিষ্কার ভাবিতে ভাবিতে জাগরিত হইলাম,—বাহিরে দেখি,—আকাশ সেইরূপ মেঘাচ্ছন্নই ছিল। উঠিয়া বসিলাম, মাথা ভার। এখন বোধহয় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে।

আমার বিহারী সঙ্গীও আছেন তাঁর আসনে। শুনিলাম, আজ আর তিনি আসন ত্যাগ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, ভোজন বানায়া নেহি? সে বলিল যে,—আজ ভোজনের নিমন্ত্রণ উমাপতি বাবার ঘরেই।

খবরটি শুনাইয়া মহা স্ফূর্তিতেই সে তাহার ছিলম লইয়া বসিল। আমি দেখিতে লাগিলাম আর যেন উপভোগ করিতে লাগিলাম। গাঁজার ধোঁয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুঝিলাম,—আমায় দেখাশুনা করিবার জন্যই বাবা ইহার মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা নিজ আশ্রমেই করিয়াছেন। আমার প্রতি কত অনুগ্রহ তাঁর। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরিয়া উঠিল।

তারপর,—এবারে দেখিলাম স্বয়ং উমাপতি, প্রসন্নবদনে আমায় লক্ষ্য করিতে করিতে সশব্দে, যেন কতকটা দ্রুতই আসিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পিছনে এলোকেশী. তাঁর একদিকে বাবার জন্য আসন বাঘছালখানি গুটানো বাঁ-হাতে ধরা, অপর হাতে বৃহৎ ঝারিতে তাঁহার পূজার উপকরণ।

আসনটা এখানে পেতে দাও, আর ওসব ভিতরে রাখো—বলিয়া আমার কাছেই বসিবার জন্য দাঁড়াইলেন ও প্রসন্নবদনে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আসনের উপর বসিয়া বলিলেন,—তোমার চক্ষু দুটি বেশ একটু লাল হয়েছে দেখছি,—কেন বলতো?—আমি কিছুই বলিলাম না, কারণ আমি জানিনা। তাহাতে তিনি নিজেই আবার বলিলেন, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধ্বকও আছে দেখছি;—বায়ুর উর্ধ্বগতি, তাইতেই ওরকম হয়েচে, চিন্তার চাপটা যেন বড় বেশী বোধ হচ্ছে বাবা?—আমি বলিলাম, হয়তো তাই হবে। তিনি বলিলেন, হুঁ-ম্ শরীরের রক্তগুলোকে মাথায় তুলে জমা করেছ দেখছি। তোমায় নিয়ে ভুগতে হবে নাকি?

আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এত কিসের চিন্তা? আমি কিছু বলিবার পূর্বেই এলোকেশী বলিলেন, পিছনের টান, দেশে স্ত্রী আছেন, বাবা, মা, ভাই বোন,—ঠাকুমা, দিদিমা যাঁরা আছেন, এখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের জন্য একটা ভাবনা আছে বৈকি।

কথাগুলি শুনিবামাত্রই আমার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া গেল,—বিজাতীয় ঘৃণা, কেমন একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আসিয়া সারা অন্তর-ক্ষেত্র যেন তিক্ত করিয়া দিল। বলিলাম,—এটা আপনার অনধিকারচর্চা, বাচালতা মাত্র। আজ প্রায় এক মাস অথবা তার বেশী এখানে আছি বটে,—কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্ব বা পরিবারের কথা নিয়ে আমার চিন্তা কোনদিনই মনে ওঠেনি।

আমার কথা শুনিয়া উমাপতিবাবা এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিলেন,—সে দৃষ্টির মধ্যে একটা বিস্ময়ের ভাব ছিল আরও একটা কি ছিল বুঝিলাম না। এলোকেশী হয়তো বুঝিলেন, তাহাতে কিন্তু এলোকেশী অপ্রতিভ হইলেন

না,—যেন একটু উৎসাহিত হইয়াই বলিলেন,—আপনার কাছে উনি কি সব কথা বলতে ভরসা করবেন? আমার তা মনে হয়না। বলিতে বলিতে নাটমন্দির হইতে বাহির হইয়া পায়ে পায়ে দ্বারদেশ পার হইয়া এমনভাবে গেলেন,—যেন কতই দরকারী একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। দু'চার পা গিয়া আবার সেইখান হইতেই তেমনিভাবে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—আপনার প্রতি ওঁর প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব,—তাইতো ভেতরের কথা জানাতে পারছেন না, তাইতো ভেতরে ভেতরে অতটা তাপ ভোগ করছেন।

কি সর্বনাশ, গায়ে পড়িয়া এলোকেশীর অনর্থক আমার সম্বন্ধে এ কী ভাবের মন্তব্য? উমাপতি বাবার তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে আমায় কিছু বলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া,—এতটা অপমানসূচক কথা বলিবার কি অধিকার আছে তাঁর? তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে প্রাথমিক সংকোচ পর্যন্ত বোধহয় এখনও ভালরূপ কাটে নাই, তা সত্ত্বেও এতটা তীব্র আঘাত? সত্যই দুর্মুখ—সংস্কৃতি-শূন্য ছোট মন কিনা। আরও মনে হইল,—আগে পরিচয় পাই নাই, এখন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। কিন্তু উমাপতি বাবার মনে অথবা আকারে প্রকারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। সেই প্রসন্ন বদন।

এই জ্বর ভোগের মধ্যে দুইবার তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে দেখা হইল, দুই বারই মনোমধ্যে যে কারণেই হোক একটা বিরুদ্ধভাবের প্রবল আলোড়ন অনুভব করিলাম, বুঝিলাম যতক্ষণ ইহার কারণ জানা যাইবে না, ততক্ষণ মাথাটা আচ্ছন্ন হইয়াই রহিল। উমাপতি বলিলেন,—তোমার ভাবই আলাদা, বাবা—উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন তোমার, এলোকেশীর কথায় একটা আঘাত পেয়েছো দেখছি। কিন্তু ও তোমায় আঘাত করবে এটা যে কতটা অসম্ভব আমার চেয়ে কেউ জানেনা;—তুমি সুস্থ হোলে আপনিই তা বুঝতে পারবে। এখন আমি বলি কি আজ যেভাবে আকাশে ঘোর ঘনঘটা দেখছি, বৃষ্টি-বাদল খুব বেশী নামবে বোলেই বোধ হয়,—তা আমাদের ওখানে এই বেলা গেলে ভালো হোতনা কি? এখানে বড়ই কষ্ট—অসুবিধাও কম নয়,—

বাধা দিয়া আমি যেন বিশেষ সংযত কণ্ঠেই বলিলাম,—ঐ যে বিহারী সাধুটি দেখছেন; ও একসময়ে এইভাবে এইখানেই অনেকদিন জ্বরভোগ করে কাটিয়েছে, আমি পারবনা?

একটা জেদ চেপেচে দেখছি, তাই বুঝতে দিচ্ছেনা তোমায়। ওদের শরীর, ওদের ধাত, ওদের তিতিক্ষা, তোমাদের নেই, থাকবার কথা তো নয়,—ওদের সঙ্গে কত তফাৎ। তা ছাড়া ঐ বাবাজীই তো আমায় বেশী বেশী অনুরোধ করেছে তোমায় এখান থেকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে!

এও একটি অদ্ভুত কথা, আমার নিত্য সঙ্গী, একসঙ্গে এতদিন কাটাইয়াছি, ও আমায় আজ এখান হইতে সরাইতে চাহিতেছে উমাপতি বাবার আশ্রমে? তবে কী আমার বড়ই বেশী রকম একটা কিছু হইয়াছে বলিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে? বলিলাম, কৈ আমায় তো কিছু বলে নি?

উমাপতি বলিলেন, ঠাণ্ডা লাগাটা ভাল নয়, আর এ অঞ্চলের জ্বরটা, সবাই জানে, মোটেই সহজ নয়,—রোগটা ভাল নয়, তাই বলা; নাহলে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে তোমায় আমাদের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করবার।

আসলে একটি দৃশ্যপট চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গেল,—আমাদের যেটা আসল

গলদ প্রত্যক্ষ হইয়া গেল,—এলোকেশীর এই মন্তব্যের কারণও বুঝিলাম। আমাদের মত গৃহী লোকের যে কামনা মজ্জাগত, শরীর একটু অসুস্থ হইল কি না হইল অমনি সেবা গ্রহণের লালসা,—আহা, তুতু ইত্যাদি দরদের দুটি কথা,—সহানুভূতিমূলক অভিনয়ের প্রতি সহজ আকর্ষণ। বিদেশে প্রবল জ্বরভোগ,—আমার তো আত্মীয়-স্বজনের কথা, চিন্তা মনে আসাই স্বাভাবিক, এই কল্পনায় এলোকেশী এক ঘা দিয়াছে। আরও একটু বুঝিলাম, তাহার গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও অভাব আছে। কিন্তু বাবা উমাপতির তো তাহা নাই। তিনি সাধারণভাবেই এই রোগের প্রভাব-কালটুকু যাহাতে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারি তাহার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন আমায় নিজস্থানে রাখিয়া।

এই জ্বর উপলক্ষে প্রথম হইতেই অন্তরে অন্তরে কয়েকটি অপূর্ব অনুভূতি আমার চিত্তকে নিবিষ্ট রাখিয়াছিল, তুচ্ছ আত্মীয়-স্বজনের কথা মনের মধ্যে স্থান পায় নাই, কারণ তাঁহাদের প্রতি আমার কোনপ্রকার আকর্ষণ তখন তো ছিলনা। বোধ হয় একথা অন্তর্য্যামী উমাপতি বাবা বুঝিয়াছিলেন। একথা তিনি যখন বুঝিয়াছেন তখনই আমি কৃতার্থ,—ইহাই মনে করিয়া তখনকার মত স্থির হইলাম। কেবল বলিলাম, আমায় এইখানেই থাকতে দিন, যা হয় এইখানেই হোক।

শুনিয়া বাবা উমাপতি বলিলেন, তা যেন দিলাম, কিন্তু আবার বলি,—এখানে জ্বর হলে দুই একদিনেই ছাড়েনা, দীর্ঘকাল ভোগায়, সেটা তো তুমি জাননা? আমি বলিলাম,—তা যেটুকু ভোগ আছে তাতো ভুগতেই হবে।

তাহলে তাই হোক, তুমি এখানেই থাক। বলিয়া উমাপতি উঠিলেন এবং আপন ব্যাঘ্র-চর্মাসনখানি গুটাইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

স্বভাবতঃ আমি একগুঁয়ে নই কিন্তু কেন যে আমি গোঁ ভরে একটা কাজ করিলাম তা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না। উমাপতি যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, আমিও চক্ষু বুজিয়া রহিলাম পড়িয়া। হঠাৎ সেই ট্রেনের ভৈরবমূর্তি দেখিতে লাগিলাম। এ আবার কি হইল আমার? বিকারের ঘোর · দেখিতেছি ঠিক সেই দম্ভপূর্ণ মূর্তি, সেইভাবে জালন্ধর বন্ধ অবস্থায় বসিয়া আছে; কিন্তু সেথায় আর কেহ নাই। হঠাৎ কতক্ষণ পরে মনে নাই একটা গর্জন, তারপর আর কিছু নাই। তাহার অল্পক্ষণ পরেই এলোকেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া নিকটেই এক স্থানে বসিলেন। আমি আর তাঁহার দিকে না চাহিয়া আপনভাবেই রহিলাম। জ্বর আমার তখনও বেশ প্রবল ছিল, মনে হয় একশো চারের উপর হইবে, দুদিকের রগের শিরাগুচ্ছ বেশ জোরে জোরেই দপ্ দপ্ করিতেছিল, মাথা ভার তো আছেই। হঠাৎ ভৈরবী আসিয়া ভাল মানুষের মত আমার কাছে বসিলেন এবং আমার তপ্ত কপালের উপর হাত রাখিয়া দুই রগের উপর বেশ জোরে দুটি আঙুলের টিপ দিয়া বলিলেন, আপনার এই যে জেদ—সেটা রোগের মধ্যেই ধরতে হবে, তার প্রধান লক্ষণ হল রগ টিপ্ টিপ্ করা, আর মাথা ভার হওয়া আর দপ্ দপ্ করা বুঝেছেন?

আমি কথা কিছুই বলিলাম না; তবে এইটুকু অনুভব করিলাম তাঁহার উপর আমার আক্রোশ আর তিলমাত্র নাই। কারণটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতেই মীমাংসা হইয়া গেল, নারী-স্নেহ-কামী-নর-যুবার মন তো? কিন্তু তারপর

এলোকেশী আবার যে কথা বলিলেন, তাহাতে আবার আমার অন্তর তিক্ত করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন, আপনি এখানে পড়ে থাকবেন আর অতটা নীচে আশ্রম থেকে আপনার পথ্য তৈরী করে নিয়ে আসতে হবে, কখন কেমন থাকেন তত্ত্ব করতে হবে, এসব এত কে করে? আমার নিজের কাজ ফেলে এসব করতে ভাল লাগেনা, তা স্পষ্টই বলচি। বাবা আমাকেই সব করতে বলবেন, কারণ আর আশ্রমে একাজের মত কেউ নেই। কাজেই এ অবস্থায় যদি আমাদের আশ্রমে না যাওয়ার গোঁ ধরে থাকেন তাহলে আপনি আমাদের একটা আপদ হয়েই থাকবেন, এটা যেন মনে থাকে।

প্রথমে তাঁহার ব্যক্তিত্ব যেটুকু প্রভাবিত করিয়াছিল, এই কথায় তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, আমি তাঁহার হাতটা সরাইয়া দিলাম,—বলিলাম, আপনার আশ্রমের কোন পথ্যই আমার দরকার হবে না, জেনে রাখুন, আমি যে কদিন এখানে রোগ ভোগ করবো আপনাদের কাকেও দেখতে আসতে হবে না,—আপনার এদিকে সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই। যদি সে রকম বুঝি এখান থেকে আমি চলে যাবো।

আশ্চর্য্য, কেন যে আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা জেদ আসিয়া এ সময় আমায় এতটা বিপন্ন করিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্রমেও গেলাম না, বিহারী সাধুর সাহায্যে একখানি পোষ্টকার্ড আনাইয়া সেই দিনটি কাটাইয়া রাত্রি প্রভাত হইলে, আমার একটি আত্মীয়কে পত্র দিলাম, সত্বর তার-যোগে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতে। ঠিক করিয়া ফেলিলাম,—এখানে থাকিব না, দেশেই যাইব। ভাবিলাম, চার পাঁচ ছয় দিনেই টাকা আসিবে,—ইতিমধ্যে একটু রোগ ভোগ করিয়া দিন কাটাইয়া দিব।

সেইদিনই বৈকালে,—দিগুঠাকুর আমার জন্য এক পাত্র দুধবার্লি লইয়া আসিল; জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল, বাবা পাঠিয়েছেন। শুনিয়া আমি বলিলাম, এ কেন? আমি তো লঙ্ঘন দেব সংকল্প করেছি। সে বলিল, বাবা বলেছেন এখানকার জ্বরে উপবাস ভাল নয়, কিছু খেতে হয়। সহজেই আমার মনে হইল বীতশ্রদ্ধ এলোকেশী উহা প্রস্তুত করিয়াছে, না খাওয়াই ভাল। আমায় চিন্তিত দেখিয়া দিগু বলিল, এটা আমিই করে আনলাম; বাবা বল্লেন যে এলোকেশীর তৈরী করে কাজ নেই, ওটা তুমিই তৈরী করে নিয়ে যাও। বাবার কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলাম। যাহা হউক, খাইলাম এবং মনে মনে যাহা বুঝিলাম তাহা আর এখন বলিয়া কাজ নাই। উমাপতি বাবার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া চক্ষে জল আসিল। উহা দিগুঠাকুর লক্ষ্য করিল।

বৈকাল একরকম কাটিয়া গেল. সন্ধ্যার পর জ্বরটা যেন প্রবল হইল, সারা রাত্রই প্রবল জ্বর ভোগ করিলাম, ভোগ করিলাম না বলিয়া উপভোগ করিলাম বলিলেই ঠিক হয়। কারণ সেটা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ মাত্র নয়, তার মধ্যে মনকে লইয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সুখকর উপভোগও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। প্রথমে দেখিলাম, তারাপুর গ্রামের মধ্যে মন্দিরটি, চলিতে চলিতে মাঠ হইতে যেমন দেখিয়াছিলাম সেই দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল ও অনেকক্ষণ রহিল,—হঠাৎ পরিবর্তন হইল না। আজ জ্বরটা তৃতীয় দিন চলিতেছে, প্রথম রাত্রটা কতক আচ্ছন্নভাব, তারপর মাথার ভিতরে যন্ত্রণাটা প্রবল হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া কত কি দেখিলাম, তারপর বোধ হয় শেষদিকে ঘুমাইয়া ছিলাম। দেখিয়াছি মধ্যে মধ্যে যখন জ্বর হয়, প্রবল জ্বরের সময়েই একটা সুখকর

অনুভূতি আমার অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া রাখে। যেন আমার প্রিয়তম ইষ্টের পরশ পাই। আরও যেন মুক্তির অনুভূতি আমায় আনন্দে মাতাইয়া তোলে। অল্প জ্বরের সময় তাহা থাকে না। আজও মন্দিরমধ্যে কত কি দেখিলাম, শুনিলাম, সে কথায় কাজ নাই।

পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে আর উঠি নাই। যখন চৈতন্য হইল, চাহিয়া দেখিলাম, উমাপতিবাবা। স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। বাবা বলিলেন,—তোমায় সেরে উঠতেই হবে যে বাবা,—এখন আমার কথা শুনে কাজ করলে তোমার ভালই হবে। যা বলব তা শুনবে তো? এখন জ্বরটা বড্ড বেড়েছে। বলিলাম,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, এমন অনেক কিছুই দেখেছি কিনা এই কদিন জ্বরের মধ্যে—তাই,—

তিনি যেন ধমক দিয়া বলিলেন,—এখন কোন কথা চলবে না, চুপচাপ পড়ে থাকতো বাবা।

আর তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল না;—বলিলাম, আচ্ছা, আমি তাই থাকবো; —তবে তার আগে দেহত্যাগের পর জীব যায় কোথা, জন্মায় কি করে এইটে যদি আমায় শুনিয়ে দেন তাহলে সুড়সুড় করে ঠিক লক্ষ্মী ছেলের মতই থাকবো। আপনি তো প্রতিশ্রুত আছেন।

এমন ভাবটি আমার হইয়াছে যেন উমাপতি বাবা ও আমি স্নেহের দাবীতে একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি, জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা অথবা সাধনার-ক্রমে লঘুগুরু কোন পার্থক্য নেই। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—শুনতে শুনতে যদি তোমার অচৈতন্য অবস্থা আসে? বলিলাম,—তাহলে তখন বন্ধ করবেন, যখন জাগবো তখন আবার শনবো।

উমাপতি বলিলেন,—এখন আমার একটা কথা তো আগে তুমি শোনো; তারপর তোমার কথা শোনবার পালা আমার, কেমন? মহা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলাম, আচ্ছা, কি কথা শুনতে হবে, আমি এখনই শুনবো,—বলুন, বলিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। তিনি ধীরে ধীরে আমার নিকটে আসিলেন এবং দক্ষিণ হাতটি বাড়াইয়া,—একটু চোখ বুজিয়ে থাকতো, বাবা; —বলিয়া আমার ভ্রূযুগলের মধ্যে তাঁর তর্জনীর টিপ দিলেন আর আমি ঠিক আবার তখনই ঘুমাইয়া পড়িলাম। এবার কিন্তু জাগিয়া দেখি,—এক অদ্ভুত দৃশ্য পরিবর্তন।

এ কোথায় আমি? বাবা আশ্রমের সেই ঘরে, বেশ নরম শয্যায় শুইয়া, আঃ কি আরাম! আমার সামনেই খানিকটা দূরে বাবা, তাঁর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া এলোকেশী মাতা। তিনি আমার মুখ দেখিবেন না, তাই যেন ঐ দিকে মুখ করিয়া। বাবা তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন। এখন আমায় জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন,—যখন এসেছিলে তখন অনেক কম ছিল এখন যেন একটু বেশী মনে হচ্ছে না?

আমার অন্তরে কিন্তু অবাধ শান্তি ছিল।

তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম, যেন একটি গভীর রহস্যের সাগর, নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত গভীর,—বলিলাম—বেশ কাণ্ড করেছেন যা হোক। আমার মত অবাধ্যকে কেমন করে বাগ মানাতে হয়,—তা, আর বলিতে ইচ্ছা হইল না, আপন অনুভূতির মধ্যেই ডুবিয়া যাইতে চাহিলাম।

যখন জাগিলাম তখন আবার দেখিলাম যে ঐ বাবার আশ্রমে, তাঁহার

বাঘছালওয়ালা আসন-পাতা সেই বসিবার ঘরে, সুকোমল শয্যায় শুইয়া, পাশে আপন আসনে উমাপতি বাবা বসিয়া। চারিদিকেই স্বর্গের তৃপ্তি—মহাপুণ্য ফলেই যেন আসিয়াছি। বায়ুমণ্ডলে ধূপধুনা মিশ্রিত পুষ্প ও চন্দনের গন্ধ। আঃ কি আনন্দ! বলিলাম, কৈ বলুন তো সেই দেহত্যাগের পর জন্মের কথাটা।

তিনি একটু হাসিয়া আমায় বলিলেন, দেহত্যাগের পর জীব জন্মায় কি করে এটা জেনে তোমার লাভ কি? সেটা আগে আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমি—লাভ লোকসান ভেবে তো বলিনি,—বিশেষ একটা কৌতূহল,—অনেকদিনই রয়েছে আমার মধ্যে। তিনি বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, আসলে ওটা তো তোমার নিজের কি গতি হবে, জানবার এইটিই ত মূল উদ্দেশ্য?

আমি—আমি শুনেছিলাম, আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারা ঝরে শস্যের মধ্যে, তারপর শস্য থেকে মানুষের বীর্য্য হয়ে নর-নারী মিলনের ফলে জন্ম হয়। শুনেছিলাম যখন একথা, অবিশ্বাসও হয়নি। এখন একবার আপনার মুখ থেকে,—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, যদি আগাগোড়া সব জীবই ঐভাবে জন্মায় শুনে থাক তাহলে আমি বলবো এক শ্রেণীর জীব ঐ ধারায় জন্মালেও সবাই, যারাই দেহত্যাগ করে পুনঃ তারা ঐভাবেই জন্মায়,—তাতো ঠিক নয়। এখানে এমন ব্যাপার অনেক আছে যাতে ঐ একভাবে জন্মানো সম্ভব নয়। ধরো,—যাঁদের উন্নত জন্ম,—আত্মার প্রকৃত আবরণ অনেক পরিমাণে খসে গিয়েছে, যাঁরা ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে কর্ম ক'রে অধ্যাত্ম চৈতন্যের অধিকারী, যাঁদের দৃষ্টি বা লক্ষ্য আর ক্ষুদ্র—নিজ পিতামাতা ভাই স্ত্রীপুত্র কন্যার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, এখানকার বিস্তৃত সমাজ নিয়ে যাঁদের আত্মশক্তি কাজ করেছে তাঁরা ঐভাবে কেন জন্মগ্রহণ করতে যাবেন? মহামায়া প্রকৃতির নিয়মেই তাঁদের পুনর্জন্ম বিধান অন্যপ্রকার।

আমি—চৌরাশী লক্ষ বার ভ্রমণ করে যে জন্ম,—সে কি সত্য?

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, জীব-সৃষ্টি যে ক্রমে শুরু হয়েছে সেই আদিকাল, মানুষ জন্মাবার কাল পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের তো ঐ চৌরাশীর নিয়মে হিসাব চলে আসচে;—তা বলে বর্তমানে মানুষের পুনর্জন্মে আবার চৌরাশী কেন?

আমি—শুনেছি মানুষ জীব, অপকর্মের ফলে পশু যোনিতেও জন্মায়?

তিনি বলিলেন, সেটা প্রাকৃত কোন নিয়মভঙ্গের বিশেষ একটা গুরুতর পাতকের ফলে দণ্ড হিসাবে হতে পারে,—মানুষ হয়ে মানুষ কত কত ভয়ঙ্কর কর্মবিপাক সৃষ্টি করে যার ফলে বিলোম গতিও সম্ভব হয়। তা বলে সবার তা হতে যাবে কেন? আসলে এইটুকু জেনে রাখো যে, কর্মই তোমার গতি নিয়ন্ত্রিত করবে। তাঁর নিয়ম এমনই বিচিত্র যে আলাদা বিচারালয় দরকার নেই, বিচারক দরকার নেই; তোমার মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার স্মৃতি আর বিবেক,—এরাই বিচার করে তোমার কর্মানুসারে গতিপথে নিয়ে যাবে।

আমি—তা হলে এক নিয়মেই সব মানুষের পুনর্জন্ম হয় না?

তিনি—নিশ্চয়ই নয়, যেমন মানুষ সবাই এক নয়, এক গোষ্ঠীও নয়, একই জাতি নয়, একই মতি নয়, তেমনি গতিও এক নয়।

আমি—আচ্ছা ক্রীশ্চানদের পারগেটারী—অথবা মুসলমানদের,—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, ওসবও ঐ যমালয়েরই নামান্তর, অথবা যমের

বাড়ীরই ব্যাপার, ওদের সমাজে লোক সমষ্টিবুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারে, পাপের ফলাফল দেখে সৎভাবে আস্থাশীল হতে পারে এমনভাবে ফলিয়ে বলা। মোটের উপর ওদেরও ঐ কর্মপ্রবৃত্তিই ওদের নিয়ে যায় পরলোকে। ক্রমবিকাশের কতটা উচ্চস্তরে উঠলে তবে প্রকৃতির পুনর্জন্মের নিয়মেতে অথবা জন্মান্তরের কথায় বিশ্বাস হয়; এসব নিয়ে মাথা ঘামানো কেন তোমার এখন থেকে? বিশেষতঃ এই প্রবল জ্বরাবস্থায়, আমি তোমায় এ নিয়ে আর আলোচনা করতে নিষেধ করি।

আমি—আচ্ছা, সেরে উঠলে বুঝিয়ে দেবেন তো? আমার ঐ কথার উত্তরে কিছুই না বলিয়া আর এক কথা পাড়িলেন;—তুমি তো জপ কর? আমি স্বীকার করিলাম, তখন আবার বলিলেন, জপের প্রতিপাদ্য কোনও মূর্তি আছে তো? বলিলাম,—আছে। তখন তিনি বলিলেন,—ঐ মূর্তিই তুমি এখন থেকে সকল সময় চক্ষের উপর রাখো;—পারবে কিনা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো না;—যতক্ষণ চেতনা আছে ততক্ষণ করে যাও, তবে জপের সঙ্গে প্রাণায়াম করো না,—এখন সে সময় নয়। আর কাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।

আমি ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম,....বলিলাম, যদি প্রশ্ন ওঠে? তিনি বলিলেন, এ অবস্থায় সেটা বিক্ষেপ মনে করে উপেক্ষা করবে। আলগা মনকে অনেক দৃঢ় সংকল্প বা বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করে তাকে আয়ত্ত করতে হবে, তবে ফল ভাল হবে; কোন অপব্যয় প্রশ্রয় দেওয়া হবে না! বুঝেছ?

আমি বলিলাম,—আপনার আশ্রমে এনে আমায় কঠিন নিয়মেই বাঁধছেন। শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—এ অবস্থায় তুমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছ তাই একটু বাঁধলাম; তারপর এলোকেশীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—তোমার তো অস্বাভাবিক অবস্থা, তোমার চেয়েও চঞ্চলপ্রকৃতি একজনকে আমি বেঁধেছি, আর তাতে তার ভাল হয়েছে একথা সে মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করে।

আমি আর কিছুই বলিলাম না,—মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতেছিল; একটু স্থির হইয়া ইষ্টে লক্ষ্য স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। শুনিলাম, এলোকেশী বাবাকে বলিলেন,—এখানে এসে জ্বরটা বেড়ে গেল কি? উত্তর শুনিতে গিয়া অল্পক্ষণেই অচৈতন্য হইলাম।

ভিতর দিকে ঘরে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আমার জ্ঞান হইল। ধুনার গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কোণে মিট মিটে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। ওঃ কি তাপ, গায়ে বড় জ্বালা, সর্বশরীর পুড়িতেছে, নিঃশ্বাসে আগুন,—মুখটা, গলার ভিতর দিকে জিভ্ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। একটু জলের কথা মনে হইল, কিন্তু জল চাহিয়াছিলাম মনে হয় না। এলোকেশী ঘরের কোণে দীপ-ছায়ায় বসিয়াছিলেন,—দেখিলাম উঠিয়া—আমার বিছানার পাশেই রাখা ছিল মাজা চকচকে একটা ঘটিতে জল; একটা গ্লাসে ঢালিয়া দিলেন। উঠিয়া জল খাইলাম, তারপর যেই আবার শুইতে যাইতেছি তিনি বলিলেন, উঠে যখন জল খেলেন তখন একটু বসে থাকুন না দু এক মিনিট, তারপর শোবেন। তাহাই করিলাম। তারপর কখন শুইয়াছিলাম মনে নাই।

রাত্রের অন্ধকার তখনও আছে, তবে কেবল মাত্র পূর্বগগনে উষার জ্যোতি দেখা যাইতেছে, আকাশের বড় বড় তারাগুলি এখনও জ্বল জ্বল করিতেছে,

বাইরে কোন এক উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে, আমি জুড়াইব বলিয়া বাহির হইয়াছি, ঘরের ভিতরে জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম। প্রত্যুষের ঐ শীতল পবনের সবটুকুই নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লইতেছি আর ভিতরটাও জুড়াইয়া যাইতেছে।

ক্রমে ক্রমে পূর্বদিক বেশ ফরসা হইয়া আসিল,—ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একস্থানে আসিয়া পড়িলাম—গ্রাম-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সবুজ, গাঢ় সবুজ ঘাসে ভরা স্থানটি। দেখিতেছি দিক্‌চক্রবাল যেন তখনও ঘন নীলাভ ধূমাচ্ছন্ন একটা গাঢ় রেখায় সমুদয় পূর্বদিকটি ব্যাপিয়া আছে। তাহার অনেক দূর ঊর্দ্ধে, অরুণোদয়ের পূর্বে যে বর্ণচ্ছটা দৃষ্টিমাত্রই প্রাণে নব জীবনের আনন্দ জাগায়,—তাহাই ফুটিয়াছে,—দেখিতে দেখিতে কোমল, লঘু,—সিন্দুর বর্ণের প্রলেপ একখানি তাহার উপর আসিয়া পড়িল এবং ক্ষণে ক্ষণে উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। তারপর পীতবর্ণে মিলিয়া ক্রম-ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইতে লাগিল। উহা ক্রমে ক্রমে মাথার উপর নীলাকাশের সঙ্গে মিলিয়া গেল। অবাক্‌ হইয়া আমি দেখিতেছিলাম, কত অল্পসময়ের মধ্যে উহা উজ্জ্বলতর হইয়া তরল হেম সিন্দুর আভায় সারা পূর্ব গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল ;—সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস লাগিয়া প্রথমে পুলকিতাঙ্গ তারপর এক শিহরণ আসিয়া তখন প্রাণ যাহা চাহিতেছিল,—সর্বশরীর জুড়াইয়া দিল। আঃ—আমি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিলাম সেই শীতল-সমীরণ স্নিগ্ধ অরুণোদয়ের পরশে।

ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, যেন আমার সম্মুখে,—ঘন সবুজের খুব পুরু গালিচার মতই ঘন তৃণময় হরিৎ ক্ষেত্রের প্রসার,—তাহার উপর উপবিষ্ট অসংখ্য ভদ্র মূর্তি, জন-সমুদ্র বলিলেই হয়। সবাই উজ্জ্বল সভ্য বেশভূষায় সজ্জিত, তাঁহাদের মধ্যে আছেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, তবে—প্রথমেই শ্রেণীবদ্ধ হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী, প্রসন্ন গম্ভীর মূর্তি, তাঁহাদের দেখিয়া মনে হয় বিশেষ গুরুতর বিষয়েই তাঁহারা অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের পশ্চাতে বহুতর সভ্য একের পর এক শ্রেণীবদ্ধ বসিয়া। ভদ্রসাধারণ, অসংখ্য জন সমাগম ; আরও লক্ষ্য করিলাম যেন সবার দৃষ্টি তাঁহাদের সম্মুখস্থ উচ্চ বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান এক মূর্তির পানেই নিবদ্ধ, এক অপূর্ব ধীর স্থির,—নারীমূর্তির উপর। সেই দ্বিধা বিভক্ত মূল শাখার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মূর্তিটি তাঁহাদের সম্মুখে বটে কিন্তু আমি পশ্চাৎ দিক হইতেই দেখিতেছি সুতরাং মুখ দেখিতে পাইতেছি না। মস্তকে চূড়াবাঁধা জটা, পরনে রক্ত গৈরিক তাঁহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত এবং দীর্ঘ, অপরূপ ঊর্দ্ধপ্রান্ত সিন্দুররঞ্জিত উজ্জ্বল ত্রিশূল মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে। নিস্তব্ধ উপবিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে মাত্র তিনিই দাঁড়াইয়া এবং সকলকারই আকর্ষণের বস্তু। কারণ সবার লক্ষ্য তাঁহার দিকেই স্থির এবং একাগ্রচিত্ত—প্রতীক্ষায় প্রতি মুহূর্ত কাটাইতেছে। কতক বিস্ময়ে, কতকটা ভয়ে ভাবিতেছি, এখানে এ সময়ে এই যোগাযোগ, ব্যাপার কি হইতে পারে ?

আমাকে যে কথা আজ আপনাদের বলতে হবে, তা শুধু আমার মনের কথা নয়,—তা আপনাদের দেশব্যাপী দুর্গতি, আপনাদের ভণ্ড, অভিশপ্ত জীবনের মিথ্যাশ্রয়ী সংঘবদ্ধ অপকর্মের প্রতিকার,—সে কথা শুনতেই আমায় আহ্বান করেছেন আর আমার বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিতচিত্ত হবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই ইষ্টের আজ্ঞায় এই সময় আজ এখানে আসা।

এ যে এলোকেশী মাতা,—কি সুন্দর, নির্ঘাৎ তাঁহার কথাগুলি বলার ভঙ্গী,—দৃঢ়, গম্ভীর,—অথচ কোমল সংযত কণ্ঠস্বর,—এটা তাঁর প্রকৃতিগত,—তাঁর মধ্যে এমনই একটি শক্তির ক্রিয়া বর্তমান যে কাহারও উপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই।

আশ্চর্য্য এই ক্ষণ, আশ্চর্য্য এই জন-সমাবেশ আর পরমাশ্চর্য্য এই বক্তা! শুনিতে, আমি আরও নিকটে গেলাম কিন্তু বাধা আছে,—একটি তৃণপূর্ণ স্তূপ সম্মুখে আমার, তাহার উপরে নানা দ্রব্য সাজানো,—জানিনা উহা কি এবং এই কার্য্যের সঙ্গেই বা সে সকলের সম্পর্ক কি। কাজেই সেই স্তূপের নিকটে কোমল ঘন বিস্তৃত দূর্বাদলের উপর বসিয়া পড়িলাম ;—শুনিতে লাগিলাম, গম্ভীর দৃঢ় ও কোমলকণ্ঠে এলোকেশী বলিতে লাগিলেন—

আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে আজ, আমার স্বাধীন মন্তব্য, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ রক্ষার উপায় সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এবং অভিমত জানাতে এই সভায় উপস্থিতি যখন স্বীকার করি তখন আমি নিজেও কম আশ্চর্য্য হইনি। একে জাতিতে চণ্ডাল কন্যা,—তারপর ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত গোঁড়া হিন্দু-সমাজের উপর বালিকা অবস্থা থেকে গভীর ঘৃণাই পোষণ করে এসেছি, —আপনারা প্রবীণ, বিদ্বান, পণ্ডিত একথা জেনেও আমার বক্তব্য শোনবার জন্য, শুধু শোনা নয়,—আমি যা বলবো, সমাজ-রক্ষার উপায় বলে যেসব নিয়ম এবং প্রস্তাব উত্থাপন করবো তা অকপটে দ্বিধাশূন্য অন্তরে আপনারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করবেন এই প্রতিশ্রুতি কেমন করে দিলেন, যাতে আজ আমার এখানে আসা সম্ভব হোলো? এটাও কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। সত্যই কি আপনারা গতানুগতিকতার প্রভাব-মুক্ত হয়েছেন? তা যদি হয়ে থাকেন, আমার পরীক্ষা আছে, তা থেকেই আপনাদের আন্তরিকতা বুঝে নিতে পারবো।

প্রথমেই আমি এই কথা বলে নেবো যে,—সমবেত বিদ্বান, আমাদের হিন্দু-সমাজের দাম্ভিক-শিরোমণি পণ্ডিত মহোদয়গণের সামনে যদি এমন কিছু বলে ফেলি যেটা তাঁরা অপমান-সূচক মনে করেন তাতে আমার অধিকার আছে বলেই বলব একথা যেন তাঁরা মনে রাখেন। আর সেজন্য সভ্য সমাজের ধারা অনুসারে মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাটা অসঙ্গত এবং ভণ্ডামো হবে বলেই আমি মনে করি। আজ তাঁদেরই সামনে, তাঁদেরই মূঢ়চিত্ত ও হৃদয়হীনতার ফলে, সমাজের সঙ্ঘশক্তি ক্ষীণ ও হীনতার ফলেই না সহায় থাকতেও অসহায়, তাঁদেরই ঘরের যে হতভাগিনী স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীরা, প্রতিবেশী এক ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য দুর্বৃত্ত পশু-দলের হাতে নিগৃহীত, দলবদ্ধভাবে চরম পীড়নের লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে, আমি সেই অভিশপ্ত সমাজের মেয়েদেরই একজন—তাই আমার এ অধিকার, তাই আগেই এটা বলে রাখি। এ বিচিত্র দেশে, প্রতিবেশী এক দলের ধর্মই হোলো অপর সমাজের নারীধর্ষণ, এটা তারা তাদের পক্ষে বড় গৌরবের কাজ মনে করে। তারা দলবদ্ধভাবে হিন্দু নারীর উপর পুরুষানুক্রমিক পুণ্যকর্মের হিসাবেই ঐ অত্যাচার চালিয়ে যাচ্চে—এ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার হোল না ;—বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য হয়তো কিছুদিন বন্ধ আছে, কিন্তু আবার কোন্ সূত্রে আরম্ভ হবে তার কোন ঠিক নাই। আজ খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই, কেন আজ হিন্দু-সমাজের এই দুর্গতি, অভিশপ্ত জীবন, তার অভ্যুদয়ের সকল পথই বন্ধ ;—অদ্ভুত নয় কি? হিন্দুর এই সঙ্ঘশক্তিহীনতার মূল কোথায়? উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাঁদের সমাজ ধর্ম-

আচরণে যাঁদের নিম্নশ্রেণী বলে অবহেলা করে এসেছেন এতদিন,—এখনও তাদের কোলে টেনে আনাতো দূরের কথা,—তাদের গুণগত ঐক্য এবং মনুষ্যত্বের প্রেরণায় প্রীতিবশে কি নিকটে আনতে পেরেছেন? তারপর আজ দেশ জুড়ে নারীর অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাসের আগুন সমাজের সকল শ্রেণীর পুরুষজাতির সকল কল্যাণ পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্চে না? আমি এই বাংলার কথাই বলচি,—অন্য কোন প্রদেশের কথায় আমার কাজ নাই, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার নারীধর্ষণ সারা ভারতের নারী-সমাজের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়েচে কিন্তু বাংলার হিন্দু পুরুষ জাতির ধৈর্য্য বিচলিত হয়েচে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে কি। তাইনা আজ এই অপরাধ অবাধে চলতে পেরেচে? তারপর আমাদের দেশের পুরুষদের — রাজশক্তির সহায়তায় এর প্রতিকারের আশার কথা আবার বিশেষ করে বলতে হবে? মূঢ়-চিত্ত হিন্দু বাঙ্গালী! এ মোহ তোমার কতদিনে ঘুচবে?

এটা যে সমাজের সঙ্ঘশক্তির অধিকারের কথা এ সত্য কি দিয়ে চাপা দেবেন? আপনারা ঘুমোবেন আর রাজশক্তি এসে রক্ষা করবে সমাজের শত্রুদের হাত থেকে, এ কথা কি সুস্থ মন একজন ভাবতে পারে?

আমাদের হিন্দু-সমাজে নারীর এতটা গুণ বর্ণনা, এতটা সেবাপরায়ণতা, ধর্মবোধ, আদর্শ আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও স্বামীরা যে তাদের রক্ষা করতে পারেনা, —তাইনা এতটা লাঞ্ছনা তাদের? স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এমন গোটা-কতক খবর শুনলেও প্রাণে আশ্বাস জাগে! তাদের রক্ষকেরা এত নিবীর্য্য কাপুরুষ বলেই না প্রতিবেশী এক-পল্লীভুক্ত নরপশুদের এতটা সাহস বেড়ে গিয়েচে? আমার প্রশ্ন এই,—যারা স্ত্রী রক্ষায় অক্ষম তারা কোন্ লজ্জায় স্ত্রী গ্রহণ করে? এতটা বিদ্যাবুদ্ধিহীন, যে-মন্ত্র পাঠ করে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে তার অর্থ বোঝেনা।

তার পরেই এই প্রশ্ন আসে,—নারী প্রকৃতিতে যে মহত্ত্ব, পবিত্রতা ও দৈব ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা দেখেছিলেন,—যার ফলে তাঁরা সমাজে মহা-শক্তিশালী হয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য জীবন সফল করে গিয়েছেন, তাঁদের বংশধরেরা এই কয়েক পুরুষের মধ্যে সে দৃষ্টি কোথায় হারালো—সেই দাম্পত্য জীবনের পবিত্র শক্তি এখন গেল কোথা? নারীর স্বভাব-পবিত্র যে প্রকৃতি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্পর্শে বা ধর্ষণে তার পবিত্রতা নষ্ট হয়না এই সহজ

বন্দিধ ; পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজে বা জাতির ধর্মনীতিতে আছে ; কেবল এই অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ এখনকার হিন্দু বাঙ্গালী সমাজই তা থেকে বঞ্চিত। আমার একথা বিশ্বাস হয়না যে, যাদের নিজ ঘরের মেয়েদের রক্ষা করবার শক্তি নেই তারা ভারতের স্বাধীনতার পথে শক্তি যোগাতে পারবে ? দেশের দুর্গতি তারা দূর করবে কি করে বা কোন্ শক্তির বলে ? এ কথাই তাদের জিজ্ঞাসা করচি, এই উত্তর দিতে হবে।

এলোকেশীর এই মর্মভেদী কথাগুলিতে সভার মধ্যে একেবারে গভীর নিস্তব্ধতা,—কাহারও মুখে বাক্য সরিল না কতক্ষণ ;—তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

আমি এখন আসল যে কথাটা সেটা স্পষ্ট করেই বলচি,—আপনারা পণ্ডিত ব্যক্তি, শাস্ত্রে বিশ্বাসী,—এখন 'গতস্য শোচনা নাস্তি' এই মহাবাক্য অনুসরণ করে শান্তভাবে অবহিত হবেন আর তা আপনাদের বংশধরদের, দেশের, সমাজের, এমন কি প্রত্যেক পরিবারের কল্যাণার্থ নিয়োগ করুন এই নব সংস্কৃত সমাজে, এ আশা আমি করতে পারি কি ? আর আপনাদের সাহায্য ও উৎসাহ পেলে এরাই এই মহান কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে, এই সত্য নিশ্চিত অবধারণ করে আপনারা তাদের সহায়তা করবেন। আরও,—একটা সহজ কথা এই যে, —কিছু বিশেষ শক্তিক্ষয় করে নিশ্চয়ই সহায়তা করতে হবেনা তাদের, শুধু এইটুকু করবেন তাদের নিজ নিজ উদ্দিষ্ট পথে যেতে চাইলে বাধার সৃষ্টি করবেন না, যদি তাদের সে কাজ আপনাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, মতের সঙ্গে না মেলে। নব জাগ্রত যুবা-শক্তি এখন এক মহাকল্যাণকর উদ্দেশ্যে অগ্রগতি চাইচে, আপনারা পুরাতন অসৎ অথবা, বৃথা অচল সংস্কারগুলি ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে মিলে যান,—না পারেন অন্ততঃ তাদের পথটা বাধাশূন্য করে দিন, আজ প্রথমে আমার এইমাত্র প্রার্থনা।

এখন প্রথমেই একটা গুরুত্ব বিষয় প্রস্তাবস্বরূপে আপনাদের কাছে উপস্থিত করচি। বয়স আমার অল্প হলেও যথার্থ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি, বুঝেছি, এবং দৃঢ় বিশ্বাস করেছি যে একদল যতই সোস্যালিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি রাশিয়ার অনুকরণে অস্থির উপদ্রবই আরম্ভ করুক, দেশের বিশাল হিন্দুজন-সমষ্টি এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম, হিন্দুর স্মৃতি-শাস্ত্র অন্তর্গত সংস্কার বৈশিষ্ট্য ছাড়তে পারবে না। এইটিই প্রাচীন সনাতন-ধর্মের জাতিগত সংস্কৃতি, মূল জাতীয় জীবনে বড় গভীরে সঞ্চারিত হয়ে আছে আর তা থাকবেও দীর্ঘকাল। তাই এই সংস্কারের ভিতর দিয়েই সংস্কৃত করতে হবে হিন্দু সমাজকে। এখন বিশেষরূপে এর মূলে যে গুণকর্ম বিভাগ রয়েচে, সেই গুণকর্ম দিয়েই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র এই বর্ণ চারিটিকে বর্তমান যুগ-প্রয়োজনে আটটি বর্ণের সমাজে বাঁধতে হবে। পূর্বের বর্ণ চারিটির মধ্যে তিনটির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই শব্দগুলির সঙ্গে এর গুণগুলির প্রভাব আজও এত গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে এ জাতির মূল ক্ষেত্রে—তাই এই তিনটিকে রেখে তার সঙ্গে আরও পাঁচটি বর্ণের যোগ—তাতে এই আটটি গুণকর্মে বিভক্ত একটি পূর্ণ সর্বজনীন সঙ্ঘবদ্ধ উদার হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেই আটটি বর্ণ যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, নৈতিক, বিজ্ঞানী এবং কর্মী এই আটটি বৃত্তি গুণগত কর্মে বিভক্ত হবে এই ভারতীয় হিন্দুজাতি। আজ প্রথম থেকেই একেবারে হয়তো ভারতীয় হবেনা, এখন

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ নামেই চলুক। আমার এই বিশ্বাস আছে যে আজ এই সংস্কারের যথার্থ উপকারিতা এবং ব্যবহার বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হলেই কাল সারা ভারতবর্ষ নিজ নিজ প্রদেশের উপযোগিতা অনুসারে এই সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে কারণ তাদেরও বাঁচতে হবে। আমি এবং আমার গুরু এই পথটি ধ্রুব পথ বলেই সিদ্ধান্ত করেছি। এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সহজ ও নিরাপদ সংস্কারের পথ। নব হিন্দুরা হবে পূর্ব সমাজগত কুসংস্কার-মুক্ত নানা সংভাবে অনুপ্রাণিত বিশাল বিশ্বজাতি সমুদ্রের পানে গতিশীল।—নিঃসঙ্কোচ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সবল, দৃঢ় সামাজিক ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত, নবীন এক নির্ভীক হিন্দু-সমাজ ; তার মধ্যে থাকবে গুণ ও কর্মে বিভক্ত সমাজের অপূর্ব পরিচয়,—বৃত্তিগত শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টবোধ ও দ্বিধাহীন অগ্রগতি। আমাদের এই হিন্দু-সমাজে শূদ্র নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, নৈতিক, বিজ্ঞানী ও কর্মী এই আটটি বা অষ্টবৃত্তিতে পরিপূর্ণ একটি আদর্শ সমাজ।

১। ব্রাহ্মণ থাকবেন তাঁরাই, বৃত্তিতে যাঁরা যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিতে জীবন উৎসর্গ করবেন, তাই-ই হবে তাঁদের উপজীবিকা দশবিধ সংস্কারে দক্ষ অধীতবিদ্যা এবং স্বার্থ-নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ। সমাজের সকল শ্রেণীর কল্যাণকামী, সকল শ্রেণীরই পুরোহিত,—তিনি এই অষ্টবৃত্তিভুক্ত সকল সংসারই জাতিকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত সকল সংস্কারকর্মই সম্পাদন করেন। এই ব্রাহ্মণ বংশগত নয়, বৃত্তিগত।

২। ক্ষত্রিয় থাকবেন তাঁরাই যাঁরা বাহুবলে নিজ দেশ ও সমাজ-রক্ষার জন্য রণনীতি বা যুদ্ধব্যবসায়ী। পৌর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এই সৈন্য-বিভাগে অথবা বহিঃশত্রু থেকে দেশরক্ষার কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁর জাতি ও সমাজ রক্ষা করবেন। দেশের বালকদের ভবিষ্যতে দেশরক্ষক হিসাবেই প্রস্তুত করবেন। তাঁরাই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষিত করবেন উপযুক্ত ছেলেদের এবং মেয়েদের।

৩। বৈশ্য,—বণিক, ব্যবসায়ী ; সমাজের উৎপন্ন ধন-ধান্য, বস্ত্রাদি যাবতীয় খাদ্য শস্যাদি ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, নানা স্থানে প্রেরণ, প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণা সভার নির্দেশে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন।

৪। বৈদ্য,—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী. রাসায়নিক ; নানা রোগ ও ঔষধ নির্বাচন দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে গবেষণাদি করবেন।

৫। নৈতিক,—সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা, অপরাধের বিচার, আইন, প্রভৃতি সম্পর্কিত দেশের নৈতিক জীবনকে সবল করে তুলবেন।

৬। বিজ্ঞানী,—পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান, শিক্ষাদান করবেন এবং উপদেষ্টা এই বিভাগে উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করে দেশের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৭। শিল্পী,—কলাবিদ্, সাহিত্য, সঙ্গীত, কাব্য এবং যত প্রকারের কর্ম শিল্প-অধিকারে আসে তাতে নিবিষ্ট থাকবেন।

৮। কর্মী.—উক্ত সপ্তবর্ণের বৃত্তি তদতিরিক্ত যা কিছু চাকুরিজীবী,—অর্থ উপার্জনের সংবৃত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাইই অবলম্বন করে সমাজের

পুষ্টি সাধনই এই কর্মীদের অধিকার। অর্থাৎ সকল বিভাগেই হিসাব রক্ষক প্রভৃতি যত প্রকার প্রয়োজনীয় কর্ম তাতেই নিযুক্ত হবেন।

এই আটটি বৃত্তিতে অর্থাৎ অবলম্বন, অথবা জীবিকা উপার্জনের বৃত্তিতে,—অন্য কথায় বর্ণে হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ থাকুক। এরপর প্রধান কথা হল যেটা বর্ণ বা বৃত্তি বংশগত নয়, ব্যক্তিগত। কোনও বৃত্তি ছোট নয়, তুলনায় শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্টের স্থান নেই। একটির অভাবে অপরাপর বৃত্তি অচল, কথামালার উদর ও অন্যান্য অবয়বের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। দেশ পরিচালনায় এই অষ্টবিভাগের আটটি মন্ত্রীর কর্তৃত্ব থাকবে। দেশের প্রত্যেকেই বিদ্যার ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিভাগেই অগ্রগতি অর্জন করবেন। সকল বর্ণের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তা সম্পূর্ণ হবার পর তখন বৃত্তিগত-শিক্ষারম্ভ করতে হবে।

কোন বর্ণ বা বৃত্তি বংশগত নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম তা নয়। হতে পারে না ;—একটা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত নিলেই পরিষ্কার বুঝা যাবে ;—যেমন কোন এক ব্রাহ্মণ জাতকের, অবস্থা, স্বভাব, প্রবৃত্তি ভাগ্যের এবং কর্মক্ষেত্রের বা ভোগের যে সকল যোগাযোগ আছে,—এই ব্যক্তির পুত্রেরও কি ঐসব প্রবৃত্তি এবং বৈচিত্রপূর্ণ যোগাযোগ ঘটবে ? এটা যেমন ঘটেনা বা হয় না তেমনি ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্যই হবে এমন কোন কথা নেই। প্রকৃতির নিয়মও তা নয়। বৃত্তি এক সময় ত বংশগত ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় বলে সমাজে গণনীয় হোতো, সমাজ-গঠন তখন অন্য রকম ছিল, প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ বৃত্তির উপর প্রবল নিষ্ঠা ছিল, সেইজন্য সমাজ শক্তিশালী ছিল। সেকাল এখন নেই—ব্রাহ্মণের উপজীবিকায় এখন কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান পৈতৃকবৃত্তি বলে নিষ্ঠাশীল নয়। সমাজ-শক্তির উৎস, নিজ সমাজের উপর আস্থা,—আর নিজ বৃত্তির উপর আস্থা। কাজেই সহজ বুদ্ধিতেই ধরা যায় বৃত্তি আর ধর্ম ব্যক্তিগত, এইটিই প্রাকৃতিক নিয়ম। অভিজ্ঞতায় এটাও দেখা গিয়েছে যে একটি কোন বৃত্তি বিশেষের উপর নিষ্ঠা বংশগত বা চিরন্তন হতে পারে না। সৃষ্টিধরের সৃষ্টিকে ঐ রকম একঘেয়ে রাখার উদ্দেশ্য মোটেই নয়। বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য একের সঙ্গে অপরের প্রাণের যোগ। তা যদি না হোতো তা হলে শুধু আজ বোলে নয়, প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণের ছেলে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করবে কেন ? ব্রাহ্মণের পাঁচটি ছেলে যদি থাকে, দেখা যায় যে ঐ পাঁচটি কখনও এক বৃত্তি-অবলম্বী নয়। না হওয়াটাই স্বাভাবিক একথাটা যেন মনে থাকে। ব্রাহ্মণের ছেলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি, বৈশ্যের বৃত্তি, বৈদ্যের বৃত্তি নিয়েচে,—এমন কি মজুরের বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে, কোন বিশেষ বৃত্তিসুলভ বিদ্যা বা গুণের অভাবে। এতো সহজেই দেখতে পাচ্চি, আমাদের এখানকার সমাজের দিকে চাইলে। তাহলে বর্ণ বা বৃত্তিকেই ব্যক্তিগত স্বাধীন অস্তিত্বের মূল কথা ধরে সমাজ বাঁধলে সেইটাই ত প্রাকৃত নিয়মে সৃষ্টির মধ্যে অভ্যুদয়ের পরিপোষক হয়।

তা ছাড়া বংশের মহিমাও এতে কমে না। সকল বড় বড় বংশেই বংশধরদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৃত্তি দেখা যায়, তাতে বংশ গরিমা উজ্জ্বল হয়েই থাকে। এক সংসারে বা এক অন্নে সংসার বাঁধা সেটা ভিন্ন কথা তার সঙ্গে বৃত্তির বা বর্ণের কথা নেই। সমাজ বাঁধবার মূলকথা সমাজের প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ সংস্কৃতি এবং সমাজ উপযোগী গুণগত বৈশিষ্ট্যে সচেতন

থাকা। একত্ব অনুভূতিই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি তার সঙ্গে বর্ণ বা বৃত্তিগত কোন দ্বন্দ্ব নেই। সারা জগতের স্বাধীন সমাজের দিকে চাইলেই এ সত্য অনুভূত হবে।

আমাকে এতটা বলতে হোতোনা যদি বৃত্তি ত্যাগ করেও ব্রাহ্মণরা বা ক্ষত্রিয়েরা নিজবংশগত শ্রেষ্ঠতার দাবী এবং অন্যান্য বৃত্তিকে ইতর নাম দিয়ে ধর্মের নামে এক বিষম শ্রেষ্ঠত্বের জট না পাকাতো। ঐ ব্যাবহারিক ধর্মের জট ছাড়াতে হবে। আর তার একমাত্র সত্য উপায় হোলো অধ্যাত্মধর্ম ব্যক্তিগত এই নিয়ম স্বীকার করা। তাতে সবার অধিকার আছে। ধর্মে আমরা হিন্দু এই পর্যন্ত জাতি নিয়ে কথা। তারপর বৃত্তির কথা। কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। কারণ সকল বৃত্তিই মানুষ-সমাজ পুষ্টির জন্য। হিন্দু-জাতি যদি শ্রেষ্ঠ হয় তা হলে এই জন্যই হবে যে, তারা সবার মধ্যে এক আত্মা দেখতে পায়; যা এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই অংশ। তারপর নিজ নিজ বৃত্তিতে নিষ্ঠা, যার ফলে সবল উন্নতিমুখী এক সমাজ। ব্যাবহারিকভাবে প্রবৃত্তিও ধর্ম নামে অভিহিত হয়, কিন্তু আসলে অধ্যাত্ম প্রেরণাই হিন্দুজাতির ধর্ম এবং তার যথার্থ সংজ্ঞা। তাকে কখনও সম্প্রদায়গত করা চলেনা কারণ অধিকারের তারতম্য চিরদিনই থাকবে। সুতরাং আচার ও ধর্মকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে সমাজশৃংখলা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। অধ্যাত্ম ধর্ম যার নাম আত্মচৈতন্য বিকাশ তা জীবের উন্নত অবস্থায় হয়ে থাকে, তা কখনও দল বেঁধে হয় না; কারণ তা হবার নয়।

এখন এই যে আটটি বর্ণ বা বৃত্তিমূলক সংজ্ঞা নিয়ে সম্পূর্ণভাবেই হিন্দু জাতিকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে,—পরে যদি এমন দেখা যায় যে কোন নূতন কর্মবৃত্তির আবির্ভাব ঘটেছে সমাজ মধ্যে, যাতে কিছু তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে তখন সমাজপ্রধানেরা একত্র হয়ে ঐ বৃত্তিনির্দ্দেশক উপযুক্ত নামকরণ করে তাকে সমাজ-অঙ্গে যুক্ত করবেন। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় যে চারিটি বর্ণ নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, দেশকাল প্রভাবে সেই চার থেকে অনেকগুলি বর্ণের সৃষ্টি এবং তাতে সমাজবাহু বহুদূর প্রসারিত হয়েছে,—আর সেই সূত্রেই আমরা বর্তমানে অষ্টবর্ণে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে নিয়ে নবযাত্রা আরম্ভ করচি, সেই রকম ভবিষ্যতে নবতম বৃত্তির পরিচয় পেলে তাকে যত্ন করেই সমাজভুক্ত করে সমাজশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আমার মনে হয় বর্তমানে আমাদের এই আটটির মধ্যে সমাজস্থ সকল বৃত্তিরই স্থান সঙ্কুলান হবে।

ধর্ম সম্বন্ধেও আগে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে, এখনও তা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যে এ পৃথিবীতে ধর্ম সম্প্রদায়গত জাতি আছে আবার দেশের নামে জাতিও আছে। দেশ ও সমাজ নিয়ে যে জাতিনির্দ্দেশ সেইটাই সমীচীন মনে হয়,—ধর্ম সম্প্রদায়গত যে জাতির নির্দ্দেশ তার মধ্যে হিংসা, হত্যা ও ষড়যন্ত্র প্রধান বলেই তারা জগৎ-প্রসিদ্ধ একথা আপনারা জানেন। কারণ তাদের মধ্যে যে ধর্ম, তা জীবনের উপলব্ধ বা প্রমাণিত সত্য নয়, সম্প্রদায়গত ব্যাবহারিক প্রবৃত্তিমূলক আচার মাত্র। ভারতের মধ্যেও ধর্ম নিয়ে হয়তো হিংসা প্রতি-হিংসামূলক কর্ম ঘটে গিয়েছে,—সাধারণতঃ ঐ ঐ সমাজের ধর্মবস্তুর সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটেনি বলেই এ সকল অঘটন সম্ভব হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় কোন সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে অনুভূত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না;—এ সত্য এখন সর্বজগতের, সভ্য সকল সমাজের মধ্যে সহজভাবেই

প্রমাণিত তাই এখন আর কোন সভ্যজাতিকে ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সভ্য জাতি হিসাবে গণ্য করা চলেনা। কোন বর্বর যুগের ইতিহাস যেমন বর্তমানের এই বিংশ শতকের মধ্যভাগে অচল, কারণ এ যুগে লোকাচারকে আর ধর্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাবে না, ধর্মের সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ সভ্যতার আলোয় অনেক উজ্জ্বল, অনেক উন্নত হয়েচে। যথার্থ ধর্ম যে বস্তু তার স্থান ব্যাবহারিকভাবে নির্দেশ করা চলেনা সেইজন্যই তাকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়ীভূত বলে সিদ্ধান্ত করাই ঠিক। তা হলেই ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসন হবে। ধর্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তি কখনও সংঘর্ষের মধ্যে যেতে পারেন না, তেমনি আমরাও সামাজিকভাবে জাতিতে হিন্দুই থাকবো, ধর্মকে সম্প্রদায়বদ্ধ করে ভণ্ড মনোভাবের পরিচয় দেবো না জগৎজোড়া প্রতিবেশীদের কাছে। সমাজেরও সদর ও অন্দর আছে,—ধর্ম অতীব কোমল প্রেমময় সত্ত্বা, তার স্হান সদরে নয়, সমাজ-অন্দরের অতি নিভৃত প্রদেশে তার স্থান ; আর সেই জন্যই অতি প্রিয়জন বা আত্মীয় ব্যতীত প্রতিবেশী সাধারণের সেখানে প্রবেশ অধিকার নাই। প্রীতিবদ্ধ না হলে কেউ তার নির্দেশ পায়না। কারণ ধর্মের মূল প্রেম, কেউবা জ্ঞানকেই মূল মনে করেন। কাজেই জ্ঞানই হোক, বা প্রেমই হোক,—এই দুইয়ের অধিকারীর দ্বারা কখনও সমাজের অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই ; ঈর্ষা, হিংসা, দম্ভ প্রভৃতির স্থানও নাই ধর্মের মধ্যে ! কাজেই ধর্মের দোহাই দিয়ে দম্ভ করে ধর্মাশ্রিত বলে জাতির পরিচয় দেবার মূঢ়তা যেন দেশস্থ কোন একটি নাগরিকের না আসে। অন্ততঃ, ধর্মের সঙ্গে হিন্দু জাতির অস্তিত্বের কথা আলোচনা বা জাগতিক প্রতিবেশীবর্গের সামনে সগর্বে ঘোষণা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত। আমরা ভারতবাসী হিন্দুসমাজ এইটুকুই আমাদের স্বাধীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিচয়। যথার্থই ধর্ম থাকবে আমাদের হৃদয় কন্দরে, নিভৃত আলোচনা অভ্যাস এবং সাধনার ধন। রাজনীতি অথবা সম্প্রদায়গতভাবে তার শ্রেষ্ঠত্বর দাম্ভিক পরিচয় থাকবে না।

॥ ২৫ ॥

চণ্ডালকন্যার কথা শুনিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, সে বিস্ময়ের কূল নাই। কতক্ষণ, সভা একেবারেই স্তব্ধ ;—সবাই যেন গভীর চিন্তামগ্ন ; বক্তাও, যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া যেন সমবেত জনসমষ্টির মনোভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন ;—যাহারা সম্মুখে ছিল তাহারাই দেখিয়াছিল—আমি পিছনে থাকায় কেবল তাঁহার স্থির, দৃঢ়, ঋজু শরীর-রেখাই দেখিলাম। যেন একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই এবার তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ

আজ আর বেশীক্ষণ আপনাদের আটকে রাখবোনা.—অবশিষ্ট যে কয়েকটি বিষয় আছে সেগুলি সংক্ষেপে বলবার আগে একটি গুরুতর বিষয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই জীর্ণ অসুস্থ, গতিহীন সমাজকে নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণপূর্ণ করতে প্রধান অবলম্বনীয় যা কিছু আগেই বলেছি, সে সব ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হলে যে ভাবের অনুষ্ঠান দরকার আপনারা সমবেতভাবে আলোচনা দ্বারাই তা স্থির করে নেবেন ;—যেহেতু সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি নিয়ম বা নীতি যা দেশের বর্তমান সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগে

প্রযত্ন হবে,—তা নির্দ্ধারণ এবং নির্দ্দেশ আমার একার দ্বারা কখনই সম্ভব না, সুতরাং সে সকল ভার আপনাদের সদ্ভাব এবং সুবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়ে এখন আশু কর্তব্য সম্বন্ধে, আমার মতে বর্তমানে যেগুলি নিতান্তই প্রয়োজন তার কথাই বলচি, আপনারা অবহিত হোন।

সামাজিক ব্যবহারে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যের কথা গুরুতর ;—তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক আমি সহজ সামাজিক প্রয়োজনের কথাই বলব। আমাদের নিজ সমাজের কল্যাণের জন্যই সমবেত গণশক্তি প্রয়োগ করে, শিক্ষা ও সদিচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অশিক্ষিত প্রতিবেশী সমাজের হিংসা ও পশুবৃত্তির প্রভাব, ধর্মের নামে অন্য সমাজের উপর যথেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি এবং ধারণা লোপ করতে হবে। অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক নিয়মেই যারা আমাদের গা ঘেঁষে রয়েচে, তাদের উপেক্ষা বা অস্বীকার করা মূঢ়তা,—আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ ক'রে অথবা দগ্ধ যন্ত্রণা নিয়ে মৌখিক সদিচ্ছার প্রলেপ লাগানো ততোধিক মূঢ়তা। তাই, মুখের কথায় বা বক্তৃতায় ঐ সম্প্রদায়ের যারা হিংস্রভাবাপন্ন তাদের, ভাই বলে নম্র সম্বোধন আত্মপ্রবঞ্চনা, তাকে ভণ্ডামো ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ঐভাবের ভাই সম্বোধন সর্বথা পরিত্যাজ্য। কারণ তোমার মৌখিক ভ্রাতৃ-সম্বোধনে তার অন্তরের মূঢ়তা, হিংসা প্রবৃত্তি অথবা ঔদ্ধত্য কিছুমাত্র কম হবে না বরং তোমাদের নম্রতাকে তারা দুর্বলতা, কাপুরুষতা বলেই মনে ক'রে তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেই যাবে কারণ পশুবৃত্তির ধর্মই হোলো দাঁত, নখ, কর্মেন্দ্রিয় ব্যবহার, তা ছাড়া আর কিছু তারা বোঝে না। কারণ তাই তাদের ধর্ম। ভবিষ্যতে যখন সত্য-সত্যই পরস্পর প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হবে, আর সেটা সহজ সত্য ব্যবহারের দ্বারাই হবে ;—তখন ঐভাবে ভাই, বন্ধু সম্বোধন সার্থক হবে, সত্য হবে, তার আগে নয়। অনেকেই এমন আছেন যাঁরা মনে করেন, মনের মধ্যে যাই-ই থাক না কেন, মুখে ভাই ভাই সম্বন্ধ প্রকাশ করা ভালো কারণ ঐ শব্দটা তাদের এবং আমাদের দুই পক্ষের কানেই ভাল লাগবে আর তাতে বিরোধের সম্ভাবনা কমবে। শুনতে এটা যতই কর্ণরোচক হোক না কেন, বাস্তবভাবে তা হবার নয়। সত্যের উপর মিথ্যার প্রলেপ স্থায়ী হয় না কখনই। মানুষের মনটা এতো সরল বা সহজ বস্তু নয় তার পিছনে বুদ্ধির তীক্ষ্ম ক্রিয়া আছে। সামাজিক একতাহীনতা, দুর্বল স্বভাব এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে—হিন্দুরা যে নৃশংস অত্যাচার, নরনারী-নির্বিচারে পেয়ে এসেছে কালের প্রভাবে তা ভুলে, সহজ প্রতিবেশী ভ্রাতৃভাব হয়ত জাগাতে সহায়তা করতে পারতো কিন্তু একটু বিচার করলেই এটা স্পষ্ট দেখা যায় তাদের ঐ হিংস্র কর্মধারা, হিন্দু প্রতিবেশীর উপর তাদের আক্রমণের ধারা ঠিক অতীতের মতই বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্চে ;—তাদের প্রকৃতিগত হিংসারীতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এ বিষয়ে তাদের অধ্যবসায় অনন্য-সাধারণ,—এবং এতে তাদের সমাজের সর্বস্তরের না হলেও বেশ বড় রকম একটা সংখ্যার অনুমোদন প্ররোচনা এবং নির্দ্দেশ আছে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, মূঢ়তা ইত্যাদি সত্য এবং কল্পিত কারণগুলি যাই হোক না কেন হিন্দুরা অন্তর থেকে মার্জনা দ্বারা সহজ হতে না পারলে প্রীতির ভাব আসতেই পারবে না। মার্জনা অর্থে ক্ষমা নয় ;—বিরোধের ফলে হিন্দুর মনেও যে মলিনতা এসেছে (ঘৃণা, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি) সেই মলিনতা সম্পর্কে সম্মার্জনার কথাই বলচি। তারপর হিন্দু সমাজের পুরুষেরা যদিও বা তাদের দুর্ব্যবহার কালক্রমে উপেক্ষার

চক্ষে দেখতে এবং নানাভাবের কর্ম-সম্পর্কে আদান-প্রদানের ফলে ভুলতে পারে, —নারী, অন্তঃপুরস্থ নারীপক্ষ থেকে তাদের প্রতি যে বিজাতীয় ঘৃণা,—সেটা যাবে কি ক'রে? অন্তরে ঘৃণা পোষণ, শরীরের মধ্যে বিষ পোষণের মতই অস্বাস্থ্যকর, পরিণামে ক্ষত উৎপন্ন ক'রে যায়, ফলে ঘোর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা রয়ে যায়। এই সত্য আমাদের নারী সমাজে প্রকাশ এবং নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবের দুষ্ট প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাদের সামাজিক কর্ম একটু বেড়ে যাবে, কিন্তু এর অন্য উপায় নাই, উপেক্ষা এবং অস্বীকারেও কোন শুভ ফল হবে না। এটা আপনারা মনে রাখবেন ; এ আমাদের গায়ের ঘা— আরোগ্যের ব্যবস্থা করতেই হবে।

এখন দ্বিতীয়টি বলছি ;—বর্তমানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তা প্রধানতঃ হিন্দুবিদ্বেষ-সম্ভূত বৃটিশ ষড়যন্ত্রের ফলেই কতকগুলি শব্দ সৃষ্ট হয়েছিল, আর দেশের অপরিণামদর্শী নেতারা তা মেনে নিয়ে ব্যবহার করে-ছিলেন, যেমন,—কাস্ট্ হিন্দু, সিডিউল্ড্ কাস্ট্, তপশিলভুক্ত ডিপ্রেসড ক্লাস, পঞ্চমা হরিজন ইত্যাদি—এখন এগুলি চিরদিনের জন্যই ভারতের হিন্দু সমাজ থেকে লোপ করতে হবে। এই সঙ্গে আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রে থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতি বিশেষ বিভাগের অভিনেত্রীবর্গের প্রতি বিকৃত অসঙ্গত ও অসংযত ভক্তির আতিশয্যে নটীগণের নামের শেষে দেবী শব্দের প্রয়োগ যথেচ্ছা চলেছে। এ ব্যভিচার আমাদের সমাজের আদর্শ বিকৃতির ফল। আমি শুধু বারবিলাসিনীদের বা সম্ভ্রান্ত অথবা সাধারণ প্রতিষ্ঠাপন্ন অভিনেত্রীদের নামের সঙ্গে দেবী শব্দের প্রয়োগ নিবারণ চাইচি না, আমি নবীন হিন্দুজাতির সাধারণ গৃহস্থ সকল নারী নামের শেষেই দেবী শব্দ নিষিদ্ধ করতে চাইচি। কলাবিদ নর-নারীর গৌরব তাদের সাধনা ও সিদ্ধিতে, তার মধ্যে দেবী বা দেবত্ব আরোপ মুগ্ধ ভাবাবেগপ্রসূত বিক্ষিপ্ত চিত্তের একটা দম্ভমাত্র। অসাধারণ চরিত্র এব কর্মশক্তির বিকাশে কোনও নারীর মধ্যে যথার্থ দেবীত্ব যদি প্রকাশ পায় তাতে আপামর-সাধারণ তাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজেদেরই অন্তর পূর্ণ করেন। সেই পবিত্র দেবী শব্দ যারা যথেচ্ছা প্রয়োগ করতে চান, তাঁদের আরোগ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অধিকারের ব্যাপার। বর্তমানের আবহাওয়ায় আমাদের এই দেশে অনুকরণ সঞ্জীবিত নাটক অথবা চিত্রাভিনয় প্রভৃতি কলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আদর্শ তো যথেষ্ট প্রবল রয়েচে। এখন শ্রেষ্ঠ বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাঁরা তাঁদের নামের সঙ্গে ষ্টার, অনুবাদে তারকা, বলে গৌরব প্রচারের রীতি পাকা করলেই তো চুকে যায়। তাতে যদি মন না ভরে তাহ'লে তার চেয়েও উচ্চস্তরের শব্দ আবিষ্কার করবেন যেমন নীহারিকা ইত্যাদি—এবং নটী বা অভিনেত্রীবর্গের পরিচয়ার্থে দেবী শব্দ নিষিদ্ধ ক'রে শব্দের মিথ্যা প্রয়োগ রোধ করতে হবে। এই ব্যবহার, আমাদের বাক্য সংযমে সাহায্য করবে।

১ম—বর্তমানে মুখুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলী এঁরা ছিলেন উপাধ্যায় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ;—প্রথমাবস্থায় তাঁরা যে যে গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন সেই সেই গ্রামের নামের সঙ্গে তাঁদের শ্রেণীগত নাম যুক্ত হয়ে বর্তমানেও ঐ সকল বংশনাম চালানো হয়ে আসচে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যে ঐভাবের উপাধি ব্যবহারের আর প্রয়োজন থাকা উচিত নয় কারণ ঐ উপাধির সঙ্গে উচ্চ নীচ এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করেই উপাধি নির্দ্দিষ্ট হবে। যখন এই

অষ্টবর্ণের লোক ইচ্ছামাত্রই হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের অধিকারী হচ্ছে এবং উচ্চ নীচ ভেদের মূল বংশগত জাতি বা বর্ণ থাকচে না এবং বিবাহ আদি এই অষ্টবর্ণের মধ্যে অবাধে চলতে পারছে তখন ঐ পুরানো বর্ণ নির্দ্দেশক চাটুজ্জে দত্ত রায় এসব তুলে নিয়ে নববর্ণের অর্থাৎ নামের আগে কিম্বা শেষে ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, নৈতিক, বিজ্ঞানী, কর্মী এসকল যোজনা করা যেতে পারে, তা খারাপ শোনাবে না। বর্তমানে যেসব উদ্ভট পদবী আছে তার তুলনায় এই নব সমাজের বর্ণ নির্দ্দেশকারী পদবী সুন্দর। তারপর রায়-বাহাদুর, খাঁবাহাদুর, খাঁসাহেব, মজুমদার, জোয়ারদার, চোংদার প্রভৃতি যত উদ্ভট্ কুশ্রী লেজুড়গুলি লোপ ক'রে সহজ সরল মানুষের মত নামকেও সহজ মনুষ্যত্বের ছাঁচে ঢালতে হবে। এ সমাজে একজনের নামটাই হবে মুখ্য, আসল, তারপর বৃত্তি বা বর্ণ নির্দ্দেশক নাম।

২য়—ব্রাহ্মণের কিম্বা যে কোন বর্ণের যদি আটটি পুত্র থাকে ঐ আটটি পুত্র আজ আটটি বৃত্তি অনুসারেই পদবী গ্রহণ করবেন। যতদিন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট না হবে ততদিন নামের আদিতে শুধু কুমার থাকবে, পিতার বর্ণগত উপাধি বা পদবীতে পরিচিত হবেন না। নারীর পক্ষেও সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারবে, কুমারী অবস্থায় কুমারীই ব্যবহৃত হবে ; তারপর বিবাহিত হলে স্বামীর পদবীই গ্রহণ করবেন। নারীমাত্রেই যে বিবাহিতা হবেন অথবা বৃত্তিশূন্যা হয়ে স্বামীর বৃত্তি উপার্জনের অংশভাগিনী থাকবেন এমন নাও হতে পারে তো। পরে তিনি যে বৃত্তিদ্বারা উপার্জন করবেন সেই বৃত্তি-সংকল্পিত বর্ণে পরিচিতা হতে পারবেন যদি ইচ্ছা করেন। সে সকল বিষয়ে পরিচয় সম্পর্কে তাঁর নিজ বৃত্তিই কার্য্যকরী হবে, এতে বাদ-প্রতিবাদের কারণ থাকা উচিত নয়।

৩য়—পূর্বেই বলা হয়েচে বর্তমানের এ নবীন হিন্দু জাতীর অষ্টবর্ণের মধ্যে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীভেদ থাকবেনা। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত থেকে সকল বৃত্তি-অবলম্বী বর্ণের মধ্যে হিন্দুর দশবিধ সংস্কার ক্রিয়াশীল থাকবে। আর তাঁদের ইচ্ছামতই তা গৃহীত হবে। অবশ্য এখানে ভারতীয় হিন্দু জাতি সবাই দশবিধ সংস্কারে আস্থাশীল এই সত্য মেনে নিয়েই এটি প্রস্তাবিত হয়েচে। জাত সংস্কারের প্রথম এই অন্নপ্রাশনই ধরা হবে তারপর উপনয়ন বিবাহ, কুশণ্ডিকা ও শ্রাদ্ধ এই কয়টিই বর্তমানে প্রতিপাল্য—বাকি বা মধ্যের যে কয়টি আছে বর্তমান সমাজে তার প্রয়োজন নেই, তাই স্বতঃই অদৃশ্য হয়েছে যেমন এখন আট নয় বৎসরে বিবাহ উঠে গিয়েচে, কাজেই বিবাহের পর সন্তান প্রসব-কালের মধ্যে যেগুলি, তাকে আর সংস্কার বলে ধরা হয়না বা তার প্রয়োজনের কথা সাধারণের মনে খুব বেশী সাড়া জাগায়না অবশ্য তাতে পঞ্চগব্যাদি সেবনের যে বিধান আছে তা হয়তো সবার রুচিসম্মত হবেনা, তাঁরা ওটা বাদ দেবেন। তবে ওর মধ্যে কতকগুলি পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়াকর্ম আছে তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদের অনেকের জানা নেই বলেই তার ব্যবহার অনাবশ্যক মনে হয়। এক সময়ে যখন সর্ববাদীসম্মত বৈজ্ঞানিকতথ্য-গুলি জাতির বুদ্ধিগত হবে তখনই ঐ সকল ব্যবহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। হিন্দুর জাতীয় সংস্কারের যা কিছু সবই কুসংস্কার এ ধারণাও এখনকার দিনে মূঢ়তার নামান্তর। আমরা উপযুক্ত কল্যাণকর পরিবর্তনেরই পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে কতকগুলি সহজ প্রথার লোপ ক'রে আমাদের সামাজিক জীবনে সংযমের যে হানি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে আর

জাতিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় ;—এখানে পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাব এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই কার্য্যকরী হয়ে উঠেছে, বর্তমানে ওসব সংস্কার সমাজের পুরুষদের মনের মধ্যে নেই। কোন কোন সংসারের নারীদের মধ্যে হয়তো আছে। যাঁদের আছে তাঁরা করুন যতদিন পারেন তাতে কারো আপত্তির কারণ নেই। আমার নিজের মত এই যে সংযম ভিতর থেকেই ভালো, বাইরের কোন আচার বা অনুষ্ঠানকে ধরে সংযমকে মানানো অসম্ভব এবং প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। জাতির সংযম,—পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়, প্রতি সংসারের মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আর মনের সঙ্গেই বাঁধা ; এর অন্য ভাবের ব্যাখ্যা নেই।

এখন এ নূতন হিন্দু জাতির যে কয়টি সংস্কার পালনীয় রইলো তার মধ্যে প্রত্যেক সংস্কারের কাজে সংস্কৃত মন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করে সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় সহজ সরল অনুবাদ আবৃত্তির দৃঢ় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এখন থেকে প্রত্যেক শুভ কাজে উপনয়ন, বিবাহ, কুশণ্ডিকা ও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকালে, বিশেষতঃ বিবাহের সম্প্রদান ও কুশণ্ডিকা পাণিগ্রহণ প্রভৃতি সংস্কারের ক্রিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃত মন্ত্রের নির্ভুল বাঙ্গলা অনুবাদ উচ্চারিত হবে। পাত্র পাত্রী পুরোহিত প্রত্যেকেই সেই সকল মন্ত্রানুবাদ মনোযোগী হয়ে আবৃত্তি করবেন। যাঁরা সংস্কারে বিশ্বাসী তাঁরা প্রকৃত অর্থবোধ করবেন এইটিই ছিল প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য। এই অনুবাদ কার্য্যকালে পরিচয় দেবে এ জাতির পূর্বপুরুষগণ কত মহান ছিলেন। বর্তমানের শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের চাপে জাতীয় সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গিয়েছে বলেই জাতি এতটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে কেবল উৎসবের দিকেই বেশী ঝুঁকচে, উৎসবের মূল সংস্কারের উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে। আমাদের জাতীয় সামাজিক অথবা পারিবারিক কল্যাণের মূল এই সংস্কার ; এটি মনে রেখে প্রত্যেক মন্ত্রের সহজ সরল বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হবে। এটি উপেক্ষা করা চলবে না। আমি বিশেষভাবেই বিবাহ সংস্কারের উপর জোর দিয়েছি তাতে হয়তো আপনারা আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন। দেশে সুস্থ উপার্জনশীল যুবারা বিবাহ করেন কিন্তু জানেন না, সম্প্রদান এবং কুশণ্ডিকায় কি প্রতিজ্ঞা করে এক নিরীহ বালিকার জীবনদায়িত্ব এবং পাণিগ্রহণ করলেন। নিজ মাতৃভাষায় উচ্চারিত হলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হবেন তাতে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি বাড়বে। তার ফল যে কল্যাণকর হবে, এ বিষয়ে যাদের সংশয় আছে তারা যেন এ সভার বাইরে থাকেন। উপনয়ন সংস্কাটিও যেন আপনারা উপেক্ষা না করেন। সত্য সত্যই সভ্য জাতির একজন ভাবী-নাগরিকের জীবনে এতটা উচ্চ সংস্কৃতির আরম্ভ বোধ হয় পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে নেই। একটা জাতীয় সমাজে এক পরিবারের মধ্যে একটি নবীন ব্যক্তির জীবনে সূর্য্যকে দেবস্থানে রেখে এই সম্বন্ধের আরোপ কত মহৎ শক্তি প্রসব করে একবার যেন অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাও কিছুদিন পরীক্ষা ক'রে দেখেন। যাঁরা হিন্দু সংস্কারের সর্বথা উচ্ছেদ চান তাঁরা মোটেই ধীমান্ নন ; তাঁদের গোড়াকার গলদ বিশ্লেষণযোগ্য নয়, সেটা বিষম সেই জন্য তাতে বিরত হলাম। একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক গঠনের পক্ষে এই সংস্কারটি যে কত বড় প্রবেশিকা তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে অন্য একটি বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন।

বিবাহ যেমন প্রয়োজনের প্রধান, একজনের জীবনে, জাতীয় সামাজিক এবং সর্ববিধ কল্যাণময় জীবনে উপনয়নের সংস্কারেরও দৃঢ় প্রয়োজন আছে,

জাতির সর্বস্তরেই এটা স্মরণীয়, করণীয়, এবং চিন্তনীয় বিষয় হয়ে থাকে। সময়ে এর ফল অনুভূত হবে।

আরও একটি বিষয়ে একটু মনোযোগী হতে হবে :—এই যে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণী, তাঁদের উপজীবিকা তো ঐ দশমিক সংস্কারের কাজ, অধ্যাপনা এই সব নিয়েই। তাইতেই তাঁদের সংসারের সর্বার্থসিদ্ধি করতে হবে তো। সেইজন্য এখন যেভাবে দরিদ্র মতে পূজা প্রভৃতি কর্মে দক্ষিণাদির ব্যবস্থা চলচে শিক্ষিত সমাজে তা অচল। এখনকার ব্যবস্থা যদি লক্ষ্য করা যায় সহজেই নজরে পড়বে যে হিন্দুজাতি বর্তমানে কতটা অধঃপতিত এবং হীন মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে, বিশেষতঃ ধর্মের নামে কল্যাণকর সামাজিক এবং পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে। বিবাহের ব্যাপারে ঘটক অথবা দালালেরা কত রকমে কত বেশী উপার্জন করে কিন্তু বিবাহ-সম্পন্নকারী সদাচার-সম্পন্ন পুরোহিতের পাওনাটা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যদৃচ্ছালাভের মত, এতই সংকীর্ণ যে এটা বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে যে এই সামান্য দানে কেমন ক'রে তাঁরা সংসার পালন করেন এই বৃত্তির উপর নির্ভর করে ? তার সঙ্গে এটাও লক্ষ্যের বিষয় হয়ে পড়ে যে কর্মানুষ্ঠানকারী পরিবারবর্গের সংকীর্ণ হীন মনোভাব জাঁক-জমকের উৎসবে, প্রতিমাদি বাহ্য অনুষ্ঠানে সাজসজ্জায় ধুমধামে মোটা টাকা খরচ হয় তার তুলনায় পূজারী বা পুরোহিত-বিদায়টা একটু ভদ্রভাবের ভিখারী-বিদায়ের তুলনায় খুব বেশী তফাৎ নয়। একটা জাতির সামাজিক বিবেক এবং চরিত্রে এটা যে কিসের পরিচয় তা শিক্ষিত সাধারণকে স্থির মস্তিষ্কে আপন পর ন্যায় বিচার করতে অনুরোধ করচি। এটা উপেক্ষার বিষয় নয়। মনে রাখবেন আমার বাল্যকাল থেকেই ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের এবং জাতিগত গৌরবের দম্ভ অসহ্য ঘৃণার বিষয় ছিল এবং এখনও আছে ; কিন্তু আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত সত্য এই সূত্রেই আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণের যথার্থ শিক্ষা ও জ্ঞান এবং শাস্ত্র-বিচার তাঁকে যথার্থই উচ্চ স্তরে রেখে আমাদের সমাজ গৌরববোধ করেছে, আমি ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁদের সংস্পর্শে এবং ব্যবহারে এসেছি ; তাঁরা কেউ দাম্ভিক তো ননই পরন্তু নিজ গুণগরিমার বিষয়েও সজাগ নন। তাতেই আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েচে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন যারা তাদের আর কিছু গৌরবের নেই জেনে তারাই উচ্চজাত বলে দম্ভ প্রকাশ করতে চায়। আমাদেরও শিক্ষার অভাবে মনে বিদ্বেষ এসে পড়ে। জাতিগত পার্থক্যের দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় নিজেদের ছোট ভাবি বলেই কিছুতেই এই জাতি বা শ্রেণীগত বিদ্বেষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই না। এখনও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির সংস্কৃতিতেই উজ্জ্বল এদেশের সব কিছু। অন্ধবিদ্বেষে পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য মন আমাদের ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য না করতেই প্ররোচিত করে, ফলে আমাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে বঞ্চিত হতে হয়।—আদর্শভ্রষ্ট হলেই তখন পরজাতীয় হিংস্র আদর্শ গ্রহণে প্রবৃত্ত করায়, ইচ্ছা হয় ঐ নিজ সমাজের শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠাপন্ন উচ্চকে সমূলে বিনাশ ক'রে আমরাই একমাত্র উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকি এ দেশে। পাশ্চাত্যের নানা আদর্শ আমাদের সম্মুখে আজ জীবন্তভাবেই নৃত্যশীল, আমরা মূঢ়চিত্ত, ঠিক কোনটা কল্যাণকর আমাদের সমাজ-জীবনে শান্তি ও স্বচ্ছন্দ আনতে পারে কেবল সেইটাই গ্রহণ বিষয়ে বুদ্ধিহীন। রক্তচঞ্চলকারী আদর্শের মতই একটা কিছু যেন আমাদের চাই-ই যেহেতু প্রমত্ত মনের যুক্তি এই যে

ঠাণ্ডা রক্ত আমাদের মরণের পথেই নিয়ে যেতে চায় তাই আদর্শ গরম চাই। কিন্তু আমরা বুঝি না যে প্রকৃতির বিধানে আমাদের এই ভয়ঙ্কর গরম দেশে বাইরের এই ভীষণ তপ্ত আবহাওয়ায় অতটা গরম আদর্শ স্বাভাবিক নয়।

এখন আমার সর্বশেষ কথা ;—মন, প্রাণ ও অন্তরাত্মা যতটা চেতন শক্তির অধিকারী আমি আমার সর্বশক্তি নিঃশেষে প্রয়োগ করেই আপনাদের কাছে শেষ অনুরোধ এবং নিবেদনটি উপস্থিত করচি ;—অধঃপতিত এই সমাজের পুরাতন অহমিকার জড়তা, উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদের দম্ভ নিঃশেষে লোপ করে এই জাতিকে বাঁচাতে,—বাঁচার মতই বাঁচাতে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচ্চস্তরের শক্তিশালী এবং সত্যসত্যই একটি মহৎ জাতিতে পরিণত করতে সহায়তা করুন। আপনাদের এই প্রবর্ত্তনা সারা ভারতে উদ্বুদ্ধ করবে। সুতরাং পরোক্ষে আপনাদেরই সহায়তায় আপনাদের সন্তানেরাই সারা ভারতের অগ্রগতির গৌরব-ভাগী হবেন। ব্রাহ্মণে ও অব্রাহ্মণে, এই বিশাল-শরীর-হিন্দুসমাজক্ষেত্রে বর্তমানে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই ;—সুযোগ এবং অনুকূল অবস্থা পেলে এক সাঁওতাল সন্তানও শিক্ষিত হয়ে দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে এবং সাফল্যলাভ করতে পারে, মানুষ হয়ে সর্বস্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মহৎ হতে পারে। এমন কি নেতৃস্থানও অধিকার করে এই বিশ্বস্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার সার্থকতার শুভ পরিচয়ও দিতে পারে। এই অবস্থাই হিন্দু সমাজের চরম মুক্তির অবস্থা। দোহাই আপনাদের, আর ঐ গলিত শবদেহের মিথ্যা বর্ণ-গরিমায় এই বিশাল সমাজের সর্বনাশ করবেন না। আর্য্যভারতের গৌরবের, জ্ঞান ও শক্তি প্রসারের দিনে সমাজের এ কুৎসিত মূর্তি ছিলনা ;—আমার আশা শুধু নয়, বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছায় শেষেও এ মূর্তি থাকবে না, তাই না আজ আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি ঐ সমাজের আগামী প্রতিষ্ঠা ও জয়ের সংকেত নিয়ে! পরলোক যাত্রার পূর্বাহ্নে আর কিছু না পারেন আপনাদের বংশধরদের পথ, উদার সামাজিক মুক্তির পথ মুক্ত ক'রে দিয়ে যান, কায়মনোবাক্যে তাঁদের অগ্রগতির বাধা মুক্ত করে দিয়ে দেশের সামাজিক ইতিহাসে আপনাদের নিজ স্থান প্রতিষ্ঠিত ক'রে যান। সার্থক হোক আপনার জন্ম ও জীবন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন চরিত্র এবং বাণী স্মরণ করা কর্তব্য। তিনি গত শতাব্দীর শেষ দিকে একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এই জাতিভেদ গায়ের ঘায়ের উপর মামড়ীর মত, (তখনকার দিনে) তাড়াতাড়ি ওটাকে টেনে ছিঁড়তে গেলে রক্তপাত হবে ; ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ি আপনি খসে যাবে। আমার বিশ্বাস এতদিনে সে সময় এসেচে তার যথার্থ কারণ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর হয়ে গিয়েচে, এই কালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্চে এখন ঐ ব্যাধির শেষ,—সেইটি অনুভব ক'রে আপনারা এগিয়ে আসুন। প্রকৃতি অনুকূল হয়েচেন। সংস্কারে বদ্ধপরিকর হোন, না হয় মরণের পথে এগিয়ে চলুন। আমার বিশ্বাস উচ্চ নীচ দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতিভেদ যে কতটা মিথ্যা তাঁর মত কেউ অনুভব করেনি তখনকার দিনে।

এখন সন্ন্যাসীদের কথা একটু আছে। সন্ন্যাসী বা গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগী, বৈরাগ্যবান যারা তাঁরা এই অষ্টবর্ণের বাইরের মানুষ। তাঁদের পরিচয় তাঁদের আশ্রম বা গুরুসম্পর্কিত। শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, সমাজের মধ্যে যাঁর ইচ্ছা তাঁদের ভরণ-পোষণের অথবা লোক বা সমাজ-কল্যাণের কাজে সহায়তা করবেন ; তাতে বাধ্যবাধকতা নেই। শাসন কর্তৃপক্ষের অপরাধমূলক সাধারণ ন্যায় নীতি-

সম্পর্কীয় নিয়ম-শৃংখলা সমাজ বা দেশরক্ষার আইন ব্যতীত অপর সামাজিক কোন আইন তাঁদের নিজ নিজ কর্মপথের বাধা সৃষ্টি না করে, এ বিষয়ে সমাজপতিগণ সজাগ থাকবেন। এই যে সামাজিক ধর্ম এবং সমাজ নব আদর্শে গড়ে তোলবার প্রস্তাব ক'রে গেলাম এর মৌলিক চিন্তা এবং বিচার পদ্ধতির সবটাই শৈবধর্মের অধিকারের বিষয়। বর্তমানে যে শৈবধর্ম আমাদের সমাজকে বাঁচাবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, কারণ অন্য পথ নাই।

তারপর সব চুপচাপ।

এলোকেশী হঠাৎ আমার দিকে ফিরিলেন, মুখে একটা প্রসন্ন বিস্ময়ের ভাব আমাকে এখানে দেখিয়া। তারপর তাঁর আমার পানে লক্ষ্য রাখিয়াই একপা একপা অগ্রসর হওয়া,—তারপর দেখিলাম, প্রথমে কপালে তারপর আমার মাথায় তাঁহার ডানহাতের তালু রাখিলেন, বলিলেন, হাঁ, এইবার জ্বর ছাড়লো। অমৃতমধুর ঐ কথা কানে যাইতেই, ঘুম আমার ভাঙ্গিয়া গেল ;—আশ্রমের সেই ঘরে সেই শয্যায় শুইয়া আছি ;—উমাপতি বাবা আমার সামনেই দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিলাম এলোকেশী মাতা আমার মাথার শিয়রে, তাঁর হাত তখনও আমার মাথায়। আমায় জাগ্রত দেখিয়াই বলিলেন, এতদিনে জ্বরটা ছাড়লো। বাবা হাসিতে হাসিতে আমার হাতে একখানা পোষ্টকার্ড পত্র দিলেন। পড়িয়া দেখি, টাকা পাঠানো হইয়াছে সেই খবর, আর বাড়ী ফিরিবার জন্য জোর তাগাদা—। জ্বর আমার সত্য সত্যই ছাড়িয়াছিল, তারপর খুব খানিক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; ঘামে সর্বাঙ্গ তখনও সিক্ত। যেন নীরোগ হইয়া গিয়াছি ভাবিয়া অন্তরে আনন্দ ও উৎসাহ। তখনই উঠিয়া বসিলাম।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে টাকা পাইলাম এবং সেই দিনই বৈকালে যাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু উমাপতিবাবা এবং এলোকেশী বাধা দিলেন। এলোকেশী বলিলেন, আমি জানতাম আপনার ঘরের টান ধরেছে, আপনাদের সাধু সাজা কেন ?

আবার খোঁচা। কিন্তু স্বপনে তাঁকে যেভাবে এই হিন্দু সমাজ সংস্কারের বিষয়ে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম বোধ হয় তাহার একটি কথাও স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই। আনুপূর্বিক সকল কথা উভয়ের কাছেই বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া উমাপতিবাবা একটু হাসিলেন ;—বলিলেন, সত্য সত্যই ও ভেবেছে।—এই জাতির উদ্ধারের কথা, দেশের যথার্থ কল্যাণকামী বড় বড় চিন্তাশীল যাঁরা তাঁরা যতটা ভেবেছেন আমার ধারণা ও তাঁদের চৈয়ে কম তো ভাবেই নি বরং অনেক বেশীই ভেবেচে। ঐটুকু তো ওর মাথার গঠন, কি করে যে অতটা গভীর সমাজ-সংস্কারের কথা ভাবতে পারে তা আমি ভেবে পাই না। ওর শেষের কথাটা বোধ হয় শোনোনি।

জিজ্ঞাসা করিলাম. সেটা কি ? তিনি এলোকেশী মাতার দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, ও বলে, ওর ঐ মত মানতেই হবে একদিন। এ ছাড়া হিন্দুর বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই ;—হিন্দু নাম মুছে যাবে ভারত থেকে, না হয় শক্তিশালী হবে ওর প্ল্যানে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার করলে। পাছে লোকে পাগল বলে, সেই জন্য ও কারো কাছে এখনও পর্যন্ত বলেনি। আমার কাছে, ওর কিছুই গোপন নেই। ওর সব বেশ ভাল ক'রে দস্তুরমত গুছিয়ে লেখা আছে, আমার ঐ আসনের পাশে ছোট সিন্দুকের মধ্যে।

আমি সে দিনটি সেই লেখা পড়িয়াই কাটাইলাম। পরদিন দেশের দিকে যাত্রা করিলাম।

॥ ২৬ ॥

পথের বিপত্তি

যুবক হেমন্ত মিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের অফিসে কাজ করিত। নূতন বিবাহ করিয়া বৎসর দুই মহা আনন্দে সস্ত্রীক কলিকাতায় কাটাইবার পর তাহার ডিস্‌পেপসিয়া ধরিয়া গেল। স্বামী পরমানন্দ তাহাকে ভাল-বাসিতেন। একদিন স্বামীজীর কাছে গিয়াছি—হিমালয় ভ্রমণে যাইব যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী প্রভৃতি কঠিন স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা তাই যাইবার আগে শ্রীগুরু চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া যাইব এই উদ্দেশ্যেই গিয়াছি। তিনি সব শুনিয়া হেমন্তর কথা তুলিলেন। বলিলেন, ও দু'মাস ছুটি পেয়েচে ওকে সঙ্গে নাও না—কিছুদিন একটু সংসার থেকে তফাতে থাকলে ওর পক্ষে ভালই হয়। একই গুরুর সন্তান সেই সম্পর্কে গুরুভাই,—কাজেই তাহাকে সঙ্গে লইতে হইল।

কলিকাতা হইতে মুসুরী আসিয়া হেমন্ত হিমালয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম তাহাকে মুসুরীতে রাখিয়া একলাই যমুনোত্তরী যাইব। আমার যাইবার কথায় সে,—আমিও যাইব, দাদা! বলিয়া নাচিয়া উঠিল। কঠিন চড়াই উৎরাইয়ের কথা শুনিয়াও ক্ষান্ত হইল না। কাজেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সংকল্পই করিলাম। সে পাহাড়ে হাঁটিবার বুট কিনিল,—আমি খালি পায়েই ভাল চলিতে পারি।

একটি দিনে যা কিছু সংগ্রহ করিবার করিয়া দুটি কুলীর পিঠে বোঝাই দিয়া পরদিন প্রত্যূষে আমরা মুসুরী হইতে ধরাসুর পথে যাত্রা করিলাম। মুসুরী পার হইলেই গাড়োয়াল রাজ্য আরম্ভ। হিমালয়ের প্রধান তীর্থগুলিই এই গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে এবং অধিকারে।

মুসুরী পার হইয়া আমরা গাড়োয়াল রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। টিহরী গাড়োয়াল অতি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। পূর্বে সবটাই টিহরী রাজ্য ছিল,—সম্ভবতঃ ১৮৪০ সাল হইতে গঙ্গা বা অলকনন্দার দক্ষিণাংশ হিমালয়ের পাদ-মূলে পর্য্যন্ত পার্বত্য ভূভাগ ব্রিটিশ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ব্রিটিশ গাড়োয়াল নামেই নির্দিষ্ট। টিহরী রাজ্য এখন ফেডারেটেড্ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং রাজদরবারের কতকটা স্বাধীনতা আছে বৈকি। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া আর আর প্রায় সকল বিভাগই তাহার নিজ কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং এই তীর্থযাত্রার মধ্যে যাহা কিছু পড়ে,—কেদার ও বদরী নারায়ণের মন্দির খোলা, যথাসময়ে বন্ধ করা, এসকল টিহরী দরবারের ব্যবস্থানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পথঘাট সকল দরবারের খরচেই প্রস্তুত এবং মেরামত হইয়া থাকে।

মুসুরী হইতে যে পথ ধরাসু পর্য্যন্ত গিয়াছে উহা প্রায় ৪০ মাইল। পথের প্রথম ২০ মাইল প্রায় সবটুকুই সমতল, অতি চমৎকার, অক্লেশেই যাওয়া যায়। কঠিন চড়াই ত নাইই পরন্তু উৎরাইটি দীর্ঘ এবং সময় সময় একটু

কষ্টকর। এমন সব স্থান দিয়া নামিতে হয় যেখানে এক পাশে গভীর খদ্, অপর পাশে ক্রমোন্নত জঙ্গল, মধ্যে সরু পথটুকু আবার নানা আকারের প্রস্তর-খণ্ডসমাকুল—খালি পায়ে চলিতে আঘাত পাইতে হয়। এক একটা পাথর এমন তীক্ষ্মমুখ, ধারালো কোণ পায়ে ফুটিয়া যায়। আমার ঐরূপ একটা ধারালো পাথরের কোণ পায়ের তলায় ফুটিয়া কিছুদিন কষ্ট দিয়াছিল। মুসুরী হইতে সুয়াখালি নামক প্রায় ছয় মাইলের মাথায় একটি পড়াও। ইহার মধ্যে মধ্যে দুই তিন খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আমরা পার হইয়াছিলাম। সে গ্রাম কেবল যাহারা ক্ষেতিবাড়ি করে তাহাদের জন্যই! ধান ও গমের ক্ষেত্র সর্বত্রই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। সুয়োখালি পর্য্যন্ত প্রায় সোজা পথ। তারপর সেখান হইতে উৎরাই; সেই উৎরাইয়ের কতকাংশ কঠিন প্রস্তরখণ্ডসমাকীর্ণ,—পাথরের ছোট বড় নানা আকারের টুকরা ছড়ানো। তখন পথ এই রকমই ছিল এখন হয়তো ভাল হইয়াছে।

উৎরাই শেষে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এক পার্বত্য নদীর উপত্যকায় দাতুরী গ্রামে উঠিলাম। স্নানাহার বিশ্রামে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া আবার যাত্রা করিলাম। ও বেলা মাত্র ছয় মাইল চলিয়াছিলাম, এ বেলা একটু বেশীদূর যাইব সংকল্প ছিল। হেমন্ত খুব চলিতেছে তাহার ভারি আনন্দ,—উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথায় হিমালয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণনার ফোয়ারা ছুটাইতেছে। বৈকালে দুটায় কিছু বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার ওখান হইতে রওনা হইলাম। সোজাপথ—কোন কষ্টই নাই। হেমন্ত ভারি খুশি। সে ইতিমধ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—ওঃ এই ত পথ, এরকম পথে লোকে আসতে ভয় পায় কেন? আমি সারা হিমালয় ঘুরবো আপনার সঙ্গে।

আমি বলিলাম—মুসুরীর চড়াইয়ের কথাটা ভুলে গেলে নাকি? সে বলিল, কৈ আজ সারা দিন ত কোনোখানে সেরকম পথ দেখলাম না। সে বোধহয় প্রথম দিকেই একটু ছিল, তারপর সব এই রকমই পাওয়া যাবে,—আপনি দেখবেন দাদা।

ভালো, দেখা যাবে। আরও অনেক পথতো পড়েই রয়েচে আমাদের সামনে। মাইল পাঁচ, সাড়ে পাঁচ আসিয়া মোলধার নামক গ্রামে পেঁছিলাম। মূলধারা হইতে বোধ হয় মোলধার নামটি,—কিন্তু কোন ধারা বড় একটা দেখি নাই। তবে ঝরণা একটা ছোট—শেষের দিকেই আছে, পাহাড়ের গায়ে। কিন্তু তাহাতে জলপানের সুবিধা মোটেই নাই। পাহাড়ের শেওলা-ঢাকা গা বাহিয়া জল ঝরিতেছে। সেই ধারা পার হইয়া চড়াই আরম্ভ হইল। এইবার হেমন্তর মুখটি চুণ,—তবুও এই চড়াইটি খাড়া চড়াই নয়। এই তিনটি মাইল চড়াই উঠিতে সে যেভাবে মধ্যে মধ্যে বসিতেছিল তাহাতে আমি একটু ভীত হইলাম। ভয়টা এই যে পাছে সে সামলাইতে না পারে। মুসুরীতে যা বেড়ানো হইয়াছে এবং আজ—এই চড়াই তিন মাইল বাদে সবটাই সহজ এবং সুখের পথ। শেষেরটুকুই তাহার পক্ষে বিষম হইয়াছে, বুঝিলাম। উৎসাহের মাত্রাটা বেশী ছিল তাই সে বড় উচ্চবাচ্য করিল না। প্রায় তিন মাইল চড়াই উঠিয়া পর্বতের অপর দিকে কতকটা উৎরাইয়ের পর ঘোরিপা নামক গ্রাম। আজ এইখানেই আমাদের রাত্রিযাপন। প্রায় কুড়ি মাইল কাবার করিয়া শ্রমক্লান্ত শরীরে আমরা যখন গ্রামের দোকানে আশ্রয় লইলাম তখনও আমাদের কুলীমহারাজ আসিয়া পেঁছান নাই।

গ্রামের মুদি বানিয়া আমাদের যথেষ্ট সৎকার করিল। তাহার স্ত্রী ও একটি মেয়ে। তাহারাই রোটি পাকাইল আর শাক বানাইয়া শেষে একটু আচার দিয়া আমাদের ভোজন করাইল। হেমন্ত খুব তারিফ করিয়া খাইল। তারপর বিছানা পাতিয়া যে যাহার স্থানে শয়ন করা গেল।

প্রাতে উঠিয়া বেশ শীত বোধ হইল। হেমন্ত বলিল, আচ্ছা দাদা, গরমের সময়েও হিমালয়ে যখন এতটা শীত তখন যথার্থ অঘ্রাণ-পৌষ মাসের শীতের সময় এখানে কেমন লাগে, আর শীতই বা কেমন পড়ে? আমি বলিলাম, তুষারপাতের কথা শোনোনি—তখন ত এ সব জায়গা প্রায় সবই বরফে ঢাকা থাকে,—ফাল্গুন মাসে যখন সে সব গলে যায়,—তখনই ত আমাদের ভ্রমণের পালা।

এবার পথে কোন চড়াই উৎরাই নাই,—সুন্দর পথ, মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর কখনও বা পাহাড়ের গা দিয়া পথ আঁকা বাঁকা চলিয়া গিয়াছে, সুন্দর দৃশ্য! বরাবর একদিকে দেখিতে দেখিতে আমরা একটা ঝরণার কাছে আসিয়া পড়িলাম। হেমন্ত বরাবরই আমার সঙ্গে এক তালে আসিতেছে।

ঝরণার কাছেই আমরা কতটা ক্লান্তি অপনোদনের জন্যই দাঁড়াইলাম। তাহার পাশেই ছিল একটা পাকদণ্ডি। সেই পথে তর তর করিয়া একটী পাহাড়ী মেয়ে নামিয়া আসিল পিঠে ঝুড়ি বাঁধা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই জায়গার নাম কি? সে বলিল, চাপ্রা। তারপর সে, আমরা কোথা যাইব, জিজ্ঞাসা করিল। শুনিয়া পরে বলিল,—খাল তিয়ারহা মে হামারা বাবাকা দুকনহৈ, উহাঁ যায়কে রহনা, হামারা বাবা আচ্ছ আদমি। তখন হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, তুম এখানে কাহে, বাবাকা পাসসে এতনা দূরমে রয়তা হ্যায়? সে একটু হাসিয়া উপরের দিকে দেখাইয়া বলিল, হামরা শশুরার। মেয়েটি ভারি সরল। কালো কাপড়ের ঘাগরা, কাপড়ের পুরা হাতঢাকা কাঁচুলী; পায়ে জুতা নাই, মাথায় একটা কাপড় চারপাট করিয়া ঢাকা দেওয়া,—উহাই তাহাদের আবরু বা ইজ্জৎরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। মেয়েটি আমাদের জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের দেশ কোথা? কলিকাতা, বলাতে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কোন দিকে—উত্তর না দক্ষিণ? পূর্ব দক্ষিণ কোণে শুনিয়া একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। যাই হোক, যখন আমরা চলিলাম, সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বোধ হয় নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। তাহার বাবার দোকানে যাহাতে আমরা থাকি তাহার জন্য অনুরোধের কথা লইয়া হেমন্ত বলিল, দেখেছেন দাদা, বেনের মেয়ে, কেমন বাপের জন্য খানিকটা ক্যানভাস করে দিল? এরা বেশ কারবারটা বোঝে—।

ঐ মেয়েটির কথা কহিতে কহিতেই আমরা চার মাইল পার হইলাম। অবশ্য তাহার কথা বলিতে হেমন্তকুমারই আগ্রহশীল তাহা না বলিলেও চলে। এই চার মাইল তাহার কি প্রবল উৎসাহ। আজ তাহার উৎসাহের মূল উৎস ঐ বেনের মেয়েটি। আমরা ঘোরিপা হইতে চার মাইল সোজা পথ আঁধিয়ারীতে পেঁৗছিয়া কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম।

তিনচার ঘর কৃষিজীবি লইয়াই এই পড়াও। আমরা ওখানে অতি অল্প-ক্ষণেই জলযোগ সারিয়া সোজা পথেই চলিতে শুরু করিলাম। এখন আমার আর একটি অশান্তি দেখা দিল।

হেমন্ত বড় বেশী কথা কয়—তার কথার ফোয়ারা ছুটিলে সহজে আর

থামিতে চায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম উহাকে আগাইয়া দিয়া আমি পিছনেই যাইব। কিন্তু এতাবৎকাল মুসুরী ছাড়িয়া ও কোথাও আমার আগেও যাইবে না পিছনেও যাইবে না,—কেবল সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম কথা কহিতে কহিতে যাইবে। কাল এতটা বোধ করি নাই আজ উহা অশান্তির পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। যদি আমি একটু আগে যাই তাহা হইলেই ও ঠিক প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাইয়া দ্রুতপদে আমার কাছে পেঁাছিয়া কথা শুরু করিয়া দিবে। সকল কথার সার-কথা তাহার শরীর খুবই ভাল আছে। এই দুইদিনে ওর মুখে কথাটা অন্ততঃ-পক্ষে বিশবার শুনিলাম। যাহা হউক তাহাকে জানাইতে হইবে যে, আমি একটু পিছনেই যাইতে চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে বলিলাম,—ভাই হেমন্ত! তুমি খানিকটা আগে যাও, আমায় একটু পিছনে চলতে দাও।

শুনিয়াই সে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন দাদা! আমার কি কিছু অপরাধ হয়েচে?

বড়ই মুশকিলে পড়িলাম। এমন লোকের সঙ্গে কি করিয়া ব্যবহার করিব? ভাবিয়া দেখিলাম আসল কথাটাই বা কি করিয়া বলিব। শেষে সত্যকে যতটা সম্ভব মনোহর করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়া একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাহার কাঁধে হাতটি রাখিয়া আবার বলিলাম, দেখ হেমন্ত,—পথে চলতে চলতে আমার জপ চলে। তুমি যদি আমার সহায় হও তাহলে আর কোন বাধাই হয় না। শুনিয়া সে কি ভাবিল, ভগবানই জানেন; কিন্তু যেন কতকটা তখন কৌতুহলমিশ্রিতহতাশ ভাবেই বলিল,—এ্যাঁ, তাই নাকি, চলতে চলতে জপ? —আসনে বসেই ত জপ করতে হয়,—কৈ স্বামিজী ত আমায় সে সব কিছুই বলেন নি?

বলিলাম,—তোমরা কলকাতার মানুষ, কলকাতার পথ চলতে চলতে তো জপের কাজ হবার নয়, তাই হয়তো বলেন নি। শুনিয়া সে মহাচিন্তায় পড়িয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়া আবার বলিলাম—তা ছাড়া তোমরা কর্মী, গৃহী লোক কিনা, তোমাদের ওসব দরকারই নাই। একথা শুনিয়া সে একটু বিষণ্ন মনেই বলিল,—তাহলে আমায় কি করতে হবে?

কিছুই নয় কেবল একটু আগে পাছে করে গেলেই হবে—তারপর পড়াওতে পেঁাছে তখন কথার ফোয়ারা ছোটানো যাবে।

সে যে দুঃখিত হইল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা গেল। আমি তার সন্তোষার্থে ঈষৎ ঘনিষ্ঠকণ্ঠে বলিলাম,—আমায় দাদা বলেচ, তোমার কল্যাণের জন্য যদি একটা অনুরোধ করি তুমি কি তা শুনবে না?

এবার তাহার ভাবান্তর হইল। তখনই সে, নিশ্চয় নিশ্চয়,—বলিয়া আমার আরও কাছে আসিয়া চলিতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম, তোমায় একটু বাকসংযম অভ্যাস করতেই হবে। এই কথার মধ্যে দিয়েই আমাদের কতটা শক্তি নষ্ট হয় তা জানো?

সে বলিল, স্বামীজীও একথা বলেছিলেন একবার, তখন এতটা বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেচি আপনি ঠিক বলেচেন। আচ্ছা দাদা, তাহলে আপনিই আগে যান।

আমি বলিলাম, তা হবে না তুমিই আগে যাবে; তাতে আমার শান্তি থাকবে। সে রাজী হইল। এখন হইতে বেশ শান্তিতেই চলিতে লাগিলাম বটে কিন্তু—একটি কথা মনে গাঁথিয়া রহিল যে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় হেমন্ত চলিতে

হয়তো একটু দুঃখ অনুভব করিতেছে। তবে মানুষ প্রকৃতি নিঃসঙ্গ থাকিতেই পারে না—তাহার চিন্তাই তাহার সঙ্গী হইবে ; তবে তাহার চিন্তা কোন্ পথে কোথায় তাহাকে লইয়া যাইবে, ইহাই হইল সংশয়।

এইভাবে চলিতে আমরা প্রায় সাড়ে দশটায় তিয়ার হা পেঁছিলাম।

এতটা পথ সহজ ও সুন্দর—এপথে চলিতে চলিতে যেন কিসের ধ্যান চলিতে থাকে। এমনই দৃশ্য সারাপথের মধ্যে দেখা যাইতেছিল,—পথশ্রম কিছু-মাত্রই বোধ হয় নাই। এবারে সম্মুখেই প্রায় চার মাইল চড়াই। হেমন্ত উহা জানিত না, যাহা হউক এখন পাঁচ মাইল আসিয়া তিয়ার হাতে তো পেঁছিলাম।

এই স্থানেই একটি ছোট পার্বত্য স্রোতের উপর সেতু, উহা পার হইয়াই চড়াইটা আরম্ভ হইয়াছে। কি ঘন ভাঙ্গের গাছ এখন চারিদিকেই রহিয়াছে—ছোট একটী জঙ্গল। বড় গাছও একটি ছিল,— সেটি পাকুড়। অবশ্য নদী হইতে কতটা দূর হইলেও এইটি পূজার স্থান, বৃক্ষমূলে কয়েকখণ্ড শিলা—উহা সিন্দুরচর্চিত দেখা গেল। তাহার নিকটেই একটি শুষ্ক বৃক্ষশাখায় অসংখ্য নানাবর্ণের কাপড়ের টুকরা দিয়া গাঁট বাঁধা, আবার ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড সুতায় বাঁধা ঝুলিতেছে দেখা গেল, সেখানে আসিয়া পেঁছিলাম। নটি মাইল সোজাপথে চলার আনন্দ ছিল, এইবার তাহার প্রত্যবায়। এইখানেই মধ্যাহ্ন-কালীন বিশ্রামের জন্য হেমন্ত অনুরোধসূচক কণ্ঠে বলিল,—দাদা এইখানেই দুপুরের ডেরা ফেলা যাবে নাকি? আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম,—দেখো ভাই, আর একটু চলিলেই শেষ, আজকের পথে আর একটি মাত্র চড়াই আছে --এসোনা সেইটুকু কাবার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান, পানাহার এবং বিশ্রামটুকু সম্পূর্ণ করি। তারপর বাকী পথটুকু বিকালেই শেষ করে দেওয়া যাবে,—কি বল তুমি?

সে আর কি বলিবে,—সরল মনেই আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজি হইল। সুতরাং একটুখানি বসিয়া নদী হইতে দুই চার অঞ্জলি জলপান করিয়া আমরা ক্রমোচ্চ পথে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমার যে এখানে একটা বিশেষ অন্যায় হইল তখন বুঝিলাম না,—কিন্তু আমার অপরাধও বেশী ছিল না— কারণ, এই তিয়ার হা চড়াইয়ের নীচে অর্থাৎ নদীতীরে উৎরাই পর্য্যন্ত লোকালয় বা বিশ্রামস্থান নাই। তবে সঙ্গে রসদ থাকিলে ঐ পাকুড় তলায় বসিয়া রান্না-বান্না করিয়া খাওয়াদাওয়া করা যাইত।

হেমন্তকে লইয়া এইবার একটু মুশকিলে পড়িলাম। যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই ঘটিয়া গেল। সে নিয়মিত আগেই যাইতেছিল ; মাইল দেড় উঠিয়া সে ঘন ঘন দীর্ঘকাল ধরিয়া বসিতে লাগিল। তখন আর তাহাকে আগে যাইতে না দিয়া সঙ্গে রাখিলাম। আমারও এই চড়াইটা খুব লাগিয়াছিল। চড়াইটা প্রায় চার মাইল, প্রথমটা খাড়া নয়—সহজ চড়াই, তারপর মাইল দুই পর মধ্যে মধ্যে একটু বিশেষ রকমের খাড়া পর্বত। তারপর এক এক স্থানে পথ বলিয়া কিছুই নাই—খানিকটা এলোমেলো উঠিয়া ঐ একটু দূরে আবার পথ দেখা যাইতেছে। এইভাবে যখন আমরা বারো আনা ভাগ আসিয়াছি তখন হেমন্ত একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—একটা উঁচু পাথরের উপর-ভাগ খানিকটা সমতল ছিল দেখিয়া সে তাহার উপরে বসিয়া পড়িল, বলিল,—দাদা, আর ত আমি পারি না। তারপর সে শুইয়া পড়িল। তখন ১টা বাজিয়াছে। আমি তাহার পাশে বসিয়া মাথায় ও বুকে

হাত বুলাইতে লাগিলাম। বলিলাম, ভাই, আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে,—তোমার কথাটা শুনলেই ভাল ছিল। এবেলা নীচে থাকলেই চলতো।

হেমন্ত বলিল, আমাদের সঙ্গে ত রসদ কিছুই ছিল না। আমিও তাহা জানিতাম,—কুলীরা কাছেও ছিল না। তাহারা রাত্রে সারাদিনের খোরাক সবটাই তৈরী করিয়া অর্দ্ধেক তখনই খায় বাকী অর্দ্ধেক পরদিনের জন্য রাখিয়া দেয়, সুতরাং আমরা কোথায় রসদ পাইতাম? আর এক সংকট—এ পথে জল নাই। সারাপথে কোথাও একটু ক্ষীণ ধারা পর্য্যন্ত দেখি নাই। সুতরাং হেমন্তের বেশী কষ্ট ঐ জলের অভাবে। আত্মগ্লানি ভিতরে চাপিয়া জলের সন্ধানে এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিলাম কিন্তু কোথাও পাইলাম না। হেমন্ত স্থিরধীর পড়িয়া আছে,—জলই তাহার ঔষধ। সেই জল পাই নাই দেখিয়া সে বলিল, দাদা আমি অনেকটাই ভাল বোধ করচি,—আঃ একটু জল পেলে এখনি উঠে চলতে শুরু করতাম।

তিয়ারহা খাল অর্থাৎ এই পর্বতের শীর্ষ দেশ আর বেশী দূর নয়। মনে মনে আন্দাজ করিলাম—প্রায় তিন মাইল আসিয়াছি, বাকী এক মাইলের কিছুটা হয়ত কমই হইবে। কিন্তু হেমন্ত যে কথাটি এখনই বলিল, উহা কেবল আমায় একটু সান্ত্বনা দিতে, যেহেতু তাহার এই অসুস্থতায় আমি মর্মে মর্মে কতকটা অনুতপ্ত তাহা সে বুঝিয়াছিল। উপায়ই বা কি? প্রায় আধঘণ্টা কাল কাটিলে আমি খুব ভাল আছি বলিয়া সে উঠিয়া বসিল। সত্যই তখন তাহাকে অনেকটাই সুস্থ দেখাইতেছিল। আমি বলিলাম, এখনও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো তারপর—যা হয় হবে। সে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে আমাদের কুলী বাহক আসিয়া পড়িল। তাহারা আসিয়াই একটা পাথরের উপর বোঝা রাখিয়া হাত ও মাথা হইতে চামের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল এবং মুখে একপ্রকার শিশ্ দেওয়ার মত করিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল।

তাহাদের, হেমন্তের জন্য—একটু জল সংগ্রহ করিতে বলায় একজন বলিল যে—এখানে কোথাও জল পাওয়া যাইবে না, উপরে না উঠিলে কোথাও জল নাই। যেমন করিয়াই হোক খালের উপর উঠিতেই হইবে। শুনিবামাত্র হেমন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল, লাঠি লইয়া বলিল, কুছ পরোয়া নেই দাদা, আমি অলরাইট,—চলুন, বলিয়া ধীরে অথচ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল। আমিও চিন্তিতমনে তাহার পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। সত্য সত্যই সে আমায় বাঁচাইল। যখন আমরা খালের উপর উঠিয়াছি তখন আড়াইটা। তারপর খানিক উৎরাইয়ের পর গ্রাম পাওয়া গেল। আমি বলিলাম—আজ আর আমরা ধরাসু যাবো না,—কোন রকমে এইখানেই থাকব, তোমার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

হেমন্ত বলিল—সে কথা পরে। এখন আসুন, খাবার যোগাড় করা যাক।

ভগবান দাস নামক বানিয়ার অতিথি হওয়া গেল। সর্বসুদ্ধ একটি টাকা খরচ আর তাহার গৃহিণীর অনুগ্রহে আলুসিদ্ধ ভাত, পর্যাপ্ত ঘৃতপক্ক উরদ আর মসুর দুই মিশ্রিত ডাল আর শেষে দধি উপযোগ এবং পূর্ণ একঘণ্টা বিশ্রামের পর হেমন্ত নাচিয়া উঠিল, বলিল,—আজই ধরাসু যাবো। আমি রাজী নই. কিন্তু কুলী বলিল. আজই যাওয়া ভাল চলুন না। মোটে মাইল সাত মাত্র পথ আর সারা পথটাই উৎরাই—সামনের পাহাড়টার নীচেই ধরাসু। হেমন্ত কোন কথাই আর কানে তুলে না, অগ্রসর হইয়া কতকটা পথ নীচে যাইয়া, আসুন, দাদা বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। কাজেই আমায় চলিতেই

হইল। অতি আরামে আমরা এই সাত মাইল নামিয়া—প্রায় সন্ধ্যায় ধরাসুতে পেঁছিলাম। আমাদের কুলী তাহার পয়সা চুকাইয়া তখনই বিদায় লইল, অবশ্য সেরাত্রিটুকু তাহারা ঐখানেই ছিল।

ধরাসুতে আসিয়া এখান হইতে যে পার্বত্য দৃশ্য দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। হিমালয় পর্বতের কথা সেই শিশুকাল হইতেই কানে আসিতেছে। মনে আছে চাঁদিনীরাতে গরমের দিনে ছাদে শুইয়া মা আমাদের ভাই বোন-গুলিকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন ; ছোটরা সব ঘুমাইয়াছে কেবল আমি শুইয়া শুইয়া বিস্ময়াকুল চক্ষে চাঁদের উপর দিয়া দ্রুতবেগে মেঘের দৌড় দেখিতেছি, অসংখ্য পাৎলা মেঘদল চাঁদের উপর দিয়া কোথায় যাইতেছে। মাও বোধহয় উহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ মা, মেঘেরা সব ছুটে ছুটে কোথায় যাচ্ছে ?

মা আমার তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—ওরা হিমালয় পাহাড়ে শালপাতা খেতে যাচ্ছে, আবার চলে আসবে যখন উল্‌টো হাওয়া হবে।

তখন হইতে ঐ হিমালয়ের সঙ্গে মেঘের সম্বন্ধ আমার মনে গভীর রেখা-পাত করিয়াছিল। তারপর কত বার কত ভাবে হিমালয়-কথা শুনিয়াছি— কত লেখা বইয়ে ও মাসিক পত্রে পড়িয়াছি। সেই সব মিলাইয়া হিমালয়ের যে কি রূপ এবং এই হিমালয় যে কত মহান্‌, কি অদ্ভুত দৃশ্যবৈচিত্র্য, স্তরে স্তরে এই বিশাল পর্বতমালার প্রত্যেক অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে তাহা যেমন একজন শিল্পীর চক্ষে ধরা দেয় তেমনটি সাধারণ তীর্থযাত্রী যাহারা তাদের চোখে পড়ে না। ক্রমেই হিমালয়ের রূপ আমাদের চক্ষে গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সেকথা পরে বলিতেছি ;—এখন এই ধরাসুর কথা একটু বলিব।

এই ধরাসু একটি পার্বত্য গ্রাম,—ইহার মধ্যে মুদির দোকান ত আছেই, আবার মনোহারীর দোকানও আছে ; আবার দরজীর দোকানও কয়েকখানি আছে। ইহা ব্যতীত সরকারী বা দরবারী কালেক্টারের অফিস প্রভৃতিও আছে। এদিকে মুসুরী হইতে অনেক সাহেব-সুবা পর্য্যটক এবং শিকারী দলও আসা যাওয়া করেন। এখানকার আসল শিকার হইল—গো-হরিণ,—তাহাকে ইহারা গোড়র বলে। আর বন্য মোরগ প্রভৃতি নানা ছোট শিকার পর্য্যটকগণের আহার ও আনন্দ যোগাইয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মণ, ছত্রি ও বানিয়া এই তিনটি জাতির বাস ; ইহারা সবাই ক্ষেতিবাড়ি করে। প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। এদিকে আখরোট, আপেল, পিচ প্রভৃতি ফলের গাছ চারিদিকেই দেখা যায়। বাজারের পার্শ্বেই একটি ধর্মশালায় আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। ধর্মশালা বলিতে একখানি অন্ধকার ঘরে একটি মাত্র দ্বার, আর দ্বারের সম্মুখে খানিকটা চাতাল—সেইখানেই রান্না করিতে হয়। মুদীই হইল মালিক, এ সব তারই সম্পত্তি। তাহার পুত্রই সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাত্রের খাদ্য তাহার ঘর হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিল, কেবল দিনমানে আমরা ভাত, ডাল, আলুর তরকারী পাকাইলাম। এইভাবে একটি দিন ও দুইটি রাত্রি 'ধরাসু' গ্রামে কাটাইলাম। যাহাকে আমি গ্রাম বলিতেছি পাহাড়ীরা ইহাকে সহর বলে। লোকসংখ্যা অনুমান করিতে পারি নাই ; তবে এই গ্রাম বা সহরে প্রায় একশত ঘর কিম্বা আর কিছু বেশী হইবে লোকের বাস। ঘেঁষাঘেঁষি কয়েক ঘর দ্বিতল মকান এইখানে বাজারের মধ্যে আছে—নীচে প্রায় দরজী, না হয় মুদী বা মশলার দোকান।

তারপর বড়রাস্তাটি ছাড়াইলে ফাঁক ফাঁক বসতি। গলিঘুঁজি যেখানেই দেখিয়াছি মাছি ভন ভন করিতেছে আর আবর্জনা স্তুপাকার পড়িয়া আছে।—নীচেই গঙ্গা এবং আরও একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম। এই সঙ্গমের জন্যই ধরাসুর মাহাত্ম্য যা কিছু। মুসুরী ছাড়াইয়া এইখানেই কতকটা প্রাণের চাঞ্চল্য দেখিলাম। এই দুইটি দিন ভ্রমণের মধ্যে আর আর যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম সব কয়টি স্থানই নীরব নিঝুম—জনমানবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। হেমন্ত এখানে আসিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। স্ত্রীকে পত্র লিখিল, এবং আরও কাকে কাকে লিখিল।

পরদিনের জন্য দুইটি কুলী আমাদের চাই। হরিধন দুইজন বেশ মোটা-সোটা কুলী লইয়া হাজির করিল—তারা বরাবর সঙ্গে যাইবে না। যমুনোত্তরীতেই আমরা প্রথমে যাইব, কারণ, তাহাই সুবিধা। কুলী দুইজন বরাবর যাইতে চায় না। এখান হইতে ঐ দিকে প্রথম পড়াও বরমখেলা পর্য্যন্ত পেঁাছাইয়া দিবে, মজুরী একটাকা চারআনা। সে বলিল যে, বরাবর যাইতে হইলে শুধু যমুনোত্তরী যাতায়াতে পঞ্চাশ টাকা লইব। হেমন্ত বলে, কাজ নাই আর কুলীতে। শেষে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া হরিহর এক মৎলব তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিল, রোজ এক টাকা চারআনা মজুরী হিসাবে পাইবে আর চার আনা খোরাকী যত দিনই হোক না কেন। তাহারা রাজী হইল—আমরা বাঁচিলাম। ইহার পর আর মাল লইয়া কুলীর অভাব আমাদের সারা যাত্রার মধ্যেই হয় নাই। সে রাত্রিটুকু আমরা বেশ আরামে কাটাইয়া প্রাতে বরমখেলা যাত্রা করিলাম। ধরাসু হইতে যমুনোত্তরী যাইতে ইহাই প্রথম পড়াও।

সেই হরিদ্বারের সঙ্গেই গঙ্গা ছাড়িয়াছিলাম এতদিন পরে এই ধরাসুতে আসিয়া একবার মাত্র গঙ্গা পাইলাম। এখানে নামটি তাঁর ভাগীরথী।

বরমখেলায় আশ্রয় স্থানটি এক বানিয়ার দোকানের দাওয়া। পাথরের মকান; মেঝে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—একটুও ধুলোময়লা আবর্জনা কোথাও নাই। আর সেই লম্বা দাওয়ার একপ্রান্তে মৃগচর্ম-আসনে এক সাধুমূর্তি বসিয়া। মূর্তিটি দেখিলেই মনে হয় গৃহী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য যা যা দরকার তাঁহার সবগুলিই আছে। মাথায় জটাভার, গলায় রুদ্রাক্ষ, তুলসী, প্রবালাদি নানাবিধ প্রস্তরের মালা। গোঁফদাড়িতে মানানসই মুখখানি গম্ভীর। একগুচ্ছ ভ্রূর নীচে তীক্ষ্ণ—লোকচরিত্র-অনুসন্ধানী—ক্ষুদ্রায়তন চক্ষু। হেমন্ত তাহাকে দেখিয়াই একেবারে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণামান্তর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার ভক্তি দেখিয়া আমি শংকিত হইয়া উঠিলাম। এ পথে এই প্রথম সাধুদর্শন।

অবশ্য আমাদের ভোজনের ব্যাপার এখানেই কিছু দক্ষিণা দিয়া এক ব্রাহ্মণকুমারকে ধরিয়া বেশ পরিপাটি রূপেই সম্পন্ন করা গেল। হেমন্ত প্রায় সর্বক্ষণই সাধুর কাছে বসিয়া রহিল,—আর অপরে না শুনিতে পায় এমন ভাবেই কথার পর কথা কহিতে লাগিল। শেষে একবার আমায় ডাকিয়া বলিল, দাদা! একবার আসুন না,—এঁর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করুন না। আমি আগেই যাইতাম,—কিন্তু তাহার জন্যই যাই নাই। এখন গিয়া নমস্কারান্তে তাহাদের কাছে বসিলাম।

হেমন্ত বলিল. দাদা জানেন, ইনি খুব শক্তিশালী যোগী। ইনি অনেক কিছুই পারেন,—আমায় ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন সব।

সব ঠিক বলেছেন? জিজ্ঞাসা করিয়া আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্য করিলাম—তাহার চক্ষু দুটি লাল হইয়াছে। যেমন নেশা করিলে হয় সে রকমই লাল।

সে বলিল, আমার যে একটা দুর্বলতা আছে সেটা তিনি আগেই ধরতে পেরেছিলেন। তাই আমি একটা ওষুধ চাইলাম। উনি একটা ওষুধ তখনি দিলেন আমি খেয়েচি। তাইতেই হয়তো চোখটা লাল হয়ে থাকবে। কেমন একটা নেশার মত মনে হচ্চে—যেমন সিদ্ধি-টিদ্দি খেলে হয়।

আমি তখন সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনে ইনকো ক্যা খিলায়া?

সে বলিল, সব ঠিক হো যায়গা, ভিতরকা গরম সব নিকাল যায়েগা,—কুছ ফিকর মত করো।

হেমন্তকে বলিলাম, তুমি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করোনি যখন, তখন আমি কিছুই জানি না। তোমার এতে কিরকমটা হবে তা তো বুঝতে পারচি না। কিরকম লাগচে তোমার এখন?

বেশ একটা নেশার মতই লাগচে আর কিছুই নয়,—আমি এখানে একটু শুই, দাদা, কি বলেন? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শুইয়া পড়িল ঐ সাধুর পাশে। মৃদু হাসিয়া সাধুজি বলিলেন, কুছ পরোয়া নহি, কুছ দুধ, গরম দুধ পিলায় দো।

মহা মুশকিল—এখন গরম দুধ কোথায় পাই? বানিয়া ভাইয়াকে ধরিয়া কহিয়া যখন দুধ লইয়া হাজির হইলাম তখন হেমন্তের আর সাড়াশব্দ নাই। অচৈতন্য অবস্থা দেখিয়া সাধুজি আবার বলিলেন, কুছ ফিকর নহি, ও থোড়া দের মে ঠিক হো যায়গা, আব উসকো এইসাই রহনে দিজিয়ে,—ঘণ্টা দোঘণ্টা পিছে সব ঠিক হো যায়গা।

ততক্ষণে বানিয়া, বণিকপত্নী প্রভৃতি ঘরের সবাই আসিয়া চারিদিকে দাঁড়াইল। আমি সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—ই আপনে ক্যা কিয়া? যদি উসিকো কুছ হোয় তো আপকো হাম নহি ছোড়েগা।

সাধুজী বিরক্তভরে বলিলেন,—আরে তু ক্যা করেগা মুঝকো—ফাঁসীমে লটকাওগে ক্যা, না; শির লেওগে,—ঔর কুছ কারোগে—ই'য়ে অংরেজী মুলুক নহি?—

তারপর যাহা হইল তাহা বড়ই অভাবনীয়, ততোধিক আশ্চর্য্য ব্যাপার। হেমন্তের ক্রমে ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হইল; দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া বলিলাম, আব ক্যা করোগে? দেখিতে দেখিতে হাত পা সটান, একেবারে সোজা হইয়া গেল এবং কঠিন হইল। মৃত্যুর চিহ্ন প্রকট দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না, চীৎকার করিয়া হেমন্ত, হেমন্ত করিয়া ডাকিতে এবং তাহার মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। লোক জড়ো হইয়া গেল, বানিয়া ও তাহার বাড়ীর সবাই কোলাহল করিয়া উঠিল,—এ সাধুজী আপ্‌নে ক্যা কিয়া? ইত্যাদি বলিতে লাগিল। আমাদের কুলী দুজন মুখ চুণ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া সাধুজীর দিকে চাহিয়া,—রাম, রাম, বলিতে লাগিল।

সাধুজী সব দেখিয়াও যেন কিছুই দেখিতেছেন না এইভাবে বসিয়া রহিলেন। আমার বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল;—এই করতেই কি আমার

সঙ্গে তুমি এসেছিলে, হেমন্ত। মনের মধ্যে এই কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল ; আমার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কি করি? এখানে তো অসহায়। শেষে সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—তুমহি ইসকো মার ডালা, শয়তান, সাধু বনকে আকর গৃহস্থ কো ইসিতরে জানসে মার দেতে। তোমকো পুলিসমে দেঙ্গে,—ফাঁসিমে লটকায়গা।

সে কিছুই গ্রাহ্য করিল না, যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। বানিয়া তখন আমায় বলিল,—উহার মুখে একটু জল দিয়ে একবার দেখলে হয় না? আমি তখন কেমন এক রকমই হইয়া গিয়াছি,—তাহাই করিতে গেলাম। উহা দেখিয়া সেই পাষণ্ড সাধু বলিল, কিসকো পিলাতে হো, বো তো মুরদা বন গিয়া।

কি সর্বনাশ, ও নিজে এখন স্বীকার করিতেছে যে হেমন্ত মারা গিয়াছে? আমি কি করিব? এ অবস্থায়,—বলিলাম.—তোম উসকো ক্যা জহর খিলায়া?

সে বলিল, আচ্ছা সমঝকে তো এক আচ্ছা জড়ি দিয়া থা, কৌন জানে বো বরদাস্ত করনে নহি শিকেগা!—ক্যা করা যায়গা?

সত্যই কি হেমন্ত এইভাবে অকালে এই রাক্ষসের হাতে মারা পড়িল? কেমন করিয়া স্বামীজির কাছে মুখ দেখাইব। আজ দু বৎসর বিবাহ করিয়াছে —তাহার স্ত্রীকে এ খবর পাঠাইব কেমন করিয়া? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত ছুটিয়া সাধুজীর পায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িলাম,—আপ বাঁচাইয়ে, বাবা ;—বলিয়া তাহার পায়ে জোরে জোরে মাথা ঠুকিতে লাগিলাম।

সে আমাকে, তাহার সবল হস্তে ধরিয়া তুলিল এবং ইঁহা বৈঠ যা, বলিয়া পাশেই বসাইয়া দিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই বসিয়া রহিলাম, ক্রমে আমার দৃষ্টিশক্তি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিল মাথার মধ্যে তুষারশীতল ধারা ঝরিতে লাগিল—আর কোন জ্ঞান রহিল না।

* * * * *

যখন সম্বিৎ ফিরিল,—দাদা, দাদা, দেখুন আমার দিকে একবার,—এই শব্দ! এ যে হেমন্ত। চক্ষু চাহিয়া দেখি, হেমন্ত হাতে জল লইয়া আমার মুখে চক্ষে ঝাপটা দিতেছে—তাহার চাহনি ব্যাকুল! আমায় চক্ষু খুলিতে দেখিয়া তাহার মুখে আনন্দের আভাষ পাইলাম। তখন, তাহার সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম।

সাধুজী গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, মৃদু হাসিয়া এখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—অব কুছ আচ্ছা মালুম হোতা?

এই যে ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল, ইহার পর সেখান হইতেই তো হেমন্ত দেশে ফিরিল,—আমি নিশ্চিন্ত হইয়াই বাকী সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া দীর্ঘকাল পরে ফিরিয়া শুনিলাম যে, হেমন্ত ফিরিয়া একেবারে কলিকাতায় আসে এবং তৃতীয় মাসের শেষেই মারা যায়।

॥ ২৭ ॥

উত্তর সাধিকা

আজ আমার দিনে আঁধার, রাতে আলো।

প্রায় সারাটা দিন মেঘের উপর জমাট মেঘের স্তর হিমালয়ের আকাশ এমনভাবে জুড়িয়া ছিল যেন মহাপ্লাবন আসিল বলিয়া। মাঝে মাঝে চিকুর হানাহানি, আর গর্জনের পর গর্জন গ্রামবাসীর প্রাণে আতংক সঞ্চার করিতে ত্রুটি করে নাই। এতটা গর্জনের ফল যাহা হইয়া থাকে—বর্ষণের নামগন্ধ নাই; অবশেষে বৈকালের দিকে দেখা গেল, পশ্চিমের প্রবল হাওয়া উঠিয়া মেঘের জমাট ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। সত্য সত্যই পবন দেবতা আসিয়া অল্পক্ষণেই আকাশের এই ঘোর-ঘন-ঘটা যেন জাদুমন্ত্রে উড়াইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে পাতলা হইয়া গেল মেঘের গতাগতি, ক্রমশঃ পশ্চিমের দিকে প্রথমে হাল্কা পীত ও লোহিত, তারপর নীলাভ ও সংগে সংগে সকল রংয়ে রঙীন হইয়া উঠিল সারা আকাশ। তারপর স্পষ্ট ফুটিল গোলাপী ও বেগুনী মেঘের কোলে কোলে ফিকা নীল, হলুদ, সিন্দুর, তাহার তলে ধূসর রং-এর খেলা। তারপর পশ্চিম আকাশের পটভূমি আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল সিন্দুর মাখা অস্তগামী মার্ত্তণ্ড মূর্তি, সারা দিনের পর লোকচক্ষুর গোচরে যেন হঠাৎ দ্রুত গতিতে নামিয়া আসিলেন এবং একবার মাত্র নয়নবিমোহন মূর্তিতে দেখা দিয়াই নীচে নীলাভ ধূসর পর্বতমালার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। সারাটি দিনের আলোয় বঞ্চিত করিয়া যাইবার সময় যাহাদের রাত্রি সম্মুখে আসিতেছে তাহাদের নিকটে যেন সলজ্জ হাসিমুখে বিদায় লইয়া গেলেন। আর এদিকে বর্ণমালার উৎসবও ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া গেল।

তারপর পার্বত্য নদীর বাঁকের মুখে ওপারের পূর্বাকাশে গোধূলি লগ্নে পূর্ণচন্দ্রের উদয়, দিনের দুঃখ ভুলাইতে। জনবিরল গ্রাম্য মন্দির হইতে যেন শাঁখের সুর শোনা গেল,—গাছপালায় পাখীর কলরবও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা-প্রকৃতির উপর মায়ার একটি স্বচ্ছ আবরণ পড়িয়া গেল সুধাকরকে কেন্দ্র করিয়া। আমার অন্তরের মধ্যেও এ পরিবর্তন অপরূপ হইয়া উঠিল তাই আজিকার এখানে থাকা সার্থক হইয়াছিল।

হাঁটা পথে চলিয়াছিলাম গঙ্গোত্তরীর উদ্দেশে। কাল সন্ধ্যায় যখন এখানে পেঁৗছিলাম,—এখানকার এই মনোহর দৃশ্য আমায় এমনই আকৃষ্ট করিল, মনে হইল, এখানে দুই একদিন থাকিয়া গেলেই বা কেমন হয়,—হয়ত কখনও আর এ দৃশ্য দেখিতে পাইব না! গ্রামখানি ক্ষুদ্র, এদিকে টিহিরি, শ্রীনগর প্রভৃতি যে সকল পার্বত্য নগর তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। নাকোরি ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম বা পাড়া, দূরে দূরে আট দশখানি কুটীর। আর চটি বলিতে দু'তিনখানি ঘর দেখিতে পাওয়া যায় অদূর সম্মুখেই, পথ হইতে কোনটা একটু উঁচু, কোনটা বা একটু নীচের দিকে। গঙ্গার ধারে ধারেই পথ, আর স্রোতটি খুব নীচে।

পথের ধারেই একটি উঁচু জমির উপর একখানি বেশ প্রশস্ত মকান প্রস্তুত হইতেছিল। তিন দিকের দেয়াল ও উপরে দুদিকে ঢালু ছাদ প্রায়

শেষ হইয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কাঠকুটা, পাথর এমনভাবে স্তূপাকার পড়িয়া আছে যে, কাহারও তাহার কাছে যাইতেই ইচ্ছা হয় না ;—মনে হয় যেন একটা বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। আশপাশের জঙ্গল এখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। কাল সন্ধ্যার আগে যখন এখানে আসি, তখন এই গৃহখানির পরিচয় পাই নাই। আজ শুনিলাম এখানকারই এক মহাজনের পুণ্যের সাক্ষী ধর্মশালা প্রস্তুত হইতেছে,—একদিকে যাত্রীগণ থাকিবে, অন্যদিকে দোকান। আমি কিন্তু কাল রাত্রে এই অসম্পূর্ণ ঘরের মধ্যেই রাত কাটাইয়াছিলাম। এক পিশুর উৎপাত ব্যতীত ভয়ের কিছুই ছিল না, এই সব আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যেই পিশুর জন্ম এটি ভালই জানা ছিল। যাহা হউক খাবার কিছু সঙ্গেই ছিল ; গঙ্গাতীরে জলযোগ শেষ করিয়া ঐ নবনির্মিত গৃহের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলাম ; গ্রামের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা ছিল না, চটিতেও উঠি নাই।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিবার পর আকাশের মূর্তি দেখিয়া পা দুটি আর চলিতে চাহিল না। কাজেই বিধাতার বিধানে আজ এখানে থাকিয়া গেলাম। আজ কতদিন পর তবে গঙ্গা দর্শন হইল। উঁচু পথ হইতে অর্ধচন্দ্রাকার স্রোতটি চোখে পড়িতেই শরীর পুলকে পূর্ণ হইল। এখানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয় ; তবে পাড় এতটা উচ্চ যে মনে হয়, গভীর খাত কাটিয়া স্রোতস্বতীর পথ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার গর্জন এমনই,—অপূর্ব, শুনিলে অন্তরে আনন্দ ভয় ও বিস্ময় মিলিয়া একটি ভাবের ঘোর লাগে। এতটা নীচের শব্দ কি করিয়া উপরে আমার কানে এত গভীরভাবে, এতটা স্পষ্টরূপেই বাজিতেছে ! একটানা শব্দ অবিরাম চলিতেছে ; ঠিক এই একই সুর-তাল মিলিয়া শব্দতরঙ্গ আমার পূর্বে কত কত মানুষে শুনিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এই এক রকমই ত শুনিয়াছে ? বিরামশূন্য, অনলস, ক্ষিপ্র যেন প্রবাহিণীর শব্দময়ী মূর্তি। অচিন্তপূর্ব এই সুরটি যেমনটি আমি শুনিতেছি, কতযুগ যুগান্তর ধরিয়া হয়ত কতজনই শুনিবে। এ সুর যেন অনাহত ধ্বনির আভাস, কালের মধ্য দিয়া প্রকৃতির পরম গুহ্যলীলা যেন দুর্জ্ঞেয় এক আভাস দিতে দিতে দিবারাত্র অক্লান্তগতিতে চলিবে,—হয়ত সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত। যে শুনিবে সেই-ই ধ্যানস্থ হইবে। প্রকৃতি জননীর নির্জন, পার্বত্য বনাকীর্ণ ভূভাগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে এই স্বচ্ছ তরল বিদ্যুৎ-প্রবাহ কোনো এক পরম গুহ্যবার্তা বহন করিয়া। যে ভাগ্যবান শুনিবে, সেই-ই মুগ্ধপ্রাণে অনুভব করিবে বৈচিত্র্যময় এই প্রবাহ বার্তা, ধন্য হইবে তাহার অস্তিত্ব, সার্থক হইবে তাহার পর্য্যটন, অন্তরক্ষেত্র স্নিগ্ধ এবং শান্ত হইবে তাহার পথশ্রম। সে অমর হইয়া যাইবে। ইহারই আকর্ষণে সুদূর সমতল হইতে আসিয়াছি। আজ এখানে রহিয়াও গেলাম ইহারই আকর্ষণে।

দিনটি কাটাইয়া দিলাম এইভাবে, এদিক ওদিক ঘুরিয়া আঁধার আকাশ-তলে বিচিত্র দৃশ্যের মধ্য দিয়া। পথের ধারে বেশ বড় একটি বটগাছ তাহার মূলে বড় ছোট সিন্দুর মাখানো নুড়ি, তাহার পাশেই একটা উঁচু জায়গা। পাথরের উপর পাথর, ফাটলে ফাটলে তৃণ জাতীয় একপ্রকার গুল্ম ; মধ্যে প্রকৃতি রচিত বেশ প্রশস্ত একখানি আসনের মত হইয়াছে। এখানেই আমি কম্বল-খানি বিছাইয়া আমার দিনের আসন করিয়াছিলাম। অবশ্য বৃষ্টি আসিলে আমায় উঠিতে হইত। কিন্তু উঠিতে হয় নাই। এখন সন্ধ্যা, রাত কাটাইতে আবার ঐ ধর্মশালার বারান্দায় যাইতে হইবে।

অল্প বিস্তর ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু প্রবল বাতাস ছিল না। পরিষ্কার আকাশে চাঁদের আলোয় খানিকটা বাহিরেই কাটাইব স্থির করিয়া এখানেই বসিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণে আনন্দ, বিস্ময়, ভয় মিলিত এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ।

যেখান হইতে গঙ্গার ধারা ঈষৎ উত্তর-পূর্ব মুখে বাঁকিয়াছে, সে দিকে অনেকটা দূর পর্বতশীর্ষ অবধি দেখা যায়। জ্যোৎস্নালোকে উহার ঊর্দ্ধে শুভ্র মেঘলোকের আভাস তাহার নীচে কুয়াসার আবরণ যেন মায়াময় স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে; অনন্তের আভাস পাইয়া আমি যেন আত্মার অমরত্ব খুঁজিতেছি। কল্পনা কিনা জানি না, আমায় আর যেন মানুষ নাম রূপধারী মরলোকের অভাবগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীব বলিয়া স্মরণ নাই;—আমি পূর্ণ, মহিমাময়, অখণ্ড সত্তা এমনই, কিছু অনুভবের নেশা, গভীর এক আবেশ, যাহা কথায় বুঝাইতে সাধ্য নাই তাহাতেই ডুবিয়াছিলাম, কতক্ষণ, সে জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ যেন আবার মাটির মানুষের অনুভব ফিরিয়া আসিল,—দেখা ও শোনার রাজ্যে। সম্মুখেই এক ভৈরবী মূর্তি,—যা এ পথে প্রায়ই দেখা যায় না। কারণ শক্তি বা তান্ত্রিক সাধকেরা বড় একটা এ তীর্থে আসা-যাওয়া করেন না। হঠাৎ ঐ অপরূপ মূর্তি, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বোধ হইল আমার সম্মুখে ব্যস্তভাবে হাত নাড়িয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না কি ভাষায় কথা কহিলেন, সেটা না হিন্দি না পাঞ্জাবী না মারাঠী,—সে এক রকম স্বর, আগে এমন শুনি নাই।

আজ বৈকালে দেখিয়াছিলাম এখানে দুইজন তিনজন যাত্রী আসিয়াছিল। তাহারাও কাল উত্তর কাশীর পথে যাইবে, আমিও তাহাদের সঙ্গে যাইব স্থির করিয়াছিলাম। তাহারা গ্রামের মধ্যে থাকিবার স্থান করিয়াছে,—আমি একটু নিরিবিলি থাকিতে চাই তাই সেদিকে যাই নাই। এপথে বেশী যাত্রী আসে না, বিশেষতঃ এই সময়ে, ইহা আমি জানিতাম। এখন এই ভৈরবী মূর্তির কথা না বুঝিয়া, ওদিকে যেখানে অপর যাত্রী দুজন গিয়াছে দেখাইয়া বলিলাম, উধার যাইয়ে পড়াও হ্যায়। সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু আমার দিকে এমন ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টি হানিয়া গেল, তাহাতেই বুকটা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল,—কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়াই উঠিলাম এবং একটু দূরে খানিক চলিয়া গেলাম। ভৈরবীর বয়স বোধ হয়, ৩২/৩৪ হইবে, কিন্তু গলার স্বরে কোমলতা নাই। বেশ উজ্জ্বল না হোক গৌরবর্ণ বটে, তবে পথশ্রমে কিঞ্চিৎ রক্তাভ। একহাতে ত্রিশূল, অপর হাতে ক্ষুদ্র একটি পুঁটুলী।

বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরিয়া সেই পূর্বস্থানে আসিলাম, যেখানে বসিয়াছিলাম। দুঃখের কথা, মন কিন্তু আমার শান্ত হইল না; ক্ষণ স্থির হইয়া বসিলাম। ততক্ষণে জ্যোৎস্নায় দিঙ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

চাহিয়া দেখি এক পাশে দাঁড়াইয়া সেই ভৈরবী, সেই এক হাতে ত্রিশূল; অপর হাতে সেই ছোট বোঁচকাটি। একেবারে যেন পাথরের পুতুলের মতই স্থির। যন্ত্রবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভয় ও বিস্ময়ে আমার বুকটা আবার ধুক ধুক করিয়া উঠিল। এখন ভৈরবী পরিষ্কার বাঙ্গলায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, —তুমি বাঙ্গালী? একে প্রথম সম্ভাষণেই, তুমি, তার উপর কথার মধ্যে একটু

পূর্ববঙ্গের টান ছিল ;—ইহাতে আমার ধারণা হইল, হয়ত এ ভৈরবী মূর্খ, বিদ্যার সম্পর্ক নাই ইহার সঙ্গে, যদিও আমি তাহার কথার উত্তর দিলাম এক কথায় এবং ভদ্রভাবে। এখন তাঁর সে রুদ্র ভাব নাই। যেন শান্তমূর্তি, পরম বন্ধুর মত কথা।

তুমি বুঝি গঙ্গোত্তরী যাবে? আমিও যাব। ভাল হল তোমার সঙ্গ পেয়ে, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আজ আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো ;—ওখানে ওদের সঙ্গে আমি থাকতে পারবো না, ওরা নোংরা।

কি সর্বনাশ! আবার সঙ্গে থাকা,—আমার প্রতি এ কি অনুগ্রহ। মনে মনে অবশ্য একটা এড়াইবার ফাঁন্দ খাটাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমি ত চটিতে থাকবো না, ঐ যে একটা পোড়ো ঘর দেখেছেন ঐখানে আমি থাকবো ; ওখানে জায়গা আছে বটে, তবে বড় নোংরা,—চারিদিকেই জন্তু জানোয়ারের ময়লা।

এত সহজে ছাড়িবার পাত্র তিনি নন। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তা হোক একটু সাফ্ করে নিলেই হবে। আহা, যখন দেশের লোক পাওয়া গেল তখন আর কোথায় যাব? বলিয়া ত্রিশূলটা ঐখানেই একটা পাথরের গায়ে রাখিয়া বোঁচকাটা খুলিলেন, তাহার ভিতর হইতে একখানি লাল রংয়ে ছোপানো তোয়ালে বাহির করিয়া, এগুলো দেখো, এখানেই রইলো,—আমি একবার আসছি গঙ্গা থেকে, বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন গঙ্গার দিকে।

এবার মনের অবস্থা এমনই হইল যে, কম্বলখানি আর পাত্রটি লইয়া এইক্ষণেই সরিয়া পড়ি। কিন্তু কোথা যাইব? উত্তরকাশীর পথে চলিতে কি আমি পারিব এই রাত্রে? বন জঙ্গলের পথে ভয়ের কারণও আছে, বিশেষতঃ সাপ আর বিচ্ছু,—বিচ্ছুর ভয়টা সবচেয়ে বেশী যে।

মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া দ্বন্দ্ব, সংকল্প-বিকল্পের প্রবাহ চলিল—শেষে এক চমৎকার মীমাংসায় আসিয়া স্থির হইলাম। আমি কেন কল্পনায় ভয় পাইয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতেছি, নিজের মধ্যে শান্তি নষ্ট করিতেছি। কিসের ভয়? সংকোচই বা কিসের। উহা হইতে আমার কোন আশংকাই নাই—বরং এ দূর বন্ধুহীন প্রবাসে ঐ নারীই আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, বন্ধুভাবে বিশ্বাস করিয়া একেবারেই আপন ভাবিয়া অবলম্বন করিয়াছে। এটি আমার কতবড় গৌরব,—আমার অস্তিত্বের এতটা গুরুত্ব যিনি বাড়াইয়া দিলেন,—আমারই তো কৃতজ্ঞ থাকিবার কথা তাঁর আছে।

যাহা হউক গঙ্গা হইতে আসিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আপনিই মুদির দোকানে গেলেন। নিজহাতে কিছু কিছু জিনিস আনিয়া আমায় বলিলেন, চলত ভাই, দেখি কোথায় থাকা হবে। সকল কিছু নিজের হাতেই লইয়া সেই অসম্পূর্ণ ধর্মশালার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিনিসগুলি রাখিয়া তাঁহার পুঁটুলী হইতে একটা বাতি ও দেশলাই বাহির করিলেন। জালা হইলে চারিদিক দেখিয়া বলিলেন, কৈ না, এখানে নোংরা ত কোথাও নেই—বেশ থাকা যাবে। আমাকে ভাগাবার জন্যে বুঝি মিথ্যা বলছিলে?

আমার মুখে কথা নাই।

এমন অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দোকানীর নিকটে কাঠকুটা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং দুজনের জন্য ঘৃতাসিক্ত রুটি ডাল ও আলুর তরকারী বানাইলেন যে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমায় যেন সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন। আমাকে পরিপাটি ভোজন করাইয়া

নিজের অংশ তুলিয়া রাখিলেন। এখনই খাইবেন না। তারপর স্থানটি পরিষ্কার করিয়া এক সতরঞ্চি ও তাহার উপর কম্বল বিছাইলেন, আমাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পেট ভরেছে?

আমি বলিলাম, আপনি না এলে আমার খাওয়াই হোত না।

কেন?

—পয়সা ছিল না, তা ছাড়া এক আধ দিন উপবাস অভ্যাস আছে। শুনিয়া যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। বলিলেন, নিঃসম্বলে এতদূর তীর্থ করতে এসেছ, কেন বলত? ব্যাপার কি, তোমার ঘরে কে আছে? তখন আদি-অন্ত পরিচয়ের পালা চলিল। সব শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ জগদম্বার ইচ্ছাতেই হয়েছে, তুমি বিশ্বাস কর?

আমি বলিলাম, অন্ততঃ ভোজনের ব্যাপারে করি।

তোমরা স্বার্থপর, সংকীর্ণমনের মানুষ কিনা। বিনা স্বার্থে কিছু মানো না, বিনা স্বার্থে কিছু শোনো না, স্বার্থ বিনা কারো সঙ্গে ব্যবহারও করো না।

হয়ত আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু আমি জীবনে অনেক নিঃস্বার্থ লোকের সঙ্গ পেয়েছি।

না না,—তারা নিঃস্বার্থ কখনই নয়, বড় বড় স্বার্থ নিয়ে কারবার করে তারা,—সেটা বাইরে থেকে ঐ রকম নিঃস্বার্থ দেখায়। যাক, এখন এক কাজ করবে, আমার একটা কথা শুনবে?

আপনার স্নেহ, আপনার উপকার ভুলতে পারব না, বলুন কি করতে হবে আপনার।

গঙ্গোত্রী করিয়ে আমায় বদরী-কেদার ঘুরিয়ে দেশে পেঁৗছে দিতে হবে। সব খরচ আমার, তুমি আমার সহায় হয়ে থাকবে কেবল ;—পারবে?

এটাতো খুব ভাল কথা, আমারও ঐ সব স্থানে যাবার আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে,—তবে জানি না শেষ অবধি কিরকম ঘটবে। আপনি কি তান্ত্রিক?

হাঁ, নিশ্চয়ই। তোমার কি ভাব,—তোমরা কোন্ সম্প্রদায়?

আমি কোন সম্প্রদায়েরই নই, কেবল নিজের জন্য একটা সাধনের পথ ঠিক করে নিয়েছি এইমাত্র।—তবে তন্ত্র সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার ইচ্ছা আছে, আপনার কাছে হয়ত জানতে পারবো।

তাই বলো,—তোমার আসল কথাটা কি? যা জানি তা বলবো, বলিয়া এমন সোজা হইয়া আসন করিয়া বসিলেন যেন সমাধিস্থ হইবেন। অন্য সময় হইলে ঐ ভাব দেখিয়া হাসি আসিত।

যাহা হোক,—এখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তন্ত্রমতে সাধন করলে ভগবান পাওয়া যায় কি না?

এই কথা, ভগবান পাওয়ার কথাটা বড়ই জটিল, কারণ সেই বস্তু সম্বন্ধে নানা জনের নানা রকম ধারণা। তারপর পাওয়া,—সেটা আবার আরও জটিল। কারণ সেটা টাকা পাওয়া, বিষয় পাওয়া—কোন বস্তু পাওয়া যেমন, সেরকম পাওয়া নয়। তারপর ভগবান পাওয়া, যে কোন ধর্মের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, আবার কোন ধর্মের মধ্যে না থেকেও হতে পারে। সকলের চেয়ে আরও জটিল কথা এই যে ভগবান যাকে লক্ষ্য করে বলচ তা পাবার জিনিস নয়। কেমন সন্তুষ্ট ত?

তবে তন্ত্র-ধর্মের যে সাধন তার প্রত্যক্ষ ফল কি?—যারা তান্ত্রিক বা সিদ্ধ কৌল তাঁরা কি পান?

যাঁরা যা উদ্দেশ্য নিয়ে সাধন করেন তাঁরা তাই পান। তবে আসলে তন্ত্র ধর্মের যেটা বীরাচার তার মূল উদ্দেশ্য পাশমুক্ত হওয়া। কারণ পাশ বদ্ধ অবস্থায়ই যা কিছু দুঃখ। পাশমুক্ত হলেই জীব নিজ শক্তি অর্থাৎ আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাতে যদি সেই শক্তি নিজ ভোগে লাগায় তার ফল মহা বিপাক, আর সেই শক্তি যদি জীব-জগতের কল্যাণে লাগানো যায় তাতে মহৎ ফল লাভ হয়—দেবত্ব লাভ হয়। এই আর কি।

এই পর্যন্ত বেশ শান্তভাবে স্থির যুক্তিপূর্ণ কথা হইল, তারপর যখন আমি বলিলাম, আচ্ছা ভগবান পাওয়ার ব্যাপারে আপনি যা বললেন আমার তা হেঁয়ালীর মত বোধ হয়। কেন? জীব কি ভগবান পেতে পারে না?

তোমায় যা বলেছি বুদ্ধিমান হলে তুমি আর প্রশ্ন করতে না। তুমি দর্শন শাস্ত্র পড়েছ, আচ্ছা বলোত কতগুলি শাস্ত্র আছে, আর সকলের মত কি এক?—ভগবানের কথা ছেড়ে দাও, এখন তোমাদের শক্তিলাভের জন্য যে সাধনা দরকার তা কি তুমি করেছ? তুমি উঠে পড়ে লেগে যাও, ভাগবতী শক্তি তোমার সহায় হয়ে সিদ্ধি এনে দেবে এইটুকু আমি শপথ করে বলতে পারি। এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আগে শক্তিমান হও, তোমার মধ্যে কতটা শক্তি আছে তা জানো, তার সৎ ব্যবহার কর, তখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝবে। আগে শক্তিমান হও,—বুঝেছ আছে শক্তি—বুঝলে?—বাজে তর্ক ক'রো না।

দেখিলাম উত্তেজিত হইয়া তিনি কথা বলিতেছেন, একটু ভয় হইল। প্রথমে যে ভাবের মুখ-চোখের চাহনি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম এটা সেই ভাবের মুখ। চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি কিন্তু আবার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—যত সব চ্যাংড়া ছোঁড়া, ইস্কুল কলেজে থেকে দু'পাতা ইংরিজি পড়ে কেবল তর্ক, তর্ক, তর্ক শিখেছেন। ভগবান নিয়ে তর্ক, প্রকৃতি, শক্তি এই সব নিয়ে তর্ক করতেই শিখেছেন। জানোয়ারের বাচ্চা সব জানোয়ার। শক্তিহীন মেধাহীন বীর্যহীন বাপ যারা, তাদের এই রকম ছেলে হবে না ত আর কার হবে? কোঁচা দুলিয়ে, সিগ্রেট খেয়ে, সাহেবের দুয়ারে লাথি খেয়ে, ঘরে যক্ষ্মা রুগী মাগ-ছেলে-মেয়ের উপর ঝাল ঝাড়বে, তারপর বুকের রক্ত মুখে উঠে মরবে। দূর, দূর, দূর,—খবরদার—তুমি আমার সঙ্গে তর্ক ক'রো না।

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এ কি ব্যাপার, উন্মাদ নাকি? মনে এই কথাটুকু ভাবিতেছি মাত্র, যেন বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভৈরবী চীৎকারে ঘরখানা ফাটাইবার যোগাড় করিলেন,—কি? আমি উন্মাদ?—আমার শক্তি জানো? সর্বনাশ হবে বাঙ্গালীদের। তুমি বাঙ্গালীর ছেলে, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, ভগবতীর অভিশাপের ফলে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি। দেখো, অন্য কেউ হলে আমি কথা কইতুম না, তোমার মুখ দেখে একটু মানুষের মত মনে হয়েছিল বলেই কথা কয়েছি তোমার সঙ্গে। খবরদার তর্ক করো না আমার সঙ্গে,—আমি তোমার সর্বনাশ করতে পারি তা জানো! আবার ভালও করতে পারি তোমার, মানুষ করে দিতে পারি। দেখবে তুমি?

ভয়ে আমার মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কেবল স্থিরদৃষ্টিতে মাটির পানে চাহিয়া মনে মনে ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতে লাগিলাম। সেই মূর্তি এমন সুন্দরী নারী, যেন পৈশাচিক উম্মাদনায় বিভীষণা হইয়াছে, তাহার কথার উত্তরই বা কি আছে? সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছিলাম।

ভৈরবী আসিয়া খপ্ করিয়া আমার দক্ষিণ হাতের কবচ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, পালাবে কোথায়, তোমার সাধ্য আছে আমার কাছ থেকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালাবার? তোমার মত একজনকে আমি পোকা মনে করি, জানো? তোমরা কি মানুষ? ঘরে মাগ-ছেলে রেখে ঢং করে ধর্ম করতে বেরিয়েছ, মুখ্যু কোথাকার! বেদান্ত পড়েছ, অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে সমাহিত

হবে? ছাই হবে, তোমাদের মুখে ছাই। ভোগ হলো না, শক্তি নেই, ভোগ করবার উদ্যম নেই, ভোগ্য বস্তু উপার্জন করবার সাহস নেই, বাপ-মা বিয়ে দিয়েছে একটা মেয়েকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাই ভোগের নিয়ম রক্ষা চলছে তাতে যে কটা ছাগল জন্মায় জন্মাক। এ্যাঁ—মুখ্যু কোথাকার—ভোগ হলে তবে হয় যোগ, জানা আছে কি?

ভয় ও আত্মগ্লানি বুকের মধ্যে এতটা গভীর পীড়ন করিতেছিল তাহাতেই যেন আমার চৈতন্যলোপের উপক্রম হইল। আমি যেন ধীরে ধীরে নেশায়

ঘোরে অন্ধকার রাজ্যে নামিয়া যাইতেছি। ভৈরবী আমার সংকটময় অবস্থাটা অনুভব করিতে পারিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি বিষম জোরে একটা ঝাঁকুনী দিয়া বলিলেন—তুই যোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস্ কোন্ সাহসে, ভোগে তোর বিরাগ এসেছে কি? বল সত্যি, আমার কাছে, নিজের ভেতরটা দেখে বল্ তুই।

আমি যেভাবে ছিলাম, ঠিক সেইভাবে মাথাটি নীচু করিয়াই রহিলাম, আমার মুখ হইতে কেবলমাত্র, না, এই শব্দটি বাহির হইয়া গেল ; জানিনা ইহা তাঁহার কানে পেঁছাইল কিনা।

ইহার পর তিনি যে ভাবে, যে ভাষায়, যেরূপ বিচিত্র ভঙ্গিতে তাঁর অন্তরের ব্যাকুল চির-উন্দাম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন তাহা বলিতে যতটা সংকোচ—লিখিতে তাহাপেক্ষা বহু গুণ অপ্রবৃত্তিই অনুভব করিতেছি। কথাগুলি শুনিবামাত্রই আমার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে বোধশক্তি রহিত হইবার উপক্রম। এই ভৈরবীর প্রকৃতি কি অদ্ভুত ;—তাহার এইরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যের যথার্থ স্বরূপটা কি, কিরূপ স্বভাবের ফল তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিলেও আমি সম্মোহিতের মত তাঁহার পায়ে আমার মাথা ঠেকাইয়া বলিলাম,—আপনি আমার মা,—আমায় রক্ষা করুন। আমি যথার্থই অতি মূর্খ, দুর্বলচিত্ত, মানুষ নামের অযোগ্য, আর আমায়,—কণ্ঠ এমনভাবে রুদ্ধ হইল যে কথা আর বাহির হইল না।

এইবার বোধহয় ভৈরবী শান্ত হইলেন।

আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন,—তারপর দাড়িতে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন যেমন করিয়া মা স্নেহ-বিগলিত চক্ষে অসহায় শিশু-সন্তানকে নিরীক্ষণ করেন সেইভাবে ভৈরবী আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাতির আলো তাঁহার মুখে পড়িয়াছিল, অপরূপ স্নেহ-লাবণ্যে উদ্ভাসিত সে মুখ। ক্রমে চক্ষে তাঁহার জলধারা বহিতে লাগিল, আমার গলার উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে পড়িতে বুকের দিকে নামিতে লাগিল, সেই তপ্ত অশ্রু। তাহার প্রভাবে আমার অন্তরের যত কিছু গ্লানি সব ধুইয়া যেন স্বচ্ছ নির্মল হইয়া গেল। ভৈরবীর ঠোঁট কাঁপিতেছে, যেন কিছু বলিতে উন্মুখ। ভাবের বেগ প্রশমিত হইলে উন্মাদিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—তুই আমায় কি ভেবেছিস, বলতো! রাক্ষসী না পিশাচী না আর কিছু। বল্ বল্—আমি পাগল, য়্যাঁ,—বল্ না যা খুশি বলে যা।

আমি ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিতে করিতে বলিলাম, কিছু ত বলিনি আমি। শুনিবামাত্র সেই উন্মাদ-ভাব আবার প্রকট হইবার লক্ষণ দেখিলাম মুখে। ছাড়ানো হাতখানা আবার ধরিয়া বলিলেন,—তোরা কি মানুষ হবি না? পুরুষের মত পুরুষ হবি না? তোদের ধাতে কি তেজ, শক্তি এসব আসবে না?—আমি কতদিন থেকে মনের মত একজন মানুষ খুজচি,—যার পায়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনাকে ফেলে দিতে পারি—তোকে দেখে মনে হল বুঝি বা এতদিন পরে একজনকে পেলুম। ছি ছি, এই কি পুরুষের মত ব্যবহার। এতটা নরম, একেবারে কাদা, তুই কি একটা পুরুষ, দূর দূর দূর,—মেনিমুখো, ব্যাটাছেলে, দুচক্ষে দেখতে পারি না। তুই কি করিস, কি করে সংসার চালাস, বলতো—? কি তোর বৃত্তি?

ছবি আঁকার কথা শুনিয়া একেবারে যেন জল হইয়া গেলেন,—প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—য়্যাঁ, ছবি আঁকিস, তাতে পয়সা হয়, কি রকম ছবি আঁকিস ?

মানুষের মূর্তি, দেব-দেবীর মূর্তি সবরকমই করতে হয়।

য়্যাঁ, ধ্যানমূর্তি আঁকিস ? ঠিক আঁকতে পারিস ? আমায় একখানা ছিন্নমস্তার মূর্তি এঁকে দিবি ? ওকে কেউ আঁকতে পারে না।

ও ছবি ত বাজারে বিক্রি হয়, ছ' আনা আট আনা হলেই একখানা ছাপা ছবি পাওয়া যায়। শুনিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন,—সে হাসি আর যেন থামিতে চায় না। য়্যাঁ ! বাজারে ছাপা ? ছিন্নমস্তা ?—য়্যাঁ, ছ' আনা আট আনায় পাওয়া যায়, য়্যাঁ—কি বললি রে, পাগল, আরও কত কি বলবি তাই ভাবচি,—অবাক কল্লি আমায় যে রে—

আমি বলিলাম,—শুনেছি বড়ই ভয়ংকর মূর্তি নাকি ছিন্নমস্তার !

মুখের কথাটা শুনিয়াই আবার সেই বিকট চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া, আমায় সন্ত্রস্ত করিয়া হাঁকিলেন,—ওরে বোকা, তোদের মত মেয়েমানুষেরও অধম মরদ যারা তাদের পক্ষে ত ভয়ংকর হবেই ছিন্নমস্তার মূর্তি ;—রক্ত দেখলে যাদের প্রাণ দেহ-ছাড়া হয়ে যায়, তারা কি ঐ মূর্তির মাধুর্য্য দেখতে পায় ? পাপ আর পুণ্য, স্বর্গ আর নরক কল্পনা করতে করতেই যাদের দিনগত পাপক্ষয় হয়,—লক্ষ্মী, সরস্বতী বীণা হাতে, কেষ্ট ঠাকুর বাঁশী হাতে এই সব মূর্তিই ত তাদের মানায়। দূর দূর হতভাগা, একটা মেয়ে মানুষ যার কাছে ভয়ের ব্যাপার, মহাশক্তির মূর্তি দেখে তার ভয় হবে না ত কার ভয় হবে ?

তারপর আমার গলায় হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন,—যা, যা, গলায় দড়ি দিয়ে কলসী বেঁধে ঐ গঙ্গায় ডুবে মরগে যা।—আর মরবার সময় জগদম্বার কাছে এই বলে প্রার্থনা করবি, হে মা জগদম্বা, পরজন্মে যেন শক্তিমান হয়ে জন্মাতে পারি, আর যদি নেহাৎ শক্তিলাভের অযোগ্য হই,—তাহলে এইটুকু করো হে মা,—শক্তি যে কি বস্তু তা যেন বুঝতে পারি আর যেন এরকম মেনিমুখো বাঙালীর ঘরের এয়োস্ত্রি বেটাছেলে হয়ে না জন্মাতে হয়। দূর হয়ে যা।

বলিয়া আমায় ঠেলিয়া নামাইয়া দিলেন। নামিয়া আমি কতকটা দূরে গেলাম, তখন আমার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। আমি চলিতেছিলাম গঙ্গার দিকেই, হঠাৎ খিল্‌ খিল্‌ হাসির শব্দে পিছনে ফিরিয়া দেখি ভৈরবী সেখানে নাই। এবার সম্মুখে ঐ খিল্‌ খিল্‌ শব্দ,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি পাঁচ ছয় হাত দূরে কে একজন গঙ্গার জলের পানে নামিতেছে।

আমি দ্রুত অনুসরণ করিলাম। তাহার গতি আমা অপেক্ষা অনেক দ্রুত। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইতেছি, যেন ভৈরবীর মতই।—আমি দৌড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম ; ভৈরবী কিন্তু সহজভাবেই চলিতেছেন।

দাঁড়ান একটু দাঁড়ান, একটা কথা আছে।

মূর্তি কর্ণপাত করিলেন না। আমি যখন দশ বারো হাত কাছে তখন ধীরে ধীরে যেন হিম-শীতল জলে অবগাহন করিলেন,—তারপর ক্রমে ক্রমে সর্বশরীর ডুবাইয়া একবারমাত্র আমার দিকে দেখিয়া ডুব দিলেন,—তাঁহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। সারারাত গঙ্গাতীরেই কাটাইলাম।

॥ ২৮ ॥

আয়েঙ্গার বাবা

বৃন্দাবনে একজন মহাপুরুষ ছিলেন,—প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে, জগদীশ-বাবা বলেই তাঁকে ওখানকার সবাই জানত। কিন্তু যেমন হয়ে থাকে, একদল লোক তাঁকে মোটেই সাধু মনে করতো না। এমন কি তারা তাঁকে ভণ্ড বলে উপহাস করতো, যেমন শুনেছি,—পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকেও আমাদের দেশের কত লোকে করতো যখন তিনি বেঁচে ছিলেন, এমন কি তার পরেও।

তখন আমি কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে রাধাবাগেই থাকি। একদিন একজন অদ্ভূত লোক এলো। অনেকটা পাগলের মতই তাঁর ভাব। ভিতরে

কৌপীন তার উপর সর্বাঙ্গে সেই শ্রাবণ মাসের গরমে একখানা মোটা কম্বল জড়ানো, আর কিছু নেই কোথাও কোন অঙ্গে। কখনও বা সেখানা কোমর থেকে তুলে এক কাঁধে ফেলা, কোন গ্রাহ্য নেই কোন দিকে।

এসে বসলো, কেশবানন্দজী যেখানে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বসে আছেন এক বিকেল বেলা। পাঁচ ছয় বছর বয়স একটি শিশু ব্রহ্মচারী, নামটি তার সত্যানন্দ, —তাকে নিয়েই তখন চলছিল অভিনয়। কেশবানন্দ সবার সামনে তাকে প্রশ্ন করলেন, সত্যানন্দ তোমার ঘর কোথায় ? সতানন্দ চক্ষু দুটি নীচে কেশবানন্দের পায়ের দিকে নামিয়ে বললে,—ঐ গুরুদেবের চরণে।

তার কথা শুনে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করছিলাম ;—এমন সময় ঐ মূর্তি ঝড়ের মত এসে উপস্থিত। কোন নমস্কার, শিষ্টাচার কিছু না। এসেই বসে একদিকে চেয়ে রইলো। কেশবানন্দজী বললেন,—স্বামীজী ! ইয়ে ধাম্ মে কব্ আয়া ?

সে বল্‌লে,—উসসে তুমারা ক্যা মৎলব ?—অবতো কুছ খানেকো মাঙ্গাও।

শুনে তিনি কিছু খাবার আনতে বলে দিলেন নিত্যানন্দকে।

ওখানে যেভাবে যে সব কথা চলছিল, সব চুপচাপ, বসে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। অবস্থাটা দেখে আগন্তুক লোকটি বললে,—লেও, তোমলোক বাৎ করো, সব্‌ চুপ কাহে ?—

তখন কেশবানন্দজী বললেন,—আপতো কুছ শুনাইয়ে,—কুছভি পরমার্থীক বাৎ—

সে লোকটা যেন রেগে উঠলো, চিৎকার করে বললে,—ইয়ে চোট্টা লোককো সাথ পরমার্থ কি বাৎ ? কোন্‌ মাঙ্গতে তুমারা পরমার্থ ; দেবুয়া ঔর কসবীকী পিছে ফস্‌ রহা যো সব, পয়সা পয়সা করকে মরতে পয়সাওয়ালাকো পায়ের চাটনেওয়ালালোককো পরমার্থীক বাৎ ক্যা শুনাউ ? শুনেভি কৌন, ওর চাহেভি কৌন,—সব ঝুঠা—চোর—ব্যস্‌ ব্যস্‌—। চুপ রহোজী—।

কেশবানন্দজী একটু হেসে বললেন, স্বামিজী,—দুনিয়াকো সবহি এক কিসিমকো তোন হি রহতা,—

শুনে সে ব্যক্তি ক্রোধে জ্বলে উঠল, আবার বললে, সব্‌—সব্‌—সব্‌ শালা চোট্টা, যেতনা আশ্রমী, লোটা-কম্বলবালে—বিলকুল ঝুঠা—পয়সাকো লিয়ে সবকুছ করতে ; ফির বাৎ মাৎ করো, বৈঠা রহো—জি মজেমে।

এমন সময় খাবার নিয়ে এসে তার সামনে দেওয়া হোলো, সে তা থেকে একটা লাড্ডু তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলে।

লোকটির তেজস্বিতা দেখে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা শ্রদ্ধা, একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম, মনে হল এ কখনই সাধারণ নয়। সেই যে একটি-মাত্র মিষ্টি তুলে নিয়ে খেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো, ততক্ষণ সবাই চুপচাপ, কারো সাধ্য নেই যে একটা কথা কয়। আমি কেবলই তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। কেশবানন্দজী নির্বাক। সত্য বলতে কি, লোকটার ব্যক্তিত্ব এমনই প্রবল যে, সেই জায়গায় আমরা সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে আছি।

খানিক পরে সে আরও একটি খাবার হাত দিয়ে মুখে তুলে খেতে আরম্ভ করলে. দৃষ্টি তার ঠিক ঐ আকাশপানেই রয়েছে ; সেটা শেষ করে লোটায় জল খেলে, আর হাতটা নিয়ে মুছলো তার বাঁ কাধের কম্বলে। তার পর উঠে দাঁড়ালো—এক পা এক পা করে প্রাঙ্গণের বাগানের মধ্যে ঢুকলো।

তখন তার অগোচরে, যারা যেখানে ছিল কথা ফুটলো তাদের। কেশবা-নন্দজী বললেন,—গাঁজা খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গেছে ও। মাঝে মাঝে কখনও কখনও এসে উপস্থিত হয়, দক্ষিণের লোক, এখানে এক বিকানীরের মহাজনের বাড়িতে থাকে।

আর একজন বললে,—বোধ হয় যেন গুপ্তচর, সরকারী কাজে ঐরকম করে সব জায়গায় বেড়ায় ও।

আর একজন বললে,—পাগলই বটে—আপনি যা বলেছেন, না হলে ওরকম অসভ্যের মত যা তা বলে।

যাই হোক সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে আবার এসে বসলো। এসে যখন বসলো, তখন আমার মনে হোলো, এ কখনই দীর্ঘকাল এখানে বসে থাকবে না। যখনই এখান থেকে উঠবে আমিও তার পিছু নেবো। এই ভেবে আমি যেন এইবার উঠবো এইভাবে ধীরে ধীরে সরে বসলাম,—তার

পর আস্তে আস্তে উঠে ধীরে ধীরে একটি থামের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছি,—যেই সে উঠবে আমিও সরে পড়বো ঐ আসর থেকে। সে আসরে কাজের কথা কিছুই হচ্ছিল না, হচ্ছিল কেশবানন্দজীর এক শিষ্যের অসুখের কথা। তিনি দেখতে এবং চিকিৎসা করতেও বটে, গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন নিরাশ হয়ে। তার আর বাঁচবার কোন আশাই নেই, সেই কথাই চলছিল—এমন সময়ে ইনি বাগান থেকে দ্বিতীয়বার এসে আবার ওলটপালট করে দিলেন।

যাই হোক, এখন এসে বসলেন বটে কিন্তু কোন কথাই কইলেন না—কেবল ঐ আকাশের দিকেই চেয়ে রইলেন। কেশবানন্দজী তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—স্বামীজী, অব্ কিধার জানা ?

সে বললে, কাহে ? ইহাঁ কুছ তকলিফ হৈ তুমরা, হামারা রহনে সে ? তুম বাৎ করোনা, আপনে বাৎ।

কেশবানন্দজী বললেন, নহিজী, হামারা তো কোই বাৎ এয়সা নহি যো আপকা সামনেমে হো নহি কতা।

আচ্ছা আচ্ছা, অব হাম যায়েগা,—দো আনাতো দেও। শুনিবামাত্রই নিত্যানন্দ উঠিল, পরে তাকে ইশারা করতেই সে এনে দিল, ততক্ষণে আমি সরাসর একেবারেই ফটকের ধারে এলাম, যাতে সঙ্গ নিতে পারি।

হন হন করে লোকটি এলেন, সদর দরজা পেরিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর আশ্চর্য্য, পরিষ্কার ইংরেজীতেই বললেন, তুমি বাঙ্গালী বুঝি, কলকাতার দিক থেকেই এদিকে এসেছ নয় কি ?—আমার উত্তরে তিনি যেন খুশী হয়ে বললেন, চলো আমার সঙ্গে।

আমি ত তাই চাইছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেতে একটা এমন আনন্দ, এমন মুক্ত ভাবের আস্বাদন পেলাম, যা এর আগে এখানে পাই নি। লোকটি চলেন অত্যন্ত দ্রুত। আমার বাপের বয়সী,—প্রায় পঞ্চাশ হবে, মাঝ মাথায় টাক। কাঁচা পাকা ছোট ছোট চুল দুধারে ও পিছনে, প্রায় এক হপ্তা না কামালে যেমন হয়, তেমনি দাড়ি গোঁফ। চক্ষু দুটি অতি ভয়ানক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ম! তাঁর চাউনিটি সাধারণের অসহ্য। কেমন করে উনি জানলেন যে আমি ইংরাজী বুঝি তা জানি না তবে, কথা তিনিই বললেন। পরে ক্রমে ক্রমে আমার কাঁধে হাত রেখে চলতে লাগলেন, আর আপন ভাবেই ইংরাজীতে বকে চলেছেন। তাঁর তাড়াতাড়িতে বলার জন্যই হোক অথবা আমার অনধিগত বিষয়ের জন্যই হোক, আমি তাঁর কথার কিছুই বুঝলাম না, ভাষাটা ইংরাজী সেটা বুঝলাম মাত্র। এখানে একটা কথা বলে রাখি, তিনি যে তালে চলছিলেন, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তিনি আমার কাঁধে হাত না দিয়েছিলেন, ততক্ষণ আমি কিছুতেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলাম না। ঠিক সেটা বুঝেই তিনি আমার সঙ্গে যেন একটা ঘনিষ্ঠ ভাব দেখিয়ে নিকটে এলেন, তার পর আস্তে আস্তে বাঁ হাতখানা আমার কাঁধে রাখলেন। তার পর থেকেই দুজনে সমান ভাবেই চলতে লাগলাম। আমার আর শক্তির অভাব হয় নি।

প্রথমে আমরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে যমুনা তীরে এলাম, তারপর আবার চলতে চলতে একটা পথ দিয়ে আবার সহরের মধ্যে ঢুকে আর একটা পথ

দিয়ে গোপীনাথের মন্দিরের দিকে আসতে লাগলাম। আমায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গাঁজা খাও? আমি বললাম,—না।

সামনেই গাঁজার দোকান, তিনি দাঁড়ালেন,—আমায় সেই দু আনাটা দিয়ে বললেন, গাঁজা কিনে আনো। নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, রাখো তোমার কাছে। আবার আমরা চলতে লাগলাম।

একটি ছোট্ট ঝুপড়ির কাছে এসে ডাকলেন, শাস্তিজ! ভিতর থেকে এক মূর্তি বেরিয়ে এলো। ছেলেমানুষ, এত অল্প বয়সের সাধু দেখেছি বলে মনে হয় না, পনেরো কি ষোল বছরের বেশী তার বয়স হবে না, তাকে বললেন, মাল হৈ! সে বললে, জরুর! আমায় ইঙ্গিত করতে তার হাতে মালটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর দুজনে বসলাম, সেই নবীন মাল তৈরী করতে লেগে গেল।

আমিই এবার প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা কি বলে তোমায় ডাকবো? সে বললে, আমার নাম পার্থসহায় আয়েঙ্গার। ম্যাড্রাসের কাছেই আমাদের বাড়ী। অবশ্য ইংরাজীতেই আমাদের কথা হোলো, কারণ আমি দেখলাম তাঁর পক্ষে ইংরাজীতে কথা বলা মাতৃভাষার মতই সহজ। তাঁকে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তুমি সাধুদের ওপর এতো বিরক্ত কেন? এই যে তারা সংসার ত্যাগ করে সব ছেড়ে ভগবানকে ডাকচে—

বাধা দিয়ে তিনি থামো, থামো, বলে আমায় থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি ছেলেমানুষ কিছু জানো না, এরা কিছুই ত্যাগ করেনি--আর ভগবানকেও ডাকে না, ভগবান ত দূরের কথা—এরা নিজেদের পরিচয় জানে না, এরা গৃহস্থদের এক্সপ্লয়েট করে, ঘাড় ভেঙ্গে কেবল নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে আসচে। কিছু ভাল নয়, তাদের ব্যাপার।

আমার তখন তর্কপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলো—বলে ফেললাম, সবাই একেবারে খারাপ এ কেমন কথা, প্রকৃতির রাজ্যে এমন বৈষম্য—

এবারও আমায় থামিয়ে কথাটা জোর করে তিনি বললেন,—ঐ ভগবান শব্দটাই যত গোল বাধিয়েছে। যে বস্তুর সঙ্গে মানবের কোন সম্বন্ধ নেই তার জন্য তপস্যা করার কোন মানে হয়? যতো সব অপোগণ্ড ভূত প্রেতের কাণ্ড?

কি সর্বনাশ, এ লোক বলে কি,—ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নেই? সবই সেণ্টিমেণ্ট, ভাবপ্রবণতা? জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষ কি ভগবানকে জানতে পারে না?

আবার সেই রকম চীৎকার করে তিনি বললেন,—না, না, না, মানুষ ভগবানকে ভাবতেই পারে না। সে বস্তু মানুষের জানা অসম্ভব। No man can know God. If God is known by man then it is a magnified man—don't talk about God—Speak something else.

আমি—ভগবৎ বিশ্বাস না যদি থাকে তা হলে তো সর্বনাশ। সে তাড়াতাড়ি বললে,—মানুষ সমাজ উৎসন্ন যাবে, এই তো? তা যাক, যেতে দাও। যে অবস্থা মানুষের হয়েচে তা উৎসন্নের চেয়ে কম কিছু? এরকম মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামো, ধর্মের নামে ব্যভিচার—চুরি, ডাকাতি, খুন, পরস্বাপহরণের চেয়ে কোন অংশে ভালো? ভণ্ডজীবন কোন দিক দিয়ে সমর্থন করা যায় না।

আমি—মিঃ আয়েঙ্গার,—তোমার কথা আমি সমর্থন করতে পারি না।

তুমি সাধু হয়ে যথার্থ সাধু একজনও দেখোনি, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

তিনি—হাঁ একজন দেখেছি, এইখানেই সে আছে, ঐ একজনই দেখেছি যাকে আমি ঠিক ত্যাগী সাধু বলতে পারি, আসল সাধু।

তখন আমি কেমন বিহ্বল হয়ে গেলাম,—এই ভয়ংকর লোকটি, ঐ যে একটি মাত্র সাধু দেখেছেন, আর সেই সাধু এখানেই আছেন শুনে ইচ্ছা হল যে এখনই ছুটে যাই। বললাম, কে তিনি মহাশয়,—তুমি বলো আমি দেখব তাঁকে—

ঐ যমুনার তীরে,—বলে সে লোকটি দেখিয়ে দিলে যমুনার দিকে—তারপর বললে, জগদীশ বাবা তাঁর নাম,—তুমি তাকে কখনও দেখোনি?

আমি বললাম, না—দেখিনি বলেই না এতটা চাই তাঁর কাছে যেতে—

তিনি বললেন—তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তিনি অতীব প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন,—ইচ্ছা করলেই তাকে দেখা যাবে না জেনো।

এমন সময়—গাঁজা তৈরী হয়ে, কলকেতে চড়ে তাঁর হাতে এসে পেঁাছালো।—

তিনি উবু হয়ে বসলেন—তারপর আর কোন দিকে না দেখে টানে মন দিলেন। প্রথম দু'একটা ফুকো টান, তারপর এমন জোরে একটা শেষ টান দিলেন যার ফলে কলকের মাথাটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো। তারপর ধোঁয়া না ছেড়ে কুম্ভক অবস্থায় কলকেটা সেই চেলার হাতে দিলেন বাড়িয়ে। তার কতক্ষণ পর অল্প অল্প করে ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হোলো,—খুব পাতলা ধোঁয়া।

চেলাও প্রসাদ পেয়ে আবার গুরুদেবের হাতে দিলে। গুরু আবার সেই রকম দম, আবার ধোঁয়া গেলা, আবার কুম্ভক,—আবার চেলার হাতে দেওয়া—এইভাবে তিনবার হলো—শেষে ভস্মটা মাটিতে ঢেলে কলকেটা ঝুলির মধ্যে তুলে রাখা হোলো, চেলা তারপর জোড় হাতে বসে রইল তাঁর সামনে।

আমি তখন বললাম, এইবার চলুন সেই জগদীশ বাবার কাছে।

তিনি বলিলেন, না এই সন্ধ্যাবেলা কি তার দেখা পাওয়া যাবে? কাল হবে। আজ চলো আর এক জায়গায় যাই।

ভাবলাম,—হয়তো কোন সাধুসন্ত মানুষের কাছেই যাবেন। রাজী হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তখন আয়েঙ্গার বাবাজীও উঠলেন,—বললেন, তুমি তো দেখচি অত্যন্ত সাধু ভক্ত লোক,—ইয়ং ম্যান (তখন আমার বয়স ২৫/২৬ হবে) বৃথা ঐ সব বাজে অকর্মা বিপথগামীদের উপর অত তোমার আকর্ষণ কেন? জীবনে অনেক কিছু উন্নত কাজ করবার আছে,—এখন থেকে ঐ দিকে গেলে তোমার ভবিষ্যৎটা আমি দেখছি, তুমি একটা বিশ্রী অকর্মাই হয়ে পড়বে! যেমন অলস অকর্মণ্য ঐ শ্রেণীর লোকে হয়ে থাকে, গৃহস্থদের ঘাড় ভেঙ্গে খায়—আর নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই দেখে থাকে। তাদের কাছ থেকে গৃহস্থরা কিছুই পায় না—পায় কেবল ধোঁকা, ভগবানের নামের ধোঁকা—বুঝলে? হাঁ।

আমি দেখলাম আমার তর্ক করা অসম্ভব এরকম একজন কঠিন, শক্তিশালী লোকের সঙ্গে। চুপ করেই রইলাম। তারপর বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরে পিঠে হাত দিয়ে মৃদু মৃদু চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন,—দেখো, আমার বয়স যখন তোমার মত ছিল—আমি তোমার মত সৎ, বুদ্ধিমান ইনটেলি-জেণ্ট ছিলাম না—আমার গোড়া থেকেই স্বভাব-চরিত্র খারাপ ছিল, বোকার মত

সুখের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতাম। বোধ হয়, মাত্র দশ বারো বছর আগে আমার পরিবর্তন এসেচে—সাধু দেখবার, বুঝবার ক্ষমতা হয়েচে এখন।

আমি তাতেও কোন কথা কইলাম না দেখে তিনি বলতে লাগলেন,—চলো, আর এক জায়গায় তোমায় নিয়ে যাব। চলতে চলতে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে হন হন করে চলতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, তুমি শুনচ? বললাম, হাঁ নিশ্চয়ই।

তিনি,—দেখো তুমি আশ্চর্য্য শক্তি দেখতে চাও কিছু?—যাতে শক্তিশালী লোকদের চেনা যায়?—

আমি পরমহংসদেবের কথাটা বললাম,—যারা শক্তি দেখিয়ে বেড়ায় তারা ভগবানের সাক্ষাৎ পায় না।

তিনি বলিলেন, আবার ভগবান সাক্ষাতের কথা? বললাম না তোমায়, ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হতে পারে না। ওগুলো এক একজনের মনের বিকার। তুমি কল্পনা করে একটা কিছু বিরাট বস্তু ভাবতে থাক, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলে তোমারও ভগবান বলেই একটা কিছু দর্শন লাভ হবে, তোমার সঙ্গে কথা হবে, এমন কি তোমার অপরিস্ফুট শক্তিও পরিস্ফুট হয়ে তোমায় লোকচক্ষে শক্তিমান করে দেবে। তুমি যাই ইচ্ছা করবে তাই ভোগ করতে পারবে, যা চাও তাই পাবে। এমন কি তুমিও লোকচক্ষে ভগবান বলে সম্মানিত হয়ে পড়তে পারবে।

আমি তো অবাক্। ইনি বলেন কি? এখন পর্য্যন্ত লোকটির ইতি করতে পারিনি, কেবল ধোকা, একটা বিস্ময়,—এমন কি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি ওঁর কথা শুনে। ওঁর সম্বন্ধে একটা কিছু নির্দিষ্ট ধারণাও করতে পারিনি। এ কেমন মানুষ!

চলতে চলতে এসে পড়লাম একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে। খুব উঁচু ফ্লোরের উপর দোতালা পাথরের বাড়ী। আমায় বললেন, এখানে যারা আছে তারাই আমার আশ্রয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভক্ত? কি রকম?—

তিনি বলিলেন, এরা চায় আমায় সেবা করতে, আমার কাছে তত্ত্বকথা শুনতে,—এমন কি, এদের দেশ হল রাজপুতনায়, ঐখানে আমাকে নিয়ে যেতে চায়।

আমি বললাম,—তা হলে তুমিও ত এক সাধু হয়ে গেলে, এই সব গৃহস্থকে এক্সপ্লয়েট করচ—নয় কি?

সে বললে—না, না,—আমি চাইনি এদের, এরাই আমায় চায়। আমি গ্রাহ্য করি না।

বিকানীরের এক মহাজনের বাড়ি। স্ত্রী কন্যাদি নিয়ে এখানে বাস করে, ছেলে নেই। বাইরে ছিল একজন চাকর গোছের মানুষ, তাকে হাঁক দিয়ে বললেন, এই! হামকো লে চলো।

সে একবার তাঁর আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, সেট্ অবি ঘরমে নেহি জি।

এমন সময় একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী উপর থেকেই তরতর করে নেমে এলো, জোড় হাতে নমস্কার করে বললে, আইয়ে বাবাজি, চলো উপর চলো, বলে আগে আগে যেতে লাগলো।

আমরা উপরে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। সে ঘরটায় যে সব জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায় আর ঘরটি বড়ো যতটা বোধ হয় তার চেয়ে ঢের বড়ো আর তার মধ্যে নেই এমন জিনিস নেই। সবই, তাদের সংসারের। মেঝের তিনদিকে তিনটি ধবধবে বিছানা পাতা, এক ধারে একখানা চমৎকার কারুকার্য্যপূর্ণ বিছানার উপর সবটাই রঙ্গীন চাদর ঢাকা দেওয়া। আর একদিকে চকচকে বাসনকোসন সাজানো থরে থরে, যেমন দোকানে সাজানো থাকে। নানা আসবাব বেশীরভাগই কাঠের উপর বাঁটালির কাজ, যেমন সূক্ষ্ম কাজ তেমনই পরিপাটি তার রচনা।

আমরা যেতেই এক লোটা জল এনে, সেই মেয়েটি আমার সঙ্গীর পা ধুইয়ে দিলে নিজের হাতে। আমাকেও সাধু মনে করে নিঃসংকোচে এলো পা ধুইয়ে দিতে। আমি অতটা নিঃসংকোচ হতে পারিনি, বললাম, হাম সাধু নহি।

নিজেই পা ধুয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যে দেখি সেই আয়েঙ্গার বাবা মশাই একেবারে সেই খাটীয়াতে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন যেন কতই ক্লান্ত।

এবার এলো গৃহস্বামিনী—সোনায় ভরা হাত, গলা, বুক আর মাথা। পায়েও প্রত্যেক আঙ্গুলে আংটী! প্রায় প্রৌঢ় বয়স, এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই পা বাড়িয়ে দিলেন। সে নিঃসংকোচে বসে গেল পা-তলায় খাটিয়ার উপরে—পা টিপে দিতে। চমৎকার, তারপর মেয়েটি দুটি থালে খাবার এনে রাখলে আসনের পাশে।

তিনি বললেন—এ আমার ভারি আরামের জায়গা,—এই বৃন্দাবনে আমি এলে এদের কাছে থাকি, এরা আমায় অন্য কোথাও থাকতে দেয় না।

তারপর মেয়েটিকে বলে দিলেন যে, আমি খাব না, খাবার তুলে নিয়ে যাও। উনি খাবেন তো খান। আমি বললাম, আমিও এখন খাব না, কারণ এটি ঠিক খাবার সময় নয়।

কিন্তু মেয়েটি জোড় হাতে এমন মিনতিপূর্ণ করুণ স্বরে বললে, তার নিজ ভাষায়, অবশ্য সেটা ঠিক হিন্দি নয়—কিন্তু মর্ম যা বুঝা গেল যেন সে বললে,—কেন তুমি খাবে না, আমাদের কি কিছু অপরাধ হয়েছে?—নিশ্চয়ই কিছু কসুর হয়ে থাকবে—তাই বুঝি তুমি খাচ্চো না। সাধু এসে বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ইত্যাদি। আমার ভাষা নেই তাকে বুঝিয়ে দিতে। শেষে হলো এই যে আমায় কিছু খেতেই হলো কোন রকমে এড়ানো গেল না,—তাদের সরল যুক্তি আর মিনতির প্রভাব কম নয়।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, ঘরে দীপ জ্বালা হোল, আয়েঙ্গার বাবা তখনও শুয়ে রয়েছেন, ওঠবার নামই নেই. আমার ত আর ধৈর্য্য থাকে না। বসে বসে দেখছি আর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠছি। মেয়েটি আয়েঙ্গার বাবার মাথার কাছে বসে তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—এ আরাম ছেড়ে তার ওঠবার কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আমি কি করি—মনে মনে ভাবচি, জগদীশ বাবার কাছে গেলে হত, এখানে কি ছাই দেখতে এলুম? বিকানীরের নারী রূপ? মনে মনে এ সব ভাবচি, এমন সময় লোকটী একবার কাশলো; ভিতরে শ্লেষ্মা থাকলে যেমন কাশে সেই রকম কাশি।

ফিরে দেখি, উঠে বসে বাবাজী প্রদীপের দিকে চেয়ে আছেন। একি দেখলুম, এতো পার্থসহায় আয়েঙ্গারের মূর্ত্তি নয়। এ যে অপূর্ব কমনীয়

মুবা পুরুষ অতীব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্বস্তিকাসনে বসা। হাতের উপর দিকে কবচ, নিচের হাতে কংকন, পরণে রেশমের উজ্জ্বল সোনালী পাড় বস্ত্র, বাঁ কাঁধ থেকে নেমেছে উত্তরীয় অপূর্ব গৌরাঙ্গ মূর্তি,—এমন কখনও দেখি নাই ত জীবনে।

মা ও মেয়ে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে সামনে, অপলক নেত্রে চেয়ে আছে ঐ মূর্তির দিকে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—সে মূর্তি এত স্থির নিশ্চল মনে হয় যেন পাথরের তৈরী। এ কি আমার চক্ষের ভ্রম, মরীচিকা দেখচি, ঘরের মধ্যে বসে?—এই বৃন্দাবনে এসে এইবারেই এই পার্থসহায়ের সঙ্গে দেখা। এতক্ষণ এইভাবেই দেখে এসেছি—আধ পাগলা, প্রৌঢ়, বদমেজাজি একটা মানুষ—তবুও তার বাইরেটা দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সঙ্গ ছাড়িনি, এখন দেখি তার আর একভাব। রূপ বদল—এ বিভূতি? সিদ্ধ যোগী যাঁরা তাঁরা এ সব পারেন—শুনেছি অনিমা লঘিমাদি সিদ্ধি থাকলে এরকমটা হওয়া খুব সম্ভব। এই সব মনে মনে তোলপাড় করচি—

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে ঐ মূর্তি একটু প্রসন্ন হাসিমাখা মুখে মাথাটি একটু নিচের পানে ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিত করলেন, এদিকে এসো।

আমি উঠে গেলাম তার কাছে, খাটের ধারে দাঁড়ালাম। তিনি দীর্ঘ হাত খানা বাড়িয়ে যেন আমায় জড়িয়ে অতি সহজেই তাঁর বুকের কাছে নিয়ে এলেন,—আমার শরীর তখন থরথর করে কাঁপতে লাগলো, তারপর আমি একেবারে জ্ঞান চৈতন্য হারালাম। কিছু বোধ রইলো না আমার।

যখন জ্ঞান হল, সামনে এক প্রৌঢ় সাধু মূর্তি, বেশ উজ্জ্বল বর্ণ তাঁর, কপালে চন্দনের ছাপ, কৌপিন পরা, ডান দিকে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলচে। আমি বসে আছি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে পার্থসহায় বাবাজী। জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে করতে চেষ্টা করলাম—কোথায় যেন দেখেছি এ মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে পার্থসারথি বলে দিলেন আমার কানে কানে, এই জগদীশ বাবা এঁকে প্রণাম করে চলো এখন আমরা যাই, কাল আবার তুমি আসবে, আর আমার সঙ্গে আসবার দরকার হবে না।

আমি প্রণাম করেই উঠলাম। তাঁর কুটির থেকে বেরিয়েই একটি কুঞ্জবন, দূরে দূরে বড় বড় গাছ পেরিয়ে যমুনার ধারে এসে পড়লাম। আয়েঙ্গার বাবা আমার কাঁধে হাত রেখে চললেন। কেশী ঘাটের কাছে এসেই বললেন, চলো, এবার আমরা যাই যেখান থেকে বেরিয়েছিলাম। বলতে বলতে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন,—আবার আমি কেমন একটা বিহ্বলতা অনুভব করলুম, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লোপ, আর কিছুই দেখা শুনার বাইরে চলে গেলাম। তারপর—

যখন পুনরায় চৈতন্য হোলো দেখি আমি সেই বিকানীর কুঠিতে প্রকাণ্ড ঘরখানার মেঝেতে বসে আছি—আর আয়েঙ্গার বাবাজী খাটে শুয়ে পায়ের দিকে মায়ের আর মাথার দিকে মেয়ের সেবা নিচ্চেন। আবার তার কাশির শব্দে ভাল রকম চৈতন্য হতেই চেয়ে দেখি আমার দিকে জ্বলজ্বল চক্ষে চেয়ে দেখছেন,—একটু কেমন অদ্ভূত পরিহাসের হাসি তার মুখে প্রকাশ পাচ্চে।

আমি উঠে দাঁড়াতেই বললেন, এখন যাও, কাল সকালে জগদীশ বাবার কাছে যেও—রাস্তাটা কেশী ঘাটের উপর দিয়ে সোজা, ঠিক যমুনার ধারে ধারে—এ্যাঁ?—মনে থাকবে তো?

আমি প্রণাম করে বললাম, হাঁ নিশ্চয়ই থাকবে।

মৃদু হেসে পার্থসহায় বললেন,—এবার আমার উপর ভক্তি হয়েচে, না?—

॥ ২৯ ॥

যোগ-বিভূতি

যাইতেছিলাম গেঁউলা,—কল্যাণী হইতে যমুনোত্তরীর পথে। পথের কোন কষ্টই ছিল না,—সোজা পথ, বেশী চড়াই উৎরাই নেই, দৃশ্যও মনোরম, তার উপর মহাভাগ্য,—এরা বড়ই যত্ন ও খাতির করে, দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করে তীর্থযাত্রীদের অথচ নিজেদের দুঃখ ও দারিদ্র্য, তার পরিমাণ যে কতটা তা যিনি এ অঞ্চলে ঘুরেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন। দেখেছি যদি কোন তীর্থযাত্রী এসে দাঁড়ায়, নিজ মুখের গ্রাস তার জন্য উৎসর্গ করতে কোন সংকোচ নেই। যাই হোক যোগাযোগটা ছিল ভালো, এই গেঁউলার পথে এক গাড়োয়ালী মালগুজারদারের সঙ্গে পথে চলছিলাম,—পথের বন্ধু বড়ই আদরের।

প্রৌঢ় লোকটি বণিয়া,—সাধু সন্ন্যাসীর উপর ভক্তি তার যথার্থই ছিল। কথা কইতে কইতে প্রায় সাত মাইল পথ শেষ করে বিকালে প্রায় তিনটার সময় আমরা গেঁউলাতে পেঁীছে গেলাম। এটা তার নিজ স্থান, বললে, এখানে তার একখানা বড় মকান আছে, কারবারও আছে। কিছুদিন যদি এখানে থেকে যাই তাহলে সে খুব সুখী হবে। ঘরে তার স্ত্রী আর এক দাসী, আর কেউ নেই। দেখলাম সত্য সত্যই নদীতীরে উঁচু জায়গায় তার পাহাড়ী মকান,—দৃশ্যটি চমৎকার, সেখানে থাকা লোভনীয় বটে। একে আরামপিয়াসী আমরা—কোথাও একটু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পেলে সহজে নড়ি না—তার উপর এখানকার কঠোর এই পর্যটক জীবন। এখানে কিন্তু আরাম করা ঘুরে গেল আমার আজ এই প্রথম রাত্রেই।

কঠিন পরিশ্রমের পর,—রাত্রে পরিপাটি ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল তার স্ত্রী। অতি চমৎকার আলুর শাক, ভাজি—আমের আচার আর পরোটা,—এই সব দিয়ে আমাকে যথেষ্ট পূর্ণ পরিতৃপ্ত করলেন। শেষে প্রায় সেরখানেক ঘন দুধ এনে হাজির, খেতেই হোলো। তারপর যখন আলস্য ও ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন, তখন শুয়ে পড়া গেল। একটা বড় ঘর, তার পাশেই একটা ছোট ঘর, সেই ঘরেই একখানা ভাল ফিতাবাঁধা খাটে সুকোমল শয্যা ;—বোধ হয় শুতে যা দেরী। বেশ মনে আছে, যেন একেবারে গভীর নিদ্রার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটি কোমল, অতি সন্তর্পণ করস্পর্শে। কে, কে ? বলে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আমার পা কোলে নিয়ে সেবারতা বণিকের স্ত্রী। ধীর কণ্ঠে সে বললে, সেবা করনে আয়া মহারাজ,—আপকো সেবিকা সমঝিয়ে। ইয়ে হামারি ধরম হৈ।

কুণ্ঠিত ভাবেই বললাম,—মাতাজি! হাম তো সন্ন্যাসী নহি, হামভি আপকী মাফিক গৃহস্থ আদমী। আপকী ঐসি সেবা লেনা হমারা ধরম নহি।

কোনক্রমে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরের বাইর করে দিয়েছি, দরজায় খিল লাগাতে যাচ্ছি,—তার স্বামী এসে ঢুকলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে যে কথা হোলো, সংক্ষেপেই বলে এ পালা শেষ করে দিতে হয়।

এদের মধ্যে প্রথা আছে যে, যেদিন কোন নিঃসন্তান নারী ঋতুস্নান করে,

সেইদিন বা রাত্রে যদি কোন সাধু সন্ন্যাসী সেই গৃহে আসেন, তাহলে ঋতুরক্ষা তিনিই করবেন। এদের বিশ্বাস এই সংসর্গের ফলে যে সন্তান হবে, সে মহাপুরুষ অথবা—অসাধারণ ব্যক্তি হবে। শুনেছিলাম পাঞ্জাবে কোথাও কোথাও এ প্রথাটি তখনও ছিল,—কিন্তু এদিকে এই সব লোকের মধ্যে ঐ সংস্কার আছে দেখে আশ্চর্য্য হলাম কম নয়। যাই হোক এই গৃহস্বামীকে বুঝাতে পেরেছিলাম, যে সাধুর পবিত্র স্পর্শে—তাঁর স্ত্রী ধন্যা হতে পারতেন সে সাধু ব্যক্তি আমি নয়। আরও একে ত আমরা বাঙ্গালী, ভ্রষ্টাচারী,—তার উপর আংরেজী লেখাপড়া শিখে সরকারী গোলামী করে বংশানুক্রমে পতিত হয়েছি, তার উপর আমি বিবাহিত গৃহী,—গৃহত্যাগী সাধু মোটেই নয়, কেবল ভ্রমণ করাই উদ্দেশ্য, তীর্থকর্মের ধার ধারিনা, আমার মত একজনের ও-কর্ম অতীব গর্হিত।

এইভাবে সে রাত্রে এক অচিন্তনীয় নাটকের অভিনয় সাঙ্গ করে পরদিন প্রাতে পথে পা বাড়ালাম।

গত রাত্রের ব্যাপারটি, কি জানি কেন মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় তুলেছিল—তার জের আজও বহুক্ষণ অবধি ছিল। কেমন ধর্মপ্রাণ মানুষ এরা, —কি ভাবে এবং কোন্ সূত্রে এমন অদ্ভুত সন্তান উৎপাদনের রীতি এদের সমাজে স্থান পেয়েছিল, যার জের এখনও অবধি চলছে। এখন চলতে চলতে এর নিমিত্ত ও উপাদান,—দুই কারণই যা আমার মনে এসেছিল, তা নিয়ে এখন আর বেশী নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, পরে কোন সময় অন্য ক্ষেত্রে আলোচনা করা যাবে ভেবে পথের দিকেই মন দিলাম। তবে সাধারণভাবে এর সূত্র সেই মহাভারতের আমলের ক্ষেত্রজ পুত্র দিয়ে স্বামীর অক্ষমতাহেতু ঔরস-পুত্রের কাজ নিষ্পন্ন করার বিধানও এর মধ্যে থাকতে পারে, এবং এইটাই এর মূলে আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এখন এখানকার—অর্থাৎ গেঁউলার ঐ একরাত্রের স্মৃতি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা সোজা রাস্তা—তখন গেঁউলার সীমানা ছাড়াইনি যেতে যেতে দুজন ভদ্রঘরের ছেলে—তারা মুসুরীতে পড়ে, পথেই দেখা হয়ে গেল। আমার বেশভূষার রকম দেখে বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে, তারাই কথা আরম্ভ করে দিলে। কোথাকার লোক, কি করি, কি উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে শুভাগমন করেছি ইত্যাদি প্রশ্ন প্রথম আরম্ভ করলে। বাঙ্গালী বুঝতে পেরে তারা ধরে বসলো আমায় তাদের বাড়িতে যেতে এবং আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে। বাধ্য হয়েই তাদের সঙ্গে—কিছুক্ষণ কথাবার্তায় কাটিয়ে, পথে আমার বিলম্ব হলে বিশেষ ক্ষতি হবে—আজ আমার গাংনানী পেঁছানো চাইই, শেষে বুঝিয়ে ছুটি নিতে পেরেছিলাম। বড়ই আগ্রহে শুনলো, স্বদেশী মুভমেণ্টের ইতিহাস, আগাগোড়া,—তারপর এখন কেমন চলছে ঐ কাজ বাংলা দেশে ইত্যাদি কথা। যেহেতু আমি বাঙ্গালী, ভারতের সকল প্রদেশের শ্রেষ্ঠ প্রদেশের একজন মানুষ, —সুতরাং যথার্থই শোনাবার অধিকারী। এদের ধারণা বাঙ্গালীরা জনে জনে এক একজন সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পাল, সকলেই বিরাট কর্মবীর। যাই হোক, শেষ অবধি অনেকটা আনন্দ, আশা আর দেশ স্বাধীন করবার শক্তির উত্তেজনা তাদের মধ্যে জাগিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। সেই দিনটা শিলকিয়ারী নামক পড়াওতে কাটিয়ে পরদিন আবার যাত্রা।

অতঃপর এখান থেকে যে পথে গেলাম, সে পথে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত বেশী চড়াৎ বা উৎরাই ছিল না। যখন উপত্যকাভূমির ওপর দিয়ে একটি ছোট

সেতু পেরিয়ে এসেছি, তখন চড়াই আরম্ভ হোলো। আড়াইটি মাইলের সেই আরোহণ। যাকে বুকভাঙ্গা চড়াই বলে এটা সেই চড়াই। তা শেষ করে প্রায় তৃতীয় প্রহরে এক জায়গায় এসে পেঁছিলাম, সেখান থেকে গাংনানীর পড়াওটা আরও চার মাইল হবে।

কি জানি আজ প্রথম থেকেই একলা আপন মনে চলে এসেছি কেমন একটা অসহায় ভাব নিয়ে। সারা পথটা একজন মানুষের মুখ দেখিনি। খানিক জঙ্গলও ছিল, ভয়ে ভয়ে পেরিয়েছি, এমন নির্জন পথটা আগাগোড়াই যেন রহস্যঘেরা। যমুনার কুলুকুলু—দু'একটা পাখীর ডাক, তার সঙ্গে যেন একই সুরে বাঁধা—তাই শুনতে শুনতে আসছি। সঙ্গে কিছুই খাবার নেই—দুই চার আঁজলা ঝরণার জল ছাড়া আর কিছুই জোটেনি; তারপর বিশাল চড়াই ভেঙ্গে ক্ষুধায় মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্চি। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। বিজন স্থানের একটা মাহাত্ম্য আছে, সেটি আমি বিশেষভাবেই অনুভব করেছিলাম প্রথম থেকেই। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা,—যার অভিজ্ঞতা আছে, সেই জানে।

কাছেই একটি ছোট গাছ, —সেই গাছের উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে অবাধ,—তাতে সুমুখে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে একটি ঝরণা দেখা যাচ্ছিল। ঐ ঝরণার কাছেই আমায় যেতে হবে—ঐখানেই খানিক জিরিয়ে নিয়ে দু'চার আঁজলা জল পান করে আবার যাওয়া যাবে। এই মনে করে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়লো সামনের ঐ ছোট গাছটির ওপর। সাড়ে তিন হাত উঁচু হবে গাছটা, —কিন্তু তার আকৃতিটি যেমন অদ্ভুত তেমনি অদ্ভুত তার পাতা, ডালপালা, সব কিছুই। এমনটি আমি আগে কখনই দেখিনি। তার পাতার গড়ন বড়ই বিচিত্র অনেকটা কচুপাতার মত—অথচ বড়ই বিচিত্র তার রং। সবুজ মোটেই নয় দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন ছাই রং; খুব কাছে দেখলে হালকা নীল তাতে সবুজের আভা তলায় হালকা বেগুনী। পাতার উপরটি ভেলভেটের

মতই নরম ; ডালপালার রং এমন উজ্জ্বল যেন রূপালী, আবার কোথাও শেওলা ধরা,—গাঁটে গাঁটে ভরা সব ডাল ও পালা। আবার সেই গাঁট থেকেই নূতন ডাল বেরিয়েছে। ঝাঁকালো গাছটি, বোধ হয় সাত আট হাত জায়গা জুড়ে আছে। গুঁড়ি প্রায় দেখা যায় না, ঝোপঝাড় লতায় ভরা।

যাঁরা হিমালয়ে বেড়িয়েছেন তাঁরা অনেক রকম গাছই দেখেছেন বিশেষতঃ যাঁরা এদিকে চক্ষুষ্মান—গাছপালা বেশী ভালবাসেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে যান নানাপ্রকার গাছপালা, ভাল কথায় সেই গিরিরাজের কোলে তরুলতা গুল্ম অথবা অসংখ্য রকমের বনৌষধি এবং বনস্পতি লক্ষ্য করে। বড় বড় গাছ প্রায়ই এক একটি বিশেষ জাতের হয়ে থাকে তাদের নামও বিচিত্র। বাঞ্জ, যার বিলাতি ভদ্রনাম ওক্‌ ;—দেওয়ার, কেলু, পাইন প্রভৃতি ;—কিন্তু ছোট ছোট জাতের গাছ যে কত রকম, তাদের নামও যেমন সাধারণের জানা নেই, তাদের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষতঃ যে গাছটি আমি এতক্ষণ দেখছিলাম,—আর কোথাও সে গাছ দেখিনি। এটা কি গাছ জিজ্ঞাসা করবারও লোক ছিল না এ পথে।

এখন এতটা পরিশ্রম, ক্লান্তি, ক্ষুধার পীড়া হঠাৎ এক ব্যাপারে যেন নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমার লক্ষ্য যখন ঐ গাছের মধ্যেই নিবদ্ধ সেই সময় আমায় চমকে, এমন কি একেবারেই স্তম্ভিত করে দিয়ে বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘকায় মানুষ ঐ গাছের ভিতর দিক থেকে, উলঙ্গ, কেবল তার কাঁধের উপরে একখানা কি ঝুলছে,—না হলে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলাই সঙ্গত। একখানি কৌপীন পর্য্যন্ত নেই সেই ঋজু অঙ্গে।

গাছটির অদ্ভুত আকৃতি প্রকৃতির কথা আগেই ত বলেছি। এখন এই যে এক মানব মূর্তি আমার সুমুখে আবির্ভূত হয়ে আমায় চমৎকৃত করেছিল তার রূপ ও প্রকৃতি সমভাবে অদ্ভুত। যেন ভিতরে বসেছিল, উঠে বাইরে এলো, এমনভাবে তার উপস্থিতি। একেবারে আমার সুমুখেই, বলেছি ; সত্যই, এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ একজনের আবির্ভাব আর একজনের সামনে আর তা এমনই অকস্মাৎ—যে তার বর্ণনা অসম্ভব।

দীর্ঘ শরীর তার, বোধ হয় ছ-ফুটের কিছু উপর,—পাৎলা রোগা ধরণ। মুখখানি ছোট তাইতেই শরীর তার খুবই লম্বা দেখায়। কিন্তু সেই মাথায় জটার বহর এতটাই ঘন যে সহজেই মনে হয় এত ভার কেমন করে এই রোগা লোকটি বয়ে বেড়াচ্ছে ঐ ছোট মুণ্ডের উপর। জটার রং তামাটে,—তার গায়ের রংয়ের সঙ্গে যেন সহজ নিয়মেই মেলানো। চার দিকেই ছড়ানো খোলা জটার মাঝে তার ছোট্ট মুখখানি দেখলে মনে হয় যেন অন্ধকার আকাশের উর্দ্ধ প্রান্তে একখানি মলিন পূর্ণ চাঁদের উদয়। অল্প অল্প গোঁফ, দাড়ি। সে অল্পতা, —অল্প বয়সের জন্য নয়,—স্বাভাবিক বাড় কম ঐ দুই জায়গায়। মুখের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তার চক্ষু দুটি। এমন চঞ্চল, অথচ পলকহীন তার দৃষ্টি,— দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও তার চোখের পাতা নড়তে বা পড়তে দেখি নি। একবার মাত্র ঝটিতি আমার চোখের উপর কটাক্ষপাত করে সেই মূর্তি আমার ঠিক সুমুখে এসেই দাঁড়ালো,—আর তার সেই দৃষ্টির তাড়িত শক্তি আমার মধ্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন করলে তা ভাষায় প্রকাশ করাই দুরূহ। তবে তার আভাস একটু দেওয়া যায় যেমন এক অন্ধকার পথে যেতে যেতে হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ-চমকের ফলে ঝটিতি অনেকটা দৃশ্য এক সঙ্গে চক্ষের গোচর হয় তারপর আবার অল্পক্ষণেই ঘোর অন্ধকার হয়ে যায় ; আমার যেন সেই রকমই হয়েছিল—একবার

হঠাৎ আমার সব অনুভূতি এক হয়ে অনেকটা অপার্থিব সত্তার আলোকে অন্তর-ক্ষেত্র আলোকিত হয়ে উঠলো,—তার পরই আবার সহজ অবস্থা এলো। তখন সেই পুরুষমূর্তিকে সামনে দাঁড়ানো দেখে আমি, নমো নারায়ণায়,—বলে নমস্কার ও সম্ভাষণ করলাম, কারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের ঐভাবে সম্ভাষণ করাই সনাতন আর্য্য রীতি, তা আমার ছেলেবেলা থেকেই জানা ছিল। এ যেন কলের মতই করে গেলাম ; না ভেবে, না বুঝে, না চেষ্টায়, না ইচ্ছায়। এই সম্ভ্রমবোধ তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এটি আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, তার উপর তখন কোন শ্রদ্ধার বিশেষ ভাব ছিল না, অথচ ঘৃণা বা তুচ্ছভাবও ছিল না। যেন কেমন একটা অনির্বচনীয় আবেগশূন্য ভাব, যা ঠিক বলা যায় না কোনও শক্তি-মানের প্রভাবে হয়ে থাকে।

সে ব্যক্তি আমায় তখন কয়েকটা কথা বললে। কি যে বললে তখন বুঝতেই পারি নি। তার ভরাট গম্ভীর স্বর বা ধ্বনি আমার কানের মধ্যে দিয়ে অন্তরে একটা আলোড়ন শুরু করেছিল। সে ধ্বনি উপভোগেরই বিষয় বা বস্তু। পরে যখন তার অর্থবোধ হলো তখন বুঝলাম—আমায় সে জিজ্ঞাসা করছে,—তু যমুনোত্তরী কি আসামী?—আমি বললাম,—জী হাঁ মহারাজ। যোগী বা সন্ন্যাসীদের রাজ সম্বোধন, সনাতন ভারতীয় প্রথা।

উত্তর শুনেই ধীরে ধীরে মূর্তিমান পথের দিকে ফিরে চলতে চলতে বললে,—মেরে সাথ তো চল্‌—হাম ভি উধার যাউংগা।

সুতরাং আর বলা কওয়ার কোন দরকার নেই, আমি যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই চললাম তার পিছনে পিছনে। কে যেন আমায় পাশে বেঁধে নিয়ে চলছে। কিন্তু ক্ষুধাবোধ। সেও সঙ্গে চলেছে আর মধ্যে মধ্যে চেতনায় আঘাত করে যেন জানিয়ে দিচ্ছে, আমি নিতান্তই আছি।

চলেছি কৌতূহল নিয়ে, সম্মুখে যে মূর্তি সচল, তার পিছন শরীরটি আমি বেশ দেখছি আর কত কি যে ভাবছি তা আমিই জানি না। তবে ক্রমে ক্রমে একটি কথা তখন চিত্তের মধ্যে কেবলই ঘোরাফেরা করছিল,—ভগবান

নবরূপ ধরে ছলনা করতে বা আমার মন বুঝতে এভাবে এলেন নাকি? ভগবানের ছলনা—কোনও সাধকের কাছে আসা তাকে পরীক্ষা করতে, এসব ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে সংস্কারগত হয়েছিল।

আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কথা তোলাপাড়া করছি যখন মনে মনে, তখন অগ্রগামী সেই মূর্ত্তি চলতে চলতেই অকস্মাৎ আমার দিকে ফিরে একটু মুচকি হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। তখন আমার মনে হলো, যদি ভগবান নাও হয় এ ব্যক্তি তা হলে নিশ্চয়ই কোন শক্তিমান যোগী,—অন্তর্য্যামী তো বটেই; বিশেষতঃ এ ধরণের শরীর যোগীরই হতে পারে।

যখন ঝরণার কাছে এসে পেঁাছেচি, তখন সে মূর্ত্তি একধারে পথ থেকে সরে গিয়ে জলের খুব কাছেই একখানা পাথরের উপর একটা পা দিয়ে দাঁড়ালো; পিছনে একবার ফিরেও দেখলে না আমি তার পিছনে আছি কিনা। ঐভাবে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন হাতে হাতে তালি দিয়ে যেমন ক'রে গানের তাল দেয় তেমনি করে তাল দিতে দিতে, বেশ সুর করে ডাকতে লাগলো,—গাঁঙনী, গাঁঙনী, গাঁঙনী।—উচ্চারণটি তার ঠিক গাঁঙনী, গাঁঙনী, গাঁঙনী এই রকম। বোধহয় মিনিট দুই তিন পরে একটি অপরূপ লাবণ্যবতী মেয়ে,—'ওঁ যোগী' বলে ধীরে ধীরে ঝরণার ধার দিয়ে সোজা চলে এসে দাঁড়ালো তার কাছে।

সত্যই অপরূপ লাবণ্যবতী সেই মূর্ত্তি,—পরণে তাঁর ঐ পাহাড়ি আর্য্য ব্রাহ্মণদের মেয়েরা যেমন পরে ঠিক সেই রকম পোশাক। নীল রংএর ঘাগরা, উপরে কাঁচলী, তার উপর একটা সাদা ওড়না, কিন্তু মাথায় ঢাকা নয়। একবার মাত্র তাঁর মুখের দিকে চাইতে পেরেছিলাম, কিন্তু তারপর তাঁর পায়ের উপর থেকে আমার দৃষ্টিকে আর তুলতে পারিনি। সুতরাং চক্ষু-ঝলসানো তাঁর মুখের কথা না বলে তার পা দুখানিতে যা দেখেছি তাই বলছি। তবে বেশী বলব না—সংক্ষেপেই বলবো, কারণ তাঁর আবির্ভাব ও স্থিতি দুইই খুব সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে ঘটেছিল।

পা দুখানি, মেয়েদের পা আমরা অনেক দেখি। এখন অবশ্য স্লিপার অভ্যস্ত হয়ে আমরা আসলে তাদের পায়ের মূর্ত্তি বা রূপ খুব কমই দেখিতে পাই। কারো হয়ত মুখখানি বেশ সুকুমার, শ্রীমণ্ডিত, কিন্তু তার পায়ের দিকে চাইলে আর দেখতে প্রবৃত্তি হয় না। পায়ের যে একটি রূপ বা সৌন্দর্য্য আছে আর সেই বোধ আমাদের ভারতীয় জনসাধারণের মনে যেমন প্রবল এমন বোধকরি জগতে আর কোথাও নেই। শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি বদ্ধমূল হয়ে আছে ঐ বোধটি। আমরা শিল্পী—তাই সকল ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্যটুকুই লক্ষ্য করে থাকি। যে হিসাবে মুখমণ্ডল শ্রেষ্ঠ বলা হয়েচে সেই হিসাবে চরণের স্থানও কম নয়। যে কোন মহৎ ব্যক্তিত্ব, অথবা দেবত্বের অধিকারে, সম্ভাষণ বা বরণ বা বন্দনা ঐ চরণ থেকেই শুরু করে থাকি, চরণ শব্দটির সংগে এমনই একটি রূপ বা পবিত্র সৌন্দর্য্যবোধের সহজ অনুভূতি সংস্কারগত হয়ে আছে আমাদের মনে। যাঁরা বোদ্ধা সহজেই বুঝতে পারবেন চরণের উপর আকর্ষণটি আমাদের হিন্দু মনে কতটা কাজ করে থাকে।

এখন এই গাংনীর সুগঠিত পা দুখানিতে যে সৌন্দর্য্য এই চোখে দেখেছি তা এমনই সুন্দর, এমনই অনুপম তার রেখায়তনভঙ্গি সত্য সত্যই যা থেকে চক্ষু ফেরানো যায় না। পায়ের বড় আঙ্গুলিটিতে একটি সোনার আঙট মধ্যে রত্ন সংযুক্ত চুটকী, আর ঠিক তার পরের সব-কটি আঙ্গুলেও ঐ রকম সোনার

আঙট, ঐরূপই তার কারুকার্য্য,—আয়তনক্রমে চমৎকার ভঙ্গিতে পরা। অন্য নারী হলে এসব কেমন মানাতো জানি না, কিন্তু আমার চোখে দৈব্যসম্পৎ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতীর অনুপম শ্রী-যুক্ত চরণ-যুগলই যেন বিধাতার অপূর্বসৃষ্টি। এর যেখানে যেটি ঐ অঙ্গের অলংকার হয়ে শোভা করে আছে, সেখানে তা' না থাকলেও যেন অশোভন হোতো না। মাথার চুল, চকিতের মতই দেখেছি, খয়েরি রংএর সঙ্গে সোনালী ও লালের মেশামেশি তা আবার চূড়া বাঁধা বাঁদিকে। সেই চূড়ার চারিধারে নানা রত্নখচিত এক অলঙ্কারের শোভা, মুকুটের মত উজ্জ্বলরত্নমণ্ডিত একজনের দৃষ্টিকে চকিত করে।

চলন তাঁর, সেও অলৌকিক,—যেন হাওয়ার উপর পা ফেলে অথবা ভেসে চলে এলেন; এমনই হাল্কা শরীর; মনে হয় যেন পৃথিবীর পরশ তাতে লাগতেই পারে না। এসে দাঁড়াতেই যোগী বললে,—হামলোক উপর যাতে;—অব্ ইহাঁ কুছ্ খিলায় পিলায় তো দে।

নারীপ্রতিমা যেন স্মিত বদনে সঙ্গীতের মাধুরী ছড়িয়ে বললেন,—আচ্ছা,—তারপর কমনীয় ডান হাতের তর্জনী-নির্দেশে ঝরণার ধারে একটি স্থান দেখিয়ে আবার বললেন,—বৈঠ যা। তারপর ধীরে ধীরে যেন নৃত্যের ছন্দে, সামনের ঝোপের দিকে চলে গেলেন,—আর তাঁকে দেখা গেল না।

আমার সঙ্গী আমায় তখন সংকেতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হতে আদেশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বসলেন সেই দেবী নির্দিষ্ট স্থানে;—পাশেই আমি গিয়ে বসলাম। বসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই লাবণ্যবতীর আবির্ভাব, হাতে প্রকাণ্ড দুখানি পাতায় খাদ্য,—আমাদের সুমুখে অপরূপভঙ্গিতে সেই পাতা দুখানি নামিয়ে;—খা-লে বাচ্চা, খা-লে। এই কথা বলেই আবার সেই ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। চমৎকার যোগাযোগ, যেন এসব খুবই স্বাভাবিক, এমনটি ত হয়েই থাকে।

সেখানে কোন কুটির নেই,—কোন লোকের বাস নেই একথা আমি খুব ভালই বুঝেছিলাম। ঐ ঝোপটি হোলো নেপথ্য। কেবল একটু আড়াল লোক-চক্ষুর অগোচরে যাওয়ার জন্য ঐ ঝোপটি ব্যবহৃত হোলো মাত্র। সেসব কথায় কাজ নেই, এখন পাতায় কি পেলাম তাই বলচি।

একটি বড় পদ্মপাতা যত বড় হয় অত বড়ই একটি খুব পুরু হাল্কা সবুজ রংয়ের পাতা;—যে গাছের পাতা সে গাছ ও-অঞ্চলে দেখতে পাইনি কোনও দিন,—তার আগেও নয় পরেও নয়। আর পাতার উপরে রাখা আছে দুটি ফল,—কি মিষ্টফল,—যখন খেলাম মনে হোলো অমৃতের স্বাদই এই। আর ছিল চাকা চাকা পুরু পুরু চারখানা রুটির মত, উপরে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ, তখনও তপ্ত। এই বস্তুটি কিন্তু আমার পাতাতেই ছিল, আমার উলঙ্গ সঙ্গীর পাতায় ঐ দুটি ফলমাত্র,—আর কতকটা পিণ্ডাকার পদার্থ। অবশ্য পথশ্রমে আমার যতটা ক্লান্তি না হোক ক্ষুধায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্য অল্পক্ষণেই শেষ করে দিলাম। প্রথম ফল দুটি ভক্ষণের পরে যে বস্তুটি খেলাম তার গুরুত্ব বুঝলাম অল্প কয়েক মুহূর্ত্ত পরে। শরীরে একটি শক্তি এবং স্ফূর্তি অনুভব করতে বেশীক্ষণ গেলো না। তারপর প্রফুল্ল ভাবের সঙ্গে একটি মত্ততায় সচেতন তৃপ্তির ফলে যা হয়ে থাকে তাই হয়েছিল আমার মধ্যে। আরও একবার গাংনীর দেবীমূর্ত্তির যদি দেখা পাই সেই আশায় ঐ ঝোপের পানে চেয়ে রইলাম। তাই দেখে ভোজন রত আমার ঐ উলঙ্গ সঙ্গী

প্রফুল্লমুখে আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুটি করলেন। বুঝলাম—আর দেখা হবে না।

এর পর আমি উঠে ঝরণার ধারা থেকে তিন অঞ্জলি জল পান করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালাম যোগীবরের কাছে। আমার সঙ্গী তখনও খাচ্ছিলেন। এত ধীরে ধীরে তিনি খাওয়ার কাজ করছিলেন তাতে আমার মনে হোল যে হয় তাঁর ক্ষুধা ছিল না, না হয় তাঁর আর কোন কাজই ছিল না খাওয়ার পর। যাই হোক, এখন—তাঁর খাওয়া শেষ হতেই কোন কথা না বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন,—তারপর আরও একবার আমার দিকে চেয়ে, চলবার জন্য পা বাড়ালেন। এবার আমরা চললাম আমাদের পড়াওর দিকে—যেটা এখান থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে।

এখন বড়ই আরামে পথ চলেছি, এত আরামে যে এই সকল পথ চলা যায় আজ প্রথম উপভোগ করতে করতে চলছিলাম। কাছে কাছে দেওদার গাছ, বেশ বড় বড় গাছ,— তা থেকে অল্প তফাতে নীচের দিকে শস্যক্ষেত্র নেমে গিয়েছে। আগে চলেছেন আমার নাংগা যোগী সঙ্গী, দুই তিনহাত মাত্র পিছনে আমি। আমার মধ্যে দুটি চিন্তা বড়ই প্রবলভাবে চলছিল। প্রথম ঐ গাংনীর রূপের বিষম আকর্ষণ তারপর তাঁর অতিথিসৎকার আর তাঁর সঙ্গে এই যোগীর সম্বন্ধ। আমার তখন পূর্ণ যোয়ান অবস্থা, তার উপর শিল্পীর মন।

যদিও পথটা উৎরাই,—আমরা ধীরে ধীরেই চলছিলাম। আমার দ্রুত চলা তো সম্ভব নয়। কাজেই এখানে আমি ধীরে চলতেও যেমন বাধ্য, চিন্তার তরঙ্গে উঠা নামা করতেও তেমনি বাধ্য। যখন ঐ সব কথা চলেছে মনের মধ্যে তখন আমার অগ্রবর্তী যোগী একটু দূরে দেখিয়ে বললেন,—বো পড়াও দেখো। কাজেই আমি বললাম, জি হাঁ। এবারে যোগী জিজ্ঞাসা করলেন,—তু ক্যা শোচতে? ফির তু ক্যা মাংতা?—এমনভাবে বললেন যেন আমার আর কিছুই চাইবার নেই, যা কিছু চাইবার তা সবই যেন পাওয়া হয়ে গেছে।

বললাম,—এক বাৎ সমজমে নহি আতি। শুনে সে বললে, ক্যা বাৎ?

বললাম,—বো গাংনী, গাংনী বোলানা, ঔর খানাপিনা মিলনা, যব উঁহা কোই আদমী ভি নহি, ঘর কোটরী ভি নহি, কোই চোপাড় ভি নহি, বো কৈসে হুয়া?

এ কথার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ;—কোন উত্তর না দিয়ে সে বললে,— ঔর ক্যা সাওয়াল তুমাহারা, বোলো?

এবার বাঙ্গলায় অর্থাৎ আমার আপন কথায় বলচি।

আমি বললাম,—আপনাকে আমি যোগী বলেই মনে মনে বুঝেচি,—এমন কি আমার মনে হয় আপনি সিদ্ধযোগী। আমার যোগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই,—আমার কি যোগসাধনা হতে পারে,—অনুগ্রহ করে আমায় কি শিষ্য করবেন?

তিনি বললেন,—তোমার বিবাহ হয়েছে কি?—উত্তরে স্বীকার করলাম হয়েচে। তখন তিনি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি হেনে আমার দিকে এমনই একটি কথা বললেন যা লিখে এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মোট কথা যাকে দুদিন বাদে স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হবে তার অত যোগবিদ্যার কথার দরকার কি?—

কথা কইতে কইতে আমরা যমুনার ধারে এসে পড়লাম; পুরা উৎরাই শেষ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, শুক্লপক্ষের চাঁদ ছিল আকাশে। যোগী একখানা পাথরের উপর বসেছেন, আমি তাঁর প্রায় সামনে। দূরে দোকানপাট, ধর্মশালা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,— আপনার যোগবিভূতি কিছু দেখতে বড়ই ইচ্ছা হয় আমার। কথাটা বলেই, নিজের মধ্যেই যেন একটা চাবুকের আঘাত পেলাম ;—আর ওদিকে কথাটা শুনেই তিনি আমার দিকে এমন একটি দৃষ্টি হানলেন, আমার শরীরের প্রত্যেক সন্ধি,—এমন কি মর্মস্থান হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো—তারপর এলো একটা ভয়! ভয়েতে আমি নির্বাক,—নীচের দিকে দৃষ্টি,—চুপ করে বসে আছি ; বুকটা ধক্‌ধক্ করচে।

তিনি বললেন,—আরে অন্ধ্যা ! তু ক্যা দেখা ? ভুখে মরতে বখৎ,—গাংনীকী মিলি নাহি ? বো খিলায়া পিলায়া নাহি ?—অব ঠাণ্ডা হোয়কে যোগ বভূতি দেখনে মাংতে।—তু অন্ধ্যা,—বাঙ্গালী লৌণ্ডে।

যোগীকে পরক্ষণেই আর দেখতে পেলাম না,—অথচ উঠে যেতেও দেখিনি। প্রাণ আমার যেন শূন্য হয়েই গেল,—সে বেদনা আমার স্মৃতিতে এখনও ধরা আছে।

॥ ৩০ ॥

ধর্ম বৈচিত্র্য

তখন কার্তিক মাস, প্রথম শীতের অল্প মধুর স্পর্শ। প্রফুল্ল মন, সুস্থ শরীর,—আর অন্তরে উদ্দাম আশা লইয়াই পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছি। এখন বৃন্দাবন যাইতেছি, মথুরায় দুই একদিন থাকিয়া কেশব মন্দিরের স্থান, যে পুণ্যক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কংসরাজের যে কারাগার মধ্যে দ্বাপর যুগে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই চিহ্নিত স্থান যেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল দেখিয়া তারপর বৃন্দাবন যাইব। একলা মানুষ আশ্রয়ের কোনও হাঙ্গামা নাই, এক ধর্মশালায় উঠিলাম। যমুনায় স্নান করিয়া বিশ্রাম ঘাটের দেবমন্দিরে প্রসাদ পাইলাম, তারপর বাহির হইলাম কেশব মন্দিরের স্থান দেখিতে।

সুপ্রাচীন ঐ মন্দির এবং কংসকারাগার স্থান প্রভৃতি লইয়া যে বাহিরে এতটা শোরগোল হইতেছে ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী কারো কোন ধারণাই নাই এ সম্বন্ধে। তাছাড়া ওদিকটা মুসলমান বস্তি,—এক্কা, টাঙ্গা প্রভৃতি দাঁড়াইবার জায়গা আর গরীব শ্রমজীবীদের গতাগতি :—চত্বরের মত একটি স্থান, তার চারিদিকেই ছোট ছোট দোকান।

মন্দিরটি কবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন এক গয়লার খাটাল সংলগ্ন কতকটা উচ্চভূমি তাহা লইয়াই বড় রকমের একটি কীর্তি, শ্রীকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠার কথা। তাহারই আয়োজনের কানাঘুসা চলিতেছে। যা দেখিলাম, —কল্পনার একেবারেই বিপরীত—তৃপ্তি ত পাইলামই না, বরং এ স্থানে আসাটা একেবারেই বৃথা হইয়াছে মনে করিয়া একটা ক্লান্তি অনুভব করিলাম। কম

নয় প্রায় দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় তিনটি ঘণ্টা বৃথা কাটাইলাম। শেষে, কেমন একটা নৈরাশ্যজনিত অবসাদ অনুভব করিয়া যমুনাপুলিনের পথে পা বাড়াইলাম।

হাতে পায়ে নাকে, কানে, মুখে, চোখে পথের যত ধুলা, যমুনার জলে ধুইয়া স্নিগ্ধ হইলাম এবং পুনরায় বিশ্রাম-ঘাটেই স্থির হইয়া বসিলাম। তারপর সন্ধ্যায় আরতি দেখিলাম। এ আরতি পূর্বেও দেখিয়াছি, কিন্তু আজ,—যেন একটা নূতন কিছুর সন্ধান দিয়া গেল। সাত্ত্বিক উপাসনার সঙ্গে অপূর্ব শিল্প-রচনার সমাবেশ,—এমনটি ভারতের আর কোন তীর্থে নাই। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটেও আরতি আছে। বিরাট হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার বিরাট উপত্যকার উপর সে আরতির অনুষ্ঠান অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রকৃত বিশালতার মধ্যে সেই গম্ভীর জল-কল্লোল যেমন সহজে মিলিয়া যায়, আরতির দীপগুলি তেমন করিয়া মিলিতে পারে না—ক্ষুদ্র, অবান্তর হইয়া যায়। কিন্তু এখানে বিশ্রাম ঘাটের আরতি যেন যমুনাকে তাহার অঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া লয়। আরতির পরও তাহার রেশ অনেকক্ষণ থাকে। বসিয়া বসিয়া একটি অপূর্ব তন্ময়তা অনুভব করিতেছিলাম।

কত ভীড় জমিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। ঘণ্টার আরাব,—আর তার তালমান নাই, যাহার যখনই খুশি তালে বেতালে ধ্বনি উঠাইয়া গেল, ঠং ঠং ঠং ঠং। কত নরনারী আসিল, চলিয়া গেল। কয়েকটি প্রৌঢ় ঘাটের সিঁড়িতে সন্ধ্যা বন্দনায় বসিয়া, কতক্ষণ পর আচমন করিয়া চলিয়া গেল। কত দেশীবিদেশী, মধুরহাসিনী কত মথুরা-বাসিনী আনন্দের রেশ ছড়াইয়া গেল দেখিলাম। প্রায় এক প্রহরের পর—ধর্মশালায় যাইব বলিয়া উঠিলাম।

ঘাটের কাছেই রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া এক মুসলমান, সাধারণ নয়, ভদ্র এবং কতকটা আধুনিক বলিয়াই বোধ হইল। কাঁচাপাকা, ছাঁটা গোঁফদাড়ি যেমন পশ্চিমা মুসলমানদের হইয়া থাকে সেই রকম; রৌদ্র-দগ্ধ লালিমায় উজ্জ্বল মুখ,—তাহার উপর ক্ষুদ্র চক্ষুতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। যেন কিছু হারাইয়াছে তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর এই ভাবটা তাহার মধ্যে প্রকট। আমার দিকেও তাহার একটা লক্ষ্য আছে, দেখিলাম। দুজনে চোখোচোখি হইবামাত্র আমায় অনুসন্ধিৎসু অথবা কৌতূহলী করিয়া তুলিল। পায় পায় আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলাম। প্রৌঢ় বয়স হইলেও চেহারায় একটি ভব্যতা ছিল। পান দোক্তার রসে ঠোঁট প্রায় কালো হইয়া আছে।

আবার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নিজ মুষ্টিটা মুখের উপর আনিয়া কয়েকবার কাশিল,—ভিতরে হাঁপের অসুখ থাকিলে যেমন কাশি হয় সেই রকম কাশি, তারপর আমার দিকে চাহিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যেন কথাটা আগে আমাকেই কহিতে হইবে,—গরজটা যেন আমারই। তখন আমি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপ্ ইঁহা কইকো সোচতা হোগা, মুঝকো ঐসা মালুম হোতা ?

সে ব্যক্তি,—জি হাঁ,—শুধু এই কথাটুকু বলিয়াই স্থির হইয়া রহিল। কতক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিল, আপ বাঙ্গালী? এই বাঙ্গালী শব্দটা এমনই কটু, বিদ্বেষ রেশপূর্ণ যে শ্রবণ মাত্রই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিলাম। তাসত্ত্বেও উত্তর দিলাম, জি হাঁ। এখন হইতে আমাদের কথা আর হিন্দীতে

না বলিয়া নিজ ভাষাতে বলিব, কারণ কথা অনেক, আর আমাদের সবার পক্ষেই ও অঞ্চলের উর্দ্দু হিন্দী তেমন রুচিকর হইবে না।

সে বলিল, বোধ হয় মথুরা বৃন্দাবন তীর্থে এসেছেন? উত্তর দিলাম। সে আবার বলিল, কালকাতার লোক? স্বীকার করিলাম। মনে মনে সন্দেহ একটা জাগিয়া উঠিল, পুলিশ নয়তো? ইতিপূর্বে সে অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্টই ছিল—বঙ্গ সন্তানের বিদেশেও রেহাই নাই।

সে আর কোন কথা না বলিয়া একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল, তারপর কতকটা চেষ্টা করিয়াই একটু বিনয় মিশাইয়া নরম সুরে বলিল,—সাধুজি, বড় ফটকের কাছেই আমার গরীবখানা, কিছু কথা আছে, একবার অনুগ্রহ করে যাবেন কি?

গরীবখানা,—বিনয় বচন; শুনিয়াই মনে হইল হয়তো দৌলতখানাই হইবে।

কাছেই বড় ফটক, সুতরাং অল্প সময়েই তার দৌলতখানায় পেঁাছিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আর অগ্রসর হইবার উৎসাহ রহিল না। মানুষের চেহারা ও বেশভূষার সঙ্গে আবাস স্থানের সম্বন্ধ যে কতটা বিপরীত হইতে পারে সে বৈষম্য যে কতটা তীব্র তা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না, হইবার কথাও নয়। যাক্ সে কথা, এখন আমার মনোমধ্যে একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল বলিলাম,—যমুনাতীরেই চলুন সেইখানে গুমটিতে বসিয়া কথা হইতে পারিবে। লোকটা মনের কথা বুঝিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল। সুতরাং আবার আমরা যমুনাতীরেই আসিয়া একটা আচ্ছাদিত চত্বরে বসিলাম। রেলের পুলটি নিকটেই ছিল, গাড়ী চলিয়া গেল, ভদ্রলোক সেই দিকেই চাহিয়া আছেন। আমার চিত্ত এখন অস্থির হইয়া উঠিল। বলিলাম, এখন বলুন যা বলবার কথা।

হাঁ বলচি, সাধুজি,—আমার একটি ছেলে, ঐ একটিই ছেলে আমার। আজ দশবারো দিন নিরুদ্দেশ—শুনিয়াই আমি উত্তর করিলাম, তা আমি কি করতে পারি? সে ব্যক্তি এখন যেন একটু কাতরভাবেই বলিল, শুনুন আপনি সব কথা,—তারপর যা ইচ্ছা হয় বলবেন। তাহার কাহিনী, সে বলিতে লাগিল।

আমার ছেলেটির কথা বড়ই অদ্ভুত। তার স্বভাবও ছিল একটু অদ্ভুত রকমের! আমরা মুসলমান, আপনি জানতে না পারেন আমরা বাদশার জাত, —সুলতান আলামের আমল থেকেই দিল্লীতে আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি, এক সময় সারা হিন্দুস্থান আমাদের হুকুমেই চলতো,—ডাফ্‌রাইন্ লাট আমাদের জায়গীর দিয়ে আগ্রায় বসিয়েছিল—আখবরেতে এসব কথা ছাপার হরপে লিখা আছে।

আমার পক্ষে অসহ্য হইল। এই সব হইতে উদ্ধারের আশায় ব্যাকুল ভাবেই প্রার্থনাসূচককণ্ঠে বলিলাম,—দোহাই শাজাদা সাহেব, এখন আপনার ছেলেটির কথা—

হাঁ, হাঁ—তাই বলচি,—কিন্তু কি জানেন ঠাকুরজী,—আমাদের খানদানের কথাটা না জান্‌লে কত বড় ঘরের ছেলে হয়ে সে কি আহাম্মকী করেচে তা বুঝবেন কি করে? তাই গোড়ার কথাটা—

আমি জোড়হাত করিয়া বলিলাম,—এখন যদি আসল কথাটা আরম্ভ করেন। তখন তিনি আবার আরম্ভ করিলেন,—হাঁ, তাই বলছিলাম,— এই যে

ধর্ম আমাদের—সারা দুনিয়ায় এক সময় এই ইসলাম ধর্মকে নিতেই হবে,—না হলে কেউ কখনও উদ্ধার পাবে না। আমরা সেই মুসলমান ; হিন্দু আমাদের কাছে কাফের,—প্রত্যেক হিন্দু, সে যত বড়ই হোক না কেন, আমরা তাদের কাফের বলেই জানি ;—আমাদের মোল্লারা তাদের ছায়া স্পর্শ করে না। আমাদের এই খোদার অনুগ্রহপূর্ণ ধর্মের মহিমা কাফেররা যদি বুঝতে পেরে কখনও এই ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে আমরা আপন জনের মতই করে নি.—কিন্তু তা বলে কাফেরদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব চলে না—

অসহ্য! কি যন্ত্রণায় পড়িলাম,—কিন্তু উপায় ছিল না, শুনিতেই হইবে। এখন ধর্মের মহিমায় ভাসিয়া চলিলাম ফলে স্রোতে পড়িয়া আমার মধ্যে কোন কৌতূহলও রহিল না তার ছেলের অদ্ভুত গল্প শুনিব। কিছুক্ষণ শুনিয়া শেষে অসহ্য হইল, বলিলাম,—আচ্ছা আপ বৈঠিয়ে, অবু হাম ঘর যায়গা—বলিয়াই উঠিলাম এবং একবার হাত তুলিয়া সেলামের ভাব দেখাইলাম। সে ব্যক্তি অবাক হইয়া যেন আমি একটা কি বেয়াড়া কাজই করিয়াছি এমনই ভাবে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, বৈঠিয়ে, এখন কেবল ছেলের কথাই বলচি।

যেন বাধ্য হইয়া বসিলাম,—তখন সে আরম্ভ করিল, কি জানেন, আমাদের উদার ধর্মের সঙ্গে হিন্দুদের পুতুল-পূজামূলক ধর্মের তুলনাই হয় না। কোরাণ সরিফেই আমাদের বিশ্বাস! তাতেই বলেচে যে হিন্দুরা কখনই স্বর্গে যেতে পারবে না জাহান্নমেই যেতে হবে তাদের। সেইজন্যই আমাদের ঘরানা ঘরের ছেলে যারা তাদের বাল্যকাল থেকেই যাতে ধর্মে মতি ঠিক থাকে, তাই শিক্ষা দিয়ে থাকি। দেখিলাম, ভিতরে একটা প্রবল রোষ তাহাকে পীড়া দিতেছে ; না বলিলেও নিষ্কৃতি নাই।

আমি ব্যগ্র ভাবে বলিলাম, এইবার বলুন এখন আপনার ছেলের কথাটা।

হাঁ, তাই বলচি, আমার ছেলেটি, নামটি তার দাদার রহমান, সে মোক্তবায় লেখাপড়া করতো, দু তিন খানা আংরেজী বইও পড়েছিল, শান্ত স্বভাব তার, সবাই তাকে ভালবাসতো, একটু মুখচোরা ছিল, কইয়ে বলিয়ে তেমন ছিল না। আমরা তবুও তাকে কড়া শাসনেই রেখেছিলাম,—আমাদের খানদানের নিয়মই তাই কিনা। আমার বিশ্বাস ছিল সে একজন খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠবে কোন দিন। এখন তার বয়স প্রায় ষোল হবে। একদিন সে তার মায়ের কাছে এক বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলো। সে বলে কি জানেন ?—বলিয়া হাঁ করিয়া সে ব্যক্তি আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, যেন আমিও অবাক হইয়া গিয়াছি কিনা দেখিতেছে। আমি বলিলাম, কেমন করে জানবো, আমি তো সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না সেখানে!

সে কি বললে জানেন ? বলে, আম্মা! তোমরা হিন্দুদের কাফের বল কেন ? বলো,—আমায় আজ বলতেই হবে। আম্মা তো মেয়ে মানুষ, কিছুই বলতে পারলে না। রাত্রে আমায় বলে দিলে যে, ছেলে এই কথা জিজ্ঞাসা করেচে। শুনে আমার গা জ্বলতে লাগলো ; একেবারে তার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে উঠানে নিয়ে এসে, সপাসপ বেত লাগাতে লাগাতে বললাম, যারা এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস না ক'রে পুতুল পুজো করে তাদের কাফের বলে, এই কথা কোরাণে আছে, তুমি আর কখনও ও-কথা জিজ্ঞাসা করবে ? হিন্দুর নাম নেবে ? সে একটাও কথা কইলে না, আমার কথার কোন উত্তরও দিলে না! আমার হাঁপ

ধরে গেল, বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। তারপর বলিল, আমরা খোদাতালার পয়দা হওয়া জীব—আমাদের ছেলেদের মুখে ও সব কথা কেন?

যাক ও-কথা, এখন ছেলেটি ঐ দিনের পর থেকে আর কাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি, কেমন একটা গম্ভীর ভাবে, কারো সঙ্গে কথা না কয়ে চুপ্‌চাপ্‌ দিন কাটাতে লাগলো। আমি মনে করলাম, ঐ রকম কড়া শাসনে তার জ্ঞান হয়েচে।

এখন কাসেম বলে আমার এক ভাইপো, সে তারই সঙ্গে পড়তো। কাসেম এই বয়সেই পাঁচবার নমাজ পড়ে, যা আমরা পারি না, সে খুব উঁচুদরের মুসলমান, পরে সে একজন নামজাদা মানুষ হবে তা আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম। ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরে কাসেম চুপি চুপি এসে সন্ধ্যানামাজের পর আমায় বললে, চাচাজী, দাদার একেবারে কাফের হয়ে গেছে। হিন্দুদের মন্দিরে যে দেওতা আছে তার দিকে চেয়ে থাকে, দরওয়াজার পাশে দাঁড়িয়ে চুপটি করে দেখে, আবার বিড় বিড় করে কি সব বলে কে জানে, আবার কাঁদে। ওর চোখে জল দেখা যায়। আমি দেখেছি।

মুসলমান-প্রবর একটু দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—কাসেমের মুখে ঐ কথা শুনে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে দরগা সারিফে, যেখানে আমাদের মোল্লা, হাপিজি, হাকিম সব থাকেন সেইখানে গেলাম। তিনি কাসেমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করলেন, নিজের চোখে সে ঠিক ঠিক যা দেখেছে। সব কথাই তখন কাসেম বললে, যে, পরশুদিন এক সঙ্গেই মক্তব থেকে বেরিয়ে যখন ঘরে আসছিলাম, সে আমায় বললে, তুই ঘরে যা আমি একটু পরে যাচ্ছি। আমি জানতাম পথে ঐ যে কাফের হিন্দুদের দেও মন্দির আছে ও ঠিক সেইখানে যাবে বলেই আমায় ভাগাতে চাইচে; আমি ওকে বললাম, তা আমি তোকে ঐখানে যেতে দেবোনা, গেলে তুই কাফের হয়ে যাবি। শুনে ও বলে কি? ভাইয়া। তুই ঐ মন্দিরের দেওতা কিষণজি আর তার বিবিকে দেখেছিস্‌? আমি বললাম যে, ও সব কি আমাদের দেখতে আছে রে? আমরা যে বিশ্বাসী পবিত্র মুসলমান। আমার কথা দাদার কানেই নিলেনা, সে কত কি সব বলতে লাগলো, শেষে বললে, খোদাই ত সব পয়দা করেছেন, তবে আমরা কেন দেখবো না তাঁর সৃষ্টিতে যা আমাদের ভাল লাগবে? এতে তো কারো কোনো লোকসান, কোন গুণা নেই কারো, আমার যদি ভাল লাগে। দেখতে দোষ কি? ওর ঐ কথা শুনে আমার রাগ হোলো, আমি বললাম, তুই ত নিশ্চয়ই কাফের হয়ে গেছিস। আমাদের আল্লা তাহলে তোর উপর গোসা করবেন, তোকে নিশ্চয়ই ঐ কাফেরদের সঙ্গে জাহান্নামেই পাঠাবেন। সে আমার কথায় রাগ করলে না, শুধুই এই কথাটি বললে, খোদা তো সব কিছুই দেখছেন, আমি যখন কোন অন্যায় করিনি, তখন কেন তিনি আমার উপর রাগ করবেন? হাঁ,—আরও সে এই কথাটা বললে যে, আমাদের মত দুর্বল ছোট মানুষের মত আল্লার কি রাগ হিংসা আছে? মহব্বৎ না হলে কি আল্লাকে পাওয়া যায়? যেখানে মহব্বৎ সেখানে গোসাগুণা এ সব কখনও থাকতে পারে?

হাপিজি একমনে সকল কথা শুনে বললেন, নিশ্চয়ই কাফের পাণ্ডাদের ছেলেরা কেউ তার পিছনে লেগেছে আর এই সব কাফেরি শিখিয়েছে। কাসেম বললে, পাণ্ডাদের কোন ছেলের সঙ্গে তাকে কখনও কেউ দেখেনি। তা ছাড়া

আমরা তো কখনও ওদের ছেলেদের সঙ্গে মিলিনা, না ওরা আমাদের সঙ্গে মেলে। এই সব শুনে হাপিজি, মোল্লা ফিরুকসার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন, আমরা চলে এলাম ঘরে। এসে দেখি দাদার বাড়িতে একলা চুপটি করে বসে আছে। তার মুখখানা দেখে মনে হয় না যে, তার মধ্যে কোন পাপ বা অন্যায় আছে। সে এমন শয়তান, নিজের মনের মৎলব বেশ প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে। কে তার পরামর্শদাতা, কোন্ কাফের বাচ্চা তাকে এইসব হদিস দিয়েচে, এই সব কথা তার মুখ থেকে বার করবার জন্য তাকে সে রাত্রে যে প্রহার করেছিলাম, অজ্ঞান হয়ে গেল তবু বললে না।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আমার কেমন একটা গ্লানি, এদের অজ্ঞান বুদ্ধি কতদূর নীচে নামিতে পারে, কেমন করিয়া সে অবস্থায় একটা সত্য বস্তু চাপা দিয়া মিথ্যার ইমারত খাড়া করিতে পারে, তাই ভাবিয়া মনটা শ্রদ্ধাহীন, তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ছেলেটির কথা পরে হইবে—কারণ তাহার দৈবানুগ্রহ-জনিত প্রেমধর্ম তাহার পিতা বা সমাজের অজ্ঞাত; সহজ চক্ষে যেটা দেখা যাইতেছে তা এই ব্যক্তি দেখিবে না, দেখিবে যাহা নয় তাই, নিজ নিজ ঈর্ষা দ্বেষ প্রসূত কল্পনার চক্ষে। আমি বুঝিলাম এদের সন্দেহটা এই যে কোনও পাণ্ডা বা তাহাদের ছেলে কেউ এই ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানদের ছেলেটিকে সরল পাইয়া হিন্দু করবার চেষ্টা করিয়াছে। একটা কথা এক্ষেত্রে না বলিয়াও পারিলাম না যদিও বুঝিলাম আমার এটা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আচ্ছা মিঞা সাহেব, আপনার বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে—

সে বলিল, পাঁচপন হয়ে গেছে এই রমজানে।

বেশ, আপনি কখনও হিন্দু, একজন মুসলমানকে হিন্দু করবার চেষ্টা করেছে, এরকম দেখেছেন কি?

সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, আগে দেখেনি বটে তবে এখন শুদ্ধি আরম্ভ হয়ে গেছে যে।

সেটাতো খাঁটি মুসলমানদের জন্য নয়, যারা আগে হিন্দু ছিল, কোন কারণে জাতের বার, সমাজের বার হয়ে গিয়েছে বা মুসলমান হয়েছে তাদেরই জন্যে না শুদ্ধির ব্যবস্থা? তাদের কেউ যদি আবার ফিরে আসতে চায়,—

তা বটে, এই রকম কথাই চাউর করে বাইরের লোককে জানানো হচ্চে, ভিতরে ভিতরে তাদের কি মৎলব তা কে জানচে? তবে এটা ঠিক খাঁটি মুসলমানকে ত কখনই পারবে না, এখন ছোট ছোট ছেলে হাল্কা মন যাদের তাদের চেষ্টা করে দেখচে হয়তো?—

এ কথার পর আর কথা চলে না—তবুও বলিলাম,—মিঞা সাহেব আপনি কি শোনেন নি যে ধর্মান্তর গ্রহণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে না? হিন্দুদের ধারণা যে, হিন্দু হয়ে না জন্মালে হিন্দু হওয়া যায় না।

মিঞা সাহেব বলিলেন, হাঁ, তা শুনেচি বটে কিন্তু—

ঐ কিন্তুতেই সর্বনাশ ঘটিয়েছে। যাহা হউক দেখিলাম এবার যেন একটু আর্দ্র হইয়াছেন। এখন করুণ নেত্রে বলিলেন—তারপর শেষ কথাটা শুনুন,—যেদিন সে নিরুদ্দেশ হয়,—তার দুই একদিন আগে থেকে সে কেমন এক অদ্ভুত-ভাবে থাকতো। তার মা আমায় বললে যে, তুমি ছেলেটার দিকে দেখচো না আমার বোধ হয় ওর উপর কোনও দেওতার ভর হয়েচে না হলে ওর চক্ষু সব সময়েই লাল কেন? আর যেন জলে ভরেই আছে। কারো সঙ্গে কোন কথা

কইতে গেলে ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। কেউ কাছে গেলে সেখান থেকে সরে যায়—একলাই থাকতে চায়। আমার তো ভয় করে ও রকমটা দেখলে।

তার মায়ের কথা শুনে আমি সেই রাত্রেই আলো নিয়ে তার বিছানায় গিয়ে দেখি সে নেই। কোথায় গেল ? কাসেম ও সে এক জায়গায় থাকে,—দেখি কাসেম ঘুমিয়ে ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে যেন ভেবে বললে, আমি তো কিছুই জানিনা কখন উঠে গেছে। এ রকম তো সে রোজই করে—খুঁজতে খুঁজতে দেখি, একটা কুয়ার ধারে, অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে। ধরে এনে বেদম প্রহার লাগালাম। মারের চোটে কেমন করে ভূত ভাগাতে হয় তা আমরা খুব ভালই জানি। কিন্তু ঐ বিষম প্রহারেও তার কিছু হোলো না, সে শয়তান শয়তানই রয়ে গেল। আশ্চর্য্য,—এতটা মার খেয়েও কিন্তু সে একটা রাগের কথা বলেনি কোনদিন। তারপর যেদিন আমার স্ত্রীর কথায় মৌলালী থেকে এক গুণিনকে নিয়ে এলাম, তখন সে পালিয়েচে। যাবার আগে কাসেমকে বলে গেছে যে, আমার আশা ছেড়ে দাও, লাডলী আমায় ডেকেচে। আমি একেবারেই কাফের হয়ে গেছি।

সেই থেকেই সে নিরুদ্দেশ,—আমি কিন্তু আশা ছাড়তে পারিনি, আজ প্রায় দু'হপ্তা হয়ে গেল,—রোজ একবার করে এই সব জায়গায় খুঁজে বেড়াই। অতএব একটা ঘরের ছেলে শেষে কাফের হয়ে যাবে এটা কি সহ্য করা যায় ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তা আমায় আপনি কি করতে বলেন ?

মিঞা বলিল, আমার ঐ একটিমাত্র ছেলে, আমি এখনও তাকে ফিরে পেতে চাই। আপনি যখন ঘাটে বসেছিলেন তখন থেকেই আপনাকে দেখছি, তারপর যখন উঠে এলেন মনে হোল হয় তো আপনার দ্বারাই তার সন্ধান হবে।

আমি বলিলাম, আপনার ছেলে তো কাফের হয়েই গেছে স্ব-ইচ্ছায়, এতটা পীড়ন সত্ত্বেও যখন সে আর ঘরে থাকতে চায় না, তাকে সন্ধান পেলেও ঘরে নিতে পারবেন ? উত্তরে সে বলিল,—সে ছেলে মানুষ, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেচে ; তার ভুলটা তাকে বোঝাবো, আমাদের দরগায় সব বড় বড় সাধু মহাত্মা আছেন, তাঁদের কাছে নিয়ে যাবো, তাঁদের শক্তির প্রভাবে তার মতিগতি বদল হয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস। বলিলাম, আচ্ছা যদি কখনও কোথাও সন্ধান পাই তো জানাবার চেষ্টা করবো। তিনি তাঁর পাত্তা দিয়া দিলেন যেখানে তাঁর নামে খৎ দিলে ঠিক জায়গায় পেঁছাইবে। এই পর্য্যন্ত কথা। পরদিন আমি মথুরা ত্যাগ করিলাম।

বৃন্দাবন আমার পরিচিত এবং অতিপ্রিয় স্থান, অনেক বারই ঐ স্থানে যাতায়াত ঘটিয়াছে। শুধু তা নয় এইখানেই সাধন জীবনে যে রত্নলাভ করিয়াছি তাহা চিরজীবনের সম্বল হইয়া আছে,—আজও পর্যন্ত।

রাধাবাগের ব্রহ্মচারী আশ্রমেই আমার আস্তানা। এবং ঐখানেই কেশবানন্দের আশ্রমে আমার দীর্ঘকাল কাটিয়াছে। সেইখানেই উঠিলাম। পরদিন মেঘে ঢাকা বৈকালে একটু ভ্রমণের জন্য যমুনাতীরে গিয়াছি, সেখানে বনচারী সাধুদের আশ্রম। তাহার নিকটেই ঘুরিতেছিলাম। পরপারের দিকে যমুনার বিস্তৃতি, বহুদূর প্রসারিত তটভূমি, মধ্যে মধ্যে দুই একটা গাছ ; তাহার

পশ্চাতেই সুদূর বৃক্ষশ্রেণীর গাঢ় নীলাভ রেখাটি দিক্‌চক্রবাল ব্যাপিয়া আকাশ প্রান্তে মিলিয়াছে।

যেখানে বসিয়াছিলাম, তার অল্প কিছু দূরে অপূর্বদর্শন তিনটি প্রকাণ্ড শিশুবৃক্ষ। চমৎকার, সুপরিস্কৃত তৃণহীন ভূমির উপর লম্বা বড় বড় গাছ তিনটির মূল এমনই সমান্তরালে অবস্থিত যাহাতে এক সুডৌল ত্রিকোণ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি রচিত এমন ক্ষেত্র প্রায়ই দেখা যায় না, এ যেন কোন

যোগীর আসন। উহা শূন্য নয়।—দেখিলাম, ঐ ত্রিকোণের মধ্যে কৌপিনবন্ত মূর্তি, অপরূপভঙ্গিতে বসিয়া আছে। সে ভঙ্গি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, আমার দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করিল,—এবং সেই দৃষ্টিতে প্রথমেই ঐ মূর্তিটি বৈষ্ণব এবং যোগী বলিয়া মনে হইল, উপবেশন ভঙ্গি তাঁহার যোগীর মতই।

বাল্যকাল হইতেই আমার প্রকৃতি চঞ্চল বলিয়া কোন সাধু মূর্তি বড়ই আকর্ষণের বস্তু। বিশেষতঃ শান্ত ধীর প্রকৃতির সাধু দেখিলে প্রাণ যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, পরিচয়ের জন্য। মনে হয় যেন তাঁরা আমার জন্মজন্মান্তরের আপন জন। কাজেই এক্ষেত্রে আর স্বস্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়াই উঠিয়া পড়িলাম এবং নিমেষ-মধ্যেই যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম অপরূপ এক বালক মূর্তি। স্বাস্থ্যবান পূর্ণায়ত শরীর,—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পরনে কৌপীন। যেন ব্যাসপুত্র পরমহংস শুকদেবকেই শরীরী দেখিতেছি। রূপ

দেখিয়া নির্বাক, পলকহীন হইলাম। শিল্পীর উপর রূপের বিষম প্রভাব একথা সবাই জানে। অবশ্য রূপটি বাহ্য হইলেই এক্ষেত্রে অন্তরের সম্পদ সে রূপকে ঐশ্বরিক লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহা জ্যোতিরই নামান্তর। যথার্থ এই রূপই শিল্পীর কাম্য।

তখন একটু শীত ছিল,—কিন্তু তাহার গায়ে কোন বস্ত্রই নাই, হয় তো প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আমার স্থূল শরীর-গত বুদ্ধি, তার শীতবোধটা নিজের উপর আরোপ করিয়া গায়ের গরম কাপড়খানি তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দিলাম। কোন কথা নাই, অপলক দৃষ্টি যমুনার দিকেই স্থির। ভাবিলাম বনচারী বৈরাগীদের বালক ভক্ত কেহ হইবে। সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে বালক ব্রহ্মচারী অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এমন চক্ষু খুব কমই দেখা যায়,—পদ্মপলাশ চক্ষুর কথা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছে—সেই চক্ষু অরুণ বর্ণ তাহাতে জল টল টল করিতেছে যেন এখনি উপচিয়া পড়িবে। এমন একটি কিশোর সাধু মূর্তি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।

মথুরা হইতে আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত সেই গোঁড়া মুসলমান ভদ্র-লোকটির পুত্র দাদার রহমানের কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার অন্তরে প্রেমধর্মের স্ফুরণের কথা, তাহার প্রতি এত অত্যাচার সহ্য করিয়া অক্রোধ, স্থিরবুদ্ধি বালকের গৃহত্যাগ, তারপর কোথা অন্তর্দ্ধান এই সব কথাই তোলপাড় করিতে-ছিলাম, যেই মাত্র এই মূর্তি সম্মুখে দেখিলাম মন হইতে সে সব কথা একেবারে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল, চিত্ত এই মূর্তির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল ; প্রশ্ন করিব কি না ভাবিতেও প্রবৃত্তি হইল না। বসিয়া বসিয়া দেখিতেই লাগিলাম।

একটি ব্রজবাসিনী, ঘাগরা, কাঁচলী ও ওড়না সবগুলিই মনে হয় নীল বর্ণ, হাতে একখানা থালায় কিছু খাদ্য কাপড়ে ঢাকা, অন্য হাতে একটি ঝকঝকে মাজা ঘটিতে পানীয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি কমনীয় তাহার মুখ, অপূর্ব লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে হাতের জিনিষগুলি ঐ কিশোরের সম্মুখে রাখিয়া দিল, বলিল, দুলাল আমার, এবারে একটু খেয়ে নাওতো,—আমি এখনি তোমায় খাইয়ে ঘরে যাব,—তারপর সেখানকার কাজ সেরে আবার সন্ধ্যায় এখানে এসে তোমায় নিয়ে যাব সেথায়।

ও অঞ্চলে যে ভাষায় কথা চলে মধুর ব্রজবুলিতে কথাগুলি বলিয়া,—তাহার মুখের দিকে স্নেহাকুলিত নয়নে চাহিয়া রহিল। আমি যে একজন তাহার অপরিচিত এখানে আছি সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই, ঠিক যেন তাহার সম্মুখে ঐ কিশোর ব্যতীত আর কেহই নাই। তাহার কথাগুলি কি মিষ্টি, ভাষার সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়া যেন সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল! সে ভাষায় অধিকার নাই তাই আমার কথাতেই বলিব।

সাধুর কোন ভাবান্তর নাই, ঠিক যেমন অপলকনেত্রে যমুনা পানে চাহিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল,—তাহা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে ঐ ব্রজাঙ্গনা, মেরে লাল, বলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। তখনি ঐ ধ্যানস্থ কিশোর, যেন চমকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু দৃষ্টি অপলক, একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, চম্পা হামকে লে চলো, লে চলো,—বলিয়া উঠিতে যায়। জননীর মতই স্নেহে হাতে জড়াইয়া ঐ ব্রজনারী সেইরূপ মধুর ভাষায় তাহাকে বলিতে লাগিল, অভি নহি মেরে লাল ;—এখন একটু খেয়ে নাও—তারপর সন্ধ্যায় এসে আমি

নিয়ে যাবো, বলিয়া খাবারের থালা হইতে এক গ্রাস লইয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিল। দুই এক গ্রাস মাত্রই খাওয়া হইল। তাহাকে বহু সাধ্যসাধনাতেও আর খাওয়াইতে পারা গেল না,—শেষে ঘটির দুধ একটু পান করিয়া আবার সেই কিশোর সমাহিত চিত্তে যমুনাতীরে বন যেদিকে, সেই দিকেই চাহিয়া রহিল এখন আমার দিকে চাহিয়া সেই ব্রজবালা মিনতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে এই কথাগুলি বলিলেন, বাপ, তুমি যদি এখানে কিছুক্ষণ থাক তাহলে কি তোমার লোকসান হবে ?

আমার উত্তরে তিনি সুখী হইলেন বটে, কিন্তু ঐ বালকের দিকে ফিরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, কালই আমার লাডলী বলে দিয়েছিলেন যে, ওর সব সময়ে ধেয়ান চলেছে, ওর হুঁশ নেই, ওকে খাইও, না হলে শরীর থাকবে না। দশ বারো দিন খোরাক নেই—সামান্য একটু দুধ, এই খেয়ে শরীর থাকবে কি ? তারপর চকিত হরিণীর মত ফিরিয়া ঐ কিশোরের দিকে চাহিয়া,—কি করবো আমি এখন, থাকো তাহলে আমার গোপাল, আমি ঘরে যাই, কাজের ঘর আমায় ডাকচে। সেখান থেকে এসে সন্ধ্যার সময় তোমায় নিয়ে যাবো, কেমন ?

কিশোর নির্বাক সমাহিতচিত্ত নিস্পন্দ,—আপন আসনে বসিয়া রহিল। ব্রজবাসিনীর অন্তর্ধানটি এক অদ্ভুত ব্যাপার মনে হইল। যখন আমি ঐ ধ্যানমগ্ন যোগী মূর্তির পানে দেখিতেছিলাম, ফিরিয়া তাহার সে ঘটিটি হাতে অপর হাতে খাবারের থালা ধরা, পিছন ফিরিল এইটুকুই দেখিলাম। তারপর সে তাহার সমুখের পথে অগ্রসর হইতে হইতে যেন মিলাইয়া গেল। অথচ আমার দৃষ্টিপথে কোনও গাছ বা কোন প্রকার বাধা ছিল না, স্পষ্ট মনে আছে।

মেয়েটির আসা-যাওয়া আর এই অল্পক্ষণ থাকা, ইহার মধ্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে এইটুকুই মনে হইল এক মহা আনন্দময় অপার্থিব নাটকের খেলা চলিতেছে এই বৃন্দাবনের যমুনাতীরে উপবিষ্ট কিশোর বৈরাগীকে লইয়া।

জ্ঞান বুদ্ধির মানুষ আমরা,—ভক্তি ধর্ম, প্রেম ধর্ম, এ সকল সাধু মুখে শুনিয়া থাকি,—কখন কখনও অভিমানে মনে হয় যেন উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগবানই জানেন বুঝিবার মত সার্থক বুদ্ধি আমাদের আছে কি না। এখন এই সব দেখিয়া বুঝিয়াই বলিতেছি—এখানকার সবই অদ্ভুত। এবারে সেই মথুরায় পদার্পণের দিন হইতেই সব কিছুতেই অদ্ভুত অপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপারই দেখিতেছি। এমনই আকর্ষণ এই বস্তুটির, আমায় যেন স্তম্ভিত করিয়া দিল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়। যমুনাতীরে বেশ হাওয়া চলিতেছে। অথচ যোগীর দিকে দেখিয়া মনে হয় না যে, বাইরের আকাশ বাতাস তার ইন্দ্রিয় গোচরে কোনরূপে কার্য করিতেছে। এখন আমার কথা কহিতে প্রবল ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসা করিলে কি কিছুই হইবে না ? প্রথমে হরি হরি হরি হরি শব্দ তাহার কানে পেঁছায় এমনভাবে কয়েকবার উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। তারপর ঐ শব্দ কানে পেঁছাইতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেই যেন আমার দিকে চাহিয়া দেখিল ; তখনই আমি বলিলাম, বাবাজী, তোমার কি কষ্ট হচ্চে ? কথা অবশ্য হিন্দীতেই বলিলাম।

ধীরে ধীরে এবার সে বলিল,—কষ্ট আমার নেই তো,—আমি যে বৃন্দাবনে, —যখন মথুরায় আপনজনের কাছে ছিলাম, বাপ মা, ভাই, সব আমায় না বুঝে

কত মেরেচে,—তাদের মনের মত হতে পারিনি বলে,—আঃ—এখন সে কথায় আর কাজ নেই। একটু থামিয়া আবার বলিল—তারা জানেনা ধর্ম (ইমান) কি (চিজ) বস্তু, তাই পাছে আমার ধর্ম নষ্ট হয়, কাফের হয়ে যাই সেই ছিল তাদের ভয়। তাই তো লাড লী, তাইতো কাহনাইয়া, এই পর্য্যন্ত বলিতেই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটু থামিয়া আবার বলিতে গেল, —কত দয়া,—গোবিন্দজী শ্রী—রাধ্‌কা রাধ, রা,—আঃ—ব্যাস আর কথা বাহির হইল না। দেখিলাম সংজ্ঞা-শূন্য হইলে যেমন হয় ক্রমে সেই অবস্থা—চক্ষু কিন্তু অপলক। দেখিয়া ভয় হয়, কেমন অস্বা-ভাবিক চক্ষু। দেখিতেছিলাম —অল্পক্ষণ পরেই,—বন্ধু! (দোস্ত) তুমি রাধাকুণ্ড কোথায় চেনো? বলিয়া ব্যাকুলভাবে দেখিল আমার দিকে।

বলিলাম,—চিনি। শুনিয়াই মহা উৎসাহে—তা হলে আমায় নিয়ে যাবে, সেথা? আবার কি মনে হইল, তৎক্ষণাৎ বলিল, না না সেখানে তো তুমি যেতে পারবে না। ব্রজরাণীর দয়া না হলে সেখানে কারো যাবার যো নেই যে, আমায় চম্পা সখীই নিয়ে যাবে—তার আসতে দেরি আছে কি না? থামিয়া থামিয়া আমায় ধীরে ধীরে অতীব মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিল।

রাধাকুণ্ডের কথা একটু বলবে কি? শুনতে আনন্দ হয়। আমার মুখের ঐ কথাটি শুনিবামাত্রই তাহার মুখমণ্ডলে গাঢ় আনন্দের পুলক,—সঙ্গে সঙ্গে অনির্বচনীয় এক শিহরণের ভাব খেলিয়া গেল, ঐ কিশোরের মধ্যে। মুখে যে জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল তাহার বর্ণনা অসম্ভব।

বলবো কি? সেখানে প্রেমের আকাশ (আসমান মহব্বৎসে ভরা হুয়া) প্রেমের বাতাস,—সে কি বলা যায় সাধুজী! সেখানে সখী সখা সব চলা ফেরা করছে যেন নাচের ছন্দ। কথা, গান, তার প্রত্যেকটি সুর আপনা ভুলিয়ে দেয় বন্ধু! পাগল হয়ে যাবার মত হয় কিছু অল্পক্ষণ থাকলে! আঃ হা!

কিছুক্ষণ স্থির সমাহিত,—তারপর আবার—সেখানে, কি আলো, (রোশনাই) তাদের মূর্তি দেখতে যদি সন্তাজি, প্রতিমা, স্বর্গের রূপ; কি মুখর তাদের পায়ে গুজরীপঞ্চমের ধ্বনি (আরয়াজ) যেন যন্ত্রের ঝংকার, আঃ আমার কৃষ্ণজী, আমার—আমার জীবন সফল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর কথা নাই। আমি বলিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে মৃদুস্বরে সেইরূপ কণ্ঠে আবার বলিল, বংশীপীঠে বসে তাঁর বাঁশী শুনছো? বাবাজি! সে অন—জীবন্ত সুর তোমার ছাতির মধ্যে যেন বেজে উঠবে। আমি যাবো সেখানে যাবো,—আর

ফিরবো না, না। দর দর ধারায় অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল—অতঃপর সে নির্বাক হইয়া গেল।

তাহার সংসর্গে আনন্দ আতিশয্যে আমারও যেন চৈতন্য লোপ হইবার মতই অবস্থা হইল। কিন্তু আমার মধ্যে দীর্ঘকাল সে অবস্থা রহিল না। তার পর প্রত্যক্ষদর্শী এই সকল উক্তি তাহার সবটুকুই জীবন্ত সত্যের প্রভাববিশিষ্ট,—প্রাণহীন পশু—এমন কে আছে ঐ সব শুনিয়া সম্ভাবনা থাকিতে, স্থানে যাইয়া ঐ সকল দেখিতে শুনিতে প্রত্যক্ষ করিতে যাহার প্রাণের মধ্যে তীব্র লালসা জাগরিত না হয়? মনোমধ্যে উত্তর উত্তর লোভটা আমার খুব বাড়িতে লাগিল। আমি তাহার কর্ণ-গোচর হয় এমনভাবেই আবার হরি হরি করিতে করিতে যেই দেখিলাম তাহার অবস্থা কতকটা বহির্মুখী হইয়াছে অমনি বলিয়া ফেলিলাম,—বাবাজী,—তোমার মহাভাগ্য সবার হয় না। আমায় একটু দয়া করবে? আমায় কিছু দেখাবে?

কথা শুনিয়া তাহার এখন নিকট বাহ্য হইল, বলিল,—আ আমার বন্ধু! (দোস্ত) আমার সাধ্য কি? সেখানে ঐ চম্পা সখী তোমায় নিয়ে যেতে পারবে। ও আমার গুরু, ও আমার চক্ষু,—ও না নিয়ে গেলে আমি আপনি কোনমতেই যেতে পারবো না,—

এমন সময়ে ঐ দূরে চম্পার মূর্তি দেখা গেল,—দেখা মাত্রই সেই কিশোর এইবার যাবো, দেখা পাবো, শ্যাম সুন্দর, রাধকা রাণী,—বলিতে বলিতেই তার চক্ষু স্থির হইয়া গেল,—আর মুখে কথা নাই। হঠাৎ এ ভাবান্তর—

চম্পা যখন আসিল, স্তম্ভিত হইলাম তাহার সেই রূপ দেখিয়া, এ যেন সে ব্রজনারী নয় যিনি আমায় এখানে থাকিতে বলিয়াছিলেন। বেশভূষাও সেরূপ নয়, এ এক প্রকার অপূর্ব বেশ, পূর্বে এখানে কাহাকেও এমন পোশাকে দেখি নাই। সব কিছুই পাৎলা, এমন হালকা যেন উড়িতেছে। অপূর্ব তাহার গতিছন্দে একটি মনোহর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

বালককে স্পর্শ করিবামাত্রই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্বাক চম্পা আগে, তার পশ্চাতে ঐ বৈরাগী কিশোর। ধীরে ধীরে আমার সমুখেই অন্তর্ধান করিল,—কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে জড়ীভূত অনেকক্ষণ ঐখানেই বসিয়া রহিলাম। কোন কথাই মুখে জোগাইল না।

পরদিন, বৈকালে সেইখানে আবার আসিলাম যেখানে যমুনাতীরে তিনটি গাছের মধ্যে সেই ত্রিকোণ ক্ষেত্রে সে কিশোরী বৈরাগীর আসন।—আজ সে আসন শূন্য—সেখানে কেহই নাই।

তার বাবাকে খবর দেওয়ার কোনও সার্থকতা আর আছে কি?

33

মুসুরী যাইতেছিলাম।

পথে ঝরিপানীর উত্তরে পরাছেত নামক স্থানের কথা শুনিলাম, সেইখান হইতে প্রায় দুই তিন মাইল উত্তরে এক-স্থানে খবর পাইলাম একটি এমন অদ্ভুত সাধু আছেন, তিনি কেবল শয়ন করিয়া থাকেন, কিছুই খান না ইত্যাদি। তীর্থ করিতেও কত লোক যায়, আমি ভাবলাম সাধু দর্শন করিয়াই আসা যাক্। আরও, আমার মুসুরীতে কর্মস্থলে ২৫শে হাজির হইবার কথা আজ মোটে ২০শে ; যথেষ্ট সময় আছে। কাজেই যাওয়াই স্থির করিলাম।

এই ঝরিপানী এবং সেখান হইতে পরাছেত, পথটি যে খুব বেশী তা নয় তবে আমার পক্ষে প্রথমে যে প্রকার সংকটময় পরে বিস্ময়কর হইয়াছিল তাহার কথাটাই বলিব।

যাঁহারা মুসুরী গিয়াছেন তাঁহারা ভালই জানেন যে, দেরাদুন হইতে মুসুরী যাইতে চড়াইয়ের নীচে বড় রাস্তার মুখেই একটা ফটক আছে, উপরের গাড়ীগুলি নামিয়া বাহিরে আসিলে তবে ফটক দিয়া মুসুরীর যাত্রীদের যাইতে দেওয়া হয়। সেইখান হইতে ডানদিকেই পথ। প্রথমে কতকটা উত্তরপশ্চিম কোণের দিকে তারপর কতকটা উত্তরদিকে মাইল দুই গেলেই ঝরিপানী পাওয়া যায়। আর সেখান হইতে উত্তরপূর্ব কোণের দিকে,—মাইল দুই যাইলে ঐ পরাছেত ; সেখান হইতে আবার কিছু উত্তরে সেই স্থানে যেখানে সাধুর কাছে যাইতেছি। চাল-চিঁড়া বাঁধিয়াই যাইতে হয়। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম মুসুরী যাইবার পথ যখন এত ভাল তখন ঝরিপানী অথবা পরাছেতও ঐরকমই হইবে। কিন্তু হায় অদৃষ্ট ;—কল্পনা আর বাস্তবের পার্থক্য তখনও ভাল বুঝি নাই।

এই যে পথটি, মুসুরী যাইতে ফটকের ডানদিকে,—কয়েকখানি বাংলো আছে, সেখানে তাহার একখানিতে একজন প্রৌঢ়া নামটি তাঁহার ভুলিয়া গিয়াছি,—ইউরোপীয়া মহিলা ভারতীয়ার পোশাকে সর্বদাই সজ্জিত থাকেন। তিনি আমার তৃষ্ণার জল, পথের খবর, আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে একটু স্থান দিয়াছিলেন। আমার মালপত্রও তাঁর আশ্রয়েই ছিল ; বেলা এগারটা নাগাদ

আমি চলিতে শুরু করিলাম যে বৃদ্ধ-ব্যক্তি আমায় পথের নির্দেশ দিয়াছিল সে মুসুরীতে এক বিলাতী ঔষধের দোকানে কাজ করে। এমনভাবে আমায় পথের কথা বলিয়াছিল যাহার মধ্যে কোনরূপ জটিলতা থাকিতে পারে কল্পনাও করিতে পারি নাই।

পথটা প্রথমে আঁকা বাঁকা কতকটা, তারপর চড়াই আরম্ভ হইল। মুসুরী পাহাড় যে স্তরে এই স্থানটি ঠিক সেই স্তরে নয়, কিছু নিচু স্তরে একথা ঠিক। কারণ মুসুরী উঠিতে যতটা চড়াই ভাঙ্গিতে হয় এখানে যাইতে প্রায় অর্দ্ধেকটা হইয়াছিল। ঝরিপানীর কথা কিছু বলিব না, কারণ মুসুরীর মত ঝরিপানীও একটা পাহাড়ী স্বাস্থ্য নিবাস, তবে খুব বিরল বসতি। বেশী লোক সেখানে থাকে না, যত বেশী মুসুরীতে থাকে। অনেকেই ঝরিপানীর কথা জানেন। মাত্র একটি ঝরণা ব্যতীত উহার আর কিছু বিশেষ আকর্ষণ নাই।

যাহা হউক, সে দিনটা ঝরিপানীতে কাটাইয়া পরদিন যাত্রা করিলাম। সেই সময় বৃটিশ অফিসার কয়জন ওখানে ছিলেন, অবশ্য তাঁহারা শিকারের জন্যই আসিয়াছিলেন।

প্রায় আধ মাইল উৎরাইয়ের পর এক উপত্যকার মধ্য দিয়া কতকটা পথ, তারপর আবার চড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার উপর আবার জঙ্গলও আছে। এ জঙ্গলে অনেক রকমের গাছ, বেশ বড় বড় গাছই দেখিলাম। সে ধরণের গাছ অন্যদিকে পূর্বে হিমালয়ের যে সব অঞ্চলে বেড়াইয়াছি দেখি নাই ; এ গাছ আমাদের বাঙ্গলায় তো নাইই, পরন্তু, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও কোথাও দেখি নাই।

যাহা হউক, নানাপ্রকার অপূর্ব বৃক্ষলতাপূর্ণ জঙ্গল একপাশে রাখিয়া চলিয়াছি। চলিতে চলিতে আমার যেমন হয়, চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি ; হঠাৎ গতিরুদ্ধ হইল একটা বিরাট আওয়াজে। সেটা যে কোন দিক্ হইতে আসিল ধরিতে পারি নাই। থামিয়া, কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে আবার সেই শব্দ। এ শব্দ ত মানুষের নয়, অনুমান করিলাম আমার দক্ষিণ হইতেই ওটা আসিতেছে, ফিরিলাম ; খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বেশ সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচের দিকে গিয়াছে। অনেক দূর অবধি, পথটা দেখা যাইতেছে, আমি আর বেশীদূর যাইব কি না, ভাবিতেছি এমন সময়ে আবার সেই বিকট করুণস্বর। এবার আর বেশী দূর নয়, বোধ হয় রশিখানেক তফাতে বোধ হইল। একটা বনজ গাছের গোড়ায় একটা চতুষ্পদ, মৃত্যু যাতনায় কাতর, সেইস্থান হইতেই দেখিতে পাইলাম।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া দেখি একটা নীল গাই বেশ বড় সাইজ, বুকের একটু নীচেয় গুলি বিঁধিয়াছে, রক্তের ধারা বহিতেছে। আমি কাছে যাইতেই ধড়ফড় করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু আর পারিল না, সুমুখের পা দুই-খানি সোজা করিয়া, এমন করুণভাবে চাহিল সে দৃশ্য আর দেখা গেল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কোন শিকারী ইহাকে মারিয়াছে, কখন কোথায় মারিয়াছে জানি না। বোধ হয় অনেক দূরেই নীল গাইটা গুলি খাইয়াছিল, তারপর অনেকটা দূর ছুটিয়াছে তবে তো পড়িয়াছে ; আমি জানতাম হরিণ মাথায় বা রগে গুলি না খাইলে কখনও কাছোপিঠে পড়ে না। এটা মাত্র একটি গুলি খাইয়াছে, তাও বুকের নীচে ; কাজেই বেশ বুঝা যায় বেশ অনেকটাই ছুটিয়াছে, আর শেষে এইখানেই পড়িয়াছে, এখন যিনি হত্যা

করিলেন তিনি কোথায়? এতক্ষণ হয়তো রক্তচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আসিতেছেন।

আমার তখন এমন অবস্থা অনেক দূর যাইতে হইবে সেটিও অন্তরে খোঁচাইতেছে অথচ একে ফেলিয়া যাইতেও পা সরিতেছে না। আমি যে ইহার কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম কোথাও ঝরণা দেখা যায় কি না, একটু জল যদি উহার মুখে দিতে পারি, কিন্তু কোথাও জল দেখিলাম না। কি, করিব, খানিকক্ষণ ভাবিলাম। এ অবস্থায় কিন্তু কিছুই হইবার নয়।

আমি আর কি করিব তোমার,—বন্ধু; তোমার কাল ফুরাইয়াছে তুমি যাও, আমারও কাল ফুরাইলে আমিও যাইব। তবে দুঃখ একটুও রহিল যে, তোমার যাওয়া এইভাবে আমাকে দেখিতে হইল।

আসিয়া আবার পথে উঠিলাম। উত্তরদিকেই চলিয়াছি যদিও বনপথ এদিক ওদিক ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রায় মাইল খানেক আসিয়া আবার একটা চড়াই পাইলাম। বেলা পড়িয়া যাইতেছে; তাড়াতাড়ি উঠিতে লাগিলাম। পথের বর্ণনায় জানিয়াছিলাম এই চড়াই উঠিয়া অপরদিকে কতকটা নামিয়া একটা বড় ঝরণা পাইব, সেই ঝরণার ধারেই একটি গুহা সেইটিই তাঁর আশ্রয়।

যত তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, বুকে ততই টান ধরিতেছে। কেহ যেন পাহাড়ে কখনও তাড়াতাড়ি চড়াই উঠিতে না যান, দেরী ত হইবেই শরীরও শীঘ্র শীঘ্র কাহিল হইয়া পড়িবে।

যাহা হউক, এখন একবার বিশ্রাম একটু করিতেই হইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে পাহাড়টা পার হইয়া অনেকটা নামিবার পর, খানিকটা অল্প নীচু অল্প উঁচু পথ গিয়াছে দেখা গেল; তাহাকে ঠিক চড়াইও বলা যায় না, উৎরাইও নয়; এমন একটা পথে কতকদূর আসিয়া একটা বটগাছ দেখিলাম, তাহার তলায় দুটি তিনটি বড় বড় নোড়ায় সিন্দূর মাখানো। গাছটা খুব বড় নয় অত উঁচুতে বড় গাছ হয় না। মাঝারি গাছ কিন্তু খুব পুরাণো। তাহার একটা ডাল পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতেও কয়েকখণ্ড রঙীন কাপড় বাঁধা। নীচের দিকে অল্প একটু দূরে একটি ঝরণা।

আকণ্ঠ পান করিয়া প্রথমে তৃষ্ণা মিটাইলাম—তারপর বটতলায় ফিরিয়া আসিয়া গাছের তলায় বসিয়া নানা কথাই ভাবিতেছি। এমন সময়ে ছাগলের ডাক। তারপরেই বাঁকের মুখ ঘুরিয়া একটি পাহাড়ী মরদ আর যুবতী আসিতেছে দেখা গেল। আর তাহার পশ্চাতে কপালে ফোঁটা, রুদ্রাক্ষমালা এবং উপবীত শোভিত বক্ষ, মাথায় কাপড়ের পাগ বাঁধা, কোমরে চাদর জড়ানো, পায়ের একটা, আঙুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বিবর্ণ একটা ক্যাম্বিশের প্রাচীন জুতাপরা ব্রাহ্মণ আসিতেছে। ক্রমে আরও চার পাঁচজন তাহার পশ্চাতে দেখা গেল।

প্রথমে যে আসিতেছে, তাহার মাথায় একটা বাজরাজাতীয় আধার মধ্যে অনেক জিনিসপত্র আছে আর সেটা বেশ ভারী। পিঠে বোঝা না লইয়া মাথায় কেন লইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। হিমালয়ে এটা অস্বাভাবিক। যুবতীর মাথায় কাপড়, আর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, আর ছাগলটাকে সেইই টানিয়া আনিতেছে। ব্রাহ্মণটি কিছু দূরে। দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া পড়িল সেই বটবৃক্ষের ছায়ার মধ্যে। আমার দিকে চাহিয়া অগ্রগামী ব্যক্তি বোঝাটি

নামাইতে সাহায্যের প্রয়োজন যেন তাহারই ইঙ্গিত করিল। অন্ততঃ আমি তাহাই বুঝিলাম এবং উঠিয়া নামাইতে সাহায্য করিলাম। নামানো হইলে দেখিলাম তাহার মধ্যে উপরেই প্রকাণ্ড এক রামদাও রাখা আছে। বুঝিলাম এইবার এখানে জগদম্বার পূজা ও বলি হইবে। আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়াই উঠিয়া পড়িলাম।

আমায় চলিতে দেখিয়া পুরোহিত,—তিনি পুরোহিতই হইবেন—হাত দেখাইয়া বলিলেন, বৈঠো বৈঠো—আরও কি কি সব বলিলেন বুঝা গেল না। আমি কিন্তু তাহাতে উৎসাহিত না হইয়া একেবারেই চলিতে শুরু করিয়া দিলাম। আগেই এক হত্যা দেখিয়া মনটা ভাল ছিল না তাহার উপর আবার এই একটা অনুষ্ঠান, যাহা সাধ করিয়া দেখিবার মত মনোবৃত্তি আমার কোন কালেই নাই ; এখানে বিশ্রামের প্রয়োজনও আর ছিল না। হায় জগদম্বা ! এই হিমালয়ের সমাজও তোমার কোন পরিবর্তন আনিতে পারে নাই।

যখন পর্বতশীর্ষে উঠিলাম তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর—সেখানেও একটু বসিতে হইল। বসিয়া বসিয়া উচ্চে সুমুখের দিকে চাহিয়া দেখি, নীল আকাশের কোলে তুষার শিখরের অনেকটাই দেখা যাইতেছে। আঃ কি চমৎকার,—মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—যেন স্পষ্ট অতি নিকটেই বোধ হইতেছে। পরিষ্কার আকাশময় নীলের আভা পশ্চাতে লইয়া যেন শুভ্রকায়, জটাজূট-সমন্বিত, হরপার্বতীর মূর্তি। তুষার স্তূপের এক একটি অংশ যেন পর পর মিলিয়া একখানি প্রশস্ত চিত্রপটের সৃষ্টি করিয়াছে,—নীল আকাশ তার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বা পশ্চাৎক্ষেত্র-পট। দেখিতে দেখিতে ভুলিয়া গেলাম কোথায় যাইতেছি। যখন সেকথা মনে হইল, তখন দৃষ্টি ফিরাইলাম।

এবার নীচের দিকে যতটা দেখা যায় তাহাই দেখিতেছি। অনেকটা দূরেই যেন ঝরণার মত একটা মনে হইতেছে। ঐ যে আমার গন্তব্য দেখা যাইতেছে না ? আর ক্লান্তি নাই, অল্পক্ষণেই পেঁছাইব। আজ রাত্রে ওখানে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাইব। তারপর কাল ভোরে উঠিয়াই হাঁটিব, সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই ঝরিপানী পেঁছাইব। রাত্রি কাটাইয়া আবার কাল সকালে রওয়ানা হইয়া মুসুরী বেলা দু'টার মধ্যে পেঁছিব। এই সকল কর্মতালিকা ঠিক করিয়া ফেলিলাম। বুকে বল আসিল।

অনেকটা নীচে উপত্যকা দেখা যাইতেছে, স্রোতটা ঠিক স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু স্থানটি অনুমান করিতে ভুল হয় নাই। উপত্যকা ভূমি হইতে আমার গন্তব্য স্থান প্রায় দুইশত ফুট উচ্চ হইবে। আর আমি যেখানে বসিয়া আছি, সেখান হইতে প্রায় দেড়শত ফিট নীচে হইবে। চারিদিকে দেওদার,—কি চমৎকার দৃশ্য, উপভোগের আকর্ষণ স্বতঃই আসিয়া পড়ে, উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

যাঁহারা পাহাড়ে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের শরীরের ক্লান্তি দুর্বলতা, চড়াই উঠিবার কঠিন বেদনা, ঐ এক দৃশ্য সম্ভোগেই প্রচুর পুরস্কৃত হয়, না হইলে হিমালয় ভ্রমণের কোন সার্থকতা থাকে না। ঝরিপানীর দৃশ্যও উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু এখানকার তুলনায়,—বলিয়া কাজ নাই, একটাকে ছোট করিবার ইচ্ছাও নাই ; আর হিমালয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার কোন্‌টা অল্প কোন্‌টা বেশী সুন্দর বলাও অশোভন ; কারণ এর সবটাই সুন্দর, যার যখন যেটা ভাল

লাগে ; তবে একটা কথা বলিতেই হয় যে, যে দৃশ্য যেখানে বিস্তৃত হইয়া ক্রমে বিশালত্বে পরিণত ও অনন্তের দিকে গতি পাইয়াছে মনে হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিতেই হয় ; শুধু ভাষায় নয়, অনন্তের অনুভূতিতেও। সেইজন্য এখানে বসিয়া বসিয়া কেবল উপরের দিকেই দেখিতেছিলাম। এই শরৎ শেষের নীল আকাশে এক টুকরাও কাল মেঘ নাই, ছোট ছোট সাদা দুই একখণ্ড পাৎলা পেঁজাতুলার মতই ভাসিয়া ভাসিয়া শীর্ষদেশে আসিয়া লাগিল, কোনটা বা তুষার শরীরে মিলাইয়া গেল। তারপর সেই খণ্ড খণ্ড শ্বেত লঘু মেঘগুলি ভাসিতে ভাসিতে আরও নীচে আসিয়া যেন এক স্থূলরেখায় পরিণত হইল। গাছপালার সবুজের ভিতর দিয়া সেই ক্ষীণ ধবল বর্ণাভাস সত্যই নয়নাভিরাম, সেই নীলধূসর বড়ই মনোরম। যেন স্থানটি ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, এখন তো আর বসিয়া বসিয়া দৃশ্য উপভোগ করিলে চলিবে না। আমার ধারণা হইল যে, গন্তব্য যখন এখান হইতে দেখা যাইতেছে, তখন অল্প সময়ের মধ্যেই পেঁছাইয়া যাইব। এই বিশ্বাসেই দৃশ্য উপভোগে একটু বেশী কালক্ষেপ করিয়াছিলাম। এখন উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে অর্থাৎ নামিতে লাগিলাম, কারণ আর চড়াই ছিল না।

উপরে বসিয়া যেখানে ঝরণা দেখিয়াছিলাম, পথটা যেন সেদিকে যাইতেছে না মনে হইল। যে স্তরে ঝরণা এবং গুহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এখন অনেক দূর নামিয়া মনে হইল যেন সেটা আরও উঁচুতে ছিল। তবে কি অন্য একটা পথ আছে সেখান দিয়া গুহায় পেঁছানো যায়।

আবার ফিরিলাম। কতকদূর উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিতে সরু একটা বনপথের মত বোধ হইল যেন দেখিতে পাইলাম, মনে হইল সেটা ঐ গুহার দিকেই গিয়াছে। ভগবানকে স্মরণ করিয়া ঐ পাকডাণ্ডি ধরিয়া পা বাড়াইলাম ও এবার দৃঢ় বিশ্বাসে হন্‌হন্‌ করিয়া চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে তাড়াতাড়ি যতটা চলা যাইতে পারে ততটা চলিতেছি, যেন রুদ্ধ-শ্বাসেই চলিতে লাগিলাম। ভরসা হইতেছে যে, এবার ঠিক পাইব। ভাগ্যে পথটা চড়াই ছিল না।

যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বন ছাড়িয়া কতকটা ফাঁকায় আসিয়া পড়িলাম তখন দেখি,—আগেই ঝর্ণাটি দেখা যাইতেছে, তাহারি কতকটা উপরেই গুহাটা মনে হইল। এখনও বেলা আছে, তবে খুব কম ; ইহাকে বেলা না বলিয়া আলো বলিলেই ঠিক হয়। ঝরণার কাছে আসিয়া একটু বসিলাম, আর যেন পারি না। স্নায়বিক উত্তেজনায় একটু দুর্বল হইয়াছি,—মনে হইল, যদি গুহার পথ না পাই, পাইব না কি? এতটা পথ যখন আসিয়াছি, নিশ্চয়ই পাইব।

বোধ হয় পাঁচ মিনিট কাল বিশ্রাম করিলাম, তাও অনেক মনে হইল। এখন ঝরণার পাশের পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, ঠিক এইখানেই গুহা। অনুমান করিয়া টপ্‌টপ্‌ পা ফেলিয়া উঠিতে উঠিতে অন্ধকার গুহামুখ দেখিতে পাইলাম। আঃ—আর ভয় নাই, পাইয়াছি এবার সার্থক হইল সারাদিনের পরিশ্রম। গুহার কতকটা নীচে সম্মুখের দিকে আসিয়া একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম, সেখান হইতে আরও একটু উঠিলেই একেবারেই গুহায় প্রবেশ করা যায়।

গুহাটি অন্ধকার, একটা আমার মত পুরা মানুষ দাঁড়াইয়া ঢুকিতে পারে বটে কিন্তু তারপর যেন আরও একটা ছোট গুহা, তার উচ্চতা দুই হাতের বেশী হইবে না। সেইটি গাঢ় অন্ধকার, এমন কি সম্মুখে দাঁড়াইলেও ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। যেখানে আমি বসিয়াছি, সেখান হইতে মোটেই দেখা যায় না।

যতক্ষণ পথ চলিতেছিলাম ততক্ষণ ক্লান্তি ছিল, এখন আর কোন গ্লানি নাই শরীরে, সাধু দর্শনের আশায় যেন সব কিছু আয়াস প্রাপ্তির আনন্দে পরিণত হইয়াছিল। উঠিয়া ঠিক গুহামুখে আসিয়া দেখি অত্যন্ত অপরিষ্কার, মানুষে যেখানে থাকে সেখানে কি করিয়া এতটা আবর্জনা থাকিতে পারে? শুকনা ডালপালায় যেন ভরা, তাহার পর গুহার ভিতর কিছুই দেখা যায় না, চামচিকার মত দুই একটা কি আনাগোনা করিতেছে—এদিকেও অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। তবে কি এখানে কেউ নাই নাকি! যা থাকে কপালে বাবাজী!—বলিয়া একটা হাঁক দিলাম। উত্তর নাই। কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া আমার মধ্যে তখন যেন ভয় চাপিয়া বসিল। তবে তো কেউ নাই এখানে, একধাপ উঠিয়া পা বাড়াইলাম। শুকনা পাতার উপর পায়ের চাপ পড়িতেই যে ধরণের শব্দটা হইল, নিজেই তাহাতে একটু চমকিত হইলাম—আরও একটু অগ্রসর হইয়া মুখ বাড়াইয়া গুহার ভিতরটা দেখিতে চেষ্টা করিলাম। ঘোরান্ধকার ভিতরে,—ও কি? কাহার দুটি চক্ষু যেন জ্বলিতেছে। আমায় গুহামুখে দেখিয়া খসখস শব্দ করিতে করিতে সেই দুটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বিন্দু সরিয়া যাইতেছে বোধ হইল। জঙ্গলের মধ্যে এই গুহা, বাঘ থাকা অসম্ভব নয়। হে ভগবান, সাধুদর্শনে আসিয়া শেষে কি এই গতি হইল?

আমি পাশের দিকে সরিয়া আসিতেই সে তড়বড় করিয়া তীরবেগে ভিতরের গুহা হইতে বাহির হইয়া গেল; যেটা গেল, সেটা বাঘ নয়, শৃগাল জাতীয় জীব। ভয়টা যেন কাটিয়া গেল। বুঝিলাম এখানে মানুষ বাস করে না।

কি করা যায় এখন, রাত তো কাটাইতেই হইবে, ভাবিতেছি এই শুকনা পাতার উপর, উপরের জামাটা বিছাইয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া কাল ভোরেই পাড়ি দিব। ভাবিয়া আমি গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সেখান হইতে কতকটা নীচে যে ঝরণার কথা বলিয়াছি, বেশী দূর নয়। আমার বোধ হইল যেন সেই ঝরণার দিকে মানুষের গলার স্বর। যেন দুজনে কথা কহিতেছে। আলো আরো কমিয়া আসিয়াছে, তবে একেবারে অন্ধকার হয় নাই। নামিতে লাগিলাম। যত নামি তাহাদের কথাও স্পষ্টতর শুনিতে পাইতেছি। কতকটা আসিয়া দূর হইতে দেখিলাম, একজন আর একজনের পীঠে একটা বোঝা যেন তুলিয়া দিতেছে। উচ্চৈঃস্বরে. এ জী, বলিয়া আমার হাতটি উঁচু করিয়া তাহাদের দাঁড়াইতে সংকেত করিলাম। তাহাতে যে ব্যক্তি বোঝা তুলিয়া দিতেছিল সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল। তাহারা ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, হিঁয়া এক সাধুবাবাকো দর্শন করনে আয়াথা, মিলা নহি। কথাগুলি শুনিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং বোঝাটি আবার নামাইয়া রাখিল। ততক্ষণে আমি তাহাদের আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের ভয় কাটিয়া গেল।

পাহাড়ী শ্রমজীবী এরা, স্ত্রী-পুরুষে জঙ্গলের কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে—আর জল লইয়া যাইবে বলিয়া ঝরণায় আসিয়াছে। তাহাদের কথা বুঝা মুশকিল। আমার সকল কথা শুনিয়া তাহারা যাহা বলিল তাহার মর্মার্থ এই যে, এখানে কোন সাধু থাকে না,—এ পাহাড়ের ওপারে একজন সাধু থাকেন, আজ রাত্রে তো সেখানে যাওয়া হইতেই পারে না। আজ রাত্রে তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া কাল সকালে সেখানে যাইতে পারিব এবং সেই-ই পথ দেখাইয়া দিবে। এখন তাহাদের আশ্রয় ব্যতীত আর ত স্থান নাই ভাবিয়া তাহাদের সঙ্গেই যাইতে রাজী হইলাম।

অনেকটা উঠানামা করিয়া পাহাড়ের কোলে তিনখানি ঘর একটু দূরে অবস্থিত দেখা গেল ; তাহার একখানিতে তাহারা ঢুকিল। বাহিরে আমি একটা পাথরের উপর বসিলাম। আমার কাছে পয়সা কড়ি ছিল, এখন ভয় হইল রাত্রে আমাকে অসহায় অবস্থায় মারিয়া যদি কাড়িয়া লয়! পাহাড়ীরা এমনটা কিন্তু কখনও করে না। তাহারা সরল, এমন কি মিথ্যা কথা বলে না বলিয়াই জানি। কিন্তু উপায়ই বা কি, যখন আসিয়া পড়িয়াছি!

আমায় তাহারা খাইতে দিল একটা পাতায় করিয়া কিছু ছাতু, দুটি কলা ও একটু গুড়। একখানি চারপাই ভিতর হইতে আনিয়া দাওয়ায় রাখিয়া দিল, দড়ি তার আলগা হইয়া ঝুলিতেছে। আমি ভগবান স্মরণ করিয়া সেই ঝোলায় শুইয়া রাত কাটাইলাম। প্রভাতে হাত-মুখ ধুইয়া, আমার আশ্রয়-দাতার সঙ্গে সাধুর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

পথের কোন বিশেষত্ব নাই. তবে আসল গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, যে স্থানটি লেটাবাবা আশ্রয় করিয়াছেন দেখিলাম, তাহার সংস্থিতি, আশ-পাশের দৃশ্য, সকল দিক এমনই চিত্তাকর্ষক, যাহার তুলনা নাই। আমাদের হিন্দু তীর্থগুলি যাঁহারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে তাঁহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান, প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের সম্বন্ধ, স্থান বিশেষের উপযোগিতা জ্ঞান. একটা রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টি কতটা পরিমাণে প্রখর ছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখনকার দিনে আমরা যতই উন্নত যতই প্রগতিশীল সবুজ মনোভাবাপন্ন ও বৈজ্ঞানিক শক্তির শরণাগত হই না কেন তাঁহাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া কিম্বা শান্তিময় জীবন পূর্ণভাবে উপভোগে প্রবণতা লক্ষ্য করিলে আমরা যে বড় বেশী উন্নত বা অগ্রসর হইয়াছি এ কথাও মনে হয় না।

যাহা হউক এ গুহাটি, চারিদিকেই লতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষে অলঙ্কৃত। গুহার মধ্যে আরও একটি ছোট গুহা তাহার মধ্যেই লেটাবাবা শুইয়া আছেন। যখন গেলাম তখন তিনি একটি দীর্ঘ ব্যাঘ্রচর্মের উপর পাশ ফিরিয়া উপাধানের পরিবর্তে হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলেন। দীর্ঘ জটা-জুট. মুখখানি শীর্ণ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। পদতলে একজন পাহাড়ী শ্রমজীবী বসিয়া। আমি গিয়া প্রথম গুহায় উঠিতেই তিনি চক্ষু চাহিয়া আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৈঠো! বৈঠো! এবং তাঁহার কাছে গিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। প্রথমেই বলিলেন, কলকত্তাওয়ালা বাবু? আমি কহিলাম, জী হাঁ মহারাজ! তিনি

বলিলেন, কাল বহোত তকলিফ উঠায়া, সন্ধ্যাতক! আমি বলিলাম, হাঁ মহারাজ! তিনি বলিলেন, মুসৌরী আয়া কামমে, বো কাম এক মাহিনেমে খতম হোয়েগা।

এখানে বলিয়া রাখি ছয় মাসের এগ্রিমেণ্ট করিয়াই আসিয়াছিলাম, কিন্তু পরে এমনই ঘটিয়াছিল যে, মুসুরীতে এক মাস পুরা থাকিতে পারি নাই। লেটাবাবার কথায় তখন বিশ্বাস করি নাই, আমার ধারণা ছিল যে ভবিষ্যৎ বলা বড়ই কঠিন। কিন্তু আমি কলিকাতায় থাকি, মুসুরীতে কাজেই আসিয়াছি, এই দুইটি কথা প্রথমেই আমাকে মোহিত করিয়াছিল।

বাবাজী আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, আমি কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। নীচু দিকেই চাহিয়া রহিলাম।

তোহার পিতা গুজর গয়া, আজ চারো বরস হোগা কি নহি? সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তবসে তো ধীরে ধীরে দুর্ভাগ আ গয়া আপনা জীবনমে। সত্য! ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম; শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইসিসে ভি জবর পিছে আয় রহা! সর্বনাশ! আরও দুঃখ আসিতেছে! নিজের দুঃখে ভয় হয় না, হতভাগ্য পোষ্যবর্গ, সন্তান, তাদের লইয়াই তো বিপদ। বলিলাম, দোহাই বাবা এর কিছু প্রতিকারের কথা বল। ফিরিয়া শুইয়া তিনি খানিকটা উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ঠিক যেন ঐস্থান হইতেই কথাগুলি আনিতেছেন; বলিলেন, ডরতে হো? তনিসে দুঃখমে জীবন শুদ্ধ হো জাতে, খবর নেহি তুম্‌হারা—?

তাইতো এমন মিষ্ট প্রতিকারের কথা তো শুনি নাই। প্রাণের ভিতরটা যেন শীতল হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—বো আতে যানেকো বাস্তে, চলা যায়েগা, ফির তো আচ্ছা হৈ। কোই কো মদৎ মৎ লেও—কোইকো মৎ বোলা করো,—তব দুঃখ জল্‌দি উতার জায়গা। অব বোল তু, সাধু দর্শন কো আয়া, ফির ক্যা লেয়ারা?

আমার ঝুলিতে খোবানী, আর কিছু খেজুর ও আখরোট ছিল সেগুলি আমি তাঁহার কাছে রাখিবামাত্রই তিনি একটি মাত্র খোবানী গ্রহণ করিয়া মুখে পুরিলেন। তারপর বাকীটা লইয়া আমারই থলিতে পুরিতে বলিলেন।

তারপর কিছুক্ষণ কথা হইল। দেখিলাম যে ব্যক্তি পদতলে বসিয়াছিল তাহাকে কি যেন বলিলেন, সে উঠিয়া গেল এবং বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে বড় একটা পাতায় করিয়া উপরেও পাতায় ঢাকিয়া খাদ্য আনিয়া আমার সুমুখেই রাখিয়া দিল। বাবাজী তখন বলিলেন, অব কুছ্‌তো খা লে বাচ্ছা।

পাতা তুলিয়া দেখি, গরম আটার হালুয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর দুই-খানি পুরা অর্থাৎ মোটা আটার মালপুয়া। ভগবান জানেন কোথা হইতে আসিল। আমার আকণ্ঠ ভোজনের পরেও অর্দ্ধেকটা রহিয়া গেল। তাহা বাবার সেই সেবকটি লইয়া গেল। যতক্ষণ কাছে ছিলাম, কিছুতেই কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। বিস্ময় ভয়ভক্তি সব মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল যখন বাবা আমাকে তাড়াইয়া দূর করিলেন।

আমার ভোজনের পর বাবা বলিলেন, থোড়া লেট যা! আমার যেন প্রকৃতই আলস্য বোধ হইল, একটু শুইয়া পড়িলাম, বাহিরের গুহায়। অল্প-ক্ষণেই উঠিয়া পড়িলাম, তখন বাবা বলিলেন, অবতো যানেকো বখৎ—। সেকি

কথা। বলিবার যে কত কথা ছিল, আমার কতই না জিজ্ঞাসা ছিল। আর কিন্তু কিছুই হইল না। আমি প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অব কিধার যাওগে? বলিলাম, ঝরিপানী। তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন,—নহি নহি, তুম মুসৌরী যাওগে—বলিয়া তাঁহার সেবকটিকে বলিলেন—ইনকো ল্যাণ্ডের পেঁছাও। আবার প্রণাম করিলাম। কত কথা মনে হইয়াছিল, যেন নৈরাশ্যে আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি বোধহয় দেখিতে পাইয়া থাকিবেন, বলিলেন, তুহার বড়া ভাগ,—মিলতো গেয়া তেরা মারগ—ফির ক্যা সোচতে? তখন আমি গৃহী, সন্তানাদি হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, গুহা হইতে বাহির হইয়া সে আমায় একটা পথে তুলিয়া দিল,—খানিকটা সে আসিলও আমার সঙ্গে তারপর বলিল, ডর নেহি, সিধা চলা যাও, পেঁছ জায়গা।

বোধহয় মাত্র এক ঘণ্টা, বড় জোর দেড় ঘণ্টা চলিয়াছি, তারপর সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্বেই আমি দেখিলাম যে সত্য সত্যই ল্যাণ্ডরের প্রান্তে আসিয়াছি।

এতটা বিস্ময় জীবনে কখনও ভোগ করি নাই।

॥ ৩২ ॥

সিদ্ধজী

পাহাড়ের গায়ে কালো কালো দাগ, তা দূর থেকে দেখায় যেন বসুধারা, খুব উঁচু থেকেই নীচে ঝরেচে। দেখতে কালো কালো বেশ চওড়া ধারাগুলি সোজাসুজি নেমে একবারেই নীচে পাথরস্তূপের উপর পড়েচে। আমার সঙ্গে, কাছেই ছিল একটি অল্প বয়স্ক সাধু,—বোধ হয় দক্ষিণ দেশের লোক কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরেচে এই উত্তরাখণ্ডে ; তার সঙ্গে কেদারের পথে এক চটিতে দেখা। তাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে,—

ই'য়ে, বো দেখো শিলাজিৎ—

একটা গন্ধও আছে,—বলে কপিমূত্রবৎ গন্ধ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে। অপ্রিয় গন্ধটা কিন্তু একটুও সংগ্রহ করবার যো নেই, পাথরের সঙ্গে ধুলায়, কাঁকরে এমন ভাবে মিশে গেছে, ওর মধ্যে কিছু সার পদার্থ যে আছে—তা কে বুঝবে ?

খানিকটা আরও যেতে হবে, তবে বিশ্রামের স্থান। চলতে চলতে একটা ছোট ঝরণা, ঝির ঝির করে সামান্য জল পড়চে,—দেখা গেল,—উপর দিকটা গাছপালায় ঢাকা, তার নীচে জল-বিছুটির জঙ্গল।

হন্ হন্ করেই চলেছি আমরা। কয়েকজন শ্রমজীবী বাঁ হাতে ঘিয়ের ভাঁড়, ডান হাতে লাঠি ; তার শেষ দিকে একটি বোঝা ঝুলচে, তারা আসছিল তাদের গ্রাম থেকে। অগস্ত্য মুনি কত দূর ? জিজ্ঞাসার উত্তরে বললে, দুসরে চড়াই। অর্থাৎ আরও একটা চড়াই পেরিয়ে। সন্ধ্যার আগেই আমরা যাতে সেখানে পেঁাছে যেতে পারি, এমনই সংকল্প করে জোর জোর পা চালালাম।

এবার সঙ্গী সাধুটি পিছনেই পড়েচে। সুমুখেই দেখি, এক বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড একটি ঝরণা—বিশাল ঝরণাটি। সেই ঝরণার নীচে, জলের গতিভঙ্গে যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেচে। খানিক এগিয়ে আরও কাছ থেকে ভাল করে দেখতে সামনে অনেকটাই চললাম—;—বড় কাছে নয় আরও অনেক চলতে হবে তবে ওকে পাওয়া যাবে সুবিধামত দৃশ্যের মধ্যে। পথ থেকে নামলাম, আবার এসে ওঠা যাবে,—পথ ত পড়েই আছে, হারাবার ভয় নেই এখানে। ভরসা ছিল খুব, তাই অত জোর করে চলতে পেরেছিলাম। আরও একটু, আরও একটু করে পথ ছেড়ে অনেকটাই নেমে চলেছি ; একবার পিছন ফিরে দেখচি কতটা বিপথে এসেছি, সুমুখে মুক্ত জলপ্রপাতের মোহতেই চলেছিলাম। এইবার পিছন ফিরে দেখি, সঙ্গী সাধু এসে পথে দাঁড়িয়েছে দূর থেকে ছোট্ট দেখাচ্ছে। আমায় দেখতে পেয়েছে কি না জানি না,—বোধ হল সে ঝরণার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমি এখন বুঝলাম, যে স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করতে আমি এগিয়ে চলেছি, ঠিকমত জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে খানিকক্ষণ ভাল করেই দেখব মনে

করে চলেছি,—সেখানে যাওয়ার ঠিক অর্থ ঐ প্রপাতের কাছেই যাওয়া যা প্রায় মাইল খানেকের মতন।—মন্ত্রমুগ্ধের মতই চলেছি, মনেই নেই যে আজই সন্ধ্যার আগে অগস্ত্যমুনি শৃঙ্গে উঠতে হবে।—এখন আমি যে ক্রমে নেমে চলেছি আমার ভবিষ্যত পথের চড়াই বাড়চে একথাও মনেই নেই। আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেন মরীচিকার নেশায় চলেছি সামনে, ঐ যে,—আরও খানিকটা, নামা উঠা করতে করতে হঠাৎ দেখি সেই ঝরণার মনোহর দৃশ্য সামনে আর নেই! এবার খানিকটা ঘুরে আবার একটু উঠলেই দেখতে পাবো এই মনে করে সম্মুখেই চললাম।

একটা প্রকাণ্ড গহ্বর,—তার বাইরে, বড় পাথর তিন চারটে রেখে যেমন চুলা তৈরী করে সেই রকম দু'তিনটে চুলা আর পোড়া কয়লা ছাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত,—পোড়াকাঠ দু'চার টুকরো আছে—এদিকে ওদিকে। এখানে মানুষ ছিল সম্প্রতি তারই লক্ষণ। গুহার ভিতরটা অন্ধকার খানিকটা তফাৎ থেকেই দেখছি কালো মিশ মিশ করচে, প্রায় তিন হাত উঁচু হবে প্রবেশ দ্বার ; এ আবার কোথা এলাম! ঝরণারও কোন চিহ্ন নেই।

একটু খানিক উঠলে তবে গুহার মধ্যে ঢোকা যাবে ঃ কিন্তু গুহায় ঢুকতে যাব কেন? মানুষ যে ওর মধ্যে নেই তা সহজেই মনে হচ্ছে। যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে? কাজ কি, উদ্দিষ্ট পথেই যাওয়া যাক। এই ভেবে পা চালিয়ে দিলাম। কিন্তু দোলায়মান উদ্‌ভ্রান্তমন ছোঁক ছোঁক করচে ঐ গুহার মধ্যে না জানি কি রত্ন থাকতে পারে তারি উদ্দেশে যাবার জন্য। কাজেই আবার ফিরে গুহার দিকেই চলতে লাগলো আমার অক্লান্ত পা দুখানি। গুহার ঠিক সুমুখে গিয়ে কিন্তু এমনই কিছু আরও দেখা গেল যাতে মনে হোলো এখানে এসে বোকামি করিনি। দেখলাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঐ গুহাদ্বার যেন মানুষের হাতের যত্ন আর চেষ্টার ফলে ধূলিশূন্য, আর ঠিক প্রবেশ পথের উপরেই একখানি খড়্গ ঝোলানো যা প্রথমে দেখা যায় নি। এ বস্তুটির উপর লক্ষ্য পড়তেই এখানে মানুষ থাকে যেমন বুঝা গেল তেমনি একটু ভয়ও হোলো —এ পবিত্র স্থানে খড়্গ কেন?

ঐ খড়্গ দেখে যেন স্বতই মনে হোলো গুহায় প্রবেশ নিষেধ। একটা যেন প্রতিবাদ, গুহার যিনি অধিকারী ঐটী তাঁরই নির্দেশ বাইরের কোন আগন্তুকের প্রতি, কাজেই, বাইরে দাঁড়িয়েই চিন্তিত মনে ভিতরের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন অবস্থায় ফিরে যাবার আগেই একবার এখানে কে আছে বা থাকে না জেনে তো যাওয়া যায় না,—তাই একবার পরিমিত চীৎকার করে দেখতে ক্ষতি কি? কে আছে ভিতরে?—

পথ থেকে ধীরে ধীরে উঠছে একটি মূর্তি,—মাথায় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উলঙ্গ নয় কটি দেশে একখণ্ড কৌপিন বস্ত্র জড়িত, জানুর উর্দ্ধেই তা শেষ হয়েছে। গৌরবর্ণ সুকুমার মুখাকৃতি, গোঁফ দাড়ির রেখা অল্পই ছিল ; দক্ষিণ হাতে ভারী জলের পাত্র। কমণ্ডলু নয় লোটা। আমায় দেখেই,—প্রসন্ন মনে, যেন কৃতার্থ হয়েছে এমন ভাবে আইয়ে, ঠারিয়ে বলে সেই যুবা—সামনের চত্বরের মত স্থানটিতে জলভার নামিয়ে রাখলে। আমার আনন্দ হোল একজন নূতন মানুষ পেয়ে, পরক্ষণেই একটু দুঃখও হোল এই ভেবে—যে, হয়ত সঙ্গী ছাড়া হলাম এখানে এসে। যাই হোক—সাধুটি আমায় জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে আমি কোথা থেকে আসচি এবং যাবো কোথা।

গিরিগুহার অধিবাসী এই যে সাধুমূর্তি, তার বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই হবে তার দুই ভ্রূতে কেশের ভাগ এতই কম যে নেই বললেই যেন ঠিক হয়, তার উপর বড় বড় চক্ষু দুটি ভয়ংকর দেখায়, পাতায় লোম নেই। হিন্দি কথা তার ঠিক ঐ দেশীয় লোকের মত। আমায় বসতে বলে মাথাটি নীচু করে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে এবং অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলো বড় একটি লোটা হাতে করে।

আমি একটু সংকোচের সঙ্গেই তাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সুমুখের ঐ বড় ঝরণা থেকে জল আনলেন ?

সে হেসে বললে, নহি নহি।—তা তো বহোত দূর, ইহাঁসে থোড়া নীচে ঔর ধারা হৈ, জল উহাঁসে লায়া।

আমার প্রথম অনুমানমূলক মনোভাব, এক কথায় ঐ সাধুর সম্বন্ধে ধারণা তেমন প্রীতিকর হয় নি। ঐ যে ভ্রূহীন চক্ষু তার, বোধ হয় সেইটাই আসলে বিরুদ্ধভাবে ক্রিয়া করেছিল মনের মধ্যে। সেই ভাবটি বদ্ধমূল হল যখন দেখলাম একটি নারী,—কোলে তার একটি স্বাস্থ্যবান পাঁচ ছয় মাসের শিশু—হঠাৎ সেই গুহার দক্ষিণ দিক থেকে এসে উপস্থিত হল আর আমাকে দেখেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, যেন র‍্যাফেলের সিস্‌টাইন ম্যাডোনা ; সেই নারী যুবতী, অপরূপ সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু উজ্জ্বল তাম্রাভ শ্যামামূর্তি, তাকে গৌরবর্ণও বলা যায়,—মুখশ্রী অতীব সুন্দর ; অবিন্যস্ত ঘন চুলে দীর্ঘ বেণী, ঘাগরা পরা বুকে ওড়না—মাথায় কাপড় নেই, যেন অভ্যস্থ গৃহস্থালীর

মধ্যে কর্মরত একটি নবীনা গৃহিণী। শিশুটি মায়ের কোলে চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ছিল। খুব হৃষ্ট পুষ্ট গৌরবর্ণ শিশুটির নীলবর্ণ দুটি চক্ষু এবং পিঙ্গলবর্ণ—চুলগুলি,—কিন্তু ঐরকমই ভ্রূহীন মুখখানি সাধুটির অনুরূপ।

অল্পক্ষণের মধ্যে এই যে ব্যাপার ঘটলো তাতে আমার মধ্যে কিং-কর্তব্য-বিমূঢ়-ভাবটাই প্রকাশ পেলে। এ ক্ষেত্রে, কি আমার করা উচিত এইটিই মনের মধ্যে তোলাপাড়া চলেছে, কিন্তু চট্ করে কোন মীমাংসায় আসতে পারিনি। মেয়েটি কিন্তু তার সংকোচ অতি শীঘ্রই চমৎকার সামলে নিলে, আমাকেও যেন নিঃসঙ্কোচ করে দিলে। সে এগিয়ে আমার সামনে এসে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে—আপ্ কো বাঙ্গালী শরীর ?

জী হাঁ, বলে আমি তার কথার উত্তর দিলাম। মনে মনে তার অসাধারণ আত্মসংযমের প্রশংসা না করে পারিনি। একবার কোলের ছেলে, আর একবার মায়ের মুখের দিকে দেখছিলাম,—যেন মনের অজ্ঞাতসারেই দেখলাম যে মায়ের ডান দিকে ভ্রূর উপরে একটা কাটা দাগ—সেটা সম্প্রতিই আরোগ্য হয়েচে বোধ হল। আমার ঐ দিকে দেখা মেয়েটি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে,—বোধ হয় আমার লক্ষ্যটি সেই দিক থেকে ফেরাবার উদ্দেশ্যেই সে তখন সাধুটির উদ্দেশে বললে ; —সিদ্ধজি ! আপকা দেশকী মূর্তি হৈ, কি নাহি ?—

ক্যা মালুম, মৈনে অভিতক কুছ তো পুছা নহী, অবহি তুরন্ত মিলা, না। আমায় তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি তখন,—বললে, বৈঠিয়ে সন্তজী, তারপর সিদ্ধজীকে, এক আসন তো দেও ;—বলে সেই চত্বরের দিকে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে, প্রফুল্লমুখে ছেলেমানুষের মত সহজ ভাবেই আমার দিকে চেয়ে রইল। দেখছিল বোধ হয় বাঙ্গালী সাধু আর একজন কেমন।

সিদ্ধজী দুইখানা মৃগচর্ম বার করেছিল, একখানা আমার দিকে দিয়ে অপরখানি একটু দূরে ছুঁড়ে দিল। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা বড় গম্ভীর, —যাকে আমরা অপ্রসন্ন গোমড়া মুখ বলি সেই রকম হয়ে গেল। আমি বসলাম বটে, আর কতকটা সঙ্কোচ কাটাতে পারলেও অন্তরে ঐ গোমড়া মুখখানার জন্য একটু বিব্রত বোধ করলাম। তারপর যখন আমায় ভাগাবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধজী, হিন্দিতে নয় এবারে বাঙ্গলায় বললে. এখান থেকে একটু সকাল সকাল না উঠলে সন্ধ্যার আগে অগস্ত্যমুনি পেঁাছাতে পারবেন না ; --তখন অন্তরে একটা কি রকম আঘাত অনুভব করলাম। আমার যাওয়াই দরকার, এখানে রাত্রিবাস অসম্ভব, একথা আমার মধ্যে উঠলেও যেন এতক্ষণ চাপা ছিল।

আর হিন্দি না বলে বাঙ্গলায় আপন ভাষায় বলছি। মেয়েটি কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্কোচেই সিদ্ধজীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে. তুমি কি এঁকে চলে যাবার কথা বলচ ?

হাঁ, একটু সময় থাকতে না বেরুলে,—

কেন সময় থাকতে বেরুতে যাবেন উনি ? আজ আমাদের এখানে থাকবেন না ?

না, উনি থাকবেন না,—আমি জানি।

থাকতে অনুরোধ করেছিলে ?

না, যখন জানি থাকবেন না,—বৃথা কেন অনুরোধ করব ?

না, তুমি ওঁকে থাকতেই বলো, আমাদের বলা উচিত - আমরা কতদিন

একলা আছি আজ যদি ভগবানের ইচ্ছায় একজন এসেছেন ; মেয়েটি যেন বেশ অনুযোগের সুরেই বললে, তাকে ভাগাবার চেষ্টা কেন ?

সিন্ধজী হয়ত আশা করেন নি যে মেয়েটি এতটা আগ্রহ প্রকাশ করবে আমাকে রাখতে। কাজেই বাধ্য হয়েই যেন, আমার কাছে এসে পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ;—আমাদের এখানে আজ থাকবেন কি ?

আমি তখন সকল কথা বললাম। বেণীনাগের পথে যেতে যেতে ঐ সুদৃশ্য প্রপাতটি দেখেই এদিকে এসে পড়েছি,—ধারণা ছিল যে ওটা খুব কাছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এতটা এসে দেখি আরও অনেকটা দূরে, তারপর আপনাদের গৃহটি চোখে পড়লো, তাই এসেছি। এখন বিদায় দিন চলে যাই। এখন না উঠলে সন্ধ্যার মধ্যে অগস্ত্যমুনি পেঁছাতে পারবো কি ?

কোন বিশেষ কাজ সেখানে যদি না থাকে তবে আজ আমাদের আশ্রমে অতিথি হলে ক্ষতি কি ?

দেখুন ইচ্ছা আমার খুবই ছিল, এখনও আমার এখানে কিছুই দেখা হয়নি ; তা ছাড়া ঐ সুন্দর জলপ্রপাত না দেখে এখনও আমি যাবো না। যদি এখানে সুবিধা না হয় তাহলে আমার যেখানে সেখানে পড়ে থাকার অভ্যাস আছে, আজ রাতটা কোথাও কাটিয়ে সব দেখে শুনে চলে যাবো।

তখন সেই মেয়েটি, বোধ হয় সব কিছু শুনে, একটা ধারণা করে—আমায় বললে, আজ ইহাঁ ঠার যানা সাধুজী। কুছ তকলিফ না সমঝো, হরজা ন হো তো রহ যাইয়ে ; হামলোক—একেলা। তখন আমি তাকে আবার বুঝিয়ে দিলাম, এখানে থাকতে আমার আপত্তি নেই, ঐ ঝরণা দেখতে এসেছি, এখানে থাকলে আমার কোন অসুবিধাই নেই যদি অসুবিধা হয় তো সে আপনাদের।

যাই হোক আমার সম্মতি পেয়ে মেয়েটি সুখী হল, আমিও ঘাড় থেকে কম্বলখানা নামিয়ে রাখলাম, লোটা আর লাঠিটা আগেই রেখেছিলাম এখন বললাম, আমি একটু ঘুরে দেখে আসি ঐ ঝরণাটা এখান থেকে কত দূর। মেয়েটি বললে, ঐ কালী ঝোরা ? না ওখানে আজ যাওয়া হবে না। ওটা কাছে নয় পেঁছাতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আপনি কাছে-পিঠে কোথাও যান, তবে বেশী দেরী করবেন না,—সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই আসা ভালো, এখানে ভয়ের কারণ আছে।

পরে জেনেছিলাম, বাঘ আর সাপও বটে এখানকার ভয়। আরও একটা ভয় আছে সেটা দিনেও যেমন রাতেও তেমন—সেটা হলো বিচ্ছু। সে বিচ্ছুর চেহারা আমাদের দেশের কারো ধারণা নেই, মিশ-মিশে কালো চকচক করচে, তিন ইঞ্চি লম্বা, পিছনের হুলটি উপর দিকে যখন গুটিয়ে রাখে তখন ছোট দেখায়। কেউটে সাপের মতই তার বিষ প্রাণঘাতী, সে তীব্র বিষের প্রতিকার নেই। শুনেছি কেউ কেউ যাঁরা প্রতিষেধক জড়ি বুটি জানেন তাঁদের পাওয়াও ভাগ্যের কথা। মেয়েটির মুখেই এই সব কথা শুনলাম, সিন্ধজী কতক্ষণ কাজে রইলেন। মেয়েটি এই সব বলে সাবধান করে আমায় ছেড়ে দিলে।

মা, শিশু ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে বসে এমনভাবে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে সহজ আন্তরিকতাপূর্ণ সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইলে. আগে কোথাও প্রত্যক্ষ করিনি। বাঙ্গালীর উপর তার সহজ শ্রদ্ধা, যেন তার নিজেরই জাতি।

ওখান থেকে বেরিয়ে যে দিকে ঝরণা ঠিক সেই দিক অনুমান করেই চললাম। খানিক উঠানামার পর আবার সেই মুক্ত জলপ্রপাতটি সামনেই দেখা

গেল। আঃ কি আনন্দই ছিল তার মধ্যে! একটা শিলার উপরে বসেছিলাম। ইচ্ছা হয় এখানে একটি কুঁড়ে বেঁধে—সারাজীবন কাটিয়ে দি। সিদ্ধজী কেন যে এমন দৃশ্যটিকে ছেড়ে—এর আড়ালে ঘর করলেন! বোধ হয় পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির তৈরী গুহাটি পেয়ে—না হলে আর কি কারণ হতে পারে।

খানিকটা নীচেই ঐ স্রোতটা চলেছে, শব্দ পাওয়া যাচ্চে,—সেই শব্দের মধ্যে মোহিনী শক্তি আছে, শুনতে শুনতে তন্ময়তা আসে। তার গতিবেগ এমনই প্রখর—খানিক চেয়ে থাকলে মনে হয় আমায় যেন তার সঙ্গে নিয়ে চলেছে?—

এখন, ছবি আঁকবার সরঞ্জাম কিছুই সঙ্গে নেই, দুঃখও নেই তাতে। কারণ সত্য বলতে এসব দৃশ্য আঁকার কাজে মনকে ছলনা করতে হয়, তারপর —শেষ অবধি প্রকৃতির এই মহান্ সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে রেখা ও বর্ণ বিলাসের কথা দূরে থাক,—শত ভাগের এক ভাগও হয় কি না সন্দেহ; সরঞ্জাম নিয়ে, যদি ঐ দৃশ্যের প্রতিচ্ছবির কাজে আমার সকল উদ্যম, উৎসাহ নিয়োজিত করতাম তা হলে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই মহান দৃশ্যটি এমন গভীর ভাবে উপভোগ করতে পারতাম না।

দূরে কাছে এই সব অনেক কিছু নয়ন বিমোহন দৃশ্য দেখতে দেখতে উঠবার কথা আর মনেই থাকে না। কিন্তু সুমুখেই আকাশে সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যা হোলো, এবার উঠতে হবে। আজ এক নূতন ঘরে অতিথি আমি, ঐ মেয়েটির কথা মনে হোলো তখন। কি জাতি কেন, সিদ্ধজীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথাটা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আজ নিশ্চয়ই এদের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—অন্ততঃ আশা আছে, জানতে পারবো।

আমার ওখানে থাকতে ইচ্ছা ছিল না, একটা কৌতূহলই কাজ করেচে। সাধু হয়ে বেরিয়ে এসে আবার সংসার করা গৈরিক পরে, এ যে ব্যভিচার, বিসদৃশ ব্যাপার এ সব জেনেও আমার এখানে থাকা ঘটলো কেন? ঐ নারীর প্রভাব যে এর সঙ্গে আছে তাতে আর সন্দেহ মাত্র নেই; তবে সবটাই তা নয় এটাও সত্য।

এক অবধূতের সঙ্গে আমার কিছু দিন সঙ্গ হয়েছিল,—তিনি অসাধারণ মানুষ। তিনি বলতেন,

ইমলি খায়কে লাগায় ধ্যান, গৃহী হোয়কে বাতায় জ্ঞেয়ান।
যোগী হোয়কে ঠোকে ভগ্, ইয়ে সব আদমী কলিকা ঠগ।

এ শুধু এখনকার কথা নয় প্রাচীন কাল থেকেই এ ভাবের ব্যাপার সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে চলচে,—কত কত উপজাতির সৃষ্টি হয়েচে এই থেকে। তার সংখ্যা নেই। এই সব থেকেই এই গৃহস্থ সমাজে অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী, গিরি, পুরী ইত্যাদি পদবীর উদ্ভব হয়েচে। অনেক জনার পথভ্রষ্ট অবস্থা, জারজ সন্তানকে শিষ্য বলে প্রচার করা,—এ সব দেখা আছে প্রথম থেকেই, পরে যখন, সমাজের সঙ্গে মিশে যায় তখন আর মোটেই বিসদৃশ লাগে না, —কিন্তু প্রথম অবস্থায়—? সমাজের বাইরে থেকেই যেন একটা বিধি-বহির্ভূত কাজ করিয়ে প্রকৃতি এদের সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। অদ্ভুত আমাদের এই সমাজের ইতিহাস আর তার তত্ত্ব-কথা।

সন্ধ্যার একটু আগেই উঠতে হ'ল, আমার আজকার আশ্রয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এসে মেয়েটিকেই দেখলাম চত্বরে,—কোলে ছেলেটি ঘুমিয়েছে পাশেই একখানি আসনের উপর একটু বিছানার মত, মাথার একখানি কাপড় পাটকরা শিশুর বালিসের কাজ করছে। আমায় দেখেই,—আইয়ে আইয়ে বলে সম্ভাষণ করে সে ছেলেটিকে শয্যায় শুইয়ে দিলে—দিয়েই উঠলো,—ঐ ওঠবার সময়েই দেখলাম, তার চোখে যেন জল,—কেঁদেছে মনে হলো। সিদ্ধবাবা সেখানে নেই।

বাবাজীর আবির্ভাব, যেদিকে মেয়েটি গেল সেই দিক থেকেই। আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে বললাম,—দেখুন আমি বেশ বুঝতে পারচি আজ আমিই আপনার শান্তি ভঙ্গ করেছি,—যদি এখনও উপায় থাকে আমি চলে যেতে রাজী আছি।

বাবাজী বললেন, মুখে তাঁর শ্লেষপূর্ণ হাসি,—যাওয়া আপনার উচিত ছিল আগেই কিন্তু রূপবতী যুবতীর মোহেই তা যখন পারেন নি তখন, এখন আর ও সব কথায় কাজ কি?

আঃ—কানে মোচড় দিয়ে ঠিক যেন সজোরে ঠাস করে গালে আমায় এমন চড় বসিয়ে দিলে, আমার মাথা ঘুরে গেল। একটু সামলে বললাম,—দেখুন, আপনি বাঙ্গালী বলেই আজ বলচি, অন্য কেউ হলে বলতাম না। আমাদেরই একজন বঙ্গ সন্তানকে এই অবস্থায় এখানে দেখবো এ আশা করিনি ; যতটা গভীর বিস্ময় ততটাই মর্মান্তিক বেদনা যে আমি ভোগ করচি তা বোধ হয় আপনি অনুমানও করতে পারেন নি। গৈরিক পরে নারী-সঙ্গ, —আবার নামে সিদ্ধজী,—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—না না, সিদ্ধজী আমার নাম নয়। সাধু সন্ন্যাসী সমাজে কোন নতুন লোক এলে, তার নামটি জানা না থাকলে তাকে সিদ্ধজী, মহাত্মাজী, বাবাজী, সন্তজী ইত্যাদি নামেই ডাকা হয়। ঐ মেয়েটি কনকা, সেই হিসাবেই আমায় উদ্দেশ করে কিছু বলতে সিদ্ধজী বলেন। আমার নাম দেবানন্দ। আজ যখন বিধাতার নির্বন্ধে আপনার এখানে থাকবার যোগাযোগ হয়েচে, আর আপনি আমার স্বদেশী স্বজাতি তখন আমার জীবন কাহিনী সংক্ষেপেই আপনাকে শুনাতে চাই,—শুনে বিচার করে আপনি দেখবেন আমার অবস্থায় পড়লে যে কেউ—

অসহ্য হল এবার, বললাম, আচ্ছা, থাক এখন একথা। সুমুখেই দেখি কনকা একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে রাখলে, তারপর বললে,—এখানে আমরা ঠিক এই সময়েই খেয়ে নি। আপনারা বসুন আমি খাবার নিয়ে আসি।

আমার ভিতরে যথেষ্ট ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছিল কিন্তু খেতে ইচ্ছাই ছিল না বিশেষতঃ পাশাপাশি,—দেবানন্দের সঙ্গে। কিন্তু আহার আমায় করতেই হলো। নীরবেই আমরা উপভোগ করলাম, গরম রুটি,—সুপক্ক ও উত্তমরূপে ঘৃতসিক্ত, শাক, আর আমসী মসলা দেওয়া তেলে ফেলা। শেষে দুধ।

যখন ভোজন পালা শেষ হ'ল তখন কনকা নিঃসঙ্কোচে এসে বসলো আমাদের সঙ্গে,—আর ততোধিক নিঃসঙ্কোচে আমার পরিচয়, জীবন কথা জানতে চাইলে। সে স্পষ্টভাবেই জানতে চায়, কেন আমি বেরিয়েচি,—আর কি পেয়েছি। অতি তীক্ষ্ন বুদ্ধি শিক্ষিতা মেয়ে,—অসাধারণ তার সব কিছুই

জানবার আগ্রহ। যখন আমার কথা সব তার শোনা হোলো—তখন অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা। বলে বসলাম আমি,—এইবার আপনাদের কথা শুনতে হবে,—বলুন।

আমার কথা, কনকা বললে,—খুব বেশী নয়, যেটুকু বিশেষ তার মধ্যে সেইটুকুই বলছি, শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার বাবা ছিলেন কাশীতে, অনেকদিন ভুগে, বড় কষ্ট পেয়েই মারা গিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত উকিল,—একমাত্র মেয়ে আমি। আমার যখন নয় বৎসর বয়স আমার মা মারা যান; তারপর বাবা আমার, সন্ন্যাসী বৈরাগীর মতই হয়ে পড়েন;—একেবারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান নি কোথাও,—তবে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে শাস্ত্রচর্চা জপ ধ্যান এই সব করতেন। সাধু সন্ত দেখলে যত্ন করে ঘরে আনতেন; সেবা করতেন। ভজন সাধনের উপদেশও নিতেন। বারো বৎসরে তিনি আমার বিবাহ দেন তাঁরই বন্ধু কোন উকিলের ছেলের সঙ্গে। তারপর আমার স্বামী বিসূচিকায় মারা যান বিবাহের এক বৎসর তিন মাস পরে। সেই থেকে বাবা আমায় তাঁর সকল কাজেরই সঙ্গের সাথী করে রাখলেন। প্রথম প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল আবার আমার বিবাহ দেবেন। বাবার একদল বন্ধু ছিলেন স্বপক্ষে, আর সনাতনপন্থী একটা বড় দল ছিল এর বিপক্ষে কিন্তু বাবার জেদ ছিল তিনি ঠিক আমার বিবাহ দেবেন। একজন ধনী প্রতিবেশী তার ছেলেকে বিলাত পাঠিয়ে ছিলেন, ছেলে পরে ব্যারিস্টার হয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বারে প্র্যাকটিস করচেন। বিবাহ হোতো তাঁর সঙ্গেই, দুটি কারণে সেটা ভেঙ্গে গেল পাকা কথা হবার পর। প্রথম, সেই ব্যারিস্টার সাহেব একটা মোটা টাকা চেয়ে বসলেন বাবার কাছ থেকে,—আর সেই টাকা,—তাঁর বিধবা মেয়েকে বিবাহ করছেন বলেই চাই। আর দ্বিতীয় কারণ, খবর পাওয়া গেল তিনি অতি দুশ্চরিত্র লোক। ঐখানেই একজন বন্ধু-স্থানীয় ব্যক্তির মেয়েকে নিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে দিন কতক গা ঢাকা দিলেন,—তারপর না কি সে ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। তাঁর আরও গুণের কথা জানা গেল, তিনি জুয়ার ভক্ত। ইতিপূর্বে জুয়াতে বাপের অনেক টাকা লোকসান করেছেন। এখনও অনেক দেনা। এই সব শুনে বাবা মত পরিবর্তন করলেন। তিনি সমাজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষে আমায় নিয়ে হিমালয়ে গেলেন। মুসৌরীতে আমরা প্রায় চার বৎসর ছিলাম। সেইখানেই আমার অধ্যয়ন আরম্ভ হল। আমিও সঙ্কল্প করলাম তত্ত্ব-জ্ঞান আলোচনায় জীবন কাটাবো।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত এই তিনটি দর্শন শাস্ত্র আমি পাঁচ বৎসর ধরে একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়েছিলাম। পড়ার দিক থেকে খাঁটি ছিলাম। শব্দ-অর্থবোধ আমার মোটমুটি ভালই ছিল কিন্তু যে সাধনে সিদ্ধির পথে যাওয়া যায়,—সে দিকে যাবার যত্ন তখন ছিল না। বাবার ধারণা ছিল একটু বেশী বয়স, অন্ততঃ পঁচিশ থেকে ত্রিশ বৎসর না হলে, মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ পুষ্ট না হলে সাধন বা সিদ্ধি কখনই সম্ভব হয় না। অসময়ে তাড়াতাড়ি, কাঁচা বয়সে সাধন, কখনই শুভ হয় না। তাই তখনকার অধ্যয়নই ছিল আমার তপস্যা। তিন বৎসর পর আমরা আবার ফিরে এলাম।

বাবা আমাদের সহরের বাড়ী ছেড়ে গিয়ে অসির তীরে, সহর থেকে অনেকটা দূরে একটি ছোট বাগানের মধ্যেই আমায় নিয়ে থাকতেন। যখন আমার বয়স প্রায় আঠারো বৎসর,—তখন এক অদ্ভুত যোগাযোগে এই সিদ্ধজী

এসে উঠলেন অতিথি হয়ে আমাদের আশ্রমে। বাবার কেমন একটা স্নেহ, মমতা হয়েছিল এঁর উপর এঁর জীবন কথা শুনে, তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। অবশ্য সেই সময়ে বাবা পীড়িত হয়েও পড়লেন. বাতে পঙ্গু হয়েছিলেন। এঁর সেবা দ্বারা তখন তাঁর অনেক কাজ হয়েছিল, তাই এঁকে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত মনে করেছিলেন। তা ছাড়া আমার পাঠ অধ্যাপনার ভার এঁর উপরই দিয়েছিলেন। তাঁর সামনেই, পাঠ ব্যাখ্যা চলতো। এঁর ব্যাখ্যান বাবার খুব ভালো লাগতো। উপদেশ করবার ভঙ্গী ছিল চমৎকার,—বাবাও ভারি পছন্দ করতেন। বাবার শরীর উত্তর উত্তর খারাপ হয়েই চলেছিল। আমরা দুজনেই তাঁর সেবা করতাম,—তিনি বলতেন, এ অবস্থায় ঘর ছাড়া ভাল হয় নি তোমার। তিনি যেন বুঝলেন আমরা দুজনেই ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়চি। তিনি বলতেন,—সংসার ভোগ প্রবৃত্তিটি সূক্ষ্ম,—স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মেই এটা হয়। ওটা সূক্ষ্ম ভাবে যুবা সাধুদের মনের মধ্যেও থাকে, তার ফলে তাদের নেমে আসতে হয়। সংসার ভোগ করে নিয়ে তার সাধন-মার্গে নামা উচিত। তোমরা মনে কোন পাপ রেখো না,—এ আকর্ষণ তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি চাই তোমরা বিবাহিত হয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন কর,—আর সেই সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জন করে মানব জন্ম সফল করো।

ক্রমে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, একদিন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়লো আমাদের দুজনকে দুদিকে রেখে দুজনের দুই হাত এক করে দিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি, আমার আশীর্বাদ রইল তোমাদের উপর ; তোমরা সুখী হয়ে তোমাদের গার্হস্থ্য আর আধ্যাত্ম-জীবন সফল কোরো। সমাজের মধ্যে সব রকমের জীবনই দেখতে পাওয়া যায়। কোনটাই ফেলবার নয়, প্রকৃতি জননী সকলেরই আপনার কোলে স্থান দিয়েছেন ; যদি তোমরা কুসংস্কার মুক্ত হয়ে জীবনকে উন্নত করতে পার,—তাহলেই আমার সে উদ্দেশ্য সার্থক হবে তোমাদের এক করে দেওয়াতে। তোমাদের উপরে ভার রইল তোমরা বিবাহিত হয়ে জীবন আরম্ভ করবে অথবা বিবাহ সংস্কার বাদ দিয়েই করবে। তবে আমার মনে হয় আমাদের প্রবৃত্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সংস্কার ত্যাগ করা উচিত নয়। আমার আর কিছুই বলবার নেই। বাবা আমার সেই দিনই মারা যান। তিনি এক সময়ে উপার্জন করেছিলেন অনেক। মা মারা যাবার পর কাজ কর্ম ছেড়ে ঘরে বসে বসেও অনেকদিন কিছু কিছু উপার্জন করতেন, যে কাজ সামনে হাতে এসে পড়তো।

হিমালয় আমাদের দুজনেরই ভাল লেগেছিল, আমরা তাই ওখানকার সব কিছু ব্যবস্থা করে হিমালয়েই থাকতাম, নানা স্থান বেড়িয়েছি। কেদার বদরী, নন্দকোট, গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী প্রায় এ-দিককার সকল তীর্থই ভ্রমণ করে গত বৎসর থেকে এই খানেই আমরা আছি। আমাদের সন্তানটি এই খানেই হয়েচে।

এতটা বলেই কনকা চুপ করে রইলো। দেবানন্দ বেশ স্থির হয়েই সব কিছু শুনছিলো,—এখন যেন একটু চঞ্চল হয়েই কনকার মুখের দিকে চাইলে তারপর আমায় বললে,—আমার বলবার আর কিছু রইলো কি ?

আমি বললাম, আপনার পূর্ব পরিচয়, সেটা আমার আর জানবার ইচ্ছে নেই।

ঠিক সাত বৎসর পরে, আমি তখন বরোদা যাচ্ছি, মথুরা ষ্টেশনে বেলা তিনটায় নেমেছি, রাত দশটায় বম্বে মেল ধরতে হবে। অনেকটা সময়, গিয়ে ওয়েটিং রুমে দেখি একজন মধ্যবয়সী গৌরবর্ণ ভদ্রলোক স্যুট্‌পরা, তাঁর সঙ্গে স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি বছর দুই অপরটি সাত আট বছরের। ছেলে দুটি গৌরবর্ণ, সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর। ভদ্রলোকের মুখখানা দেখেই কেমন বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি সামনে যেতেই স্মৃতির আলো জ্বলে উঠলো সেইক্ষণে,—বললাম,—সিদ্ধজী নাকি?

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন,—তাঁর স্ত্রী কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন,—আমার দিকে ফিরে তিনি একটু হেসে বললেন,—কালী ঝোরা কি পাশ গুফা কি পরচয়,—এক সাঁঝ,—হৈ কি ন হি?—

জী হাঁ,—কনকাদেবী,—ধন্যবাদ্ আপকি ইয়াদ, নমস্কার!—

তখন দেবানন্দজি উত্থিত ভ্রূ নামিয়ে বললেন,—ওঃ—ওঃ—অতটুকু সময়ের পরিচয় আপনার মনে আছে? তারপর অনেকখানি কথা। শুনলাম বম্বে চলেছেন, প্যাসেজ বুক করা হয়ে আছে;—তাঁরা য়ুরোপ ও এমেরিকা ভ্রমণে চলেছেন। একই গাড়িতে আমরা যাত্রা করলাম, তবে পৃথক শ্রেণীতে। দেবানন্দ বললেন, আশ্চর্য্য!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোনটা আশ্চর্য্য? এখানে দেখা হওয়াটা, না অবস্থার পরিবর্তনটা? দেবানন্দ বললেন, উভয়ত।

ইতি—দ্বিতীয় ভাগ

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

উৎসর্গ

জগত জন অম্বা,—
শ্রীশ্রীমা
জননীকে।

কয়েকটি কথা

গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ঘটনার বিবরণগুলি কয়েক বৎসর থেকে কথা-সাহিত্য, গল্পভারতী, জনসেবক, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি মাসিকে কোনটি বা শারদীয়া সংখ্যায় বেরিয়েছিল, —কেবল বিধিনির্বন্ধ লেখাটি অপ্রকাশিত ছিল। এখন সকলগুলি একত্রে তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের তৃতীয় খণ্ড-রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোলো,—এইজন্য শ্রীযুক্ত ডি. এম্. লাইব্রেরীর অধিকারী মহাশয়ের কাছে আমি ।

গ্রন্থকার

নররূপী নারায়ণ

কভু যদি দেখ, হে রাজন্ !
দীনবেশী অদ্ভুত-দর্শন কোন একজন
আসিতেছে তব সিংহাসন পানে,—
অতি-সঙ্গোপনে, নিভৃত অন্তর হ'তে
দূর করে দিও যত শৌর্য-বীর্য রাজ-অভিমান তব ;
যেন কোন অংশ তার প্রকট না হয় তব মুখে,—
আকারে প্রকারে কিম্বা ব্যবহারে, বাক্যে বা করণে।
এই ভাবে হইয়া প্রস্তুত,—দু'বাহু প্রসারি,—
উঠিয়া আসন হতে,—হরি, হরি, নারায়ণ বলি
হয়ে অগ্রসর,—আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তাহারে
ধরিও আপন বুকে—।
কিন্তু যদি উদ্ধত প্রকৃতি হেতু আত্ম-অভিমানে,—
দীনহীন ভাবিয়া তাহারে—
বাধে যদি বরিতে আপন বলি ; তবে—
অন্ততঃ এটুকু ক'রো,—
সিংহাসন হতে উঠি জোড় ক'রে দাঁড়ায়ো ক্ষণেক,
অতঃপর ক'রো নমস্কার, নমো নারায়ণ বলি।
সম্ভাষণে স্বাগত জানায়ে,
বসাইয়ো নিজ সিংহাসন-পাশে নিকট আসনে।
কেবা জানে কোন্ অনিশ্চিত ক্ষণে
আসিবেন কোন্ মহাজন, অথবা স্বয়ং
রাজরাজেশ্বর ছদ্মবেশে—
অশেষকল্যাণ-মূর্তি,
যাঁহার ঈক্ষণে মাত্র
ঘুচিবে তোমার স্বার্থ-অন্ধ মনের গরল,
ত্রিতাপের যত দুঃখ জ্বালা।
টুটিবে গরিমাগ্রন্থি,
শান্তিপূর্ণ প্রাণ,—সর্বঅর্থসিদ্ধি লাভ ঘটিবে তোমার ;
সত্যবাণী মানিও রাজন্। নিজস্থানে করিয়ো দর্শন
অপরূপ বেশে নররূপী নারায়ণে।

পান্থের দেহ মুক্তি

পথে যারা চলে পথিক তারাই,—কিন্তু এমনও আছে যারা পথে শুধুই চলে না, পথে বাসও করে। বলতে গেলে পথই তাদের আশ্রয়। যাযাবর তারা সত্যই। এই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একবার তাদের এক দলের সঙ্গে কিছুকাল বসবাস ঘটেছিল। ঐ সময়ে বেশ সহজেই সকল প্রদেশের মানুষের সঙ্গে বড় আনন্দে, ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করতে পারতাম—তাতেই একটা আনন্দ ছিল, অনেককিছু লাভও হতো। তখন বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে রাজপুতানা অতিক্রম করে গুজরাটের দিকে যাচ্ছিলাম, দ্বারকানাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে।

ভরতপুর পেরিয়ে জয়পুরের দিকে যেতে পথেই এই পান্থদের সঙ্গে মিলন, সদলবলে চলেছিল পশ্চিমদিক পানে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ঘটলো শৈলবারা নামে একখানা গ্রামের প্রান্তে, মাঠের উপর প্রকাণ্ড এক বট-বৃক্ষতলে। দেখতে দেখতে নিকটেই ফাঁকা মাঠের উপর তাদের তাঁবু, ছোট ছোট মোটা কাপড়ের ঘর তৈরী হয় গেল। জনবিরল বসতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অনেক দূরে দূরে। এদের দলটি যেখানে পড়লো পাশেই একখানা ছোট্ট গ্রাম,—শৈলবারা।

এই সব স্থান আমার বৃন্দাবন বলেই মনে হয়,—মাটি, মানুষ, নর-নারী, গাছ-পালা, দৃশ্য যা-কিছুই দেখছি সবই যেন ঐ শ্রীবৃন্দাবনেরই অংশ বলে মনে হচ্ছে।—ব্রজপুরের নেশা এখনও বোধ হয় কাটেনি। যাক সে কথা, এখন এদের কথাই বলতে হবে। পান্থ বা পন্থ এরা নিজেদের বলে, আবার কোথাও উদাসী বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে,—অথচ সংসার সঙ্গেই আছে।

দলে যার কথা সবাই মানে তার নাম দেবরাজ। পঞ্চান্ন বৎসর বয়স কিন্তু মনে হয় অনেক কম, চমৎকার কর্মঠ শরীর। এরা তিনটি ভাই, বড় ভাইটি সন্ন্যাসী। এদের পিতা ভীমরাজ—তিনি এখনও আছেন। প্রায় একশো বছর বয়স। শ্রমসাধ্য কাজ আর তাঁকে করতে দেওয়া হয় না—তবে তিনি সবই দেখেন শুনেন। দেবরাজের ছোট ভাই মেঘরাজ, দেখতে যেন রাজপুত্র—কি অসাধারণ শ্রমশক্তি, সারাদিন কাজে লেগেই আছে। যে কয়েকটি পুরুষমূর্তি দেখছি প্রত্যেকের কাজ মনে হয় যেন আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

পরদা-প্রথা আছে। মেয়েরা সবাই ভিতরে থাকে, ব্যতিক্রম কেবল একটি মেয়ের বেলা। কুমারী মেয়েটি মেঘরাজের, নামটি তার ইন্দ্রী, ইন্দ্রাণী থেকে ইন্দ্রী হয়ে গিয়েছে বয়স তার চোদ্দ হবে। এরা রাজস্থানী,—রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্য এদের মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণরূপেই প্রকট দেখেছি। মেয়েদের ঘাগরা, কাঁচালী আর ওড়না। আর মরদের চুড়িদার পা-জামা, গায়ে ছাতিবন্ধ পিরান, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি।

মেঘরাজকে ভারি সুন্দর দেখতে, বয়স তার প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু দেখতে যেন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবা, তারই মেয়ে ঐ ইন্দ্রী। হাতে তীর ধনুক,—আর নিঃসঙ্কোচ গতাগতি, সর্বত্র। শিকারে তাদের অসাধারণ লক্ষ্য। চোদ্দ বৎসর বয়স, তার রূপটি অপরূপ বলা যায়, তার উপর বাহুবলও অসাধারণ।

একটা ডোল, তামার ঘড়ার মতই দেখতে, প্রায় যাট হাত গভীর কুয়া, তাই থেকে দিনে অনেক বারই জল তোলে। আমি যে কয়দিন তাদের আশ্রয়ে ছিলাম, —বেশীর ভাগই ঐ ইন্দ্রী, আর মেঘরাজকেই তুলতে দেখেছি।

এদের যে ধনু, বাঁশ বটে কিন্তু খুব শক্ত, হাড়ের মতই কঠিন, কার সাধ্য সহজে বাঁকায়। ছিলাটা থাকে খোলা, ব্যবহারের সময় অতি অল্পক্ষণেই মোটা তাঁতের ছিলাটা পরিয়ে নেয়, অবশ্য হাঁটুর চাড় দিয়েই ধনুকটি বাঁকাতে হয়, তারপর শর সন্ধান করে। তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি আওয়াজ হয়, রামায়ণ মহাভারতে তার নাম টঙ্কার। সে টঙ্কার স্থানবিশেষে বড়ই চমক-প্রদ—ভয়ঙ্কর ; ঐ টঙ্কারে বনের পশুও ভয় পায়। বাঘ ভালুক বা হরিণ যদি নজরের মধ্যে এসে পড়ে তার আর রক্ষা নাই। এদের শিক্ষাই এমন যে তীরটা ধনু থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের অঙ্গ ভেদ করে ফলাটা সোজা বার হয়ে যায়। যদি কোন মানুষ এদের শত্রু হয়, —একটি বাণ তার নামে উৎসর্গ করা থাকে, তাইতেই নিশ্চয় তাকে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে।

একটা বড় বাবলা গাছ কাটা হয়েছিল। এখন তাই থেকে ডাল আলাদা, গুঁড়ি আলাদা, বড় কাঠের চ্যালা সব কেটে কেটে পাশেই রাখছে—মেঘরাজ আর দেবরাজ। গাপ্ গাপ্ গাপ্—কোপ পড়ছে কুড়ুলের ;—অল্প দূরেই বসে দেখছি। এদের কাজটা বটগাছ থেকে খানিক তফাতে। হঠাৎ একটা বাবলা গাছ কাটবার কি এমন দরকার পড়লো বুঝতে পারলাম না ; দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করলাম,—সে বললে, এখানে কাল একটা বড় যজ্ঞ হবার কথা আছে,—দেখতেই পাবে।

আমার কি হয়েছে—জানি না। এদের স্বাধীন জীবনের সব কিছুই ভাল লাগে। এদের কাঠ কাটা, জল তোলা, যা-কিছু কাজ সব—এমনই সুন্দর, এদের দেহায়তন ভঙ্গির সঙ্গে মানানো—তাহাই দেখছিলাম বসে বসে, বেলা তখন প্রায় দশটা,—গরম খুব।

উত্তর দিক থেকে একটি ঘোড়সওয়ার আসছে ;—ক্রমে কাছে এসে এখন ঘোড়াটা দাঁড়ালো,—তার উপর থেকে নামলেন এক সরকারী দফাদার। মথুরার কোন সরকারী মহাপ্রভুর চাপরাশী হবেন,—খবর দিলেন, কে এক সাহেব কমিশনার আসছেন, তিনি এইখানেই থাকবেন আজ, এইখানেই তার তাঁবু পড়বে এবং এখনই সব এসে পড়বে—সুতরাং সব হটাও। হুজুর এই সাহেবটি কমিশনার আর বড় লাটো সাহেবের দোস্ত,—হিন্দুস্থান শায়েরমে আয়া,—ইত্যাদি —ইত্যাদি। বটগাছ থেকে খানিক দূরেই পান্থদের তাঁবু ; সাহেবের তাঁবু অন্যদিকে কিম্বা এই গাছের কাছেই হতে পারতো, কোন বাধাই ছিল না। কিন্তু তবুও জমাদার সাহেবের হুকুম এখান থেকে সব হটাও। বলতে নেই এখন এটা ব্রিটিশ আমল।

মেঘরাজ বললে,—কাহেজী, হামলোক ক্যা ভগবানকা পয়দা হুয়া জিউ নহি ? হাম লোক ইহাই ঠাহরেগা—কইকো বাৎসে হটেগা নহি।

সর্বনাশ—এরা বলে কি ?

এদিকে দেখতে দেখতে সাহেবের মালপত্র, লোকজন, ছোলদারী পর্যন্ত সবই এসে হাজির। ছোলদারী এসেছে—এখনই তাঁবু খাটাতে হবে,—জমাদার তাড়া লাগাতে আরম্ভ করলে। মেঘরাজ কোন কথা না ব'লে নিজের কাজ

করতেই রইলো। জমাদার দেখলে এ পক্ষ দুর্বল নয় বরং শক্তিমান ;—সে তো প্রমাদ গনলে।

এবার জমাদার মিষ্টি কথায় বলছে,—আরে, এ যে কমিশনার, বড়লাট সাহেবকো দোস্ত,—ছোটে লাট-সাহেবকো তরে আদমী—ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেবরাজ কিন্তু না রাম না গঙ্গা, কোন কথা নয়, গপাগপ্ কোপ ঝাড়তে লাগলো বাবলা ডালের উপর।

বেলা বেড়ে যেতে লাগল—শেষে দূরে আগমনশীল অশ্বারোহীকে দেখিয়ে সে বললে,—বো দেখো, অব হামারা সাহাব তো আ গেয়া, হামকো ক্যা বোলেগা —অব্ তোমলোগ আপনা সামালো। শুনে মেঘরাজ কুড়ুল ফেলে, গাছের ছায়ার মধ্যে এসে বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়ি রেখে, সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,—দৃষ্টি তার দূরে,—ঐ ঘোড়সওয়ার।

দেখতে দেখতে সাহেবও এসে পড়লেন এবং বটগাছের নিবিড় ছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। ঘোড়া থেকে না নেমে, সরল দৃষ্টিতে একবার মেঘরাজের দিকে আর একবার অদূরে এদের তাঁবুর দিকে, তারপর নিজের লোক লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামের দিকে দেখলেন। ইতিমধ্যে জমাদার সেলাম ঠুকে তার বক্তব্যটা বলে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচালো। সাহেব যেন সবই বুঝলেন, কিন্তু ঘোড়া থেকে নামলেন না বা কোন কথাই বললেন না।

এখন এই বট-গাছটার কথা একটু আছে,—গাছটার বহু-বিস্তৃত শাখা, এ অঞ্চলের মা কর্তা-মা রা গাছ। এই বিখ্যাত গাছ-টির তলায়, সারাদিনই মানুষ, পশু, আর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পক্ষী ও সরীসৃপের বস-বাস আছে। দিনমানে অনেক পথিক রেঁধে খায়, দুপুরে—রাখাল, গো-পাল ক্লান্ত জীবেরই আড্ডা, ছায়াতে বিশ্রামের সঙ্গেই সবার সম্বন্ধ। বাঁশী বাজায় রাখাল, ক্লান্ত গো-পাল ঝিমুতে ঝিমুতে জাবর কাটে শুয়ে শুয়ে। কাছেই

একটি কুয়া আছে,—কাজেই এ অঞ্চলের সবারই যাতায়াতের পথে লক্ষ্য থাকে এই গাছটির দিকে। যাই হোক, এই সাহেবের অবস্থা ক্লান্ত, ঘোড়ারও তথৈবচ, —কিছু কম নয় উপরন্তু তার মুখেতে ফেনা, যেটা বহুদূর থেকে আসার লক্ষণ। এই তরুচ্ছায়া তখন সবার পক্ষেই স্বর্গ। অথচ সাহেব তখনও ঘোড়া থেকে

নামচেন না,—কেন? মনে তাঁর একটা কিছু চলছিল,—মেঘরাজের সেই দৃঢ়, পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকা দেখে হয়তো মনে কিছু বিরুদ্ধ শক্তির আভাষ পেয়ে থাকবেন। এমনই সময়ে ফোঁস, ফোঁস, হিস্-স্-স্— শব্দের সঙ্গেই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো,—প্রায় বারো হাত তফাতে! দেখা গেল সামনা-সামনি এক চক্রধর—স্থির,—চক্র তুলে সোজা দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচে। দেখতে দেখতে সাহেবের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল,—আর নামার কথা ভাবতেও পারলেন না। কেবল ডান হাতটা সট্ করে বেল্টের দিকে গেল—সেখানে তাঁর মূল্যবান পিস্তলটা ঝুলছিল। কিন্তু আশ্চর্যের উপর তাঁকে আশ্চর্য করে দিলে। হলো কি,—পিস্তলটির হাতল বাগিয়ে ধরবার আগেই একটি তীক্ষ্ন বাণ এসে ঐ চক্রধরকে বিঁধেই মাটির ভিতরে ফলার খানিকটা ঢুকে গেল। তাঁর দৃষ্টির সামনে সাপটা একেবারে সর্ব শরীর পাকাতে পাকাতে সোজা হয়ে অল্পক্ষণে ঐখানেই স্থির হয়ে রইলো। এইবার সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সদাই প্রফুল্লমুখী ইন্দ্রী এসে দাঁড়ালো, হাতে মুষ্টি-বদ্ধ ধনু। সেই মূর্তি দেখেই সাহেব চমৎকৃত হলেন, মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন —Amazon, indeed! ইন্দ্রী কি বুঝলেন ভগবানই জানেন কিন্তু সাহেবের দিকে চেয়ে উপর নীচে মাথা নাড়িয়ে বললে,—জী হাঁ, সাহেব।

এবার সাহেব চমৎকার হিন্দীতে বললেন,—হাম্ আপ্‌কি হিন্দুস্থান দেখনেকো আয়া, বড়ি দূরসে। অব্ ইয়ে রাজস্থান মে ঘুমরহা। ইতিমধ্যে মেঘরাজ একটা লাঠির উপরে সাপটিকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল পোড়াবে বলে। জাত সাপকে মেরে,—না পোড়ালে পাপ হয়, ভারতের সর্বত্রই এই সংস্কার।

সাহেব এখন স্বচ্ছন্দে পায়ে পায়ে একটা মোটা শিকড়ের উপর, সামনে আর এক শিকড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে বেশ যুৎ করেই বসলেন। ইন্দ্রী একদৃষ্টে সাহেবের দিকেই দেখছিল। নারীজাতির মধ্যে যে স্নেহ ও সেবা-প্রবণতা আছে তা যাবে কোথা! সাহেবের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল দেখে,— সে তার চাঁপার কলির মত আঙ্গুল চারটি নিজের মুখের পানে তুলে সঙ্কেতে খাওয়ার ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—সাহেব! কুছ খাওগে?

সাহেব চমৎকার হিন্দী বলেন,—এখন উত্তরে বললেন,—আচ্ছা,—বোলো পহলে মুঝে ক্যা খিলাবেগা? ইন্দ্রী বললে, হমলোগকা ঘরমে যো কুছ তৈয়ার হৈ বোহি লায় শক্তা;—রোটি-টিকরা, কুছ ভাজি, আচার ঔর দহি, পেঁড়া দুধকা। আশ্চর্য ব্যাপার—সাহেব বললেন, বহোতাচ্ছা, হাম্‌তো মেহমান্,— লা দো যো আপকী ইচ্ছা, লেকেন্ হামারা পিয়াস লাগা। ইন্দ্রী দ্রুতপদে চলে গেল তাদের তাঁবুর দিকে;—আর অল্পক্ষণ পরেই একটি থালিতে দুখানা বড় বড় মোটা পরোটা, কিছু ভিণ্ডির ভাজি, একটি তেলের আমশী, ছোট একটা পাথরের বাটিতে দই। আর দুটো পঁ্যাড়া নিয়ে এলো, আর ঝকঝকে মাজা একটা রূপার মতই কোন ধাতুর ঘটিতে এক পাত্র জল এনে দাঁড়ালো। সাহেব দেখেই খুসি হলেন, কিন্তু থালাটি গ্রহণ করবার আগেই বেশ সরলভাবে বললেন. দো-রোটি নেহি, একই হামরা বাস্তে কাফি হৈ, ব্যাস্ ঔর সব ঠিক রহেনে দিজিয়ে।

সাহেব বড়ই উদার দেখলাম, তাঁর বসুধৈব কুটুম্বকম্; একজন কসমোপোলাইট; তখনকার দিনে এ ধাতের ইংরেজ দুর্লভ ছিল। যাই হোক, সাহেব তো ঐখানে বসে বসে কোলে থালা রেখে দিব্বি হাতের সঙ্গে আঙ্গুলের

ব্যবহার করলেন,—বেশ তারিয়ে তারিয়ে ভাজি দিয়ে খেলেন সেই পরোটাখানি, দুই আঙ্গুল দিয়ে দধিও খেলেন সবটা, শেষে মিষ্টি,—ঘরের তৈয়ারী টাটকা ক্ষীরের প্যাঁড়া দুটি, তাতে চিনির নামগন্ধও ছিল না। ইন্দ্রী চলে গেল যখন সাহেব খেতে আরম্ভ করলেন, কেবল সেথা আমি, আগাগোড়া সব কিছুই কাছে বসে দেখছিলাম। খেতে খেতে সাহেব আমার দিকে লক্ষ্য করলেন।

আমার কাপড়-চোপড় এবং চেহারাটাও বোধ করি এদের বিপরীত। তখন মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়ি,—ভিতরে কৌপিনের উপর একটা মোটা চাদর মাত্র সর্ব শরীর বেড়ে দেওয়া, বুকের উপর গাঁট বাঁধা। চলবার সময় পাগড়ি জড়ানো, না হলে খালি মাথা। কাছেই একটা কম্বল পাট করা দেখে সাহেব,—আমার সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দিতে। পরিচয়ে আমায় বাঙ্গালী জেনেই সাহেব যেন কৌতূহলে আবিষ্ট হয়ে বললেন, How strange! I know you people are a terror to the Govt.—I was requested by the Commissioner Mr. Ronald Pierce to keep an eye and beware of Bengalees and now I am to deal with one.

আমার মনে হলো সাহেব কখনই ইংলিশম্যান নয়—তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, উরোপের কোন্ দেশের লোক তুমি, ভদ্র? সাহেব বললে—আমি আইরিশ, চার বৎসর ভারতে এসেছি ;—প্রথমে ১৯১০ সালে এসেই আমি হিন্দী শিখলাম ;—হিন্দী জানলে সাধারণের সঙ্গে মেশবার সুবিধা হয়। তারপর থেকে আমি সারা উত্তর ভারত ঘুরেছি। দু বছর আগে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখেছি—

আমি তখন সরকারী কাজ নিয়েছিলাম। আমি সারা উত্তর ভারতের প্রায় সবই দেখেচি বলতে পারি। হিমালয়ের অনেক স্থান দেখেছি। দার্জিলিং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার মত তুষার দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এবার দক্ষিণ ভারত দেখবো মনে করেছি। ইত্যাদি ইত্যাদি—

কলকাতার কথা হতেই তিনি বললেন,—সেখানে বিপিন পাল, অম্বিকা মজুমদার, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রভৃতি তখনকার বরেণ্য পুরুষ দেশসেবকদের সঙ্গে মিলেছেন। শেষে ভয়ানক খুসী হয়ে উঠলেন যেমনি আমি ই. বি. হ্যাভেলের নাম করলাম—আমাদের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। জানলেন আমি শিল্পী। আমার খাতাখানিও তাঁর নজরে পড়লো। তার মধ্যে ইন্দ্রীর একটি পেন্সিল স্কেচ ছিল, দেখে ভারি খুসী।

এবার সাহেব একটু বিশ্রাম নিয়েই ঘোড়ায় উঠলেন এবং তাঁর আরদালীকে বললেন,—চিজ বস্ত উঠাকে আগে ভেজো, হাম্ ইধার ঠারনে নহি মাংতা। আগাড়ি, মাইল করিব্ চলো, বন্‌কোটারী গাঁওমে রাতকো রহেঙ্গে। প্রফুল্ল মুখে একবার ইন্দ্রীর দিকে ফিরে একটু হেসে হাতটি তুলেই বললেন—রাম, রাম। ইন্দ্রী কিন্তু, রাম রাম করলে বটে—তা ছাড়া শেষে আবার বললে, কেঁও সাহেব, ইঁহা রহনেকো ডর্ লাগা? সাহেব মুচকে হেসেই বললেন—জী হাঁ, বো চিজকো হাম্ বহোত ডরতে।

সাহেবের ঘোড়া তখনও গতি পায়নি,—পায়ে পায়ে চলছিল—অল্প খানিকটা পথ যেতেই সামনে বেশ লম্বা-চওড়া এক সাধু মূর্তি দেখা গেল,— প্রৌঢ় বয়স, বোধ হয় ষাট বৎসর,—চমৎকার চেহারা, সঙ্গে চেলা একজন, সাহেবের সামনে পড়লেন। সাহেব সাধুর দিকে একটু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে ঘোড়ার গতি সংযত করলেন,—ঘোড়াটা যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েচে, সাধু একটু দ্রুত এগিয়ে গেলেন,—একটু মুচ্‌কে হেসে বললেন—এলাহাবাদ কুম্ভ মেলেমে আপকো দেখা থা?

সাহেব বললেন—ঠিক, ঠিক—ইয়াদ আপ কো বড়ি ঠিক। সাহেব যখন কুম্ভ মেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যদি এই সব সাধুর মধ্যে এমন কাকেও পান, যিনি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন;— এমনই সময় সাধুটি সাহেবের সামনে এসে বললেন,—সাহেব, কি ভাবচো তুমি? সাহেব বললেন, তুমিই বলো আমি কি ভাবচি। তখন সাধু ঠিক তাহার মনে যা হচ্ছিল সেই কথাই বলে দিলেন। তখনই সাহেব বললেন, ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম বটে; তা আমি আরও জানতে চাই। তখন সাধু বললেন,—এখন আমি চলে যাবো এখান থেকে, এখন কোন কথাই হবে না। এর পর আর একবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তখন তোমার কথা শুনবো। সাহেব বললেন,—সে দেখাটা কোথায় হবে? সাধু বলেছিলেন, রাজপুতনায় কোথাও হবে। সাহেবের সে কথা এখন মনে পড়লো। সেই দু বৎসর পর দেখা তো হলো। সাহেব চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এখন তিনি সাধুকে নিয়ে যাবার চেষ্টাই করলেন। বললেন,—

এখান থেকে থোড়াই দূরে আমার তাঁবু,—সেখানেই কথা হবে। সাধু বললেন, আমার এখন যাবার বড়ই দরকার ঐখানে, বলে উদাসীদের তাঁবুর দিকে দেখিয়ে দিলেন। শেষে বললেন,—কাল এখানকার কাজ শেষে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। বলেই সাধু চলতে লাগলেন। সাহেব সঙ্গে যেতে

যেতে বললেন,—আমার জায়গাটা বন-কোটারী—যেন মনে থাকে,—এখান থেকে অল্পই দূর।

মুচকে হেসে সাধু চললেন পন্থদের তাঁবুর দিকে।

এর পর যে ব্যাপার ঘটলো তা যেমনই অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর। সাধু এসে ঐ বটগাছ তলায় বসলেন। কাকেও ডাকতে হলো না;—অল্প কতক্ষণের মধ্যেই প্রথমে অতি বৃদ্ধ ভীমরাজ এলেন, সঙ্গে সঙ্গেই দেবরাজ, আর মেঘরাজ তাঁকে ধরে নিয়ে এলো, আর ইন্দ্রী নাচতে নাচতে এলো। সবাই নতশিরে সাধুর পাদস্পর্শ করলে; সাধুও পন্থদের সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেখানে যেন আনন্দের বাতাস বইতে লাগলো। আমার মনে হলো, এই সাধুটি যাযাবর দলের কেউ হবেন,—কারণ যে ভাষায় তাদের মধ্যে কথা হতে লাগলো সেটা তাঁদের নিজেদের মধ্যেই প্রচলিত একটা ভাষা। চমৎকার ভাষা, সেটা মারহাটি, গুজরাটি, সিন্ধি, হিন্দী কোন ভাষাই নয়,—কেমন এক বিচিত্র ভাষা। সেই ভাষায় তারা এমনি আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন যে আমি কিছু না বুঝলেও ওদের আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেই ওদের সঙ্গেই মেতে গেলাম। ছিলাম আনন্দেই, অথচ মনে মনে চুপচাপ ভাবছিলাম এদের সঙ্গে সাধুর সম্বন্ধটা কি হতে পারে? খানিক পরে ইন্দ্রী যখন আমার খাবার দিতে এলো তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এই স্বামীজী কে,—এর সঙ্গে তোমাদের কিছু সম্বন্ধ আছে নাকি?

হাঁ হাঁ, স্বামীজীনে হামার। জ্যেঠা, আমার বাবার বড় ভাই, ভীমরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। সংসার ত্যাগী,—জয়পুর রাজ্যে গলতা গদির গুরু মাধবাচার্যের শিষ্য, বাচপনসে। আশ্চর্য মানুষ। উনি কখনও কখনও আপনিই আসেন, উনি ঠিক টের পান যেখানে আমাদের তাঁবু পড়ে। কিছুদিন থাকেন, উপদেশ দেন, তারপর আপন ইচ্ছামত চলে যান আমাদের আশীর্বাদ করে। উনি ভগবানে প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছেন, উনিও ভগবান হয়ে গেছেন।

এতটা বুঝিয়ে আমাকে বলার পর ইন্দ্রী আমার দিকে এমন ভাবে খানিক চেয়ে রইলো যেন একটা বিশেষ কথা ভাবচে সে আমায় বলবে কিনা, আমি বুঝবো কিনা, আমায় বলা সঙ্গত হবে কিনা, সেই সব কথাই যেন ভাবচে মনে হলো।

আরও মনে হলো,—একটা গুরুতর বিষয় যেন তাকে বেদনা দিচ্চে। কিছু তো বুঝতেই পারিনি কেবল তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে অপেক্ষাই করচি কতক্ষণে তার মুখ থেকে কথাটা বার হবে। শেষে আমার কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত মৃদু স্বরেই বললে—

আপ ক্যা জানতে, জেঠাজি কিসবাস্তে ইসি বখৎ ইধার আয় গেয়া? শুনে তখন আমি অবাক হয়েই বললাম, মুঝে ক্যা মালুম? তার মুখখানি একবার একটু ম্লান হয়ে গেল, অন্তরে যেন সে একটা বেদনা অনুভব করচে এই রকমই আমার মনে হলো। একটু সামলে নিয়েই সে মৃদুস্বরে বললে,—আজ পূর্ণিমা, দাদাজী আজ শরীর ছোড়েঙ্গে—ইসবাস্তে জেঠাজী নে ইহাঁ আগয়া।

আমার কি যে হলো বলতে পারবো না। দুপুরের সময় যখন স্বামীজী এসে বটতলে বসলেন, আর বৃদ্ধ ভীমরাজ, দেবরাজ, মেঘরাজ সবাই তাঁকে পাদস্পর্শ করেই প্রণাম করলে,—আমিও সব শেষে প্রণাম করলাম স্বামীজীকে।

প্রথমেই পিতা ভীমরাজ এসে পুত্রের পায়ে হাত দিয়ে, একজন সাধারণ শিষ্যের মতই প্রণাম করলেন। এ ব্যাপারটি বাংলার মাটিতে অচিন্তনীয়,—এমন কি কল্পনাতীত বললেও বেশী বলা হয় না। কি করে পিতার প্রণাম গ্রহণ করবেন, তা ভাবতেই পারি না। কিন্তু এ তো হলোই,—এই কর্মক্ষেত্রে স্বচক্ষেই দেখলাম। তারপর আরও চমৎকার কথা,—পিতা দেহত্যাগের কাল জানতে পেরে পুত্রকে আনিয়েচেন অথবা সন্ন্যাসী-পুত্র পিতার অন্তিম জানতে পেরে এসে গিয়েছেন তাঁর আত্মার সদ্গতির জন্য, সাধনোচিত ধামে প্রয়াণের জন্য যিনি আজ আটচল্লিশ বৎসর বিপত্নীক হয়ে তাপসজীবন যাপন করে এসেছেন।

সেই রাত্রে সবার সঙ্গে আমিও মহাত্মা ভীমরাজের দেহত্যাগ দেখলাম।

পূর্ণিমা তিথি,—সন্ধ্যার পর একপাশে দেবরাজ আর এক পাশে মেঘরাজ, ভীমরাজকে ধরে নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই প্রাঙ্গণের উপর বিছানা পাতা, তাঁর উপরে তাঁকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলে পর তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। জ্যেষ্ঠ, সন্ন্যাসী-পুত্র বিছানার পাশেই একখানি আসনের উপর বসেছিলেন। বোধ হোলো এখানে এর মধ্যে ইন্দ্রী ব্যতীত নারী কেউ ছিলনা। সে পায়ের তলায় জমিতেই বসলো। সব চুপচাপ। একদিকে দেবরাজ অন্যদিকে মেঘরাজ,—আমি খানিক দূরে বটগাছের কাছেই বসে আছি।

জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ভাসচে, এমন আলো যেন আগে কখনও কোথাও দেখিনি, আর নিস্তব্ধ রাত্রির এতটা গাম্ভীর্য কল্পনার অতীত। কাল চলেছে, প্রবাহের মতই তার গতি ঐ নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে দিয়েই। দ্বিপ্রহর হোলো, চন্দ্র ঠিক যখন মাথার উপরে,—সন্ন্যাসী আসন থেকে উঠে পিতার কানের কাছেই অত্যন্ত মৃদুস্বরে কিছু বললেন। তখন ভীমরাজ,—আমায় বসিয়ে দাও, বলে হাত দুটি তুললেন। দুইজন দু'দিক ধরে তাঁকে বসিয়ে দিলে।

চমৎকার বসা ; একেবারে সোজাই ব'সলেন, পিছনে কোন অবলম্বন নেই, প্রাণায়ামী যোগিবর যেমন পদ্মাসনে স্থির হ'য়ে বসে আত্মস্থ হন সেই-ভাবেই ভীমরাজ ব'সলেন, দুটি হাত দুই জানুর উপরেই রইল। ক্রমেই তিনি স্থির হয়ে গেলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসী পুত্রও আপন আসনে স্থির। ক্রমে চাঁদ ঢলে পড়লো পশ্চিমে। সেই সময়ে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে একটি ধ্বনি উঠতে লাগলো। এক ধারায় তাঁর ধীর কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে উদর থেকে নির্গত সেই ধ্বনি চারিদিকেই বিস্তৃত হয়ে যেন বায়ুমণ্ডল কাঁপিয়ে তুললে। সবার অন্তরেই সেই ধ্বনির কম্পন, হরি, হরি—ওঁ—ওঁ—ওঁ—ওঁ—এইভাবে ঐ ধ্বনিময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যথাকালে কেবল একবার মাত্র—শ্বাসের প্রান্তে হরি-ওঁ,—সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন চমকে উঠলেন,—আর একখানি পা স'রে নেমে আসনচ্যুত হয়ে গেল।

দেহত্যাগ ঘটলো ঠিক ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। মুখখানি বুকের উপর ঝুঁকে পড়লো। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে, হরি-ওঁ, ব'লে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো,—সন্ন্যাসীও ছিলেন ঐ প্রদক্ষিণের সময়। প্রভাত হতেই তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হোলো। আর ঐ সময় মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আর প্রদক্ষিণ করে শেষে প্রণাম করলে।

দেখি, সন্ন্যাসী তখনই চলে গেলেন আর ফিরেও দেখলেন না পিছনে,—কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথাও বললে না।

বেলা হতেই আমি দেখলাম দাহ, বুঝলাম ঐ বাবলা গাছটি কাটা হয়েছিল কেন!

এমন মৃত্যু আগে আর কোথাও দেখিনি।

পরে মেঘরাজের কাছে শুনেছিলাম সব কথাই। ভীমরাজের বিবাহ হয় জয়পুরে উদাসীদের এক পরম রূপবতী মেয়ের সঙ্গে। চিরদিনই উদাসীরা যাযাবর, কিন্তু প্রথমে মেয়ের বাপ ও ভায়েরা ভীমরাজকে পছন্দ করেনি। তখন মাধবাচার্য স্বামীই ভীমরাজের অসাধারণ গুণ ও শৌর্যবীর্যের কথায় তাঁদের আকৃষ্ট করেন—তাইতেই তাঁরা ভীমরাজকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। তারপর স্বামীজী ভীমরাজকে বলেন, তোমার প্রথম পুত্রটি ভগবানের জন্য উৎসর্গ করবে এই প্রতিজ্ঞা যদি করো তা হলে তোমাদের এই বিবাহের ফল শুভ হবে। তিনি তাই-ই করেছিলেন। যখনই আমার প্রথম ভাইটি হোলো,—আচার্য স্বামী এলেন, নিয়ম মত উৎসর্গ করলেন তাকে ভগবানের নামে। তারপর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন গলতায় তাঁর গদিতে। তখন থেকেই তিনি সন্ন্যাসী।

আত্মার পরশ

প্রত্যেক উদ্যমশীল ব্যক্তির কাজে প্রতিভার খেলা কিছু আছেই এটা আমরা ধরে নিতে পারি। প্রতিভাবানকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি প্রাণে-প্রাণে।

পৃথিবীর সভ্য সমাজে প্রতিভার আদর সর্বত্রই, ওটি না থাকলে,—সভ্য সমাজ অন্ধকার। অনেকের ধারণা প্রতিভা বাগ্দেবীর বিশেষ অনুগ্রহ। ঐ শক্তি কোন বিশিষ্ট মানবের মধ্যে যথাকালে বিকশিত হয়, ঘষে-মেজে চেষ্টা চরিত্রে.. ফলে হবার নয়। তবে পরিমার্জনের ফলে অথবা প্রবল চেষ্টার দ্বারা যে খানিকটা হয় না তা মনে হয় না ; কিন্তু পূর্ণ বিকশিত প্রতিভার যে স্ফূর্তি বিদগ্ধ জনের প্রাণে প্রাণে অপূর্ব রসের প্রবাহ সৃষ্টি করে, রসিকের মর্মে যে বিচিত্র রসানুভূতি জাগায়, ভাবকে জীবন্ত ক'রে তোলে, সেই প্রতিভা যথার্থই ভগবানের প্রসাদ,—এ আমাদের অন্তরের কথা। তবে এইটি কালের মধ্যে দিয়েই একজনের জীবনে বিকশিত হয়। অনেক সময়ে বাল্যজীবনে একজন প্রতিভাশালীকে চেনা যায় না—এমনও হয় কোন কোন ক্ষেত্রে।

অবিনাশ ছিল আমাদের সহপাঠি ; তার পড়াশুনা বরাবর খুব ভালোই—কিন্তু তার প্রধান যে গুণে আমরা আকৃষ্ট হয়েছিলাম সেটি তার নির্বিরোধী স্বভাব, আর সবার কাছে নমনীয় ভাবটি। যথার্থই ক্লাসের সকল ছাত্রের ঐটির অভাব, এটা আমি তখন থেকে স্পষ্টই লক্ষ্য করে আসছিলাম। বরাবরই দেখে আসছি, ক্লাসের যারা ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড বা থার্ড বেঞ্চে বসে, যার যেটুকু আছে তাই নিয়ে জাঁক আর আস্ফালনের সীমা নেই। যার সুখসৌভাগ্যের কিছু নেই তার অভিজ্ঞতার গর্ব। এক সঙ্গে জড়ো হওয়া তার তখনই আরম্ভ হয়ে গেল ;—ধন, মান, কৌলিন্য, সম্ভ্রম, কর্ম, জ্ঞানাদি নানা ঐশ্বর্যের গর্ব। কিন্তু অবিনাশ একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। সবার সঙ্গেই তার ব্যবহার হয়েছে, কথা-

বার্তাও সকলকার সঙ্গেই সমান ছিল,—কিন্তু তার মুখ থেকে কখনও আমরা কোন বিষয়ে গর্ব, জাঁক বা অহঙ্কারের কথা শুনি নি।

একজন আরম্ভ করলে—এই শুনছিস্ ! আমরা নৈকষ্য কুলীন, আমার ঠাকুরদাদা মহা পণ্ডিত, পাঁচটি বিবাহ, তোরা কি জানিস ! আর একজন,—জানিস্ ! আমাদের দু'খানা গাড়ি আর যা দুটো ঘোড়া—কি আর বলবো, দেখতে যেন সায়েব বাড়ীর ঘোড়া। আর একজন বললে,—আমাদের বাড়িতে এতদিন গ্যাসলাইট ছিল, এখন ইলেকট্রিক ফিটিংস আরম্ভ হয়েছে, সুইচ টেপো আলো জ্বলে উঠল, দেশলাইয়ের কিছু দরকারই নেই, পরে অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে,—তোদের বাড়ী কি আলো রে, গ্যাস বুঝি ? অবিনাশ বললে, না ভাই, আমাদের সবই কেরোসিনের, হ্যারিকেন লণ্ঠন। এই ভাবের কথা। সে চুপটি ক'রে ঠায় বসে বসে সবার কথাই শুনছে, কিন্তু কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করলে কখনও কথা বার হ'ত না তার মুখ থেকে।

একই পাড়ায় আমরা থাকতাম,—সেইজন্য আমার সঙ্গে তার মেশামিশি ছিল একটু বেশী। যখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন তার বাবা মারা যান। কিছুদিন পর যখন সে মাথা নেড়া অবস্থায় ক্লাসে এল, একদল হাঁ হাঁ ক'রে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, একটা টুপী পরিস নি কেন ? একজন বললে, নেড়ামাথা নিয়ে এলি কি ব'লে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সে কিন্তু কারো কথায় উত্তর না দিয়ে এমন একটু হাসলে তাইতেই সবার কথার উত্তর হয়ে গেল। তখন থেকেই আমি কিন্তু তার উপর একটি করুণ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপর যখন তার সঙ্গে দেখা হ'ত, আমার মনে হ'ত ও আমাদের চেয়ে ঢের বড় এবং মহৎ।

লেখাপড়ায় তার আন্তরিক যত্ন ছিল, যা আমার শুধু নয় অনেকেরই ছিল না। দেড় বৎসর পরে যখন সেবার এনট্রেন্স পাশ করলে, এমন বেশী নম্বর পেয়েছিল, ইউনিভারসিটিতে সে বছরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে। তাই স্কুল থেকে তাকে সৎচরিত্রের জন্য একখানা আর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে একখানা—দু'খানা স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছিল। ছোটটা আড়াই ভরি আর বড়টা ছয় ভরির পদক। অবশ্য সোনা তখন সস্তা ছিল সত্য,—তাহলেও সে ঐ দু'খানা পদক পেয়ে যা করলে তাইতেই আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে সে কখনই আমাদের মতো সাধারণ ছাত্র নয়, সে ঈশ্বর অভিপ্রেত কোন কাজ করতেই এসেছে।

আমাদেরই প্রতিবেশী এক অত্যন্ত গরীব ভদ্রলোক, প্রৌঢ়, কারেন্সি অফিসে কাজ করেন, সাতাশ টাকা মাইনে,—তাঁর মেয়ের বিবাহ। কন্যাদায়ে তাঁর বিপন্ন অবস্থা আমরা দেখেছি। অবিনাশও সব খবর জানতো, বিশেষ তার বাড়ী থেকে তিন চার খানা বাড়ীর পরেই তাঁদের বাড়ী। পরিচয়ও ছিল বেশ। তিনি আত্মসম্মান খুইয়ে, ভিক্ষা ক'রে মেয়েটির বিবাহ দিচ্ছেন। যেদিন সে ঐ মেডেল দুখানা পেলে, স্কুল থেকে একেবারে তাঁদের বাড়ী গিয়ে উঠল। ভিতরে গিয়ে চুপিচুপি ভদ্রলোকটিকে অবাক ক'রে যখন ঐ দুখানি সোনা তাঁর হাতে দিলে, অবিনাশের মুখের দিকে চেয়ে তিনি নির্বাক ; যেন অবিনাশ কি করছে অথবা কি তাঁর হাতে দিয়ে সে বলছে কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না, এমন ভাবেই চেয়ে রইলেন অবাক বিস্ময়ে।

অবিনাশ ধীরে ধীরে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে মৃদু কোমল কণ্ঠে

বললে,—দেখুন, এটা নিয়ে আপনার মেয়েকে কিছু একটা গড়িয়ে দেবেন। তারপর তাঁর পায়ে হাতটি রেখে বললে,—আমার একান্ত অনুরোধ এটা নিয়ে হৈ চৈ করবেন না,—ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, না হ'লে আমি বড়ই দুঃখ পাব।

এ সম্বন্ধে কোন কথা সে বাড়ীর কাকেও, এমনকি মাকেও জানায় নি। অনেক দিন পরে মায়ের কাছে গোপনে বলেছিল।

এই পর্যন্তই অবিনাশের কথা বা আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কারণ এর পর আমি আর ঘরে থাকিনি। বাড়ী ছেড়ে বাইরে বাইরেই থাকতাম, ঘুরে বেড়াতাম এ-দেশে ও-দেশে। প্রায় দুবছর পরে একবার এসে কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে মাত্র কয়েক দিন ছিলাম। শুনলাম, অবিনাশেরা এপাড়া থেকে অনেক আগেই উঠে গিয়েছে, কোথায় আছে সে, কেউ বলতে পারলে না। ভারি ইচ্ছা ছিল তাকে একবার দেখবো। তা হ'লনা—সে যে কি করছে এখন জানতেও পারলাম না। আমি এখন নিজের ভাগ্যচক্রে, নানা বিপর্যয়ের মধ্যেই ওঠাপড়া করতে করতে দশ-বারো বৎসর কাটিয়ে দিলাম।

তার মধ্যে পাঁচ বছর আর্ট স্কুলে, তারপর পর্যটন আর সাধুসঙ্গ।

এখন আমি দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানেই ঘুরছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে ত্রিবেন্দ্রামে এসে পড়লাম। খুব বড় না হ'লেও চমৎকার রাজ্য এই ট্রাভাংকোর। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি এবং দেবস্থানও আছে। আবার আধুনিকতায়,—বোধ হয় জয়পুর, মাইশোর, বরোদা প্রভৃতি ভারতের বড় বড় রুলিং প্রিন্সদের রাজ্যের অন্যতম ট্রাভাংকোর, সংস্কৃতির দিক থেকেও কম নয়। নরনারী নির্বিচারে বিদ্যাধিকারে এতটা অগ্রগতি, এমন আর কোথাও দেখিনি। মহারাজার একটি মিউজিয়াম এবং চিত্রশালা, তাইতে বর্তমান ভারতের শিল্পোৎকর্ষের যত রকমের দৃষ্টান্ত আছে এখানে তার সংগ্রহ প্রচুর। তা ছাড়া বহুকালের প্রাচীন অমূল্য শিল্পকীর্তি ঐ অনন্ত শয়নে নারায়ণ মূর্তি,—তার যে মন্দির তার তুলনা নেই। কয়েকদিন থেকে এখানে সব কিছুই দেখবার পর কন্যাকুমারীর পথে যাত্রা করলাম।

উত্তর-দক্ষিণে এই নগরের বুকের উপর দিয়ে নদীর মতই এক প্রশস্ত জলপথ,—বাণিজ্য ব্যপদেশে অসংখ্য নৌকার যাতায়াত। সে নৌকাও বিচিত্র গঠনের, সে ধরনের নৌকা আমাদের উত্তর বা পূর্ব ভারতের কোথাও দেখা যাবে না, তার চেহারাই আলাদা।

এই দীর্ঘ বিশাল জলপথে মধ্যে মধ্যে সেতু। অপূর্ব এই ট্রাভাঙ্কোর রাজ্য। ত্রিবেন্দ্রামকে ওরা ট্রিভাণ্ড্রামই বলে।

রাজধানী ত্রিবেন্দ্রাম থেকে একটি প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য জলপথ ও সেতু অতিক্রম ক'রে চলে গেছে সাগরকূলে কন্যাকুমারী মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত। নানা-দৃশ্য দেখতে দেখতে সেই পথেই চলেছি। মধ্যে মধ্যে ছোট বড় গ্রাম,—তার ভিতর দিয়ে পথটি বোধ হয় বাহাত্তর মাইল হবে। ঐ রাস্তা এখন মোটর রোড হয়ে গিয়েছে, তখন মোটামুটি পুরনো রাস্তা একটি ছিল। গ্রাম ছেড়ে, পথের দুদিকেই বাগান আর কৃষিক্ষেত্র। মাঝে মাঝে এক একটি গোপুরমের উচ্চ চূড়া দূর গ্রামের মধ্যে, পথের ধারে বড় বড় গাছের ফাঁকে দেখা যায়। চমৎকার দৃশ্যের মধ্যে মুক্ত ভাবটাই সর্বক্ষণই যেন প্রাণে জাগায়। চলতে চলতে, প্রথম রাত্রে এক গ্রামে ছিলাম ; দ্বিতীয় দিনে বৈকালে নাগরকয়েল নামে একটি বেশ বড় গ্রামে এসে পড়লাম। এখান থেকে সাগরকূলে কন্যা মন্দিরে পৌঁছাতে

আরও একবেলার পথ। এখানেও আছে দেখলাম একটি বিশাল মন্দির—প্রাচীন শিবেরই স্থান। গোপুরম দেখেই পা আমার সোজা পথ ছেড়ে মন্দির পানেই চললো।

গোপুরম অতিক্রম করেই প্রাঙ্গণ, তার চার দিকেই দীর্ঘ পাষাণময় দরদালানের মতই। তার স্তম্ভগুলি অপূর্ব শিল্প-কীর্তি, যেমন দক্ষিণের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিতে দেখা যায়। আরও ভিতর দিকে পথের ধারেই পাষাণময় এক চত্বর—সেই চাতালের উপর এক জায়গায়, বেশ দীর্ঘ শরীর এক সাধু বসে আছেন। দেখেই মনে হ'ল অদৃষ্ট ভালো—সোনায় সোহাগার মতো। একে এই মন্দির আশ্রয় তার উপর সাধুসঙ্গ লাভ। ভগবানের কৃপা আমার উপর অসীম। সাধু দেখে প্রথমে মনে হ'ল হয়তো এই দেশেরই মানুষ,—তারপর দেখলাম তাঁর মাথা থেকে সর্বশরীরে কোথাও কোন প্রকার ছাপমারা নেই, তখন মনে হ'ল দাক্ষিণী সাধু নয়। তা তিনি যেখানকারই হোন আমার কাজ আমি করলাম—অর্থাৎ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েই—প্রণাম ক'রে,—একেবারে তাঁর বেশ কাছে গিয়ে বসলাম। সাধুর মুখখানি আমায় আকৃষ্ট করেছিল।—দাড়ি গোঁফ আছে বটে কিন্তু জটাজুট নয়। পরিষ্কার মুখ, অযত্নরক্ষিত নয়,—দাড়ি গোঁফ চুল রুক্ষ হ'লেও পরিপাটি—শরীর তাঁর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; গৈরিক নয়—সাদা কাপড়। চুলগুলি বড় বড়,—মাথার একদিকে চূড়া বাঁধা। প্রশস্ত কপালের উপরে তিনটি ভস্মরেখা, ত্রিপুণ্ড্র। কোমল দৃষ্টি. বর্ণ তার উজ্জ্বল শ্যাম। বেশ পুরু আসনের উপর নরম মৃগচর্ম একখানি পাতা, আপন আসনেই বসে আছেন।

তিনি বসেছিলেন চুপচাপ। দেখতে দেখতে একটি বৃদ্ধ লোক এলেন তাঁর সামনে—মালাবারি ভাষায় কিছু বললেন। তিনিও উত্তর দিলেন সেই ভাষায়, তারপর চলে গেলেন বৃদ্ধটি।

ভাবলাম ইনি বোধহয় মালাবারি। কোন্ দেশের সাধু ঠিক করতে খানিকক্ষণ গেল বটে কিন্তু বরাবরই তাঁর সেই মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই পারিনি। কেমন একটা যেন বড়ই নিকট সম্পর্কের টান মনের মধ্যে স্পর্শ করছিল, আর যেন স্মৃতিকে আলোড়িত ক'রে আবার স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তিনিও নিশ্চয়ই একটা কিছু করছিলেন আমায় নিয়ে নিজের মনে, আমার তাই-ই বোধ হ'ল।

ঠায় তাঁর মুখের পানে চেয়েই ছিলাম। বড়ই যেন পরিচিত মুখ, যেন কোথায় দেখেছি, কিছুতেই স্মৃতির মধ্যে আনতে পারচি না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই যেন, বললেন পরিষ্কার বাঙ্গলায়, আপনি বাঙ্গলাদেশ থেকেই আসছেন বোধকরি। আশ্চর্য ! গোঁফ দাড়ি আর ঝাঁকড়া চুলে কি অদ্ভুত পরিবর্তন আনে একজনের মুখে। যাই হোক আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ, আপনি বাঙ্গালী ? জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো,—আমাদের প্রতিবেশী সেই অবিনাশ ! তখনই বলে ফেললাম,—আরে ! অবিনাশ !—অবিনাশ মজুমদার ? উত্তরে তিনিও আমার নামটি সুন্দর ব'লে ফেললেন।

তুমি কি সন্ন্যাস নিয়েছ ? আমি বললাম,—না।

তুমি নিয়েছ নাকি ? উত্তরে সে বললে, দেখছ শিখাসূত্র সবই রয়েছে সাদাকাপড় রয়েছে, সন্ন্যাসী হলাম কি ক'রে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে

কদিন? অবিনাশ বললে, আজ কয়েক বৎসর এই দক্ষিণ ভারতেই রয়েছি—কিছুদিন হ'ল আমি ঘুরতে ঘুরতে এইখানেই এসে পড়েছি।

শুধালাম, কন্যাকুমারী দেখেছ? উত্তর পেলাম, কন্যাকুমারী থেকেই তো এখানে এসেছি, ভেবেছি এইখানেই বসে যাব; স্থানটি ভালো লেগেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সমুদ্রতীর ছেড়ে এতদূরে কেন? সে বললে, সমুদ্রতীরে বড়ই গোলমাল, বড় বেশী লোকের যাতায়াত, ঘন ঘন লোক আসে,—এখানেই বেশ ভালো লাগল। ইচ্ছা হয়, সমুদ্রে যেতে কোন বাধা নেই,—চমৎকার রাস্তা, এক বেলার পথ মাত্র, হেঁটে গেলেই হ'ল। হাঁটার সুখ আমি পেয়েছি ভাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতদিন কি করলে বন্ধু,—একটু বলবে?

সে বলে কি,—আরে! ওটা যে আমারও জিজ্ঞাসা। আগে তুমিই বল না ভাই, কতদিন পরে দেখা। সে আরও বললে,—আমার বাবা মারা যাবার পর আর বোধহয় তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে যখন ও-পাড়া থেকে উঠে আসি তখন তোমার খোঁজ নিয়েছিলাম, তোমাদের বাড়ীর লোকেরাই বললে,—তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, পাগল হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুনে হেসে ফেললাম,—আমার কথা থাক এখন তোমার কথা বল না ভাই! কি করলে এতদিন?

করলাম কাশীবাস আর বেদান্ত অধ্যয়ন, অদ্বৈত চর্চ্চা, সন্ন্যাস নেওয়া। পরে ভালো লাগল না,—তাই ঘুরতে ঘুরতে আজ ছ'সাত বৎসর উত্তর ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে এই দক্ষিণ ভারতেই এক বৈজ্ঞানিকের পাল্লায় পড়ে এখন ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে হাবুডুবু খাচ্চি।

কে ভাই তোমার বৈজ্ঞানিক গুরু—বলবে? অবিনাশ বললে, মহর্ষি রমণ,—নাম শুনেছ? বললাম, না। তখন আমি কেন, অনেকেই তাঁর খবর রাখতেন না।

এখন বুঝলাম অবিনাশ মহর্ষি রমণেরই আশ্রয় নিয়েছে। তবে গৈরিক ধারণ ওর উদ্দেশ্য নয়—আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস নিতে ও নারাজ,—সেইজন্য সাদা কাপড় রেখেছে। যাই হোক, এখন বললাম,—কাশী ছাড়লে, বেদান্ত ছাড়লে, কিন্তু এখন বলো কি গ্রহণ করলে?

অবিনাশ বললে,—আচ্ছা আচ্ছা, সব বলব, দেখাব, তুমি থাকো দিকি কিছুদিন।—মাসখানেক থাকো না ভাই আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করেই দিচ্ছি।

কাজেই কন্যাকুমারীর পথে অবিনাশের পাল্লায়ই পড়লাম, সে ঠিক তালেই আমায় আটকে ফেললে।

থাকবার ব্যবস্থা সে করে দিলে চমৎকার। যেখানে সে থাকে সেখানে নয়, একখানা ছোট ঘর দিলে আমায় মন্দিরের চত্বরের মধ্যেই। সেখানে সব হলো, খাওয়া দাওয়া, স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত বাইরে যাতায়াত, যাতে আমার কোন রকম অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থাই করলে সে। এখন এ-কথাটি বলবার যো রইলো না যে, আমার এই বিষয়টি একটু অসুবিধা হচ্ছে। অথচ তার নিজের নিত্য কর্মপদ্ধতিতে ব্যতিক্রম যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই প্রথম ও প্রধান। অবশ্য এ কথাটাও ঠিক যে, যেভাবে সে ওখানে জীবন যাপন করছে তাতে ওখানকার লোকের শ্রদ্ধার সীমা নেই তার উপর। ওর মুখের একটি

কথা, একটি আজ্ঞা পাবার জন্য সবাই জোড় হাতে অপেক্ষায় সব সময় রয়েছে, যতক্ষণ সে ঐ আসনে বসে সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার রেখেছে।

সে যে গভীরভাবে কেবল আসনেই বসে থাকত তা নয়। ঐ আসনে— যেখানে তাকে প্রথম পেয়েছিলাম, ওখানে বসবার সময় ছিল একটা। খাওয়ার পরেই সে ঐ আসনে আসত, বিকাল অবধি থাকতো ওখানে। অবিনাশের পাল্লায় পড়ে গেলাম, মানে আমায় পেয়ে অবিনাশ শুধুই যে আটকে রাখলে তা নয় আমি যে এতদিন কি কাজকর্ম করেছি, কোথা ভ্রমণ করেছি কত সাধু দেখেছি,—সবার চেয়ে কাকে বেশী ভালো লেগেছে আর আমার নিজের জ্ঞানানুসন্ধান, ভজন-সাধন তপস্যা কতটা হয়েছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি কী পেয়েছি সব কিছু খুঁটিনাটি পেট থেকে বার করে নিলে। যা কিছু গত সাত বৎসরের সাধুসঙ্গের ইতিহাস, তার মধ্যে অঘোরী, মহেশ্বরী মা, বামা ক্ষেপা, শেষে অবধূত, মায় কেশবানন্দের আশ্রমে থাকা, তাঁর কথা যা কিছু জানতাম সে সব-কিছুই শুনে নিলে। অবশ্য অবিনাশের কাছে বলতে আমার প্রাণ থেকে প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছিলাম তাই—আনন্দেই তাকে সবকিছুই বলতে পেরেছিলাম।

গোড়া থেকে মানে, আমাদের আর্যমিশনের সেই স্কুল থেকে অবিনাশকে যেভাবে যেটুকু দেখে এসেছি, এখন দেখলাম তারই পরিপক্ক অবস্থা—আসলে প্রকৃতি তার ঠিক সেরকমই আছে, নির্মল মনের গাম্ভীর্য সেটিও ঠিকই আছে।

আমার কথা তো সবই শুনলে, এর পর এখন তোমার কথাটা একটু জানতে দাও, আমি বললাম।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানবে, আর তা জানবে ব'লেই তো বিধাতার যোগাযোগ এখানে এই ভারতের শেষ প্রান্তে আমরা আজ মিলেছি। আচ্ছা, কাল আমার কথা হবে, কেমন? তারপর একটু হেসে—এত তাড়াতাড়ি কেন, জলে তো পড়োনি। ব'লেই নিজের কাজেই গেলো সে।

কথার তিলমাত্র বেঠিক হবার যো নেই। কখন তার সময় হবে ভাবতে ভাবতে সারাদিন কাটলো। ঠিক পরদিন সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের ভোগ আরতি শেষ হ'লে পর অবিনাশ আমায় নিয়ে চললো বিশাল এই ঠাকুর মন্দিরের এক অংশে। দেখলাম, দীর্ঘ বিশাল এক হল, যাকে আমরা দরদালান বলি, তার শেষ দিকে খানিকটা বেড়া দিয়ে পৃথক একখানা ঘর ক'রে নেওয়া হয়েছে। ঘরখানিও বেশ বড়। বাইরের কেউ এঘরে আসে না। যখন ঘরের ভিতর থাকেন তখন ভিতর থেকে বন্ধ,—যখন বেরিয়ে যান তখন বাইরে থেকে বন্ধ। ভিতরে এক দিকে দেয়াল-ধারেই একখানা নেয়ারের খাটিয়া—তার উপর শয্যা রচনা করা আছে। মাথার দিকে ছোট চৌকীর উপর একটি বাতিদান, আবার তার পাশেই প্রকাণ্ড এক পিতলের পিলসুজ, তার উপরে প্রদীপেরও আয়োজন আছে। তবে অবিনাশ এখন বাতিই জ্বাললেন।

ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেজের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি কাঠের বড় চৌকী—তার উপরে একটি দ্বাদশ দল পদ্ম, একেবারে খোদাই মনে হল। চমৎকার শিল্পকীর্তি। ছয়টি বড় পাপড়ি, আর দুইটি বড় পাপড়ির মাঝে একটি ক'রে ছোট পাপড়ি। মনে হল চৌকীর তলায় ফাঁক নয়, সবটা নিরেট একখানা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরী ঐ আসন। চৌকীর কেন্দ্রে একটি সরু লাইনের চক্র প্রায় ছয় ইঞ্চি তার ব্যাস, তারই কেন্দ্রে আবার একটি শ্বেতবর্ণ

বিন্দু একটি পয়সার চেয়ে বড় নয়। ঘরে বাতির আলোয় এইটুকুই দেখা গেল। এখনও পর্যন্ত অবিনাশ একটিও কথা কয়নি, কেবল আরতির পর প্রণাম শেষে সে আমার হাতখানি ধরে স্নেহভরে বলেছিল, এবার এস। আর এখন বললে, তুমি এখানে বসো একটু তৈরী হয়ে নি, তারপর কথা হবে কেমন? ব'লেই আর কোন দিকে না দেখে কাপড়খানি খুলেই ফেললে। উলঙ্গ হয়ে কাপড়খানা বিছানার উপর রেখে মাথার বালিশটা নিয়ে দেয়ালের কোলে এক জায়গায় ফেললে। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটি বালিসের উপরে রেখে পা দুটি ঐরকম ধরে ধীরে উঁচু ক'রে দিলে উপর দিকে। শিরাসন করে হাত দুটি তার বালিশের কিনারায় রাখলে খুব আলগা। তারপর স্থির হ'ল। চক্ষু বুজিয়েই ছিল।

ঘরখানায় কোন জানলাই নেই। কেবল যে কাঠের দেয়ালটি পার্টিশান বানিয়ে ঘরখানি পৃথক করা হয়েছে প্রায় আট ফুট উঁচু তার উপর থেকে ভিতরের ছাদ অবধি স্রেফ্ দশবারো ফুট, সবটাই খোলা। ঐ মাত্র খোলা, আলো বাতাস যা কিছু ঐ স্থান দিয়েই আসে। ঘরখানি ঠিক যেন একটি বড় ঠাকুর ঘরই।

ভিতরে দেয়ালের ধারে একখানি চওড়া বেঞ্চে বসে আছি আর দেখছি। প্রায় আধঘণ্টা, সমানে স্থির ছিল অবিনাশ, তারপর ধীরে ধীরে আসন ভাঙ্গলে। ধীরে ধীরে মাথার বালিসটি নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলে—আবার মেজেতেই পদ্মাসনে বসল। অল্পক্ষণেই স্থির হয়েছিল, তারপর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরটি একেবারেই ডান দিকে বিপরীতমুখী ক'রে নিলে আবার ঐ ভাবে বাঁদিকে ঘুরিয়ে মট্ মট্ করে আড়া মোড়া ভেঙ্গে নিলে। এবার সে উঠে দাঁড়ালো। তখনও মুখে কথা নেই। আমি বসে বসে দেখচি আর ভাবচি অবিনাশের কোন কাজেই খুঁৎ নেই; ঠিক যেন ও একলাই ঘরে নিত্যকর্ম ক'রে যাচ্ছে। চমৎকার, কেউ দেখছে একজন বাইরের লোক, এ বোধই নেই তার।

এবার সেই রকমই ধীরে ধীরে আমার কাছে এল,—অত্যন্ত কোমলভাবে খুবই সন্তর্পণে তার ডান হাতখানি রাখলে আমার কাঁধে, তারপর কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বললে, তুমি তো মূর্তি মানো?

বললাম,—মানি বৈকি।

তোমার ইষ্টমূর্তি দেখতে চাও?

বললাম,—আমার ইষ্ট তো কোন মূর্তি নয়।

তবে তুমি যে নারায়ণ বলো কি মনে করে?

—বললাম, ইষ্ট যে আমার নারায়ণ, অনন্ত।

—তত্ত্বটি এখন ভালো ক'রে ধরো, আগে রূপ তারপর অরূপ। নাও—

তত্ত্বটি ত এইটি জানতাম, আমি ঐ রহস্য অতিক্রম ক'রে এসেছি অর্থাৎ আমি একস্তর উর্ধ্বে আছি,—এই রকমই ধারণা ছিল আমার মধ্যে—এখন কিন্তু অবিনাশের প্রভাবের মধ্যে এসে আর একটু ছাড় দিতে হ'ল। অবিনাশ যখন বললে, আগে রূপ তারপর অরূপ, নাও, অর্থাৎ প্রস্তুত হয়। আমি প্রস্তুত হব কি তার মুখের দিকে দেখি,—অপরূপ মূর্তি প্রথমেই! বোধ হ'ল আমার দৃষ্টির সামনে যেন ভাসছে আমার ইষ্ট রূপ। সারা স্থান এমন কি আকাশ

জুড়ে বিশাল রূপ, কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় পুরুষ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী মূর্তি। তারপর আমার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে সেই বিরাট মূর্তি আমার সত্ত্বার সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেল, আর আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ—অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ পর আমার মুখ বা কণ্ঠ থেকে, নারায়ণ শব্দটি বেরিয়ে এল, সম্বিৎও ফিরে এল। এসব দেখা বা বলার কথা নয়। কিন্তু এর মধ্যে একটি এমনই তত্ত্ব আছে, অধিকারী বিশেষের পক্ষে ধারণা কঠিন হবে না, মানুষের পক্ষে যে ভগবৎসত্তা ধারণার সম্ভাবনা বা মূর্তি দর্শন হয়, সেটি কি ভাবের।

সে রাত্রের কথা এই পর্যন্তই, অবিনাশ আমায় ঐ ঘরেই রাখলে। কথার প্রয়োজনও ছিলনা, তখন যে অবস্থা আমার তাই নিয়ে একাই আমার সারা রাত্রই কাটল।

পরদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই ছিলনা, তবুও অবিনাশ আমায় অতীব যত্নে একরকম জোর করেই প্রসাদ খাওয়ালে,—দ্বিপ্রহরে যখন প্রসাদ পাবার সময় হ'ল। ঠিক যেন আমার মা। অপূর্ব দেখলাম অবিনাশের ভাবটি, যথার্থই গুরুর অধিকার তার হয়েছে।

সন্ধ্যারতির পর আবার আমরা এলাম সেই ঘরে। পূর্বে সে যা যা করেছিল ঠিক তাই ক'রে নিল, তারপর দুজনে বসে সামনা সামনি। এখন সে বললে,—আমাদের এই ভারতে ভগবান নিয়ে নানা ভাবের সংস্কার রয়েছে নানা প্রদেশে সাধারণের মধ্যে। তবে আমাদের কথা তাঁদেরই নিয়ে,—যাঁরা যথার্থই উচ্চ অধিকারী,—যাঁরা—ভগবৎ সাধনায় জীবন বেঁধে ফেলেছেন, আর কিছুই কাম্য নেই ; তাঁদেরই উচ্চ অধিকারী বলছি। এ ছাড়া যারা ভগবান বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে টেবল টকিং করেন, অনেক পড়াশুনা ক'রে নানা বিষয় বুঝেছেন, অনেক কিছু জেনেছেন—কোন দরকার নেই আমাদের তাদের কথায়। এখন বলতো একটি কথা, এর আগে তোমার ইষ্ট-মূর্তি দর্শন হয়েছিল কি ?

বললাম,—না। শুনে সে বললে, আমি জানি হয়নি। কেন হয়নি তাও বলছি। তুমি গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছিলে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মূর্তি হয় না, মন বুদ্ধির অগম্য স্বরূপ যখন, তখন আর রূপ কল্পনার দরকার কি ? একেবারে নির্বিকল্প সমাধিতেই হবে যা হবার। কেমন এই তো তোমার কথা ?

অন্তর্যামী অবিনাশ।

বললাম, যথার্থই তাই। তখন অবিনাশ বললে, এখন কি পেলে ?

বললাম, এখন মর্মে মর্মে বুঝেছি, রূপ বা মূর্তির অধিকার পার না হ'লে অরূপ বা অনন্ত সত্তার অনুভব হবার নয়, শুধু মনে মনে কল্পনায় পার হওয়া নয়। আগে ইষ্টমূর্তি দর্শন, তারপর ঐ মূর্তি আত্মসাৎ করে নেওয়া। তারপর ইষ্টের সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তা, নিজ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেলে, তখনই জন্ম ও জীবন হবে সার্থক।

অবিনাশ আমায় গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে জড়িয়ে রইল কতক্ষণ। এখন অবিনাশ বললে, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি এতদিন কি করেছি। এই যে দৈব্য রূপের কথা, ভগবানের নামে আশ্চর্য মূতির যে সকল সংস্কার আমাদের মধ্যে ভারতের গুরু পরম্পরা চলে এসেছে—তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অন্বেষণ করেছি। আমার মহাভাগ্যফলে আশ্চর্য গুরু পেয়েছিলাম, যা প্রাণে প্রাণে চেয়েছি তাঁর

কাছে তাইই পেয়েছি, মুখ ফুটে চাইতে হয়নি। তারই একটুখানি তুমি দেখেছ।

আমি নির্বাক বসেছিলাম, স্থির আসনে, কথা বলবার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও নয়। তখন সে আবার বললে, অন্য কাকেও আমি এসব বলিনি। এখানে আসবার পর—এই তোমার সঙ্গেই প্রথম এর পরিচয় হ'ল। দেখলাম তোমার মধ্যে তত্ত্বের স্ফুরণ। তাছাড়া তোমার সব কিছুর মধ্যেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাইতে প্রবৃত্তি হ'ল তোমার সঙ্গে এ সকল নিয়ে ব্যবহারের।

আমার ভিতরের কথা তুমি জানলে কেমন করে?—জিজ্ঞাসা করলাম।

এই যে তিন দিন তোমার সঙ্গে ঘর-কন্না করলাম তাইতেই তো গুরু-কৃপায় বুঝে নিলাম। তুমি কি পদার্থ তা ভালো মতেই বুঝে নিয়েছি। তারপরও আছে, তুমিই সবার বড় ব'লে যখন রামকৃষ্ণকে ধরেছ, তখন তোমার মধ্যে ধর্মের খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে—এতে সন্দেহ নেই। তাইতো আরো ভালো মতে বুঝলাম ; না হ'লে ঐ মানুষটিকে সবার বড় ব'লে ধরবার বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি কখনই হ'ত না।

আমার ভুলও হ'তে পারে তো? তাছাড়া আমার মনে মাঝে মাঝে সন্দেহ ওঠে, সত্যই কি আমি ততটা ভক্তিমান?

শুনে অবিনাশ বললে—ভুল হ'তে পারবে না কেন মানুষ যখন, তা হোক তাতে কিছুই এসে যায় না ; কিন্তু এ জগতে অন্তত আমাদের ভারতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং ধর্মের অধিকারে যারা যথার্থ মহৎ তারা সবাই ঐ পরমহংস-দেবকেই এমন ভাবে বড় বলেই জেনেছেন। তাঁদের অনেকেরই মন্তব্য শুনেছি যে, তাঁরা বলেন, এ পর্যন্ত ভারতভূমিতে যতগুলি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে ইনিই সবার চেয়ে বেশী শক্তিধর, সবার বড় জ্ঞানী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। এভাবের গুরু আগে আসেন নি। আগে আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধর্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এমনভাবে প্রচার করেননি। তবে এটাও ঠিক, তখনকার মানুষ সরল ছিল বেশী, এত বেশী জ্ঞান ও বিদ্যানুশীলন পটু ছিল না, এখন যেমন। এখন মানুষ-সমাজ অনেক বিস্তৃত এবং জ্ঞানস্পৃহা প্রবল, আগে লোকসমাজ এতটা অগ্রসর হয়নি। সবার উপরে, এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধাক্কা খেয়েই এখনকার ভারতবাসী এতটা উন্নত হ'তে পেরেছে,—আর ঠিক সেই কারণেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্ভব হতে পেরেছে।

এক কথা মনে এল, ব'লেও দিলাম :—

তুমি যেভাবে পরমহংসদেবের ধর্ম এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছ, এসব যদি একটু খুলে সাধারণের কাছে পেঁছে দাও, তাতে তাঁকে বুঝবার সুবিধা হবে। সাহিত্যের মধ্যে দেখি, তাঁর কথা সাধারণে আলোচনা করে বটে কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারে না।

উত্তরে অবিনাশ বললে,—সাধারণকে বুঝাবার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। কোনো ভাগ্যবানের যদি গরজ থাকে, তিনি ভাবুন না কেন, মাথা ঘামান না তাঁর কথা নিয়ে, তাতে তাঁর অশেষ কল্যাণই হবে। তা ছাড়া, এসব বুঝবার একটা সময় বা অবস্থা আছে, সেই অবস্থা না হ'লে ওসব মাথায় ঢোকে না। যাক ও কথা. এখন সাধারণকে ছেড়ে তুমি নিজে একটু মন দাও তো, বন্ধু!—এই যে পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে জন্মসূত্রে জীব ভোগের কেন্দ্রে এসে পড়ে, তার পর নানা কর্ম ও ভোগাদির ফলে ত্যাগ ও জ্ঞান লাভ ক'রে জীবনচক্র

পূর্ণ ক'রে চলে যায়। আচ্ছা, বলতো দেখি, এখানে কোন্ ইন্দ্রিয় নিয়ে ভোগ বা বিলাস আরম্ভ হয়? তোমার কি মনে হয়, কোনটাকে আগে ধরতে চাও?

সহজেই আমি বলে ফেললাম, চক্ষু বা রূপ নিয়েই তো আমরা প্রথমেই আরম্ভ করি।

তত্ত্বের দিক যদি সত্যকে ধরে এগিয়ে যেতেই হয়, তাহলে বলতে হবে ঐ পাঁচটি তত্ত্ব এবং তার জ্ঞান বা বোধ বা অনুভূতি তা একটিরই খেলা, আর সেটি হ'ল মহাপ্রাণ। কিন্তু এটি আপ্ত পুরুষ ব্যতীত আর কারো ধরবার কথা নয়। তবে যদি আমার সঙ্গে এস, সহজে তোমার ধারণা হবে যে, আমাদের স্পর্শচেতনাই সবার আগে, দৃষ্টি ও শ্রবণ ফুটবার আগে থেকেই স্পর্শ অনুভূতি, —যেটি আকাশতত্ত্বের গুণ। শুনে আমি বললাম, আরও একটু খুলে বল। তোমার বলার মাহাত্ম্য আছে, শুনতে মিষ্টি লাগে।

অবিনাশ বললে, তা হ'লে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়, কেন আবার ন্যালা করো,—ব'লে অবিনাশ খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখলে। কি প্রশান্ত দৃষ্টি তার—মুখে প্রসন্ন ভাব; যেন আমার অন্তরক্ষেত্র পরিষ্কার দেখে নিলে। আমি তবুও বললাম, বলনা ভাই। তখন তারও তন্ময় অবস্থা, আমারও একটা নেশার ঘোর লেগেছিল যেন। তত্ত্বের আলোচনায় দেখেছি নেশা হয়, যেমন মাদকদ্রব্য সেবনে হয়।

তা হ'লে চল ঐখানে যেথা সৃষ্টি হচ্চে; সেখানে আগাগোড়াই স্পর্শের ব্যাপার,—এমন কি স্পর্শের চরম বলতে পারো,—কেমন? তারপর সেই ঘনীভূত পরশের মধ্যে দিয়েই জননীর সূক্ষ্ম, বিন্দু পরিমিত ডিম্বকোষের আবরণ ভেদ ক'রে জনকের কীটানুরূপ বীজ প্রবেশমাত্র, সেই মুহূর্তেই যে সূক্ষ্মতম প্রাণ-স্পন্দন আরম্ভ হয়ে গেল তাও স্পর্শেরই বিষয়, স্পর্শময় জগতে নিরন্তর ক্রিয়মাণ। তারপর ঐ সূক্ষ্মতম প্রাণশক্তি, পরশের ক্রম-প্রসারতাই জীবের বৃদ্ধির কারণ। মায়ের ঐ প্রাণময়াদি পঞ্চকোষের অভ্যন্তরস্থ তাপের পরশে সঞ্জীবিত ঐ জীব যথাকালে সুপুষ্ট হয়ে যখন ধরণীতে অবতীর্ণ হলেন তখন তার নিজ কোষগুলিও অংশত তৈরী। তখন বাহ্য আকাশ-বাতাস-তেজ-জল ও মাটির পরশের সঙ্গে সঙ্গে কোষগুলির বৃদ্ধি। আত্মা থেকে প্রাণ, সেই প্রাণের সঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের ও স্থূল ও সূক্ষ্মতম বিকাশের মধ্যে শিশু অবস্থা থেকে স্পর্শের গুণেই জীবনে আমরা গতি পাই। তারই ফলে আমাদের বৃদ্ধি, কর্মপ্রবৃত্তি, ভোগাদি সব কিছুই চলতে থাকে। প্রথমেই শিশুর মাকে পাওয়া। সে কি দৃষ্টি? তখন দৃষ্টি কোথা তার? শুধু পরশ। পরশেই মাকে পেল। তা হলে দেখ, আকাশ থেকে আরম্ভ ক'রে সকল তত্ত্বের সঙ্গে সকল রকমে নিরন্তর যুক্ত হয়ে আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষণই কাটিয়ে চলেছি। এটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ, আর এতই সহজ যে সেদিকে আমাদের লক্ষ্যই পড়েনা।

এই পর্যন্ত ব'লেই কিছুক্ষণ অবিনাশ স্থির হলেন, চক্ষু বুজেই ছিলেন, আমিও স্থির, মুগ্ধ। এবার অবিনাশ বললেন,—এই পরশের মহিমা ওতপ্রোত এই সৃষ্টির মধ্যে, এমন কি পরমহংসদেবের যে সমাধি তাও ঐ স্পর্শ ধরেই! এই কথা শুনেই হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—চমৎকার তো!

অবিনাশ বললেন, আরও চমৎকৃত হবে যদি তুমি ঐ আসনে বসেই অন্তঃকরণের মধ্যে ডুবে যাও। সত্যই চমৎকার, আমার প্রতি তার ঐ নির্দেশ-

মাত্রই এক অপূর্ব অনুভবময় কোমল পরশের মধ্যে ডুবেই গেলাম। তখনকার ভাবেই আমি প্রস্তুত ছিলাম ব'লেই এটি ঘটে গেল।

যখন উঠলাম, সময়ের জ্ঞান নাই,—আনন্দের আবেশে টলমল চিত্ত; সঙ্গে সঙ্গে পরমহংসদেবের সমাধি তত্ত্বটির অর্থাৎ যে ক্রমে তাঁর সমাধির অবস্থা হতো, অতি সরলভাবেই আমার বোধে ধরা দিয়েছে। নির্বাক আমি, তখন কথার কিছুই ছিল না। চিত্তের মধ্যে ঝটিতি এ কথা যেন স্পর্শ ক'রে গেল যে, এর তুল্য আনন্দের বিষয়ও জীবনে আর কিছু নেই। আর তারই মধ্যে অনেক কিছু ভাবের সঙ্গে শব্দের পরশ দিয়ে গেল, যা এখানে প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। যতই সরল এবং অকপট হই না কেন, ভাষার স্পর্শে এলেই কোন একটি ভাব দেখোঁচ এমনই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে যে আর প্রকাশের যো রাখে না। অথচ বিচার করে দেখলে তার মধ্যে অসৎ কিছুই নেই।

স্পর্শময় ইন্দ্রিয়চেতনা এখন বড়ই স্পষ্ট এবং জাগ্রত বোধ হ'ল। সকল পরশের মূলেই প্রাণ। ঐ প্রাণই নিত্য, চিদানন্দময় অহং সত্তার একমাত্র অবলম্বন, অনুভূতিময় যন্ত্র, যাকে নিয়ে এই জগৎ সংসারের সঙ্গে যতকিছু সম্বন্ধ এবং ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। কি ভাবে? বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সাহায্যে আমার প্রাণী-জীবনের যত প্রবৃত্তি, কর্ম, ভোগ ও বিলাস জাগিয়ে, সংস্কার, জ্ঞান ও আনন্দেই আমার জীবন সার্থক করছে।

একটি গান, তার ভাষার সঙ্গে সূক্ষ্ম সুরের তরঙ্গ কানে পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের সঙ্গে লোহার পরশের মতই প্রাণে লেগে গেল,—আর তারই ফল, অহংসত্তা স্বরূপস্থ হয়ে গেলেন। কোথায় দেহ ইন্দ্রিয়াদি বোধ, সব নিস্পন্দ, অহম্ সমাধি মগ্ন। তখন ঐ অবস্থায় পরমহংসদেবের শরীরে যন্ত্রের সকল ক্রিয়াই বন্ধ, কোথাও প্রাণের লক্ষণ পাওয়াই যেত না। তারপর ঐ অবস্থা-চ্যুতিতেই আনন্দ-উপভোগই চলতো অন্তঃকরণে অর্থাৎ মন বুদ্ধির ভূমিতে নেমে এলে পর।

কিন্তু ঐ যে স্বরূপে স্থিতি, বা স্বরূপানুভূতির কথা, বলবার যো নেই, কারণ প্রকাশের ভাষা নেই, কতকাংশে ব্যক্ত করতে ভাষায় একটিমাত্র শব্দ আছে, —আনন্দ।

এইভাবে কোন মধুর, পবিত্র ভাবোদ্দীপক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের স্পর্শে, মোহমুক্ত শুদ্ধমনা জীবসত্তার স্ব-ভাবে তথা স্ব-রূপে স্থিতির কারণ হয়। ঐ সূত্রেই কোন সঙ্গীত বা ভাবের পরশেই পরমহংসদেবের একেবারেই স্বরূপে অবস্থিতি হ'ত। এত সহজে স্বরূপস্থ হওয়ার দৃষ্টান্ত জগৎ সংসারে বিরল। ইচ্ছা মাত্রই স্বরূপস্থ হওয়া তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য। তাঁর, মা! শব্দটিই ঐ সূত্র, তাই ধরেই ডুব দিতেন।

পাতঞ্জল যোগ দর্শনোক্ত সমাধির দৃষ্টান্ত যদি কেউ প্রত্যক্ষ করতে চান, পরমহংসদেবের উপবিষ্ট ঐ দেবমূর্তির পানে চাইলেই হবে।

যখন আমরা সে রাত্রে কথা শেষ ক'রে নিজ নিজ শয্যাশ্রয় করলাম, অবিনাশ বললে, ঐ অবস্থা আত্মার স্বরূপে থাকার অবস্থা। তার ফলে অন্তঃ-করণে মন বুদ্ধির ভূমিতে নেমে আনন্দ উপভোগ করে, এটি সারা দিনে ও রাত্রে অনেকবারই হয়, আর তা প্রত্যেক জীবেরই হয়, কেবল পরিচয় নেই তাই জানতে পারে না, অনেকে কতক কতক বুঝতে পারে। রাত্রে সুষুপ্তির আগে

হয়, পরেও হয়, জাগবার অব্যবহিত পূর্বেও হয়। একটু লক্ষ্য রাখলেই বুঝা যায়।

এই ভাবে আমরা আত্মার পরশ পেয়ে থাকি, এ থেকে কেউ বঞ্চিত হয়না হতে পারেনা। উচ্চ-নীচ অভেদেই সেই পরমানন্দের পরশ কাজ করছে জীবের জীবনে, আর তাইতেই আমরা সঞ্জীবিত।

অনাথের বন্ধুলাভ

এক সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মথুরবাবুর পরমহংস বলেই পরিচিত ছিলেন কলকাতার বাবুসমাজে। কারণ ঐ মথুরবাবুই তখন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বৈকালের দিকে গাড়িতে আপনার সামনে বসিয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁকে একটু প্রফুল্ল রাখবার জন্য।

কোথায় কে ভগবদ্ভক্ত, অথবা জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি, সাধক বা সিদ্ধযোগী আছেন খবর পাবার সঙ্গেই তাঁকে দেখবার জন্য অধৈর্য হওয়া; একথা তাঁর তখনকার সেবক হৃদয়রাম, তার পরেই পরমভক্ত মথুরবাবুর মত আর কারো জানবার কথা নয়।

তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহর্ষি খ্যাতি চারদিকেই ছড়িয়েছিল, তাঁর ত্যাগ, সদ্ধর্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠার কথা শুনেই একদিন ঠাকুর মথুরকে ধরে বসলেন,—একবার দেবেন্দ্রনাথকে দেখবো। শেষে মথুরের সঙ্গে গিয়ে দেখে শুনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর নিশ্চিন্ত। একথা এখন আর কারো অজানা নয়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন পরিণত যুবা; তখনকার উদ্যান-বিলাসী সৌখিনবাবু হলেও অন্যদিকে শিক্ষিত, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, সাহিত্য ও সংগীতাদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ছিল। এখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা শুনে তাঁরও ইচ্ছা হোলো পরমহংসটি কি চিজ্ দেখবেন একবার নিজের চোখে।

যদু মল্লিকের বাগান কাছেই। এক ক্লাসেরই বন্ধু, যদু মল্লিকের বাগানেই যোগাযোগটা ঘটে গেল। যদুকে ঠাকুর স্নেহ করতেন, সবারই তা জানা কথা। খবর পেয়ে ঠাকুর তো আগেই গিয়ে বসে আছেন, আহ্লাদের সীমা নেই। যথাকালে যতীন্দ্রমোহন এলেন; যদুও দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে এক নজরেই তিনি ঠাকুরকে দেখে নিলেন। কোঁচার খুঁটটি গায়ে, একমুখ পান, কষ দিয়ে ধারা গড়াচ্ছে,—সামনের দুটি বড় বড় দাঁত বার করা, হাসি হাসি মুখখানি দেখে তাঁর মনে কি ভাব হয়েছিল তা আমরা জানি না;—তবে কি কথা হয়েছিল তা ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন।

আলাপ করতে সদানন্দ ঠাকুরই এগিয়ে এলেন। তাঁর ঐটিই স্বভাব। নিরভিমানী ঠাকুর অপরিচিত কোন ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ সূত্রে প্রথমেই একটি প্রশ্ন প্রায়ই করতেন—মানুষ-জীবনের প্রধান কর্তব্য কি? উত্তরটিও আবার নিজেই যুগিয়ে দিয়ে কেবল তার সমর্থনটুকুই চাইতেন এবং তাইতেই কৃতার্থ হয়ে অনুকূল পরিবেশ দেখলে কথার অমৃতধারা ছুটিয়ে ধন্য করতেন।

এখন, ঐ একজনকে উপলক্ষ্য করে সকলকেই এখানে এইমাত্র কথা, মানুষের প্রধান কর্তব্য কি ; ঈশ্বর-চিন্তাই প্রধান কর্তব্য কিনা ?

এ ভাবের প্রশ্ন যতীন্দ্রমোহন হঠাৎ এখানে আশাই করেননি। অথচ সভার মাঝে তাঁকে এই প্রশ্ন—একটা উত্তর দিতেই হবে, যেহেতু তিনি নিজেও একজন কেউ-কেটা তো বটে ! মনে যা যোগালো তাই দিয়েই পরমহংসদেবের মুখ বন্ধ করে দিতে চাইলেন। যথা, আমরা সংসারী লোক, আমাদের মুক্তি কোথা ? এই দেখুন না, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যা বলে নরকদর্শন করতে হয়েছিল।

এই উত্তর শুনেই ঠাকুর যতীন্দ্রমোহনের অন্তরক্ষেত্রটি পরিষ্কার দেখতে পেলেন। তারপর তিনি যা বললেন, তাইতেই যতীন্দ্রমোহনকে আর ওখানে বসতে হল না, কাজ আছে তাঁর,- বলেই উঠে গেলেন।

পরমহংসদেবের দেহত্যাগের বোধ হয় ৫/৭ বৎসর পর থেকেই তারা-পীঠের বামাক্ষ্যাপার নাম কলিকাতার ধর্মানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত সাধারণ এক শ্রেণীর লোকের গোচরেই এসেছিল। ক্রমে তাঁর সাধন সিদ্ধি এবং নানাপ্রকার অসাধারণ যোগৈশ্বর্যের কথা পাঁচজন বন্ধুলোকের মুখে শুনেই সম্ভবত যতীন্দ্রমোহন একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত একজন কলিকাতার বাবু, রাজা মানুষ, মহামান্য ব্যক্তি, তিনি নিজেই সেই সাধু দেখতে অজ পল্লীগ্রামে যাবেন ?—সে কি সম্ভব ? কাজেই পর্বতকে মহম্মদের কাছে আসতে হোলো ; তবে অনেক ষড়যন্ত্র করেই এটি ঘটাতে হয়েছিল, বাবাকে সহজে রাজী করাতে পারা যায় নি।

অনেকের ধারণা, বামাক্ষ্যাপা তাঁর আসন ছেড়ে কখনও তারাপীঠের বাইরে যান নি। একথা কিন্তু ঠিক নয়। বোধ হয় ১৯৮০ বা ৯১-এর মধ্যে কোন এক সময় তাঁকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল এবং কিছুদিন তিনি এই মহানগরে বাসও করেছিলেন। তখন এদেশে সর্বত্রই তান্ত্রিক গুরুর বড় আদর, বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরের পুরাতন বনেদী কুলীন অথবা বংশজ ব্রাহ্মণবংশীয়দের মধ্যে। সবাই জানেন, রাজা রামমোহন রায় প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরা বংশানুক্রমেই তান্ত্রিক কুলগুরুর শিষ্য। আমরা শুনেছি, গৃহস্থ কুলগুরুর উপর আস্থা ছিল না,—সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুলাভের উদ্দেশ্যেই যতীন্দ্র-মোহন বামাক্ষ্যাপাকে আনিয়েছিলেন। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না ; তবে প্রতিবেশী সাধারণের মধ্যে ঐ মহাত্মার কলিকাতায় আসা এবং রাজবাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে থাকার কথা প্রচারিত হয়েছিল। অনেকেই তাঁর দেখা পেয়েছিলেন আবার কৃপাতেও বঞ্চিত হন নি।

ঐ সময়ে শ্যামাচরণ চক্রবর্তী মশাই বিখ্যাত ধ্রুপদী, সিঙ্গির বাগানে থাকতেন। তাঁর অবস্থা মাঝামাঝি ;—কিন্তু তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ ; জনপ্রিয় এবং নির্বিরোধী মানুষ। সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন ; গত বৎসর পেন্‌সান্‌ নিয়েছেন। সংসারে স্ত্রী ও দুটি মাত্র পুত্র। পুত্রভাগ্য তাঁর ভালই। বড়টি সোমনাথ ; ভালোভাবেই এন্‌জিনীয়ারিং পাশ করে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে বেশ সুখ্যাতির সঙ্গেই কাজ করছিল। গত বৎসর মধ্যপ্রদেশে এক দূর জঙ্গলের মধ্যে কাজে গিয়ে, সেখান থেকে কি এক সর্বনাশা অসুখ নিয়ে এলো। আজ দুমাস শয্যাগত ;—ডাক্তার-কবিরাজ

কিছুই করতে পারছে না ; এমন কি রোগটা কী, ধরতেই পারে নি,—তারা হাল ছেড়েই দিয়েছে। ছেলেটি এখন মরণের পথেই চলেছে একথা সবাই বুঝেছে।

পিতার কণ্ঠে আর গান আসে না ;—এক মাসের উপর তানপুরাটায় ধুলো জমচে। এলোপ্যাথি চিকিৎসকদের পরীক্ষামূলক ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার জন্য তিনি ধনেপ্রাণেই মরতে বসেছেন। এটা করে দেখলে হয়, ওটা করলেও হয়, এইভাবে নানা চিকিৎসার ধারা চলেছে। আর তিনি ঋণে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

ছোট ছেলেটির নাম অনাথবন্ধু—জেনারেল এসেমব্লিতে এফ. এ. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তার শিশুকালে কথাটা ফুটতে দেরি হয়েছিল, সেজন্য পিতাকেও তার পিছনে শাস্ত্রীয় স্বরসাধনার ব্যায়াম নিয়ে অনেক দিন তপস্যা করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁর শ্রমের পুরস্কার পেয়েছেন, ছেলেটি স্কুলে মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত। যখন এনট্রেন্স পাস করে, তখন স্কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল, তাই এই দুই বৎসর ফ্রীতে পড়চে। কথা তার খুবই কম, লেখায় সে অতীব দ্রুত এবং শ্রেষ্ঠ রচনা তার, সকল শিক্ষকেরই অভিমত। এখন আঠারো উত্তীর্ণ হয়ে উনিশে পড়েচে। সামনেই তার পরীক্ষা, গত একমাস সে ভাল করে পড়তেও পারে নি। মনকে কোন রকমেই সে পাঠ্যপুস্তকে লাগাতে পারে না। সর্বসময় চিন্তা, দাদার এ কী রোগই হোলো।

সংসারের যত কিছু বাইরের কাজ, সব তারই। যতক্ষণ কাজে থাকে ততক্ষণ একরকম ; তারপর আর কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে অস্থিরচিত্তে ছট্‌ফট্‌ করে, অথবা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঐ পাংশুবর্ণ শীর্ণকায় রোগীর বিছানার ধারে যেতে প্রাণ চায় না।

রাত্রে মা থাকেন সোমনাথের কাছে, ঐ সময়ে সে নিজের স্থানটিতে ঘুমের আগে যতটুকু সম্ভব পড়বার চেষ্টা করে। বাবা তো টাকার ধান্ধায় ঘোরেন, কখন আসেন কখন বেরিয়ে যান তার ঠিক নেই। আজ দু'দিন থেকে সে বই স্পর্শ করতেই পারে নি। একটা নৈরাশ্য এসে গিয়েচে সকল দিকেই। কবিরাজ ডাক্তার এরা মানুষ তো, এদের কতটুকু শক্তি, মরণ থেকে বাঁচাবার সাধ্য এদের তো থাকতেই পারে না ;—একমাত্র দৈবই বল ;—ভগবান কি এসব দেখচেন না! তার মা-বাবা তারকেশ্বর থেকে আরম্ভ করে যে-যে দেবতার কথা শুনেচেন, তাঁদের পায়েই আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। কে যে তাঁর সোম-নাথকে রক্ষা করবে, কে জানে! সবার পায়েই মাথা কুটচেন, ডোর, মাদুলি, কত দৈব কবচ, চরণামৃত পান, পুজা মানৎ, ঝাড়ফুক—কিছুই বাকী রাখেন নি ; —কিন্তু কি হল ?—ভগবান!

কি করবে অনাথ ?—প্রতিদিন দাদা ক্ষীণ, নির্জীব হয়ে পড়চে। চোখের সামনে আর দেখতে পারা যায় না। কাল থেকে আবার একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েচে ; অনাথের চোখের উপরেই হ'ল সেটা, পিঠের দিকে একটা বেদনা উঠে শরীরটা বাঁকিয়ে দিলে। তখনই ডাক্তার আনা হল ; তিনি হাতের উপর ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন। তারপর রুগী ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে রাত্রে, উদ্বেগে অনাথের ঘুম হল না।

সকালে উঠেই এসেচে অনাথ,—বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে,—মায়ের কোলে মাথা। দেখলে, সোম যেন তার দিকেই চেয়ে আছে। তার প্রাণটা কেমন করে উঠলো ;—কাছে বিছানার উপরে গিয়ে দাদার গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

কি কষ্ট হচ্চে দাদা ?—কিন্তু সোমনাথের চোখের কোণে জল দেখে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বেরোলো না, কেবল তার কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিলে। ধীরে ধীরে সোমনাথ এইবার তার দুর্বল হাত একখানি তুলে অনাথের ঠাণ্ডা হাতখানি ধরে নিয়ে এসে একবার তার বুকের উপরে রাখলে, ক্ষীণকণ্ঠে—আঃ, এই কথাটুকু বেরোলো। তারপর সেই হাতখানি নিয়ে আবার চোখের উপর রেখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে যেন অনুভব করতে লাগলো ঐ ঠাণ্ডাটুকু। অনাথ অনুভব করলে দাদার চোখ বেশ গরম, তাতে তাপ আছে। অনাথের চোখ সজল হয়ে উঠলো, তারপর টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো বুকের উপর। মা তখন নিজে চোখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কাল থেকে অন্নজল ত্যাগ করেচেন মা, ছেলের মাথা কোল থেকে নামান নি, ওঠেন নি বিছানা ছেড়ে।

ডাক্তার এলেন যথাকালে, দশটার পর ;—পরীক্ষা করে দেখলেন। কিছু না বলে শুধু একবার মুখে,—হুম্, শব্দ করে চলে গেলেন। এইভাবে সেদিনও রাতটা কাটলো। পরদিন সকালে অনাথ এলো,—দাদার যেন আর সাড় নেই। শরীর তো বিছানার সঙ্গে মিশেই আছে। চক্ষু মুদিত, তবে কোণে জল। মা মাঝে মাঝে মুছিয়ে দিচ্চেন। অনাথ সহ্য করতে পারলে না, বুকের মধ্যে তার প্রবল একটা আলোড়ন ;—ছট্‌ফট্ করে সে ছুটেই বেরিয়ে গেল।

খানিক পর পিতা এলেন। তিনি টাকার ধান্ধায় গিয়েছিলেন এক বন্ধুর কাছে। সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দু-একজন তাঁর পিছনে ঘরে ঢুকল। তাঁরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চিন্তিত বিরস বদনে রোগীর দিকে চেয়ে ;—তারপর ধীরে ধীরে বাইরে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইলেন, পিতা ঘরেই ছিলেন ; মা জিজ্ঞাসা করলেন, অনাথকে দেখলে,—কোথায় গেল সে ? কর্তা বললেন, যখন বাড়িতে ঢুকচি, বাইরে থেকে এসে একটু আগে, সে, দেখি, হন্ হন্ করে গলির মোড়ে চলেচে, ভাবলাম বোধ হয় ডাক্তারের কাছেই গেল। তারপর রোগীর দিকে চেয়ে একেবারেই ম্রিয়মান হয়ে গেলেন বাবা।

এদিকে বেলাও বাড়চে, দুপুরের কাছাকাছি ; দেখা গেল রুগীও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াও ক্ষীণ ; ক্রমে যেন স্থির হয়েই এলো। পিতা দেখলেন গায়ে হাতে পায়ে হাত দিয়ে, সব ঠাণ্ডা ; তারপর সর্বাঙ্গ স্থির। দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন—যেখানে সবাই ফিস্ ফিস্ করছিল। আর মা, কয়দিন অনাহারে ক্ষীণ, নির্জীব শরীর নিয়ে অনিদ্রায় ছেলের মাথা কোলে, যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ছেলে বোধ হয় একটু সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে,—এই মনে করেই তিনিও যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

অনাথ গেল কোথা ?

তার সহপাঠি একমাত্র বান্ধব ভূপেন। কথা-প্রসঙ্গে গতকাল তার কাছেই শুনেছিল, ওদের পাড়ার পাথুরেঘাটা অঞ্চলেই তারাপীঠ থেকে বামাক্ষ্যাপা নামে এক সিদ্ধ যোগী মহাত্মা এসেছেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদের কাছেই এক বাড়িতে থাকেন ; অনেক লোক যাচ্ছে তাঁকে দেখতে। এখন আজ সেই কথা মনে করেই সে ভূপেনের উদ্দেশ্যেই চলেছে। অনাথ হন্ হন্ করে চিৎপুর রোড পেরিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে ঢুকে বাঁ দিকে এক গলির ভিতরে প্রবেশ করলে। একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে. ভূপেন। ভূপেন আছ ?

—ভিতর থেকে অল্পক্ষণেই ভূপেন বেরিয়ে এলো। তাকে দেখেই অনাথ বললে, —আমায় দেখিয়ে দেবে ক্ষ্যাপাবাবা কোথা থাকেন, সেই সাধু!

অনাথের খালি গা, খালি পা, মুখের চেহারা দেখেই ভূপেন আর কোন প্রশ্ন না করেই সোজা অনাথের হাতখানি ধরে বেরিয়ে এলো। তারা চলতে আরম্ভ করল এবং অল্পক্ষণেই পেঁছে গেল যথাস্থানে। ওখান থেকে বেশী দূর নয় বরং কাছেই বলা যায়—পাথুরেঘাটায় যে বাড়িতে সাধু আছেন, দরজার সামনেই তারা দাঁড়ালো। কয়েকজন লোক আগেই দাঁড়িয়েছিল সদরে। এক-খানা পালকী,—আর কয়েকজন উৎকলবাসী, পিছনে খোঁপা বাঁধা বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। তারা গিয়ে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একজন বললে, কে তোমরা, এখানে কি চাও? ছেলে-ছোকরার জায়গা এটা নয়।

অনাথ একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে তার স্বভাব সুলভ কোমল কণ্ঠেই বললে, এখানে সাধুবাবা আছেন, আমরা তাঁর কাছেই যাবো।

না না, তাঁর কাছে যাওয়া হবে না, তাঁকে বিরক্ত করতে বারণ, মহারাজার হুকুম নেই,—বলে সে তাদের ভাগাবার চেষ্টা করলে। অনাথও যেন নিরাশ হয়ে পড়লো,—ভাঙ্গা গলায় সে বড় কাতর হয়েই বললে,—তিনি কি দয়া করে যাবেন একবার, আমাদের বড়ই বিপদ,—এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশী দূরে নয়।

বোধ হয় অনাথের মুখের কথা তখনও শেষ হয় নি,—এমনই সময়ে, এক শ্যামবর্ণ নধর কান্তি, দীর্ঘ শরীর এক অদ্ভুত মূর্তি এসে দাঁড়ালো। কোমরে মাত্র একটা কোপীন, আর কোনখানেই কিছু নেই তাঁর! যে লোকটি এদের সঙ্গে কথা কইছিল এতক্ষণ, সে শশব্যস্ত হয়ে, জোড় হাতে বললে, বাবা, আপুনি নেমে এলেন কেনে? বিশ্রামের ব্যাঘাত হল। চলুন উপরকে দিয়াঁ আসি।

বাবার কানে তার কোন কথা গেল বলে তো বোধ হল না, কারণ তিনি অনাথের সামনে এসে, তার একখানি হাত ধরে, বললেন,—চলো বাবা, তুমাদের ঘরকে যাই। আর কোন কথা নয় একেবারে রাস্তার উপরে এসে গেলেন।

বন্ধু দুজনেই অবাক;—দেখতে দেখতে দু-তিনজন উপর থেকে তর তর করে নেমে এসে বাবার কাছে দাঁড়ালো, তারা একা বাবাকে ছাড়বে না—সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে চায়। দেখে বাবা বললেন,—কোনো শালা আমার সঙ্গে আসবে নি, খবরদার, আমি আপুনি যাব আপুনিই আসবো যেঁয়ে।

সাধুর কাছে এসেচে, এ কী রকমের সাধু;—এই অদ্ভুত মূর্তির স্পর্শে অনাথ স্তম্ভিত,—তার নিজের ইচ্ছা বা কর্মপ্রবৃত্তি আর রইল না। বাবা চলতে লাগলেন—যেন তিনিই অনাথকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। থপ্ থপ্ করে চলতে লাগলেন বাবা।

পালকিতে যান বাবা; না হলে রাজাবাবু রাগবেন যে! বোলে একজন বাবার গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে দিলে তাতে বাবার আপত্তি হোল না; পালকীর কথায় বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন, উ আমার ভাল লাগে নি। খাঁচার পারা, উয়ার মধ্যে বসতে সুখ নাই যে গো। আমি বেশ হেঁটেই যাবো গা এদের সাথে। যা যা, তুরা আর জ্বালাস না।

তবুও দুজন দারবান, আর পালকি কাঁধে বেয়ারা পিছনে পিছনে আসতে লাগলো। বাবা আর ফিরেও দেখলেন না।

একজন পিছনে বলে উঠলো ;—রাজবাড়ি থেকে যদি ডাকতে, কি নিয়ে যেতে আসে ?

বাবা সেদিকে না ফিরে বললেন, না, না, না, এখন আসবে কেন লিতে, —যদি আসে, সে আমি বুঝবো যেঁয়ে। বাবার গতিক দেখে তারা আর কেউ এলো না।

পথে যেতে যেতে বাবা অবাক বিস্ময়ে বাড়ি, ঘর, দোকান পসারী, গাড়ী ঘোড়া পালকি দেখতে দেখতে চলেচেন, আনন্দ উপচে পড়চে যেন তাঁর মুখে-চোখে। জোড়াসাঁকোর মোড় বরাবর এসে ওরে ও ছেল্যা, দেখ দেখ, হোই যে গো, বাবু মনিষগুলো সবাই ছুটেছে যেন পাগল হইচে—এই শালা কলকাতা সহর ; পথ লয় যেন রাজ্য। হাঁটবো কোথাকে, যত গাড়ি তত বাড়ি, আর যত বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা, ধাঁচা একই পারা ; যেন গোলকধাঁধা বটে গো। কুথা যাব, চেনাই যায় না। অনাথের হাতটি ঠিক ধরা আছে।

চলতে চলতে অনাথকে লক্ষ্য করে যেন আপন মনে আবার বলছেন,—এইজন্য বাবুরা যেন আগুলে রেখেছে বটে। আমায় হাঁটতে দিবে না, পালকি রেখেচে, বলে যেথাকে যাবে উয়ার ভিতরে বসেই যাও ;—কেনে ? আমু কি মেয়্যা,—আমার কি হইচে কি ?—এমন সহর পানে এসে হাঁটবু নাই।—দেখবু নাই ? কি করতে এলাম হেথা ;—মা, তারা—

বাবা যখন অনাথের বাড়ির দরজায় এসে পেঁছিলেন তখন দু-চারজন লোক সেথায় জটলা করচে, একখানা খাটও এনে রাখা হয়েচে। বাবাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি অনাথ একেবারে উপরে উঠে এলো। বাবার মুখে কোন শব্দই নেই। ঘরে অনাথের বাবা আর দুই তিনজন আছে। অনাথ যেন টেনে নিয়ে এলো ঐ অদ্ভুত সাধুকে খাটের কাছে—যেখানে দাদার প্রাণহীন দেহ, আর জননী তার বুকের উপরে মাথা রেখে পড়ে আছেন অচৈতন্য হয়ে।

সবাই স্থির, নিস্তব্ধ ঘরের হাওয়া, তার মধ্যে দেখা গেল, কেবল পিতার চোখে ধারা বয়ে যাচ্চে। যেন কেমন হয়ে গিয়েচেন এই দুর্যোগের মধ্যে। ক্ষ্যাপা বাবা খাটের কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছুই একবার চক্ষু বুলিয়ে দেখে নিলেন। তারপর, 'তারা'! বলে এমনই একটা হুঙ্কার ছাড়লেন যে, উদারা মুদারা তারা তিন গ্রাম জুড়ে সেই শব্দ চতুর্দিকের ব্যোমে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো, সবাইকে চমকে দিয়ে—এমন কি অনাথের মনে হল যেন সোমনাথের প্রাণহীন দেহখানিও নড়ে উঠলো। ঐ ভয়ঙ্কর তারা রবে মা-ও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন,—সামনে প্রায় উলঙ্গ ভৈরব মূর্তি দেখে অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে চেয়ে রইলেন।

কে তুমি বাবা ?—আমার সোমনাথকে,—ঐটুকু কথা,—তারপর স্বরভঙ্গ হল,—শূন্য দৃষ্টি উন্মাদিনী মূর্তি। ছেলের মাথাটি তখনও কোলে আর তার ঠাণ্ডা মাথার উপরে ডান হাতখানি রাখা।

অনাথের দিকে চেয়ে ক্ষ্যাপাবাবা বললেন,—হাঁরে ও ছেল্যা, আমায় আনলি কেনে, কি হয়েছে হেথাকে ?

লোকটা পাগল না কি, বলে কি হয়েছে হেথায় ! অনাথ মুখে বললে, দেখছেন না কি হয়েছে, দাদার অবস্থা ?

এবার ক্ষ্যাপা যেন একটু থমকে উঠলেন, হাঁ, হ্যাঁ, তোর দাদার হইচে

কি, ও তো মায়ের কোল পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে গো। দেখছিস না। তুর কি চক্ষু নাই।

অনাথ তখন একটু উষ্মার সঙ্গে বললো, ওটা ঘুম। কি রকম ঘুম দেখছেন না ?—কথা তার শেষ হল না, চেয়ে দেখে চমৎকার ব্যাপার—দাদার মুখে আর মরণের পাংশুবর্ণের আভাস মাত্র নেই। ক্ষ্যাপা বলেই চলেছেন,—যা, যা, তু দেখ গা যা, আমার দেখা অছে—ইত্যাদি।

এখন অনাথ দেখলে দাদার পেট ও বুকের উপর যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা। সাধুবাবা বলচেন,—হাঁরে বোকা ছেল্যা, মায়ের কোল থেকে ছেল্যাকে যমে লেয়,—সাধ্য কি। তারপর সোমনাথের দাড়িতে হাতটি দিয়ে,—দেখ তো গোপাল, একবার চেয়ে দেখ মায়ের পানে।

সোমনাথের চক্ষু উন্মীলিত হল,—প্রথমেই ক্ষ্যাপাবাবার মুখের উপর পড়লো দৃষ্টি, একটা বিস্ময় ফুটে উঠলো তার চোখে ও মুখে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত চক্ষুতারা মাথা ঘুরিয়ে মায়ের মুখের উপর গেল,—তারপর ক্ষ্যাপাবাবার প্রসন্ন মুখখানির দিকে দেখতে দেখতে তার হাত দুখানি উঠলো কপালের উপর, প্রণামান্তে মুখে উচ্চারিত হল, মা !—মা !

শুনে আনন্দে বাবার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—হাঁ, মায়েরই দয়া বাবা, তু খুব সাবাস ছেল্যা বটে। যেমন বাপ, তেমন মা, তেমনি ভাই, তেমনি তু দাদা ; না হলে মায়ের এত দয়া হবেক কেনে ?

এই অল্পক্ষণে এই ব্যাপার ঘটে গেল। তখনও সবাই স্তম্ভিত, একটা ভাবে আচ্ছন্ন রয়েছে ঘরখানা।

ঘরের মধ্যে সবার উপরই ক্ষ্যাপাবাবার প্রভাব সত্ত্বেও চক্রবর্তী মশাই প্রথম তা থেকে কতকটা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্মশক্তির ব্যবহারে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্ষ্যাপাবাবা যাবার জন্য দ্বারমুখী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এগিয়ে এসে বাবার পা দুটি দু' হাতে জড়িয়ে মাথাটি তার উপর রাখলেন।

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন—তু শালাদের ঐ তো দোষ, পায়ের উপর মাথা রাখা কেনে, মাথায় যে মায়ের বাসা,—এত বয়স হল, বুড়া হতে চল্লি, এটা বুঝিস নাই এখনও, কবে আর বুঝবি তু। যা যা, আপন কাজকে যা—।

এইবার খপ করে অনাথের একখানি হাত ধরে নিজ হাতে নিলেন,—চল বাবা, যাই সেথাকে, তারা ভাবচে, লয় ?—বলে, কোথা গেল মনিষটা ছোড়াদের সাথে। এখন মায়ের মুখেও ভাষা ফুটলো,—কে বাবা, মানুষের রূপ ধরে আমাদের ঘরে এলে ? ভগবান না হ'লে প্রাণদান কে দেবে বাবা,—এত দয়া কি মানুষের হয় ?

ক্ষ্যাপাবাবা যাবার জন্য দরজার দিকে যাচ্ছিলেন, মায়ের মুখের কথা শুনে আবার খানিকটা ফিরে এসে বললেন, এ সকলই ঐ তারা মায়ের খেলা, এটা বুঝ নাই জননী, জয় দাও মায়ের নামে। তার পরেই আবার সেই তাণ্ডব ধ্বনি, তারা,—সেই ধ্বনিতেই দিগ্‌মণ্ডল ভরে গেল। সবারই প্রাণে প্রাণে পুলক,—অন্তরের সকল তন্ত্রী বেজে উঠলো।—অল্পক্ষণের জন্যই স্থির, নিশ্চল মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা—তারপর স্নেহভরে অনাথের দাড়িটি স্পর্শ করে জিজ্ঞাস্য করলেন,—তুমার নামটি কি মাণিক ?

অনাথবন্ধু। শুনেই ক্ষ্যাপাবাবা যেন আনন্দে নেচে উঠলেন। সাবাস

ছেল্যা—তুমি আমারও বন্ধু গো ; এখন চলো তো স্যাঙাৎ—সেখাকে যাই ব'লে তার হাতখানি ধরলেন এবং বাইরের দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

পথে বললেন, ওগো বন্ধু,—দাদাকে লিয়ে, বাবা-মাকে লিয়ে একবার আমাদের তারাপীঠে যাবে, দেখে আসবে শ্মশানের উপর মায়ের মন্দির,—মা আছেন সেথা ;—তারা মাগো ! বীরভূমে তারাপীঠ, শুন নাই ? সবাই জানে। পূজা দিতে যায়, মহাপীঠস্থান যে।

যেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে মন আলোড়িত, সেখানে মানুষ-সমাজে এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে, যা বুদ্ধি যুক্তির সাহায্যে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধেই যোগটা ঠিকই ঘটে, মানুষ সেটা বিশ্বাস করুক, না করুক। তাঁর অনেক রকমের খেলা থাকে। এখানকার সকল বিষয়ে, মানুষের মত কিছু ক্রিয়া, সৎ-অসৎ কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত সকল বিষয়ের অমাদের বিধাতার তীক্ষ্নদৃষ্টি থাকে। এই সত্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন তাঁরাই বলেন,—কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর খেলা যেন চমৎকার নাটকের মতই স্বচ্ছ,—এবং স্পষ্টই দৃশ্যমান হয়। তবে এটা ঠিক,—তা সকলকারই হয় না। হয় সেই ভাগ্যবানের, যাঁর অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস নামক মহান বস্তুটি জন্মেছে অথবা পরমেশ্বরের এই সৃষ্টির কারণতত্ত্বের দিকে মন বুদ্ধি প্রায় সব সময়েই লেগে আছে ; তাই হয়ে আছে তার জীবনে প্রধান ভোগ বা বিলাসের বস্তু। ঐ সব খেলা এমনই অদ্ভুত, যুক্তি তর্কের বহিভূত ব্যাপার ; সাধারণের কাছে অবিশ্বাস্যই থেকে যায়। কিন্তু তবুও তা ঘটে, পূর্বকালে ঘটেছে অনেক, বর্তমানেও যা ঘটেছে, তাও অনেক ; ভবিষ্যতেও যা ঘটবে, তাও কম হবে না। কারণ ততদিনে জীব—বিশেষ মহান মানবজাতি, তাঁর অনেক কাছেই এসে যাবে। অন্ততঃ এখন যতটা দেখা যাচ্ছে, তার তুলনায় অনেক নিকটই হয়ে পড়বে, তাঁরই ইচ্ছায় অবশ্য।

বগলা বাবা

অনেক মহাত্মার কথা শুনি যাঁরা প্রচুর ভোগ ও ধনাগমের উদ্দেশ্য ছেড়ে এমনই একটি পথে জীবনধারা বইয়েছেন যার ফলে তাঁদের পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে ; পার্থিব উন্নতির সকল সূত্রই হারিয়ে এমনই একটি উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন, যার ফল ইচ্ছামাত্র কাকেও দেওয়া যাবে না ; পার্থিব সম্পদের মতো কাকেও দান-বিক্রয়ের অধিকারী ক'রতে পারবেন না। সে পথ নিজের জন্যই—একমাত্র নিজেকে নিয়েই চলতে হবে সে পথে, অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের বিষয় নয়। ধর্মপথে নানা ভাবে বৈচিত্র্য আছে, সিদ্ধি আছে, আজ তারই একটির কথা বলছি।

একবার পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে—ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রংপুর অঞ্চল ঘুরে আসামের দিকেই চললাম। কামরূপ হ'য়ে কামাক্ষা দর্শনের পর গোহাটির দিকেই চলেছি। পথেই খবর পেলাম, এখানে মাঝপথে ব্রহ্মপুত্রের উপরেই একজন কাপালিক আছেন, কম লোকেই জানে। কাকেও স্থান বা আমলই দেন না। কেউ তাঁর আশ্রমে যেতে এবং থাকতেই পারে

না। তিনি নাকি অতি ভয়ঙ্কর লোক। ভূতপ্রেত নিয়ে কাজ করেন, সঙ্গে তাঁর ভৈরবী এক অপ্সরা আছেন। তিনিও কোথাও যান না, কারো সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না।

একজন হিত উপদেশ দিলেন, বাবা, যাবেন না তার কাছে, সে পিশাচ-সিদ্ধ কাপালিক, যে যায় সে ওখান থেকে আর ফিরে আসে না।

কতকটা ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যেতে হয় তাঁর আশ্রমে। আমার মধ্যে কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব আকর্ষণ, তার আসল ভাব একটা কৌতূহল মনের মধ্যে ক্রিয়া করছিল, তাইতে আমায় বড় দ্রুত নিয়ে চলেছিল সেই বনপথে—সেই মানুষটিকে দেখবার আগ্রহে। মনের মধ্যে তার একটা রূপের কল্পনাও ক'রে চলেছি। পথে যেতে যেতে এক গৃহস্থজনের কাছেই বেশ ভালো ক'রে

জেনে শুনে জায়গাটা কোথায় তা ঠিক করে নিয়েছিলাম। সারা দিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে,—শেষে বৈকাল নাগাদ গিয়ে উঠলাম আশ্রমে।

তিন-চারিটি ধাপ উঠে বারান্দা। বিসদৃশ মোটা কাঠের রলা, তার উপরে ছাদ। সামনেই দুখানি ঘর, তার জানলা দেখা গেল, কিন্তু দরজা বিপরীত দিকে। সেই বারান্দা ঘুরে গিয়ে দেখা গেল ঐ বারান্দা ঘরের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পাশেই খানিকটা প্রাঙ্গণ, কিছু কিছু গাছপালাও আছে তার মধ্যে।

হঠাৎ দেখি, সেইখানেই একটা গাছের কাছেই যেন বনদেবীর মতই একটি অপূর্ব নারীমূর্তি। ঐ গাছের ডালে একটা কাপড়ের খুঁট বাঁধছিলেন

কিম্বা গাঁট খুলছিলেন। যেমন এই কামরূপ অঞ্চলের ভদ্র গৃহস্থঘরের বৌ-ঝি হয় ঠিক সেই রকমই দেখতে। গৌরবর্ণ, কপালে জ্বলজ্বল ক'রছে সিন্দুরের ফোঁটা। তাঁর কাপড়ও লাল। অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি। যেন তুলির রেখা ভ্রূ, তার নীচে উজ্জ্বল অথচ কমনীয় নীলাভাময় দুই চক্ষু। মনে হ'লো, এই কি অপ্সরা—নাকি? দেখামাত্রই আমাকে যেন চমকে দিলে, সেটা তিনিও লক্ষ্য করলেন। আমি জোড় হাতে নমস্কার ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রেই এইখানেই কি কৌল বগলা বাবা থাকেন? কোন কথা না ব'লে তিনি একটু মুচকে হেসেই দাওয়া, অর্থাৎ বারান্দায় উঠে এসে হন হন ক'রে কোণের দিকে একটা ঘরের দরজার মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন।

ভাবলাম এ কি হ'লো, কোন অপরাধ ক'রে বসলাম নাকি।

দেখতে দেখতে এক দীর্ঘ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ মূর্তি, হাতে একখানা রাম দা, অত্যন্ত দ্রুতপদে একেবারে আমার সামনে এসে এমন ভাবে তাকালেন, যেন এক কোপেই আমায় সাবাড় ক'রে দেবেন। আমি স্তম্ভিত, বেশ ভয়ও ছিলো তার মধ্যে, তিনি তাই দেখেই বোধ হয় বেগ সংবরণ করলেন। রক্তবর্ণ চক্ষু যেন ক্রোধে বিস্ফারিত, কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ ক'রে বললেন, —কে তুই, এখানে কি চাস?

আমি তখনও স্তম্ভিত। ঠিক যেন কালান্তক যমকেই সামনে দেখ-ছিলাম। অমন একটি স্বর্গের লাবণ্য-ময়ী মূর্তি দেখবার পরেই ভয়ংকর কালো, রোগা, অতিদীর্ঘ, কুশ্রী মূর্তি দেখে, হঠাৎ তার সঙ্গে রামদা, তারপর কর্কশ কণ্ঠে ঐ প্রশ্ন শুনে যন্ত্রবৎ আমি ধাপের উপর বসে পড়লাম। এমন অবস্থায় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেলো। ঐ নারীমূর্তি ঘর হ'তে বেরিয়ে এলেন, একখানা চেটাইয়ের আসন হাতে। সোজা এসে সেখানি আমার সামনে পেতে দিয়ে বললেন,—বসুন, বাবা।

ব্যাস্—অভিনয় এই পর্যন্তই,—যম তখনই সেই অস্ত্রপাণি অবস্থায় সোজা গিয়ে প্রবেশ ক'রলেন—যে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলেন সেই ঘরে। আর তখনি, নেশা কাটলে যেমন মানুষের সহজ অবস্থাটি আসে, সেইভাবেই আমিও প্রকৃতিস্থ হলাম। অতঃপর প্রণাম ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মা, এ কি ব্যাপার? মা বললেন,—একজন বাইরে থেকে এলে প্রথমে এই রকমই হয়। উনি ঐ খাঁড়া হাতে যেই ঘর থেকে বার হন, অমনি তারা ছুটে পালায়, আর উনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন। আজ তা হ'লো না। বোধ হয়, মায়ের কৃপা আছে আপনার উপর, না হয়, আপনি শক্তির সাধক। তাই হোক বাবা,

আর কোন ভয় নেই, বসুন, যখন বাইরে আসবেন কথাবার্তা হবে। এঁর খেলাই এই রকম।

মনে বুঝলাম, মা জগদম্বাই এই মূর্তিতে আজ আমায় কৃপা ক'রলেন। পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় গিয়েছি। আমার ভাগ্যে কেবল ফরিদপুরের জগৎ-প্রভু মহাত্মকেই দেখেছি, আর এখানে এই কৌল বাবা ব্যতীত সাধু বা যথার্থ সিদ্ধ পুরুষ দর্শন হয়নি।

কি অদ্ভুত নির্জনতা,—চেটাই আসনে বসে বসেই কাল হরণ ক'রছিলাম। হঠাৎ মা এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কতদূর থেকে আসা হচ্ছে, দেশ কোথা, কি করি, এখানে কেন এসেছি—এই সব। প্রশ্নের সব উত্তরগুলি আদায় করার পর, কিছু খাবো কি না জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ক'রেই বললেন, বাবা, খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতাম না—একেবারে এনেই হাজির ক'রতাম, কিন্তু অপরাহ্ণ, আর তুমি সাধক কি না, তাই আসনে বসবার আগে কিছু খাবে কি না একটু সন্দেহ ছিলো তাই জিজ্ঞাসা ক'রলাম। এমন সুন্দর, এত মধুর জবাবদিহি কোথাও শুনিনি। যে কাণ্ডটা ঘটে গেল এরপর এখন খাওয়ার কথা মনেই ওঠেনি। যাই হোক, এখন মা নিয়ে এলেন একখানি কোমল কাঁথার আসন, দিয়ে বললেন, ওর উপর পেতে নাও, সুবিধে হবে। বুঝছিলেন, দীর্ঘকাল বসবার উপযোগী আসন এটা নয়, তাই এই অনুগ্রহ।

একটু দূরেই প্রথমে লম্বা এক চাটাই, তার উপরে একখানি সতরঞ্চ, তার উপর পুরু একখানি গালিচা, তার উপর একখানি গুলবাঘের ছাল পেতে দিলেন, সামনে একখানি খুব নীচু কাঠের চৌকি। অল্পক্ষণ পরেই এলেন দিগম্বর বগলা বাবা। এখন দেখলাম সৌম্য মূর্তি তবে চক্ষু লাল,—গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষ ও হাড়ের মালা,—হাতের বাজুতেও রুদ্রাক্ষ এবং প্রবাল, নীল, লাল পাথরের মালা জড়ানো। এসে বসলেন, এখন লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, ইনি একটু ট্যারা। ট্যারাকে আমার বড়ই ভয়, এটা সংস্কারগত। আমার সঙ্গে আর এখন কোন কথাই কইলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, মা প্রথমে দুটি ডিজ্ হ্যারিকেন লণ্ঠন জেলে, একটি ওখানে রেখে অপরটি নিয়ে গেলেন সঙ্গে। তারপর মদের ছোট বোতল এলো। পাথরের রেকাবে খাদ্য মৎস্য, মাংস, মুদ্রাদি উপকরণ এলো সেই চৌকির উপর। জল এলো, আর যা কিছু সবই এলো। এ সব দেখে আমার অন্তর বিস্বাদে ভরে উঠলো। বুঝলাম এবার পঞ্চ ম-কারের পালা আরম্ভ হবে, আর নির্লজ্জভাবে চলবে পশ্বাচারের কাণ্ড। মনের অজ্ঞাতেই আমি উঠে পড়লাম, অন্তরের কথা এই যে, যদি এখনও বেরিয়ে হাঁটিতে থাকি, তা হ'লে অন্ধকার হবার আগেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। তারপর রাজপথে গৌহাটিতে পেঁছাতে কতই বা রাত হবে। বাবা জপে বসছেন, এই উপযুক্ত অবসর।

আমায় উঠতে দেখেই বিকৃতাক্ষ,—কটাক্ষপাত করে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, উঠছো কোথা, এখনই যে চক্র আরম্ভ হবে। সর্বনাশ—উপায়? মিথ্যার আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো, বললাম, এই যে একটু বাইরে থেকেই আসছি, আপনি বসুন না।

আরে এখানে বাইরে কোথা যাবে,—কেউটে, খরিস, গোখরোর রাজ্য,—কলকাতা পেয়েছো নাকি? এ সন্ধ্যায় আর বার হওয়া হবে না। মুখ হাত ধোবে তো যাও, জায়গা আছে ; ব'লে ডাকলেন, মা। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আসা, অঙ্গনের এক প্রান্তে খানিকটা পাথর বাঁধা জায়গা দেখালেন, আগে আগে মা ছিলেন পিছনে আমি দাঁড়িয়েছি। মা, অত্যন্ত নীচু গলায়, যেন কানে কানেই বললেন, এঁর বাইরেটা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যেওনা বাবা, এসেছো যখন একটা রাতই থাকো। এখানে কোন অভাবই হবে না, কথাটা আমার শুনো, তোমার ভালোই হবে।

উত্তরে আমি বললাম, আমি তো তন্ত্রমার্গের লোক নই, এ পথে আমার সাধনা নয়।

বাধা দিয়ে মা যা বললেন, সেটা হুকুম বা আজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তিনি বললেন, জাগ্রত শক্তিমন্ত্র পেয়েছ, এখানে আপন আসনে বসে ইষ্টমন্ত্র জপে বাধা কি? বাইরে যাই হোক না কেন, তাতে তোমার কি? শুনে এবার প্রাণ সহজ হয়ে গেল। সাক্ষাৎ মা জগদম্বারই আদেশ যেন ;—কৃতার্থ হ'লাম।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে এসে বসা। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই শেয়াল ডেকে উঠলো। উনি জপেই ছিলেন। সব কিছু কাজ সেরে মা-ও এসে পাশে বসেই জপ আরম্ভ ক'রলেন ; আর কেউ আমার দিকে চেয়েও দেখলেন না। আমিও স্থানমাহাত্ম্য অনুভব ক'রলাম, আর নিজ মন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত রইলাম। এইভাবে কতক্ষণ গেল। প্রায় এক ঘণ্টা স্থির। সন্ধ্যার পর, রাত্রি যখন ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাবা তখন জপ শেষ ক'রে মাকে বললেন, এইবার এসো, পাত্রটা দাও। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এখন দেখো. আমরা খাই, তুমি শেষে কেবল খাবারটা খাবে—তখন আমরা দেখবো, কেমন?

বললাম, সেই কথাই ভালো।

একটি ছোট কালো পাথর বাটি, তাতে এক কাঁচ্চা ধরে। তাইতে কারণ ঢেলে দিলেন মা। এই রকম তিন পাত্র পানের পর মা ঐ বাটির তলা থেকে এক আঙ্গুলে (তর্জনীতে) নিয়ে ফোঁটা দিলেন আপন কপালে। আমায় বললেন, সরে এসো বাবা, ফোঁটা নাও, অবজ্ঞা ক'রতে নেই, পূজার সামগ্রী যে, সবই দেবীর প্রসাদ হয়ে আছে। আমি নিঃসংকোচে তাই ক'রলাম। তারপর মৎস্য-পাত্র থেকে বেশ বড় বড় তিন-চার টুকরা, তাই থেকে কোল বাবা একটি নিলেন, আমায় একটি দিলেন, মা একটি নিলেন, শিবা ভোগের জন্য একটা রইলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ঘিয়ে ভাজা রুটির মতো, আলাদা পাত্রে নিজ নিজ অংশে কয়খানা ক'রে তুলে নেওয়া হ'লো। তারপর মাংস। তাও ঐ রুটির সঙ্গে তিন-চার টুকরা খাওয়া হ'লো। যা খাওয়া হ'লো তাতে পেট ভরা মোটেই হ'লো না। অথচ ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'লো চমৎকার।

এরপর বিকৃত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে ভৈরব ব'ললেন,—দেখতে এসেছো যখন—তান্ত্রিক পঞ্চ-মকারের, মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা—এই চারটির কাজ হ'লো, তোমারও দেখা হ'লো। এখন বাকীটা দেখবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বললাম, ও জিনিস তো দেখবার নয়, দেখবার প্রবৃত্তিও নেই, আমি সরে যাচ্ছি।

বাবা—নিজেদের ও-কাজ সবাই দেখে জানি অপরের দেখেচ কখনও?

আমি—দেখবো কি, ঐ জঘন্য, হেয় কর্ম কি দেখবার? ওতে দেখবার কি আছে?

বাবা—আছে, আছে, ওরও প্রয়োজন আছে। যার সংযমব্রত আছে, তার একটা পরীক্ষা নেই ? পরস্য মৈথুনের দ্রষ্টা হওয়াতেই তো তার সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া জানো তো, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তা থেকে মুক্ত না হ'লে সিদ্ধি কোথায় ? পরে তিনি বললেন, আচ্ছা, বাবা ! বলতো, ওটাকে হেয় জঘন্য বললে কেন ?

আমি—জানোয়ার পশুদেরই তো ঐ কাজ, মানুষের মধ্যে ওর কোনো গৌরব আছে নাকি ?

তিনি হাসিমুখে বললেন—এইতো বাবা, বলতে পারলে না আসলে কেন ওটা হেয়।

আমি—আপনিও তো জানেন ওটা হেয়,—বলুন না আপনি, ওটা হেয় নয় কেন ?

যদি বলি, আমরা ওটা ধর্মাঙ্গ বলেই করি, তখন ও-কাজকে হেয় বা জঘন্য বলবার অধিকার আছে কি ?

তা হ'লে বলবো, আপনারা পশু স্তর থেকে কিছুটাও উন্নত হন নি, যথার্থ ধর্ম বা সত্যকে ধরতেই পারেন নি। শুনে কৌল বাবা তিলমাত্র বিরক্ত না হয়েই বললেন, তুমি তো আসল কথাটা বলতেই পারলে না ; এখন মা বুঝিয়ে দেবেন কেন ও'টা হেয়, বলেই মায়ের দিকে লক্ষ্য ক'রলেন। মা সবই শুনছিলেন, এখন মধুর কণ্ঠে প্রশান্ত একটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে যা বললেন,—মুগ্ধ হয়েই তা শুনতে রইলাম।

ও-কাজটা কামমূলক, সৃষ্টি আর সম্ভোগের কামনায় ওর উৎপত্তি, সেই জন্যই হেয়। ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কি আছে ওতে ? ওটা শরীরের ভার, রক্তের বোঝা,—নেমে গেলেই আরাম। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর, মল মূত্র ত্যাগেও একপ্রকার সুখ হয়। শরীরধর্মেই ওটা হয়. ওতে শরীরের স্ফূর্তি আছে কিন্তু আনন্দ কোথা ? একমাত্র যাদের মধ্যে প্রেম ঘনীভূত, তাদেরই ওসব হেয় মনে হয়। কারণ তারা জানে ওটা কাম মাত্র,—যথার্থ প্রেম-প্রীতির হন্তা। ওটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শুদ্ধ প্রেম তাঁর মধ্যে স্থান পায় না, পেতে পারে না। বুঝেছো বাবা ? তবে জগদম্বা তাঁর জীব সৃষ্টির ধারা বজায় রাখবার জন্য প্রত্যেক কামপূর্ণ ঘটের মধ্যে একবিন্দু প্রেম মিশিয়ে দিয়েছেন—তাই যৌবনের কালে সংসারমুখী স্ত্রী পুরুষের মিলনটা যেন প্রেমেরই সম্পর্ক ব'লেই মনে হয়। যেমন, এক গামলা জলে এক ফোঁটা পুষ্পসার মিশিয়ে দিলে সারা জলটাই অল্পক্ষণের জন্য গন্ধে ভরে যায়, ব্যবহারে শরীর সৌরভময় হয়ে ওঠে। এ সংসারে ঐ একবিন্দু প্রেমের মহিমাই এমনি যে নরনারীর কামময় অস্তিত্ব, যৌবনের রঙে আগাগোড়াই প্রেমপূর্ণই মনে হয়। আসলে সৃষ্টির প্রবৃত্তি সতেজ রাখতেই স্রষ্টার এই কৌশল।

আমি যেন আপন মনেই বলছিলাম, প্রেমের মহিমার কথা শুনেছি সত্য, কিন্তু দুইয়ের মোদ্দা কথাটা একই তো মনে হয়। তৎক্ষণাৎ মা বললেন, তা কেমন ক'রে হবে, ও দুটো বিপরীতধর্মী যে, বিশুদ্ধ প্রেমে দুই একাঙ্গ হয়ে যায় যে, আর কামে দুই দুই-ই থাকে, সম্ভোগের ফলে ক্ষণেকের জন্য এক বোধ হ'লেও শরীর মন পৃথকই থাকে। শুদ্ধ প্রেমের ছিটে-ফোঁটায়ও সিন্ধু প্রমাণ রস সৃষ্টি করে। কাম যেখানে, কেবলই সংঘর্ষ, ঐ সংঘর্ষই কামের সার কথা।

আমি মুগ্ধ হয়েই শুনছিলাম, মা যেই কথা বন্ধ ক'রে স্থির হ'লেন, বাবা অমনি আরম্ভ ক'রলেন,—বুঝলে কিছু? আর বুঝবেই বা কি, এতে বুঝবার আছেই বা কি? দুই থাকতে কিছু হচ্ছে না,—বাবা। শুনে আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো, আপনার তো সিদ্ধাবস্থা শুনেছি, আপনাদেরও মৈথুন চলে নাকি স্ত্রী-পুরুষের।

শুনেই তিনি বললেন, মৈথুন পরম তত্ত্ব, এ সাধনের শেষ, তখন দুই মিলে এক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, জানি, ওটা শোনা কথা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে আছে পড়েছি, কিন্তু কখনও দেখিনি।

হয়তো তাই দেখতেই এসেছো,—বলে বাবা আবার বললেন, তুমি তো ওটা দেখতেই চাও না ; হেয় ব'লে সরেই যাচ্ছিলে।

আমি ভাবছিলাম, ঐ কালো কুৎসিৎ রোগা মানুষটিকে দেখে ভক্তি দূরে পালায়, ঐ মানুষ কি সিদ্ধ যোগী হ'তে পারে! সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রলেন, পরে বললেন, এখনও রূপ আঁকড়ে আছো বাবা, ঐ স্থূল বুদ্ধিতে সিদ্ধ অসিদ্ধ বুঝবে কি ক'রে?

একখানি চাবুক যেন পিঠে এসে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই বাকরোধ।

কৌল বাবা বললেন, দুই প্রহর হ'লো, এখন আসনে বসতে হবে। যদি দেখতে চাও তো আপন আসনে ব'সেই দেখ। আমাদের অবস্থান্তর দেখলে ভয় পেয়োনা বা উঠে পড়োনা যেন। এমন সময় পাশে কাছেই একদল শেয়াল ডেকে উঠলো, হুক্কা হুয়া। মনে প্রবল আলোড়ন নিয়েই বসে আছি। নিম্ন-দৃষ্টি। এখানে শুনেছিলাম শেয়ালেরাই প্রহর জানিয়ে দেয়।

বাবা তো উলঙ্গই ছিলেন. এবার মা বস্ত্রত্যাগ ক'রে উঠে বসলেন কৌল-বাবার কোলে, কিন্তু দুজনেই মুখোমুখী আর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে,—দুজনেই দুজনের চক্ষে চক্ষে, দেখলাম এইমাত্র, তারপর আমার শরীর আপন আসনের গুণেই স্থির হয়ে এলো। এমন দৃঢ় সংযম আমার ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। অল্পক্ষণেই কে যেন কানে কানে বলে দিলে, এইবার দেখো! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো ; আমি সামনে চেয়ে দেখলাম, শূন্য ঐ আসনে কোন মূর্তিই নেই। আলোটা যথাস্থানে ঠিকই জ্বলছিল। প্রভাত পর্যন্তই নিস্পন্দ বসেছিলাম।

এই মহাশক্তির ক্ষেত্রে পরদিন আমার থাকবার সাধ্যই রইলো না—যখন চলে আসি, প্রসন্নমুখে মা বললেন, আর থাকতে পারলেনা বাবা।

বললাম, মা, আমার জন্মজীবন সার্থক, মনে হচ্ছে সবই পেয়েছি। কিন্তু মা, আসন শূন্য দেখলাম কেন? মিলনের এক মূর্তি তো দেখতে পেলাম না। মা বললেন,—আমরা কালের মধ্যেই তো ছিলাম দুই হয়ে, যখন এক হলাম, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তো রইলো না, মিলবার সময় ক্ষণেক দেখা যায়, তারপর আর দেখা শুনার বাইরে। তোমার জন্যই কাল ওটা হয়েছিল। যাও বাবা, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। যা দেখলে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রচার ক'রে বেড়িও না, তোমার ভালো হবে।

অপরূপ সত্ত্বা বিনিময়

লোকটা শেষকালে আমাকে এমন কল্পনার অতীত একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ফেলতে পারবে এ ধারণা কোন সময়েই ছিল না। হয়তো সে ব্যক্তি এর জন্যে দায়ী নয়,—হয়তো বিধাতার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে গিয়েছে,—হয়তো বা আমারই গলদ বা অপরাধের ফল হিসেবেই এটা হয়েছে। তা সে যাই হোক, যার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটার ফলে আমার এই অবস্থার উদ্ভব ; মনে হয় তার সরল নিরীহ প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু ঢাকা ছিল যার স্বরূপ কোন প্রকার ব্যবহারের ফাঁকেও আমার লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়নি।

আমাদের মত উচ্চপদস্থ মোটা মাইনের ইম্পিরিয়্যাল বৃটিশ-সরকারের গেজেটেড অফিসার ; সোপার্জিত পদগৌরবের উপর সচ্ছলতা, উপরন্তু বিলাসের নেশায় মশগুল, সর্বক্ষণই নিজ নিজ সৌভাগ্যে সচেতন যারা, তাদের যতই জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তিই থাকুক না কেন, এইভাবের একটি লোকের সম্বন্ধে ধারণা কতটা সংকীর্ণ এবং ভ্রমসংকুল, আবার নিজ নিজ অন্তঃসারশূন্যতার ফলে কতটা বিকৃত হতে পারে, আজ ভালোমতে সবাইকে জানিয়ে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি।

সম্ভবত ১৯৩৮ সালের কথা। তখন ইম্পিরিয়্যাল দিল্লীর অফিসারদের বড় বড় গ্রেড্ থেকে লোয়ার কেরাণী পর্যন্ত সবাই মাসিক মাইনের অঙ্কের হিসাবে সমাজে ব্যবহারিক ছোট বড় সাব্যস্ত হতো অর্থাৎ উচ্চ পদস্থ যিনি অধিক বেতনের অধিকারী,—তাঁর সঙ্গে নিম্নপদস্থ কারো সম্বন্ধ হ'ল—উপেক্ষার। অতি অদ্ভুত সমাজ আমাদের। এমন অবস্থায় দেড় হাজারী ডাঃ গুপ্তের সঙ্গে আড়াই হাজারী আমার কোনো সম্পর্ক থাকবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু ক্ষীণ বন্ধুত্ব জন্মেছিল। তার কারণ ডাঃ গুপ্ত ছিলেন উচ্চ বিদ্যাধিকারী, তাঁর এডুকেশন কেরিয়ার অনেকেরই ঈর্ষ্যার বিষয় ছিল। সুতরাং দুজনেই দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আরম্ভ করে, হরিসভা, কালীবাড়ী, স্টুডেণ্টস্ ক্লাব ইত্যাদি প্রায় সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলাম।

এই বৎসরের কালীপূজার সময়ে আমাদের মধ্যে একটা পরামর্শ এই হলো যে, নাচ, গান, থিয়েটার, যাত্রা বা বাজী পোড়ানোতে উৎসব সম্পূর্ণ না করে একটু ইণ্টেলেকচুয়াল অথবা রিলিজিয়াস এনটারপ্রাইজের মত কিছু করলে বোধহয় ভালই হয়,—এইভাবেই কিছু আনন্দ ও জ্ঞানের অনুশীলন করা যাক। ডাঃ গুপ্ত বললেন—আমার এক বন্ধু আছেন আর্টিস্ট। তন্ত্র সম্বন্ধে সাধনার কথা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। আপনাদের সবার মত হলে তাঁর কাছ থেকে তন্ত্রধর্ম সম্বন্ধে কিছু শোনা যেতে পারে। সবাই সায় দিলেন। তার করে তাঁকে তলপ করা হলো এবং যথাকালে তিনি এসেও গেলেন।

ডাঃ গুপ্তর অতিথি হয়েই রইলেন এ কয়দিন।

নামটি তার দর্পনারায়ণ উপাধ্যায়। দেখতে একরকম সুশ্রী বলা যায়। বয়স তার দেখায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু যদি তার নিজমুখে না শুনতাম তাহলে বিশ্বাস হয় না যে দুবছর পরে তাকে ষাটের কোটায় পা দিতে হবে।

যাই হোক, তার প্রথম দিল্লীতে আসা এবং দুদিন ধর্ম বা তন্ত্র সম্বন্ধে কথা শুনে, আলাপ পরিচয়ে শ্রদ্ধা একটু হয়েছিল, যেন একটু আকৃষ্টও হয়েছিলাম, কারণ চলে যাবার পরেও তার কথা মনে ছিল। আমার ঐ শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাবটি বোধহয় চিরদিনই থাকতো, যদি সে ব্যক্তি আবার দিল্লীতে ফিরে না আসতো।

প্রায় তিনবৎসর পরে সে আবার দিল্লীতে এলো ডাঃ গুপ্তের আহ্বানে এবং এবারেও ডাঃ গুপ্তর গেষ্ট হয়েই রইলো। সরকারী দপ্তরের ক'খানা ছবি রিনোভেশানের কাজেই তিনি শিল্পীকে আনিয়েছিলেন। কাজটি মাস দেড়েকের মধ্যেই হয়ে গেল। তার পর ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কিছুদিন রয়ে গেল সে। মধ্যে মধ্যে দেখাশুনা হতো,—কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ ভাবটি ছিল তার প্রকৃতিগত। তার সঙ্গ আমাদের ভাল লাগতো, এ কথা সত্য।

ডাঃ গুপ্ত ছিলেন তার যথার্থ কল্যাণকামী বন্ধু। লোকটার জন্যে তিনি ভাবতেন। তিনি চেয়েছিলেন লোকটি দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করে, তাহলে আমাদের কালচারাল এসোসিয়েসনটা বেশ জোরালো হয়। লোকটা ভারতের সবদিকেই, এমনকি তিব্বতেও ঘুরেছিল—তাইতেই তাকে ভ্রমণ-সাহিত্যে সুপরিচিত করেছে। তারপর সাধুসঙ্গ গ্রন্থ তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাছাড়া সুকণ্ঠ, সঙ্গীতেও তার অধিকার আছে।

তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব তখন পর্যন্ত ভালই ছিল। মাঝে মাঝে দেখা-শোনাও চলছিল। এই সময়েই একদিন ডাঃ গুপ্ত, একটু বিশেষভাবেই আমায় বললেন ;—দেখুন, লোকটি অনেক বড় শিল্পী, কাজও অনেক করেছেন, কিন্তু বর্তমানে কলকাতায় ভাল সুবিধা হচ্ছে না, এখানে কিছুদিন থেকে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দেখতে চান। ওর মত লোকের পক্ষে এই জায়গাটাই ঠিক মনে হয়। আমাদের সকলকার যথাসাধ্য কিছু করাই উচিত।

যেইমাত্র কথাটি শুনলাম,—আশ্চর্য ব্যাপার, যেটুকু শ্রদ্ধা প্রীতি আমার মধ্যে ছিল সবটাই ম্লান হয়ে গেল ; এক বিপরীত ভাব, যেমন দরিদ্র ভদ্রলোকের উপর অবস্থাপন্ন দাতা একজনের হয়ে থাকে সেই ভাবই এসে গেল আমার মনে। অথচ বাইরে রইল এমন একটি ভাব, যাকে শ্রদ্ধা তো নয়ই, আবার ঠিক অশ্রদ্ধাও বলা যায় না,—কেমন একটি কৃত্রিম ভাব। তারপর থেকে তার সঙ্গে দেখা হ'লে কেবল সামনের দাঁত কয়টা দেখিয়ে, আচ্ছা বোলে পাশ কাটানো ; —এই রকমই চলতে লাগলো।

॥ ২ ॥

কয়েকদিন পর, এমন একটি ব্যাপার ঘটলো তাইতেই আমার ভিতরটি একেবারে তিক্ত হয়ে উঠলো। ডাঃ গুপ্তের চতুর্থ কন্যা ক্লাস সেভেনে পড়ে, আর আমার মেয়ে মীরা এবার ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠবে। ডাঃ গুপ্তই প্রস্তাব করলেন যে আপনার আর আমার মেয়ে দুটিকে যদি চিত্রবিদ্যা শিক্ষার একটা সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে লোকটিকে বেশ একটু সাহায্য করা হয়। পঞ্চাশ টাকা হিসাবে দুজনের টুইশান্ ফি একশো টাকা,—মন্দ হবে না আরম্ভটা। মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখা গেল তাদেরও মত আছে। যাই হোক, এই কথাটি নিয়ে আমিই একটু মুরুব্বিআনা দেখিয়ে একদিন তার কাছে প্রস্তাব করলাম। তাকে বুঝিয়েও দিলাম যে তার উপকারার্থেই আমাদের এই প্রথম উদ্যম। শুনে লোকটি একটু

যেন ভেবে নিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—যাঁদের শেখবার কথা, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?—তাদের ইচ্ছা—

ধমক দিয়ে বেশ মুরুব্বির মরই গরম মজাজে বললাম, হাঁ-হাঁ, কথা হয়েছে, তাদের ইচ্ছাও আছে।

আচ্ছা লোক যা হোক, বলে কি, আপনাদের অনুরোধেই হয়তো ইচ্ছা হয়ে থাকবে,—কিন্তু উৎসাহ দেখলেন কি ? এবার বিরক্তি দেখিয়েই বললাম—শিখতে শিখতে হয়তো উৎসাহ আসতে পারে,—আপনার চাই কিনা বলুন না। সে বলে,—দেখুন, আমি গোড়াতেই বুঝেছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করতেই এটা ঘটাতে চাইছেন। কিন্তু এমন কাজে হাত দিতে চাই না, যাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এতে সন্দেহের কথা আসছে কেন ?—আমিই বললাম কথাটা।

যে পাত্রী দুই এক বৎসরের মধ্যেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, অথচ পূর্বে কখনও একটি লাইনও টানেনি, একেবারেই নতুন, তাদের এই আঠারো কুড়ি বৎসর বয়সে লাইনটানা থেকে, যাকে বলে ষ্ট্রেট্-লাইন থেকে আরম্ভ করা—আমার মনে হয় এটা তাদের ভালই লাগবে না ; আমারও পণ্ডশ্রম, মনের শান্তি ও শক্তি নষ্ট, আর, উভয় পক্ষেই অনর্থক সময় নষ্ট।

কীরকম ছাত্র বা ছাত্রী হলে আপনি শেখাবার ভার নেবেন ?

যাদের আগে কিছুটা করা আছে, বেশ ঝোঁক আছে চিত্রবিদ্যা শেখবার, খানিক লাইন প্র্যাকটিস আছে,—বুঝতেই তো পাচ্ছেন।

ব্যাস্, এইমাত্র কথা। এর পর আর তার উপর শ্রদ্ধা রাখা চলেনা,—একমাত্র উপেক্ষা ছাড়া তার উপর শ্রদ্ধার কিছু অবশিষ্ট রইলো না আমার। লোকটার কিন্তু মনে তিলমাত্র দাগ কাটলোনা এ ব্যাপার নিয়ে। যথার্থ তারই উপকারের জন্য আমরা একটা উপার্জনের সূত্র বার করে তাকে আহ্বান করলাম, আর সে এটা উপেক্ষাই করলে। চুলোয় যাক্,—আমি আর কি করতে পারি,—সে নিজে যা পারে করুক। শুনলাম, সে পলিটেক্‌নিকে একটা মাস্টারীর চেষ্টা করছে।

একদিন বিকালের দিকে আমার বাংলোয় এলো,—এমন মাঝে মাঝে আসতো। আমরা বেড়াতে যেতাম খানিকটা ইণ্ডিয়া গেটের দিকে বা এদিক ওদিকে। সেদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার মেয়ের মুখে শুনলাম, উপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণই বসে আছে আমার অপেক্ষায়। একটা মিথ্যা অছিলায় বললাম—আমার সময় কোথা. এখনি স্টেশনে যেতে হবে, এক বন্ধু আসবেন। গাড়িটাও ছিল দরজার কাছে হুকুমের অপেক্ষায়। জানলা দিয়ে দেখি, লোকটা বাগানে বসে বসে সামনের প্রকাণ্ড ইউক্যালিপটাস্ গাছটা আঁকচে। হাতে তার সব সময়েই একটা স্কেচবই থাকতো। আমি এখন কথা কইচি ঘরের ভিতরে, নানা কাজে ব্যস্ত, চাকরদের হুকুম করচি, টেবলে খেতে খেতে—মেয়ের সঙ্গেও কথা কইচি। মেয়ে আবার আমায় মনে করিয়ে দিলে ; অনেকক্ষণ তিনি এসছেন, একবার দেখা করবে না, বাবা ?

এই মীরাকেই ছবি আঁকা শেখাবার কথা হয়েছিল। তার প্রত্যাখ্যানটা দেখলাম মোটেই সিরিয়াসলি নেয়নি ঐ মেয়েটি। ব্যাপারটা সে এই ভাবেই মানিয়ে নিলে যেন, ম্যাট্রিক পড়তে পডতে আর্ট লাইনের ক, খ থেকে শেখা চলে না। উপরন্তু সে বলে কি ? উনি সত্যসত্যই আমাক হিউমিলিয়েশান

থেকেই বাঁচিয়ে দিয়েচেন বাবা,—ও আমার হতো না। দেখলাম,—উল্‌টে তার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে।

এখন তার লক্ষ্য—কলকাতা থেকে যে ছবিগুলি তিনি সঙ্গে এনেছেন, আর যা এখন ডাঃ গুপ্তর বাড়িতে বসে বসে আঁকচেন,—তা দেখবার জন্য সময় ঠিক করতে আমায় অনুরোধ আরম্ভ করেছে,—চল না, বাবা—একদিন দেখে আসি।

সে যাই হোক, এখন তাকে বিদায় করতে হবে একটা ভদ্র অছিলায়। বললাম,— যাকগে, বলিস, আমি বিশেষ দরকারে স্টেশনে গিয়েচি, সে আপনিই চলে যাবে'খন।

জানিনা, এই মৃদু উপেক্ষা সে বুঝেছিল কিনা। আর যদিই বা বুঝে থাকে তাহলেই বা কি,—আমার মত লোকের ফেভার পেতে যদি দুচার দিন হাঁটাহাঁটিই করতে হয়, এটা এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং এটাই দস্তুর। সবাই করে থাকে, যাদের কাজ চাই।

ডাঃ গুপ্ত তার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং সমপদস্থ একজনের মতই ব্যবহার করেন, যার ফলে সে আমাদের সঙ্গেও খুব খোলাখুলি ব্যবহার করতে চায়। আমি তা চাই না। আমি চাইতাম, সে আমাদের পদমর্যাদার উপযুক্ত সম্মানজনক ব্যবধান রেখে চলুক! কিন্তু সে সেদিক দিয়েও যেতে চাইত না,—আমরা যে তার মুরুব্বি, আমাদের অনুগ্রহই যে তার কাম্য একথা কিছুতেই তার মাথায় ঢোকানো যেত না। সে স্পষ্টই বলে দিতো, দেনেওয়ালা একমাত্র ভগবান, মানুষে কি করবে? এইখানেই আমরা সঙ্গে তার বিরোধ।

প্রায় মাস পাঁচেক কাটালো ঐভাবে। আমারও বাইরের ভাব একই রকম রইলো। তার পরই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার,—একদিন সে এসে সোজা কথায় স্পষ্টই বললে,—

আপনার আশ্রয় ছাড়া আর আমার গতি নেই, দেখচি।

ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। ডাঃ গুপ্তের এক আত্মীয় পরিবার আসছেন। তাঁর বাংলো ছোট, জায়গা কম,— কাজেই তাকে ওখান থেকে সরতে হবে। সেইজন্যই আমার আশ্রয় ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখন আমার সি ক্লাসের, বেশ বড় বাংলো, অনেক ঘর। ফ্যামিলির মধ্যে আমার ছেলে ও একটি মেয়ে ; স্ত্রী প্রায় সাত বৎসর পূর্বে স্বর্গে গেছেন ; মেয়েটিকে নিয়ে আমি একটি ঘরে থাকি, আর ছেলে একটি ঘরে তার পড়াশুনা নিয়েই থাকে। বাকী ঘরে গেষ্ট অথবা আপন কেউ এলে থাকে। একবার কথা প্রসঙ্গে আমিই তাকে এ কথা জানিয়েছিলাম,—সে জানতো ব্যাপারটা,—তাই আশ্রয়ের কথা বলা সহজ হয়েছিল।

তাকে বললাম,—বেশ তো, চলেই আসুন না, পশ্চিম দিকের ঘরখানায় থাকবেন। প্রসন্নমনেই বলেছিলাম কথাটি ;—আমার আশ্রয় ছাড়া তার গতি নেই কথাটা তার মুখ থেকে শুনতে ভারি শ্রুতিরোচক লেগেছিল।

সে অবশ্য তখনই এলো না, কারণ তাদের আসতে কিছু দেরী ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে তার যাতায়াত যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে যা ঘটবার তাও ঘটে গেল ; তাকে একটা বিষম আঘাত দিয়ে ফেললাম, যার ফলে আমার এই অসাধারণ দুর্ভোগ, আমার জ্ঞান বিশ্বাসের ধারা একেবারেই বদলে দিলে।

ঘটনাটা সহজেই ঘটে গেল। সত্যই তখন কোনো রকমেই ধরতে পারলাম না যে, আমার এই ব্যবহার তার সরল প্রাণে কতটা গভীর আঘাত দিয়েছে।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল, তাই অফিস থেকে এসে আর বাইরে বেড়াতে গেলাম না। বিরাট কম্পাউন্ড, যত রকম মরসুমি ফুল ফুটে যেন আলো করে আছে বাগান। এক জায়গায় প্যানসির বিছানা, তারই মাঝে মাঝে পপিও আছে। সেই ক্ষেত্রেই কিছু তফাতে তফাতে পিচগাছ—ফুলে ভ'রে গিয়েছে। সে যে কি রংয়ের খেলা তা ব'লে বুঝাবার নয়। দেখতে দেখতে মনটা যেন ভ'রে উঠলো। ঠিক ঐ সময়েই দেখি—শিল্পী একটা জায়গায় বোসে, নিবিষ্ট মনে ঐ দৃশ্যই উপভোগে তন্ময়। দেখে ভারি চমৎকার লাগলো। কাছে গিয়ে ; —কখন এলেন ? জিজ্ঞাসা করলাম। তার ধ্যানটি যেন ভেঙ্গে গেলো,—বললে, এই কতক্ষণ এসেচি। প্যানসী, পপি, তার সঙ্গে ফুলে ভরা পিচের শোভাই দেখেছিলাম ; কি চমৎকার—এমনটি আমাদের বাঙ্গলায় তো দূরের কথা, এখানে আর কোনো কোয়ার্টারে দেখি নি। অপূর্ব রচনা।

আমার মধ্যে একটা প্রীতির দোলা লাগলো। লোকটির কথায় এমনই একটা আন্তরিকতা আছে যেটি শুনলেই নিঃসন্দেহে প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করতেই হয়। তাকে বেশ সহজ একটা বন্ধুত্বের আহ্বান দিলাম—আসুন না, একটু বসে কথা কওয়া যাক।

ডাকলাম আমি, কিন্তু কথা কইলে সে। সুন্দর একটা প্রসঙ্গ, প্রাকৃত নিয়মের কথা নিয়েই আরম্ভ করলে—আগে ঐ ধরনের কথা কোথাও শুনিনি। তার একটা বৈশিষ্ট্য দেখেছি, যে প্রসঙ্গ নিয়েই কথা আরম্ভ হোক না কেন, সে ঠিক প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ভগবৎ প্রসঙ্গে এনে ফেলবেই,—আর তখনকার মত বিশ্বাসী করে তুলবে। বেশ যেন একটা নেশার মত ভাব এসে যায়। এখন শ্রদ্ধাই হয়েছিল, বললাম,—আজ বেশ লাগচে আপনাকে পেয়ে। কিন্তু আমায় এখুনি বেরোতে হবে, একটা বিশেষ এনগেজমেণ্ট আছে কিনা। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

বিনয়পূর্ণ ভদ্র ভাবেই সে বললে, হুকুম করুন,—

দেখুন, আগামী শনিবার আপনার নিমন্ত্রণ রইলো, সকাল সকাল আসবেন, বেশীক্ষণ থাকবেন, শেষে খাওয়া দাওয়া করে যাবেন। শুনে সে বললে, এ এমন বেশী কথা কি বেশ তো, তাই হবে। তখন বললাম, আর আমার ছেলেদের একটু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু ভাল কথা শোনাবেন ! কেমন ?

তাইতে সে বলে কি,—যে ভাবে এ্যাংলিসাইসড্ করে তুলেছেন ছেলেদের,—ধর্ম কথা ভাল লাগবে কি ? তাদের জীবনের আউট লুকটাই বদলে গিয়েছে যে।

কথা শুনে আমার ভিতরটা আবার রি রি করে উঠলো, স্পর্দ্ধা দেখ ! তবু বললাম—আমাদের যে এদিক ওদিক দু দিকই রাখতে হবে, এটাও চাই, ওটাও চাই। তাইতো এখন থেকেই তাদের কানে একটু একটু ঢুকিয়ে দিতে হবে, তবেই না সময়ে তার ফল পাওয়া যাবে।

সে আর তর্ক না করে বললে ;—আচ্ছা, তাইই হবে।

কথা রইলো শনিবার সন্ধ্যায় আসবে, খাওয়া দাওয়া করবে—ইত্যাদি ;— এইভাবে সে দিনের কথা শেষ।

শনিবারে তার আসবার কথা,—আমার মনেই রইলো না ; কারণ একটা মহা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছিল।

মিঃ বোস—বড় একটা কমিশনে রেঙ্গুন যাচ্ছেন। এত বড় কাজ এর আগে কোনো ভারতীয় কর্মীকে দেওয়া হয়নি। সেই শুভ উপলক্ষ্যে তাঁর ওখানে একটা পার্টির আয়োজন হয়েছিল।

খুবই সত্য, আমার এ ভুলটা অনেকটাই ইচ্ছাকৃত। ঐ লোকটাই তো সেদিন আমার ছেলেদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাবার অনুপযুক্ত, এংলিসাইসড্ বলেছিল—তাতেই আমার মধ্যে এমন ভাবে একটা আঘাত লেগেছিল যাতে আমি তাকে এতটা উপেক্ষাই করলাম।

তার কথা যাই হোক, শনিবারে কিন্তু বোস সাহেবের বাড়িতে যে পার্টিটা হলো তা যথার্থই উপভোগ্য। সুখের তো বটেই, তা ছাড়া তাকে ইউনিক্ বলাই ঠিক। এর আগে এতটা কোথাও হয়নি। যতো বড়ো বড়ো অফিসার, ছ হাজারী, পাঁচ, চার, তিন, আড়াই, দুই এবং এক হাজারী পর্যন্ত ছিল। তারপর মহিলা সমাবেশ,—সে কথায় আর কাজ নেই। আর ডিনারের কথা একমুখে বলবার নয়। সত্য বলতে, এমন বিচিত্র ব্যয়-সাধ্য পানীয় ও ভোজ্য এর আগে কোথাও ভোগ করেছিলাম ব'লে তো মনে পড়ে না। তারপর পরিবেশ,—পরম সুখকর। তৃপ্তি আমার পূর্ণরূপেই হয়েছিল ; সবার উপর স্যার বি. এল. ও লেডি মিত্রের উপস্থিতি, মহামান্য শ্রেষ্ঠ অভ্যাগত রূপে। মহাভাগ্য না হলে এ যোগাযোগ কারো কখনও ঘটে না। শেষে, রাগিনী দেবীর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য পর্যন্ত। কোনো দিকে ফাঁক নেই, ফাঁকিও নেই।

ঘরে ফিরতে আমার সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

তখনও পোষাক ছাড়িনি, শুনলাম, শিল্পী ঠিক সাড়ে সাতটার সময়েই এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেও ছিল ; যখন এখানকার কেউ এলোনা তখন একখানা স্লিপ লিখে রেখেই চলে গিয়েচে।

নেপালি চাকর স্লিপটা হাতে দিলে, তাইতে পরিস্কার বাঙ্গলায় লেখা ;—

আপনার অনুরোধপূর্ণ আহ্বানে ঠিক সময়েই এসেছিলাম ; তৃপ্তিপূর্বক ভোজন,— শেষে ছেলেদের সঙ্গে খানিক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বিদায় নিলাম। ধন্যবাদ।

চাকরের কাছেই শুনলাম, ছেলেরা বিকালেই ক্লাবের পার্টিতে গিয়েছে,— এখনও তারা ফেরেনি।

ভেবে দেখলাম, তাদেরও তো শনিবার !

কাগজখানা টুকরো টুকরো, যাকে বলে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। গা জ্বলে যায়—আঃ, কি অশান্তি। উঃ—এই ভদ্র ভিক্ষুকদের স্পর্দ্ধা কতটা বেড়ে গিয়েছে, আর সেটা আমাদেরই উদারতার গুণে।

দূর করো ছাই !

যাই হোক, আমার তিলমাত্র অনুশোচনা হলো না। বরং খুব খানিকটা স্ফূর্তি হলো এই ভেবে যে, ঠিক হয়েছে—কেমন ? এই ইনসাল্টটাই আমার শান্তি।

তারপর মন থেকে তাকে দূর করে দিলাম। আজকের পার্টির সুখের কথা, রাগিনী দেবীর নৃত্য যে স্বর্গের জিনিস, কি মিউজিক, আর অপূর্ব পরিবেশ ! ভোজনে বহুকাল এমন সুতৃপ্তির মুখ দেখিনি !—রাত্রি বারোটা,—

আজকের সুখের ভাবনায় বিভোর ;—শুয়ে পড়লাম এবং অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে গেলাম অল্পক্ষণেই।

॥ ৩ ॥

ঘুমটি ভাঙ্গলো ভোরবেলায়, যে সময় আমি উঠি। অবশ্য ঠিক ঘুম ভাঙ্গবার আগে, যেমন হয়ে থাকে খানিক স্বপ্নাবস্থা,—সেই সময়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য, পাড়াগাঁয়ের পথের ধারে যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি—ডান হাতে আছে আমার একখানা কাস্তে আর বাঁ হাত ধরে টানাটানি করছে একটি কালো, ময়লা কাপড় পরা, মাথায় চুড়ো-খোঁপা বাঁধা একটি ছোট মেয়ে ; বলছে—চলো না, বাড়ি চলো না, মা যে এঁদে বেড়ে বোসে আছে। ঠিক তখনই ছ্যাঁৎ করে ঘুমটা ছুটে গেল আর তখনই উঠে বসলাম।

স্বপ্নটা বুঝি তখনও ছাড়েনি,—একি বিছানা, একটা তক্তার উপর মাদুর, আর জরাজীর্ণ কাঁথা, একি ব্যাপার, মশারীর চারিদিকে তালি, ময়লা, দুর্গন্ধ, শিশু ছেলে-মেয়েদের শুকনো মুতের গন্ধ। পাশে শুয়ে ও কে? কালো-পাড় কাপড়, ময়লা রং, হাতে রুপোর দুগাছা চুড়ির নীচের দিকে একটি শাঁখা, লোহা আর কাঁচের চুড়ি। মোটা মোটা গাঁটওয়ালা আঙ্গুল, একটি হাত ফেলা আর একটি হাত মাথার নীচে, আমার পাশেই ঘুমোচ্ছে ভোঁস ভোঁস শব্দে। কাপড় গায়ে নেই, কতকটা কোমরে জড়ানো। পিঠের দিকে খোলা আর পায়ের দিকে হাঁটুর উপর অনেকখানি গুটানো। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি, বীভৎস লাগে সেদিকে চাইতে। একি ব্যাপার, এরা কে? আমিই বা কোথা? তারপর গোঁফটা চুলকে উঠলো। আমার এ কি শরীর? মাথায় টাক নেই, ঘন ঘন চুলভরা মাথা, মোটা গোঁফ, এত বড় দীর্ঘ শরীর, এ দেহ তো ছিল না আমার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সাত আট দিন না কামালে যেমন হয় সেই রকম। এমন স্বপ্ন তো কখনও দেখিনি জীবনে।—এ স্বপ্ন—নিশ্চয়ই স্বপ্ন আমি মিঃ দত্তগুপ্ত, সাজাহান রোডে, সি গ্রেড বাংলোতে থাকি, আমি কখনও এখানকার কেউ নয়। এখানে আসবো কি করে। কিন্তু স্বপ্নটা ভাঙ্গছে না যে, কি মুস্কিল, বসেই আছি, চোখ রগড়ে রগড়ে বেদনা হয়ে গেল, তবুও স্বপ্ন অনেকক্ষণই দেখছি—অদ্ভুত, বিচিত্র অবস্থার স্বপ্ন এর আগেও অনেক দেখেচি, অল্পক্ষণেই ঘুম ভেঙ্গেছে, জেগে উঠেছি, বাথরুমে ঢুকেছি।

আমার বাথ-রুমে কারো প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আজ এ কি আপদ,—কোথা বাথরুম? একটা পুরানো, খড়ের ছাওয়া চালা ঘর ;—ছেলেবেলা যেতে আসতে রেলপথের ধারে গ্রামের চাষাভূষোদের যেমন দেখেছি এ যে সেই রকম সব। আচ্ছা, মনে মনে জিজ্ঞাসা করছি এরকম অবস্থার কেমন করে সম্ভব হলো? কোথা দিল্লী, সেই ইম্পিরিয়্যাল দিল্লী আর কোথা বাংলার এই চাষা প্রধান পল্লী। যাক মজা মন্দ নয়। আর কতক্ষণ এটা থাকবে, কাটলে যে বাঁচি।

এমন সময় একটা বুড়ীর গলার আওয়াজ, যেন দরজা থেকে গলাটা বাড়িয়ে বলছে, অ—নিস্তার,—ওমা, এখনও শুয়ে আছিস? শুনামাত্র পাশের নিদ্রামগ্না প্রায় উলঙ্গিনী নিস্তারিণী ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—ওমা, ফরসা হয়ে গেছে, আমায় একটু গা ঠেলে ডেকে দিতে পারোনি—দেখ, মিনষের রকম দেখ, যেন কাকে বলছি তো কাকে বলছি ;—বলি, ওগো শুনতে পাচ্ছনা,—মা যে ডাকতেছে। ভোরে উঠে পড়বো, ধান সেদ্দর কাজ পড়ে রয়েছে। বলি বসে বসে ঘুমুচ্ছো নাকি? টাকার কি হলো, কিছু সুবিধে হলো কোথাও? তোমার

হলো কি—রা কাড়োনা যে বড়,—ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে রয়েছো? কাছারীতে যেয়ে আজ টাকা দিতে হবেনি বাবুদের?

আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে একবার মাত্র ঐ জমাদার চাষাণী স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে দেখলাম;—এত সব কথা এ মাগি কাকে বলছে? তারপর দেখি, তাড়াতাড়ি উঠে মশারীর বাইরে গিয়ে কশি দিয়ে কাপড় পরতে লাগলো। এমন সময় ছোট মেয়ে একটি, যে মায়ের পাশেই শুয়েছিল, উঠেই, ও মা—বলে একটানা কান্নার সুর ধরলে।

ততক্ষণে ঘরের দরজার কাছ থেকে আমায় লক্ষ্য করে নিস্তার বললে, ও মা, অমন ঝুম মেরে বসে দিন কাটাবে নাকি? নাঃ, ওঠো না গো—তুমি মেয়েটিকে একটু দেখো, আমি ঘাটে চল্লুম, ম্যালা কাজ পড়ে আছে। নিস্তার চলে গেল, মেয়েটিও মশারী তুলে বেরিয়ে উপর থেকে নামতে চেষ্টা করলে,—না পেরে,—মা, মা করে জোর গলায় কান্না লাগালে। আমি মহাবিরক্তির মধ্যে এই স্বপ্নই দেখতে লাগলাম।

স্বপ্ন অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন নচ্ছার, দীর্ঘকালস্থায়ী স্বপ্ন কখনও দেখিনি। ছি-ছি, আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগলো—বিরক্তিতে এক একবার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হলো। কি করি? এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে আমি যে কি সূত্রে আসতে পারি সেটা ভেবেই পেলাম না। স্বপ্ন হলেও তার তো একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ সূত্র থাকবে? কিন্তু আমি মিঃ দত্তগুপ্ত, সি. আই. ই., সাড়ে তিন হাজার গ্রেডের গেজেটেড অফিসার, আমার সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের এক অজ পল্লীগ্রামের ঘৃণ্য চাষী পরিবারের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?—কি সূত্রে আমায় এই নোংরা দুর্গন্ধপূর্ণ ছেঁড়া মশারীর মধ্যে, কাঁথার বিছানার উপর বসে প্রভাতে, তাড়কা রাক্ষসীর মতো উলঙ্গিনী চাষাণীর এই সম্বোধন শুনতে আর নোংরা কুৎসিৎ একটি মেয়ের ঘ্যান-ঘ্যানানী শুনতে হচ্ছে?

আড়কাঠের উপর খস্ খস্ করে এক রকম কি শব্দ হলো; তখন কতক আলো হয়েছে, তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখি,—সর্বনাশ, প্রকাণ্ড একটি সাপ, বাঁশের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়ে পাঁচিলের ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে। হায়, হায় কাকেই বা ডাকবো, কাকেই বা দেখাবো। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম, সমনেই দেখি, বুড়ি একটি, হেঁট হয়ে শপ্ শপ্ করে কোঁস্তা দিয়ে দাওয়া ঝাঁট্ দিচ্ছে। বললাম, ওগো একটা সাপ ঐ যে উপর দিকে, আড়কাঠে।

বুড়ি ঠিক সেই ভাবেই হাত চালাতে চালাতে বললে,—যাও বাবা, সক্কাল-বেলা আর ঘরের ভেতর কেন, বাইরে যাও। আশ্চর্য, বুড়ী কালা নাকি? বললাম, সাপ,—কথাটা শুনতেই পেল না। আরও চীৎকার করে বললাম, শুনতে পাচ্ছ না—সাপ, একটা প্রকাণ্ড সাপ যে,—ঐ আড়কাঠে—। বুড়ী বললে, কে জানে বাছা, আজ তোমার আবার কি হলো, সক্কালবেলা, বাইরে যাওয়া নেই, ঘরের ভেতর থেকে না বেরিয়ে, সাপ সাপ করে চীৎকার করেছো—যেন একটা কি ভয়ানক লড়াই হয়েছে। যেন বাপের জম্মে ঢোঁড়া সাপ কখনও দেখনি, চালের উপর। বোলে, সে বিরক্ত হয়ে দাওয়ার অপর দিকে চলে গেল।

ঘুম ভেঙে গেলেই কোথা বাথরুমে ঢুকবো, তারপরে শাওয়াব বাথ্ আছে। স্নানশেষে একেবারেই অফিসের সুট পরে সোজা ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসবো, কাগজখানায় চোখ বুলোতে বুলোতে জবজবে মাখন মাখানো একখানি টোস্ট রুটিতে জেলীর সঙ্গে হাতে নিয়ে কামড় দেবো, ইতিমধ্যে ছেলে-মেয়ে সবাই

খাওয়া আরম্ভ করেছে দেখবো,—দুই একজন বান্ধবও সামনে বসে দুই একটা সরকারী অফিসের কর্ম সংক্রান্ত বকুনী ছাড়বে, আমি মহা প্রাজ্ঞের ভাবে একটু মাথা নাড়াব ; কোথাও বা একটা কথা বোলে সেটাতে রশান দেবো ; তা নয় আজ আমি কোথা ? এখানে কি করে এলাম, স্মৃতির সাহায্যে কোনো রকমে মীমাংসা করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে জড়বৎ এই অজ পল্লীগ্রামের মধ্যে এক চাষার ঘরে ছটফট্ করছি স্বপ্ন দেখতে দেখতে। এটা কি স্বপ্ন নয় ? তবে এটা কি ?

॥ ৪ ॥

মনের মধ্যে এক একবার কে যেন বলছে—স্বপ্ন বোলে বাস্তবকে উপেক্ষা পবিত্রচিত্ত দার্শনিকদেরই সাজে, তোমার মত পার্থিবমনা গরিমা-গ্রন্থি প্রধান চাকরে একজনের সাজে না।

তবে কি সত্যই আমি সেই দিল্লীর মিঃ এল. এম. দত্ত গুপ্ত নয় ?—আমি তবে কে ?—

উঠান থেকে একজন ভারী গলায়,—হলধর আছো, -হলধর ! বোলে সামনে আসতে লাগলো। আমাকে দাওয়ার উপর দেখে আরে দাওয়ায় দেঁড়িয়ে হাপু গুনচো কেন ?—হেথা এসো না— মাঠে যাবা নী ?

আমি হলধর চাষা ? কোথায় মিঃ ললিতমোহন দত্ত গুপ্ত, সি. আই. ই.—তা নয়, স্বপ্নে হলাম হলধর ?—কিন্তু আশ্চর্য, আমার এই পরিবর্তনটা ঘটলো কেমন করে ?—আমার স্মৃতি তো হলধরের নয় শরীর মাত্র রূপান্তরিত হয়েচে। বেশ মনে হচ্চে কাল রাত্রে মিঃ বোসের বাড়ি চব্য চোষ্য তৃপ্তিকর ভোজ্য উপভোগের পরে নিজ ঘরে এসে নিজের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শুয়েছিলাম নয়া-দিল্লীর সাজাহান রোডের ভিলার মধ্যে, আর আজ প্রভাতে ঘুম থেকে উঠলাম কি না হলধর নামে এক চাষা, নিস্তারিনীর স্বামী হয়ে— বাংলার অজ পল্লীর মধ্যে চাষাদের গ্রামে ; এটাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে ? তাহলে—ঐ আসল হলধর —সেই মানুষ যার শয্যায় শুয়েছিলাম সে কোথা ? হা ভগবান ! এই টোয়েন্টিএথ্ সেঞ্চুরীর মধ্য ভাগে এমন ঘটনা ঘটে কি করে ? মন্ত্র তন্ত্রের ব্যাপার তো কিছু নয়, আমার উপর ও-সব করেই বা কে ? আমি তো কারো কোনও অনিষ্ট করিনি. আপনার যা আছে তাই নিয়েই আমি এর মধ্যেই যা কিছু ভোগ উপভোগ ক'রে চলেছি। আমার শরীর কিভাবে পরিবর্তিত হলো ? মন, ব্রেন, চেতন ও স্মৃতি তো ঠিকই আছে কিন্তু পরিবর্তন শুধু দেহ আর পরিস্থিতি নিয়ে—এ কি ব্যাপার ?

এখন লোকটি আমার হাত ধরে হুড়মুড় করে টেনে নিয়ে গেল একেবারে দরজার বাইরে পথের ধারে। সামনেই অনেকটা চওড়া মাটির রাস্তা আর সেই রাস্তার উপরে একটা বটগাছ ; তার নীচেই একটা চালাঘরে কামারশালা ; হাপর চলছে এই সকালেই। লোকটা সেইখানে নিয়ে গেল আমায়। কামার হাতুড়ি পেটা বন্ধ করে আমার মুখের দিকে দেখলে,—বললে, এই যে হোলো দা,—তোমার চাউনিটা যেন কেমন কেমন দেখছি।

তাইতো তোলো ! ত্রৈলোক্যর ডাকনাম তোলো, ঠিক তো বোলেচিস,

বটে বটে। দেখে শুনে আর একজন বললে, হাঁরে হোলো, তোর হলো কি? ওরকম চেয়ে রয়েচিস ক্যানো বল্ দি—

আমি কি এখনও ভাবব যে স্বপ্ন দেখচি এই সকালবেলা?

মোড়লের ভাই। তোর যে দেখি আজ ভাব চাগালো—হাঁরে হোলো, কাল হরিসভায় তো খোলে একবার হাতও দিলিনি। বল্ না তোর কি হলো? দেখতে দেখতে আরও জন দুই তিন এসে জুটলো সেখানে। বেশ বেলা হয়েচে,—এবার গাছের ফাঁকে সূর্য দেখা যাচ্ছিল। আমি তো ভাবতে ভাবতে সেখান থেকে আস্তে আস্তে পথ ধরে সামনের দিকে চলতে লাগলাম। ওরা আর আমার সঙ্গ নিল না। পিছনে তারা পরস্পর কথা কইতে লাগলো, শুনলাম একজন বলচে—কি ব্যাপার বল দি, আজ ওর হলো কি? ত্রৈলোক্য বলচে—আমি তো টেনে আনলাম, না হলে ঘরের দাওয়ায় দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে ভাবতেছে—ওর একটা কিছু হয়েচে, উপরি দেবতা লেগেছে। আর একজন বললে—ও সব কিছু নয়, খাজনার টাকার কথাই আসল।

পথে আর এক ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম;—বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এযে আমাদেরই সেই দিল্লীর আর্টিস্ট, অতিথি। ঠিক যেন সেই লোকটা, নিজের জায়গায় থাকলে যেমন হয়—খালি গা, পায়ে চটি, কোঁচা ঝুলছে, দাঁতন করতে করতে চলেছে। আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। মুচকি হাসি তার মুখে, বললে, কি হলোধর!

আমি তো অবাক। ভাবলাম,—আমায় হলোধরই বললে। এঁ্যা, তা হলে এ কি জানে আমার সব কথা?

আমি বললাম,—আপনি এখানে যে? সে বললে,—আরে তুমি জানো না নাকি এখানে আমার মামার বাড়ি—আমায় কখনও কি তুমি এখানে আগে দেখনি নাকি যে জিজ্ঞাসা করচো? আর অমন অবাক হয়েই বা দেখছো কেন বলতো? ভাবাবেগ সামলাতে না পেরে আমি বললাম,— আপনি দিল্লীতে ছিলেন না? রাতারাতি এখানে এলেন কি করে?

সে বললে, যেমন করে তুমি এসেছ তেমনি করেই আমিও এসেছি। এমন সময়ে একটি ফুটফুটে ছোকরা এসে তাকে সম্বোধন করে বললে,—অপু দা, তোমায় মোহিনীকাকা ডাকতেচে।

লোকটা কে? একেবারেই আমাদের সেই দিল্লীর অতিথি উপাধ্যায় শিল্পীর মতই দেখতে। তাকে যখন অপু'দা বোলে ডাকলে, তখন আমার মনে হলো এটা আমারই ভ্রম। মানুষের মত একটা মানুষ কি থাকে না, এ তাই হবে।

যাই হোক, এখন এই যে অপুদা, সে কিন্তু তখনই তার সঙ্গে গেল না; সে ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললে, ওরে পানু, এ বলে কি রে? দিল্লী থেকে কবে এলাম জিজ্ঞাসা করছে। তাহলে আমাদের হলোর দেখচি দিল্লী পর্যন্ত জানা আছে। দিল্লী তুই কবে দেখেছিলি, বল্‌তো হলোধর?

তখন আমি আবার সত্যকে নিয়েই অভিনয় আরম্ভ করলাম। বললাম, আজ সকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। যেন দিল্লীতে গিয়েচি আর আপনিও যেন আছেন।

অপুবাবু আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি বলে গেল;—আর তুই সাজাহান রোডে একখানা সি ক্লাসের বাংলোয় আছিস, লাটসায়েবের দপ্তরে কাজ করিস, মাসে আড়াই হাজার মাইনে পাস, বড় বড়

লোকের সঙ্গে ডিনার খাস, বাথরুমে শাওয়ার বাথে স্নান করিস। বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা হলে সেক্‌হ্যাণ্ড করিস। সাইকেলে অফিস যাস, মটরে করে পার্টিতে যাস, এ্যাঁ, কেমন, নয় কি? আমার মত একজন পোটো ক্লাসের লোককে রাত্রে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে ভুলে যাস্‌, নয় কি? তোর চেয়ে কতই না ছোট আমরা,—দাতা ও ভিক্ষুক সম্পর্ক, আমাদের মত লোকের সঙ্গে তোর,—না রে?

আমি তো স্তম্ভিত, বিস্ময়ে আমার দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসচে। তাহলে এ লোকটা তো সত্যই সব জানে। তারপর আর একটা মনে হলো, যে উপায়ে আজ প্রাতে আমার অবস্থান্তর ঘটেছে, এবও হয়তো তাই। মনে হলো, আমার দম্ভের ফলে বিধাতার এই দণ্ড।

॥ ৫ ॥

কি অদ্ভুত শ্লেষব্যঞ্জক হাসি অপুবাবুর মুখে,—আমার অন্তরাত্মাই জানেন কি আঘাত পেলাম তার কথায়। আমার অবাক বিস্ময় আর অন্তরের তোলা পাড়াটি যেন লোকটা বেশ তীক্ষ্ণ ভাবেই লক্ষ্য করছিল, তাই তারপর আবার বললে, কি?—হাঁরে হলোধর, নতুন দিল্লীর লাটসাহেবের অফিস, সহরের ঐশ্বর্য, চাকরীর মান আর সব সমান পদের বড় বড় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজের চরম উন্নতির অবস্থার স্বপ্ন—তাছাড়া আর দুনিয়ার তেমন সুন্দর কী-ই বা আছে?—আমার মত একজন তাঁবেদার, সে কি আর অত বড় ধনবান, উঁচু পদের অধিকারীর সঙ্গে সমান হতে পারে? তারপর ভগবান বোলে সত্যি কেউ আছে কি? অন্তর্যামী একজন সবার মনের কথা টের পায় এমন কেউ সত্যি সত্যি আছে নাকি? এ্যাঁ, এই সব ভাবিস না তো?

আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কি ভয়ানক, এই লোকটাই কি আমার মনের কথা বুঝে দণ্ড দিচ্ছে নাকি—এখনও কি আমি স্বপ্ন দেখছি?

আমি যেন কি একটা বলতে গেলাম,—আপনি আপনি,—এইটুকুই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, কানেও শুনলাম,—তারপর কি যে হলো জানি না, কেবল এইটুকু শুনতে পেলাম, ওরে পানু, ধর্‌ ধর্‌, আমাদের সম্ভ্রান্ত নতুন দিল্লীর একজন কম্যাণ্ডার অফ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ব্যাস, আর কোনো সংজ্ঞা নাই আমার। কতক্ষণ পর যেন জ্ঞান ফিরে পেলাম, আমার সেই দাঁড়ানো অবস্থাই রয়েছে। পানুর বলবান বাহু আমায় ধরে আছে, আমায় পড়ে যেতে দেয়নি। সেখানে অপুবাবু ছাড়া তখনও কেউ নেই। চেয়ে দেখি, লোকটা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ হাসিমুখে আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি চক্ষু মেলতেই সে বললে—আর কাজ নেই হলধর, তুমি যাও যেখানে যাচ্ছ,—তোমার ভাবে ভঙ্গিতে আমার মনে হল যেন তোমার জীবনের মধ্যে এই সময় একটা অভিজ্ঞতা এসেছে—যা কস্মিন কালেও তুমি ভাবোনি, চিন্তাও করনি, এমন কি কল্পনাও করনি—অবস্থাটা যেন স্বপনেরও অগোচর,—নয় কি?—আমার দিক থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে লোকটা আবার বললে—আমি আর কিছু জানি না, কেবল এইটুকু মনে হচ্ছে, —তোমার অন্তরের স্বার্থ, উচ্চপদ আর ধনের অহং গরিমাই তোমাকে এই অবস্থায় হয়তো এনেছে—দেখো যদি এতে তোমার চৈতন্য হয়।

ঐ কথা শুনে ভেবে দেখলাম, সত্যই তো আমরা এই সংসারের এখনকারই মানুষ,—একটু উঁচু হয়েছি কি অহংকারে ফুলে উঠি আর দম্ভই তখন আত্ম-প্রসাদের স্থান অধিকার করে ;—যাকে দেখি সেই-ই আমার চেয়ে কোন না কোন দিকে ছোট, আমার সব কিছুই সম্ভ্রান্ত, এই হলো আমাদের রোগ—আর তার ওষুধ-ও ঠিক পড়েছে ?

ক্ষুদ্র আমরা, আমাদের বিচারের ভুল হয় কিন্তু তাঁর বিচারে কখনও ভুল হয় না। আমরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী কেউ হয়তো একটু বুঝি, কেউ বা বুঝিই না, বুঝতে পারিই না। কারণ, ভিতরের জমাট অহংকার আর ততোধিক জমাট দম্ভ ঠিক বুঝতেই দেয় না যে।

আবার সময়মত একটু ভেবেই দেখো কথাটা। এই পর্যন্ত বলে লোকটি চলে গেল আর আমার দিকে চেয়েও দেখলে না।

আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম—হন্ হন্ করে ভদ্রলোক যাচ্ছে, এতটা দ্রুতপদে চলে গেল, সেটা অস্বাভাবিক মনে হলো।

আমি তো তাহলে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য-পথেই আছি। কিন্তু লোকটা যেন সব কিছুই জানে এবং বোঝে যা কিছু আমার অবস্থান্তরের ব্যাপার। বেশী দম্ভ-অহংকার আমার আছে। এ সংসারে কারই বা নেই ? সবারই তো প্রচ্ছন্নভাবে ঠিক ওটা আছেই, বিশেষতঃ তাদের তো থাকবেই সেল্ফমেড্ ম্যান যারা,—তবে আমার বেলা বিধাতার এমন একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা হলো কেন ?

আমায় এই স্বপ্নেই পেয়ে বসলো দেখচি। তবে কি স্বপ্নই দেখতে হবে ? দেখি পথের ডানদিকে টিনের উপর লেখা রয়েচে, বাকুলে-চাঁদপুর পোস্ট অফিস, থানা কুলপী। হে ভগবান।

একি, আমি আবার ভগবান বলছি কেন ? আমি তো ও জিনিসটি কখনও মানি না,—মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি যে সমাজে অথবা সংসারে অন্যায় ও অশান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের মনবুদ্ধির অগোচর একটা অস্বাভাবিক আদর্শ দেখানো আছে মান্ধাতার আমল থেকে, না হলে আসলে ভগবান বলে সত্যি সত্যি কেউ আছে নাকি ? তবে হেথায় হরিসভা করি, কালীবাড়ীর চাঁদা দিই, দুর্গাপূজার ব্যবস্থার মধ্যে থাকি কেন ? আমার মত অবস্থাপন্ন একজন, —এসব না করলে হবে কেন ? ঢাকার আনন্দময়ী মায়ের ভক্তদের মধ্যেও তো আমি একজন অন্তরঙ্গ—সবাই তাঁর এঁটো ফল, মিষ্টি, গ্লাসে খাওয়া জল প্রসাদ পায়, আমিও পাই। তাতে কি হয়েচে,—লোকে ভক্ত বলে বলুক না, আমি তো জানি আসলে ও-সব কিছুই নয়।

এর মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে, আমার মূর্তিটা ঠিক এদের হলধর হলো কি করে ? তারপর সেই আমি কেমন করেই বা ওভারনাইট নিউ দিল্লীর সাজাহান রোড থেকে এই বাকুলে চাঁদপুরে এসে গেলাম।—আর এখানকার সংসারী হলধর, দরিদ্র চাষীর মেটে ঘর-দোর, খড়ের চাল, তাতে সাপ বেড়াচ্ছে, এ সব ফেলে সে গেল কোথা ? আশ্চর্য নয় কি ? এখানে আমার স্থান হলো কি করে, এর মধ্যে কার ষড়যন্ত্র আছে ? আবার ভাবি, অদ্ভুত ব্যাপার—এই হলধর গেল কোথা ? তাহলে নিউ দিল্লীর আমার বাংলোতে যেখানে আমি থাকতাম, সেখানেই আমার বদলে নিশ্চয়ই এখানকার শ্রী হলধর আছেন। এ যে সুবর্ণ

গোলকের গল্প। এখানে দুটো মানুষের রূপ ছাড়া মন বুদ্ধি নিয়ে বদলা-বদলি হয়ে গেল। এ কখনও হয়?

তাও যেন হলো, কিন্তু ওভার নাইট জায়গা বদল হলো কি করে, হলধর গেল দিল্লীতে বাংলোয়, ললিতকুমার এলো বাকুলে চাঁদপুরে ২৪ পরগণা জেলায় ডায়মণ্ড হারবার সাবডিভিসনে কুলপী থানার অধীন এই অজ পল্লীগ্রামে। এরকম ট্রান্সফরমেশান, এক্সচেঞ্জ অফ সোল—বিংশ শতাব্দিতে! কেউ শুনলে মনে করবে লেখক অপ্রকৃতিস্থ—যুক্তির একটা সীমা আছে তো? আচ্ছা, আমার বাংলোয় এতক্ষণ কি হচ্ছে—যাওয়া যায় না একবার দেখতে?

এখান থেকে যেতে কম্ সে কম্ থার্ডক্লাসে গেলেও প্রায় পঞ্চাশ টাকা লাগবে। আমার কাছে এই টাকা তো নেই—কোথা পাবো টাকা? পঞ্চাশ টাকা এক সঙ্গে এ গ্রামে কারো আছে কিনা সন্দেহ।

আবার একটা কথা মাথায় এলো—আর ঠিক করেই ফেললাম মনে মনে যে, অপরিচয়ের ভাবটা ত্যাগ করে এদের সঙ্গে পরিচিতের মত ব্যবহার করিনা, তাতেই দিল্লীতে ফেরবার পথ দেখতে পাবো, হয়তো পেয়েও যেতে পারি।

এখন, সকল বিষয়ে সব কিছু অপরিচিত ভাবটা ত্যাগ করে সহজ হলধরের অভিনয় আরম্ভ করে দিলাম, যেন আমি সত্যই হলধর। ঐ কামারশালার ঘর থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম, এখন সেইখান দিয়েই চললাম। যেটা হলধরের ঘর সেখানে গিয়ে দাওয়ায় দেখি আগুনভরা মালসা সামনে, তামাক খাচ্ছে দু'টো ছোকরা :--আমাকে দেখেই তার মধ্যে একজন বলে উঠলো,— ও বা, অর্থাৎ বাবা, এই মাত্তর বাউদের বাড়িথে খেত্তোর পাক্ এসেছিল, বলে বাউরা তোমায় ডেকেচে,—তুমি যাবা না?

বুঝলাম দুটি হলধরের ছেলে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ—কালো রং, কিন্তু সুন্দর ছেলে—আমার নিজের ছেলের চেয়ে ঢের মানুষের মত। বেশ লাগলো। কিন্তু জমিদার বাবুদের বাড়ি কোন্ দিকে তা তো জানি না,—ভাবলাম—এই ছেলেকে নিয়েই যাওয়া যাক্, সে তো চেনে? এখানকার বাবুদের সঙ্গে তো দেখা হবে,—এক নূতন অভিজ্ঞতা। ভেবে চিন্তে বললাম, চ' তুই আমার সঙ্গে, দুজনে যাই। সে বলে, আমায় খড় কাট্টে হবে এখন, হাতের কাজ ফেলে পারবুনি,—বাবা, তুমি যাও না।

এও তো এক সঙ্কট, তার দৈনন্দিন কাজের ব্যাঘাত করে জোর করে তা নিয়ে যাওয়া যায় না—কি করি, মহা মুস্কিল! এমন সময় উদ্ধার করলে ঐ ক্ষেত্তোর পাক এসে।

এই যে হলোধর,—তোকে মেজবাবু ডেকেছে, তুই গিয়িলি কোথা রে? তার কথায় জবাব না দিয়ে বললাম—চ—যাই।

॥ ৬ ॥

পথ সোজা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তারপর ডানদিকে ঘুরে একেবারেই জমিদারদের দেউড়িওয়ালা বাড়ির সামনে। গিয়ে উঠলাম প্রকাণ্ড আটচালায়। সামনেই চণ্ডী দালান। বারান্দা তিন দিকে—বড় বড় ঘরের সারি। সামনে বাঁদিকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মোটাসোটা গায়ে কোট, আধা বয়সী, এক হাতে ঝক্‌ঝকে চাবির গোছা, একবার করে বার কচ্চে আবার পকেটে পুরে রাখছে অন্যমনস্কভাবে। আর তার পাশে রোগা, ফরসা একজন, কেবল জুল-

পিতেই কাঁচাপাকা চুল, গায়ে গেঞ্জি, টেরীকাটা ভদ্রলোক একখানা চেয়ারে বসে গড়গড়িতে তামাক খাচ্ছে। তাছাড়া অনেকগুলি প্রজাও আছে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে। আমায় দেখেই সেই কোটওয়ালা বললে,—এই হলো—তুই থাকিস কোথা ? আজ সক্কালে টাকা নিয়ে আসবার কথা মনে নেই বুঝি নবাব পুত্তুরের ? কথা শুনেই আমি একেবারে জ্বলে উঠলাম, আর অভিনয় মনে রইল না, প্রণাম কার্যটি করতেও ভুলে গেলাম। বললাম,—আপনারা ভদ্রলোক, ওরকম অভদ্র ভাষায় কথা কইছেন কেন ? আমরা তো সবাই মানুষ, আপনারা না হয় জমিদারই হয়েছেন।

বিস্ময়ে অবাক। ওখানকার সবাই আশ্চর্য ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বুঝলাম এক্ষেত্রে আমার কথাগুলি খাটেনি, ব্যাপারটা খারাপ করে ফেললাম। বাবু বললেন, দেখো উমাচরণ, তোমার ভাই-এর বাড়টা কিরকম হয়েছে। তবে রে হারামজাদা, শুয়ার কি বাচ্চা, তুমি বড় ভদ্রলোক হয়েছ বটে, দাঁড়াও, তোমার ভদ্রতা বার করচি। বোলেই, এই কে আছিস—এই দোবে।

আমার ভাই—উমাচরণ ! দেখি, বেশ ভব্যযুক্ত চমৎকার মূর্তি, প্রৌঢ়, গলায় তুলসীর মালা, শান্ত চাউনি, আমার দাদা !

দোবেজী ঐখানে দেউড়িতেই ছিল,—জী হুজুর, বোলেই লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালো। বাবু বললেন, এই ! হলোকো কান প্যাকাড়কে হামারা সামনে ঘোড়দৌড় করাও। ঠিক ঐ সময়ে উমাচরণ জোড়হাতে এসে বললে, মেজবাবু ! ওর মাথা খারাপ হয়েচে ; কাল থেকে দেখছি, টাকা যোগাড় করতে পারেনি,—খায়নি দায়নি, সারা রাত ঘুমোয় নি।

দোবে কিন্তু বাবুর হুকুম মতই আমার কান ধরতে এলো কিন্তু সেই বিরাট শরীরের কাছে আমি পারবো কেন, আমার হাত দুটো ধরে সে এক হাতে মুঠের ভিতর রাখলে, তারপর কান ধরতে এলো, মেজবাবু বললেন,—থাক্ থাক্। তখন ছেড়ে দিয়ে সে পাশে দাঁড়ালো।

বেশ বুঝতে পারলাম, গাঁয়ের মোড়ল উমাচরণের জন্যই বেঁচে গেলাম, আর সে হলধরেরই দাদা, এখানে আমারও। এমন সময়ে দেখি, সেই অপুবাবু, বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো, আমার দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে সে একটু মুচকে হেসে ধীরে ধীরে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবেই পায়ে পায়ে আমার পাশেই এলো তখন মেজবাবু গোমস্তার সঙ্গে কি একটা কথা কই-ছিলেন, এদিকে লক্ষ্য ছিলনা, এই অবসরে অপুবাবু আমার ঠিক কানে কানে বললেন,—এতবড় বুদ্ধিমান মানুষ, দেশ কাল পাত্র হিসেব করে কথা কইতে পারো না,—বোলে যেমনভাবে এসেছিলেন সেইভাবে বরাবর বাড়ির ভিতর দিকে আবার চলে গেলেন। আমার যা হচ্ছিল সে কথায় কাজ নেই। এখন আসল ব্যাপারটাই বলি,—

বাবু এবার বললেন,—কই ভদ্রলোক ! টাকা কোথা ?

আমি ধীরে ধীরে বললাম, কই টাকা, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন—তবে যে পরশু সকালে বড় জাঁক করে বোলে গেলি, আজ সকালেই খাজনা মিটিয়ে দিবি ! উত্তরে শুধু বললাম যে,—আমার টাকা নেই।—তাতে বাবু রেগে বলে কি, একথা বললে আমাদের চলবে কি করে ? আজ বাদে কাল লাটের কিস্তি পাঠাতে হবে না ? আমি সেই এক কথাই বললাম,—টাকা নেই আমার। তখন বললেন, নেই তো ধার করে দে।

ভাবলাম, ধার করেই দেবো। দিতে যদি হয়তো ভালো করেই ধার করে এদের টাকা, আরও গোটা পঞ্চাশ টাকা বেশী করে নিয়ে দিল্লী পাড়ি লাগাই, তারপর যার দেনা সে বুঝবে। যদি তার সঙ্গে দেখা হয়তো টাকাটা দিয়ে দেওয়া যাবে। একবার দিল্লী পেঁছিতে পারলে হয়। এই সব মনে মনে ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ধার কোথায় পাবো টাকা। বাবু বললে, কেন, চৌথী আছে, দোবে আছে, এদের কাছে চোটার সুদে ধার কর্‌গে যা না।

তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কত টাকা চাই ঠিক করে বলে দিন তাহলে। বাবু গোমস্তাকে বলতেই, গোমস্তা খাতা দেখে বললে, পরশু সকালবেলা ঠিকঠাক হিসেব করে দিলুম,—সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা তিন পাই।

যাক্‌, তাহলে দুবছরের খাজনা সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা আর পঞ্চাশ টাকা, মোট অষ্টআশী টাকা। এইমাত্র কান মলা খেতে খেতে রয়ে গেছি যে লোকটির কাছে, তার কাছেই আবার যেতে হোলো! সে আমায় গোলাবাড়িতে নিয়ে গেল, বললে,—বৈঠ যা। বসেই রইলাম। আমার অদৃষ্টে এতও ছিল, ততক্ষণে দোবে কোথা থেকে টাকা নিয়ে এলো। টাকা রাখবার জায়গাটা তাদের লোকচক্ষুর অগোচর। কত টাকা গুণতে সে বলে কি, এত টাকা কেন চাই? এমন সময় গোমস্তাটি পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত, বললে, ওই সঙ্গে আমাদের টাকাটিও আছে, সেটিও যেন ধরে নিও।

আমি তো অবাক, তোমাদের টাকা আবার কি?

আহা, খোকা, যেন কিছু জানেন না, আমাদের হিসাবটা কে দেবে? তারপর ঐ পেয়াদার টাকাটি, যে ধরে এনেছে সরকারী কাছারীতে, তারপর চৌকিদারি, পথ-কর, বারোয়ারীর চাঁদার টাকা কে দেবে?

বাব্বা! এ সব কি? শেষে খাজনার উপর আরও পাঁচ সাত টাকা দিয়ে তবে মুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে হলধরের উপর একটি মমতা এলো, আহা, বেচারা তো ধনে-প্রাণেই মরচে এই জমিদারের জমি চাষ করতে এসে। হঠাৎ আপন মনেই প্রার্থনা করে ফেললাম,—

হে ভগবান! এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে দাও, কমিউনিসম্‌ আসুক। চট্‌ করে মনে পড়লো, ব্যাংকে যে আমার দেড় লক্ষ টাকা আছে। তাছাড়া আরও কত দিকে কত টাকা রয়েচে, তা হলে আমার সে টাকার কি হবে। কমিউ-নিসম্‌ এলে আমার ব্যাংক ব্যালেন্সটা থাকবে কি করে? যাক্‌, চুলোয় যাক, কাজ নেই ও সব পাপ কথায়—এখন দোবেকে বললাম, তাহলে আমায় নব্বই টাকা দাও। টাকা পিছু রোজ দু'পয়সা সুদ হিসাব করে প্রথম দিনের প্রায় আড়াই টাকা কেটে নিয়ে সে দিলে টাকাটি। তা থেকে জমির খাজনার সব টাকা, হিসেবানা, তারপর পেয়াদা, এ চাঁদা সে চাঁদা ইত্যাদি করে সবসুদ্ধ তেতাল্লিশ টাকা দিয়ে পরিত্রাণ পেলাম।

হাতে রইলো বাহান্নো টাকা। যখন ফিরে আসছি তখন একজন কে, জানি না পিছনে পিছনে এসে বলে কি,—হাঁরে, অত টাকা কি জন্যে ধার করলি বল্‌ দিকি? বললাম, আমার দরকার আছে।

গোটা কুড়ি টাকা দেনা, তোকে ঠিক দু-এক দিনেই দিয়ে দেবো, আর বাবুকে বোলে তোর ভাল করে দেবো। সর্বনাশ, এ থেকে আমার দেবার যো

নেই, আমি কিছুতেই পারবো না দিতে। সে লোকটি পিছু ছাড়ে না, শেষে ভয় দেখাতে লাগলো,—যদি না দিস্

সকালে তৈলোক্য বোলে যে লোকটা আমায় ডাকতে গিয়েছিল সে দেখি আমার দিকেই আসছে। তাকে দেখে আমি একটু সাহস পেলাম। যখন তার কাছে গিয়ে সব কথা তাকে বলতে যাচ্ছি তখন সঙ্গের সেই লোকটা বলে কি, আরে হলোধর এটি বুঝলি না, তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করছিলাম, যা যা ঘরে যা। বোলে চলে গেল চট্ করে। তখন তৈলোক্যকে বললাম, ভাই, একটি উপকার কর, আমার সঙ্গে স্টেশনে চল, একটি কথা আছে।

হলধর বলে, ইস্টিশান হেথা থেকে পাকা আড়াই ক্রোশ পথ, কি করতে এখন তুই ইস্টিশানে যাবি বল দি? বললাম,—একটা দেনা পাওনার ব্যাপার আমায় যেতেই হবে—ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই চ, তোকে দুটো টাকা দেবো। ভাবলাম, একেবারে পাঁচ টাকা বললে যদি আরও চায় তাই দুটাকা থেকে সুরু করবো এই মৎলব করেই বলেছিলাম। ওমা! সে বলে কি, শুধু শুধু আমায় দুটাকা দিতে যাবি কেন, আর আমিই বা নেবো কেন তোর কাছ থেকে। তোর কি হয়েচে বল দি?

বললাম—কিছুই হয়নি, তুই আমার সঙ্গে চ যাই। সে বলে, কিন্তু কি আজ তোর হয়েচে একটু খুলে বল দি, দেখচি সকাল্ থে, যেন কেমন হয়ে গেছিস? ঠিক যেন এ গাঁ-ভুঁয়ের কেউ নয় তুই। বল দিকি, ব্যাপার কি তোর হলো—বল্‌না? আমার কাছে লজ্জা কি, সেই ন্যাংটো পোঁদে কত খেলেচি তোর সঙ্গে, তারপর কত—মারামারি করেছি, বল্ না।

কি আর বলবো, শুধু বললাম,—চল্‌তো আগে স্টেশনে যাই তারপর বলবো। পথে কথা কইতে কইতে আড়াই ক্রোশ পেরিয়ে সংগ্রামপুর স্টেশনে পেঁছে বললাম—তুই একটু এখানে থাক, আমি আসচি। বোলে টিকিট ঘরের ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসায় জানলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে একখানা কলকাতার গাড়ি আছে, আর কলকাতার ভাড়া বারো আনা মাত্র। টিকিট কিনে ফিরে এসে বড় কৌশলে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি কলকাতায় যাচ্চি. বড়ই দরকার; —আমাদের উকিলবাবুর সঙ্গে একটা দরকারী পরামর্শ আর কিছু টাকার ব্যাপারও আছে।

সে বিশ্বাস করবে না, বলে চাষাভূষোর আবার কলকাতায় কাজ কি, তা ছাড়া উকিলবাবুদের সঙ্গেই বা তোর কি কাজ? খবরদার বলচি, মামলায় নামিসনি, ধনে-প্রাণে মারা যাবি। ঐ তো তোর কয়েক বিঘে জমি,—ও খোয়ালে খাবি কি করে? ছেলেপুলে ইস্ত্রি তাদের পথে বসাবি নাকি? এই সব কথা,—থামতেই চায় না। শেষে যখন দেখলাম মহামুস্কিল—এখন এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শেষে খুব চেঁচিয়ে বললাম—শোন শোন, বলতে দিবি আমাকে, না তোর কথাই বলতে থাকবি?

বুঝিয়ে বললাম, তুই এই পাঁচটা টাকা নে, আমার ছেলের হাতে দিবি, ফিরে এসে তোকে আমি খুসী করে দেবো। যা, তুই বাড়ি যা। যাই হোক, কোন রকমে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে গাড়িতে উঠলাম,—টিকিট কেটে কলকাতার উদ্দেশ্যে।

এখন আর এক দুর্ভাবনা, সেখানে যে হলধর আছে সে কী অবস্থায় আছে? দুজন হলধর একত্র হলে ব্যাপারটি কি রকম যে হবে? মনে নানা

কথা তোলাপাড়া করতে করতে শিয়ালদহ স্টেশনে পেঁছিলাম। স্টেশন থেকে বাইরে এসে বউবাজার থেকে একখানা কাপড়, একটা গেঞ্জি, একটা টুইলের সার্ট —শেষে একজোড়া চটি জুতা কিনে নিয়ে উঠলাম ক্যালকাটা হোটেলে। স্নানের পর ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে বেলা চারটা আন্দাজ হাওড়ায় পেঁছে, যে ট্রেনে যাবো ঠিক করে ফেললাম।

বোধহয় আধঘণ্টা পরেই ট্রেনে উঠলাম।

ভীড় বেশী ছিল না,—দিল্লী একসপ্রেসে ইণ্টার ক্লাসে ভাল জায়গাই পেলাম, বাঙ্কের উপর পুরো শোবার মতই জায়গা। সন্ধ্যার পর শুয়ে পড়লাম। আমার চক্ষে রাজ্যের ঘুম এসে ভীড় করে লাগলো, আমিও ঘুমে একেবারে অচৈতন্য। কলকাতায় ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, সব ভরপুর, কারো সঙ্গে দেখা করলাম না। যত তাড়াতাড়ি এখন দিল্লী পৌঁছাতে পারি সেই বাসনাই প্রবল ছিল—কাজেই যাতে একটুও দেরী হয় এমন কিছুই করিনি।

হায় হায় : ঘুম আমার ভাঙ্গলো। কি সর্বনাশ, আবার সেই হলধরের শয্যায়, তারই শয্যা-সঙ্গিনীর সঙ্গে, আশে পাশে একপাল ছেলেমেয়ে,—শুকনো মূতের গন্ধ। আঃ—হে ভগবান,—কেন মরতে ঘুমোতে গেলাম, না ঘুমোলে হয়তো এসব কিছু হতো না। আর ঘুম নয় ; ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম,—মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লেগে গেলাম, এ কি হলো ! এখন কী-ই বা করি ? তবে কি আমার মুক্তি নেই,—না—কি এই দীর্ঘ স্বপ্নেরও শেষ নেই। এমন সময় হলধর-গিন্নি উঠলেন—ওমা, এখনও ঘুমোও নি তুমি, সারারাত বসে কাটাবে নাকি ? হ্যাঁগা, তোমার হয়েছে কি বলতো ?

খোলে তিনি বাইরে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার এসে বসলেন আমার পাশে। আমার একখানা হাত বেশ জোর করে ধরে নিয়ে নিজের বুকের উপর রেখে বললেন—দেখ তো, কি রকম আছাড়ি পিছাড়ি করতেছে বুকটা, জমিদারের বাড়ি কি কাণ্ডটা করেছো তুমি শুনে কেঁদে মরি। এত টাকাই বা ধার করলে কেন, তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই ? তুমি নাকি বাউদের দোবের কাছে একশো টাকা চোটায় ধার করেচ ? এ্যাঁ, সুদবে কি করে বলতো ? চাষ-বাস তো হয়ে গেল, এখন আমাদের উপায় কি ? বলনা, বোবার মত বসে অইলে কেন গো ? বলনা, আমার মাথা খেতে অত টাকা নিয়ে কলকাতা গিছিলে কেন ?

না রাম না গঙ্গা, আমার মুখ থেকে কিছুই বার করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে সে বেচারা আবার শুয়ে পড়লো। আমি বসেই রইলাম। আর মুক্তির উপায় চিন্তা করতেই মাথা ঘামিয়ে ফেললাম। আমার বুদ্ধি কোনো কাজেই এলো না।

॥ ৮ ॥

তারপর যা হলো বলতে আমার লজ্জা ও সংকোচের কোনো বালাই নেই। খানিক পরে যখন হলধর-গিন্নি নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন,—এই অসহায় অবস্থা ভেবেই আমার চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ ধারা আরম্ভ হলো। কি তীব্র অনুশোচনা এলো আমার অন্তরে তা ভাষায় জানাবার নয়। হে ভগবান ! হে দয়াময়, মনে মনে এই সব ভাষায় আমি তাঁর উদ্দেশ্যে আমার জীবনে এই প্রথম প্রার্থনা জানালাম,—যথার্থই চক্ষের জলে আজ তাঁর শরণাগত হলাম। কাতর প্রার্থনার

কথা শুনেছিলাম, লোকে বিপদে পড়েই করে থাকে, যা বইয়ে পড়েছিলাম, আজ সত্য সত্য তাই নিজে করলাম। জীবনে কখনও এমন করে ভগবানকে ডাকিনি। নিজেকে আর বড়ো মানী লোক বলে মনে হলো না। সম্ভ্রম বা কৌলিন্য—প্রচুর অর্থোপার্জনের সঙ্গেই যার সম্বন্ধ—সে ভাব কোথায় উড়ে গেল। নিজেকে ঐ হলধরের মতই অকিঞ্চিৎকর বরং হলধর বড় সুখী চাষী বোলে, তার স্বভাবাশ্রিত সংসারী মানুষ পরিশ্রমী জীবন, এখন তাকেই যথার্থ মহৎ ব্যক্তি বোলেই মনে হতে লাগল, দিল্লীর সম্ভ্রমের উপর এলো এক ঘৃণা। মনে আছে, শেষে—হে অন্তর্যামী, আমি অতি হীন, অতি মূঢ়, বুদ্ধিহীন, যথার্থই তোমার দয়া পাবার অনুপযুক্ত—আমার কি গতি হবে—আমায় রক্ষা করো, আমায় সৎপথে মতি দাও। শেষে, অন্তরের দম্ভ, অভিমান, আর আমার কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির মোহ—চূর্ণ হোক, আত্মম্ভরিতা কিছু যেন আর না থাকে আমার মধ্যে,—এই প্রার্থনা করলাম। সত্যই অনুভব করলাম যে এই হলধরের চেয়ে মানুষ হিসাবে আমি শ্রেষ্ঠ নয়—কখনই নয়। এই পর্যন্তই মনে আছে, তারপর গভীর নিদ্রার কোলে ডুবে গেলাম। মনে আছে —ঘুমের মধ্যেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না যেন অনুভব করেছিলাম।

অন্য অবস্থায় আমার স্বভাবের এই বিপর্যয় কল্পনারও অতীত ব্যাপার কিন্তু সত্য সত্যই তা ঘটে গেল। প্রকৃতির রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয় আর মনে স্থায়ী ভাব বোলে কিছুই নেই। প্রভাতে জেগে উঠলাম,—এবারে আর স্বপ্ন নয়, সাজাহান রোডের বাংলোর মধ্যে নিজ শয্যায় শুয়ে যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গলো। তখনও ভাগবতী প্রভাব আছে। জেগেছি মাত্র, চক্ষে যেন জল এখনও আছে। মনে মনে ভয়ও আছে যে আবার এটাও বা পাছে স্বপ্ন হয়ে যায়—আবার হলধরের সেই মশারীর ভিতর বিছানার মধ্যেই বা ফিরে যেতে হয়। অনুতাপে আমার সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, মনে আমার এই ভাব! কি নির্মল আনন্দ! জীবনে এই প্রথম উপভোগ করলাম। যেন নতুন জন্ম হলো আমার।

প্রথমে এলো আমার মেয়ে মীরা,—সে এসে বলে কি, বাবা, আজ কেমন আছ! সত্যি! তোমায় যেন অনেকটাই সহজ দেখচি,—কি হয়েছিল বাবা? উত্তরে বললাম—কি সব হয়েছিল আমায় বলতো শুনি! মেয়ে বলে—গত কাল থেকে তুমি আর ঘর থেকে বার হওনি, বিছানায় শুয়েই আছ, জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলোনি,—জল ছাড়া কিছু খাওনি, কারো সঙ্গে কথা কওনি,—কি হয়েছিল বাবা?

ভাবলাম, বেচারা হলধরেরও তাহলে বড় কম দুর্ভোগ যায়নি তো! হা ভগবান!

তখন আমি আবার প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, সেই উপাধ্যায় আর্টিস্ট মশাই এসেছিলেন কি ইতিমধ্যে? মীরা বলল,—হাঁ বাবা, রবিবার তিনি আসেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তুমি কেবল তাকে দেখলে, পরিচিতের মতই কথা কইলে, তারপর আমায় বললে, এখন আমি একটু কথা কইব আড়ালে। তাই আমি চলে এলাম। কতক্ষণ পর তিনি চলে গেলেন। আজ তোমার কাছে আসবার সময় দেখি তিনি এসে বাগানে একটা বেঞ্চে বসে আছেন—

শুনেই মীরাকে বললাম, যা, এখনি তুই তাকে ডেকে নিয়ে আয়,—যেন চলে না যান আমার সঙ্গে দেখা না করে।

* * * * *

মিঃ ডাটের সঙ্গে যার অস্তিত্ব বিনিময় ঘটেছিল, এখন সেই নিরীহ ধর্মভীরু পল্লীবাসী কৃষক হলধরের কথাও আছে ; সেটি না জানলে, বিধাতার আসল খেলাটি ধরাই যাবে না।

তার কি হয়েছিল ?

একটু আগের কথা,—সংক্ষেপে এই যে—চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত, ডায়মণ্ড হারবার বা হাজিপুর মহকুমার মধ্যে কুলপী থানার অধীনে বাকুলে চাঁদপুর একখানা গ্রাম ; সেখানে উমাচরণ আর হলধর দুই ভাই। উমাচরণ ছিল গ্রামের মোড়ল বা প্রধান ;—হরিসভার-সভাপতি। সকল কাজেই গ্রামে তার ছিল অসাধারণ প্রভাব আর প্রতিপত্তি। প্রথমে অনেকদিনই হলধর—দাদা উমাচরণের সঙ্গে একই সংসারে ছিল ; কিন্তু বিবাহের পর থেকেই কেমন একরকম হয়ে গেল ; শেষে স্পষ্টই বললে—দাদা, আমার ভাগের যা-কিছু সব বুঝিয়ে দাও, আমি আলাদা হবো। উমাচরণ বিচক্ষণ মানুষ, গ্রামের জমিদার আর ভিন-গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডেকে হলধরের যা তার প্রাপ্য, জমিজমা, বাগান পুকুর, ঘর-দোর,বাসন-কোষণ—সব কিছু ভাগ করে দিলে. এমন কি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের মাঝে পাঁচিলও উঠে গেল ;—তখনই যথার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন সংসার হলো তাদের। এর মধ্যে তিলমাত্র অসদ্ভাব জন্মাতে পারেনি,—সবাই জানে, সেটা উমাচরণের গুণে আর হলধরের দাদার উপর অসাধারণ বিশ্বাসের ফলে সম্ভব হয়েছিল। দুই ভাই, সন্ধ্যার পর হরিসভায় কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যে অনুপস্থিত থাকেনি। এই ভাগাভাগির পর প্রায় আট বৎসর কেটে গেছে। হলধরের এখন দুটি ছেলে-মেয়ে হয়েচে। তার অবস্থাও খারাপ হতে আরম্ভ হয়েচে. বিশেষতঃ গত দুই সন অজন্মা, জমিদারের খাজনা বাকী, তিন বৎসর হতে চললো। এই সব কারণে হলধরের উদ্বেগেব সীমা নেই।

একটা কারণে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। এই সেদিন জমিদার সরকারে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেদিনই মেজবাবু গ্রামের অনেকগুলি প্রজাকে কাছারীতে ডেকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, লাটের কিস্তির সময়, সরকারী খাজনা মেটাতেই হবে, না হলে তাঁদের তালুক আসচে মাসের শেষ তারিখে নিলামেই উঠবে। সুতরাং যার কাছে খাজনা যা পাওনা আছে তা মিটিয়ে দেওয়া চাই। এখন যেমন করে হোক অর্ধেকটা চাই-ই। হলধরের প্রায় আড়াই তিন বছরের খাজনা বাকী—সে জানে তার বিপদ কেমন। এখন পাঁচজনের সঙ্গে তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, সামনের রবিবার দিন অর্ধেক টাকা নিশ্চয়ই দিয়ে আসবে। এখন মান বাঁচাতে তাকে যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে। এই তার বিপদ।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। সেই দিন থেকেই হলধরকে ভাবিয়ে তুলেচে। সে কিছু জমি বাঁধা রাখতে বদ্যিপুরে মোড়লদের কাছে গেল। সেখানে সুদের বহর দেখে সে ফিরে এলো ; এই সুদে তার ঐ জমি চলে যাবে যদি দু'বছর দিতে না পারে। তার চেয়ে বিক্রি করাই ভালো। কিন্তু যে জমি কিনবে সে বলে চার চার কিস্তিতে টাকা দেবো! কিন্তু তাতে খাজনার টাকা সম্পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা অর্ধেকও হয় না। এই ভাবে বৃহস্পতি, শুক্র দু'দিন কাটলো। শনিবার সকালে উঠেই ভিন্‌গাঁয়ে এক বড় ঘর কুটুমের কাছে গেল। তারা আমলই দিলে না,—একরকম অপমানিত হয়েই ফিরে এলো। তাছাড়া আট ক্রোশ পথটা যাওয়া আসাতেই দিনের তিন প্রহর

গেল। এই দুদিন সে হরিসভায় ঠিকই হাজির হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই নামে যোগ দিতে পারেনি। তার ভরাট গলা, দোয়ার গাইতো—খোলও সে ভাল বাজায়, কিন্তু এই গত দু'দিন সে ভাল করে গাইতে পারে নি, খোলেও তার হাত পড়ে নি। অবশ্য সবাই বুঝেছিল তার মনের অবস্থা, কিন্তু কারও হাত ছিল না এতে, তাই কেউ কিছু বলেনি। সেও কাকেও কিছু বলেনি, মর্মের দুঃখ মর্মে মর্মে ভোগ করেই চলে এসেচে।

আজ এই শনিবার তার ছটফটানিটা বেড়েই গেল, সে যেন আর সামলাতে পারে না, এমনই তার মনের অবস্থা।

আজ বাদে কাল রবিবার, জমিদারের লোক অর্থাৎ পাইক টাকার তাগাদায় আসবে আর ধরে নিয়ে যাবে, আপনি না গেলে। কিন্তু তার টাকা কোথা ? সে আশপাশের গ্রামে তো কোথাও বাকী রাখেনি সন্ধান করতে।

একবার সে উমাচরণের কাছেও কথাটা তুলেছিল। স্নেহ থাকলেও উমাচরণ ঘাড় পাতলে না, কারণ তাকেও দুশো টাকার একটা কিস্তি এই সময়েই দিতে হবে। তার জমি জমা বেশী, তাই তাকে দিতেও হবে বেশী। বিশেষতঃ এই দুবৎসর শুধু তো হলধরের একলার নয়, গ্রামের বোধহয় প্রত্যেক চাষীর একই হাল। এই সূত্রে অনেকের ঘর দোর বাঁধা বন্ধকও পড়েচে। হলধরও তো নিজ অংশের বাগান, জমি বাঁধা দেবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কে রাখবে,—গ্রামের মধ্যে ধনবান কোথা। সামান্য রকম ধন সংগ্রহ যাদের আছে তারা শুধু হাতে তো কেউ টাকা দেবে না। মহাজন বলে,—গ্রামের তিন চার জনের ভিটে বন্ধক রেখে তো টাকা দিয়েচি আর কত দেবো,—আমার আর টাকা নেই।

সন্ধ্যায় সে দিন কীর্তনে গেল। হরিবাসরে সবাই যেমন পূর্ণ উৎসাহে সেদিন গাইলে হলধরও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রাণ ভ'রে হরিনাম করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই পুরো মন লাগাতে পারলে না। তখনই মনে মনে সে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে টাকার চিন্তার ভারে মনটি তার হরির কাছে পেঁছিতে পারছে না। যাই হোক, গান ভেঙ্গে গেল। সকালে কি হবে যখন পাক্ এসে তলব করে বাবুদের আটচালায় নিয়ে যাবে—এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে সে বেরুলো। কিন্তু আর তো পারে না সে, যেন অবসন্ন হয়ে আসছে তার শরীর।

একবার ভাবলে আর ঘরে যাবো না, যে দিকে দুচক্ষু যায় চলে যাই ;— সকালে গ্রামের কেউ আমায় দেখতে না পায়। কিন্তু তা হলো না। শেষ অবধি, ছেলে পুলে, স্ত্রী নিস্তারিণীর কথা মনে করেই সে ঘরে ফিরলো। তারপর দুটি ভাত খেয়েই,—শোবার ঘরে ঢুকলো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শেষ আশ্রয় শয্যা। আর সে ভাবতে পারে না। যে নামটি নিয়ে সে রোজ শুয়ে পড়ে আজও সেই শ্রীহরি বলেই, তাদের ঘরজোড়া তক্তার উপর ছেলে-মেয়ে ভরা বিছানাতে এক ধারে সে শুয়ে পড়ল আর অচিরেই বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে মগ্ন হয়ে গেল। সে এখন সত্যই শান্তি লাভ করলে। কাল সকালে কি হবে সে তার শ্রীহরিই জানেন।

সংসারে সে একলা নয়, তার স্ত্রী, অর্ধাঙ্গিনী সে তখনও হেঁসালে, রাতের দিকেও তার কাজ কম নয়,—সংসারের সব কাজ সেরে প্রায় দেড় প্রহর রাতে নিস্তারিণী এসে তার পাশে শুতে এলো। একবার ভাবলে মিন্সেকে

জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করে নেয় যে সারা দিনে সে কি করলে, টাকারই বা কি হলো। কিন্তু অসহায় হলধর এমনই অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে, তার মুখ দেখে আর জাগিয়ে কথা বলতে প্রবৃত্তি হোলো না। সারা দিনের ক্লান্তি তারও কম নয়, কাজেই সেও অচিরে সুপ্তির কোলে ডুবে গেল।

* * * * *

শ্রীহরি বলে হলধর রোজই ভোরে ওঠে। আজও যথাকালেই তার ঘুম ভাঙ্গলো। শ্রীহরি বোলেই সে উঠলো,—কিন্তু একি? শ্রীহরির একি খেলা? স্বপ্নই দেখচে না কি? এখনও কিছুই ঠিক বুঝতে পারচে না, প্রথমটা সে যেন স্বপ্নই দেখচি মনে করলে বটে, কারণ এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা তো জীবনে কখনও দেখেনি। মশারী নেই, পালঙের পুরু গদির উপর বিছানায় ধপধপে চাদর পাতা, ঝালরওয়ালা বালিশ মাথায়। সঙ্গে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কেউ নেই, একাই সে এক পরিপাটি শয্যায় শুয়ে। কোথায় তাদের খড়ের ছাওয়া চালের ঘর, মাটির দেওয়াল? এ যে ইমারৎ—প্রকাণ্ড ঘর, দেওয়ালে ছবি, ফটো-বাঁধানো, আয়না, দেরাজ আলমারি দিয়ে সাজানো চেয়ার-টেবিলের উপর ঘড়ি, ফুলদান। বড় লোক জমিদারদের ঘরের মত, এ কোথায় এসে পড়লো সে? হে ভগবান,—হরি হরি!

এ কি কাণ্ড? এখনও স্বপ্ন! গত কাল তো টাকা টাকা করে সারাদিন আধমরা হয়ে ফিরেচে। হরিসভা থেকে একপোর রাতে এসে যখন ঘরে ফিরেছিল তখন আর শরীরের মধ্যে সাড় ছিল না।

শুয়েছিল তক্তার উপর;—তার গা-সওয়া সেই দুর্গন্ধে ভরা কাঁথার বিছানায়,—আর বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়েই তো শুয়েছিল। তাই তো তার অভ্যাস চিরদিনের। সে বিছানাই বা কোথা, সে ঘরই বা কোথা? এ কোথায় এসে গেল সে? টাকা টাকা টাকা করে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তার?

নাঃ, এটা তারই স্বপ্নই,—না হলে বস্তুতঃ এ সব কি সম্ভব তার ঘরে? স্বপ্ন মনে হলেও সে শুয়ে থাকতে পারলে না নিশ্চিন্ত হয়ে, উঠে বসলো সে। চারদিকে চেয়ে দেখছিলো—এমন সময় খস্ খস্ খস্—সানের মেজেতে চটি ঘষে ঘষে চললে যেমন শব্দ ওঠে সেই শব্দ, কাছেই আসতে লাগলো,—সে আবার শুয়ে পড়লো, তবে চক্ষু না বুজে। দরজা তো খোলাই ছিল,—একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, পোনের ষোল বছর বয়স,—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী—পানা পানা মুখ,—একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো,—একবারেই হলধরের মাথার শিয়রে খাটের বাজুর উপর দুটি হাত রেখে দাঁড়ালো, আর,—বাবা! বোলে ডাকলো। মিষ্টি গলার স্বর। যেন লক্ষ্মী মূর্তি মনে হলো হলধরের। আর ঐ বাবা ডাকটি শুনে প্রাণ তার আনন্দে যেন দুলে উঠলো। তারও মা বোলে একবার উত্তর দিতে ইচ্ছা হলো; কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করেই রইলো।

কি হয়েছে, বাবা?—বোলে মেয়েটি তার কপালে হাত দিলে, যেন তাপ আছে কিনা দেখলে,—তার শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো। সে কথা বললে না বটে কিন্তু মনে মনে ভাবছিল,—মেয়েটা বোকাই বটে, না হলে দিনের আলোয়, আমার মত এই চাষার মূর্তি দেখেও বুঝতে পারলে না যে আমি তার বাপ হতেই পারি না। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ও যেন বলতে চাইলে,—বোকা মেয়ে—দেখতো আমার মুখটা একবার ভাল করে, এটা কি তোর বাপ?

মেয়ে বলতেই লাগলো,—আমায় বল না কি হয়েচে তোমার,—আজ এখনো উঠচো না কেন? নিশ্চয় তোমার শরীর খারাপ।

হলধর এবার একটু আশ্চর্য বোধ করে। মাথার চুলে, যেমন কিছু ভেবে দেখবার বেলা করা অভ্যাস, একবার আঙ্গুল চালিয়ে দিতে গেল, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল যখন দেখলে—মাথায় তার ঘন কাঁচা পাকা চুলের রাশ তো নেই-ই তার জায়গায় মাথা ভরা টাক্। তারপর নাকের নীচে আঙ্গুলগুলি চালিয়ে বুঝে নিলে যে তার সে গোঁফও নেই, দাড়িও তার কামানো পরিষ্কার, যেন কালই কামিয়েচে অথচ সে পোনরো দিন ক্ষৌরী হয়নি—তাইতো,—তাহলে তো ও আমার মধ্যে বাপের মুখই দেখচে। আমার মধ্যে ওর বাপের মূর্তি এলো কি করে! তাজ্জব ব্যাপার, হে হরি, এ তোমার কি খেলা,—এ্যাঁ তাহলে আমার কি হলো?

নিরুত্তর দেখে মেয়ে বলচে, বাবা, ডাক্তার মৈত্রকে খবর দিচ্চি। নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েছে। না হলে,—

এবার হলধর চেঁচিয়ে বললে,—না না, না না,—আমার কিছুই হয়নি, আমি ঠিকই আছি।

মেয়ে বলে, শরীর তোমার নিশ্চয়ই খারাপ, না হলে যার ভোরে সবার আগেই ওঠা অভ্যাস, এখনও সে ওঠেনি কেন? তোমার দৃষ্টিটা ওরকম কেন? —বলতে বলতে চলে গেল দ্রুতপদে,—বারান্দায় গিয়ে কর্‌র্ কর্‌র্ কর্‌র্, যন্ত্রে কি করলে; তারপর বলতে লাগলো,—হাঁ, আমি মীরা, মিঃ ডাট্-এর এখান থেকে বলচি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরই বাড়িতে বেশ হৈ হৈ চলতে লাগলো।

এই ভাবে বাড়ির কাণ্ড,—তারই মধ্যে হলধরের স্বপন দেখাও চলতে লাগলো। অধৈর্য হয়ে আবার ভাবে, এ বাবা স্বপন যে ভাঙ্গবার নামও করে না,—কি বিপদ—হে হরি!

অল্পক্ষণেই সাহেবী পোষাক, চক্ চক্ করচে বক্‌যন্ত্র নিয়ে ডাক্তার এলো,—এই যে মিস্টার ডাট্—সম্বোধন করে বলে,—ব্যাপার কি বলুন তো দেখি। হলধর বললে, আমার তো কিছুই হয়নি ডাক্তারবাবু। এই বাবু শুনেই ডাক্তার কি একরকম কটোমটো চেয়ে রইলেন, আর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষাও আরম্ভ করলেন। শেষে বললেন, কৈ কিছুই তো দেখচি না, বেশ চলচে সব। ওঁর মনে একটা কিছু হয়ে থাকবে।

তাইতো, কি করা যায়—কি করা যায়, বলতে বলতে হোঁৎকা ডাক্তার সায়েব বাইরে গেলেন।

কত রকমের কত ভাবনাই যে হলধরের মাথার ভিতর দিয়ে চলতে লাগলো তার শেষ নাই। এ সবটা কি স্বপ্নই চলচে। ভগবানই জানেন, এতক্ষণ তার ঘরে কি হচ্ছে। কোথাও কোন কুলকিনারা না পেয়ে শেষে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বসলো, যা হবার তাই হোক। আমি কি করবো, হে হরি!—দয়া করে এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দাও,—যা অদৃষ্টে আছে তাই হোক না আমার। আবার ভাবচে, এই স্বপন ভাঙ্গলেই তো জমিদার বাবুদের খাজনার টাকা দেবার দায়ে পড়তে হবে, টাকা তো কোনরকমেই জোগাড় হয়নি। দেবার সাধ্য যখন নেই, তখন চলুক না, এমন বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ কাটে, স্বপ্নেই কাটুক,—শ্রীহরির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হলধর বিছানা ছাড়লো না।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর, মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, বাবা,—সেই উপাধ্যায়বাবু এসেচেন, আমি তাঁকে নিয়ে এসেচি তোমার কাছে। বলতে যাচ্ছিল হলধর,—কে উপাধ্যায়? কিন্তু তাকে কিছু বলতে হলো না, দরজায় দেখলে এক দীর্ঘশরীর, মাথায় টুপী এক মূর্তি উপস্থিত। বাঙ্গালী কি কোন্ দেশের লোক বুঝবার যো নেই। তবে মুখখানা দেখেই মনে হলো তার যেন অতি পরিচিত—সে যেন অনেকবারই দেখেছে তাকে।

আরে, এ যে আমাদের অপুবাবু, না? যেই মনে হওয়া, ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বোসলো হলধর। হাঁ, ঠিক যেন সেই মুখই। আমাদের গ্রামের জমিদারবাবুদের ভাগনে—অপুবাবু।—ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসচি—এ না হয়ে যায় না। মাথায় গান্ধিটুপী, তাই প্রথমটা ঠিক ধরতে পারিনি।—তার পরই তার মাথায় এলো—মানুষের মত মুখ মানুষের তো হয়, দেখাই যাক না, যদি আমায় চিনতে পারে তাহলেই বুঝা যাবে। হলধর তখন মেয়ের দিকে চেয়ে বললে, আমরা একটু কথা কই তুমি এখন যাও। বাপের মুখে এভাবের কথা শুনে মেয়ে অবাক হয়ে চলে গেলো।

হলধর বড় ব্যাকুল হয়েই তখন বললে, আপনি বলো বাবু আমি কি স্বপ্ন দেখচি; আপনি কি অপুবাবু? উপাধ্যায় তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, তার পর বললে—মিষ্টার ডাট্, আপনার কি হয়েছে বলুন তো; কাল রাত্রে আমি এসেছিলাম। যাবার সময় লিখে রেখে গিয়াছিলাম, পান নি?

হলধর বললে, আমায় আপনি কি বলচেন বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ, তার পর আমায় চিনতে পারচেন না, আমি যে হলোধর—আপনার মামাদের গেরাম চাঁদপুরের পেরজা, উমাচরণ মোড়লেরই ভাই।

এবার মহা বিস্ময়ে উপাধ্যায় অনেকক্ষণ হলধরের দিকে চেয়ে থেকে শেষে বললেন,—আমি কিছু না বুঝলেও একটা কথা তোমায় বলচি শোনো,—দেখো, কাকেও এখানে তোমার ঐ পরিচয় যেন বোলো না। আমায় যা বললে তা বললে,—আর কাকেও কখনও যেন বোলো না, মহা অনর্থ ঘটবে।

তখন হলধর প্রাণের সব কথাই খুলে বলতে লাগলো—

কাল কোথায় ছিল, আজ ঘুম ভাঙ্গলো এই বিছানায়। কাতরকণ্ঠে বললে, আচ্ছা বলো তো, আপনি আমাদের অপুবাবু কি না? এখন আমি কি করবো, আপনি আমায় বোলে দাও সব। তিনি বললেন, আমি কে, তোমাদের অপু কি না, সেকথা চাপা থাক এখন—তোমার কথা যদি সবাইকে বলো তা হলে তোমায় ভূতে পেয়েচে ধরে নিয়ে রোজা এনে মারপিট করে ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করবে। এটা দিল্লী সহর হলেও ওদেশের মত ভূত প্রেতের ব্যাপার আছে সবই। শুনে হলধর বলে, এ্যাঁ। এটা দিল্লী, রাজধানী,—আমি ভেবেছিনু কলকাতা হবে। আমি এখানে এনু কি করে?

উপাধ্যায় বললেন—সে যাই হোক, যে ব্যাপার ঘটচে, তাতে দিল্লীই বা কি আর কলকাতাই বা কি? তোমার পক্ষে এখন চুপচাপ থাকাই দরকার। খাও দাও আর মনে মনে ভগবানকে কেবল ডাকো, প্রভু! এ তোমার কি খেলা, আমি কি অপরাধ করেছি যাতে এই অবস্থা হয়েছে;—তিনিই যা করবার করবেন। যা বুঝেছি, তোমাদের দুজনকে নিয়েই খেলাটা চলছে।

হলধর বলে—দুজন আবার কে হলো, ঠাকুর?

তুমি একজন আর যার দেহের মধ্যে তুমি এখন রয়েচ। তিনি হয়তো সেখানে তোমার দেহ আশ্রয় করেছেন। মনে রেখো, এসব উপরওয়ালারই খেলা, কারো কিছু করবার নেই। চুপ চাপ থাকো, দেখনা কি হয়। মজা আছে। শেষ অবধি, চেয়ে চেয়ে দেখো—আর থাকো।

যখন শুনলেন যে হলধর সকাল থেকে ওঠেনি—মুখ হাত ধোয়নি তখন তিনি পাশের দরজা খুলে ঘরের পাশে যেখানে সব কল প্রভৃতি আছে দেখিয়ে দিলেন,—সে সব দেখে হলধর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। উপাধ্যায় যাবার সময় বলে গেলেন—আমি কাল আবার আসবো। এখন হলধর অনেকটাই সহজ হতে পারলে,—ভাগ্যে উনি এসেছিলেন।

খানিক পরে চাপকান পরা মাথায় পাগড়ি খানসামা চা, জলখাবার সব নিয়ে এলো। এই ম্লেচ্ছ সাহেবী খানা খাওয়ার ব্যাপার,—হলধর ছুঁলোনা, ও সব কিছুই খেলেনা। যখন সব কিছু, সেই খানসামার পো উঠিয়ে নিয়ে গেল তখন আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে ঢক্ ঢক্ করে এক পেট জল খেয়ে এসে আবার শুয়ে রইলো। মনে মনে ভাবলে, এ যেন তার একটা অসুখের পালাই চলেছে। ভিতরে তার যথেষ্ট ভয় ছিল এই ভয়ংকর ওলট পালটের জন্যে। এমন আশ্চর্য ব্যাপার জীবনে কেউ দেখেছে, না শুনেছে। রাতারাতি, কোথা বাঙ্গলা মুলুকের অজ পাড়া গাঁ থেকে কোথা এই রাজধানী দিল্লী সহরে, এমন এক বাগানবাড়ির ভিতরে সাহেবীয়ানায় সাজানো ঘরে সে এলো কি করে আর একজনের শরীরের মধ্যে? ভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব—আমরা কি করেই বা বুঝবো,মুখ্যু সুখ্যু লোক একজন পাড়াগাঁয়ের চাষা। এই সব নানা রকম ভাবনায় সে দিনটা কাটলো। এক একবার দেশ ঘরে কি কাণ্ড হচ্চে ভাবতে থাকে, কিন্তু কিছুই পায়না ভেবে।

এইভাবে সারাদিন বিছানায় কাটলো শুয়ে বসেই। দিনের মধ্যে কত লোক এলো তাকে দেখতে; কত কত ইংরাজী বাৎ—কত রকমের সম্ভাষণ শুনলে। তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে দেখলে—সবাই সায়েবী পোষাক পরা। বাঙ্গালী কেবল ঐ উপাধ্যায়, অপুবাবুর মত যাকে দেখতে, সেই-ই ধুতি, পিরান চাদর গায়ে এসেছিল। এ এক রকমের মেলা—এই সব বুধু লোকের মুখ দেখতে, কথা শুনতে শুনতেই তার কাটলো।

রাত্রেও আর একবার পেট ভরে জল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার যেন ক্রমে অসহ্য হয়ে এসেছে, আর যেন সে পারে না। রাত্রে ঘরেতে বিজলী বাতি জ্বলে উঠলো, কলকাতায় সব বাবু-লোকের বাড়ি যেমন জ্বলে। এখানেও আছে, সেই দেয়ালে বোতাম টিপেই আলো জ্বালানো। এইভাবে কত কি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো সে। এক ঘুমেই রাত কাবার করে যখন সে জাগলো;—তাদের সেই দেশের ঘরে, বিছানায় সেই গন্ধই লাগলো। ভয়ে সে চক্ষু বুজেই রইলো, পাছে যদি আবার স্বপনের দিল্লীর ঘর বিছানা দেখতে হয়।

চোখ বুজে শ্রীহরি, শ্রীশ্রীহরি! জপ করতে লাগলো।—হে হরি, এ কোন্ কর্মের ফল। ক্রমে দরদর ধারা তার চক্ষু দিয়ে গড়াতে লাগলো; চক্ষের জলে এখন তার প্রাণস্নিগ্ধ হয়ে গেল। এবার সে চোখ চাইলে। ঐ যে নিস্তার, তার ছোট মেয়েটিকে আগলে শুয়ে আছে, পাছে শিশু খাট থেকে পড়ে যায়। শ্রীহরি বোলে সে উঠে বসলো, হাতখানা বাড়িয়ে নিস্তারের গায়ে রাখলে।

নিস্তার চেয়ে দেখলে, বললে—ওমা, মরণের ঘুম আমার হয়েছে, এতটা আলো হয়েছে আমায় ডেকে দাওনি? কাঁদছিলে নাকি?

এখন তার ধড়ে প্রাণ এলো। এই পর্যন্তই—হলধরের কথা।

এখন শেষের কথাটুকুও হয়ে যাক ;—দিল্লীর সাজাহান রোডে মিঃ ডাটের সেই বিচিত্র বাংলোতে। সেখানে আজ প্রভাতে আমি মিঃ ডাট্, গভর্মেন্ট অফিসাররূপেই জেগে উঠেছি। মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল,—সেই উপাধ্যায় দেখা করতে এসেছেন। আগ্রহ ভরেই আমি তাঁকে নিয়ে আসতে বললাম।

উপাধ্যায় এসে অনেকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়েই রইলো। শেষে বললে, কি ব্যাপার! আজ কেমন আছেন? আমি বললাম, যদি বলি ভালো আছি তাহলে কি বুঝবেন? একটু হেসে উপাধ্যায় বললে, তাহলে বুঝবো এখন বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করেই নিজস্থানে এসে গিয়েছেন ; আর সে বেচারাও—

মেয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনচে দেখে আমায় বাধা দিলেন মিঃ ডাট্। তিনি মেয়েকে বললেন, চায়ের ব্যবস্থা করো তো মা, এঁর জন্যে।

মেয়ে বললে, তোমার জন্যেও আনতে বলি? আজ পর্যন্ত মুখে কিছুই দাওনি। তাই বলো,—বোলে মেয়েকে সরিয়ে দিলাম—তার পর উপাধ্যায়কে সুধালেম—এ কী রহস্য বলুন তো, আপনি যেন জানেন মনে হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি আপনার চেয়ে বেশী কিছুই জানিনা। শুনেই আমি বিছানা থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম ;—আপনি চক্ষু খুলে দিয়েছেন —আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোনো মালিন্য নেই, আমি এখন ঠিকই বুঝেচি,—

বাধা দিয়ে উপাধ্যায় বললেন,—কিছুই বোঝেন নি,—এ সব সাধারণের বোধগম্য হবার কথাও নয়, আপনি বুঝবেন কি করে? এসকল ব্যাপার কি শিক্ষিত অহং সর্বস্ব ব্যক্তি, আধিপত্যপ্রিয়, সম্ভ্রান্ত নগরবাসীরা বুঝতে পারে? এ একটা খেলা,—তাঁরই খেলা। তিনিই বোঝেন, আমাদের সাধ্য নেই এর মধ্যে প্রবেশ করি। তবে তিনি করুণা পরবশ হয়ে যদি কাকেও বুঝিয়ে দেন কেবল সেই-ই বুঝতে পারবে। নিজবুদ্ধিতে কেউ কিছুতেই পারবে না। তখন আমি বললাম, আপনি কি বুঝেচেন বলুন না ;—তাইতে তিনি যা বললেন, আমি বুঝলাম।

আপনাকে ও হলধরকে নিয়েই খেলাটা হলো। এতে হয়তো দুজনেরই একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে হবে। দুটি জীবন নিয়ে খেলা, আপনার শরীর-মধ্যে হলধরের জীবন, প্রাণ, চৈতন্য যাই বলুন আর হলধরের শরীর-মধ্যে আপনার অস্তিত্বকে নিয়েই এক দিন-রাত খেলা হলো ; তারই মধ্য দিয়ে পরমাত্মার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো সে গুহ্য আর কারো জানবার কথা নয়।

আমি বলিলাম, আপনি তো বেশ সহজেই এটা বোলে গেলেন কিন্তু আমি ভাবছি এ কি করেই বা সম্ভব, বিশ্বাস হয় না।

কি করে বিশ্বাস হবে? আপনার নিজের অধিকৃত জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের অহংকার, সেই গতানুগতিক ধারায় ভাবাই অভ্যাস, এই গভীর বিচিত্র-রহস্যময় ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করবেন কি করে? এ তো সাহেবেরা কেউ বলেনি.—কি করে বিশ্বাসই বা হবে? এখন যে কাজটা হয়ে গেল—আমরা তার কিছুই জানিনা। তবে

এ নিয়ে বন্ধু-সমাজে আলোচনা যেন কদাচ করবেন না, কেউ বিশ্বাসই করবে না। এ সব ব্যাপার মানুষের স্বার্থ চিন্তায় মসগুল বুদ্ধি দিয়ে ধরা যাবে না।

সে কথা যাই হোক, এখন আমি যে বাকুলে চাঁদপুর গ্রামে কালকে সকাল থেকে যে সব কীর্তি করে এসেছি তা আগাগোড়া সব কিছুই নিখুঁত বললাম। শুনে উপাধ্যায় চমকে উঠলেন, বললেন,—

এ সবই তাঁর ইচ্ছায় ঘটেছে, খেলাটা এখনও শেষ হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। এখন ঐ বেচারা হলধরকে আপনাকেই বাঁচাতে হবে। দারোয়ানের কাছে চোটার সুদে আশী-নব্বই টাকা ধার করা মানে এ জীবনে হলধরকে তা শোধ করেতে হবে না। এখন উপায় ?

সে উপায়ও ভগবানের কৃপাতে সহজেই হয়ে যাবে, দত্ত বললে।

—এখন উপাধ্যায় বলে চললো,—এমন খেলা একজনের মহাভাগ্যেই দেখা যায়। তাঁর অপরূপ—

বাধা দিয়ে বললাম, এতে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো—বুঝেছেন কিছু ?

তাঁর যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো তা যথার্থ বুঝেচেন আপনারা দুজনেই, যাদের অস্তিত্ব নিয়ে তিনি খেলেছেন। আপনি কি বুঝতে পারেননি এতে আপনার কি উপকার হলো ? তেমনি সেই হলধর মোড়লও ঠিক বুঝতে পারবে তার কি হলো। তবে আমি এইটুকুই দেখছি, বিধাতার ইচ্ছায় হলধরের দুর্ভোগটা আপনার উপর দিয়েই হয়ে গেল।

কথাটা শুনেই আমার প্রাণের ভিতরটা এমনভাবে তোলপাড় করতে লাগলো যেন বাষ্প হয়ে চোখ ঠেলে বেরোতে চায়। আমার দম্ভ, অহঙ্কার, পদগর্ব চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা কাকেও তো বলবার নয়। বেচারা হলধর, তার কি হলো—

শিল্পী জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাবছেন ?

বললাম, ভাবচি হলধরকে উদ্ধারের কথা ;—তাকে ঐ অবস্থা থেকে মুক্ত করাই এখন আমার প্রধান কাজ আর সেই ব্যবস্থাই করবো আমি এখনই,—

কি করবেন ?

বললাম, সে ভেবেছি, আগে দোবের টাকাটা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব।

তারপর ?—

তারপর তাকে এখানে আনিয়ে দিনকতক তাতে-আমাতে থাকবো, দুজনে আমরা আত্মীয় হয়ে গিয়েছি যে।

সে যদি না আসতে চায় ?

তাকে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, এই সব তীর্থ দর্শনের প্রতিশ্রুতি দিলেই সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে রাজী হবে। সুশৃঙ্খলায় তার ঘর-সংসারের সব ব্যবস্থা করতে হবে—এই রকমই একটা প্রেরণা অনুভব করছি।

আর আমার ব্যবস্থাটা কি হলো ?

আপনি তো আমাদের এখানে এসেই যাচ্ছেন। নিজের কাজ করবেন আর অবসর হলে আমাদের দুজনের মাঝে থাকবেন—আপনার তো জানাই আছে সব, কেবল আর কাকেও বলবেন না এইটুকুই অনুরোধ।

দত্ত সাহেব ব্যবস্থা করলেন চমৎকার। কলকাতায় তাঁর ভাইকে পর্যাপ্ত টাকা পাঠিয়ে সব ব্যবস্থাই করতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না ; শিল্পীকে ধরলেন,—আপনাকেই যেতে হবে। দোবের দেনাটা প্রথমেই চুপি চুপি শোধ করে, হলধরের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে তার সংসারের সকল ব্যবস্থাই করতে হবে। চুপি-চুপি তার গৃহিণীর হাতে কর্‌করে দুশো টাকার আধুলি, সিকি, দুয়ানি দিয়ে হলধরকে দু'-মাসের মত ছুটি করে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

আর কারো দ্বারা সহজে এ-কাজ হতেই পারবে না।

যাত্রাকালে বলে দিলেন ;—গ্রাম ত্যাগ করে এখানে আসবার পথে কলকাতা থেকে,—ধুতি চাদর কামিজ পাদুকা প্রভৃতি সভ্যজাতীয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করতে যেন না ভুল হয়।

শিল্পী জিজ্ঞাসা করলেন ; সবচেয়ে সুবিধা হবে, এখানে হরিসভা আছে। হলধরের ভরাট গলা, দোয়ার ভালো ; আর খোলে সিদ্ধহস্ত। এমন খোল বাজনা প্রায় শোনা যায় না।

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

হলধর এখন দিল্লীতে।

বিধাতার বিধানেরই পরামর্শ মত সব কিছুই সুসিদ্ধ হয়ে গেল।

হলধর আর সেই গ্রাম্য কৃষক নয়, বাহুল্যতা বর্জিত ভদ্র বেশে এই দত্ত সাহেবের সাজাহান রোডের বাংলোতে গেষ্ট-রুমে স্থান পেয়েচে এবং যথারীতি টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। এমন কি এটাও সে বুঝেচে, দত্ত সাহেবের সংসারে টেবিলে খেলেও আর হিন্দু বাবুর্চি রান্না-বান্না করলেও অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া হয়না সাহেবি পোষাকে থাকলেও দত্ত সাহেব ধার্মিক হিন্দু, হরিসভার প্রধান কর্তা, সভাপতি, তাছাড়া কালীবাড়িরও একজন কর্তা ব্যক্তি। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনেরও একজন মুরুব্বি। দত্ত সাহেবের সঙ্গে সে ইতিমধ্যে এখান-কার নানা স্থান দেখে এসেছে। এখন দত্ত সাহেব ছুটির দরখাস্ত করেছেন, বৃন্দাবন মথুরা প্রয়াগ কাশী হরিদ্বার তীর্থ হলধরকে ঘুরিয়ে আনবেন। বেশ একটা স্নেহের সম্পর্ক জমে গিয়েছে হলধরের সঙ্গে। শিল্পীও অনেক সময় তাঁদের সঙ্গেই থাকেন, বেড়ান। হলধর শিল্পীকে অপুবাবু বোলেই ডাকে, যেহেতু মামার বাড়ির নাম তাঁর ঐটাই।

দত্ত সাহেবের যত ঘনিষ্ঠ-বন্ধু,—বড় বড় অফিসার,—বর্তমানে তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নেই। প্রফেসার গুপ্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঠিকই আছে, হলধরের সঙ্গেও তাঁর বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দত্ত সাহেব এখনও সেই সত্ত্বা-বিনিময়ের কথা ভুলতে পারেননি। একদিন হলধরের অগোচরেই বাড়ির কম্পাউন্ডে বাগানেই শিল্পীকে ধরে বসলেন,—

আচ্ছা, কি করে কি হলো,—বলুন তো ? দুজনেরই দেহ রইলো যথা-স্থানে, বাকী সব কিছুই বদল, এমন অবিশ্বাস্য,—বলতে গেলে অসম্ভব ব্যাপারই বা ঘটলো কি করে ? এখনকার বিজ্ঞানে এর কোন ইতি—

বাধা দিয়ে শিল্পী বললে, এখনকার এই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, এটা জড় বিজ্ঞান, অর্থাৎ চৈতন্য সত্ত্বা,—Spirit ছাড়া যা কিছু পদার্থ এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে তাই নিয়েই এর কারবার। কিন্তু এদেশেতে বিজ্ঞান যাকে বলে তার মহিমাই আলাদা, তার যা কিছু তত্ত্ব-অনুসন্ধান তা চৈতন্য নিয়েই। এ ছাড়া যা কিছু

দৃশ্য অদৃশ্য পদার্থ, তা বিজ্ঞানীরা নাকচ করে দিয়েছেন অর্থাৎ তাই নিয়ে ভারতের জ্ঞানমার্গের পণ্ডিত এবং আত্মতত্ত্ব পিপাসুদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কারণ তার মধ্য দিয়ে আত্মিক কল্যাণের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আপনি বলেন কি? এই জড় বিজ্ঞানেই আজ কত উন্নতি। রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ বা রেডিও বেতারের কথা তো এখন পুরানো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এয়ার-প্লেন, হেলিকপ্টার, এটম-বম্ব রকেট ইত্যাদি ইত্যাদি—এ সবই তো বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি। দুদিন বাদে চাঁদে পৌঁছাবার কথা ; এ সব কিছুই নয়?

আহা, অনন্ত আকাশে কতক দূর গতাগতি যন্ত্রশক্তিতে না হয় হলো। অনেক দূর, হাজার হাজার মাইল গতিবেগ, অতি দ্রুত, অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত—এসব তো বাহ্য বা ব্যবহারিক উন্নতি, সভ্যতার উৎকর্ষ বলা যায়। অথবা বহু সহস্র টাকা খরচ করে একটা বোমাই তৈরী হল, প্রকাণ্ড নগর বা জনপদ না হয় ঐ বোমা ফেলে পুড়িয়ে, ধ্বংস করে দেবার শক্তি লাভই হলো কিন্তু তাইতে যথার্থ কল্যাণ যাকে বলে তা কতটুকু হলো? কটা লোকেরই বা কল্যাণ হয়েছে বলুন এ সব কাজে। ধন উপার্জনের ক্ষেত্রে, অথবা ভ্রমণ বিলাসী কিংবা ব্যবসায়ী শ্রেণীর না হয় খানিক আনন্দের খোরাক যোগানো হয়েচে ; কিন্তু রোগ শোক দুঃখ-দারিদ্র্যের সমাধান কি হয়েছে কোনো সমাজের? যারা আবিষ্কার করেছে তাদের নিজ নিজ অহঙ্কার যতটা বেড়েছে ততটা কি তার আত্মিক উন্নতি হতে পেরেছে? ব্যক্তিগত প্রবল অহঙ্কার বা জাতিগত অহঙ্কার বাড়া,—আমাদের জাতির শক্তি বেশী, আমরাই ওদের কাবু করবো, প্রভুত্ব করবো। এখন এই আগ্রহই তো জাতির গৌরব হয়ে দাঁড়িয়েছে, একে কল্যাণ বলেন? তা যদি বলেন তাহলে বলতেই হবে আপনার কল্যাণ-বুদ্ধির গোড়ায় গলদ।

দত্ত বলেন, তাহলে এটাই বোলতে হয় যে আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক কিছু মীমাংসা একেবারেই অসম্ভব।

আচ্ছা! কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলচি,—আমাদের সত্ত্বাকে এক শরীর থেকে আর এক শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত বা এই অদল বদল ঘটানোতে কিছু প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠান আছে তো?

যেহেতু একটি এটমিক বা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে কত প্রক্রিয়া, কত এনজিনীয়ারিং দরকার। একটা মানুষের আরোগ্যের জন্যে আর একজনের শরীরে রক্ত সঞ্চার করতে কত প্রক্রিয়া দরকার হয় ;—একজনের হার্ট বা লিভার কেটে আর একজনের নষ্ট হার্ট বা লিভার জুড়ে দেওয়া কত প্রক্রিয়ার দরকার ; —সেই হিসাবে একটা দেহের ভিতর থেকে তার আসল ব্যক্তিটি বার করে দূরস্থ এক দেহের সঙ্গে বিনিময়ের একটা প্রসেস থাকবেই। হয়তো আছেও, কিন্তু সেটা ধরা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আপনার আমার মত সামান্য একজন জীবের বুদ্ধিতে ধারণা করবার মত বিষয়ও এটা নয়। যাঁর সত্ত্বায় এই সারা সৃষ্টিটা জড়িত,—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত ব্যাপক যে মহাসত্ত্বা, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে কোনো প্রক্রিয়া বা কর্মানুষ্ঠানের দরকার আছে নাকি? ইচ্ছামাত্রেই তো সেটি সম্পন্ন হয়ে যায়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই তো পর্যাপ্ত প্রক্রিয়া, মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এর ইতি করতে পারবে কি করে। তিনি যে এই জীব কোটির সঙ্গে নিত্য যুক্ত এই যে পরম সত্যতত্ত্ব—এইটিই ঠিক ধারণা।

কোটি কোটি সংসারী ছোটবড় জীবদের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। তাঁর ইচ্ছায় কোনো বিষয় সম্ভব-অসম্ভব বোলে কিছু আছে নাকি?

এবার দত্ত বললে;—বুঝেচি,—এটা ধারণা করাই অসম্ভব, কোন বিচার চলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চমৎকার লাগে ভাবতে।

আত্মশক্তি কতটা প্রবল হলে,—সন্দেহ বা বিচার বুদ্ধির রাজ্য পেরিয়ে বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া যায়। আচ্ছা, এটাও কি আপনার আশ্চর্য লাগে না, আজ দু'দিন আগের কথা, রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আপনি কী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আপনার অহম সত্ত্বা কী ধাতুতে গড়া ছিল, আর আজ আপনার কী অবস্থা হয়েছে? আপনার মধ্যে কি একটা অনুভূতি হয়নি? তাঁরই উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলোই পরন্তু দুই জনেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো যার ফলে আপনার মনের পরিবর্তন আর হলধরের উদ্বেগজনক নিরুপায় অবস্থার পরিবর্তন।

এবার দত্ত সাহেব বললেন, দেখুন, একটা কথা আমি স্বীকার করবোই, পরমেশ্বর বা তাঁর লীলায় বিশ্বাস না হলেও—এই যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, এটা যদি নিছক স্বপ্নই হয়, অথবা ভৌতিক কিছু হয় তা হলেও এটা ঠিক যে এর সবটাই শুভ এবং কল্যাণময় ফলই প্রসব করেছে। এইটি ভেবে সত্যই আনন্দ হচ্চে, বিশ্বাস, করতেও ইচ্ছা করে,—কিন্তু আমার এই মনের পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐ বিশ্বাস, পরমেশ্বরের মহিমায় মনকে স্থির করতেই পাচ্ছিনা। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন; আমার যতটা শিক্ষা, প্রতিষ্ঠা, সমাজে কর্মী বোলে একটা সম্ভ্রম, নিজেকে সাধারণের তুলনায় কতটা উচ্চস্তরের মানব বলেই মনে করি,—কিন্তু ঐ হলধর, যে লোকটার শিক্ষাদীক্ষা মর্যাদা নিশ্চয়ই আমার মত নয়, তত্রাচ আমার সঙ্গে কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বৈষম্য আছে যা দিয়ে বিচার করছেন। ওটা ক্ষুদ্র জীবগত দৃষ্টিভঙ্গি, তাইতেই হলধরের সঙ্গে আপনার সচ্ছল অবস্থা ও সংস্কৃতির এতটাই পার্থক্যের দিকেই লক্ষ্য পড়েচে—কিন্তু এটা দেখতেই পার্নান, আপনার মত ধন ও বিদ্যার ঐশ্বর্য না থাকলেও হলধর শিল্পী—কীর্তন গান ও বাজনায় তার দক্ষতা—নির্মল অন্তঃকরণ আর ঈশ্বর-ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলেই তাঁর কৃপালাভ তাঁর এই লীলার এমনই একটি পাত্র নির্বাচিত হয়েছিল। তাই এক হিসাবে সে আপনার তুলনায় উচ্চস্তরের জীব। দেখুন না, এতটা বিপন্ন অবস্থায় কোনো রকমে তার টাকার কোনো সন্ধান না করতে পেরে শ্রীহরি স্মরণ করেই শুয়ে পড়লো রাত্রে হরিসভা থেকে এসে। পরদিন শ্রীহরি যা করবার তা করে দিলেন। আপনাকে দিয়েই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। হলধরের মত মহৎ প্রাণ মানুষ কি অবস্থায় থাকে তা দেখেই না হলধরের মত একজনের সঙ্গে আপনার প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ ঘটলো; ফলে আপনার সঞ্চিত ধনেরও কিছু সদ্ব্যয় হলো, সার্থক হলো সঞ্চয় আপনার।

সত্যই এ সকল আমি বুঝি কিন্তু আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন এমন কি হাতের যন্ত্র, এ বিশ্বাস কিছুতেই আনতে পারচি না। এতটাই আমাদের অহঙ্কারের জড়তা। তিনিই তো আমার এই অবস্থা করে মাথাটি বিগড়ে দিয়েছেন—

বিগড়ে দিয়েছেন যেমন তেমনি সরল বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়েও দিয়েছেন, যথাকালে বিশ্বাস আসবেই—না হলে এমনটাই বা আপনাদের ঘটবে কেন?

যদি হয়, সেটা আপনার জন্যই বোলতে হবে।

আমাকেই বা আপনার সঙ্গে জড়ানোর উদ্দেশ্য কি? তাঁরই ইচ্ছায় তো সবকিছু যোগাযোগ, মূলেই তিনি। এটাও তো দেখতে হয়। যাক্ সে কথা, এখন আমাকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই, আসলে আপনি চুপচাপ থাকুন, ভাব ভিতরে ভিতরে পেকে আসুক, তারপর আপনার নিজ বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব ধরতে পারবেন; বিশ্বাসও আসবে যথাকালে। আমার মনে হয় এই হলধরই যে আপনাকে ভক্তিমান করে তুলবে না কে বলতে পারে?

এই পর্য্যন্তই সত্ত্বা বিনিময়ের কথা।

ফিরঙ্গ-বাবা

তখন হিমালয়ের মধ্যস্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলাম। মধ্য মহেশ্বরের পথে যে ভয়ংকর বন এবং জঙ্গল, তাহা আগে জানিতাম না। সে প্রকার ভীষণ জঙ্গল শিবালিক শ্রেণীর মধ্যে নাই। হিমালয়ের প্রথম স্তরেই শিবালিক,—ঐ শিবালিক শ্রেণীর সর্বত্রই প্রায় বন উপবনে পরিপূর্ণ, কিন্তু এমন ভীষণ জঙ্গল সেখানে কম। ঐ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল বড় বড় জঙ্গল আছে, সূর্যরশ্মি সেখানে বৃক্ষ লতা-পল্লব ভেদ করিয়া এক একটি উজ্জ্বল সোনার পাতের মত এখানে ওখানে চক্ষে পড়ে। কিন্তু এই মধ্যস্তরের হিমালয়ের যে জঙ্গলের কথা বলিতেছি সেখানে এক বিন্দু সূর্যকিরণও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানকার তুলনায় শিবালিক শ্রেণীর বনজঙ্গল রম্য উপবনের মতই মনে হয়। যদিও হিংস্র জীব-জন্তু ওখানেও আছে, এখানেও আছে; এখানে বরং বেশী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই মধ্য মহেশ্বরের পথে জঙ্গলে শুনিয়াছি বাঘ ভালুক তো আছেই, সাপ আর বিচ্ছুও বড় কম নাই। সে বিচ্ছু আকারে দীর্ঘ যতটা না হোক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ যেন কষ্টিপাথরে তৈরী। এই জঙ্গলে যেসব ভীষণ হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কথা শুনা যায় তাহার মধ্যে একপ্রকার সিংহ আছে তাহাকে ঘোড়ামুখো সিংহ বলে। অবশ্য আমি এক ভালুক ব্যতীত আর কোন জন্তু দেখি নাই, আর, তাহাও ক্ষণেকের জন্য। সিংহের কথাটা শোনা, আবার ইহাও শুনিয়াছি কোন সময়ে ঐ ধরনের সিংহ হিমালয়ে প্রচুর ছিল, এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। তবে গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের জঙ্গলে ঘোড়ামুখো সিংহ নাকি এখনও কিছু কিছু আছে এবং তাহাদের বংশ নাকি লুপ্তপ্রায়।

যাহা হউক, এখন দ্বিতীয় কেদার, মধ্য মহেশ্বর যাইতে এই গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটা প্রকাণ্ড চড়াই ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি। যখন মধ্যপথে পেঁাছিলাম তখন প্রায় দ্বিপ্রহর ঘেঁসিয়াছে। আমি একা নয়, সাথী আমার বাহক একজন, যে ব্যক্তি আমার বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং আমার সকল অসুবিধা দূর করিতেছিল।

এখন চলিতে চলিতে এমনই এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম যেখানে সূর্য-কিরণ ভূমি স্পর্শ করে না, প্রায় অন্ধকার বনভূমি।—বড়, মাঝারী ও ছোট ছোট গাছ তাহাতে অসংখ্য প্রকারের লতা ও বিচিত্র পাতায় ভরা। বাহক বাবাজী পায়ে পায়ে, পিঠ জোড়া বোঝা কপালের সঙ্গে মোটা পশমের ফিতায় বাঁধা, আগে আগে চলিতেছেন। পনেরো বিশ হাত পিছনে আমি, হাতে লম্বা খোঁচাওয়ালা

পাহাড়ে লাঠি লইয়া, শুধু পায়ে চলিতেছি। অন্তরে একটা আনন্দও যেমন, একটু ভয়ও আছে, কি জানি কোন্ হিংস্র-মহাত্মার সঙ্গে দেখাই বা হইয়া যায়। এদিক ওদিকে একটু দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেছি, এই আশ্চর্য, গম্ভীর, প্রায়ান্ধকার পরিবেশের মধ্যে বিস্ময় মিশ্রিত একটা কৌতূহল অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া আমায় এক বিচিত্র ভাবেই নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিয়াছে।

আরও চমৎকার এটা পাকডাণ্ডি পথ—পথের রেখা অস্পষ্টই, যেটুকু দেখিবার বা বুঝিবার তাহা আমার ঐ বাহক বান্ধবই বুঝিতেছেন,—আমি কেবলমাত্র তাঁহার অনুসরণই করিতেছি।

মধ্যে মধ্যে একপ্রকার পাখীর আওয়াজ কানে আসিতেছে। সেই ভূমির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন ঐ অদ্ভুত স্বর বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া আসিতেছে—শুনিলে কেমন ভয় আসে। কর্কশ প্যাঁচার আওয়াজ যেমন মাঝ রাত্রে কানে আসিয়া আমাদের চমকিত করে,—অনেকটা সেই রকম হইলেও তাহার উপরে যায়। তারপর আবার আর এক রকমের আওয়াজ, কিন্তু এটা যে প্যাঁচার ডাক নয় তাহা বুঝা যায় ; না জানি আজ আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, বিধাতাই জানেন।

এইভাবে তরুচ্ছায়াঘন প্রায় অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে আমার অগ্রবর্তী বাহক বাবাজী,—হঠাৎ আমার নজর পড়িল যেন,—অকস্মাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তারপর নিঃশব্দে পশ্চাৎ ফিরিয়া হঠাৎ তাহার কপালের পটি খুলিয়া দুই হাত মুক্ত করিয়া বোঝাটা ঝটিতি পিছনে ফেলিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন। উহা দেখিয়া আমি ভাবিলাম বুঝিবা ইহা তাহার কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির ফল। অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে পেঁছিয়া বাহু অবলম্বনে তাহাকে ধরিলাম। সে যেন চমকিয়া উঠিল, বলিল,—বো দেখো নাগরাজ। এখন সে আসিয়া সবল দুই বাহুর জোরে তাহার বোঝাটা তুলিয়া সরাইয়া পার্শ্বে রাখিয়া বলিল,—দেখো তো। তখনই দেখা গেল নাগরাজের লেজের দিকটা নড়িতেছে কিন্তু মাথা হইতে গলা পর্যন্ত খানিকটা শরীর থেঁৎলাই গিয়াছে—ঐ পর্যন্ত অসাড়। সাপটা বোধ হয় কুণ্ডলী পাকাইয়াছিল মাথাটি বাহিরে রাখিয়া শিকারের জন্যই ওৎ পাতিয়াছিল। ইপাশে একটা বেশ বড় গর্ত।

ইসিকে, আভি জ্বালানা চাইয়ে—বলিয়া বাবাজী ঐখানেই কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আনিল। এক অদ্ভূত রকমের চিত্রিত সাপটির চেহারা, লম্বা প্রায় ছয় হাত, বেশ মোটা, চক্র ছিল না। মুখটি তার বেশ চওড়া। পাহাড়ী ঘোড়ার জাত মনে হইল। এইভাবে নাগরাজের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বাহক আবার মোট তুলিয়া লইল এবং অগ্রসর হইল। এ কী একটা হইয়া গেল—ভাবিতে ভাবিতে আমিও তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম।

ক্রমে ক্রমে প্রবল তৃষ্ণার ফলে আমায় মরীচিকায় পাইয়া বসিল। সাপের কথা যখন মনে হয় তখন তৃষ্ণার কথা মনে থাকে না, আবার যখন তৃষ্ণার জ্বালা ধরে তখন সাপের কথা মনে থাকে না। কেবল কুলু কুলু, ঝর ঝর, ঝম ঝম, ঠিক যেন অদূরে একটি ঝরণা আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। এমন অদ্ভুত অবস্থা হইল আমার, ঠিক যেন এক অজ্ঞাত শক্তিশালী কেহ আমায় লইয়া খেলা করিতেছে।

বাহক-বন্ধু তার মুখ নীচের দিকে করিয়া সমানেই সরু পথ অতিক্রম

করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার মধ্যে কি হইতেছে কে জানে। তৃষ্ণায় তাহারও ছাতি ফাটিতেছিল নিশ্চয়ই আমি জানিতাম, কিন্তু আমার মত তাহার দিগ্‌ভ্রম অথবা মরীচিকার খেলা চলিতেছিল কিনা জানি না। মনে মনে খানিক ভগবান ভগবান করিয়া কাটাইয়া দিলাম। বনে জঙ্গলে তৃষ্ণার কি দুঃখ। আশেপাশে গাছের সীমা নাই ;—কিন্তু একটাও কি পরিচিত ফলের গাছ হইতে নাই,—না আম, না আমড়া, না আঙ্গুর, না আপেল, না ন্যাসপাতি। দেখিতে দেখিতে এক ঝাঁক আমলকী গাছ, এক একটা আঁসফলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ধরিয়াছে, অসংখ্য। তাহাই বেশ গোটাকতক তুলিয়া মুখে পুরিলাম—না রস না স্বাদ,—কেমন অদ্ভুত তিক্ত ও কষায় রস। দাঁতে চিবাইয়া মুখে নাড়িয়া চাড়িয়া তৃষ্ণা খানিকটা কমিল।

প্রায় আধ মাইল চলিবার পর ক্রমে আমাদের পথ অল্প একটু যেন পরিষ্কার হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও অনেকটাই কমিয়া আসিল, তত আঁধার আর রহিল না। পথের একধারে বড় বড় গাছ আর ঝোপ জঙ্গল, অপর দিকে বিরল পাইন বৃক্ষ-শ্রেণী আর খড়, একপ্রকার তীক্ষ্ণাগ্র ঘাস নামিয়া গিয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, কোথায় একটু জল পাওয়া যায় খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা চলিয়াছি। এই মধ্য-মহেশ্বরের পথে এখনও পর্যন্ত একটিও ঝরণা মিলিল না। এ পথ যে এমন ভয়ানক কঠোর হইবে তাহা কে জানিত? তবে সর্বাপেক্ষা দুর্বল করিতেছিল তৃষ্ণায়।

শুনিয়াছিলাম, মাঝপথে ভীলদের একটা আস্তানা আছে। নিশ্চয়ই সেথায় জল পাওয়া যাইবে, মানুষ জল বিনা বাস করিতে পারিবে কি করিয়া—কাজেই প্রাণের কামনা হইল, ভীলদের বস্তিটা পাওয়া যায় না—হে ভগবান, —কোথায় মাঝপথে ভীল-বস্তি, এতটা আসিলাম, মাঝপথ কি এখনো হয় নাই? আর এই জঙ্গলই বা শেষ হইবে কোথা! এখন যদিও অরণ্য অনেকটা হাল্কা হইয়াছে তবে মাঝে মাঝে সেই অজগরের ভয়ের স্থান আছে, একেবারেই অদৃশ্য হয় নাই। এখন সেই ভীলদের আস্তানা গুহায়, কিম্বা পৃথক নির্মিত কুটিরমধ্যে তাহারা থাকে কিনা, এ অঞ্চলে তো এখনও বাসস্থান কোথাও দেখিলাম না। একবার বাহককে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবাজী, ভীললোককা গাঁও কাঁহা, মালুম?

সে বলে,—আজ সঞ্ঝাকো উঁহা পেঁছা যায়েগা। রাতকো উঁহাই রহনেকো চাইয়ে—ফির কাল সুবকো চলেগা, দু'পহর কো কিদারনাথ পেঁছা যায়েগা'—

সাধারণ ভদ্র পর্যটক, তাঁদের সঙ্গে জলপাত্র ভরা জল থাকে। কোনোকালেই আমার তাহা ছিল না। পথের আয়োজন বলিতে কিছু, জীবনে কখনই শিখিলাম না, যদিও বাল্যে ও যৌবনে অনেক কালই পথে পথেই কাটিয়াছে। চিরদিনই পথকে গণ্য করিতে পারি নাই, গন্তব্যই মুখ্য হইয়া আছে আমার জীবনে। পথের দুঃখও কম পাই নাই। এখন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, ভালই বুঝিয়াছি যে. পথের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার নাম পাথেয়, তাহার কোনোটুকুই উপেক্ষণীয় নয়।

বাহক বন্ধুর তৃষ্ণাও কম নয় ; কিন্ত তিনি বড় গম্ভীর ও সংযত প্রকৃতির ব্যক্তি। সহজে নিজ অন্তরের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার মানুষ নয়, কাজেই ঘাড় গুঁজিয়াই চলিতেছেন।

বো দেখো, কৌন লোগ আ-রহা হৈ। সত্যই যেন অন্ধকারঘন বনতরু-ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া আসিতেছে তিন চার জন লোক। দেখিতেছি বিশাল শরীর, তাহাদের মুখমণ্ডলও ভয়ংকর দেখিতে। ক্রমে উহাদের গলায় প্রবালের সঙ্গে বড় বড় পুঁতির মালাও দেখা গেল। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, তীক্ষ্ণাগ্র লোহফলা তাহার, অব্যর্থ মারণাস্ত্র। সামনে দুই মূর্তি,—পিছনে একটি নারী, তাহার এক হাতে একটি থলি, অপর হাতে একটি দণ্ডে ঝুলানো ভাঁড়। তিনজনেরই পরনে লাল কাপড়।

বাহকের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে,—তৃষ্ণায় কিম্বা আতঙ্কে ঠিক বুঝিলাম না। তাহার গতিও শ্লথ হইয়া আসিতেছে;—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অদূরে আগমনশীল মূর্তি কয়েকজনের উপরে,—সে দৃষ্টি নড়িতেছে না। একটা কথা এখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল;—ভীললোগ্ উপরসে আতা হোগা; অর্থাৎ বোধহয় উপর হইতে ভীলেরা আসিতেছে।

আমার আর ভয় রহিল না, যখনই শুনিলাম উহারা উপরের অধিবাসী ভীল।

ক্রমে তাহারা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—এ রাস্তেমে জল মিলেগা কি নহি? হামলোককো বহোত তিয়াস।

পুরুষ দুই জন একবার আমার আবার বাহকের দিকে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি তাহার উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিল, তারপর বলিল,—ইঁহা জল কঁহা মিলি, ই রাস্তেমে জল নহি, বো পুরানা ঝরনা শুখ গই।

ইহার পর পুরুষদের একজন বলিল,—অব্ চঢ়ো, চঢ়ো, বো সীধে চলা যাও, জব জঙ্গল খতম হোয়েগা, সন্ত মহারাজ ফিরঙ্গবাবাকো আশ্রম মিলেগা। উঁহাই সব কুছ মিলেগা, ঝরনা ভি হৈ, বৈঠনেকি জাগা মিলেগা।

তাহারা আর দাঁড়াইল না, সোজা চলিয়া গেল। আমাদেরও শান্তি—বাহকের ভয় ঘুচিয়া গেল। এখন তাহার মুখে হাসি ফুটিল; বলিল,—ই লোগ শিকার কা পিছে যা রহা। আমরাও গতি না কমাইয়া চলিতে লাগিলাম;—কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে নিলাম,—কৌনসে শিকার ইহাঁ মিলে গা?

বাহক বলিল,—হরণ, ব্রেড়ের, মোরগ বনকী,—ঔর ক্যা মিল শকতা হৈ, ইধার।

গভীর জঙ্গলের শোভা, একটা আশ্চর্য রূপ আছে;—যার ভয় লাগে তার পক্ষে আর এ বন্য সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে না।

এ পথে কোনও কালে একটা ঝরনা ছিল, বহুকাল সে-ধারা বন্ধ হইয়াছে। কাজেই আমাদের অদৃষ্টে সে পুণ্যতীর্থ যখন আর নাই, তখন ছাতিফাটা তৃষ্ণা লইয়াই চলিতে হইবে। পাহাড়-পথে তৃষ্ণা এড়াইতে, আমার বাহক বন্ধু, দেরাদুন হতে যাত্রার পূর্বে কয়েকটি বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেঁতুল, মিস্রি, নুন-আমলা প্রভৃতি,—তাহাই মুখে নাড়িতে চাড়িতে চলিয়াছি—কিন্তু তাহাতেই কি জলের তৃষ্ণা মিটিবার? শীতল জল ব্যতীত এ তৃষ্ণার শান্তি নাই। এখন পথ চলিতেও কষ্ট হইতেছে, শরীরও অবসন্ন। তৃষ্ণায় যে এতটা কাহিল করে এ অভিজ্ঞতা পূর্বে ছিল না।

কষ্টের শেষ আছে, ক্রমে বনপথে আলো আসিতে লাগিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যকিরণ দেখিয়া প্রাণ প্রফুল্ল এবং আশার সঞ্চার হইল। বাহক

বাবাজী বলিলেন, এইবার কাছেই আমরা জল পাইব। আরও কতক উঠিয়া যখন গাছপালা দূরে দূরে ছড়াইয়াছে তখন সম্মুখেই একটা পর্বত গুহা আমাদের আকৃষ্ট করিল। গুহার দৃশ্য নয়নগোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, মুহূর্তের মধ্যে যেন সকল কষ্টের অবসান হইল। বলা কওয়া নাই সবকিছু ভুলিয়া ঐ গুহার দিকেই পা চালাইতেছিলাম, দেখিবামাত্রই বাহক-বন্ধু বাদ সাধিলেন—

উঁহু উঁহু, উধার নেহি,—যিস্ তরফ ঝরনা হোগা পহলা হাম্ যায়েগা, আপ থোড়া ইহাঁ ঠার যাইয়ে। বলিয়া সে তাহার বোঝা একটা বড় পাথরের উপর রাখিয়া ঐ গুহার দিকে একটা বনপথ ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি মাল পাহারা দিতে রহিলাম। বসিয়া বসিয়া,—যেন দূরস্থ ঝরনার শব্দও পাইলাম। অল্পক্ষণেই বাহক ফিরিয়া আসিল,—আপ্ যাইয়ে, থোড়ি দূর। জল পী লেনা, লেকেন বো গুফামে মৎ ঘুসো।

কাহে নেহি ঘুসেগা, যব্ দিল চাতে ?

উঁহা শের রহতা, সাপ, বিচ্ছু সব কুছ রহ সকতে।

তাহার কথা শুনিতে বাধ্য। দেখিলাম বড় সাবধানী মানুষ, এ অঞ্চলেরই লোক সে। সুতরাং ঝরনায় গিয়া আকণ্ঠ জল পান করিলাম। ফিরিয়া গুহার কাছে আসিয়া মনে হইল গুহায় কি আছে একবার দেখিতে দোষ কি ?—এখানে এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, কৌতূহল লইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছি ; হঠাৎ পিছন হইতে আমার কাঁধে একখানি হাত

আসিয়া পড়িল। চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি, চমৎকার! অপরূপ এক সাধু-মূর্তি, যেন সাক্ষাৎ শিব স্বয়ং আমার সম্মুখে। ইনিই ফিরঙ্গ-বাবা।

তীরথ কা যাত্রী? বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

জী মহারাজ, বলিয়া প্রণাম করিতে গেলাম। ঐসা নহি, ঐসা নহি, এ্যায়সা,—বলিয়া সবলে আমায় তুলিয়া আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। বিশুদ্ধ হিন্দীতেই কথা।

অল্পক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন দেশ কি মূর্তি?

বাঙ্গালী! শুনিয়াই আনন্দে আমার হাতখানি ধরিয়া গুহার দিকে লইয়া চলিলেন।

সচ্চাবাৎ শুনোগে, আপনে দেখতেই মুঝে সমঝা থা যে আপ কি বাঙ্গালী শরীর।

এখন আর হিন্দি নয়, ভাষায় বলিব।

তারপর সস্নেহে বলিলেন,—আজ তুমি আমার অতিথি। আমি বলিলাম, সঙ্গে আমার বাহক আছে যে। তিনি বলিলেন, সেও আমার অতিথি। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এখানে কিছুরই অভাব নেই।

গায়ের রং, মাথায় চুলের রং এবং গাঢ় নীল চক্ষু-তারকা দেখিয়া আমার মনে যাহা উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম,—আপনার শরীরটি উরোপের কোন্ অংশের জানতে ইচ্ছা হয়। কয়েকটি বৈচিত্র্য দেখেই জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হয়েছি,—ক্ষমা করবেন।

মৃদু হাস্যে তিনি বলিলেন,—I was once an European, a Hungarian of jewish decant, but justnow an Indian Sadhu, Pure and simple. এই যে সাধুর Pure and simple কথাটি যে মর্মে মর্মেই সত্য সে পরিচয় পাইয়াছিলাম।

সাধুর হিন্দী বুলি খুব ভাল, ইংরাজী বলিতে যেন একটু ঠেকে। যাই হোক এখন গুহার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে,—বাহিরে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছিল। গুহার দ্বার ছোট, প্রায় সাড়ে তিন ফুটের মত, হেঁট হইয়াই ঢুকিতে হয়। ভিতরে দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব কিছুই। দেখা গেল, এক প্রান্তে সাধুর আসন বিস্তৃত, তাহাতে শয়ন ও উপবেশন দুই চলে। তুলার গদি, তাহার উপর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম বিস্তৃত। ভিতরের ছাদ উচ্চে, মধ্যস্থলে সাড়ে চার ফুটের বেশী হইবে না, শেষ দিকটায় আরও কম, সেই দিকেই সাধুর আসন। আশেপাশে অনেক বই ও খাতাপত্র আছে। গুহার মধ্যে দাঁড়াইতে পারা যায় না;—দাঁড়াইতে হইলে বাহিরে আসিতে হইবে। ভিতরে পাঁচ-ছয় জন পাশাপাশি বসিতে পারে এমন স্থান আছে।

আমরা গুহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবেশ করিবার পূর্বে, আশ্রয়দাতা, বাহক বাবাজীকে ডাকিয়া আমার কম্বলাদি কিছু আনাইয়া গুহার মধ্যে আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তারপর তাহাকে অন্যান্য জিনিসপত্র সহ কোথায় রাত্রি যাপন করিতে হইবে, কোথায় খাদ্য পাক করিতে হইবে, কোথায় তাঁহার ভাণ্ডার—প্রয়োজনীয় সকল কিছু পাওয়া যাইবে ইত্যাদি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। অতীব তৎপরতার সহিত

সব কিছু শেষ করিয়া বলিলেন,—এইবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আলাপ করিব।

তাঁহার সব কাজই মেথডিক্যাল,—এই থরোনেস্ই তাঁহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য। ইহাপেক্ষা আর একটি ব্যবহার আমায় আকৃষ্ট করিয়াছিল,—সেটি তাঁর সরলতা। আমার সঙ্গে প্রথম হইতেই এই যে ব্যবহার, ইহার মধ্যেই উরোপীয়ানদের, বিশেষতঃ ব্রিটিশ প্রভুদের শ্রেষ্ঠত্বের গরিমাহেতু যে একটা দূরত্ব —যাহাতে আমরা চির-অভ্যস্ত সেটির নামগন্ধও নাই। অবশ্য ইহাও বুঝিলাম এই উৎকর্ষের মূলে তাঁহার ধর্ম বা অধ্যাত্ম-চেতনা—যাহাতে তাঁহার পাশ্চাত্যের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

এই সকল বিবরণ যে কথা প্রসঙ্গে আসিয়াছিল—এখন সেই কথাই বলিব। সাধু বেশ রসিক,—ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর বলিলেন,—তুমি তো ভারতবাসী, এটা জানাই আছে যে অতিথি এলে আগে কিছু খাওয়ানো দরকার। আমার ঘরে যা আছে তাই দিচ্ছি, আর আমিও তাই খাব। দেখিলাম, ঝক্‌ঝকে মাজা পাত্রে জল, এক পাত্র ভাজা আটা বা ছাতু, কৌটায় মাখন, চিনি, একটি লোটায় গরম জল। ছাতুতে খানিকটা মাখন ও চিনি এক পাত্রে আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এটা গরম জলের সঙ্গে নরম করে নিয়ে গলাধঃকরণ কর, আমিও তাই করি। শেষে সুপক্ক পেয়ারা দুটো আছে, দুজনে খাওয়া যাবে। রাত্রে যা জুটবে দেখা যাবে। এই ভাবে আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ হইল। দেখিলাম, পেট ভার হইল না অথচ বেশ তৃপ্তিকর ভোজন হইল।

এইবার পরিচয়ের পালা। উভয়েই এক এক টুকরা হরিতকী মুখে দিয়া বসিবার পর তিনি আরম্ভ করিলেন,—তোমার মনোগত কৌতূহল এই যে, আমি কোন্ সূত্রে ভারতে এসে এইভাবে সাধু-জীবন যাপন করছি এই কথা তো? সংক্ষেপে তার প্রথম কথা এই যে, দেশে বিদ্যাধিকারে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম এবং অধ্যাপকের আগ্রহে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিলাম। আমার অধ্যাপকের কাছেই শুনেছিলাম, ভারতের আর্যেরা সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন শংকরের ভক্ত, বেদান্তই মানব-জ্ঞানের চরম আবিষ্কার, একথা বিশ্বাস করতেন। আমি তাঁর কাছেই অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্বের কথা শুনেছিলাম। তিনি আমায় বুঝিয়েছিলেন যে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বই অপার্থিব বস্তু, মানব জ্ঞানের সার। এই ধারণা নিয়েই তখন আমি প্রাণের টানে দেশ ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়ি। বয়স পঁচিশ উত্তীর্ণ হয়ে ছাব্বিশ বৎসর আরম্ভ হয়েছে। তখন সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনই আমার একমাত্র কাম্য ছিল। আর আগেই শুনেছিলাম ভারতের সর্ব প্রাচীন সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্রই হলো কাশী। কাশী লক্ষ্য ছিল, তাই ত্বরাগতি বোম্বাই থেকে একেবারে কাশীতে এসে পড়লাম। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নাম, অদ্বৈত বৈদান্তিক বলে প্রসিদ্ধ আগেই শুনেছিলাম। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বেদানন্দ। তাঁরই আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে আমার জীবন-কথা জানালাম, কিন্তু বেদানন্দ আমায় গ্রহণ করলেন না। পরমানন্দও একজন বিশুদ্ধানন্দের শিষ্য। তখন দণ্ডী স্বামী পরমানন্দেরই শরণাপন্ন হলাম।

এমন কি, তাঁকেই আমার গুরু বরণ করে জীবন সার্থক করব, আমার এই সংকল্পের কথা বললাম। তিনি বললেন—ব্রাহ্মণসন্তান না হলে আমি দীক্ষা

দিই না, এইটাই এখানকার নিয়ম। তবে তোমার অধ্যয়নের সহায়তা নিশ্চয়ই আমি করব, যদি তুমি শুদ্ধাচারে এখানে জীবন-যাপন করতে পার।

আমি তাই স্বীকার করলাম।

প্রথম দুই বৎসর এইভাবে আমার কাশীতে কেটেছিল। কঠিন নিয়মের মধ্যে কাশীর পাঠ সাঙ্গ হলে পর ওখান থেকে আমি চলে আসি।

বিদায়বেলা তিনি বললেন,—এবার তুমি ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন কর। ঐ সুযোগে তোমার দেহমন পবিত্র হবে, ফলে গুরুলাভও ঘটতে পারে। তখন আমারও প্রাণ আর কাশীর কোলাহলের মধ্যে থাকতে চাইছিল না—কেবল অধ্যয়নের আকর্ষণেই ওখানে দুই বৎসর কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। সংস্কৃত ভাষায় আমার অনুরাগ দেখেই স্বামীজী স্বয়ং এবং ওখানকার সবাই আমার প্রতি একটা স্নেহের ভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বিদায়বেলা যখন স্বামীজীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে গেলাম তিনি আমার স্পর্শ নিলেন না, পা সরিয়ে নিলেন। বোধ হয়—ইউরোপীয়ান, ম্লেচ্ছ, আচারহীন বলেই তাঁর মত একজন দণ্ডীস্বামী পূজ্যপাদ পণ্ডিতের মধ্যেও একটা দ্বেষ এবং ঘৃণা বেশ ভাল ভাবেই জমা আছে দেখলাম, তা থেকে পরিত্রাণ নেই, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও।

এই ব্যাপারে আপনি হয়তো প্রাণে একটু আঘাত পেয়েছিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তা হয়তো একটু পেয়েছিলাম, তবে বুদ্ধি বিচারে তার মীমাংসাও করে নিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, সেটি কি রকম, বলুন তো? তিনি নিঃসংকোচেই বলিলেন,—পূর্ণভাবে আত্মসাক্ষাৎকার বা সমাধি না হলে, অর্থাৎ যাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান, তা না হওয়া পর্যন্ত, জাতি ও ধর্মগত সংস্কারগুলি এমন ভাবে মন বুদ্ধিকে আঁকড়ে থাকে, তা থেকে কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন এক জিনিস—আর অদ্বৈত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার অন্য—তাইতেই সর্বার্থসিদ্ধি, সর্বাত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ—জন্ম, জীবন ও জীবত্ব সার্থক। সেটা বিদ্বান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়দের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না।

আমার প্রশ্নের উত্তর এতটা সরল এবং এতটাই সত্য যে আর কথা বাহির হইল না আমার মুখে। যাহা হউক, তারপর তিনি বলিয়া চলিলেন—এখন থেকে গুরুলাভ ও দীক্ষার জন্য পাগলের মতই তীর্থভ্রমণ আরম্ভ করে দিলাম। কেমন করে অদ্বৈত তত্ত্বানুভূতি আমার জীবনে সম্ভব হবে এইমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই—কাশী থেকে প্রয়াগ, অযোধ্যা নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্রে কিছু দিন কাটিয়েছিলাম। সর্বত্রই সাধু-সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ,—কিন্তু কোথায় আমার গুরু? কারো কাছে জিজ্ঞাসা করলেও কোন সদুত্তর পাই নি। একজন বললেন, মথুরা বৃন্দাবন যথার্থই ভগবানের স্থান। মথুরা গেলাম, তারপরই বৃন্দাবন। অনেক অনেক সাধু আছেন, কেবল আমার গুরু নেই। তারপর জয়পুর রাজ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে নাথ সম্প্রদায়ী সাধুর আড্ডা-গলতায় দীর্ঘকাল বাস করেছি। অতঃপর মধ্য প্রদেশের নাসিক তীর্থে কুম্ভ মেলায় এবং তন্ন তন্ন করে সাধু সন্ত দেখলাম। কি ভয়ানক ভিড় সাধুর। তারপর পুনা হয়ে বোম্বাই গেলাম।

এখন থেকেই দ্বারকা যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এতটাই প্রবল

হলো দ্বারকা তীর্থে যাবার আকাংক্ষা, কে যেন প্রবলবেগে আমায় ঠেলে দিলে ঐ দিকে। জাহাজে যখন দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম এক সাধুও ছিলেন ঐ জাহাজে,—দ্বারকা-যাত্রী। প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হলাম তাঁর মূর্তি দেখে। কান ফোঁড়া ঘড়িওয়ালা সাধু। ঘড়ি অর্থাৎ মোটা মোটা রিং দুই কানে দুটো ঝুলছে ; নাম তাঁর মঙ্গলনাথ বাবা। চমৎকার সংস্কৃত ভাষায় কথা বললেন। আমার ধারণা হয়েছিল তিনি জ্ঞানী আর সেই জন্যই একটা কেমন গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

দ্বারকা পেঁছিবার পর থেকে আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি। দুইএকদিন পর যখন সুযোগ পেলাম, সোজা একেবারে আমার দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় নিবেদন করলাম। আমার প্রতি কৃপা করে তিনি নিঃসঙ্কোচেই রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে দুজন শিষ্য বা সেবক ছিল তারা বেঁকে দাঁড়ালো। তারা বললে, বিজাতীয় বিধর্মীকে দীক্ষা দেওয়া হতেই পারে না—আমাদের গুরু মোহান্ত শুনলে অনর্থ ঘটবে। বাবা মঙ্গলনাথ কিন্তু তাদের কোন কথাতেই কান দিলেন না। তাদের বললেন,—যে ব্যক্তি এমন দেবভাষার অধিকারী, তপঃপরায়ণ,—জ্ঞান-মার্গের মানুষ,—সে এই ধরিত্রীর যে অংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। অন্তরে যখন ধর্মসাধনের ঐকান্তিক আগ্রহ জেগেছে তখনই ওর অধিকার হয়েছে।

দ্বারকাতেই আমার দীক্ষা হয়ে গেল। সত্যই আমার জন্মান্তর হলো—ধন্য হলাম। আমার গুরুদত্ত নাম হলো—কল্পনাথ। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত ও নামে কোথাও পরিচিত হইনি। পূর্বাশ্রমের ধন-সম্পত্তি, বেশ-ভূষা, নাম, সংস্কার প্রভৃতি যা-কিছু—এমন কি শিক্ষা-সূত্র পর্যন্ত সব কিছুই যেমন ত্যাগের বস্তু,—এ নামটিও তেমনি পরিত্যাজ্য বলেই আমার ধারণা। সাধুর আবার একটা নাম কেন ? নামের সঙ্গে মোহ আছে।

গুরু আমায় মন্ত্র এবং জপাদি সাধন দিয়েছিলেন। জপের প্রণালী সুন্দর ভাবেই বুঝিয়ে. আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ কেমন করে স্বয়ংক্রিয় হয় দেখিয়ে. এমন কি আয়ত্ত করিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। ঠিক সেই নিয়মেই জপে মগ্ন হয়ে থাকতাম। ফলে সহজেই আমার ধ্যানের অবস্থা এল ; আনন্দে আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে প্রায় বৎসরাধিক কাল কাটিয়ে তখন আমি প্রভাস তীর্থে এলাম।

প্রভাসের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন রকমের। এখানে বৈষ্ণবভক্ত আর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানই বেশী। চমৎকার, আনন্দময় ভাবভঙ্গীতে ভজন সাধন করে চলেছে, এরা সবাই যেন এক দেবরাজ্যেরই অধিবাসী। প্রভাস থেকে ডাকোরজী দর্শনে গেলাম। দ্বারকার আসল বিগ্রহ এখন এই ডাকোর তীর্থেই রয়েছেন—ঠিক যেমন বৃন্দাবনের আসল বিগ্রহ গোবিন্দজী জয়পুরের প্রাসাদস্থ উদ্যানের মধ্যেই বর্তমান। পরে আমি মধ্যভারত হয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করলাম।

এদিকে প্রত্যেক জনপদের নাগরিকরা এমন শান্ত প্রকৃতির নর-নারী যে নির্বিচারেই বলচি, প্রাচীন ভারতের প্রতিরূপ দক্ষিণ ভারতেই বর্তমান। এদের মাঝে এসে একদিনের জন্যও আমি মনে করতে পারিনি যে আমি ভিন্ন দেশের লোক, যদিও ভাষা জানতাম না। অনেক পণ্ডিত. গ্রামে এবং নগরে—তাদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছি, দেখেছি, তারা সবাই আপন করে নিয়েছেন

আমাকে তাঁদের সরল এবং উদার আচরণে। ঐ দেবভাষার প্রভাবেই আমি তাঁদের আপনজন হতে পেরেছিলাম। তবে অধিবাসীরা সাধারণ গরীব, সবরকমেই বিলাস-বর্জিত আর তাইতেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

ঘুরতে ঘুরতে আমি মাদুরায় গেলাম। মাদুরাই যেন দক্ষিণ ভারতের প্রাণ মনে হলো। তবে সর্বত্রই ফোঁটা তিলকের ঘটা ঠিকই আছে কোথাও ব্যতিক্রম নেই। এমন কি গৃহস্থাশ্রমী ভদ্র গ্রাম বা নগরবাসীরাও ফোঁটা তিলক ছাপ মারাই পছন্দ করেন।

আমার ভাগ্যক্রমে সাধু সন্ন্যাসীদের কারো সঙ্গে নয়, সত্যনারায়ণ শর্মা নামে এক প্রৌঢ় গৃহস্থের সঙ্গেই একটু গভীর ভাবে আলাপ হয়ে গেল। তিনি এম-এ পাশ। প্রথমেই আমি তাঁর মূর্তি দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কারণ তাঁর মধ্যে এমনই একটি স্বাধীন ও শক্তিমান ভাবের প্রকাশ ছিল, যা আমার পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব। এতদিনের মধ্যে যত লোকের সঙ্গে মিলেছি, তাঁর মধ্যে যে নিঃসংকোচ স্বভাবটি দেখেছিলাম এমনটি কারো মধ্যেই দেখিনি। যাঁকে মুক্ত পুরুষ বলা যায় ইনি তাই।

আরও বিশেষত্ব ছিল, কোথাও তাঁর শরীরের মধ্যে ফোঁটা তিলকের কোনো চিহ্নই ছিল না। এমন কি শিখা ও সূত্র যা ব্রাহ্মণদের দেহের সঙ্গে আমরণ যুক্ত—সর্বত্র দেখে এসেছি তাও ছিল না। তিনিই প্রথমে আমার সঙ্গে উপযাচক হয়েই কথা কইলেন। আমার পরিচয় নিলেন, আহ্বান করে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেবা-যত্ন এমনই আন্তরিকতাপূর্ণ মনে হয় যেন বহুকালেরই প্রীতির সম্বন্ধ ছিল আমাদের মধ্যে, তিনি যেন আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। প্রথম প্রথম আমার একটু একটু সংকোচ ছিল, তাঁর সেটা তিলমাত্র ছিল না। যাই হোক ঘনিষ্ঠ কথাবার্তার মাঝে একদিন,—তিনি দীক্ষিত অর্থাৎ তাঁর গুরুলাভ হয়েছে কিনা, এই কথাই জিজ্ঞাসা করে বসলাম তাঁকে।

উত্তরে তিনি যা বললেন আমার পরমাশ্চর্য বলেই ধারণা হলো। আরও বেশী আমি আকৃষ্ট হলাম, এমন কি মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তা শুনে। তিনি বললেন,—গুরু-লাভ বা মন্ত্র-দীক্ষার কথা বলছেন? গুরু এবং ইষ্ট,—আমার দুইই লাভ হয়েছে ঐ একই সত্তার মধ্যে। পরমেশ্বর,— আমাদের যিনি সর্বজীবেরই ইষ্ট, সর্বব্যাপী সৎ, তাঁর মূর্তি কোথা? কাজেই যার ভিতর দিয়ে আমার মধ্যে ইষ্ট স্ফূর্তি হলো সেই মূর্তিই আমার ইষ্টমূর্তি; —আর কি চাই? সবই পেয়ে গিয়েছি ঐ গুরুর মধ্যে, অথচ তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে যে দীক্ষা হোম যাগ যজ্ঞ ওসব অনুষ্ঠানের কোনো দরকারই হয়নি। এখন আমার জীবনে শান্তি আনন্দ প্রাণের স্ফূর্তি, যা নিয়ে এ সংসারে আত্মশক্তির খেলা, তা প্রচুর। আমার আর চাইবার কিছুই নেই;—সবই পেয়ে গিয়েছি।

এমন কথা আমার জীবনে কোথাও, কখনো কারো মুখেই শুনি নি। আমার যেন বাকরোধ হয়ে গেল। ধন্য জীবন.—ভারতে এসে এই একটি জীবন প্রত্যক্ষ হলো। আমার আদর্শ যেন সামনেই দেখতে পেলাম। এখন চরম কৌতূহলের চাপে সর্ব সংকোচ কাটিয়ে যখন মনোগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে যাব তখন শর্মা আবার বললেন,—গুরু আমার প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী; প্রচ্ছন্ন থাকেন সত্য কিন্তু তা বলে আমার অথবা আমারই মত কারো উপস্থিতি উপেক্ষা করতে পারেন না। যখনই প্রাণ চায় দেখতে, কিম্বা সঙ্গ করতে ইচ্ছা হয়, অবাধেই চলে যাই,—

বিশ মাইল মাত্র দূরে থাকেন, কয়েকটা স্টেশন পরেই তাঁর স্থান। অপূর্ব তীর্থ,—অরুণাচলম্।

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, দুর্নিবার লোভে পেয়ে বসল। এইবার নিঃসংকোচেই বলে ফেললাম হাত জোড় করে—আমার কি সে ভাগ্য হবে,—একবার তাঁকে দেখার সাধ কি পূর্ণ হবে না?

আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আর বিলম্ব অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তিনিও আমার মন বুঝলেন। পরদিন প্রভাতেই যাত্রা।

ঐ অরুণাচলম্ পর্বতমালা; স্টেশন থেকে হেঁটে পেঁাছে গেলাম। অল্পক্ষণেই পরমতীর্থ মহর্ষি রমণের কুটির-মণ্ডপে। প্রথম দর্শন গৃহদ্বার থেকেই—একবার মাত্র ঐ চক্ষের দৃষ্টি।

ঐ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছুই আমার মধ্যে পেয়ে গেলাম। আজ আমি তোমায় যা বলছি, আমার জীবনে আজ আট বৎসর জীবন্ত অভিজ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে আছে—মহর্ষির ঐ প্রথম দৃষ্টি আমার উপর। ঐ এক দৃষ্টিপাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক প্রীতিময় একাত্ম সম্বন্ধের জন্ম। আশ্চর্য নয় কি? এর চেয়ে পরমাশ্চর্য আর কি হতে পারে এই বিজ্ঞানের যুগে?

আমি কথা বলি নাই, চুপচাপ তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিতেছিলাম। কতক্ষণ স্থির থাকিয়া সাধু বলিলেন;—যৌবনকালে রূপে-গুণে মুগ্ধ নরনারীর আকর্ষণ বুঝতে পারি;—কিন্তু প্রৌঢ় বয়স্ক, অতি সাধারণ এক মূর্তি ভারতের মাটিতে এইভাবে আমার মত একজন ইউরোপীয় পরিণত যুবাকে, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে এভাবে আকর্ষণ, এমন কি দৃষ্টিপাতেই আত্মস্থ করে নেওয়া, বিজ্ঞানময় জগতে এর বড় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এবার তিনি নিস্তব্ধ হলেন। তাঁর এই দিব্যোচ্ছ্বাস আমার মধ্যে খানিক সংক্রামিত হইয়াছিল, তবুও খানিকক্ষণ সংযতই ছিলাম, কিছুই বলিতে পারি নাই। এখন আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম—দেখুন, আমার মধ্যেও এক প্রবল আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। এক সময়ে বছরের পর বছর আমি দক্ষিণ ভারতে কাটিয়েছি,—বিশেষ তামিল দেশে অনেকবারই যাতায়াত করেছি কন্যাকুমারী পর্যন্ত—তখন মহর্ষির নাম পর্যন্ত আমার কানে যায়নি;—সেই-জন্য তাঁকে আমি যেভাবে হারিয়েছি, মনে হয় আমার এ দুঃখের কখনও শান্তি হবে না।

সাধু শুনিলেন,—কিছুই বলিলেন না।

দেখিলাম, আনন্দে ভরপুর হইয়া আছেন। বুঝিলাম, এখন আর কোনো কথাই চলিবে না।

কতক্ষণ পর, যখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সূর্যদেব অস্তে গিয়াছেন, ঐ সময়ে তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। আমাকেও অনুসরণ করিতে বলিলেন।

সাধু বলিলেন:

এখন এসো, একটু বাহিরে। এখানে আমি কি নিয়ে থাকি, কিভাবে দিনপাত করি, ঘুরে ফিরে দেখবে শুনবে;—সন্ধ্যার পরেই রাত্রের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাক, তারপর তো সারারাত আছে।

দেখিলাম ইতিমধ্যেই আমি অপরিচিতের ব্যবধান ছাড়াইয়া মহাত্মার বড়ই নিকটে আসিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, সময়টা গোধূলী, এখনও অন্ধকার হয় নাই।

এসো বন্ধু, আমার অন্তঃপুর দেখবে এসো।

আমরা গুহা হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে পায়ে পায়ে নিকটেই অপর এক গুহাদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিকটেই একটি অতিবৃদ্ধ পাকুড় গাছ ; তাহার তলাটি দেখি আলগা পাথরে বাঁধানো, বেশ কয়েকজন বসিতে পারে। তাহার পাশেই আমার বাহক-বন্ধু পাক করিতেছে, লোটায় ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন রুটি সেঁকিতেছে। চাপাটি—হাতে চাপড়াইয়া যে-ভাবে রুটি এদিকে রোজ বানাই ও খাই। আমায় দেখিয়া সে বলিল, সন্তু মায়ীসে সব কুছ সিধা মিল গিয়া, অব বনাতা হুঁ। শুনিয়া সাধু বলিলেন—তোমার বাহককে বলিলাম, আজ আর তোমায় পাকাতে হবে না, আমরা সবাই একসঙ্গেই রাত্রে খাবো। কিন্তু সে রাজী নয়, বলিল—হাম অপনা পাকায় খাবেগা, —সিধা লেউঙ্গা। কাজেই সিধা নিয়ে ইচ্ছামত তৈরী করে নিচ্চে।

আমি বলিলাম, ভারতের এই-টিই হলো বিশেষত্ব। খাওয়ার ব্যাপারে পবিত্রতা রক্ষাই ধর্ম। সাধু বলিলেন—এর মূল কারণটা আমার মনে হয় আমীষ ও নিরামিষের ব্যবধান—যারা নিরামিষাশি তারা আমিষাহারীদের ঘৃণা করে। বহুকালের প্রচলিত প্রথা বলিয়া সাধু গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই গুহার দ্বার অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দেখা গেল—ভিতরে একটি নারীমূর্তি, কর্মরত অবস্থায়। বেশভূষা এই গাড়োয়ালের মেয়েদের মতই। ঘাগরা কাঁচলী, বাহিরে আসিলে একটা দোপাট্টা বা ওড়না। উজ্জ্বল গোরী চাহনীতে আমার মনে হইল যেন একটু ট্যারা, কিন্তু সুন্দর মুখশ্রী—কপালে কালো টিপ্। নিঃসঙ্কোচ ভাব, তিনি আমাদের এমনভাবে দেখিলেন যেন ইহাতে তিনি চির অভ্যস্ত। তাহার হাতের কাজে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিল না। নিঃসঙ্কোচ ভাবটি বড় ভাল লাগিল অথচ একটি আত্মসম্ভ্রম পূর্ণমাত্রায় ঐ সন্তনীর মুখে প্রকট।

একটু অগ্রসর হইয়া দ্বার হইতে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন—যমুনা মায়ী,

ভোজন সব কুছ বন গেয়া না? উত্তর আসিল, জী হাঁ—আপলোগ মু হাত ধোকর আইয়ে না। সবহিঁ তৈয়ার।

আমায় বলিলেন—চলো, আমরা ঝরণা থেকে আসি। বলিয়া একখানা আংগোছা লইয়া চলিলেন, আমি পশ্চাতেই আছি।

ঝরণায় আমরা কতক্ষণ ছিলাম, হাতমুখ ধোয়া হইলে ফিরিয়া দেখিলাম গুহায় বেশ বড় বাতি জ্বলিতেছে; আর দ্বারদেশে একটি ডিজ লণ্ঠন বেশ উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করিতেছে। বাহকও পাকুড় তলায় খাইতে বসিয়াছে।

গুহার মধ্যে তিনখানি ঠাঁই হইয়াছে। দুইখানি সামনা সামনি আর একখানি একটু দূরে একধারে, বসিলে আমাদের দিকেই মুখ থাকিবে। আমাদের ভোজন-পাত্র চমৎকার; পাতাগুলি বড় বড় চক্রাকার। ছোট ছোট পাতা সরু কাঠি দিয়া গাঁথা,—যেমন দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে ব্যবহার আছে। পাতায় পাট করা দুইখানি করিয়া রুটি বা পরোটা, গোলাকার এবং বড়ো আর একদিকে সূক্ষ্ম বাঁশমতি চাউলের অন্ন সাজানো চূড়া করিয়া;—তাহাতে খানিক মাখন দেওয়া। যমুনা মায়ীর পাতায় একখানা রুটি, অন্নও আছে। আমাদের পাতার উপরে ঝিঞা ও আলু বেগুনের পৃথক ভাজি। ছোট বাটিতে মুগের ডাল, পুদিনার চাটনী;—শুকনা মুলার চমৎকার তরকারী, তাহাতে পেঁয়াজ রসুন দেওয়া;—একটু আচার কাঁচা আমের;—পাথরের বাটিতে দধি ও দুটি ক্ষীরের পেঁড়া শেষে। পেট বেশ ভরিয়া গেল।

ভোজন শেষে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মাংস পাওয়া যায় কিনা। অকপটেই সাধু বলিলেন—সপ্তাহে একদিন অথবা দুই দিন মৃগমাংস এবং বনমোরগ কখনও কখনও পাওয়া যায়; আমি খাই, যমুনা মায়ী নিরামিষাশি,— তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রাঁধিয়া খাওয়ান,—ঘৃণা করেন না। বলিলেন—উপরে ভীলেরা থাকে;—তাদেরি একটি জোয়ান, যমুনা মায়ীর পুত্র সে, আমাদের জন্য শাক-সবজি, মাংস প্রয়োজন মত যোগায়;—যেদিন যা পায় নিয়ে আসে। জল তুলে কাঠ কেটে সব কিছুই যোগাড় করিয়া দিয়া যায়। এইভাবে আমরা এখানে আছি।

কয়েক মাস আগে একজন অতিথি এসেছিলেন এদিকে। দুই দিন ছিলেন, আর আজ আপনাদের পাওয়া গেল। এখানে দু-চার দিন থাকিলে ক্ষতি কি? আসল কথাটা বলিলাম, অর্থাৎ আমার বাহকই প্রভু, সে যদি রাজি হয়তো মহা আনন্দেই থাকিব। সাধু ফিরঙ্গ-বাবা বলিলেন—আচ্ছা, তাহাকে রাজী করিবার ভার আমার। কি জানো, অতিথি আমাদের কত প্রিয়, বিশেষ মানুষ মানুষের কত প্রিয়, এই বিজন পার্বত্য জঙ্গলে থাকি তাই বুঝিতে পারি। মানুষের মধ্যে যে আমার ইষ্টরূপী মহাসত্ত্বার প্রকাশ তা এই অবস্থায় অনুভূত হয়।

এমন সরল প্রাণে—সত্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা কোথাও পূর্বে শুনি নাই। সাধুর সবটাই খোলা।

যতক্ষণ যমুনা মার সামনে আমরা কথা কহিতেছিলাম ভাষা হিন্দি, দুই একটা ইংরাজীও তাহার মধ্যে ছিল। ফিরঙ্গ-বাবা ইংরাজী বলেন তবে এক ধারায় বলিতে গেলে তাহার যেন একটু বাধো বাধো ঠেকে। দেখিলাম এখন তাঁহার জীবন ভারতের জল ও হাওয়ার সঙ্গে বেশ মিলিয়া তাহাকে ঠিক

ভারতেরই একজন করিয়াছে—বিশেষতঃ হিন্দি ভাষণে, কে বলিবে উনি উরোপীয়।

আহারের পর আমারা তিনজনেই বসিয়া খানিক কথাবার্তায় ছিলাম। সাধুর উদ্দেশ্য যমুনার সঙ্গে আমার একটু পরিচয়। প্রথমে যমুনা মায়ী আমাদের সঙ্গে বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন,— পরে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপ্ সাধুবাবাকে সাথ মিলি কৈসে? উত্তরে আমি বলিলাম, হমলোগ মাধ-মাহেশ্বরকো যাত্রী। এ রাস্তেমে কৈঁ জল মিলি নাহি, তিয়াস কে মারে জল শোচতে ইহাঁ আগেয়া, জলভি মিলি ফির সন্তু মহারাজ মিলি।

এবার যমুনা মা আমায় প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন ; তাহার ধাক্কায় আমি নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিলাম। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ;—আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি কিনা?—আমি উত্তরে বলিলাম—সংসার ত্যাগ আমি বিশ্বাস করি না ;—তবে হিমালয় ভ্রমণ আমার ভাল লাগে আর সাধুসঙ্গই আমার কাম্য। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বর্তমানে ঘুরিতেছি। তখন আবার প্রশ্ন ;—এখন বলো তোমার সাধন-পথ কি? কিভাবে সাধন করো? শুনিয়া আমি বলিলাম—একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন, ঠিক কি জানিতে চান। তাহাতে তিনি বলিলেন—ভগবান চাও তো? যদি চাও তাহলে তাঁকে লাভ করবার জন্য কি কর? একেবারে সোজা উলঙ্গ প্রশ্ন—এমন ভয়ানক কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তিলমাত্র কপটতা ইহার সঙ্গে চলিবে না ; এ বড় কঠিন পরীক্ষা অথচ যমুনা মায়ীর সঙ্গে সকল কিছুই খুলিয়া বলিবার মত এমন ঘনিষ্ঠতা নাই অথবা জন্মায় নাই ; তাই একটু চাতুরী করিয়া বলিলাম ;—এ সকল ব্যক্তিগত ভাব এবং সাধনার কথা, সব সময়ে সকলকে খুলিয়া বলা যায় না।

শুনিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলাম—আপনি হাসলেন যে? তিনি বলিলেন—তোমার সংকোচ দেখে ; আত্মগোপনের চেষ্টা দেখেই তো হাসলাম। এটিও নগ্ন সরলতা।

বুঝিলাম, ইনি সাধারণ নন। তা ছাড়া আরও স্পষ্টই বোধ হইল, আমি এঁর কাছে ছেলেমানুষ। অথচ এইটি অনুভব করিতে আমার মনে কোনো প্রকার গ্লানি বা অপমান বোধ হইল না। তিনি স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিতই রহিলেন, মধ্যে আমি যেন ছোট হইয়া গেলাম ; কথা বাহির হইল না।

এইবার সাধু আমায় এই অবস্থা হইতে বাঁচাইলেন,—তিনি যমুনা মায়ীকে বলিলেন—এখন এঁকে ছেড়ে দাও, আমরা এবার ওখানে যাই ; তুমি তো নিজের জায়গায় রয়েচ। যমুনা মায়ী বলিলেন, বেশ তো. এরপর দেখা হবে, কথা হতে পারবে। বলিয়া জোড়হাতে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। আমিও নমস্কারান্তে চলিয়া আসিলাম।

ঝক্‌ঝকে মাজা একটি বড় লোটায় জল লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং বাঁ হাতে লণ্ঠনটি লইয়া আমায় বলিলেন. এসো। এবার আমরা ক্ষুদ্রদ্বার সেই প্রথম গুহাতেই এসে গেলাম। এখানে সাধুর আসন তো আগেই পাতা ছিল তার পাশেই আমারও শয্যা রচিত হয়েছিল। বাহক গুহাদ্বারে বসিয়া ঢুলিতেছিল। তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা উভয়েই আসনে বসিলাম। এখানে বাতিদানে বাতি জ্বালা হইল।

গুহাতলে তিন চার জন আরও শুইতে পারে এততা স্থান আছে।

ভিতরের ছাদ সাড়ে চার ফুটের বেশী নয়। সাধু বাতি জ্বালিয়া ছিলেন, লণ্ঠনটা গুহার বাহিরেই রহিল। গুহার মধ্যে আলোকে ভরিয়া গিয়াছে। কোণের দিকে একটি ছোট্ট টুলের উপর একটি ছোট টাইমপিস, তাহাতে দেখা গেল এখনও নয়টা বাজে নাই। শয়নের দেরী আছে—তা ছাড়া আজ আমাদের পরিচয়ের দিন, কথা কখন শেষ হইবে কে জানে। ঘড়ি দেখিয়া সাধু বলিলেন, এই ঘড়ি আমার এক বন্ধুর উপহার। তিনি দেখতে এসেছিলেন এখানে আমি কি ভাবে আছি। ইনি মাঝে মাঝে আসেন।

সাধুর বিছানার আশেপাশে এক গাদা খাতা-পত্র, পাশেই অনেকগুলি গুহা। ঐ খানেই ঘড়ির কাছে একটি আধারে পীতবর্ণ পেন্সিল, কালো এবং খয়েরী রং-এর দুটি ফাউন্টেন পেন। কাগজপত্রও কিছু কম নাই। এই সব দেখাইয়া সাধু নিজেই বলিলেন, চিঠিপত্র লিখতে হয়। আবার কখনও কখনও পাওয়াও যায়। জার্মানীতে সহপাঠি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গেই যা কিছু পত্রাদি ব্যবহার চলে। আমার যা কিছু এখানকার অভিজ্ঞতা, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার ঝোঁকটা তাঁরই বেশী, তাই যা কিছু লেখা সব তাঁর কাছেই পাঠাই। তিনি গত বৎসর এখানে এসেছিলেন,—কিছুদিন ছিলেনও, দেখে শুনে গেলেন। এখন তো যুদ্ধ চলছে তাঁর আর আসবার যো নেই।

সাধু যথার্থ মিতাচারী মানুষ।

যেটুকু আপনা থেকে বলবার তা প্রথম পরিচয় হিসাবে বলা হলে পর তিনি বললেন—আচ্ছা, আর আমাদের আলো দরকার কি, নিবিয়ে দি? আমার সম্মতি লইয়া তখনই বাতিটা নিভাইয়া দিলেন। আমি একটু যুত করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—এখন বলো—

আমি বলিলাম—আপনিই বলবেন, আমি খুব ভাল শ্রোতা। সাধু বলিলেন—আচ্ছা, যমুনা মায়ীর কাছে এতটা ঘাবড়ে গেলেন কেন?

বলিলাম—এখনও অপরিচিতির বাধা কাটাতে পারিনি। বিশেষতঃ একজন অতটা উচ্চাবস্থার জ্ঞানী নারী, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমান তো জানা ছিল না। তারপর বলিয়া বসিলাম,—

এখন আমার একটা প্রশ্ন জেগেছে, যদি অনুমতি দেন তো বলতে পারি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, বলো না বিলম্ব কেন?

আপনার সঙ্গে যমুনামায়ীর সম্বন্ধটা কি, জানতে কৌতূহল হয়।

সাধু বাবা বলিলেন—বুঝেচি,—এখন দেখচি তোমার সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, বেশ বেশ, সুখী হলাম। এখন বলো তো—তোমার কি মনে হয়?

আপনি সন্ন্যাসী বা সাধক যাই হোন, নারী সঙ্গে নিয়ে এই হিমালয়ে বাস করচেন, আমাদের চক্ষে এটি ভাল মনে হয় না, অবৈধ সম্পর্কের ভয় আসে।

কথাটা বলিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমার মনে এত গোলমাল। এক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গ আমার উত্থাপন না করাই উচিত ছিল। এতটা কৌতূহল যা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। সত্যই,—এখন সামলাইব কি করিয়া? একটা গ্লানি আর বিষণ্নতা আমার অন্তরে,—বিষম মর্মপীড়া অনুভব করিলাম।

গুহা অন্ধকার,—তবুও সাধুর যেন হাসি ;—দেখা গেল না কিন্তু বুঝিলাম। তিনি বলিলেন,—তোমাদের দেশে এ সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা আছে, নয় ? আমার বারো বৎসরের অভিজ্ঞতা। কেন, নারী নিয়ে ঈশ্বর উপাসনার বিধি নেই কি ধর্মের রাজ্যে ?

আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসের পর নারী সঙ্গে রাখা ভ্রষ্টাচার,—পাপ।

আমার তান্ত্রিক ভৈরব হতে বাধা কোথা ?—যদি বলি আমি ভৈরব, যমুনা আমার ভৈরবী।

আপনার রক্তবস্ত্র কোথা,—ত্রিশূল কোথা, রক্ত সিঁদুরের ফোঁটা ঐ সব চিহ্ন কোথা ? মুখে বললেই তো হবে না ;—তান্ত্রিক মূর্তিই আলাদা, যদিও আপনাদের তান্ত্রিক সাজলে সুন্দর মানায় সত্য,—কিন্তু আপনার সরলতা, সহজ সত্য ভাষণ, গোড়া থেকে এ পর্যন্ত যে ব্যবহারটুকু পেয়েছি, আপনার ভারত আগমনের যে ইতিহাস শুনেছি, মহর্ষি রমণের কৃপাদৃষ্টিলাভ পর্যন্ত,—তার সঙ্গে তন্ত্রধর্ম সাধন বা তান্ত্রিকতার কোন সম্বন্ধ নেই, থাকতে পারে না।

বেশ বলেচ—ঠিক বলেচ—এখন শোনো আসল কথাটা বলি—

রক্তে তেজ যতক্ষণ আছে,—পুরুষের কথাই বলছি ;—পুরো যৌবন-কালটুকুর মধ্যে নারী-সঙ্গ-সংস্কার প্রবল থাকবেই। তার সঙ্গে ছিটে ফোঁটা প্রেমের সম্বন্ধ হয়তো থাকতে পারে, নাও পারে ; বিশেষতঃ আমাদের উরোপীয় শরীরে। এখন আমার নিজের কথা এই যে, উরোপ থেকে যখন ভারতে আসি, তখন আমার পরিণত যৌবন, বয়স প্রায় ছাব্বিশ ; নারীসঙ্গ তার মধ্যে অনেক হয়ে গিয়েছে, যদিও আমি বিবাহ করিনি। আমাদের দেশে ঐ রকম হয়. স্বাভাবিক স্বাধীন সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে। সুতরাং ওর মধ্যে যেটুকু সুখের তা আমার ভাল মতেই জানা হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া আমি যখন সংসার, ভারতীয় ভাষায় গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করবো না, তখন আর নারী-রূপের মোহ বা আকর্ষণ আমার লোভের জিনিস হতেই পারে না। তা ছাড়া, আমার জীবনের আদর্শ, ইষ্টের প্রভাবেই যে স্তরে পেঁাছেচে, আমার লম্পট হবার সাধ্য আর নেই,—আশা করি এটা বিশ্বাস করতে তোমার বাধা নেই। সত্য স্বীকারোক্তির এমনই প্রভাব যে, আর কোনো কথা চলে না। তিনি চুপ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—

যৌবনে পাঠ্যবস্থায়, সহজ প্রেরণার বশেই আমার ওসব অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। যখন থেকে সত্যতত্ত্ব লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তারপর ভারতীয় সিদ্ধ যোগী মহাত্মাদের ভাগবৎ অনুভূতি কি প্রকারের জানতে, ব্যাকুল তৃষ্ণায় ছুটে এসেছিলাম, ভারতের পবিত্র মাটিতে পা দিয়েছিলাম, তখন থেকেই আশ্চর্য ব্যাপার,—ঐ ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা তিলমাত্র ক্ষণেকের জন্যেও আমার মধ্যে মাথা তোলেনি। তারপর কাশীতে অধ্যয়ন, মঠের সেই কঠিন নিয়ম, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে গঙ্গাস্নানাদি, দিনে পূর্ণ একবার, রাত্রে অর্ধাহার,—স্বামীজিদের সংযত জীবন ; এই আচার-নিষ্ঠা আমার মধ্যে সংযম-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণই আত্মগত করে দিয়েছিল। কিন্তু এখনও সিদ্ধি সম্বন্ধে আমি জোর করে বলতে পাররো না যে আমি সংযমে সিদ্ধ হয়েছি। কারণ ওটি গর্ব করবার বিষয় নয়; ঐ গর্বটাও অসংযমের পরিচয়—তাইতে আমার ভয় আছে।

এর পর আর কথা চলেনা—অকপট এই স্বীকারোক্তিই আমার মনের

সন্দেহ মলিনতা নিঃশেষে দূর করে দিয়েছিল। তারপর ইন্দ্রিয় সংযমে অধিকারের কথা কোনো অবস্থায়ই গর্বের বস্তু নয় এ কথা ঠাকুর যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন এমন আর কে দিতে পারে? সত্য সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য,—এই সব ভাবছিলাম।

সাধু এবার নিজে থেকেই বলতে আরম্ভ করলেন ;—এখন যমুনা মায়ীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথাটা সোজাসুজিই বলতে হবে, কেমন? সেটা ছয় সাত বৎসর আগেকার কথা। দীর্ঘকাল একাসনে কাটাবার পর হিমালয়ের তীর্থগুলি পর্যটন করবার সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছিলাম। সমতল ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমের প্রধান কোনো তীর্থই বাকী ছিল না,—হিমালয় ছাড়া। তাই এবার হিমালয়ের উদ্দেশ্যেই চলেছিলাম।

হরিদ্বার থেকেই আরম্ভ করে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত এসে প্রথমে যমুনোত্তরী যাবার জন্য গঙ্গার তীরে তীরে টীরি রাজ্য, তারপর সেখান দিয়ে ধরাসু গ্রামে এসে গেলাম। দেবপ্রয়াগ ছাড়বার পর এমন সৌন্দর্য কোনো স্থানে দেখিনি। গঙ্গার উপরেই ধরাসু। এই ধরাসুই আমায় আটকে ফেললে। ঐ গ্রামের এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ বেণীমাধব শুক্ল। ভদ্রলোক গঙ্গাতীর থেকে আমায় ভিক্ষার্থে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারেই প্রতিশ্রুতি নিলেন, যে কয়দিন ইচ্ছা তাঁর ঘরেই যেন ভিক্ষা করি, অন্যত্র না যাই। সেখানেই কয়েক দিন ছিলাম।

এই যমুনা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বাল-বিধবা। তখন তার বয়স বত্রিশের খুব বেশী হবে না, আমারই সমবয়সী। ও অঞ্চলে পর্দা প্রথা বোধ হয় ছিল না। প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতিই প্রবল; তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য বিলাসব্যসন অথবা সামাজিকতা ওদিকে তখনও প্রবেশ করেনি। নিঃসংকোচেই যমুনা আমার কাছে আসতো, বসতো ; মনের কথা প্রকাশ করতো। আমার সেবার ভার তার উপরেই ছিল। ক্রমেই পরিচয় পাওয়া গেল যে, যমুনা তার পিতার কাছে গোড়া থেকেই সংস্কৃত পড়েছে, কাব্য পুরাণ, বিশেষ দর্শন শাস্ত্রের সাংখ্য ও বেদান্ত ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছে। বড় গম্ভীর প্রকৃতি তার। প্রথমে কিছু জানা যায় নি—ক্রমে ক্রমে যখন তার অধিকারের পরিচয় পেলাম, ভারতের নারী যে কতটা মহান ও সংযত চরিত্র, তখনই আমার ধারণা হলো। তিলমাত্র বিদ্যার অভিমান নেই। ইতিমধ্যে তার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে তারও আভাস পাওয়া গেল। তার মনের কথা এই যে, অর্ধেক জীবন তো সংসারে কেটে গেল, বাকী যেটুকু আছে তা আর এইভাবে নষ্ট হতে দেবো না। প্রসঙ্গক্রমে সে আমায় সব কথাই বলেছিল। তার ইচ্ছা, সে আর এভাবে সংসারে আবদ্ধ থাকবে না,—স্বাধীন পুরুষেরা যেভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করে অন্তরে তার সেই প্রবৃত্তিই তখন প্রবলভাবে কাজ করছে ; বিশেষতঃ তীর্থপ্রধান ভারতের সকল তীর্থই ও ঘুরতে চায়, দেখতে চায়, কিছুতেই আর ঘরের মধ্যে থাকবে না। আসলে সে নারী, তাই একলা বার হতে সাহস হয় না, সহায় চাই তার। শেষে আমায় ধরলে, নিঃসংকোচেই বললে ; আমাকে শিষ্যা করে নিয়ে চলুন, আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানেই যাবো, সেবা করবো।

আমার পক্ষে এটা গভীর চিন্তার বিষয় তো। সহজে হল না দেখে যমুনা তার পিতাকে নিয়ে এলো আমার কাছে। তিনি তো জানতেন তাঁর

সন্তানের কথা। শঙ্করজী বললেন, ওকে দীক্ষা দিন এবং সঙ্গে নিয়ে যান। তীর্থ ভ্রমণের জন্য ও উন্মাদিনীর পর্যায়ে এসে পড়েছে, আপনাকে আশ্রয় করেই ও জীবন সার্থক করতে চায়, এখন আর কোন বাধাই চলবে না ও আর বালিকা নয় তো। নিজ ধর্ম রক্ষা করবার শক্তি ওর আছে। আমার বিশ্বাস, ওর নিজ ধর্মবোধই ওকে রক্ষা করবে।

পিতা ওর শুধু স্নেহ-প্রবণ নন যথার্থই দূরদর্শী। তিনি বলে দিলেন, মন্ত্র ওর কাছেই আছে,—ওর দীক্ষা আমিই দিয়েছিলাম, এখন সেটা জেনে নিয়ে আর একবার ওর কানে শুনিয়ে দেবেন, যথাকালে তার কাজ ঠিকই হবে।

যা ভাবিনি, কখনো কল্পনাও করিনি তাই হয়ে গেল। যমুনার ঐকান্তিক আগ্রহে তার সকল কর্মই মনোমত হলে পর ;—পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী, ঘনিষ্ঠ নিকটতম প্রতিবেশী সবার কাছে বিদায় নিয়ে মহা আনন্দে যমুনা, পুরুষ বেশে পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে প্রথমেই যমুনোত্তরী ঘুরতে বেরুল। বললে—পথে পুরুষ বেশই ভালো। পথে তার সাহস দেখে আমি অবাক। তার উৎসাহ আর শ্রমশীলতা এবং তিতিক্ষা দেখে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, কোন বলিষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা কম নয় ওর শক্তি। পথে ও বিশ্রাম পর্যন্ত চায়নি। বোধ হয় সাত দিনেই আমরা তীর্থ শেষ করে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে মহা আনন্দে কয়েক দিন পিত্রালয়ে বাস করলে, তারপর আমরা গঙ্গোত্তরী যাত্রা করি। ওর প্রাণ এখন তীর্থই চাইছিল। দেখলাম, ওর পিতা খুবই আনন্দিত। এ যাত্রায় ওর পিতা কিছু ধন ওর কাছেই দিয়েছিলেন প্রয়োজন মত খরচ করতে। টাকার পরিমাণ আমি জানতাম না।

ওর মূর্তিই বদলে গিয়েছিল। মাথায় পাগড়ি দিয়ে ও পুরুষবেশে বেরিয়েছিল নিঃসঙ্কোচে ; হাতে পাহাড়ি লাঠি, ঠিক যেন এক কুমার ব্রহ্মচারী। ওর চড়াই উৎরাই দেখলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে—এমন হাল্কা শরীর ছিল ওর। এবারে গোমুখ পর্যন্ত গেলাম। পরে গঙ্গোত্তরী থেকে উত্তর কাশী হয়ে আমরা ত্রিযুগী নারায়ণেই ছিলাম কয়েকদিন—তারপর গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম করে আমরা মধ্যে নলচটি হয়ে কালিকা তীর্থে যাত্রা করি এবং সেখান থেকেই মধ্য মহেশ্বব যাই। পথে এ গুহা ওরই আবিষ্কার। ঐ সময়েই যমুনা এই গুহাতে একরাত্র বিশ্রাম করেছিল। ফিরে এসে ওঁর সংকল্প হলো এইখানেই আসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাছে ঝরণা দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল। আশ্রম করবার পরও আমরা দুবার বেরিয়েছি, —মধ্য ভারতে একবার আর দক্ষিণ ভারতে একবার কয়েকমাস কাটিয়ে এসেছি আমরা।

এইখানে স্থায়ী হবার পর ওর শিক্ষাও হয়েছে অনেক। সাধনের যা কিছু আমার অধিকার সবেতেই ওর সিদ্ধি হয়েছে। মহর্ষি রমণের কৃপাও ও পেয়েছে,—শেষবার যখন আমরা দক্ষিণের তীর্থ দর্শনে যাই,—অরুণাচলে আমরা কয়েকদিন ছিলাম। তখন থেকেই ওর সাধনে সিদ্ধি এসেছে। তারপর আর আমরা কোথাও যাই নি।

বুঝলাম সহজেই এখন ওর উচ্চ অবস্থা।

মেয়ে মানুষ, স্নেহপ্রবণ মন, এখানে এক ভীলের ছেলে ওকে মা বলে, ও তাকে ঠিক নিজ সন্তানের মতই স্নেহ করে। উপরে কয়েকজন ভীল আছে

এ পথে, তারা সবাই ওকে মায়ের মত দেখে, বেশ একটা স্নেহের সম্পর্কই গড়ে উঠেছে যমুনা মায়ীকে নিয়ে।

এই পর্যন্ত যমুনা মায়ের কথা। এরপর আর কথা চলে না। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চুপচাপ ছিলাম। তিনি বলিলেন—আজ এই পর্যন্ত কেমন? এবার শুয়ে পড়া যাক।

চিন্তা ছিল, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ। বিদেশীয় একজন সাধুর মধ্যে এমন সরলতা দেখিনি।

প্রভাতে উঠেই আমি প্রথমে বাহকের গুহায় গিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়েই বললাম—আজও এখানে হয়তো আমাদের থাকতে হবে। সে তৎক্ষণাৎ বললে, হাঁ জী; সাধু মহারাজ ভি বোলা ইহাঁ দু এক রোজ ও'র ঠা'রনাই পড়ে গা। মায়ী জী ভি কাল রাতকো বোলিথি।

ক্যা বোলা?—জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল, উনো নে ভি বোলা যে,—অব ইহাঁসে জলদি যানেকা কোসিস মত করো; দু-এক রোজ ওর রহ যাবেগা তো ক্যা হৈ। হামনে বোলা ঐসাহি হোয়েগা। তখন আমি বলিলাম, দু এক রোজ ঠারনেসে তুমহারা ক্যা নুকসান? শুনিয়া সে বলিল নুক্সান হামারা নহি, আপিকো—হামারা ক্যা। অর্থাৎ দৈনিক চার আনা করিয়া খোরাকি দিতে হবে। আর তারও ঘরে ফিরতে বিলম্ব হবে।

ভোরেই উঠিয়া ছিলাম। সাধুও ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়াছিলেন। আসনের কাজ শেষ হইলে তখন প্রভাতে আমরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকটাই দেখিলাম। চারিদিকেই দূরে দূরে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলি;—তাহার উপর রৌদ্র ঝলমল করিতেছে, যেন স্তব্ধ স্রোত। তার মধ্যে সূর্যের সোনালি কিরণ-দীপ্ত একটি শৃঙ্গ দেখাইয়া সাধু বলিলেন—এটি মধ্যমহেশ্বর শৃঙ্গ।

এখানে আমরা চা পাই নাই, আমাদের এক বাটি দুধ খাওয়াই হইল, আর কিছু ভিজা ছোলা, তাও ভালো। তারপর পাকুড় তলায় বাঁধানো জায়গাটায় বসিয়াছিলাম। সাধু বলিলেন,—

ভাবছো কি, বন্ধু।

আদর্শ জীবন আপনাদের;—ঠিক তন্ত্রমতে সিদ্ধ ভৈরব ও ভৈরবীর মতই আছেন, দেখে আনন্দ হয়—তাই ভাবছি।

স্বামীজী বলিলেন—এই বা কি কথা, সদ্ভাবের উপর নরনারীর একত্র জীবন যাপন করতে গেলেই তন্ত্রমতকে আদর্শ করতে হবে!

ওটা আমিই বলছিলাম এ বিষয়ে তন্ত্রধর্ম উদার বোলে সাধু বলিলেন—তন্ত্রধর্মের যে ভাবের প্রতিপত্তি এখানে হয়েছিল অবশ্য তাও উদারতার জন্যই বুঝতে হবে;—তাইতেই সর্বভারতীয় ধর্ম হওয়াই উচিত ছিল, তা হতে পারলে না কেন? অথচ তন্ত্রধর্মের মত মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুগত আর ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ, অভিচার এসেই এবং নানা প্রকারে ঐ ধর্মের মধ্যে ব্যভিচার ঢুকেই তন্ত্রকে একেবারে ভেঙ্গে দিলে। তারপর বৈষ্ণব ধর্ম এলো;—অবতার তথা মহাপুরুষদের আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ঐ ভাবের উদারতা নিয়ে এলো,—তারপর দুশো বৎসরের মধ্যে বিকৃত হয়ে কতো রকম ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিস্তেজ হয়ে গেল। বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ধর্মের তীর্থগুলি এখনও রয়েচে—ঘুরে এলেই বুঝা যাবে ধর্মের কি অবস্থা হয়েছে। ইংরাজের আমলে খৃস্ট ধর্মও যযাতে কম চেষ্টা করেনি, তখন

ব্রাহ্ম ধর্ম জেগে উঠলো—কৃশ্চান ধর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখলে ভারতকে ঐ ভাবে। এখন রামকৃষ্ণ দেবের আমলই চলছে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই তখন সাধু বলিলেন—ওগো নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ;—এত দিনের প্রাচীন ভারতের ধর্ম-সমাজে পথ একটা না একটা অবলম্বন হিসাবে আছেই। যে ভাবের জীবন এবং আশ্রয় তুমি চাওনা কেন, তাই আছে হিন্দু অধিকারে। আসল কথাটা এই যে—আদিম, ধর্মহীন সহজ সম্বন্ধ নিয়ে এখানে জীবন যাপন চলবেই না,—একটা ধর্মের আওতায় তাকে আসতেই হবে। এইটিই আসলে ধর্মের দিক থেকে ভারত-সভ্যতার ইতিহাস।

ধর্মের আশ্রয় না থাকলে মানুষ তো পশু হয়েই রয়ে গেল। আসলে মানুষ তো যথার্থই পশু নয় ;—আমি বলিলাম।

একটু খুলে বলো বন্ধু! না হলে সহজে মর্মকথাটা মাথায় আসছে না।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ, সামান্য মেতৎ পশুভিঃ নরানাম্।

আপনি তো জানেন—ধর্মোহি তেষাং দ্রবিণং বিশেষো, ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা।

শুনিয়া সন্তজী বলিলেন, চমৎকার এই মানব-ধর্ম সূত্রটি ; কিন্তু আমাদের সন্ন্যাস জীবনে তো ওর ভিতর যেতে হবেনা। এটা হলো মানব সমাজের আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম ; আমাদের তো সমাজের বাইরে স্থান,—আমরা তো বাইরে পড়ে আছি। নরনারী তো সৃষ্টির প্রতীক আর সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টা ও দ্রষ্টের সম্বন্ধ যে আমাদের। অবশিষ্ট জীবন প্রারব্ধক্ষয় অর্থাৎ বিবিধ কর্মক্ষয়, তারপর যথাকালে আত্মস্থ হওয়া।—সকালে আজ এই পর্যন্ত কথা।

যমুনা মা গিন্নি ভালো, আমার বাহকটিকে কাজে লাগিয়েছেন ; সে আমাদের দুধ আর দুটি ছোলা দিয়েছিল। খাওয়া হলে পাত্র নিয়ে গেল। খানিক পরে সে ঝরণার দিকে গেল বেশ কতকগুলি বাসন-কোষণ নিয়ে। আমাদের আড্ডা চললো এইখানে। দেখতে দেখতে যমুনামায়ীর ভীল পুত্রটি এসে উপস্থিত ;—সাধুকে প্রণাম করলে। কিছু শাক সবজী আর একটা বন-মোরগ এনেছে। এত বড় সাইজের যে মোরগ হয় আগে দেখিনি।

মাথায় চূড়া, দীর্ঘ বাহু, বলবান, ভীল যুবার নাম বাঞ্জু। তার মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ, নিখুঁত বিগ্রহ। এমন সুন্দর মূর্তি আগে দেখিনি। খুব লম্বা নয় ;—কিন্তু শরীরের আড়া এমনই, ইয়া চওড়া বুকের পাটা আর কালো রং যে কত সুন্দর হয় বাঞ্জুকে না দেখলে ধারণা হবে না। তার সঙ্গেই দেখলাম একটি যুবতী, বেশ ফরসা মেয়ে ;—সে এগিয়ে এসে সাধুকে প্রণাম করল। তারপর যমুনা মায়ের গুহার দিকে চলে গেল। এই বাঞ্জু, যমুনা মায়ের ছেলে,—এই নির্জন হিমালয় গুহাবাসী সন্ন্যাসিনীর কতো বড় সহায় তা এখানকার সবাই জানে। আমার দেখেই আনন্দ, বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে!

এই ভীলকুমার বাঞ্জুর রূপে আমায় আকৃষ্ট দেখিয়া সাধু রহস্যজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—যমুনার সংসারের কথা আরও একটু আছে। উনি গত বৎসর বাঞ্জুর বিবাহ দিয়েছেন,—সঙ্গে ঐ যে মেয়েটি দেখলে, ওরই বৌ। মেয়েটিও এক ভীল সর্দারের মেয়ে, ওর নাম কালকা। ভীলরা কালীভক্ত।

যাহা দেখিলাম, তাহা কল্পনাও করি নাই। ভীল হইলেও কালকা মেয়েটি মোটেই কষ্টি পাথরের কৃষ্টি নয়,—গৌরী,—কপালে সিঁদুরের ফোঁটা

তাহাকে যেন দেবী মূর্তিতেই চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। পরনে ঘাগরা কাঁচলী ওড়না। এমনই চমৎকার মানাইয়াছে ;—ঠিক যেন গাড়োয়ালী ক্ষত্রিয়াণী। সাধু বলিলেন,—

এদের নিয়ে যমুনা মায়ীর বেশ সংসার খেলা চলছে। তাঁর জীবনের অতৃপ্ত বাসনা, সংসার সৃষ্টিতে বাধা পেয়েছিল যে প্রবৃত্তি, এদের ভিতর দিয়েই তা সার্থক হচ্ছে। মহান এই সৃষ্টির ধারার সঙ্গে একেবারেই কাঁটায় কাঁটায় মিল। ঠিক প্রকৃতির হাতের যন্ত্র হয়েই কাজ করছে যমুনা।

চমৎকার আনন্দময় পরিবেশ।

গত কাল দ্বিপ্রহরে যেমন ছাতু মাখন চিনি এক বাটি দুধের সঙ্গে ভোগের আয়োজন, আজও তাহাই হইল। আজ বাঞ্জু কলা আনিয়াছিল, শেষে আমরা উহাই খাইলাম। বাহিরে ঠাণ্ডা বাতাস আরম্ভ হইয়াছে, আমরা গুহার ভিতর যুত করিয়া বসিলাম, নিজ নিজ আসনে।

কথার কথা একটা, মনে উঠিল তাই বলিয়া ফেলিলাম ফিরঙ্গ-বাবাকে।

সাঁওতাল বা ভীল, এদের মধ্যে এমন ফরসা গায়ের রং আমি দেখিনি,— কালো বংশে এত ফরসা রং হঠাৎ এলো কি করে?

তিনি বলিলেন—কালোর দলে একটি গৌরবর্ণ এসে গেলো কি করে? এটা প্রাকৃত সৃষ্টির একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য, আমরা কি প্রকৃতির সকল রহস্যই ভেদ করতে পেরেছি, তুমি কি মনে কর? তাঁর কথায় বুঝিলাম তিনি এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিবেন না, তাই আমিও সহজ ভাবে বলিলাম—

আপনি যা বুঝেছেন, আমিও সাধারণভাবে তাই বুঝেছি। কাজেই এখানে আপনি যা বলবেন—হয়তো আমিও ঠিক তাই বলতে পারবো—কিন্তু তাছাড়াও নিশ্চিত কারণরূপ যে একটা প্রকৃতির গুহ্য রহস্য আছে কেবল সেইটিই বলতে পারবো না। সৃষ্টিতত্ত্বের কতটুকুই বা মানুষের আয়ত্ত? জীব-সৃষ্টির যে সহজ সনাতন পদ্ধতি—তা সকল জীবের একই, এটা স্বভাবসিদ্ধ, কখনও কাকেও শেখবার দরকার হয় না, তারই ফলাফল আমরা কতটা জানি।

সাধু বলিলেন,—এসব বায়োলজীর ব্যাপার। বিজ্ঞানের বড় বিভাগ, সারা জীবন দিয়ে সাধনা করবার বিষয়। তবে শুনেছি হিন্দু শাস্ত্রে বাৎসায়ণ কামসূত্রে এর মৌলিক বিশ্লেষণ আছে,—ওসব আমাদের বিষয় নয় বোলেই আমি ওদিকে যাই নি। শুনিয়া আমি বলিলাম—

তন্ত্রধর্মের বামাচারের মধ্যে দেখেছি, ওর অনেক রকম বিচার-বিশ্লেষণ, নারী গ্রহণের নিয়ম, হিসাব অনেক কিছুই আছে।

সাধু একটু উপেক্ষার ভাবেই বলিলেন,—

অনেক কিছুই আছে তো তন্ত্রধর্মের বিরাট পরিধির মধ্যে ; কিন্তু ও-সব নিয়ে কি হবে? আমরা আমাদের সহজ জ্ঞানে নারী নিয়ে ঘর করি, অথচ নারী-প্রকৃতি বুঝতে পারি না। তবে একটা ব্যাপার বুঝা যায় যে, প্রকৃতি রহস্যময়ী,—নারীকে পুরুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আড়ালেই রেখে দিয়েছেন। নারী কখনও পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবে না। কেবল জীব সৃষ্টির বেলা আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় একই গন্তব্যের পথিক হিসাবে যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকু। আসলে পুরুষের কাছে রহস্য হয়েই থাকুক নারীর সব কিছু।

শুনিয়া আমি বলিলাম—নারী-প্রকৃতির গভীরতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন

এমন লোকও দেখেছি। অবশ্য তিনি জ্ঞান মার্গেরই মানুষ, এটা সত্য। শুনিয়া সাধু বাবা বলিলেন—তাঁর অদৃষ্টে সময়ের অনেকটাই অপব্যবহার আর শেষে অক্ষমতার জন্যে অনুতাপ আছেই। তবে এটা ঠিক, পুরুষকে সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতেই নারীর যা কিছু রূপ গুণ সব। তবে আমার একটি আবিষ্কার আছে—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলচি ;—হেথা বান্ধবী হিসাবে পুরুষের পক্ষে নারীর মত কেউ নেই ;—সর্বোৎকৃষ্ট বান্ধবী এক নারীই হতে পারে। এর ফল কখনও খারাপ হয় না। তবে এখানে ইন্দ্রিয়জ কোনো সম্বন্ধ থাকলে হবে না ও সম্বন্ধ থাকলেই বিকৃত হবে। এখানে পবিত্র ও মুক্ত ভাবের কথাই বলছি।

আমার মুখ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে গেল ;—যেমন আপনাদের এখানকার সম্বন্ধ।

তা বললে মিথ্যা বলা হবে না ; বললেন সাধু—এখন এর মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে একটু পরিচয় দিতে হবে। আগেই বলেছিলাম, এতদিন ব্যবহার করেও নারী-প্রকৃতি আমি বুঝতেই পারিনি। এখন তার আগে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাই বলে নেবো। কারণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার ছাড়া নারী-প্রকৃতির মধ্যে এমনই একটি আশ্চর্য গুণ দেখেচি তাকে নারীধর্মও বলা যায়। সেটি হল তার সেবাধর্ম, এটি তাদের প্রকৃতিতে প্রবাহের মতই স্রোতস্বতী ; তারই চরিতার্থতায় তাদের জীবন পূর্ণ হয়। ও সুযোগ না পেলে যেন নারী-জীবনটাই বিফল হলো, এটি তাদের মনের কথা। দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছাকাছি এসে পড়লে দুজনেই দুজনের অন্তরের পরিচয় পেয়ে যায় ; আরও এটি লক্ষ্য করেচি,—আপন বোলে একজনের সেবায় আত্মোৎসর্গ না করতে পারলে তাদের জীবন যেন বৃথা হয়ে পড়ে। কাজেই, একটি প্রীতির অবলম্বন তার চাই-ই। এখানেই পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ একজন সহজেই একটা গভীর বিষয় নিয়ে ডুবতে পারে—তার কাছে সেইটাই সবার উপর,—কিন্তু নারীর কথাই আলাদা। একটুক্ষণ স্থির হইয়া আবার বলিতেছেন,—

আশ্চর্য এই ভারতের নারী-প্রকৃতি। যমুনার সঙ্গে আজ আমার ছয় সাত বৎসর হল সম্বন্ধ চলেছে। সত্য বলতে কি, প্রথমে আমার খুবই ভয় হয়েছিল, হয়তো আমার পতনই হবে যমুনার সঙ্গে—আমার সংযম যথার্থ সংযম কিনা এইটিই হলো পরীক্ষার বিষয়। ঐ যমুনাই আমায় বাঁচিয়েছে পতন থেকে। কারণ বয়স আমাদের একই প্রায়, তার উপর নারী থেকে তফাতে থাকার ফলে আমার অধিকার বুঝতেই পারিনি। যমুনাই নিজের দিক থেকে তার নিজ সহজ সংযমের প্রভাবেই আমায় ঐ ব্যাপারে সচেতন করে দিলে। সেও যে বেঁচে গেল তাও একটা কমপ্লেক্সের জন্যে। সেই কথাই বলবার বিষয়, এখন তোমায় বলতে পারি।

তিনি বলছেন, আমি নীরব শ্রোতা,—শুনেই যাচ্চি তাঁদের সম্পর্কের কথা।

তাকে সঙ্গে নিয়ে কতো তীর্থস্থানে ঘুরেছি,—এইজন্যে আমার প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এসব বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উরোপীয় এবং খৃস্টান জাতি, বোধ হয় এই ধারণায় আমার উপর, যেমন হিন্দু মেয়েদের

মুসলমানের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা থাকে, ঠিক সেই জাতীয় একটা ঘৃণাও আছে ; তার পরিচয়ও পাই মধ্যে মধ্যে। এই অদ্ভুত ভাব দেখে আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মেয়েদের সঙ্গে ভারতের মেয়েদের তুলনাই হয়না, সত্যই এঁরা বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি।

বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত ; আমার মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল, ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো। এমন একটা কমপ্লেক্স, যমুনা মার মত নারীর থাকতে পারে এটা ভাবতেই পারা যায় না।

আর আমার বিশ্বাস এই কমপ্লেক্সের জন্যই ও নিজেও বেঁচে গেল, সহজ পুরুষের আকর্ষণ থেকে। অথচ জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের উভয়েরই মিলনে কোন বাধাই ছিলনা। যদি ওর মধ্যে ঐ ঘৃণাটি না থাকতো, তাহলে আমার যে কি হতো ঈশ্বরই জানেন। আমার ধারণা এই জন্যই আমাদের এই যোগাযোগ বিধাতার অভিপ্রেত। আমি ভেবে দেখেচি,—তখন অন্তরে অন্তরে আমি মনোমত একটি সৎ সঙ্গীই চেয়েছিলাম। কিন্তু নারী-সঙ্গীর কল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু ঘটলো অচিন্তিতপূর্ব ব্যাপারে। তবে আমি অনেক গভীর এবং বিশদভাবে ভেবে দেখেছি ওঁর ঐ বিজাতীয় ঘৃণার উপযুক্ত কারণও হয়তো আছে—যা আমি অস্বীকার করতেই পারবো না।

আমি বলিলাম,—সেকথা পরে হবে, এখন একটি কথা বলবেন আমায় ?

কি ? আচ্ছা, ঐ যে ঘৃণার কথা বলছেন, আপনি কি তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পেয়েছেন ?—শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই ; তা না হলে বলবো কেন ? প্রথম থেকেই দেখেছি, একটা ঘনিষ্ঠ সহযোগ, প্রীতির সম্বন্ধ আমার সঙ্গে, কিন্তু ওর খাবার বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোনো একটি জিনিস আমি স্পর্শ করলে সেটা আর স্পর্শই করবেন না। আমার অভ্যাস গুণে, হাতে গড়া রুটি পরোটা বেশ আসে, তরকারী বা ভাজি বেশ ভালই তৈরী করতে পারি। একদিন একটু আনন্দ করে নিজ হাতে প্রস্তুত করে দুজনে একসঙ্গে খাবো এ প্রস্তাব করেছিলাম ;—কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। স্পষ্টই বললেন— ওসব দরকার কি ? একবার জ্বর হয়েছিল, এই কিছুদিন আগের কথা—আমি দুধ নিয়ে গেলাম, কিছুতেই খেলেন না, কিন্তু ঐ ভীল বাঞ্জু তার বৌ এসে দুধ গরম করে দিলে, বেশ খেলেন। এইবার তিনি চুপ করিলেন। তারপর কতক্ষণ পরে বলিলেন—একদিকে আমি ওঁর গুরুস্থানীয়, ঐ সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠার পরই সহজ-ভাবেই আমার ভ্রমণ-সঙ্গিনী হয়ে নিঃসঙ্কোচেই বেরোতে পেরেছিলেন। জানি, সেজন্য শ্রদ্ধার সীমা নেই। এমন কি গোপনে ওঁর পিতা সহস্রাধিক টাকা দিয়েছিলেন ওঁর হাতে ; তাও আমার কাছে গোপন করেননি, বরং আমায় ওটা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতেই চাইলেন। আমি কিছুতেই নিতে চাইলাম না—তখন নিজের কাছেই রেখে দিলেন। অসাধারণ মিতব্যয়ী।

আশ্চর্য এই নারী-প্রকৃতি,—বিশেষতঃ এই যমুনা, আমি এর সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম না। এদিকে সকল দিকেই তীক্ষ্ম দৃষ্টি, যাতে আমাকে হেথা কোন অসুবিধা ভোগ করতে না হয়। কোন কাজেই খুঁৎ নাই। আমায় শ্রদ্ধা ও যত্নেরও সীমা নেই, কিন্তু প্রণাম করেন দূর থেকে মাটিতে মাথাটি ঠেকিয়ে ভক্তিভরে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর উঠে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে,—কখনও পা ছুঁয়ে প্রণাম নয়। প্রণাম করে উঠবার পর তার চক্ষের ভাব দেখলে

মুগ্ধ না-হয়ে থাকা যায় না। অথচ ঐ বিজাতীয় ঘৃণা একটা ঠিক ভিতরে পুষে রেখেছেন, মনে হয় আমার।

এখন আমি এই কথায় যে সত্যটি উপলব্ধি করিলাম সেইটি সোজা বলিলাম,—

দেখুন, ভারতের হিন্দু মেয়েদের, বিশেষতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত বিধবাদের দেহ-মনের পবিত্রতা এবং সংযম অটুট রাখবার ঐ এক বিচিত্র রীতি আমি বাল্যকাল থেকেই দেখে আসচি ;—তাঁরা আপন পর নির্বিচারে কারো ছোঁয়া দ্রব্য ব্যবহার তো দূরের কথা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। খাওয়ার বিচার আরও ভয়ানক, নিজের হাতে পাক করে হবিষ্যান্ন গ্রহণ ; তাও, সকল রকম ডাল কড়াই শাক সবজি খাওয়ার বিচার আছে। এক অদ্ভুত পবিত্রতা বোধ। আমার বিশ্বাস তাঁদের ব্রহ্মচর্য রক্ষার সহায় ঐ নিয়মকে আমরা বলি শুচিবায়ু।

সাধু বলিলেন—ঠিক ঐভাবেই তো যমুনার ভোজন ব্যাপার দেখেচি, যখন থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়েচেন।

আমি বলিলাম—উনি বরাবরই নিজের বৈধব্যের কথা ভুলতেই পারেননি, আর নিজ আচারের ভিতর দিয়েই তা পালন করেই আসচেন। সমাজের চক্ষে উনি হিন্দু বিধবা,—যতদিন ঘরে ছিলেন সে নিয়ম ও আচার পালন করেছেন ; বাইরেও তো ঠিক তাই পালন করবার কথা। এটা বাহ্য জীবনের কথা, হোন না উনি সিদ্ধ, অধ্যাত্ম মার্গে ওঁর যত উন্নতিই হোক, পার্থিব ব্যবহারে তিনি ঐভাবে চলতেই দৃঢ় সংকল্প,—এক্ষেত্রে এইটুকুই বুঝলাম। ঐ সংযমের জন্যই এখানকার সবারই শ্রদ্ধাও পেয়েছেন। কোনো একটু গলদ থাকলে কিছুতেই তা ঘটতো না।

তিনি বলিলেন—এর মধ্যে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েচে।

বললাম—বিধাতার ইচ্ছা বুঝা শক্ত, আমি তা বলতে পারবো না।

কেন? বলিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াই আমায় দেখিলেন।

এদেশের চোর ডাকাতেরাও কর্ম-সিদ্ধির জন্য ভগবানের পূজা দিয়ে, প্রার্থনা করে যাত্রা করে ;—কর্মসিদ্ধি হলেও পূজা দেয়।

এখন একটা কথা আমার মনে এলো, আবার জিজ্ঞাসাও করিলাম—এখানে এসে আপনার অধ্যাত্ম পথের অপর কোন সঙ্গী কেউ জুটেছিল কি?

এ পথটা এমনই ভিতরের দিকে, গভীর জঙ্গলে ঘেরা এদিকে সাধারণ হিমালয় তীর্থযাত্রীই আসে না। বোধ হয় গত ছয় মাসের মধ্যে আমাদের সঙ্গে কোন তীর্থযাত্রীর দেখা হয়নি, কেবল একদল উরোপীয়ই—নরওয়ের জোয়ান শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখানে যমুনা মায়ী আর উপরের দু-চারজন ভীলই আমাকে ঠিক মানুষ হিসাবে ধাতস্থ রেখেছে, মানুষ-সঙ্গীর অভাব মিটিয়েছে।

আমার যেন যমুনা মায়ীর সম্বন্ধে কৌতূহলের সীমা নাই। এখন তাঁহার সম্বন্ধে মূল ধারণাটা জিজ্ঞাসার ভাবেই বলিলাম,—যমুনা মায়ী বোধ হয় পূর্বেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন,—আমার ধারণায় তিনি অসাধারণ।

উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, এমন প্রকৃতির নারীর কথা পূর্বে শুনি নাই।

সাধু বলিলেন ;—ওঁর যা কিছু দেখেচেন বা বুঝেচেন তা তপস্যা করে

লাভ বা সিদ্ধির ফল নয়, যেমন আমাদের হয়েচে। যখন এইটি প্রথমে আমার লক্ষ্যের বিষয় হলো তখনই আমায় অবাক করেছিল আর ভারতীয় নারী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এমনই সচেতন করেছিল যে সেকথা জীবনে ভোলবার নয়। ওঁর সহজ জ্ঞান এমনই অদ্ভুত আর সত্যকেন্দ্রিক তা দেখে লজ্জা হয় আমাদের পুরুষাভিমান এবং শক্তিমত্তা বা গৌরবের কথা ভাবতে। তপস্যার উপর নির্ভর করেই আমরা শক্তিলাভ করি কিন্তু সিদ্ধি বা ইষ্টলাভ শুধুই তপস্যার ফলে লাভ করা যায় না, এটা যমুনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেচি। একথা স্বীকার করতে এখন কোন সঙ্কোচ নেই যে আমরা কঠোর তপস্যা করে কেবল আত্মাভিমানকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখি, এটা সহজেই ওঁদের মত একজনের চক্ষে ধরা পড়ে যায়। যমুনার সঙ্গে যোগাযোগের পরেও আমি দীর্ঘকাল আসনে বসতাম ; মন্ত্রজপের মাত্রা বাড়িয়ে ধ্যানাবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার সাধনা করেছিলাম। এটা লক্ষ্য করে একদিন বললেন,—ধ্যানে স্থিতিলাভের ওর চেয়ে আরও সহজ উপায় আছে, ওটা গৌণ। ফলে আমার যথার্থই লাভ হয়েছিল।

কিছুকাল পরেই আমরা দুজনে দক্ষিণ ভারত তীর্থভ্রমণে যাই। শেষদিকে ফেরবার সময় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যাবার আগে একটা সঙ্কোচ, নারী সঙ্গে মহর্ষি আশ্রমে যাওয়া ঠিক হবে কিনা এ কমপ্লেক্স ছিল ; আশ্রমে নারী তো দেখিনি, তবে শুনেছিলাম ওঁর মা আছেন। যমুনা বললেন, চলো না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে, মহর্ষির মহর্ষিত্বের ভাল পরিচয়ই পাবে। ওঁর নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমাদের দুইজনকে দেখে কি আনন্দ মহর্ষির ;—বললেন, রেয়ার এমঙ্গষ্ট্ আস্ তোমাদের দুজনের যোগাযোগ বিধাতার অভিপ্রেত, না হলে এমনটা হতেই পারতো না। তোমাদের পবিত্রতা আমায় আকৃষ্ট করেছে!

কতক্ষণ আমরা নির্বাক, নিস্তরঙ্গ একটি ভাবপ্রবাহেই ভেসে চলেছিলাম, —তারপর মনে এক প্রতিক্রিয়া শুরু হোলো,—একটা প্রশ্ন উঠলো কিন্তু বলতে সঙ্কোচ—সেটা তিনি মুখ দেখেই বুঝে ফেললেন, তখন বলছেন—সঙ্কোচ ঠিক নয়—খুলেই বলা ভালো—

আমার মনে এই কথাটাই তোলপাড় চলছিল যে, আপনারা যে ভাবে আছেন—সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে এই ভাবের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বাস করা যায় কিনা।

আঃ, তুমি সেকস্ থেকে মনকে কিছুতেই তফাৎ করতে পারছো না দেখচি। যাই হোক,—এই বলে তিনি দাড়িটা মুষ্টিবদ্ধ করে একটু ভেবে নিলেন, তারপর বললেন,—

ওটা অসম্ভব নয়, নারী যদি পুরুষের সহায় হয়। শিশুকাল থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই হয়। কিন্তু এখানে সংসার চাই যে। আচ্ছা, এটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ,—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধটা যৌবনে এক রকম, প্রৌঢ়ে একরকম, বৃদ্ধাবস্থায় আর এক রকম। এটা পুরুষ পক্ষে গেল.—পুরুষ পক্ষে আরও একটি মৌলিক ভাব এই যে—আসলে সৃষ্টি প্রেরণাতেই পুরুষের মনোমত নারীসঙ্গের প্রবৃত্তি। সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, গৃহস্থ হোক বা সন্ন্যাসী হোক, বয়সের ধর্ম ঠিকই থাকে। তবে সংযমের দৃঢ়তা আর মনের বলই বাঁচিয়ে দেয়। সবার বড় কার্যকারী হলো প্রবৃত্তির অভাব. এটি দেখেচি যমুনার মধ্যে ;—যেন সেই শিশুকাল থেকেই একেবারেই নিশ্চিহ্ন ওর অন্তরক্ষেত্রে, এমনই প্রকৃতি। আমার বিশ্বাস, নারী স্রষ্টার কাছ থেকে পৃথকভাবেই

এক বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছে—সেটা ইন্দ্রিয় সুখে উপেক্ষা,—যা পুরুষের কল্পনারও অতীত।

কেন? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন—বৃদ্ধ হলেও পুরুষের সৃষ্টি প্রবৃত্তির তাড়না সময় ও সুযোগে সারা জীবনকাল অন্ততঃ প্রচ্ছন্ন থাকবেই। প্রাণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বলে, প্রাণত্যাগের সঙ্গেই ঐ সংস্কার ত্যক্ত হয় একেবারে।

ধরুন, যৌবনের প্রভাবোত্তীর্ণ হ'য়ে বা তপস্যার ফলে যে সংযম আসে তা স্থায়ী বলেই মনে হয়,—তা থেকেও কি পতন হয়? ধরুন আপনার মত কেউ—

কিছুই অসম্ভব নয়। বললাম না, পুরুষ শরীরে সৃষ্টি প্রবৃত্তি প্রাণের সঙ্গেই যুক্ত। ঐ প্রাণ থেকেই সৃষ্ট জীবেরও প্রাণ সঞ্চার। প্রাণের ধারা থেকেই বাসনার বেগ, শরীর ইন্দ্রিয় মিলে সৃষ্টির খেলা, আর—বেগ ধারণের জন্য নারীও প্রস্তুত, তবেই না জীবসৃষ্টি সম্ভব হয়! কিন্তু নারীর পক্ষে তা নয়।—নারী পুরুষকে ভ্রষ্ট করতে পারে কিন্তু পুরুষ নারীর ইচ্ছা বিরুদ্ধে তাকে ভ্রষ্ট করতে পারে না। পুরুষ আমরা, আমাদের সব কিছু প্রবৃত্তিঘটিত দোষ গুণ সহজেই বিচার করে বুঝে নিতে পারি। কিন্তু অপর পক্ষে আমরা যেন তাদের কোলের শিশুমাত্র। কখনই তাদের প্রকৃতির ইতি করতে পারবো না। এই যমুনা মায়ী আমার জীবনব্যাপী অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এ নারী চরিত্র এই দেশেই সম্ভব।

আমি বললাম, রামকৃষ্ণ দেবও ঠিক ঐরকমই বলেছেন নিজ বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে।

কি, বলুন না, ক্ষেত্রফল মিলিয়ে নেওয়া যাক্।

তিনি বলেছেন, মেয়েরা সাধারণতঃ দুরকম প্রকৃতি। এক হল বিদ্যাশক্তি অপর হলো অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি হলো সংসারে সকলের কল্যাণকামী এবং তাঁর সঙ্গে আপন স্বামী এবং আপনার ঈশ্বরানুরক্তি তাইতেই আনন্দ,—সব সময়েই প্রফুল্ল,—আর সবার সঙ্গেই প্রীতি থাকে তাদের,—আর অবিদ্যা শক্তি হলো নিজ ভোগ-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য তার একান্ত ঝোঁক বহির্মুখী প্রবৃত্তি পার্থিব সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য কামনাময় জীবন তার।

পরমহংসদেবই নিজ স্ত্রীর সম্বন্ধে বলেছেন, সে যদি বিদ্যাশক্তি না হোতো, বহির্মুখী সংসারমনা নারী হতেন তাহলে তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য রাখা অসম্ভব হতো। এমনও বলেচেন,—সংসার প্রবৃত্তি নিয়ে সে যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, কোথায় থাকতো এই সংযম, অটুট ব্রহ্মচর্য। সাধু বললেন —একথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা আমার জীবন দিয়েই অনুভব করেচি।

একটু থেমে আবার বলছেন,—এখন হয়তো সংযম আমার প্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েচে, বয়সও তো হয়েচে, তাই—কিন্তু সেটা ঐ যমুনার প্রভাবেই। তন্ত্রের সাধনার সিদ্ধির সহায়রূপিণী যে উত্তরসাধিকার কথা আছে ইনি সেই উত্তর-সাধিকার কাজ করেচেন এক মুহূর্তে আমার জীবনে আবির্ভূত হয়ে। আমি আশ্চর্য হয়েই ভাবি, বিধাতার বিধান কি বিচিত্র,—কোথাকার আমি উরোপের এক প্রান্তের অধিবাসী বিভিন্নধর্মী এক জার্মান, আর যমুনা ভারতের সুদূর হিমালয়ের এক শান্ত পল্লীবাসিনী। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যোগাযোগ ঘটলো; —যেন বিধাতা নিজ হাতেই ঘটিয়ে দিলেন। হিন্দু ঘরের বাল্য বিধবারা যে কারণে, সাধারণতঃ যে বয়সে ঘরের বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁর মধ্যে সে-

সকল কারণের কোনোটাই ছিল না। আমার কাছে নিজেই একথা যমুনাই বলেছেন যে যদি বিধাতার এমনই উদ্দেশ্য হতো যে, স্বামী, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করব, তাহলে আমায় বাল্যবিধবা করলেন কেন? আমার যে প্রকৃতি, তাইতেই বুঝেছি আমার বৈধব্যই বিধাতার অভিপ্রেত ;—এইজন্যই সংসার চাইনি, কায়মনোবাক্যেই চাইনি।

তারপরও হিন্দু ঘরের নারী-জীবনে কোনও বিশেষ সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও একজন মনোমত সহায় দরকার—ঠিক ঐ জন্যই উনি আমায় আশ্রয় করেছিলেন। কোনো স্থূল ভোগের দিকে ওঁর মন কখনও ছিল না। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী পুরুষ যা করে, তীর্থ ভ্রমণ ও ভগবান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে যা কিছু ভাবে তাইতেই তাঁরও প্রবৃত্তি। ঘরে বসে তা হবার নয়, তাই ওঁর গৃহত্যাগ, ওঁর উদ্দেশ্যের কথা ওঁর জীবনেই ঢাকা থাকে, কিন্তু যমুনার সঙ্গে থেকে মনে হয় আমিই বেশী উপকৃত।

কিসে একটু ভেঙ্গেই বলুন না!

বিশ্ব সৃষ্টি,—নরনারীর সঙ্গে স্রষ্টার সম্বন্ধ—কেমন ভাবে তাঁরই ইচ্ছাশক্তি সংসারে নর ও নারী-জীবনে কাজ করছে, এই সকল অনুভূতি ওঁর সঙ্গ গুণেই আমি পেয়েচি। কামগন্ধহীন নারী-চরিত্রই এতটা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী হতে পারেন ; এই সৃষ্টিতত্ত্বেই যে সকল রহস্য ওঁর সঙ্গের প্রভাবে পেয়েচি সারা জীবন দিয়েই তা আলোচনার বস্তু।

আরও একটু বলুন না, এ যোগাযোগ কি আর হবে?

আচ্ছা, আমরা সাধারণতঃ এটা তো সহজেই নারী প্রকৃতিতে দেখতে পাই, বুঝতেও পারি, যে মনের মত কাকেও পেলে তারই সেবায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে ; কিন্তু সৃষ্টি বা গর্ভধারণের বিষয়ে তার প্রকৃতি অন্য ভাবে কাজ করে। সৃষ্টির ব্যাপারে তার স্বার্থপরতার শেষ নেই, সেটি বিশ্বজননীর সৃষ্টির নিয়মের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। এখানে সে শরীরকে বিলিয়ে দিতে পারে না। নারীর মনস্তত্ত্ব পুরুষের পক্ষে ধরা শক্ত। সময় সময় স্থান কিম্বা অবস্থা বিশেষে নানা দিকে লুব্ধ পুরুষকে সে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়ে,—আমিও ওঁর সেই আক্রোশ থেকে বাদ যাই নি।

তিনি আরও বললেন, সৃষ্টিমুখী হয়ে কোন পুরুষের উত্তেজিত হওয়াটা যত সহজ, নারী-প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত। তার নিজের প্রবৃত্তি না থাকলে কোনো প্রকারে তাকে ছোঁয়াও যাবে না। ঐ সময়ে, অর্থাৎ গর্ভধারণের প্রবৃত্তির বেলায় সে যেমন পরমা-প্রকৃতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অনুগামী, তাঁর সংকেত বুঝে চলে, পুরুষ তা ধরতেও পারে না। ঐখানে পুরুষ অহং সর্বস্ব হয়ে আত্মগরিমায় সব মাটি করে নিজেকে পশুতে পরিণত করতেও তার সংকোচ নেই তুচ্ছ একটু সুখের বশে। এর সার কথা এটুকু যে,—জীব-সৃষ্টির বেলা বিধাতার ইচ্ছাই নারী-ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে।

সংযত ইন্দ্রিয় পুরুষ হলেও নারীসঙ্গ অসংযত হওয়া বরং সম্ভব হতে পারে ; কিন্তু সংযত নারী পুরুষ সঙ্গে থাকলেও কখনও অসংযত হবেই না, —বিচিত্র কৌশলেই সে এড়িয়ে যাবে। সৃষ্টির মূল প্রেরণাটাই হলো নারীর ; পুরুষ ঠিক যন্ত্রের মতই তার প্রভাবে কাজ করে যায়। এখানে নারী-প্রাধান্যের কারণ একটি সৃষ্টি, তাকে সে ধারণ করতে যাচ্ছে। পুরুষের বীজ আছে সত্য কিন্তু নারীর সে বীজকে বিফল করবার শক্তি আছে। সেইজন্য সৃষ্টির

ব্যাপারে নারীর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রবৃত্তি দরকার। নারীর প্রতি বিধাতার এই জন্যই পক্ষপাত। এখানে তারই স্বাধীনতা বেশী লক্ষ্য করার বিষয়। তবে সেটা প্রচ্ছন্ন। মনে করি আমরাও তো ভালো মতেই জানি, কিন্তু সত্যই জানিনা কেবল কি উদ্দেশ্যে আমরা নারীকে চাই। তার একটা কেবল সম্ভোগের জন্য—তার উদ্দেশ্যে শরীরে স্ফূর্তির চরিতার্থতা, তার নাম সম্ভোগের নেশা, অপরটি হলো সৃষ্টির নেশা, সে একটা পৃথক ভাবের উন্মাদনা, তার ফল জীব সৃষ্টি,—এইটির সঙ্গেই ঈশ্বরেচ্ছার যোগ থাকে। আগেই সে কথা বলেছি।

ভারতের জীবনে আমি সত্যই আর একটি জ্ঞান নারী সম্বন্ধে পেয়েচি,—সৃষ্টিধারণ ছাড়া, কল্যাণ, অকল্যাণ, সকল কর্মেই পুরুষের সহায় করেই হোক, নারী-প্রকৃতিই এমন যে সে দুরন্ত পুরুষের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে, বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যতই দুর্দ্ধর্ষ পুরুষের শত অত্যাচার সহ্য করেও। কিন্তু স্বাধীনচেতা শক্তিশালী নারীর সঙ্গে তাল রেখে পুরুষের চলা সহজ হয় না। শক্তিশালী পুরুষ, উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী হলে তার জীবনে নারীর বন্ধুত্ব নিতান্তই প্রয়োজন। নারী-সঙ্গই তার জীবনকে সহজ গতি, শান্তিময় কর্মে প্রবৃত্তি দিতে পারে। আমার স্থির অভিজ্ঞতা যে পুরুষের উপযুক্ত বন্ধু, নারী ছাড়া আর কেহই নয়, বিশেষতঃ অধ্যাত্মমার্গের মানুষ যাঁরা, সংযমে যাঁরা যথার্থই দৃঢ় হয়েচেন তাদের নারী সঙ্গিনীই প্রয়োজন। এই নারীসঙ্গ লাভ যথাকালে হলে পুরুষের বৈরাগ্য সাধনের জন্য সংসারের বাইরে যাবার অথবা শেষ সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন হয় না।

সাধুর এই কথার সমর্থনে—আমায় একটু বলিতেই হইল যে, আমাদের দেশেই এভাবের চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে নর-নারীর জীবন সম্পর্কে। দেখতে ঠিক সাধারণ গৃহস্থ,—সন্তান সন্ততি নিয়ে ঘর করেচেন অথচ অধ্যাত্ম শক্তিতে স্বামী স্ত্রী কেউ কারো গতিপথে বাধা সৃষ্টি করেন নি, নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে গিয়েচেন—আবার গুরুরূপে বহু সংসারীকে পথ দেখিয়ে অধ্যাত্মমার্গে পরিচালিত করেচেন। আমাদের দেখা সেই সব মহাত্মার প্রভাব আমাদের জীবনেও বর্তমান। তাঁরা না থাকলে আজ আমার মত একজনের অস্তিত্ব সম্ভবই হতো না। কাশীতে শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাই, শশীভূষণ সান্ন্যাল মশাই; প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পাগল হরনাথ, ওঁকারনাথ, তারানাথ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এঁরা তো সিদ্ধ মহাপুরুষ।—আবার মহীয়সী নারী সিদ্ধযোগিনী আমাদের সামনেই রয়েচেন;—সারদা মা, গৌরী মা, আনন্দময়ী মা, যথার্থই আনন্দময়ী—এঁদের সঙ্গ মহাপুরুষ-সঙ্গের তুল্যই ফলপ্রদ। এই সব মহান আদর্শের পিছনেই আমরা জীবন সার্থক করতে এগিয়ে চলেছি।

এই কথার পরও বলিয়া ফেলিলাম,—দেখুন, এত বড় বড় অধ্যাত্ম মার্গের বড় বড় মানুষ দেখলেও এখানে আপনাদের এইভাবে নারী-সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহও করেচি।

আহা, সাধারণ মানুষের চক্ষে তো এভাবে একটি সাধুর সঙ্গে কোনো নারী রাখা স্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ উরোপীয় একজন, হৃষ্টপুষ্ট বলবান, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের ব্যাপারে তো উপেক্ষণীয় নয়। আরও ওদেশে নারী সম্পর্কে জার্মানদের একটা সুনাম তো জানেন। তাই হয়তো অপনার মনে প্রশ্ন উঠে থাকবে যে যমুনা মায়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুদ্ধ কি না। তবে একথা ঠিক,

আপনার দেশের মেয়ে বলেই এটা আমার পক্ষে পরম লাভের বিষয় ঘটে গিয়েছে। আপনি চেনেন তো ভারতের মেয়েদের,—সুপার ফিসিয়ালি চেনার কথা নয়, আপনার তো গভীরভাবেই জানবার কথা।

আমি—দেখুন, সেদিকে আমি ভাগ্যবান, অদৃষ্ট আমার নিতান্তই ভালো। কারণ আমারও গার্হস্থ্য জীবনে এক বিদ্যাশক্তি সরলা স্ত্রীর সঙ্গেই বিবাহ হয়েছিল, তাছাড়া যমুনা মায়ীর মত কামগন্ধহীন উচ্চস্তরের নারী আগেও দেখেচি। অনেক বৎসর আগের কথা, তখন আমি বীরভূমে ;—এক পাশমুক্ত সিদ্ধ যোগী তাঁরই সঙ্গে ছিলেন—এখানে সেই স্তরের আর একটি দেখবো সেটি এমনই অপ্রত্যাশিত—বিশেষতঃ, আপনার ইনি আপনাকে ধরেই গৃহ আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এসেচেন। পরে এখন জানলাম যে কী অপূর্ব সংযমের ফলে আপনাকেও তুচ্ছ ঐ ইন্দ্রিয় বিকার মুক্তও করেচেন। এর চেয়ে আশ্চর্য আর আমি হইনি। এ যোগাযোগ উভয়ত মহৎ। আবার তার উপর,—আমি আপনাদের দুজনকেই চক্ষের সামনেই দেখলাম, আপনাদের কথা শুনলাম, নিশ্চয়ই মহা ভাগ্যই বলতে হবে। আরও একটা প্রমাণ হল, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুই একটি ইন্দ্রিয়-প্রভাব-মুক্ত নরনারী জন্মান যাঁরা নিজ দৃষ্টান্তে অপরকেও প্রভাবিত করতে পারেন।

আমাদের শাস্ত্রে জীবমাত্রেরই আহার নিদ্রাদির কথা তো আগেই বলেচি—সাধারণ নিম্ন বা মধ্যস্তরের মানুষ প্রায় পশু, তবে সভ্য পশু বলা যায়। আজ বিকালে এইভাবেই আমাদের কথা আরম্ভ হইল—এটা অবশ্য বর্তমান নগরবাসী সাধারণের প্রকৃতি এবং পরিস্থিতির শেষ কথা।

শুনিয়া সাধু একটু তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে আমায় দেখিলেন ; তারপর বলিলেন ;—

মানব জীবনের সার্থকতার সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে, ঐ পশুভাবের দৃষ্টান্তই কি তার ঠিক উপমা ?

নয় কেন, দেখুন না, পশুরা সারাদিন যেমন আহার সংগ্রহের চেষ্টায় চারদিকেই ঘুরে বেড়ায়, সাধারণ মানবও তেমনি ছোট বড় নগর বা পল্লীর প্রায় সর্বত্রই উদরান্নের জন্যে ঘুরচে। কেউ বা বসে, কেউ ঘুরে ঘুরে, কেউ টুলে, কেউ চেয়ারে, কেউ মোট নিয়ে, কেউ কোন যানবাহনযুক্ত গাড়িতে ঘুরে ঘুরে সারাদিন কাজ করে। তারপর উদরপূর্তি, শরীর সতেজ হলে তখন স্ফূর্তি, তারপর শান্তিময় নিদ্রায় প্রভাত। চাঙ্গা শরীর নিয়ে আবার সকাল থেকে দৈনন্দিন কর্মের ধারা চলতে রইল।

অবশ্য অহমিকার পূর্ণ প্রভাব আছে। সম্ভ্রম, মর্যাদার উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে বাইরে যাওয়া কর্মক্ষেত্র ভদ্র বেশে উপস্থিত হওয়ার কথাও আছে। এইটাই পার্থক্য পশুর সঙ্গে সাধারণ নরনারীর, নইলে রুচি অরুচি পশু জীবনেও আছে।

গতানুগতিক জীবনে বিতৃষ্ণা এলেই না উচ্চ ভাবের দিকে মানুষের গতি হয়। সৃষ্টি প্রবৃত্তি যখনই ধর্মমুখী হয় মানুষের তখনই মনুষ্যত্বের প্রসার,—তখনই পশুভাব থেকে মুক্তি।

লজ্জাটা পশুদের নেই মানুষের আছে। তাই থেকেই সভ্যতা ও আচ্ছাদনের উৎপত্তি, আর ফ্যাসান বা অলঙ্কারে শোভা সেটা তো বিলাসিতার

মধ্যেই গেল আর প্রয়োজনবোধের কাল্পনিক বিস্তার, রুচির বিকার তার সঙ্গে। আর সুবর্ণ মণিরত্নাদি ব্যবহার বিলাস মাত্র, নারীপক্ষে আকর্ষণ বাড়াবার জন্য আত্মাভিমান, অধিকার, গর্ব, শক্তি জাহির করার নেশা। এইভাবেই কত জন্ম জন্মান্তর ঘটে যায় তবেই না বাহ্য বিষয়গুলি তুচ্ছ হয় আর তখনই ধর্মরাজ্যে প্রবেশ কথা। একটু দেখলেই বুঝা যায় যে সাধারণ মানুষ সমাজের শিশু বালক যুবা প্রৌঢ়, বৃদ্ধের দল, পশুভাবের প্রভাব থেকে কতটা উন্নত হয়েচে বা হতে পেরেচে।

সাধু বলিলেন,—সাধারণ মানুষের মধ্যেও তো ধর্মের প্রেরণা, বিবেক-বুদ্ধির প্রভাব আছে ; একেবারে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন সাধারণ মানুষ কি সম্ভব ?

ধর্মের উৎপত্তি বুদ্ধি বা চৈতন্যের প্রভাবে, মানুষ সাধারণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে আছেই, বুদ্ধিপূর্বক কত রকমের কত কর্মই না করতে হয়। চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রসূত কর্মে, বুদ্ধিপূর্বক হিংসার পরিচয়ও আছে—আবার ধনোপার্জনও তো ঐ বুদ্ধি সম্বল করেই চরিতার্থ হচ্চে। মানবের ঐসব স্তর থেকে অধ্যাত্ম স্তরে অবস্থান্তরিত হতে সময় লাগবে তো ? এধারে ভোগতৃষ্ণা, ইচ্ছাময় মনের প্রবল তৃষ্ণা মেটাতেও বড় কম জন্মও যায় না,—তবেই না মানব চৈতন্যমুখী হয়। তারপর স্তর পেরিয়ে মুমুক্ষুত্ব এলে তবেই না মুক্তি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য ছটফটানি আসে।

এই আলোচনাটা এবার এলো মানুষের প্রাথমিক আকর্ষণ রূপকে নিয়ে। ঐ রূপ থেকেই সকল কিছু ভোগের প্রবৃত্তি। মানুষের মূর্তি স্থূল হলেও প্রধানতঃ শরীর নিয়ে তারই সঙ্গে নিজ অস্তিত্ব অর্থাৎ দেহাত্মবোধ জাগায়, এই দেহ আশ্রয় করেই আমি আছি এই বোধই সহজ। তার সঙ্গে একটি নাম প্রথম পারিবারিক, তারপর সামাজিক পরিচয়ের কথাও আছে ঐ নাম আর রূপকে ধরেই। মানুষকে কি স্বাভাবিক অবস্থায় রেখেচে তার পরিবেশ ? সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান মানুষকে কত রকমেই না বেঁধেছে ; আর্য রীতি-নীতি ও নিয়মের নাগপাশে জন্ম থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত, মৃত্যু হলেও যেন তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। আজ যদি মানুষ বনে জঙ্গলে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে থাকতো তাহলে কত সহজেই তার সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকশিত হতে পারতো আর যথাকালে একটি জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনে তার সৃষ্টির সঙ্গে স্থিতি ও লয়ের সকল রহস্যই স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে যথানিয়মেই ভেদ হয়ে যেতো, জীব-রূপে তার উৎপত্তি সার্থক হতো। তা না হয়ে,—এখন সহরবাসী হয়ে কত দিকে কত অভাব, কত রকম অভিযোগের কত রকমের শাস্তিভোগ থেকে যেন নিষ্কৃতি নেই।

কিন্তু সে জীবন তো হবার নয়। হলেও মানুষ বনেই নগর গড়তো, যেমন আগে গড়েচে। এখন প্রাণের গতি,—সর্ববিধ কর্মে প্রত্যেকে চলা বলা কলা সৃষ্টি সবই দ্রুত লয়েই ঘটতে বাধ্য করেচে। প্রবল প্রাণশক্তি তার বাঁচার জন্য কতো দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে। কাজেই বিচিত্র এই গতির জটিলতা কাটিয়ে তার সহজ আত্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কত কম। কারণ সে স্থির হবে কি করে ? এখন, মানব সন্তানের কথাই বলচি,—যৌবনের সহজ উন্মেষের সহজ গতি কোথায় ? নির্জন অবস্থায় যেগুলি উন্মেষের সুযোগ, সময়ে সময়ে কৃত্রিম ভাবে তার উন্মেষ ঘটাচ্চে এ হট্টগোলের মধ্যে। তার প্রিয়তম বন্ধুরূপী সেই

নিঃসঙ্গতা কোথায় ? অবশ্য আশেপাশে টেনে টুনে যে নির্জনতাটুকু তাই বা অবাধ কোথা ? নির্জনতা উপভোগ তো সমস্যা এই নাগরিক জীবনে।

সাধারণতঃ কিশোর কিশোরীরা এ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ সঙ্গী-সঙ্গই চায় ; দেখেছি তারা সঙ্গই খোঁজে বেশীর ভাগ সময়ে, সেটি না হলে ঐ অবস্থায় তার নিজেকে বড় একলা ও অসহায় বোধ হয়। অথচ ঘনিষ্ঠতার ফলে যার প্রবৃত্তি কতকটা বিকৃত হয়ে পড়চে, সে সকল সংশোধন করতে তার নির্জন স্থানে, নীরব ক্ষেত্রে তার কতকটা চিন্তার সুযোগ বা অবসর কোথা ? সবাই একলা থাকতে চায়না বটে, কিন্তু এক শ্রেণীর সুস্থমনা কিশোর কিশোরীরাও মাঝে মাঝে নির্জনতাই খোঁজে নিজ কর্তব্য স্থির করতে। সে নিজে গন্তব্যভ্রষ্ট হয়ে কোথায় কোন্ বিপথে চলেছে এটাও তাকে ভেবেচিন্তে নিশ্চিত হতে হবে না ? এত ভীড়ে মানুষ তো সহজেই বিপথে যেতে অভ্যস্ত,—কিন্তু এখন কি করে নিজে সৎভাবের ক্ষেত্রে আসতে পারবে ? তারও তো একটু খোলা পথ চাই। নিঃসঙ্গতাই তাকে লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারে। তখন সে আপনার মধ্যে আপনাকে ধরতে পারে, নিজেকে ভালভাবে পায়। তারা ঘুম থেকে উঠে ক্রমাগত সঙ্গ-সঙ্গীর গুণে তার আর নিজেকে নিজের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই তার জীবন খানিকটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে নাকি ?

এখানে কেউ যে নিজেকে নিজের ভিতর পাচ্ছে না এটা কি আরও বেশী বলবার কথা ?

সত্য,—ক্রমান্বয়ে ঘন সন্নিবিষ্ট অল্প পরিসর কোলাহলমুখর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে তাদের মতিগতির কোন স্থিরতা নেই, তাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় নির্জনতার অভাবে। অবশ্য সবাই যে এভাবে জ্ঞান বুদ্ধিহীন হয়ে অসংযমের পথে উন্মত্ত হয়ে ছুটেচে ঠিক তা নয়। ওরই মধ্যে এমন অনেক কিশোর বা যুবা নবীনকে দেখা যায় ঐ সহপাঠি বা সহকর্মিদের সঙ্গ থেকে খানিক তফাতে গিয়ে নিজ বুদ্ধির প্রেরণায় খানিক ভাবতে পারে বা চিন্তার সুযোগ চায়। তাদের ভেবে-চিন্তে দেখার প্রবৃত্তি আছে বলে।

সৎ পরিবেশের অভাবের কথাই হলো আসল, তারই অভাব থেকে যত-কিছু অশান্তি ও অভাবের উৎপত্তি সঙ্গে সঙ্গেই অসন্তোষের সৃষ্টি, যেন অভাবের প্রবল বন্যায় এ সময়ে বালক ও যুবাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পিতা—যারা নিজ শক্তিহীনতা, অক্ষমতা ও দুরদৃষ্টের ফলে সাধু দেখলেই হ্যাংলামো, আমাদের কিসে অভাব যোচে। বংশধরদের মধ্যেও অভাব ও অভিযোগের বিষ সঞ্চারিত করে তাদের মধ্যেও সহজবুদ্ধির প্রেরণাগুলি সংযত হতে দিচ্ছে না।

যৌবনের ধর্মে তারা স্থির হতে না পেরে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে সহজে মেতে উঠতেই চাইচে এখন। উরোপ আমেরিকার কথা রাষ্ট্রীক, পারিবারিক, সামাজিক অশান্তির বহ্নিতে যেমন তাদের সমাজকে একটা ধ্বংসের ভিতর দিয়ে গড়তে চেষ্টা করচে, এখনও অক্ষম বোলে নিরন্তর অসন্তোষের আগুনেই জ্বলছে। এদেরও তাই করা চাই, না হলে যেন পথই নেই। ভ্রান্ত আদর্শের এই বিজাতীয় প্রভাব কতটা অস্থির করেচে তাদের চিত্ত।

শেষে ফিরঙ্গ-বাবাই এর অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রকাশ করে দিলেন এই বোলে যে, জটিল এই নগরবাসী জীবনই জীবের আত্মবিস্মৃতির ফল,—শক্তি

সর্বস্ব হবার জন্যই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, শেষে জাতিগত ভাবে কি প্রবল চেষ্টা, কি কঠোর তপস্যা ? আর যত শক্তির দিকে গতি, ততই আত্মার চৈতন্য থেকে চ্যুতি—ফলে বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। এই তো দুনিয়ার স্বস্তিহীন অবস্থার রহস্য। কে কাকে বুঝায় ? অথচ এ খেলাটি তাঁরই।

রাত্রে আজ আহারাদির পর নিজ নিজ আসনে আসিয়া বসিবার পর ফিরঙ্গ-বাবাই আমাদের দিকে ফিরিয়া বড়ই প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠেই বলিলেন,—কি ভাবচেন ? তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—তা তো আপনি জানেন,—প্রথমেই তো বলেছিলাম। শুনিবা-মাত্রই তিনি বুঝিলেন এবং বলিলেন—ও হো, মহর্ষির কথা। আপনি এখনও ভুলে যাননি। আমি বলিলাম—দেখুন। আমার বড় দুঃখ যে দক্ষিণ ভারতে এতদিন থেকেও আমি বঞ্চিত হয়েছি এই জন্যই আমার কৌতূহল যতটা, আগ্রহও তার চেয়ে কম নয় ;—আগাগোড়া তাঁর সঙ্গে আপনার ব্যবহার—

আমি বুঝেছি সেটা ; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার কেমন একটা বড় অদ্ভুত সঙ্কোচ আসে। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার বড় বেশী কথা হয়নি, তবে যে ব্যবহারটা হয়েছিল তা আমি সহজেই বলতে পারবো। আমাদের উরোপীয় মনে,—সকল অবস্থায় একটা বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ বাইরের লোকের কাছে জানাবার ব্যাপার আছে। উরোপে, তুমি জানো রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদয়ের যাঁরা সাধু, গুরুস্থানীয় তাঁদেরও বাইরের বেশভূষা, যেখানে থাকেন, সেস্থানের আসবাবপত্র যা কিছু বাইরের লোককে আকৃষ্ট করবার একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন আছে। তাইতে সহজেই বুঝা যায় ইনি সাধারণ থেকে পৃথক, অসাধারণ,—বিশেষ একজন চিহ্নিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর দল বা সম্প্রদায়-গত চিহ্ন, উচ্চভাব এবং আদর্শের প্রতীক বা চিহ্ন থাকবেই ; যাতে সাধারণ ব্যক্তি তাঁর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারে। এখানে ভারতে অবশ্য সাধারণ সাধুও সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, বেশভূষা, ভেক যাকে বলে, অবলম্বন হিসাবে অনেক কিছু প্রতীক বা চিহ্ন ধারণ করার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এখানকার সরলতা ওদেশে নেই। সবার উপর যেটা আমি বলতে চেয়েছি সেটা এই যে, বিচিত্র এই ভারত-ভূমিতে যাঁরা উচ্চতম অবস্থায় পেঁৗছেচেন, এখানকার শাস্ত্রীয় নির্দেশমত যাঁরা জগৎগুরু স্থানীয়, এখানকার সিদ্ধ, পরমহংস স্তরের যাঁরা, তাঁরা এতটা প্রচ্ছন্ন এতটাই সহজ, সাধারণ জীবের সঙ্গে মেশানো যে তাঁদের আবিষ্কার করাও কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের তুলনায় কম গভীর নয়। এই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আমার ঐ রমণ ঋষির সান্নিধ্যে ঘটেছিল।

আমি রামকৃষ্ণকে দেখিনি। এখানে এসেই স্থানে স্থানে তাঁর কথা শুনেছি বাঙ্গলায়ও শুনেছি,—দক্ষিণে মাদ্রাসে, ব্যাঙ্গালোরে এমন কি কন্যাকুমারীতেও শুনেছি। শিষ্যশ্রেণীর দুই একজনের সঙ্গ করে জেনেচি। ফটো দেখেছি, খুব ভাল করেই দেখেছি,—ফটো তাঁর যতই খারাপ হোক তাঁর যে চক্ষু দেখেছি তাইতেই আমাকে স্তম্ভিত করেচে। প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ ফটোতে যা দেখা যায় কিম্বা সেই জীবিত মানুষটির মুখপানে চাইলেই প্রত্যেক মানুষের চক্ষে জীবনের আলো বলতে একটা আমির প্রকাশ এতই স্পষ্ট যে কাকেও বুঝাবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রামকৃষ্ণের মূর্তিতে যে চক্ষু, তাইতে ঐ আমির এতটা অভাব, অসম্ভব রকমের লুপ্ত, আর কোন জীবিত

মানুষের মধ্যে এ পর্যন্ত দেখলাম না। আমাদের মহর্ষি রমণের চক্ষের দৃষ্টিতে এমনই একটা জীবন্ত আমি সময় সময়—বেশী সময়েই দেখা যেতো, সেও চমৎকার। যাকে তিনি দেখেছেন তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করছেন বুঝা যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণের তুলনা নাই। সারা উরোপ তো আগেই ঘুরেচি এবং ভারতেরও বোধ হয় অনেক প্রদেশ ও নানা অঞ্চলে কম ভ্রমণ করিনি—কিন্তু এমন সমাধিস্থ মূর্তি আর দেখলাম না। এখন আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম ;—

মহর্ষির মূর্তি দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল, আগে যে আকর্ষণের কথা বলছিলেন ?

সাধু বললেন—প্রথম দর্শনে যখন আমি দ্বারপথ অতিক্রম করে, ভিতরে অনেকেই একত্রিত হয়েছেন এমনই সভার এক প্রান্তেই বসলাম ; তাঁর দিকে আবার চেয়ে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, তিনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠিক যেন পরিচিত অতি প্রিয় ঘনিষ্ঠ একজনের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলে যেমন সত্যই হয়—আমার ঠিক সেই রকমই মনে হয়েছিল। আমার ভিতরটা গুরু গুরু করে সর্ব শরীরে সঞ্চারিত আর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের মধ্যে এক শীতলধারা বয়ে গেল, আর কিছুই বুঝলাম না। তবে সেটা অল্পক্ষণেই শান্ত হয়ে এলো ; সহজও হয়ে গেল। তারপর আমায় একেবারেই স্থির করে দিলে ;—ভয় ও আনন্দ এই দুই ভাব আমার মধ্যে পৃথক আর রইল না। আশ্চর্য, এমন দুয়ের মেশামেশি আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। এখন আমার মধ্যে আর কোন কথাই উঠল না, জীবন্ত অনুভূতি এখন ঘন হয়ে আমার অস্তিত্বের সবটুকুই গ্রাস করে ফেললে।

আসনে একই অবস্থায় রইলাম কতক্ষণ—শেষে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম ওখানে আর কেউ নেই ; রমণ মহর্ষি তখন সবেমাত্র নিজের আসন ছেড়ে উঠেছেন,—তাঁর কাছেই একজন দাঁড়িয়ে।

মহর্ষি অতি মৃদুস্বরে সেই লোকটিকে কিছু বললেন। তখন তিনি আমার কাছে এসে বেশ স্পষ্ট ইংরাজীতেই বললেন—এখন আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি ? আমাদের ভোজনের সময় হয়েচে।

আমি শুনলুম তার কথা, কিন্তু প্রথমেই যেন অর্থবোধ হলো না, আমি হাঁ করে তাঁর দিকেই চেয়ে রইলাম। তারপর তিনি মহর্ষির দিকে তাকিয়ে বললেন, —মহর্ষি বলছেন আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, আপনি কাল থেকে অভুক্ত।

বলতে গেলে সত্যই আমি গতকাল রাত্র থেকে অভুক্ত একথা তখনই আমার স্মরণ হলো।

বিনা বাক্যে আমি যন্ত্রবৎ উঠলাম এবং তাদের অনুগামী হলাম।

তখন একটা নেশার ঘোর আমার মধ্যে ছিল একটা ভাবুকতা—সে আমার নিজেরই মনে হল, এটা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক কিন্তু আনন্দদায়ক। পরে অবশ্যই এর কারণ জেনেছিলাম।

একই সঙ্গে অনেকেই খেতে বসলেন।—তার সঙ্গে মহর্ষিও বসেছেন,— আমাকে ঠিক তাঁর পাশের আসনেই বসতে দিলেন। খেতে বসে, যা খাই অমৃত ; এমন অমৃতপূর্ণ খাদ্য কখনও আগে খাইনি। অথচ ভাত ডাল ভাজি এই সবই ছিল সুন্দর, পবিত্র। ঘৃত ছিল প্রত্যেক গ্রাসে। কি খেলাম—আর কি খেলাম না তার কথায় কাজ নেই,— যখন সবাই উঠলো আমিও উঠলাম।

হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আপন খেয়ালে সামনের জমিতে একটা গাছের

কাছেই বসেছি। মহর্ষি তখন একটু এদিক ওদিক বেড়াচ্ছিলেন। আমি কখনও কখনও তাঁর দিকেই দেখছিলাম, কেমন একটা অপূর্বভাবে বিভোর হয়েই সেই দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি মহর্ষি আমারই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি কোন রকম চঞ্চল না হয়ে বসেই রইলাম।

এবার তিনি নিঃশব্দে আমার সামনে বসলেন ;—কতক্ষণ নির্বাক, বসেই রইলেন। আমার মনে কোন প্রশ্নই নেই, কোন কিছু জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিও নেই, চাইবার কিছুই নাই ; যেন আমার সর্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে। এবার শুনলাম তিনি বলছেন,—

তুমি এখানে (ভারতে) যখন এসেছিলে, একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্ব লাভ ছাড়া মনে তোমার অন্য কোনও অভিসন্ধি ছিল না ; কিন্তু এখানে এসে কিছুদিন অধ্যয়নের পর,—নানাস্থানে ভ্রমণকালে তোমার মধ্যে যোগ সাধনার এখন যম-নিয়মাদির সাধন, বিশেষ প্রাণায়ামের উপর ঝোঁক এসে গিয়েছে। আসলে তোমার লক্ষ্য যদি স্থির হয়ে থাকে, ঠিক কোন্‌টা তুমি চাও এটি ধরতে পেরে থাক তা হলে আমি তোমায় সহজেই কিছু সাহায্য করতে পারি।

প্রাণ আমার আনন্দে চঞ্চল যেন বিহ্বল হয়ে উঠলো। আমার মুখে কতক্ষণ কোন কথাই এলো না। কতক্ষণ পর মনে মনে বেশ গুছিয়ে নিয়ে বললাম,—

এই যে পাতঞ্জলের যম নিয়মাদি এ একটি উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক সাধনের পথ। তারই ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে, সেগুলি নিজে করে দেখবার প্রবল ইচ্ছাই হয়েছিল তাই ওদিকে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আপনাকে দেখার পর সেদিকে আর মন নেই। যা পেলে সব পাওয়া হয়, যা সর্বাপেক্ষা গুরু আমার তাই চাই, আপনি তো জানেন সেটা কি বস্তু।

অত্যন্ত স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—তাহাই হবে তোমার। ক্ষেত্রটি তোমার তৈরী। তপস্যা অথবা জপ প্রাণায়ামাদি কিছুই ক'রো না,—কোন প্রয়োজনই নেই। সহজ জ্ঞান আপনা থেকেই আসবে,—কেবল এইটুকু ক'রো, যেন ঈশ্বর লাভের জন্য কিছু করবার ইচ্ছায় মন টেনে নিয়ে যেতে না পারে।

কোন কাজ করতে মানা করছেন কি ?

না না, শরীর মনের কাজ, যা দরকার মনে হয় তা সবই করবে। কেবল নিজ ইষ্টলাভের উদ্দেশ্যে কাজ, বিশেষ কিছু করতে হবে না। একটু অগ্রসর হলে আপনিই বুঝতে পারবে কোন্ কাজ করতে হবে আর কোন্ কাজ করতে হবে না। এই পর্যন্ত কথা। আমার সঙ্গে তার কথা শেষ হতেই সোজা তিনি চলে গেলেন। ঘরে গেলেন না,—ফাঁকায় রইলেন অনেকক্ষণ। যখন সন্ধ্যা হলো, একজন আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। কুটিরটি ছোট্ট,—একজনের থাকবার মতো একটা খাটিয়াও ছিল, তিনি বললেন আপনি এইখানেই শোবেন। একটা ডিজ লণ্ঠনও রেখে গেলেন। অন্ধকার রাত্রে বিনা আলোয় বার হতে বারণ করলেন, সাপ খোপ আছে, তারা রাত্রেই বেরোয়। দেখলাম আমার সঙ্গে যে বাক্স ও আর সামান্য কিছু থলের মধ্যে ছিল, সঙ্গে আমার বেডিং ইত্যাদি সযত্নে এখানে রাখা আছে,—মেজেতে একখানা চেটাই বিছানো আছে।

তিন দিন মাত্র ছিলাম। ঐ তিনটি দিন আমার সর্বার্থ সিদ্ধির দিন বললেও চলে। যা কিছু আমার প্রাপ্য ঐ তিনটি দিন ও তিনটি রাতের মধ্যেই

হয়ে গেল। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম,—রাত্রে যেমন সকলে খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে ইনি ঘুমান না। বিছানায় বসে থাকেন, কখনও শুয়ে থাকেন, কখনও বা বাইরে বেরিয়ে পড়েন আর ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ান। ঐ তিন রাত দিনের মধ্যে একদিন ঘুরতে ঘুরতে গভীর রাত্রে এসে পড়লেন আমার ঘরে। তখন আমি লণ্ঠনের আলোয় আপন অভিজ্ঞতার কথাই খাতায় লিখছিলাম। আমার অনুভূতি যা যা হচ্ছিল লেখবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। তিনি এলেন, দরজা খোলাই ছিল। এসে বসলেন কতক্ষণ, কথাই নেই প্রথমে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ঘুমান নি ?

বললেন—হাঁ, ঘুমিয়েছিলাম কিছুক্ষণ ;—সে হয়ে গিয়েছে। এখন একটা কথা শোনো ;—তুমি এসব লিখতে চেষ্টা কোরো না। এখন এই সব অনুভূতি তোমার সম্পূর্ণ নয় ; ও চেষ্টাও এখন নয়।

ভেবে দেখ। আমি কিছু বলবার আগেই আবার বললেন ;—ঐ প্রবৃত্তিটাই আপন পথে তোমায় সোজা যেতে দেবে না ;—বাধা হবে। এখন ঐ লেখবার,—লিখে এখনকার মনোভাব প্রকাশ করার লোভটা সম্বরণ করো ; ওটা ভাল নয় এখন—তোমার ইষ্ট লাভের অন্তরায় বলেই জানবে।

আমার অন্তরে তখনই তাঁর কথার মর্মার্থ বুঝতে বিলম্ব হলো না ;—বুঝলাম। তিনিও বুঝলেন যে আমি ধরতে পেরেচি তাঁর উপদেশ ;—খুশি হয়েই চলে গেলেন। এমন উদার এবং যথার্থ গুরু কাকে বলে—এই ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম।

যাবার আগে আর একবার দেখা হলো। বললেন, এখন তুমি উত্তরে যাবে সংকল্প করেছ, হিমালয়ে ঘুরবে ;—বেশ ভাল হবে। আর কোন কথাই নয়। আমার ধর্ম সেই থেকে সাধনার বস্তু মাত্র নয়, অনুভূতির বস্তুই হয়ে গিয়েচে। মধ্যে মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয়, তখন খানিক ঘুরেই বেড়াই ; আবার এসে আপন আসনে বসি। ভারতে এসে এই সব আমার সম্পূর্ণ লাভের বিষয় ঘটেছে।

কতক্ষণ পরে আপনা আপনিই বলিতেছেন ;—প্রথমে কিছুদিন বিদ্যা-লাভ, তারপর কিছুদিন পর্যটন,—ঘাড়িওয়ালা বাবার সঙ্গ—তারপর বেশ কিছু-দিন ধর্ম সাধনের ক্রিয়াকর্ম—তারই উদ্দেশ্যে কিছু তপস্যা,—শেষে মহর্ষির সঙ্গ এবং সাধনের শেষ। চুপচাপ বসে যাও। আনন্দ আনন্দ আনন্দ।

বললাম, চমৎকার,—সত্যই আমার এখানে আসা সার্থক হলো।

তিনি বলিলেন,—সেটা তোমার কথা ;—আমার কথা এই যে, ঈশ্বর লাভের জন্য কারো কিছু করবার নেই, যথাকালেই ওটা হয়। শুধু অহম্ সত্তার পানে লক্ষ্য রাখাই কাজ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসও এই কথাটি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবেই বলেছেন, তাই সাধারণ মানুষে ধরতে পারেনি। এই কথাটি আমি তখন বললাম।

সাধু বলিলেন ;—সকল আপ্তপুরুষের শেষ কথাটি একই। তবে রামকৃষ্ণদেব ঐ 'আমি' নিয়ে সাধারণকে একটু ধোঁকায় ফেলেচেন।

আপনি কেমন করে জানলেন ?

শান্তিনিকেতনে যখন ছিলাম, ওখানকার পণ্ডিতের কাছে ঐ কথা শুনি। তিনি আমায় বাংলা থেকে তাঁর মুখের ভারবেটিম কথাগুলি শুনিয়ে ইংরাজিতে

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাইতেই বুঝেছিলাম যে তিনি আমিকে নিয়ে সাধারণের অহমিকার নির্ঘাৎ কুফল থেকে বাঁচাতেই ঐ ভাবে বুঝিয়েচেন।

কিন্তু তিনি একথাও বলেচেন,—আত্মা-ব্রহ্ম-ভগবান একই।

এই 'আমি' যার নামরূপাদির সঙ্গে এই সংসার ভোগ চলচে, সেই আমিই যে অপরদিকে নামরূপহীন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এটা বিশদভাবে কোথাও বুঝিয়ে দেননি।

কেন দেবেন না ;—পাত্র বা আধার হিসাবেই বুঝিয়েছেন। ঐ তো সদগুরুরই কাজ ;—যাকে তাকে অথবা সকল ক্ষেত্রেই একভাবেই বলে দেবার কথা তো নয় এটা, মূলতত্ত্ব কি সবার কাছে খোলা যায় ? তাইতে ফল খারাপ হয় যে ;—একথা ঠাকুর যেমন চমৎকার বুঝতেন এমন তো আর কাকেও দেখলাম না। কে কোন্ ভাবে তত্ত্বজ্ঞান নিতে পারবে তার হিসাব আছে তো ?

আমার এই কথাটিতে ফিরঙ্গ-বাবা যেন চিন্তিত হলেন ;—কতক্ষণ পর বললেন,—সত্য তত্ত্ব একই ভাবে, একই পদ্ধতিতে বলা বা প্রচার করাই উচিত —তা হলে কোথাও কোন গরমিলের আশংকা থাকে না ; আমরা তো এই রকমই বুঝি। দেখ, মহর্ষি রমণ কোথাও কারো কাছে দু'রকম বলেন নি ; যাকে বলেছেন ঐ 'আমি'কে ধরতেই বলেছেন ;—অন্য কোন ভাবে অন্য অর্থে ব্যবহার করেন নি, তাইতে তাঁর কাজ সোজাই হতে পেরেচে। সকলকার কাছেই একই রকম।

কিন্তু সকল মানুষের মন বুদ্ধি তো একই রকম নয়, কেউ সোজা বোঝে, কারো সেণ্টিমেণ্ট, ভাবধারা অন্যরকম ;—কারো রূপে বিশ্বাস, কারো নিরাকার চৈতন্যের উপর লক্ষ্য ; এই সব ভিন্ন ভিন্ন আধারে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার করা কি সহজ। কাজেই যার ভাবটি যেমন তাকে তেমনি করেই বলা ভালো। আসলে সবার মধ্যে সেই সত্ত্বা তো একই কিন্তু কেউ ভোগ চায় কেউ চায় ত্যাগ। আনন্দ উপলব্ধিটা সবারই একই বটে কিন্তু কর্ম-প্রকরণ, চিন্তা, জীবনধারা তো সবার এক ভাবেই চলে না।

কিন্তু ঐ আমিকে ধরেই তো সব ?

তবুও ঐ আমির প্রকারভেদ আছে তো ; সব আমি কি চৈতন্য সত্ত্বামাত্র লক্ষ্য করতে পারে। কোনো আমি প্রভু-ভৃত্য বা সন্তান আমি, এ ভাবটা ধরতে পারে কিন্তু আমি সেই অখন্ড সচ্চিদানন্দ এ ভাবতেই পারেনা। কাজেই আমির ব্যাপারটি জটিল বলেই সবাইকে তিনি আত্মতত্ত্বটি একই ভাবে বুঝাতে চাননি।

আসলে বুঝলাম, ফিরঙ্গ-বাবা—মহর্ষি রমণের টেক্‌নিকটাই ধরেচেন মন-প্রাণ দিয়ে, পরমহংসদেবকে ভাল করে গভীরভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পান নি। ফলে মহর্ষির উপরই তাঁর নিষ্ঠা প্রবল হতে পেরেছে, তাইতে তাঁর লাভও অনেক হয়েছে। জীবিত ভগবানকে পাওয়ার ঐটিই মুখ্য লাভ, প্রত্যক্ষানুভূতি। এখন আমায় একটু ভাবতে দেখেই বললেন ; আপনি হয়তো ভাবচেন আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর অবিচার করচি।

আমি বলতে বাধ্য হলাম ; ঠিক তা আমি মনে করিনি তবে আমি আসল কারণটা, অর্থাৎ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে আপনার ভাল রকম না জানবার আলোচনা করছিলাম মনে মনে।

কি রকম ?—

আপনি রমণ মহর্ষিকে সশরীরে জীবন্ত পেয়েছেন, তাঁর পার্সোন্যাল ম্যাগনেটিসম-এর মধ্যে পড়েছেন তাইতে তাঁর প্রভাবের যতটা সম্ভব অনুভব করেচেন ; পরমহংসদেবের সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি উপদেশ বা তত্ত্বকথা পড়েছেন এবং শুনেছেন। তার মধ্যে—

এটা সত্য বটে, তা ছাড়াও একটি বিষয়ে দুজনের বহুতর প্রভেদ ছিল সেটাও কম গভীর তত্ত্ব নয়। সেটা কি আপনি বুঝেছেন ?

আপনি, দুইজনের জীবন এবং সাধনের তারতম্যের কথা যদি ধরতে পেরে থাকেন,—তা হলে হয়তো আমি বুঝেছি মনে হয়।

ঠিকই এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। দুই মূর্তির সাধনের পার্থক্য, —আর সে পার্থক্য বিষম এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর আমার বিশ্বাস সেটা আপনি ভাল জানেন এবং বুঝেচেন আমার চেয়ে।

কেন, বলুন তো ? তিনি বলিলেন,—প্রথমতঃ আপনি পরমহংসের স্বদেশবাসী বলে : দ্বিতীয়তঃ—আপনি তাঁর প্রতি গভীর ভক্তিমান বলে ; তৃতীয়তঃ—আমার বোধহয় আপনি তাঁর সত্ত্বার মধ্যে প্রবেশ করেছেন,—এই আমার বিশ্বাস।

চমৎকার আপনার বিশ্লেষণ ; একটা আনন্দের শিহরণ আমার মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেল ; তিনি সেটি লক্ষ্য করলেন। বললেন এখন আপনিই বলুন পরমহংসের সাধনের মূল কথাটা।

বললাম ; প্রথমতঃ ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস নিয়েই তাঁর জীবনারম্ভ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে যারা যতরকমে ঈশ্বর প্রণিধান করেচেন তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করেচেন ; যথাকালে যখন তাঁর নিজ প্রবল ব্যাকুলতার ফলে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হলো ; তার সেই প্রবল ধাক্কা সামলাতে তাঁর কিছুকাল গিয়েছিল। তার পর, ভারতের যতগুলি ধর্মসম্প্রদায়, তাঁদের প্রত্যেকটির সাধন-পদ্ধতি তিনি যথারীতি এবং যথাশাস্ত্র সাধনের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। এই ভাবে প্রায় বারো বৎসর সাধনের পর তিনি সবার আকর্ষণের বস্তু হয়েছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল ভাবের ঈশ্বর-বিশ্বাসীর গুরু বা উপদেষ্টার আসনে বসবার অধিকারী হয়েছিলেন। এইখানেই মহর্ষি রমণের সঙ্গে তাঁর একটু তফাৎ—তিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক সকলেরই সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারতেন, সেইটিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিলাস ছিল। মহর্ষির অধিকারে যাঁরা এসে পড়েছেন তাঁরা তাঁর পদ্ধতি অধ্যাত্ম অনুভূতি নিয়েই মশগুল ; অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলবার প্রবৃত্তিই নেই তাদের। অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়কে তাঁরা কি চক্ষে দেখেন তা আমি জানিনা।

তিনি বললেন—আচ্ছা, আপনি যেভাবে বললেন, তার মধ্যে যেন একটু দ্বেষভাব না হলেও পক্ষপাতিত্ব রয়েচে মনে হয়। আমি বললাম—কি রকম, একটু খুলে বলুন তো !

—আপনি যেন রামকৃষ্ণকেই বড় এবং শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন।

—তা হলে বলি শুনুন ;—আমার ধারণা মহর্ষির আত্মতত্ত্ব, যা তিনি যথাকালে অনুভব করতে আরম্ভ করলেন, তারপর যতই প্রবলতর প্রেরণা তাঁর মধ্যে এলো তিনিও গৃহত্যাগ করে নিজ আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ একটি স্থান নির্বাচন করে ব্যাকুল প্রাণে ঐখানেই এসে জমে গেলেন। রামকৃষ্ণেরও তাই

হয়েছিল। মনোমত বিশেষ একটি স্থান চাই,—এ সব কাজ নিজ সংসারে হবার নয়। তারপর যেসব সিদ্ধ যোগি মহাত্মার সঙ্গে দেখাশুনা হলো তাঁদের ভাব তিনি নিজ অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তার পর সিদ্ধাবস্থা এলে তখন উপদেষ্টারূপে যাদের মধ্যে তত্ত্বানুভূতি লাভের সহায়তা করলেন তারা ঠিক তাঁরই প্রবর্তিত ধারায় চলেছিল। অনেকগুলি ব্যাকুল জ্ঞানান্বেষী উরোপীয় অনুসন্ধিৎসুর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ। সব বিষয়ে দুজনে একই ভাবে জীবনের কতকাংশ কাটিয়েচেন। আমি এঁদের কাকেও ছোট কাকেও বড় করতেই পারি না। কারণ দুজনের প্রকাশ বা প্রচার-প্রণালী বাইরে দেখতে, ক্ষেত্র বিশেষের জন্যই দেশ-কাল-পাত্র পৃথক হলেও তত্ত্বলাভ একই এবং সার বস্তু নিয়েই। পরমহংস বলেচেন,—যে যেভাবেই ধরুক না কেন সবই ঠিক, কারণ তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু এখানে নেই, আর মহর্ষি বলেচেন আমি-কে ধরলেই সব পাওয়া যাবে যাতে মানব জন্ম সার্থক হয়। পরমহংসও বলেচেন —আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম একই বস্তু। তা হলে বলুন, আমি কাকে বড় বা শ্রেষ্ঠ বলবো ?

সাধু বললেন—এতক্ষণে পরিষ্কার হোলো তোমার কথাটা, আমি সুখী হয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আমি সেই সুখের ভাগি খানিকটা তো হয়েইচি। আসল কথা, আপনি জীবন্ত পেয়েছেন মহর্ষিকে, জীবন্ত গুরুর কাছ থেকে, সকল অনুভূতিই জীবন্তভাবেই ধরেছেন, কাজেই আপনার লাভ অনেক বেশী।

তিনি বললেন ;—তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার অধিকার তার বেশী তো আমার পাবার কথা নয় ; তাই আমার মনে হয় ভারতের একটি সাধারণ মানুষের যতটা জ্ঞান, অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথাই বলচি—আমার জ্ঞান তার চেয়ে অনেক কমই।

আসলে কম বেশীর প্রশ্নই আসে না এখানে। আমার মনে হয় এটা আপনার বিনয়। শুধুই বিনয় ঠিক না হলেও খানিক ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাও থাকতে পারে এর মধ্যে ; তাইতেই এতটা বাড়িয়ে বলে থাকবেন। না হলে আপনি এটি নিশ্চিত জানেন, এক জন ভারতের সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেচে বলেই সত্য সত্যই অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন হবার সম্ভাবনা কত কম। শুনেই তিনি বললেন ;—এ কথা সমর্থন অথবা প্রতিবাদ করবার কোন চেষ্টা না করেই আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি—বলো তো, ভারতের সাধারণ লোক ধর্ম সম্বন্ধে একটা সহজ সংস্কার নিয়ে জন্মায় কিনা ? আমাদের দেশে যেমন সাধারণ জাতক, কর্মশক্তি, সুখ, দুঃখ ও দ্বন্দ্বময় জীবনের সংস্কার নিয়ে জন্মায় ?

সেদিক থেকে হয়তো আপনার কথাই ঠিক মনে হয়। এক সময় ছিল যখন আপনার বক্তব্য বিষয়টি সত্য মনে করবার কারণ হয়তো ছিল, কিন্তু আজ বোধহয় পাঁচ শত বৎসর ধরে প্রবল রাজনীতিক অধঃপতনের ফলে তা আমরা হারিয়ে বসে আছি। এটা সাধারণের কথাই বলছি।

সেইদিন রাত্রে ভোজনের পর আবার যমুনা মায়ীর সঙ্গে কথা ;—এবার প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন বিবাহ করেছি কি না ? উত্তরে আমার বিবাহিত জীবনের সেই প্রথম বিবাহ থেকে সকল কথাই বলতে হোলো। তিনি স্থির সমাহিত চিত্তেই শুনিলেন। শেষে বলিলেন,—

এখন তুমি ইচ্ছামত ঘুরেই বেড়াও আর যাই করো না কেন, তোমার মধ্যে জীবসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখচি প্রবলই রয়েচে বলতে হবে। পরমাত্মার ইচ্ছায় আবার ভালো ভাবেই ঘর সংসার করতে হবে, ছাড়বেনা, জেনে রাখো, নাম, যশ ও সিদ্ধির পথে অনেক কাজই আছে তোমার ; তবে এটি প্রত্যক্ষই দেখছি বর্তমানে এখন তোমার উন্নত জীবনের সব লক্ষণই বর্তমান।

ঘরে ফিরে গিয়ে সন্তান-সৃষ্টি আর গৃহাস্থাশ্রমে জীবন কাটানোর নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখেও তাকে উন্নত জীবনের লক্ষণ বলচেন আপনি ?

তোমার মতে কি গার্হস্থ্যজীবন ছেড়ে বাইরে দূর দূরান্তরে ঘুরে সাধুসঙ্গ তারপর হিমালয়ের আশ্রয় নির্মাণ করাটাই উন্নত জীবন নাকি? তাইতে তোমার লাভ কতটুকু ভেবে দেখেচ ?

আমি বুঝতে পারলাম না স্ত্রী নিয়ে ঘর করা, সন্তান-সৃষ্টি, সংসার প্রতিপালন এটাই বা কি করে উন্নত জীবন হতে পারে। ঐ যদি উন্নত জীবন হয় তাহলে হেয় জীবনটা কি ?

যমুনা মায়ী একটু যেন বিরস বদনেই কতকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, যেন একটু ভাবিলেন, তারপর বলিলেন ;—এখানে জীবমাত্রেই কর্মাধীন, মানো ? কর্মের ফলাফল আছে আর সেটা কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হয়, মানো এসব কর্মতত্ত্ব ?

বললাম, যারা কর্মত্যাগ ক'রে অধ্যাত্ম জীবন নিয়ে চলচে ?

যে কর্মের ফলগুলি এখনও ভোগ হয়নি,—সে কর্মপথ পরিষ্কার না হলে ঊর্ধ্বগতি আটকায়, এসব বোধ হয় এখনও পর্যন্ত কারো কাছে শোনোনি।

কি করে আটকাবে সেটা বুঝতে পারিনি ; যদি আমি অনন্যমনা হয়েই অধ্যাত্মমার্গে ডুবে যেতে পারি তাহলে-

হাঁ, অনন্যকর্মা হয়ে ডুবে গেলে হয় তো সব কিছু সঞ্চিত কর্ম ছাই করে দিতে পারবে ; কিন্তু এমন সব কর্ম আছে যাতে তোমায় অনন্যমনা হ'তে দেবে না সে খবর রাখো কি ?

সেটা কি রকম, বুঝলাম না।

তুমি তো সন্তান-সৃষ্টি, সংসার-কর্ম এসব হেয় বলে ছাড়তে চাও, কিন্তু কতকগুলি জীবের সঙ্গে তোমার কর্মসূত্র এমন বাঁধা আছে--তাদের এখানে আসতেই হবে তাদের কর্ম ও ধর্ম-জীবনের চক্র সম্পূর্ণ করতে। তাদের সৃষ্টি করবার দায়িত্ব যে তোমার রয়েছে ; তারা যে তোমার ভালবাসা বা প্রীতির টানে তোমার শক্তিতেই পয়দা হয়ে জীবন আরম্ভ চায়, তাদের এড়িয়ে আত্মতত্ত্বে সমাধিস্থ হয়ে থাকলে চলবে কেন ? ওগুলি শেষ হলে তবেই না তোমার সমাধির পথ সহজ হবে। তখনই তোমার ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময়ের সঙ্গে এক হতে পারবে।

আপনি এই সব কর্মকাণ্ডের কথা বলচেন, সত্যই কি এই নিয়ে একজনের জীবনে অধ্যাত্ম পথে এত বাধা সৃষ্টি করে ?

বাধা বলছো কেন, পথ নির্বিঘ্ন হওয়াটা কি বাধা ?

ধরুন, যদি আমি আবার সংসারে ফিরে না যাই ?

আহা, সংসারে ফিরে না যাই নয়,—সংসারের বাকী বা অবশিষ্ট কর্ম সম্পূর্ণ করতে যাই বলো। তোমায় যেতেই হবে, ঐ সকল কাজ শেষ না হলে তোমায় ছাড়চে কে ? তোমায় নিয়তির বিধানে করতেই হবে।

এ তো বড় ভয়ংকর !

না না, অত ভয়ঙ্কর বলে দেখচো কেন ? তোমার সহজ জীবনধারার সঙ্গে সবটাই দেখবে না, মিলিয়ে এক ক'রে নেবে না ?

তা শুনে আমি বললাম—

এই যে আমার দীক্ষা, গুরুলাভ, সাধন তত্ত্বানুভূতি,—এর এই স্বর্গের, আনন্দ ছেড়ে দিয়ে আবার পশু-জীবন সংসার—

না না, ও ভাবে দেখো না। পশুজীবন নয় তোমার এই স্ফুরণ, আনন্দময় আত্মিক সাধন জীবনের যা-কিছু লাভ—যা-কিছু আকর্ষণ, এ সব তো তোমার সঙ্গেই থাকচে ;—তোমার উপার্জিত যা-কিছু তোমার সঙ্গেই তো রয়েচে ; এ তোমার পতন নয়, বরং উন্নত জীবনই বলতে হবে। আর তাইতো আমি বলেছিলাম।

এ এক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি,—অদ্ভুত !

আর আমার কথা যোগাল না—মুখটি আমার বন্ধ হয়ে গেল ;—বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো,—ভিতরটা মোচড় দিয়ে চক্ষু দিয়ে ধারা হয়ে নামতে আরম্ভ করলে। আমি সংযত হতেই পারলাম না।

আমার অবস্থা দেখে যমুনা মায়ী বললেন, এ কি পাগল ছেলে ; যদি এসব তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে না নিতে পারো তা হলে নিছক তোমার অধ্যাত্ম অস্তিত্বটুকু নিয়ে কেমন করে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্ব-আত্মার মধ্যে ? সেই জন্ম থেকে এখানে কর্ম-জীবনের সবটা নিয়েই তো তোমার ধর্ম-জীবন ; খানিক বাদ দিলে কি পরমাত্মার লীলা তোমার জীবনের ঘটিতে সম্পূর্ণ ফল দেবে, এ লীলা কি তোমার ব্যক্তিগত ? এ যে তারই লীলা, তোমার জৈবিক অস্তিত্ব নিয়েই তাঁর খেলায় কি কোন রকমে কোথাও ফাঁক আছে ? বোঝো তো, তারপর ডুবে যাও দিকি। এখান থেকে উঠবার আগে সব কিছু বিজ্ঞান চৈতন্যের অধিকারে মিলিয়ে নাও। আনন্দ সম্পূর্ণ করো। এটা মেনো যতই সমাধিবান পুরুষ হওনা, কেন তুমি, তোমার জন্ম থেকে সকল কিছু নিয়েই তোমার তুমি ; খানিক বাদ দিয়ে, খানিক ধরে নয়।

পরদিন ভোজনের পর যমুনা মায়ীর সঙ্গে আবার দেখা।

এখন আর কোন সঙ্কোচই রইল না, আমি অকপটেই প্রাণের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম ;—

আপনি কিভাবে দেখচেন জানিনা, আমার তো বর্তমান অবস্থাটা বড়ই কষ্টকর হয়েছে। দীক্ষার পর কয়েক বৎসর মহাআনন্দেই কাটিয়েছি ; কিন্তু আজ কিছুদিন থেকে আমার মধ্যে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আর সেই উদ্দেশ্যেই আমি একটু বেশী সাধু খুঁজতে আরম্ভ করেচি। যখনই কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গ পাই, আশা হয়, এইবার আমার সাধনার পূর্বধারা, যেটা হারিয়েছি আবার ফিরে পাবো এই মহাত্মার কৃপায় ;—কিন্তু দিন যায়, সে ভাবই আর আসেনা, সেই সাধুর উপর অশ্রদ্ধা আসে। আবার খুঁজতে আরম্ভ করি—ভাগ্য-ক্রমে যদি আর কাকেও পাই। পেয়েছিলাম একজনকে সম্প্রতি ;—প্রথমে বিশ্বাস হয়েছিল, তারপর দেখলাম কতকগুলি ফাঁকা কথা বলে তিনি এড়াবার চেষ্টা করলেন, আর বেশী কিছু ভিতরের কথা প্রকাশ করলেন না।

কেন বলতো ?

পাছে তাঁর গুহ্য সাধন রহস্য আমি গ্রহণ করতে না পারি। শুনিয়া যমুনা মায়ী বলিলেন,—তা ঠিক নয়, ওটা আসলে তোমার পথ আলাদা বলেই। আরও একটা গুহ্য কথা এর মধ্যে আছে সে কথা তুমি জানো না এই ঈশ্বর সাধনের পথে।

বলুন, সেটা কি? উত্তরে বললেন, কেউ কাকেও ঠেলে তুলে দিতে পারে না সিদ্ধির পথে, এটা জানো কি? সম্পূর্ণই নিজের দায়ীত্বেই যেতে হয়।

তবে গুরুকরণ, দীক্ষালাভ সেই মত সাধনা কেন?

ওটা যে করে সেটা তার বিশ্বাসের জন্য। নিজ পথ ধরবার জন্য ওটা আরম্ভ। তাঁর উপদেশ তোমার মধ্যে সার্থক হলে,—তুমি যদি তা'তে আত্ম-সমর্পণ করে স্বীকার করে নাও যে ইঁনিই তোমার যথার্থই ইষ্টগুরু, নিশ্চিত সহায় ইষ্ট, ভগবান লাভের একমাত্র সহায়, তাইতেই তোমার শান্তি আসবে, এ সবই অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে কথা, যথার্থ বিশ্বাসের উপরেই ওটা নির্ভর করে।

গুরুলাভ ভাগ্যের কথা, সেই গুরুর কথাই বলচি—

অর্থাৎ তোমার আত্মসমর্পণের যোগ্য পাত্র, যেহেতু তুমি দুর্বল, নিজ শক্তিতে অ-বিশ্বাসী,—যা পেয়েছ তাই নিয়ে নিজ শক্তিতে এগিয়ে যেতে পারছো না, তাই আত্মসমর্পণের সাহায্যেই সম্পূর্ণ করতে চাও। তবে আমার মনে হয়েছে তোমার বিষয়ে কথাটা স্বতন্ত্র।

বলুন দেবী, আমায় সবটাই বলুন, বাকী রাখবেন না কিছু।

সাধন পথে মধ্যে মধ্যে ঐ রকম অবস্থা হয়। সকল সাধকেরই ইষ্টলাভের পথে হয়ে থাকে, যে যত শক্তিশালী তার ততই ঐ অবস্থাটি হয়। মনে হয় তখন খেই হারিয়ে গিয়েছে, আমি আর পারচি না, আমার শক্তিতে আর কুলাচ্চেনা। কাকেও এমন যদি পাই, ইত্যাদি,—সব যা তোমার এখন চলছে—

আমার যে কি হলো এই কথাটি শুনে তা আর বলতেই পারবো না। শুধু অন্তরে মনে হলো,—জয় মা।

শেষদিকে যমুনা মায়ী কয়েকটি বিশেষ কথা বলিলেন,—নিজের সাধন পথ গুহ্য থাকাই ভালো, তাইতো নিজের মধ্যে আত্মশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় কথা বলিলেন ; সাধুর মতো বেশভূষা দেখে, সাধু মনে করে তার কাছে নিজ সাধন কথা প্রকাশ করা ক্ষতিকর ;—একজন আর একজনের মনের গতি বুঝতে পারে না,—সাধু হলেও পারে না। সাধারণতঃ যারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে চলাফেরা করচে, যতদিন না সিদ্ধি আসে ততদিন তাদের ঠিক চিনতেও পারা যায় না। আর নিজের মনের গোল সম্পূর্ণ না কাটলেও তো ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নেই, অতএব সাবধান।

এখন বুঝিলাম আমি কতটা দুর্বল, তাই প্রথমে নিজের কথাটা যমুনা মায়ীর কাছে খুলিয়া বলিতে পারি নাই ; তিনি দয়াময়ী, নিজগুণে চমৎকার আমার অন্তরের কথা বাহির করিয়া লইলেন। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা হইল—কেহ কাহাকেও সিদ্ধি দিতে পারে না, আত্ম-শক্তিতেই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে এবং লাভ করিতে হয়। অবশ্য এক সময়ে মধ্যাবস্থায় সংকট আছে, তখন সবকিছু যেন গুলাইয়া যায়,— ফলে আত্মশক্তির উপর আস্থা থাকে না, মনে হয় যেন আমি পারিব না;—তাই অন্য কোন শক্তিমান, যিনি আমায় উদ্ধার করিবেন এমন কারো সন্ধানে প্রবৃত্ত করে। তখনই ইষ্টকে জোর করিয়া ধরিতে হয়, ছাড়িতে নাই। যথাকালে ঠিক সে সংকটকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আবার

নিজপথে আনন্দেই চলিতে শক্তি পাওয়া যায়। এ সকল অবস্থার কথা কাহাকেও বলিবার নয়। আমার ইষ্ট এবং আমি, মধ্যে আর কাহারও স্থান নাই, এ রাজ্যের সার কথা। তারপর—

একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমায় দেখিলেন, যেন অন্তর ভেদ করিয়া ভিতরের ভাববস্তু এবং আমার মধ্যে আত্মনির্ভরতা কতটা, যেন বুঝিলেন ;— যমুনা মায়ী তারপর বলিতেছেন—

দেখ বাবা,—এক শ্রেণীর জ্ঞানমার্গের জীব আছেন তাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও বিচারের প্রবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা শূন্য হইয়া আবাল্য ঐ পথে চলিতেই অভ্যস্ত। কোন ব্যক্তি বা সাধকের কাছে কখনও নতি স্বীকার করিবেন না। গোড়া থেকেই আত্মশক্তিতে নির্ভর করে নিজ সিদ্ধির অবস্থায় পেঁাছে গিয়েছেন, গভীর আত্মতত্ত্ব নিজ শক্তিতেই পেয়ে গিয়েছেন এমনও আছেন এখানে ;— যেমন মহর্ষি রমণ।

এখানে এই ফিরঙ্গবাবা ও যমুনা মায়ীর সঙ্গে দেখা আমার জীবনের বড় লাভ। পরদিন প্রভাতেই আমরা বিদায় নিলাম।

বিধি নির্বন্ধ

প্রায় বারো বৎসর আগের কথা,—প্রথমে নোয়াখালির ঘটনা তারপর পাকিস্তানের রিফুজিদের শিয়ালদা স্টেশনে অধিষ্ঠান যারা দেখেছেন, সেকথা তাঁদের স্মৃতির মধ্যে আর এনে দিতে চাই না। শুধু আমার কথাই বলচি, নিত্য নিত্য ঐ নাটক চক্ষে দেখা ও শোনা অথচ প্রতিকারের হাত নেই,—ফলে এমনই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে,—কলকাতা থেকে পালাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। কিন্তু কোথায় যাবো, এইটিই ছিল আসল কথা।

যিনি সবার মনের খবর রাখেন তিনিই বুঝি এবার আমার প্রতি সদয় হলেন ;—তমলুক থেকে যোগজীবনের একখানি পোস্টকার্ডে পত্র এলো ; তিনি লিখেচেন, দুই তিন দিনের মধ্যে যদি এসে পড়তে পারো তো একবার দেখা হবে। শীঘ্রই বিন্ধ্যাচল যাবো।

এই তো চাইছিলুম। তমলুক বহু প্রাচীন স্থান, মেদনীপুরে একটি বিখ্যাত তীর্থ, বর্গভীমার ক্ষেত্র, আগে কখনও যাইনি। সুতরাং প্রবল একটা উৎসাহ আর আনন্দে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন সকালেই হাওড়া স্টেশনে পেঁাছে গেলাম। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর একখানি পাঁশকুড়ার টিকিট কেটে, সাড়ে সাতটার ট্রেনে উঠে বসলাম। কামরায় ভীড় ছিল, তবুও জানলার ধারে জায়গাও পেলাম। বসে একবার চেয়ে দেখলাম ঘরের ভিতরে লোক সমষ্টি। গাড়ি অবশ্য যথাকালে ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের সামনের বেঞ্চে একটি গম্ভীর মূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, হাতকাটা ব্যানিয়ান গায়ে, থান কাপড় পরা, ডানহাতে বিঁড়ি, বাঁ-হাতে কাগজখানা,— কোলের উপর রেখে কি যেন ভাবছিলেন। তাঁর পাশেই বোধ হয় তাঁর স্ত্রী, সুন্দর মূর্তি, প্রৌঢ়া, ম্লানমুখে বসেছিলেন। হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথায় সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। তার পাশেই ঐ অল্প স্থানের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে একটি

মেয়ে ; আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যেই বয়স, মায়ের মতই সুন্দর মুখ। কিন্তু বিষম ভাবটাই প্রকট যুমন্ত সেই মুখের পানে তাকালেই বুঝা যায়। তারও নীল রংয়ের কাঁচের চুড়ি। গাড়ির ভিতরে আমার দেখা এই পর্যন্তই। তারপর পাশ দিকে জানালার পাশে আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে পড়লো,—গাছপালা জঙ্গল-ঘেরা গ্রাম, আর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের দৃশ্য। দ্রুত অতিক্রমের মধ্যে আপন চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ইতিমধ্যে অনেক সময় কেটে গিয়ে থাকবে। গড় গড় গড় গড় শব্দে চেয়ে দেখি গাড়ি রূপনারায়ণের সেতুর উপর দিয়ে চলছে। ভিতরে দেখলাম,—এবার মেয়েটি উঠে বসেছে, আর মা তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন,—দেখতে দেখতে কোলাঘাটে এসে দাঁড়ালো ট্রেনখানা।

ভদ্রলোক এবার উঠে বাইরে গেলেন, কিছু কলা আর পেয়ারা সওদা করে নিয়ে এলেন। এবার তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন, তাইতে বুঝলাম এঁরা পূর্ববঙ্গের লোক। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় নামবো। পাঁশকুড়া শুনেই দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সেখান থেকে কোথা যাবো ; তমলুক, শুনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, আবার বললেন,—ওখানে জে, এন, চোন্দারকে চেনেন, ওখানকার সাব্ ডেপুটি। বললাম, এই প্রথম তমলুক যাচ্ছি, কাকেও চিনি না।

তবে থাকবেন কোথা ?—বললাম ;—বর্গভীমা দেবীর মন্দিরে একজন সাধু থাকেন তাঁর কাছেই যাচ্চি। তবুও প্রশ্ন শেষ হলনা ; তিনি কি আপনার পূর্ব-পরিচিত ?

হাঁ, তিনি আমার গুরুভাই, ভালোবাসেন, ডেকেছেন তাই যাচ্ছি। অঃ ! এবার আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল ; কতক্ষণ পর তিনি বললেন,—

যোগেন্দ্র চোন্দার আমার ভাইয়ের জামাই। এখন তার ওখানে যাবো বলেই বেরিয়েচি,—কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে তিনি ওখানে আছেন কি না ? পত্রে খোঁজ খবর করে যাচ্চি না, বড় অসুবিধার মধ্যেই যাচ্চি—এই হয়েছে মুস্কিল। তবে তাঁর একটা ঠিকানা পাবোই,—তাই ভেবেছি—

বাপের কথা শুনে মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। দেখলাম বিরক্তিতে মুখখানি তার বিকৃত হয়েছে,—স্থানকাল উপেক্ষা করে অস্বাভাবিক চিৎকার করে বললে,—আমি তো আপনাকে বারবার নিষেধ করে বলেছিলাম না, ওসব লোকের কাছে না জানিয়ে, আগে ব্যবস্থা না করে গেলে ভালো হবে না ; তিনি কি আপনাকে এক সময়,—

হঠাৎ যেন দম ফুরিয়ে গেল, মেয়েটি আর কথাই বললে না। বাপ অল্পক্ষণ তার দিকে চেয়েই রইলেন, তারপর যেন মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন ; চিঠিপত্র দিয়ে যেতে গেলে আরও তিন চারদিন বিলম্ব হয়ে যেতো না, অতদিন থাকতাম কোথায় আমরা ? মেয়েটি তীব্রকণ্ঠে বললে,—কেন, যেখানে দেশের এত লোক রয়েচে ! বাপ বললেন,—সেই শিয়ালদহ স্টেশনে,—ওখানে কখনও ভদ্রলোক থাকতে পারে ? একদিন ও এক রাত্রি থেকে তো দেখেচ, তোমরা। তবুও মেয়েটি বললে,—হোটেলেও দু চারদিন থাকা যেতো।

আমাদের বেঞ্চের একটি লোক তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা পূর্ব-বঙ্গ থেকেই আসছেন বোধ হয় ? শুনেই ভদ্রলোক যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন, কতক্ষণ নির্বাক, সবাই তাঁর কথা শুনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ। হঠাৎ একটা

দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। ভদ্রলোকের মুখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি,—এখন বললেন ;—হাঁ, পূর্ববঙ্গ থেকেই আসচি ;—সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে, সর্বনাশের চরম করেই এই তিনটি প্রাণী আমরা বেঁচে আসচি; কিন্তু যে প্রাণ সেখানে খোয়ায়ে এসেছি ;—ও হো—ভগবান—

আর কথার কিছুই রইল না ; বললাম—থাক্, থাক্, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, বুঝেচি। এবার তিনি যেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, একটা ধমক দিয়েই বললেন ;—কি বুঝেছেন ? কিছুই বুঝেন নাই, —কি করে বুঝিবেন, আমি মহিমাচরণ রায় ভৌমিক, গ্রামে আমার প্রতিপত্তির কথা—কল্পনাও করতে পারবেন না। ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে,—এম. এ. তারপর গত বৎসর ল পাশ করে উকিল হয়ে বেরিয়েছিল। কলকাতার বাসায় তখন সে, দেশের খবর কিছুই জানতো না, পরে লোকমুখে খবর শুনে আমাদের কলকাতায় নিয়ে আসবে বোলে দেশে এলো। আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের গ্রামে তখনও পর্যন্ত আমার দাপটে কেউ মাথা তুলতেই পারেনি। গান, রাইফেল রিভলভার সব হাতে হাতে ফিরতো। কোন গোলমাল কল্পনাও করতে পারিনি। ছেলে গেল একেবারে ফেরবার নৌকা ঠিক করে,—সেই রাত্রেই আমাদের নিয়ে আসবে। আমি বললাম, এত তাড়া কেন, এখানে কিছুই হয়নি, আর আমি তো রয়েচি, দু চারদিন থাকো, দেশে এসেছ যখন। ছেলে বলে, আমি যেসব কথা শুনেছি সে খবর রাত্রে নৌকোয় বলবো। চলুন, আর এখানে থাকা এক রাত্রিও নিরাপদ নয়। এদের ব্যাপার আপনি কিছুই জানেন না দেখছি।

সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে, যা কিছু নৌকায় নেবার মালপত্র সব চালান করে বাবা, মা আর বইনকে রেখে, নিজের স্ত্রী আর ঘুমন্ত এক বৎসরের খোকাকে আনতে আর পুরাতন চাকরের হাতে বাড়ীর সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে আসতে গেল ; আর ফিরে এলোনা। ইতিমধ্যে দেখি মাঝি নৌকা খুলে দিচ্ছে ;—বিশ্বাসী মাঝি, জানিনা সে কি দেখেছিল, বললে,—বাবু আর আসবে না, এখন আপনাদের প্রাণ বাঁচাতে পারলেই বাঁচি,—বলে খুলে দিলে নৌকা ; আমাদের হাঁ হাঁ করতে করতে খানিক বেড়ে গেল নৌকা,—তখন দেখি,—রক্তাক্ত দেহ, মাথাটা ঝুলছে,—নদীর পাড়ে এনে ফেলল, পাঁচ ছয় জন ছিল তারা,—তারপর নৌকার দিকে চেয়ে, হেই কর্তা ছেল্যারে লইয়া যান, বোলে সেই দেহটা দুজনে মিলে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নদীর জলে। নৌকা থেকে দশ বারো হাত তফাতে পড়লো। সঙ্গে আমার দুনলা বন্দুক দুটো, একটা রাইফেল হাতের কাছে। আমি নৌকা থেকেই দু তিনটাকে শেষ করতে পারতাম। স্ত্রী আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, আমাদের আর একজনকেও রাখবে না। মাঝি বললে, আমরা কেউ রক্ষে পাবো না ওদের হাত থেকে—আমি জড়ো হয়েই রইলাম। মাঝি প্রাণভয়ে আর দাঁড়ালো না ; সারারাত প্রাণপণে চালিয়ে ভোরের দিকে স্টেশনে পেঁৗছে দিলে। বাপ হয়ে চক্ষের সামনে দেখলাম আমার একমাত্র পুত্র-সন্তানের পরিণতি।

বেঞ্চে সবাই স্তম্ভিত। কারো মুখে বাক্য নাই। শোকের ছায়া যেন সবার মুখে, এদিকে গাড়ীও এখন ধীরে ধীরে পাঁশকুড়ায় এসে দাঁড়াল।

যারা নামবার তারা নামলো, আমিও নেমে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়ালাম। কর্তা ও গিন্নি নামলেন, মেয়েকে ডেকে এলেন, কিন্তু মেয়ে বসেই আছে, যেন মনেই নেই এখানে নামতে হবে। শেষে বাপ গিয়ে নামিয়ে আনলেন হাত ধরে।

দেখলাম মেয়েটি পীড়িত, না হয় অপ্রকৃতিস্থ। বাপ বললেন,—অনুমণি—অমন কর ক্যান্।

বাসে তমলুক ষোলো মাইল,—রাস্তা ভালো। আমরা এক গাড়িতেই উঠে তমলুকের বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে নামলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। এখানেও, সবাই নামবার পর অনুমণিকে ধরে নামাতে হলো। নেমেই প্রথমে মহিমাচরণবাবু, খোঁজ করলেন এখানকার সাবডেপুটি সাহেবের বাড়ী কোথা? তাড়াতাড়ি এক ভদ্রলোক এসে বললেন, আসুন আসুন আমি আপনাকে পেঁাছে দিচ্ছি, বোলে কর্তাকে উৎসাহিত করলেন। ভালোই হলো; আমি আর দাঁড়ালাম না। আসবার সময় নমস্কার করে মহিমাচরণ বাবু বললেন; আবার দেখা হবে হয়তো। আমি বললাম,—নিশ্চয়।

॥ ২ ॥

আশ্চর্য কীর্তি এই বর্গভীমার মন্দির, অনেক দূর হতেই দেখা যায়;—এ ধরণের মন্দির বাঙ্গলার কোথাও নেই। ভারতের কোন প্রদেশের মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের স্থাপত্যগত কোন সম্বন্ধই নেই। অনেকে বলেন, বৌদ্ধ স্তূপের উপরেই মন্দিরটি স্থাপিত, তাই অতটা উঁচু। মনে হয় এত উঁচু ভিতের উপর পুরীর মন্দির ছাড়া আর কোন মন্দির নেই। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও শুনেছি বৌদ্ধস্তূপের উপর নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরও কত দিনের তা কেউ হিসাব রাখেনি।

আশেপাশে অনেকগুলি বাড়ী, সবগুলিই পাণ্ডাদের অধিকারে, যাত্রি-নিবাস। তারই একখানিতে দোতলার উপরে বেশ বড় ঘরেই যোগজীবন থাকেন; এখানে তাঁর নাম যোগিবাবা। ইচ্ছা মত সকল ব্যবস্থাই করে নিয়েচেন, কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। আপন স্থানে আপন আসনে একলাই থাকেন। ঘরের সামনেই খানিক মুক্ত ছাদ, বেশ খোলা ম্যালা; তারই একদিকে সিঁড়ি, তাই ধরেই ওঠানামা করতে হয়। আমি যোগিবাবার সামনে গিয়ে নমস্কার করলাম;—একঘর লোক। তিনি বললেন, আমি জানতাম আজই তুমি আসবে।

পাশের ঘরেই সকল ব্যবস্থা ঠিক করাই ছিল আমার জন্য,—এখন কেবল বললেন, স্নানাহার ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের পর আবার যথাকালে দেখা হবে। তারপর বললেন,—আমার সামনে যাদের দেখচো তাদের সবার কাজ সেরে তবে আমার ছুটি। সবাই হেসে উঠলো, আমি চলে এলাম।

আমার বিশ্রামের দরকার ছিল না, মা জগদম্বার প্রসাদ পাবার পর আরামে না শুয়ে আমি নীচে এসে চারদিক দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তখন বেলা বারোটা হবে। দেখি মুটের মাথায় সব কিছু বস্তু, স্ত্রী এবং কন্যাসমেত মহিমাচরণ রায় মশাই যাত্রী-নিবাসে এসে ঢুকচেন। সঙ্গে অবশ্য পাণ্ডা আছে সেটা না বললেও চলে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন,—নাঃ, যোগেশ চোংদার গত মাসে বদলী হয়ে বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছে, এখন মা বর্গভীমার আশ্রয়ই নিলাম। দেখলাম অনুমণির চক্ষে আগুন জ্বলচে, মুখে বাক্য নেই। মা তার হাতখানি ধরেই আছেন।

মহিমাচরণকে বললাম,—বেশ করেচেন, এমন সুন্দর তীর্থ, এইখানেই থেকে যায়না কিছুদিন। তিনি বললেন,—আমি তাঁকে বাঁকুড়ার ঠিকানায় পত্র দিয়েই

এসেছি, দেখি কি উত্তর আসে, সেই বুঝেই ব্যবস্থা করবো,—এখন তো এই-খানেই থাকি।

বললাম, ঠিক আছে। ভদ্রলোক আমাদের খবর করলেন অর্থাৎ আমি কোন্ বাসায় থাকি—শেষে ঐ বাড়ির একখানি নীচের ঘরেই তাঁরা বাসা ঠিক করলেন। আসলে আমায় তিনি ছাড়তে চান না।

সন্ধ্যার পূর্বে দেখা হলো ; আবার তখন অনেক কথাই বললেন। আজ তো প্রসাদ খেয়েই কাটিয়ে দিলাম, কাল বাজার হাট রান্নাবান্না করা যাবে। মেয়ে কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই খায়নি, আজ তিন দিনের উপর উপবাসী। আমি বললাম, সে কি কথা, আপনি সেজন্য কি করছেন ?
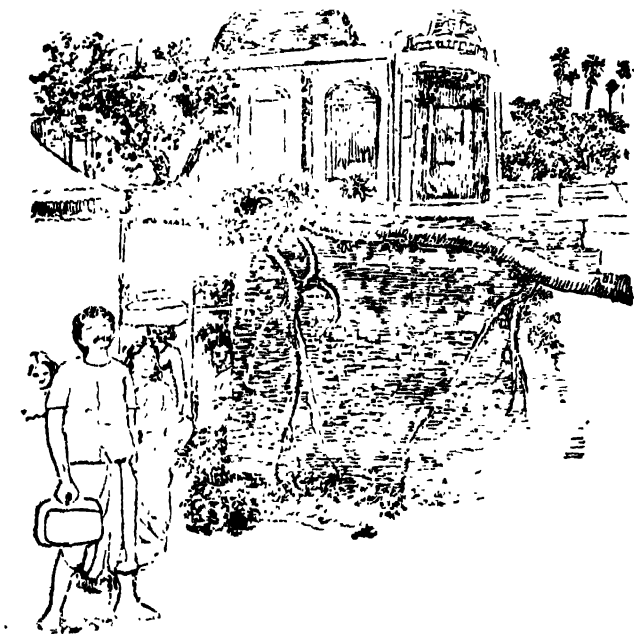
কি করবো, ও তো ছোট মেয়ে নয়। ওর রাগ আমার উপর। আমি কলকাতা থেকে হেতা চলে এসেচি ব'লে। তারপর যেন আপন মনেই বলচেন ;—কলকাতায় আমি থাকতেই পারবো না ; যেদিন এসেছি সেই দিন থেকে দেখতে বাকি রাখিনি ; যার যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব আছে সব গিয়ে উঠেচে, সব সংসার ভরতি। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেচে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি। আমরা কারো গলগ্রহ হবো না ; সেই জন্যই তো মেয়ের কথা না শুনে চলে এলাম হেথায়। যখন নিয়তি এনে ফেলেচেন এই মহামায়ার রাজ্যে তখন আর কোথাও যাবো না। কলকাতায় আমি থাকতে পারবো না। আমার ঐ একমাত্র ছেলের শ্বশুর বাড়ি, মুখ দেখাব কেমন করে! একখানা পত্রে সকল খবর লিখে গত কালই পোস্ট করে দিয়েছি। আমার পুত্রবধূর রূপ যদি দেখতেন,—ছেলে তাকে

দেখেই বিবাহ করেছিল। ভাবলে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। এই তো সংসার ;—নিয়তি কেন বাধ্যতে।

আমি শুনছিলাম,—ভাবছিলাম,—আমায়ও নিয়তির বিধানে যখন মহিমাচরণের সকল কথাই শুনতে হচ্ছে ;—তখন ভাল করেই শোনা যাক—যাতে কোথাও কিছু ফাঁক না যায়।

এবার গলাটা একটু খাটো করে বললেন,—এ সময়ে আপনার মত সদাশয় একজনকে পেয়েছি তাই বলচি, তাইতে মনে অনেকটা হাল্কা হতে পাচ্চি, এখন আমার বিশেষ কোন দুঃখ নেই, কেবল ঐ মেয়েটি কি করে বাঁচবে তাই হয়েছে সমস্যা। ও না খেয়ে মরবে ব'লে সেই রাত্রি থেকে আজ তিন দিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত গেলেনি। কেবল বলচে, আমার বাঁচবার কোন মানে হয় না। আজই ওর মাকে বলেচে, না খেয়ে মরতে দেরী হবে, আমি কেন এত দেরী করবো! কি জানি কি করবে কোন্ দিন।

আচ্ছা, আপনার ঐ সাধু বাবাকে একটু বলবেন, ওঁদের তো কত রকম তন্ত্রমন্ত্র সব জানা আছে ; কত শক্তি ওঁদের, যদি ওঁর পায়ে গিয়ে পড়ি, দয়া কি হবে না? বুঝতেই পারচি দৈব ব্যতীত আর কোন উপায় নেই।

মানুষ যখন বিপন্ন হয় তখন একটা কুটো হাতের কাছে পেলে তাই ধরেই বাঁচতে চায়। এখন বললাম—আচ্ছা, আমি বলবো তাঁকে আপনার কথা। বলেই উঠলাম, আর বসলাম না।

যোগজীবনের মূর্তি দেখলে শ্রদ্ধা হয়, প্রৌঢ় বয়স, প্রায় ষাট হবে কিন্তু শরীরের বাঁধন অটুট আছে, যোগীর শরীর—চুল বেশীর ভাগই পাকা, জটা বা বড় চুল নয়, বৎসরে একবার চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মুণ্ডন করেন, তারপর সারা বৎসর আর ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজন হয় না। এখন অক্টোবর মাস, বেশ বড় চুল ও গোঁফ দাড়ি ; কিন্তু কোন পারিপাট্য নেই। গোঁফ দাড়িটি খানিক শ্রীঅরবিন্দের মত। এখন আমায় দেখেই আসন থেকে উঠলেন, বাইরে এসে বললেন—

শোনো, এখানে আর বেশী দিন থাকা নয়, দেখচো তো একপাল এসে সকাল থেকে শুরু করেচে,—সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে থাকি, না হয় বেরিয়ে নদীতীরে চলে যাই। তুমি এসেছ ; এই কয়দিন থাকো, আমায় রক্ষা করো।

আমি বললাম, আগে তুমি তো আমায় রক্ষা করো—তারপর তোমার কথা ভাববো।

সে কি রকম ; তোমার আবার কি বিপদ হলো?

এখন ট্রেনে যা ঘটেছে, আগাগোড়া যেমন শুনেছিলাম এখন পর্যন্ত মহিমাচরণ বাবুর সব কথাই যোগিকে বললাম। শেষে বললাম, ভদ্রলোক তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন।

কি সর্বনাশ,—বলে যোগজীবন বসে পড়লেন। এ যে পরমহংসদেবের কেস, আমরা এর কি ট্রিটমেণ্ট করবো। তুমি এই সব সর্বনেশে ল্যাঠা জড়িয়ে নিয়ে আসবে জানলে কোন্ শালা তোমাকে আসতে লিখতো।

যখন এসে পড়েচি তখন আর চারা নেই, এখন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, অন্ততঃ সাধ্যানুসারে।

না হলে ঠাকুর দুঃখ পাবেন,—কেমন? বোলে যোগবাবা উঠলেন,—কিন্তু তাঁকে কোথাও যেতে হলো না ; সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন অধৈর্য

মহিমাচরণ স-স্ত্রীক, স-কন্যা এসে উঠলেন যোগিবাবার ঠিকানায় ;—আমরা আসতে পারি কি ?

আসুন, আসুন, বসুন। এইমাত্র এঁর কাছ থেকে সব কথা শুনলাম।

তাঁদের বসালেন ঐখানেই ; তারপর প্রায় বিশ মিনিট ধরে মহিমাচরণের সকল কথা, তাঁর কর্মজীবন—তাঁর এত দিনের সংসার-জীবনের নাড়ি-নক্ষত্র সব কিছুই বেশ বার করে নিলেন তার পেট থেকে। তাঁর এই অবস্থার মূল সূত্র যেন পেয়ে গেলেন। এতো কথা হলো কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে জন্য সাধুর কাছে আসা, মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই হলোনা। মহিমাচরণ তো নিজে থেকে কিছু বলতেই পারলেন না,—সাধুর কাছে এসে, প্রথম সম্ভাষণ থেকেই যেন কেমন হয়ে গেলেন। আর এটাও দেখলাম, যোগিও তাঁকে নিজ থেকে কিছু বলবার সুযোগই দিলেন না। অথচ মেয়েটি ঐখানেই বসে আছে ; একমনে সাধুর কথা শুনচে। নিজে থেকে সেক্ষেত্রে কোন কথা তোলা আমার ভাল মনে হলো না। যোগীও ঐ মেয়ের সম্বন্ধে আমার মুখে সবই শুনেছিলেন তিনিও কিছু বললেন না। যাই হোক এখন যোগীবাবা ভদ্রতা রক্ষা করে শেষে বললেন ;—আচ্ছা, দেখা-শুনা আলাপ-পরিচয় অনেকটা হলো এখন আপনারা যান, মায়ের মন্দিরে পূজা পাঠ, এখানকার সব কিছু দেখুন, তারপর কাল আবার দেখা হবে, কেমন ? বলে, তিনি সোজা নিজস্থানে চলে যাবেন বলেই উঠলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু চলে যাবার আগেই বুদ্ধিমান বাবু মহিমাচরণ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে টং করে সাধুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন।

যোগিবাবা বললেন,—ওকি মশাই, ওটা বার করলেন কেন ? এখুনি পকেটে ফেলুন—ফেলুন, টাকা নিয়ে কি করবো ? মহিমাচরণ বললেন ;—থাক না কাজে লাগবে।

তখন আপনার কাছে চেয়ে নিলেই হবে—এখুনি ওটা তুলে ফেলুন, বলেই চলে গেলেন। অগত্যা আবার টাকাটা পকেটে রাখলেন তিনি। তারপর চলে গেলেন ওরা সবাই।

রাত্রে আমাদের অনেক কথাই হলো, বেশীর ভাগ পুরানো কথা, প্রথমেই এই বলে আরম্ভ করলেন, তোমায় পত্র দিয়ে এখানে আনলাম আমি ;—কারণটা তো এখনও জানতে চাইলে না ;—অথচ জানো বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা আমার স্বভাব নয়। শোনো, আমার মনে ছিল--যেদিন তুমি এসে পেঁছাবে সেদিন আর রাত, বড় জোর পর দিন ও রাত কাটিয়ে আমি বিন্ধ্যাচলের পথে যাত্রা করবো ;—আর যদি চাও তো তুমিও থাকবে সঙ্গে,—কেমন হবে বলো তো ! বললাম,—বেশ হবে ;—তা বিন্ধ্যাচল কেন, তোমার প্রিয় সেই—

বাধা দিয়ে বললেন ;—কেশবানন্দের আশ্রমটি পাওয়া গেল, অমন পবিত্র স্থান আর নেই—দিনকতক থেকে একটু আনন্দ লাভ করবো।

কেশবানন্দ তো ওটা সত্যানন্দকে দিয়েছিলেন ?

সত্যানন্দ তো গুরুর পশ্চাদ্ধাবন করেচেন অনেকদিন। আরে, সে দুনিয়ার কোন খবরই রাখনা দেখচি।

অবধূতের কথা, পরমহংস দেবের কথা হলো, কিন্তু অনুমণির সম্বন্ধে কোন কথাই নয়। আমি যতবারই ঐ মেয়েটির কথা তুলতে গেলাম ততবারই তাঁর অদ্ভুত ভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া দেখে ভাবলাম, দূর করো ছাই,

আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন, যা হবার তাই হবে। অনেক দিন পরে দেখা হলো, পুরাতন বান্ধব, সতীর্থ ; আন্তরিক প্রীতির টান একটা আছে, তা বলে জোর করে কোন কাজে বাধ্য করার চেষ্টা অন্যায়।

তারপরও দেখলাম, যতোবার পূর্ববঙ্গের অত্যাচার সম্পর্কে কোন কথা তুলতে গিয়েছি সে কথা উড়িয়ে দিয়ে অন্য কথা পেড়েছেন। যাই হোক, এখন আমার ক্লান্তি দেখেই বোধ হয়—এইবার শুয়ে পড়ো, রাত হয়েছে—বোলে চলে গেলেন নিজ আসনে। আমি তো আমার বিছানায় বসেই ছিলাম। মনে হলো আজ মা জগদম্বার কোলেই শুয়ে পড়লাম, আর অঘোরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, সারাদিনের ক্লান্তির পর।

গভীর রাত্রে প্রথমে খট্ খট্ যোগির কেঠো পয়জারের শব্দ। তারপর আমার বিছানার কাছে এসে—বন্ধু, ওঠো, কাজ পড়েছে। শুনেই আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম,—ব্যাপার কি? একবার বাইরে যাও তো। ঐ দিকে নদীর ধারে যেন একটা কিরকম শব্দ পেলাম।

কি রকম শব্দটা, যেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—একটা ধমক দিয়ে যোগি বললেন,—একটু উঠে গিয়েই দেখনা ছাই।

আমার ঘুম ছুটে গেল।

কাছেই সিঁড়ি, তরতর করে নেমে এলাম, দেখি দরজার হুড়কো খোলা, অথচ কাছেই খাটের উপর একজন ঘুমুচ্ছে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। বাইরে বেরিয়ে নদীতীর পানে গেলাম, কেউ কোথাও নেই ;—কি হলো? ডান দিকে আরও খানিক চলে সামনেই চন্দ্রালোকে দেখলাম, একটা কালো মাথা, পিঠে এলোচুল একটি মূর্তির পিছনের সাদা কাপড়ও দেখা গেল, যেন সামনের দিকেই চলেছে। এবার দ্রুত পা চালিয়ে কাছেই গিয়ে পড়লাম, দেখলাম নারী-মূর্তিটি আর কেউ নয় অনুমণি, টলতে টলতে, পাড়ের উপর এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যেখান থেকে ঝাঁপ দিলে গভীর জলেই পড়া যাবে। কোন কথা না বলে পিছন দিক থেকে ধরেই পাড় থেকে তাকে খানিক তফাতে এনে ফেললাম। ঐ দুর্বল শরীর, চারদিন খাওয়া নেই, তবু কি জোর, সামলাতে পারি না। গলা ফাটানো চিৎকার করে তখন বললে ; আমি কেন বাঁচবো,—ছেড়ে দাও, আমাকে ধরবার কোন অধিকার নেই,—বলে এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে জলের দিকে একটা ছুট দেবার প্রবল চেষ্টা করতে গেল ; কিন্তু অশক্ত হয়ে তখনি ঘুরে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য।

পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলাম আমাদের ঘরে ; মেজেতে শুইয়ে দিলাম, মাথায় একটা বালিস দিয়ে। যোগিবাবা বললেন, এই রকমই একটা অনুমান করেছিলাম। এখন আর নাড়াচাড়া নয়, যখন আপনি জাগবে তখনই দেখা যাবে। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েছে,— চাঁদ দেখে যোগিবাবা বললেন। বলা বাহুল্য পিতামাতা তখনও কিছুই জানে না, ঘরে তাঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। যোগি চলে গেলেন আসনে।

এখন আর শুলাম না,—জেগেই রইলাম। যখন ভোর হয়েছে, জ্যোৎস্না তখনও রয়েছে, যোগী এলেন দেখতে এখানকার অবস্থাটা। বললেন, ভয়ঙ্কর আঘাত,—সহজ অবস্থায় জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। সুবিধার ভিতর এই বিদেশে একটা আবহাওয়ার পরিবর্তন, তাইতে উপকার হবে। তার উপরে এই পীঠস্থানের মাহাত্ম্যও কাজ করবে। বিধাতার অপূর্ব যোগাযোগ।

এ দিকে ফরসা হয়ে এলো—এমন সময় বাবা ও মা হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন,—আমাদের মেয়েকে দেখছিনা যে।

যোগি বললেন,—এই যে আপনাদের মেয়ে, দেখুন, তবে ছোঁবেন না। এখন ওকে নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, একটু বসুন আপনারা। বসলেন তাঁরা। ঘটনাটা সব শুনলেন, আর বিস্ময়ে নির্বাক হয়েই রইলেন। কতক্ষণ পর, মেয়েকে

বাঁচিয়েছেন বলে যখন আমায় ধন্যবাদ দিতে এলেন তখন যোগি বললেন,—ধন্যবাদের অনেক দেরী, এখনও আপনার মেয়ে ঠিক বাঁচেনি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কিনা একমাত্র জগদম্বা ব্যতীত আর কেউ জানেন না। তবে প্রথম ধাক্কায় হয়তো রক্ষা পেলেন।

এই সময়টি একবার চেয়ে দেখলে, সে দেখবার মধ্যে কোন লক্ষ্য নেই কেমন ফ্যালফেলে যেন পাগলের চাহনি, তার পরেই পাশ ফিরে শুয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়লো।

বাপ বললেন, এইবার ওকে উঠিয়ে আমাদের ঘরে নিয়ে যাইনা কেন ; আপনারা আর কতক্ষণ কষ্ট করবেন ?

না না, ওকে এখন নাড়াচাড়া করা হবে না ;—অর্দ্ধেক রাত যখন কষ্ট করা গেছে এখন তো দিন, এখন আর বেশী কষ্ট হবে কেন ? যখন ওর ঘুম আপনি ভাঙ্গবে তখনই কথা।

বাপ চুপ করলেন,—মা এবার মৃদু কণ্ঠে বললেন, বাবা আজ চারদিনের মধ্যে এমনভাবে শুয়ে এতক্ষণ ও ঘুমায়নি। যখনই উঠেছি দেখি বসে আছে,

বড় জোর বসে বসে বালিসে মুখ গুঁজে থাকতো। এখন বাপ বললেন,—আমরা এখানে শুধু শুধু বসে কি করবো, আপনারাই বা কি করবেন?

আপনাদের বসে থাকতে কি কেউ অনুরোধ করছে, এখানে?

শুনে বাবা বললেন,—সঙ্গে সঙ্গে একটা নিঃশ্বাসও পড়লো, বাঁকুড়া থেকে পত্রের উত্তর কবে যে আসবে, ভগবানই জানেন। শুনিয়া যোগি বললেন, ভগবান আরও জানেন,—আপনারা এখানে এসে পড়বেন তা জানেন, মেয়েটির গতি এইখানেই হবে তাও জানেন, তারপরেও এমন কিছু জানেন যা আপনারা এখনও কল্পনাও করেননি।

তা হয়তো জানেন,—কিন্তু এমন দুর্গতি করেন কেন মানুষের; সেইটাই যে আমরা বুঝতে পারি না,—ঐখানেই তো হয়েছে গোল। চল, চল, এখন আমরা উঠি, সকালে আজ কাজ আছে,—বাজার-হাট—

তাঁরা চলে যাবার পর, যোগজীবন বললেন, এরা কেউ এখনও প্রকৃতিস্থ নয়। এদের ভিতর যে আঘাত এসেছে তাই থেকে এখনও কেউ সামলাতে পারেনি। এখন মেয়েটির সম্বন্ধে এইটুকু তুমি তো বুঝতেই পাচ্চ, ঘুমটা যত দীর্ঘ হয় ততই ভালো। যে আঘাতটা ও পেয়েছে,—ততটা আঘাত ওর মাও পেয়েছেন, বাবারও কম নয়—তবে মায়ের একটা জোর অবলম্বন রয়েছে স্বামী, তাকে ধরেই সামলাচ্চেন; কিন্তু মেয়ের তো সেরকম কিছু নেই, তাই এতটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাও, এখানে বক্তৃতায় কিছু হবার নয়। তুমি একটি কাজ করোদিকি;—মন্দিরে যাও, পূজারী যিনি, নিশিকান্ত আচার্য তাঁর নাম, তাঁকে একবার আমার নাম করে বলবে,—তাঁর পূজার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে এখনি একবার আমাকে দেখা দেন, না হলে পূজার পর যেন নিশ্চয়ই আসেন। বেশ লোক, দেখলে খুসী হবে, যাও চলে।

যেতে আসতে আমার পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশী লাগেনি; প্রায় আমার সঙ্গেই এলেন নিশিকান্ত ঠাকুর। বেশ জাঁদরেল মূর্তি, রক্ত বস্ত্র ও উত্তরীয়—কপালে সিন্দুর, রক্তচন্দন তার সঙ্গে চক্ষুর রক্ত আভা সব মিলিয়ে যেন একটি শক্তির প্রতীক বলেই মনে হয়। তিনি এসেই যোগিবাবাকে প্রণাম করলেন। তাঁকে বসিয়ে যোগজীবন এমন সুন্দর করে অনুর্মণির ইতিহাসটা বললেন, যেন তিনি আগাগোড়া সব কিছুই স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রত্যেকটি কথাই পূজারী ঠাকুর মন দিয়ে শুনলেন। শেষ হলে বললেন,—কবচ একখানি দিতে হবে। মেয়ের বাপ কত খরচ করতে পারবেন?

মেয়ে আমার, ওর বাবা আমিই ধরে নাও।

তা হলে পয়সার কথাই চলবে না। তখন যোগজীবন বললেন—এই অবস্থায় কামড়ে ওদের কাছ থেকে টাকা বার করলে তোমার ভাল হবে না, আর মাও অসন্তুষ্ট হবেন। তবে সেরে উঠলে, মা তোমায় যে পুরস্কার দেবেন তাতেই তোমার ঐ ছোট্ট ব্যাগটি ভরে যাবে।

আর কিছুই বলবেন না প্রভু,—ক্ষমা করুন। তারপর বললেন,—আজ শনিবারও আছে, সন্ধ্যার একটু আগে মেয়েটি যেন মন্দিরে যায় তারপর যথা-কালে যা করতে হবে তা করে দেবো। যোগী বললেন—ওর বাবা-মার সঙ্গে ও ঠিকই যাবে।

পূজারী বললেন, একখানা নতুন শাড়ী পরে যেন যায়; স্নান করিয়ে কাজ নেই। যোগী বললেন, এক কাজ করো,— তোমার মনোমত একখানা শাড়ী

ওর জন্যে তুমি কাছে রেখো,—ইতিমধ্যে ওর শাড়ী যদি যোগাড় হয়তো আর লাগবে না।

পূজারী বললেন—কালো, নীল বা সবুজ আর সাদা ছাড়া যে কোন রং চলবে।

আচ্ছা, কোন্ রংটা হলে ঠিক হয় তাই বলতো বাবা ;—

লাল সিঁদুরের রং, পেঁয়াজি, এর কোন একটা হলেই ভালো হয়। যাবার আগে পূজারী ঠাকুর অনেকক্ষণ ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখলেন ;—জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী ?

হাঁগো বাবা, এখনও বুঝতে পারোনি ?

যোগীবাবা বললেন,—মা নিজেই নিজের সবই যোগাড় করে নিলেন,—আমাদের কৃতিত্ব কতটুকু—দেখেছ ?

ঠিক যন্ত্রের মত কাজই করেছি আমরা,—তাছাড়া আমাদের শক্তি কোথায় ?

এইটুকু বুঝতেই মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই ; অসংখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থ আর মতামত নিয়ে মাথা ফাটাফাটি।

কতক্ষণ পর আবার পিতা মাতা এলেন। বাপের উদ্বেগ, মেয়ে এখনও উঠছে না কেন ? মা বলেন, আহা একটু ঘুমাক না— আজ চার দিন চক্ষে ঘুম নেই, গলা দিয়ে এক‌ফোঁটা জলও নামেনি। কি করে যে মেয়ে বেঁচে আছে তাই ভাবি। ভাগ্যে এখানে এসে পড়েছিলাম, মা, রক্ষা করো—মা রক্ষাকালী—

যোগী বললেন এখন আপনারা যান রান্না খাওয়া বিশ্রাম সব কিছুই সেরে নিন। ঠিক সন্ধ্যার আগেই মেয়েকে নিয়ে মায়ের মন্দিরে যেতে হবে. মনে থাকে যেন। কবচ পরানো হবে,—**দেবী কবচ**। শুনেই মা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—তাঁকেই তো সব করতে হবে।

বাপ কাজের লোক, কাজের কথাটা পাড়লেন ;—কবচ ধারণের ব্যাপার, খরচটা কি রকম লাগবে,—জিজ্ঞাসা করলেন। যোগি বললেন,—সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে, আপনি কত খরচ করতে পারবেন, তাই বলুন না।

এই অবস্থায় আমি আর কতটুকু খরচ করতে পরবো, বুঝতেই তো পারেন ?

বেশ, তাহলে পাঁচ পয়সা ; কেমন ? আচ্ছা, সেই কথাই রইলো,—তাহলে, —যেন বলতে গেলেন এখন উঠুন। কিন্তু উহ্য রইল কথাটা—

আপনি যখন আছেন এর মধ্যে তাইতো শুভই হবে বোধ হয়। জয় মা, —বাবা বললেন—

আগাগোড়া এটা মায়েরই ব্যাপার সেটা বুঝচেন না ?

তাহলে টাকাটার কথা !

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন,—কিসের টাকা ?

ঐ কবচের !—সেটা কি পরিমাণ হবে ?

সাধু বললেন,—ঐ যে বললাম, পাঁচ পয়সা। এর কম কি করে হয় ?

পরিহাস করচেন, হেঁই বাবা, অপ্রসন্ন হবেন না। করজোড়ে বাবা বললেন।

আচ্ছা, তাহলে আপনিই বলুন না, কত খরচ করতে পারবেন। শুনেই বাবা মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করলেন, শেষে বললেন, আপনিই বলুন।

তাহলে একশো টাকাই দিবেন। ঠাকুর, তাহলে খুব খুসী হবেন।

বাবা বললেন ;—অবশ্য দৈবশক্তি অমূল্য,—ওর দাম কি পয়সায় হয় ? তাছাড়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা, সৎপাত্রে দান এ তো আমাদেরই কর্তব্য। তারপর, দৈব্য ব্যাপারে দর কষাকষি চলে কি ? এখন আমার ঐ একমাত্র সন্তান, ওর শান্তি, ওর প্রাণের জন্য একশতই দিব ; আপনি আশীর্বাদ করবেন। তা টাকাটা কখন লাগবে ?

সাধু বলিলেন, আমি বলি কি, কবচ ধারণের পর আপনার মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেলে তখনই দিবেন।

তাহলে তো কথাই নাই, আনন্দেই দিব।

তাই দিবেন। তাহলে এই কথাই রইলো।

পায়ে রাখবেন, বলে প্রণাম করে বাবা উঠলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

দাদা-জীবন! যোগিবাবা আমায় বলচেন,—শোনো,—তোমার কাজ শেষ হলো মনে করেচে ।

আমি তো কিছুই মনে করিনি, তবে কবচ ধারণের পর আর তো কিছু কাজ দেখচি না।

অবশ্য কবচের কাজ তো হবেই,—কিন্তু স্থায়ী স্বস্তি ও শান্তির জন্যে ওর জীবনে কাজ চাই, মনোমত কাজ, যার সঙ্গে ওর প্রাণের যোগ থাকে এমন কাজ। চমৎকার হয়, যদি—

যদি কি ?

উত্তরে যোগী বললেন, একটি সুপাত্র জোগাড় করে যদি চার হাত এক করে দেওয়া যায়। ভাবচি, মা জগদম্বা যদি এই রকম একটি ঘটিয়ে দেন তো বেশ হয়। এই কাজটা সম্পূর্ণ হলো বলে মনে করতে পারি তখনই।

কথাটা তোমার মুখে শুনলাম তাই,—অন্য কেউ বললে মনে করতাম, পরিহাস।

সে কি, বন্ধু, তুমি একথা বললে ?

কেন বলবো না,—সরলা বালিকার এই মানসিক অবস্থা, চক্ষের সামনে পৈশাচিক হত্যা, বীভৎস কান্ডের অসহ্য প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই বিকৃতি, তার ঔষধ হলো বিবাহ। এই কি বিবাহের মত পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনের অনুকূল অবস্থা ?

কথাগুলি শুনেই যোগি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কতক্ষণ পর বললেন ;—আমরা জানি, তন্ত্রধর্ম এবং সাধন সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধিৎসা বেশ কিছু দিন প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেকগুলি তান্ত্রিক, সিদ্ধ ভৈরবীর সঙ্গের ফলে সাধন ও সিদ্ধির পরিচয়ও ভালই জানা হয়েছিল। মূলে আনন্দ-সত্ত্বা প্রকৃতি পুরুষের যোগই এই সৃষ্টির চরম ও পরম তত্ত্ব অর্থাৎ তন্ত্রধর্মের সার কথা এইটিও ভালমতেই জানা হয়ে গিয়েছে। এর পরও তুমি বর্তমান অবস্থায় অনুমণির বিবাহের কথায় এমন পিউরিটানিক্ মনোভাব নিয়ে বিচার করতে গেলে কোন্ বুদ্ধিতে ?

এক ঘা চাবুক যেন পিঠে পড়লো, ফলে আমার বাক্‌রোধই হয়ে গেল কতক্ষণ।

কি ? আর কথা নেই যে ভায়ার মুখে ?

দেখ, তুমি জ্ঞানী ! যথার্থই সায়ানটিষ্ট, অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞান যথাক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছ, আর—আমি নভিস, দেখ, এখনও থিওরী ভাঁজচি।

আমরা যখন এই সব কথায় মসগুল ছিলাম,—মেয়েটি হয়তো সেই সময়েই উঠেছিল, এখন দেখি ধীরে ধীরে উঠে বসলো। হয়তো আমাদের কথা খানিক শুনেও থাকবে ;—অদ্ভুত এক কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি তার,—চার দিকে চেয়ে এখন জিজ্ঞাসা করলে,—আমার বাবা কোথা, আমার মা ?

যোগী বললেন,—তাঁরা নীচে ঘরেই আছেন, তুমি যাওনা, ঐ সিঁড়ি দিয়ে, —যেতে পারবে ?

যাবো,—বলে সে উঠলো, দুর্বল শরীর—তবুও সাধুকে প্রণাম করলে, আমাকেও প্রণাম করে দ্বারপথে চললো। আমি পিছনে ছিলাম,— নীচে ওদের ঘর পর্যন্ত গেলাম পেঁাছে দিতে।

ওদের ঘরটি দেখলাম বেশ গুছিয়ে নিয়েচেন গিন্নি। মেয়েকে দেখে মা একবারে জড়িয়ে ধরলেন এসে। বাবা বসে বিঁড়ি হাতে ভাবছিলেন, মেয়েকে দেখেই আনন্দে কথাই কইলেন না। মা বললেন,—এইবেলা কিছু খেয়ে নাও তো মা ;—এর পর মন্দিরে যেতে হবে সন্ধ্যায়। মেয়ে বসে পড়লো, বললে, এখন কিছুই খাবো না, খাওয়ার কথা বলবেন না।

আমি এই সব দেখে শুধু বলে এলাম, সন্ধ্যার আগেই এসে নিয়ে যাবো, —এখন আমি যাচ্চি।

মা বললেন--আত্মীয় কুটুম্বের বাড়া, কোথায় ছিলেন বাবা আপনারা ? আপনারা না থাকলে কী যে হোতো আমাদের, সকাল থেকেই তাই ভাবচি।

বললাম—অন্য কেউ থাকতো, যাঁর কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নিতেন।

এখন পথে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীতীরেই এলাম। এমন একটা রহস্যময় আকর্ষণ আছে এই প্রাচীন উপনগরের মধ্যে, নদীতীরে এলেই সেটা বেশ অনুভূত হয়। এক সময় এইখান থেকে বাণিজ্য-তরী, বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ বহু দূর জলপথে কত দেশ-দেশান্তরেই যাত্রা করতো পণ্যভার নিয়ে। কত কত ধন ঐশ্বর্য সম্পদ তখনকার দিনে তাম্রলিপ্তির এই বিশাল বন্দর দিয়েই যাতায়াত করতো। পৌষ সংক্রান্তির দিন মহাজনদের নৌবহর,—পূজা অর্চনার সঙ্গে শঙ্খরোলে শুভ যাত্রার সূচনা করতো, নর-নারীর মিলিত কোলাহলে বন্দর মুখরিত হয়ে উঠতো। প্রাচীন এই জাহাজ ঘাটায় কত বড় বড় সমুদ্রগামী পোত নিরন্তর দেখা যেতো, তার জায়গায় এখন ছোট বড় নৌকা—অবশ্য সবই মালবাহী নৌকা, পালোয়ার, আর দূরে দূরে ছোট ছোট জেলে ডিঙিগুলি নড়াচড়া করছে দেখা যায়। কলকাতার ওপারে সালিখা অথবা শিবপুরের কোলে যেমন কতকগুলি নৌকা বাঁধা থাকে, তার মধ্যে সব রকমের নৌকা থাকে এখানেও সেই রকম। সেই পুরানো দিনের সঙ্গে এখনকার কোন অবস্থার তুলনা করাই যায় না। কারো কারো মনে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতি, তাও আবার জোর করে যেন ধরে থাকা, স্থানে এসে দাঁড়ালে হয়তো উদ্দীপ্ত হয়। সেই পুরাতন ঐশ্বর্যের সাক্ষীরূপা এখন এই বর্গভীমাই আছেন এখনকার অদ্ভুত রহস্যময় স্থাপত্যের মধ্যে আবদ্ধ।

প্রাচীন স্থান, রাজা বা রাজবংশ আছেন, রাজবাড়িও আছে একটি পুরাতন জীর্ণ ও শীর্ণকায়া, তবে সে আধুনিক। অতি পুরাতন সেই তাম্রধ্বজ রাজার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিনা। এদিকটায় এক ঘাট পুকুর বা ঘাট পুকুরই সেই অতি পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেচে। অবশ্য অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্বিবদের চক্ষে এর চেহারা এক রকম, আমাদের চক্ষে হয়তো সে রকম নয়। এই দিকেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপাদি অনেক আছে সেটা আমাদের মত অব্যবসায়ীদের মোটেই আকর্ষণ করে না। এক সময় রাজধানী ছিল নাকি এই স্থানটিতে।

চমৎকার কতকগুলি গাছ চক্ষে পড়লো। এই পুরানো গাছগুলিও অনেক কিছু দেখেছে এই প্রাচীন রাজধানীর। সেই রূপনারায়ণের বিস্তৃতিও এখানে কম নয়। এই ভাবে খানিক ঘুরে বাজারের ঘন জনসমষ্টির মধ্যে না গিয়ে ফিরলাম। বাজারহাট সব জায়গাই সমান, পণ্যদ্রব্যেই ভরা।

এখন ফিরে এসে পেঁৗছে গেলাম মহিমাচরণের বাসায়। দরজায় দাঁড়িয়েচি, শুনচি সেই একই কথা,—বাঁকুড়া থেকে পত্র কত দিনে আসবে। কত দিনে যেতে পারবেন সেখানে। কত দিনে আপনজনের মুখ দেখতে পাবেন। এই সকল কথাই চলছিল। দেখলাম অনুর্মাণ একখানি নীল শাড়ি পরে বসে আছেন প্রস্তুত হয়ে। শরীর ক্ষীণ হলেও মনে হল অনেকটা স্বাভাবিক।

আমায় দেখেই মহিমাচরণ বললেন—এই যে, এইবার যেতে হবে।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—এরই মধ্যে অরুচি ধরে গেল আপনার এ জায়গাটি ?

হাঁ,—তাতো হতেই পারে। মনে করুন এই যাত্রীশালায় থাকা, নির্বান্ধব প্রদেশ,—

আমরা কি আপনার বান্ধবদের মধ্যে গণ্য হতে পারি না। এই সময় অনু বিরক্তিপূর্ণ মুখে মায়ের দিকে চাহিল,—মা তখন বললেন, বাবা ওনার কথায় কান দিবেন না, ওঁর মেজাজ ঠিক নাই।

চলুন, মন্দিরে যাওয়া যাক্। এবার অনুর্মাণ আগেই উঠে দাঁড়িয়েচে, দেখে মনে হলো যাত্রা শুভ।

আমার একটি কৌতূহলও ছিল এই ব্যাপারে সেটা এই যে,—কবচ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল ক্রিয়া কিছু দেখা যাবে কিনা। যখন মন্দিরে পেঁৗছিলাম, পূজারী তখন ছিলেন না। আমরা সামনের যজ্ঞ মন্দিরেই বসলাম। তার সামনেই বিরাট নাটমন্দিরাদি। উপরের দিকে চাইলে, কি আশ্চর্য কৌশলে দেশের স্থপতি এই মন্দিরের ভিতর দিকের ছাদ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছেন ভেবে মুগ্ধ হতে হয়। না দেখলে কথায় বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয়। ভারতে এমন ভাস্কর্য আর কোথাও নাই। অনুমাণ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এখানকার কারু-বৈচিত্র্যই দেখছিল। মাঝে মাঝে আমার দিকেও দেখছিল। আমার খুব ভালই মনে হল ওর বর্তমান অবস্থা। অনেক দূরে নয়, কাছেই ছিলাম। আমার দিকে দেখতে দেখতে এক সময় আমায় লক্ষ্য করেই বললে,—কাল আপনাদের বড় কষ্টই দিয়েছি আমি।

বললাম, তা ঠিক নয় ; যাঁর ঘরে আপনি আজ ঘুমিয়েছিলেন সারাদিন, তিনিই যা কিছু করেছেন। তিনিই লক্ষ্য রেখেছিলেন—আমি যন্ত্রের কাজ করেচি মাত্র।

এমন সময় পূজারী এলেন হাতে একটি ঝারি তার মধ্যে অনেক কিছু,

আর এক হাতে একখানি নতুন লাল কাপড়। কাপড়খানি অনুর হাতে দিয়ে বললেন,—ঐখানে গিয়ে কাপড়খানি পরে এসো। মা ও মেয়ে উঠে গেলেন, পূজারীও মন্দিরে প্রবেশ করলেন। অনেক লোক ছিল না।

অল্পক্ষণেই দ্বারপথে দেখা দিলেন পূজারী ঠাকুর,—অনুকে সঙ্গে নিয়েই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, আমরা বাহিরেই অপেক্ষায় রহিলাম।

আরতির আয়োজন ওদিকে চলেছে, সে এক চমৎকার দীপাধার, এমনটি সাধারণত দেখাই যায় না। অবশ্য এখন দেরী আছে, তাহলেও আয়োজনটি আগে থাকতেই করতে হয়। এই সব দেখেই এটি অতীব প্রাচীন দেবস্থান বলে ধারণা হয়। সব কিছুই সুশৃঙ্খল, আমাদের কালীঘাটের মত নয়। অথচ কালীঘাটের ঐ তীর্থ কত প্রাচীন কালের—বাহান্ন পীঠের একটি, সেথা এমনটি দেখা যায় না কেন?

অল্পক্ষণেই অনুর্মাণ ধীরে ধীরে মন্দির হতে বেরিয়ে এলো। এখন আর সে মূর্তি নেই, যেন এক অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত দেবীমূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে প্রসন্ন ভাব, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় লাল ফিতার সঙ্গে বাঁধা কবচ,—দেখে আমার যে কী আনন্দ হলো সে কথা আর বলে কাজ নেই। পূজারী আচার্য, সস্ত্রীক মহিমাচরণের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন যে দশ দিনের মধ্যে যেন কবচ খোলা না হয়, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে হারের সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য হয়ে থাকবে। পিতা একটি টাকা দিয়া প্রণাম করলেন দেবীর স্থানে ;—আসবার সময় একটি মালসায় কলাপাতায় ঢাকা প্রসাদ এনে দিলেন। পূজারী বললেন, মেয়ে আজ এই প্রসাদ খেয়েই থাকবে, রাত্রে আর কিছুই খাবে না।

যোগজীবনের কাছে গেলাম রিপোর্ট দিতে, দেখি তখনও নিজ আসনেই রয়েচেন,—নিঃশব্দেই ফিরে এলাম। নিজ শয্যায় বসে ভাবছিলাম কত কথা। সেই ট্রেনে একত্র আসার ব্যাপারটা, কি পরিণতি লাভ করলো দুই দিনে ; এখনও শেষ হলো কিনা কে জানে!

এবার যোগিবাবার সাড়া পেয়ে গিয়ে বসলাম, এবং সব কিছুই বললাম।

ইতি অনুর দেবী-কবচ ধারণ পর্ব সম্পূর্ণ।

যোগজীবন বললেন ;—

তোমার প্রাণের টানেই মেয়েটির একটি সৎ গতি হলো। তুমি গোড়া থেকে এতটা পক্ষপাতি না হলে বোধ হয় এভাবের হতো না। এতটা টান কি শুধু বিপন্ন অবস্থা বলেই?

তুমিই বলো, তা ছাড়া আর কী ভাব থাকতে পারে! ওদের ঐ কথা যে শুনতো সেই সহানুভূতির চক্ষেই দেখতো, যেমন তুমিও দেখেচো।

খোঁচার সূত্রটার উপর জোর দিয়েই বললেন, তা সত্ত্বেও তোমার মত এত টান কারো হতোই না।

কেন বলো তো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুলেই বলোনা, এতটা কায়দ করছ কেন?

তখন সাধু বললেন,—আহা, চটো কেন? আমি কি বুঝিনা কিছু,—তুমি অতগুলি মেয়ের বাপ, মেয়ের উপর তোমার জাতটান, তাদের দুঃখ দুর্গতি তুমি সহ্য করতে পারনা,—এ আমি বুঝিনি ভেবেচ। তা ছাড়া তোমার সেই মেয়েটি—যার সঙ্গে ওর বয়স ও আকৃতি প্রকৃতিগত ঐক্যই তোমায় এতটা আকৃষ্ট

করেচে ; এ যদি না বুঝবো তাহলে অবধূত শিষ্য আমি হতেই পারি না। যাক্, তোমার অনয়োরণীয়ান এখন সুস্থ হবার পথে এসেছে তাই আমার আনন্দ। শুনে আমিও বললাম—মহতোমহীয়ানের কৃপায় যে সেটা ঘটেছে এই জন্যই আমার এখানে আসা সার্থক মনে করচি। অতএব তোমার বজ্র এখন সম্বরণ করো।

সে রাত্রে আমাদের মধ্যেই ঠিক হলো যে আমরা পরশু দিনই বিন্ধ্যাচল যাত্রা করবো যেহেতু আমাদের কিছু কাজই রইলো না, এখন মেয়েটি সারবার পথেই চলেছে মায়ের কৃপায়। কথাটা শেষ করেই উঠতে যাচ্চি,—দরজার কাছে আবছায়ায় এক মূর্তি। আশ্চর্য ব্যাপার ;—যোগিবাবা কাছে গিয়ে,—আরে, আমাদের অনু মা যে ;—এসো মা, এসো, বোসো, ব্যাপার কি ? রাত্রে কেন বলো তো ? পেটে কিছু পড়েচে কিনা আগে তাই বলো ?

প্রসন্নমুখে অনু প্রবেশ করলে,—বললে, এই তো প্রসাদ পেয়ে এলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি কি ছিল প্রসাদে বলো তো ;—

ভাত ছিল, খিচাড়ি ছিল, দুখানা লুচি, ভাজা ডাল তরকারি শেষে পরমান্নও ছিল। বললাম, আজ চার দিন পরে পেটে অন্ন গেল।

অন্নের গুণ এমনি যে অনুর মূর্তি গতি সবই বদলে গিয়েছে। সে মেজেতে পা মুড়ে বসলো। যোগী বাবাকে বললে, কাল সকালে আমি আপনার কাছে আসবো—আমার কিছু বিশেষ কথা আছে, জানিয়ে গেলাম আজ।

সাধু বললেন—মা গো, তুমি আজ যে এতটা সহজ হয়ে আমাদের কাছে আসবে তা কল্পনাও করিনি। মায়ের কোলে এসে পড়েছিলাম, তখন জানতাম না যে মা কেন এখানে আনলেন, কি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।

আচ্ছা, মা, কাল আবার দেখা হবে। যদি আসো তবে সকালে একটু বেলায় সাড়ে আটটা নাগাদ এসো। আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙ্গে না।

সত্যিই আপনি আটটা অবধি ঘুমান ?

প্রায় সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাতে পারিনা, বেশী রাতটাই জেগে থাকি ; ভোর বেলাটা ঘুমাই,—তাই দেরী হয়ে যায় উঠতে।

মনে আমারও একটা কথা এলো, বলেও ফেললাম অনুকে—

উনি যদি রাত্রে আমাদের মত ঘুমাতেই পারতেন,—তাহলে কি কাল রাত্রে তোমায় বাঁচানো যেতো ?—উনি ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে বসে আছেন যে।

শুনিয়া যোগী বলিলেন, মাগো, ওর বাড়াবাড়িটা মোটেই সত্যি বোলে যেন নিওনা, আসলে রামপ্রসাদই যথার্থ ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে ছিলেন,—ও সেইটে আমার উপর চাপিয়েছে। মেয়েটি বললে ;—আচ্ছা, তা হলে সাড়ে আটটা নাগাদ আসবো। এখন আমি তা হলে যাই—এই বলে দাঁড়ালো,—গেলনা। একবার একটু উঁকি মেরে দরজার দিকে দেখলে তার পর অতীব নীচু গলায় বললে—দেখুন, আমার বাবা ভয়ানক শোক পেয়েচেন, আপনি সবই শুনেচেন তো ; আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে ;—এই বয়সে এ আঘাত সহ্য করতে সবাই পারে না ;—সেই জন্যই ওঁর মাথার ঠিক নেই ;—এখান থেকে বাঁকুড়া যাবার জন্য ছটফট করছেন। যেই দেখলেন আমি ভাল আছি, প্রসাদ খেয়েছি, —অমনি বাঁকুড়া যাবার ঝোঁক। বড় ব্যস্ত লোক—এখন আপনজনের মুখ দেখবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন। আমরা কিন্তু যেতে চাইনা এখান থেকে ; তাই মা আমাকে বলে দিলেন যাতে উনি এখান থেকে না যান, আপনারা—

যোগজীবন বললেন,—উনি কি ছেলেমানুষ যে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমরা রাখবো।

মেয়েটি বললে,—আমরা কেন ওখানে যেতে চাইনা সে কথাটি আপনাকে না বললে বুঝবেন না। আমার জ্যেঠামশাই, বিষয় ভাগাভাগির পর ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কেশব সেনের দলে নববিধানের শিষ্য। তাঁর যে জামাই যোগেশবাবুও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। ঠাট্টা করেন আমরা নাকি মাটির ভগবানকে পূজা করি—তা ছাড়া তিনি বিলাত ফেরত। একেবারে পুরো সাহেবি চালে চলেন। বাড়িতেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদ কক্‌টেল করেন। আমরা কেউ শান্তিতে থাকতে পাবো না ওখানে গেলে—বাবা ওসব গ্রাহ্য করেন না। তাই এই বিপদের পর থেকে আপনজন দেখবার জন্য নেচে উঠেচেন। আমাদের আসল কথা, আমরা আপনাদের পেয়েছি,—মা বলেন, যেমন হারিয়েছি, তেমনি ভগবানের দয়াতেই আপনাদের মত আপনজনও পেয়েচি। আমার যে অবস্থা হয়েছিল, মা বলেন, আপনারা না থাকলে যে কি হতো ভগবান জানেন। —সেথায় আপনাদের কোথায় পাবো ? এই দুঃসময়ে আপনারা আমাদের ত্যাগ করবেন না।

আচ্ছা মা, কাল সকালে দেখা হবে, এখন—তুমি মা জগদম্বাকে ডাকো, উপায় তিনিই করে দেবেন ঠিক। যাতে তোমাদের কল্যাণ হয় তাই করবেন,—বিশ্বাস রেখো তাঁর উপর।

অনুমণি চলে যাবার পর যোগীবর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, নাও ঠেলা,—কি ফ্যাসাদ জোটালে বলো তো,—এখন আমি কী করি ! মা মা,—জয় মা, রক্ষা করো। একেই বলে কর্মই কর্মকে টানে। একটা কর্ম সামনে এসে পড়লো, বিপন্ন দেখে দয়াপরবশ হয়ে লাগলে সেই কর্মে ; সেটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারই আনুষঙ্গিক আরও কর্ম এসে জুটলো, এখন ঠেলা সামলাও। শুনিয়া আমি বলিলাম—সেটাও তো তোমার ইচ্ছাধীন,—না করলেও তো পারো ?

সকল ক্ষেত্রে কি নিজ ইচ্ছামত কর্ম ত্যাগ বা গ্রহণ করবার সুযোগ থাকে। এই বলচো তুমি, সবকিছু তাঁরই ইচ্ছানুসারেই হচ্ছে,—আবার কর্মের স্বাধীনতার কথা আনচো কি করে! বিশেষ এই ব্যাপারে সঙ্গে যে এক বিশেষ ঈশ্বরাভিপ্রায় প্রত্যক্ষ যন্ত্র দেখচি একথা কাহাকেই বা বলি?

এখন ঐ মহিমাচরণবাবুর কথাই ধরো,—কর্তা তো খবর রাখেন না, এখানে কার অধিকারে এসে পড়েছেন, এ জানতে সাধ্য নেই তাঁর। এখন মেয়েটি সুস্থ হয়ে এসেচে, এবার যা মন চাইবে তাই করবেন। এদিকে যে আরও কাজ আছে তার হুঁস নেই।

কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ের মনস্থির হয়েচে, আর কাজ কি রকম, একটু খুলেই বলোনা। শুনে যোগির চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—যেন ভিতরের আলো বাইরে আসতে চায়। বললেন,—কাতর হয়ে যখন একবার মেয়ের জন্য আত্মসমর্পণ করেচেন, যতক্ষণ না সে কাজ সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ নিষ্কৃতি কোথা? মহামায়া সহজেই ছেড়ে দেবেন মনে করেছো। বিষয়ী লোক, যা কিছু বুদ্ধির পুঁজি বিষয়েই ঢালা রয়েচে, মা জগদম্বার উদ্দেশ্যের কথা কি বুঝবেন—বাবু?

সাধু যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন—

উনি তো বিদেশী,—ঐ যে মন্দিরের পূজারী, মাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, তারাই কি জানে যে এই মা-দেবীটি কি বস্তু। ওরা শুধুই প্রচার করে,—মা বড় জাগ্রত। মায়ের দৌলতেই ধন, ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাস চলেছে তাদের। তাই, কতকটা আনুগত্য আবার কতক ভয়ও আছে। উৎসাহ বেড়ে যায় যখন কোন বড় যজমানের মানৎ অর্থাৎ মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই সব নিয়েই তো ওরা আছে—ভগবতীর তত্ত্ব কে করে?

তারপর, অন্য দিকে,—যার জন্য এই সিদ্ধপীঠ, এত বড় একটা প্রকাণ্ড জনপদকে বল, বুদ্ধি, ভরসা যোগাচ্চেন তাঁর কথা আর মনে আনবার দরকার নেই। নিজের দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করে যিনি এই তারা মাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, মাকে এই কেন্দ্রে বাঁধলেন, তাঁকেও ওরা ভুলে বসে আছে। অবশ্য কালধর্মেই এটা ঘটেছে। কিন্তু তিনি নিজ ইষ্টকে জনহিতায়, তাঁর সিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পুরুষ একজন এলেন, উপাসনা,—পূজার ভার নিয়ে, তিনি বললেন—এ তো শুধু তারা নয়, ইনি উগ্রতারা। আসলে এরা নিম্নস্তরের। মায়ের শুধু তারা নাম তাদের মনঃপূত নয়, একটা উগ্ররকম বিশেষণ না দিলে তার বুদ্ধি, তার অনুভূতি তেমন জোরালো বলে প্রমাণ হয় না। তাই উগ্রতারা, বজ্র-তারা, এ তারা সে তারা নামের উৎপত্তি। এক মা,—এ যেন হাল্কা, ঘর সম্পর্ক হয়ে যায়;—তাই ভাষার অলঙ্কার জোড়া লাগানো! পাগলেরা জানে--না,—এক কালী বা তারাই সব,—আর কেউ নেই;—তাঁরই অস্তিত্বের ঠেলায় ত্রিভুবন টলটলায়মান, কত ওলট-পালট হয়ে যায়; এ ধারণা থাকলে ঐ সব প্রাণ চমকানো শব্দসম্ভার জোড়া দেবার প্রবৃত্তিই হতো না। ওরে বোকা পণ্ডিত,—মাকে পেতে, মাকে বুঝতে, ঐ এক মা ছাড়া কোন শব্দই পর্যাপ্ত নয়। মাকে গয়না পরিয়ে বড় করতে চাস কেন, এটাতে যে মায়ের অপমান,—আর তোর বোকামির পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। এটা যদি আভাষেও বুঝতিস তা হলে আর এ দুর্মতি হবে কেন? যতই ভাষার অলঙ্কার বাড়াবি, অলঙ্কার

বিশেষণ চাপাবি ততই যে সেই পরম অস্তিত্বকে দুর্বোধ্য করে ফেলবি ;—সামলানা তোর অহঙ্কারের খেলাটা।

এক মনে শুনছিলাম, এমন কথা তো আগে শুনিনি। বলতে বলতে এখন যেই থেমেচেন একবার, আমি যোগীর দিকে দেখলাম। একটু রহস্য করেই জিজ্ঞাসা করছেন, কি ভাবচো? বললাম, ভাবছিলাম যে, তোমার নামে মায়ের কাছে নালিশ চলে।

কি রকম?

ধরো, যারা উগ্র-তারা, বজ্র-তারা, বিদ্যুৎজ্বালা, করালী এই সব নাম প্রচার করেচেন, তাঁরা যদি মায়ের কাছে নিয়ে নালিশ করেন—দেখো তো মা, কালকের একটা বালক, তোমার মূর্তি নিয়ে আমাদের দেওয়া নাম নাকচ করে দিচ্ছে।

একটু হেসে যোগি বললেন,— তখনই মা তাদেরকে বলবেন, প্রথমাবস্থায় দূর থেকে আমার রূপের একটুখানি পেয়েই আনন্দে তোরা এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেলি কেন নাম নিয়ে বাছা ;—আমার নামে একরাশ শব্দ, অক্ষরের বোঝা চাপিয়ে নিজের খুসীমত লম্ফ ঝম্ফ করে তো চলে গেলি ;—এখন ওরা এসে যদি আসলটা চিনে নিয়ে, শব্দের বোঝাগুলো ফেলে আমায় হাল্কা করে দিয়ে থাকে তাইতেই আমার আনন্দ, ওরা সত্যই কাছে-থেকে দেখেচে বলে। ওদের ওপর অত রাগ কেন বাপু? ওরাও তো ফেল্‌না নয়।

তারপরেও ওরা হয়তো বলবে,—তুমি বেশ মা তো, তখন যে আমাদের উপর খুব খুসীই হয়েছিলে, তাইতো অত উৎসাহিত হয়েছিলাম আমরা। মাও বলে দেবেন ;—প্রথম মুখেই কেউ তো সবটা পায় না ; তোরা ঐ একটুখানি পেয়ে তারই আনন্দে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিস, সত্যকে দেখতে বুঝতে চাসনি, ভাব আর আনন্দই সম্বল করে ছুটেছিলি! আমি মা হয়ে কি তোদের সেই আনন্দে জল ঢেলে-দিতে পারি? তা হলে কি তোদের দুঃখ হোতো না? তখন আনন্দেই তাই সহ্য করেছি রাগ করো না বাছা,—সত্যকে ধরে কথা কও। অলঙ্কার, শব্দ আড়ম্বর তত্ত্ব নির্ণয়ের পরিপন্থি এটা ভুলে যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো কথা কি?

এখানে যেমন বর্গভীমা তারা-মূর্তি, তেমনি দক্ষিণেশ্বরের বর্তমান পীঠ তো রামকৃষ্ণই প্রতিষ্ঠা করেছেন ভবতারিণী কালী-মূর্তিতে?

যোগি বলিলেন,—মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেচেন রাসমণি,—আসলে বুঝতে হবে, রামকৃষ্ণ ঐখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন, ফলে ঐটি সিদ্ধপীঠ হয়ে গিয়েছে,—এটা প্রতিষ্ঠা করছি বোলে তাঁকে কিছুই করতে হয়নি। তত্ত্বটি এই যে, এইখানে তাঁকে কেন্দ্র করেই ভাগবতীর শক্তির আবির্ভাব হয়ে গিয়েচে। ওখানেও যা এখানেও তাই। তিনি বলিলেন, হাঁ গো, ঐ একই সূত্রে এখানকার বর্গভীমা আর দক্ষিণেশ্বরের ঐ ভবতারিণী বাঁধা। অবিকল একই তত্ত্ব। ঠাকুরও কি মাকে বলেননি যে,—মা গো,—এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তাদের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রত্যেক সিদ্ধ মহাপুরুষেরই ঐটি শেষ কামনা তাঁর ইষ্টের কাছে। নিজেদের তো চাইবার কিছুই নেই ; সিদ্ধ হওয়া মানেই তো ইষ্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তাঁর আর আলাদা করে চাইবার কি থাকলো? আবার বলছেন,—

তাঁরা তো জানতেন সাধারণ জীব কতটা অসহায়, বহির্মুখী বলে। তবু

বিপদে অশান্তিতে নানা দুঃখ বা পীড়নে অন্ততঃ এই রকম একটা পীঠস্থানে বা সাধন কেন্দ্রে এসে আত্মসমর্পণ করলে খানিকটা তো চৈতন্যমুখী হতে সাহায্য করবে তাকে, এই আর কি। বিশ্বাস করে আশ্রয় নিলে পাওয়া সহজ হয়ে যায়। এখানেও দেখ বিশ্বাসটাই সবার বড়ো।

আচ্ছা এমনই চৈতন্যের ভূমি বা তীর্থক্ষেত্র, এমন পবিত্র স্থান অধ্যাত্ম সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এখানে এত ব্যবসাদারি বিষয়, কারবার কেন। সব তীর্থ তো দেখেছি, হাট-বাজার, হৈ হৈ নানা প্রকার শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যসম্ভার নিয়ে যেন যুদ্ধ চলচে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে।

আহা, বাইরের শরীর দেশভূমির এতটা প্রসার, আর দৈবশক্তির কেন্দ্র হলো ঐ দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্রটি ; ঐ একটুখানি বিশেষস্থানেই মহাপীঠ দেব বা দেবীর অধিষ্ঠান-মন্দির ; যারা বোঝে তারা বাইরে জাঁকজমক দেখে ভোলে না। যাহারা বহির্মুখী তারাই হাট বাজার মনোহারির দোকান দেখেই ভোলে। সাধক তাতে ভুলবে কেন ?

আমার ঘুম এসেছিল,—রাত এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে এবার শোওয়া যাক, অনেক কথাই তো হলো।

প্রহর উত্তীর্ণ হলো জানলে কি করে ?

শেয়ালগুলো ডেকেছিল শুনেছি।

ওহো, তুমি দেখচি অনেক ঘাটের জল খেয়েচ।

পরদিন সকালে ঠিক সময়েই অনু এসেচে, তখন আমরা আজকালের মধ্যেই বিন্ধ্যাচল যাবার কথাই কইছিলাম। আমি উঠলাম এই ভেবে যে,—ওর এমন কথা থাকতে পারে যা আমার শুনবার নয়। অনু বলে, আপনি উঠলেন কেন ? —বললাম, বাইরে আমার একটু কাজ আছে। শুনে অনু বললে, আচ্ছা আমার কথা হয়ে গেলে কাজে যাবেন। বসতেই হলো অগত্যা।

এবার মেয়েটি গম্ভীর হয়ে গেল। তাই দেখে যোগজীবন বললেন, বলতো মা তোমার আসল কথাটি ; এবার আমি প্রস্তুত। কিন্তু অত গম্ভীর হয়ে গেলে আমি ভয় পাবো যে। তখন সহজ ভাবেই মেয়েটি বললে—

আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিয়ে এখন থেকে অধ্যাত্ম পথেই সারা জীবন কাটাতে চাই। আমায় আপনি বাঁচান এই সমাজের খপ্পর থেকে।

খুব ভাল কথা,—বেশ, তোমার বাবা মা কি দীক্ষিত ?

হাঁ উনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। বাবা-মা দুজনে একই সঙ্গে দীক্ষিত।

বেশ, শোনো—এখন আসল কথা এই যে দীক্ষা অর্থাৎ কানে একটা মন্ত্র দিয়ে তোমার মুক্তির যে ব্যবস্থা, সেটা আমার দ্বারা হবে না, গুরুর নিষেধ। কিন্তু দীক্ষা পেয়ে যে কল্যাণ তুমি আশা করো তা তোমার হতে পারবে যদি তুমি আমার কথামত উপদেশ মেনে চলো।

হাত দুটি জোড় করে নীচু মুখে অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই অনু বললে, —আমাকে আপনার মেয়ে মনে করে আমার জীবনে কল্যাণের জন্য, এক বিবাহ ছাড়া আর যা বলবেন আমি তাই শুনবো।

এবার আমার দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই যোগী এক বিস্ময়ে জড়িতকণ্ঠে বললেন ;—ও সাধু বাবা !—এ মেয়েটি যে আমার অনেক

উপরে চলে গিয়েছে দেখি। এ্যাঁ, তাহলে মায়ের উদ্দেশ্য তো আমার পক্ষে ল্যাটিন গ্রীক হয়েই রইলো, এতটা আশা করিনি। আচ্ছা অনু-মা, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে যদি আমাদের মনে করে থাকো, তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাওনা, তার আসল কথাটা বলবে?—যদি বিশেষ কোন আপত্তির কারণ না থাকে।

না, আপনাদের কাছে বলতে আমার কোন আপত্তি থাকতেই পারে না; —বলচি, দেখুন—একটি পরম রূপবতী নারী, আমারই বয়স, আমারই আপনজন, তার যে দুর্গতি দেখেচি, তার চক্ষের উপর তার স্বামীকে যে নৃশংস পৈশাচিতভাবে হত্যা দেখেচি, তাতেই বিবাহ ও সংসার সুখের উপর একটা এমনই বিতৃষ্ণা এসে গিয়েচে যাতে এ জীবনে বিবাহ করে সুখী হতে পাববো না। ও-কাজে আমার কোন লাভ নেই। শুনেই যোগি বললেন,—আচ্ছা, ও-কথা থাক। এখন তোমায় তো কিছু নিয়ে থাকতে হবে—কিছু কাজে লাগতে হবে মা লক্ষ্মী।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম দু বছর আগে,—তারপর আর পড়তে ইচ্ছাই হলো না। ভাবলাম কি হবে পড়ে? বড় জোর ৫০/৬০ টাকা মাইনের একটা চাকরি হবে, বড়জোর তাইতে নিজের খাওয়াটুকু হতে পারবে। জীবনে সুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তা ছাড়া আমরা বড়ই দুর্বল, একটা প্রকৃতিগত দুর্বলতা মেয়েদের আছে, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় আছে কিনা জানিনা, এটাও এক দুর্ভাবনা হয়ে বসেছে আমার মধ্যে। তাই ভেবেছিলাম আপনার কাছে অধ্যাত্ম জীবনের নির্দেশ পাবো;—তাইতেই হয়তো ভাল হবে।

যোগি তাঁহার নিজের কথাটিই সস্নেহে বললেন,—মাগো, এই অবস্থায় তুমি যা-কিছুই করতে যাবে তাই-ই হবে পরীক্ষামূলক বিষয়, তার ফলাফল অনিশ্চিত, পরিণামটা যা হবে সেটা আগে থেকে তো জানা যাবে না, শেষ পর্যন্ত তাইতে তোমার মন না থাকার সম্ভাবনাটাই প্রবল রয়েছে যে।

তা হলে আমার উপায় কি হবে,—বাঁচবার কি কোন উপায়ই আমার হবেনা?

নিশ্চয়ই হবে,—তবে সেটা তোমায় নিজশক্তিতে নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেরই মধ্যে আবিষ্কার করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কারো উদদেশে তোমার কিছু হবার নয়।

অনু একটি কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে বললে;—কেন—কেন?

কারণ তুমি সাধারণ,—সরল প্রাণ—পরনির্ভরশীল। গতানুগতিক বুদ্ধি, —অথবা নির্বিচারে গুরু উপদেশ অনুগামী মেয়েও নও, তুমি যে স্বাধীনচেতা, তীক্ষ্নবুদ্ধিমতি; নিজ বুদ্ধিতে চলতে না পেলে তুমি সুখী হবেনা।

তবে—আমার কি উপায় হবে, আমায় বাঁচালেন কেন আপনারা?

আমরা তোমায় বাঁচাইনি তো;—তোমায় মারা বা তোমাকে বাঁচানোতে আমাদের হাত আছে, কল্পনায়ও ওকথা মনে ঠাঁই দিওনা। ঐ ব্যাপারে আমরা ঠিক যন্ত্রের মতই কাজ করেচি,—যেমন মিস্ত্রির হাতে একটা যন্ত্র কাজ করে।

অনুমণি বললে—দেখুন, কথাটা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসচি যে ভগবানই কর্তা, সব কিছুই করেন বা মানুষকে দিয়ে সব কিছুই করান, মানুষ তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। অথচ প্রত্যেক কাজ, ভাবনা-চিন্তা করা, নড়া-চড়া, বলা,

যা-কিছু আমরা আপন ইচ্ছায় করি, এটা করব বা করছি আমিই কর্তা বলেই তো করি ;—আমিই এখানে প্রধান। তাহলে আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হলাম কি করে এটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

একটু স্থির হয়ে বসো দেখি,—শোনো মা ! ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, —রহস্যটি এই যে মানুষের হাতের যন্ত্রটা, মানুষ ইচ্ছামত তার কাজের উপযোগী করে কঠোর পরিশ্রম করেই গড়েচে ; তবুও সে নিষ্প্রাণ জড় একটা, মানুষের হাতেই তার নিয়তি যা কিছু কর্মগতি। আর ভগবান, আপন আনন্দে খুসিমত যা সৃষ্টি করেন, তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য, তাঁর ইচ্ছার প্রাকৃত নিয়মেতে সহজেই সৃষ্ট হয়ে যায়,—সে যন্ত্র প্রাণময় জীবন্ত—তার গতি আছে, শক্তি আছে —তার সম্ভাবনাও বিপুল। কারণ তার মধ্যে চেতনস্বরূপ আমি আছে,— সেটাই অহম কর্তা। ভেবে দেখ দুই যন্ত্রের প্রভেদটা।

অনুমণি এতটাই স্থির হয়ে গেল যে মনে হল ওর যেন শ্বাস প্রশ্বাস চলছে না। সাধু বললেন—শুনচো মা ?

হাঁ শুনেচি, বলেই সে যেন জেগে উঠলো। যোগি বললেন—একটু আগেই তুমি অধ্যাত্ম পথে জীবন চালাবার কথা বলছিলে, তুমি কি জানো অধ্যাত্ম জীবন কিরকম বা কি লাভ তাতে ?

না, তা তো জানিনা।

সাধু বললেন,—তাহলে না জেনেই তুমি যেতে চাইছো ?

তাইতো।

স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে যোগি বললেন—তাহলে জেনে রাখো, মানুষ যে তাঁরই হাতের যন্ত্র মাত্র, আর তিনি মানুষ বুদ্ধির অগম্য বিশ্বস্রষ্টা ধাতা ও পাতা, একমাত্র নিয়ন্তা, এই তত্ত্বেই প্রবেশ, একান্তে সাধনা ও সিদ্ধি ফলে সম্পূর্ণরূপে নিজ জীবনে সার্থকতা এবং নিরাপত্তাই চাইছিলে ; এরই নাম অধ্যাত্ম পথে সিদ্ধিলাভ।

এবার অনু সহজ ভাবেই বললে,—এ তো বুঝলাম বেশ, যেমন বললেন, —কিন্তু তাহলে নোয়াখালিতে যে ব্যাপার হোলো, ঐ ভীষণ হত্যা, পৈশাচিক পীড়নে যথেচ্ছাচার—এও তো সেই আসল, বিশ্বযন্ত্রী ভগবানেরই কাজ বলেই বুঝতে হবে।

শুধু বুঝতে কেন, নিশ্চিত ভাবেই ধারণা করতে হবে,—সত্যই তো তারই, তাছাড়া আর কার কাজ হতে যাবে ? আচ্ছা, এর কার্যকরণ সম্বন্ধে বুঝাতে আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলো তো মা, তোমার বাবা কি করতেন ?

নিজের জমি-জমা দেখতেন, চাষবাস করাতেন মজুরী দিয়ে। টাকা ধার দিতেন জমি-জমা বন্ধক রেখে, সুদ নিতেন, দিতে না পারলে আদালতে নালিশ করে ডিক্রি পেতেন,—আবার তা জারী করতেন, অনেকেরই জমি-জমা ঘর-বাড়ি নিয়ে অনেক রকমেই টাকা উশুল করতেন। আইন আদালত নিয়েই বেশীর ভাগ থাকতেন। সাধু বললেন—শুধু তোমার বাবাটি নয় অমন শত শত ছেলে-মেয়ের বাবারা আগে থেকেই ঐ কাজ করে এসেছেন তো। আর আইন তো ধনবানেরই পক্ষে। কিন্তু মা ভেবে দেখো তো আইনসঙ্গত ভাবেই যার ভিটে-মাটি গেল, তার প্রাণে কি লাগেনি, ভিতরে [illegible]

যেই সুযোগ এসেচে অমনি দুর্দমনীয় বেগেই আরম্ভ হয়ে গেল ওদের যা কাজ। এটা দুপক্ষেই পরমেশ্বরের সহজ নিয়মভঙ্গের ফল।

ঐ খানেই শেষ নয়,—বুঝে দেখবার মত আরও কিছু আছে। পাশাপাশি বাস। একদল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধন-সম্পত্তিতে সকল দিকেই প্রভুত্ব ক'রে এসেছে, অন্য দল গায়ের জোর থাকতে পরিশ্রমে অকাতর, তাদের আগেকার অধিকার স্মরণ করে কতটাই বা সহ্য করতে পারে? তাছাড়া ধর্ম ক্ষেত্রে মতবিরোধ; বিচারে ধর্ম বা জ্ঞানের ব্যাপারে সোজা সহজ মেলামেশার ভিতরে কোন যুক্তিযুক্ত বোঝাপড়া নেই, সুযোগ সুবিধা নিয়েই কারবার;—একদল হলো অপর দলের ঘৃণার পাত্র আর অপর দল গায়ের জোরে দুঃসাহসিক হীনাচারে অভ্যস্ত—আবার তাদেরই পরিশ্রমে অন্ন উৎপন্ন করে লাভবান অপর পক্ষ। এইভাবে কতদিন চলতে পারে? এতদিন পর মৌকা তাদেরই এলো কৃত্রিম মেজরিটির জোরে। ইংরেজ সরকার প্রসন্ন ছিলেন। ওদের উপর। তারপর সরকার-বিরোধি উন্নত বাঙ্গালী হিন্দুর উপর এলো সরকারী জাতক্রোধ। ফলে ওদেরি সরকারী আমলেই সুযোগ পেয়ে গেল, আর যা করবার তা করলে। ওদের প্রবৃত্তি, ওদের বুদ্ধি, কর্মশক্তি নিয়ে যতটা পেরেছে করেছে আগে থেকে জমা আক্রোশ মেটাতে। এ হলো যন্ত্রে যন্ত্রে লড়াই,—কর্তা দেখচেন স্বাধীন যন্ত্র তাঁর কেমন কাজ করছে। এর বেশী আর কি করতে পারতো। বুদ্ধির কারবার তো ওদের ঐভাবেরই, গায়ের জোরে সতেজ ইন্দ্রিয় নিয়ে ভোগই ওদের কারবার; ওরা ঐ কাজই করবে দুপক্ষেরই যখন জীবনের উদ্দেশ্যই আলাদা। কাজেই ঐ ব্যাপারে তোমাদেরও কতটা নামিয়ে এনেচে সেটা ভেবে দেখেছ? একটা ঘৃণা আর আক্রোশ তো রয়েই গেল, এর ফলে পরে তোমাদের মধ্যেও হিংসাপ্রবৃত্তি কম জাগায়নি,—সেটা কি ভালো হলো? এটা এইখানেই শেষ নয়, আর দেখো না এর জের কত দূর যায়—

সর্বনাশ! তা হলে উপায়? সাধু বললেন,—উপায় অবশ্যই আছে কিন্তু তা চায় কে? আছে উপায় দু রকম। একরকম ব্যক্তিগত অর্থাৎ তুমি একটি ব্যক্তি, তোমার পক্ষে উপায় হলো বুদ্ধিপূর্বক ঐ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র থেকে সরে আসা। তুমি বুঝেচ যে হাতে সুযোগ পেলেই নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতি করবার প্রবৃত্তি বড়ই উত্তেজক এবং ভয়ানক ফল প্রসব করে বিশেষতঃ যখন প্রতিক্রিয়ার সময় আসে। এ ভাবের অশান্তির জীবন, যারা ভালো সৎভাবাপন্ন লোক কখনই চাইতে পারে না! এমন কাজে না যাওয়া যাতে, নিজ কল্যাণের জন্য অপরের ক্ষতি করতে হয়। এরই নাম সৎপথ। এটা ব্যক্তিগত উপায়। আর ঐটাই সমষ্টিতে বা সমাজগত হলেই সৎ-সমাজ যেখানে বেশীর ভাগ লোকই ওটা বুঝেচে। সৎভাবের একতা থাকলেই ও-সব পাপ আর থাকবে না। এখন সবাইকে ঐভাবে তৈরী, সে বিধাতার ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের সাধ্য নয়।

কথার মাঝে এক বাধা—পূজারী হন্তদন্ত হয়ে প্রসন্ন বদনে হাতে একখানা জন্ম-পত্রিকার মত কিছু নিয়ে হাজির। যোগির চরণে প্রণামান্তর নিবেদন করলেন কোথাকার এক বড় যজমান এসেচেন। এখানে যোগজীবন স্বামীজী আছেন শুনেচেন তাই দেখা না করে যাবেন না। তাঁর যা কথা নিজ মুখেই বলবেন এখন শুধু অল্প সময়ের জন্যই দর্শনপ্রার্থী।

যোগজীবন বললেন;—দেখো, শশী! কাকেও বিমুখ করা উচিত নয়,

তুমি বলে দিও এখানে সবার সামনেই কথা কইতে হবে, আর পাঁচজনের সঙ্গে একই মেজেতে বসে কথা কইতে হবে। স্পেশাল ফেভার—

এই পর্যন্ত শুনেই ;—যথা আজ্ঞা বলেই আচার্য চলে গেলেন।

যোগি বললেন—এই দেখ, তাল কেটে গেল মনে হচ্ছে ; নয় ? তা হোক এর মধ্যেও তাঁর অভিপ্রায় আছে। শুনে অনুমাণ সসংকোচে বললে, তা হলে আমি এখন যাই ;—বাধা দিয়ে স্বামীজী বললেন ;—কেন মা, কোন্ দুঃখে ?

উত্তরে কিছু বলবার আগেই পূজারী ও তার পিছনে সসংকোচে প্রবেশ করলো সুদর্শন এবং ভদ্র এক যুবা। বেশভূষায় যেন দীনহীন মনে হয়। একখানি আধ ময়লা ধুতি তার উপর গায়ে একখানি সাদা চাদর মাত্র। পায়ে ধূলিধূসর চটিও ছিল।

এ রকম ভট্চায্যি প্যাটেণ্ট সম্ভ্রান্ত ঘরের দুলাল তো আশা করিনি। প্রথমেই এই হলো সাধুর পিলে-চমকানো সম্ভাষণ। মনে হোলো, সাধুর কি মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি ? এই ভাষা শুনে অনুমাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে, শশীকান্ত পূজারী বিপন্ন দৃষ্টিতে, আমিও কতকটা অবাক দৃষ্টিতেই চেয়ে দেখলাম সাধুর দিকে। যিনি এলেন, তাঁর মুখখানি হাঁ হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু সাধুবাবার মুখে কোন বৈলক্ষণই দেখা গেল না ; যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন কেবল শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশায়ের মত বুজু বুজু চক্ষে দেখছেন নবাগত যুবার পানে।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি বললাম,—বসুন। আমার পাশেই বসলো।

সব চুপ চাপ ;—শশীকান্ত বললে, মন্দিরে আমার কাজ আছে, আসি, বলে প্রণাম করেই চলে গেল।

বেশ সৌম্য মূর্তিটি ;—বলো বাবা তোমার কথা। নিঃসঙ্কোচেই বলো ; সাধু বললেন।

ছেলেটি একবার অনুর দিকে চেয়ে দেখলে ; তাই দেখে সাধু বললেন, ওঁর মামলাটাও সঙ্গীণ, কোন চিন্তা নেই তুমি নিঃসংকোচেই বলে যাও।

ছেলেটি আরম্ভ করলে ;—আমার নাম সুধাংশু ভদ্র ; গত ৪৩ সালে আমি বি. এসসি পাশ করে চার বছর শিবপুরে এঞ্জিনীয়ারিং পড়েছিলাম ;—এমনই সময়ে আমার মা মারা গেলেন ; তাইতেই আমার সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল। আমি আর পড়াশুনায় মন বসাতে পারিনি। পিতামাতার একই সন্তান আমি, মায়ের স্নেহেই গড়ে উঠেছি। বাবাও আমায় খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু মায়ের জন্যই আমার এই অবস্থা দেখে বাবা ভাবলেন আমাকে শান্ত করতে হলে বিবাহ দেওয়া দরকার।—আর আর বর্ষিয়সী বাড়ির আপনজন —জেঠাই খুড়ি পিসিরা সবাই একমত হয়ে আমার বিবাহের চেষ্টাই করতে লাগলেন। এক ধনবানের সুন্দরী কন্যা পাত্রী দেখে দিনস্থির পর্যন্ত হয় আর কি। আমার দুঃখটা কেউ বুঝলেনা, আমি বাধ্য হবেই পালিয়ে গেলাম। বাড়িতে মা নেই, আমি থাকবো কেমন করে. মা আমার বাড়ির সবটাই জুড়ে ছিলেন। বাবাও ভীষণ শোক পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সব কিছু তাঁর কর্মপন্থা গিয়ে পড়েছিল যেমন করেই হোক আমার বিবাহ দেওয়ার কাজে। আমার মধ্যে দারুণ বিতৃষ্ণা, কাজেই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর নিজেকে বাঁচাবার কোন

উপায়ই রইল না। পালিয়ে বাঁচলাম ; আর একখানা পত্রে মনের কথা জানিয়ে গেলাম।

চারটি মাস,—আমি সারা দক্ষিণ ভারতটা ঘুরে বেড়ালাম। প্রায় দেড় মাস কাটিয়েছিলাম কন্যাকুমারীতে। বাবা পত্র দিতেন, টাকা পাঠাতেন, তাঁকে লিখতাম যখনই যেখানে থাকতাম ; এমন কি শেষে তিনি একথাও লিখলেন যে আমার অমতে তিনি আর কখনও বিবাহের চেষ্টা করবেন না। তখনই আমি ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, ঘরে এক মা এসেছেন। আমার পুরাতন চাকরের মুখে আরও শুনলাম,—যে-মেয়েটি আমার জন্য পছন্দ করেছিলেন তাঁকেই তিনি গৃহলক্ষ্মী করেছেন।

সাধু বললেন,—চমৎকার, তাহলে তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলো, বাবার বয়স কত ছিল? আটচল্লিশ—সুন্দর শরীর—দেখবার মতই চেহারা।

এই দেখ সংসারের খেলাটা। বাবার সঙ্গে তোমার দেখা—

হাঁ, আমি এসেছি শুনেই তিনি আপনি আমায় সস্নেহে ডেকে কথা বললেন,—তোমার কোন কাজেই আর আমি বাধা দেব না। তোমার যেমন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা তুমি থাকবে ; তোমার জীবন যে ভাবে ইচ্ছা কর তুমি চালাও, যথাসাধ্য আমার সাহায্য তুমি পাবে। এখন তুমি সম্পূর্ণই স্বাধীন।

সাধু বললেন,—বেশ কথা।—তা এখন আমার কাছে কেন?

আমি সংসার করবো না, এখানে আচার্যকে আমি কোষ্ঠি দেখিয়েছিলাম, তিনি বলেছেন,—আমার দুর্দিন কেটে গিয়েছে, এখন শুভ সময় এসেছে। আপনি আমায় উপদেশ দিন ; আমি এখন সন্ন্যাসী হতে চাই। শুনে যোগি বললেন ;—তা চাওয়া তো ভালই,—এখন তোমার কি যথার্থ বৈরাগ্য জন্মেছে, বলতো বাবা, যে বৈরাগ্যের তেজে সন্ন্যাস নেওয়া যায়?—সন্ন্যাস নিলে তুমি কি নিয়ে থাকবে?

কেন, দিবারাত্র ভগবানের নাম করবো। সাধু বললেন,—সন্ন্যাস না নিয়েও তো তা করতে কোন বাধা নেই তোমার। সন্ন্যাসের মুখ্য প্রয়োজনটা কি? সুধাংশু মাথা চুলকাতে লাগলো। তার পর বললে,—তা হলে আমায় আপনি কি করতে বলেন?

হাঁ গা, তুমি কি খোকা? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েচে, যা তোমার ভাল লাগে তাই করবে। এক কাজ করো না, মায়ের একখানা বড় ছবি রেখে খুব দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে সাজাবে, মালা পরাবে, ধূপ-ধুনো দিয়ে পূজা করবে, সামনে বসে ধ্যান করবে, সর্বদাই মাকে ভাববে।

সুধাংশু চুপ করেই রইলো। সে কি ভাবছিল তা জানি না। খানিক পরে সে বললে,—দেখুন, আপনি আমায় এতটা হেয় ভাববেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। স্ত্রীলোক বিধবা হলে যা করে থাকে আপনি আমাকেও সেই ব্যবস্থা দিচ্ছেন। তারা যে সময়ে ঐভাবে নিজ নিজ জীবন সার্থক বোধ করতো এখন সে কাল নয় ;—তারপর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ চলন নেই, আর এই হেয় দুর্বল সমাজে নারীর উন্নতির সম্ভাবনার সকল পথই বন্ধ ছিল, এখন সে দিন নেই, আপনি কোথায় আমাকে র‍্যাশোনাল ফুটিং একটা যাতে পাই তাই করবেন, তা নয় যা-তা একটি সেণ্টিমেণ্ট্যাল,—এ আমি কল্পনাও করিনি, —আমার মাতৃভক্তিকে ব্যঙ্গ করে—এই সব বিধান দিচ্ছেন।

তোমার খুসিমত চাওয়াটা সে তোমার মরজি—কিন্তু গ্রহণ করবার কেপ্যাসিটির কথা ভেবে দেখেছ কি? তোমার অধিকার কতটুকু?

কি করবো তাই বলে দিন।

সেটা যে তোমার নিজেরই কারবার।

যদি আমি তা না পারি?

তাহলে আমি বলবো, যে সময়ের যা; যদি ক্রিয়েটিভ এনার্জি কিছু থাকে তা আপনা থেকেই তা বেরোবে। একটা কাজ ধরে যেতে হবে তো, কাল কাটাবে কি নিয়ে? তোমার বাবা এমন এ্যাক্‌টিভ লোক, তুমি এতটা প্যাসিভ, ম্যাদামারা কেন?

দেখুন, অনেক আশা নিয়ে এসেছি;—এমন করে গায়ে জল ঢেলে দেবেন না।

তুমি তো সন্ন্যাসী হতে চাও,—জানো কি তার কোয়ালিফিকেসন?

কি করে জানবো, আমার পক্ষে কি তা জানা সম্ভব?

তাহলে ভালো এবং যথার্থ সন্ন্যাসী হতে গেলে যা দরকার আগে তাই কর।

সে বললে;—বলুন।

ঠিক আমার উপদেশ মতো চলবে তো?

নিশ্চয় চলবো, না হলে এতটা এসেছি কেন?

মন দিয়ে শোনো—তাহলে আমি প্রথমেই বলবো, এত বৎসর তপস্যা করে যে বিদ্যাটি লাভ করেছ তারই পূর্ণ সুযোগ নিয়ে একটা কাজে লাগাও, হেড্ আর হার্ট এক করে লেগে যাও, তারপর বিবাহ করো। গার্হস্থ্য ধর্মের ভিতর দিয়েই পথ;—যথাকালেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

তা হলে সেই বাবার আশ্রয়ে যেতে হবে?

হলেই বা—তাঁর কাছ থেকে তুমি তো নিষ্কৃতি পাওনি; তুমি গিয়ে তোমার বাবার সংসারেই ঢুকবে আর বিবাহ করবে যাকে, সে তাকে নিজের সংসারই করে তুলবে। সে সব তোমায় দেখতে হবেনা,—বিধাতার সনাতন নিয়মের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এঞ্জিন যেমন ট্রেন টেনে নিয়ে যায় সেই রকমই তোমার শক্তি নিজ গতিতেই নিয়ে পেঁাছে দেবে তোমার লক্ষ্যস্থলে। পরলোকগতা জননীও আশীর্বাদ করবেন।

সুধাংশু বেশ ভিজে গিয়েছে। এখন অনুমণি উঠে দাঁড়ালো, প্রণাম করতে গেল; যোগি বললেন—আর একটু বোসো মা, এখনও কাজটি শেষ হয়নি।

অনুমণি বোসলো, আর প্রশ্নভরা চক্ষে সাধুবাবার দিকেই চেয়ে রইলো। ছেলেটির দিকে চেয়ে সাধু বললেন—তোমার ব্যাপার তো সব শোনালে, এখন এই যে মেয়েটি—এর ব্যাপারটা শোনো। অভিজ্ঞতা বাড়বে, নিজ কর্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করবে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,—ভাই, তুমিই সবটা বলো, তোমার সঙ্গে এদের যোগাযোগ থেকে;—

এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে, সেই ট্রেনের কথা সব এবং এখানে এসে যা যা ঘটেছিল, আগাগোড়া সব কিছুই,—এমন কি দীক্ষা নিয়ে অনুর সাধন ভজনের অভিপ্রায় পর্যন্ত—সব কিছুই বলতে হোলো। আমার কথা শেষ হলে এখন যোগি বললেন,—আমার একটা কথা রাখবে,—অনুমা!

আজ্ঞা করুন,—অমন করে বলচেন কেন,—

কারণ আছে তাই না বলি—শোনো, তুমি তো ছেলেটির সকল কথা, যা আমি, তুমি, ইনি (আমি) সবাই শুনেচো,—এখন আমার অনুরোধ, এক্ষেত্রে ওঁর কি করা কর্তব্য, ওঁর যথার্থ কল্যাণ যাতে হয়,—কথাটা তুমিই বলে দাও।

অনু নিঃসঙ্কোচেই বললে,—আমার মনে যা হয়েছে তা বলতে পারি, উনি কি নেবেন সে কথা? শুনে সাধু বললেন,—উনি নেবেন কিনা সে কথা নয়, এখন ওঁর কি করা উচিত বলে তুমি মনে করো সেইটাই আসল কথা।

উনি তো চার বছর ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েচেন বললেন, আর এক বৎসর মাত্র বাকী; এখন ওঁর কোর্সটি কমপ্লিট করাই প্রথম ও প্রধান কাজ। তারপর ভালো পাশ করতে পারলে ভালো সার্ভিস পাওয়া যাবেই,—তারপর স্বাধীন জীবন,—

সঙ্গে সঙ্গেই সাধু বললেন, চমৎকার,—জয় মা! তারপর ছেলেটিকে বললেন, কেমন বাবা, কথাটা লেগেছে?

লেগেছে, বলেই মুখখানি নীচু করে রইলো। শেষে বললে,—বর্তমানে এর চেয়ে আর ভালো কিছুই হতে পারে না, তাও বুঝি, কিন্তু আমার মনে জোর পাচ্ছিনা, যেন—

সাধু বললেন, সত্য কথাটা এই যে,—মায়ের মৃত্যুতে যে অন্তরের স্নেহ ও প্রীতির মুখ্য সহযোগটি হারিয়েচ এখন তুমি সেইটির কাঙ্গাল হয়েই ঘুরচো, সেইজন্যই তোমার বিবাহ করাই উচিত।

কিন্তু এখন যদি আমায় কলেজে ঢুকতে হয় তা হলে সময় নষ্ট করা চলবে না, বিবাহের ব্যাপারে তো সময় চাই; এদিকে সামনের মাসেই কলেজের সেসান আরম্ভ,—

বিবাহের ব্যাপারে পিতার অনুমতির দরকার হবে কি?

না,—সে দিকে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন;—হয়তো খুসীই হবেন শুনলে।

তাহলে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। অনু-মা—মা জগদম্বার ইচ্ছা জেনেই বলচি, তুমি এ ছেলেটির ভার নাও, এতে উভয়তঃ কল্যাণ। তোমরা দুজন একই ঘাটে এসে উঠেচ নৌকাডুবির পর।

কতক্ষণ ভেবে অনু বললে,—বাবাকে বলবার ভার আপনার কিন্তু—

ভালো, তাই হবে। একেই বলে বিধাতার নির্বন্ধ,—এই জন্যই তোমরা এইখানেই এসেছ—আর এ বিধান আমার নয়, ঐ বিধাতারই, এটা বিশ্বাস করো।

ত্রিমূর্তি-যোগি

॥ ১ ॥

নিরবচ্ছিন্ন সুখ কামনা করে সবাই ; কিন্তু সন্ধান জানে না, কি ক'রলে বা কোন্ অবস্থায় তা সুলভ। তাই সাধারণের ধারণা যে মনুষ্যজীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভব নয়। কোন ভাগ্যবানের হয়তো কোন বিশেষ একটা অবস্থায় মনের সুখ বা সাম্য একটু দীর্ঘস্থায়ী হ'ল, তারপরই যখন অবস্থা পরিবর্তিত হ'য়ে তাকে চঞ্চল ক'রে তুললে, তখনই তার অনুসন্ধানের বিষয় হবে কেমন ক'রে সেই অবস্থা আবার ফিরে আসে ; কিন্তু তা আর কখনও আসে না, প্রাকৃত নিয়ম বা বিধির বিধানেই যা আসে তা নূতন, তাকেই মানিয়ে নিয়ে তাঁর মনকে ভরাতে হয়।

কেউ কেউ বলেন, একজন সুখী হ'তে পারে, যদি তার সকল কর্মই ধর্ম-অনুমোদিত হয়। কিন্তু ধর্মবোধ তো সবার সমান নয় ; তাই অপরকে সুখী করাই নিজের জীবনের সুখী হবার সব চাইতে সহজ উপায়, এই কথাটি আমাদের বন্ধু ব্যান্কট্-রত্নম্ নাইডু বলতেন।

দক্ষিণ ভারতের রেলপথের বিখ্যাত স্টেশন বেজওয়াড়া। শহরটি বড়। আমার বন্ধু ব্যান্কট্-রত্নম্ নাইডু শহরের একজন গণ্যমান্য এবং বরেণ্য ব্যক্তি। বাঙ্গালীর প্রতিভার উপর একটা সহৈতুকী শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। এমন অনেক বড় বড় দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী শিক্ষিত লোকেরই তখনকার দিনে ছিল ; হয়তো এখনও আছে। এখন নাইডু একজন ধার্মিক বলেই তাঁর প্রসিদ্ধি, তার উপর ধনবান উচ্চ শিক্ষিত, ঐশ্বর্যশালী এবং বিনয়ী। আবার ভারী সৌখীন এবং বন্ধুবৎসল। ইস্তাম্বুল থেকে আতর আনিয়েছেন,—বুলগেরিয়ার গোলাপের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ, তাও বন্ধুদের মাখানো চাই। প্রশস্ত ভদ্রাসনের কাছেই ঠাকুর-বাড়ী, দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা, পূজা, ভোগরাগ, সাধুসন্তদের সেবা, নিত্য-নৈমিত্তিক সকল রকমের ব্যবস্থাই আছে। বিশেষতঃ সাধুসঙ্গে, সর্ববিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা তাঁর জীবনের একটি উচ্চস্তরের বিলাস। এ কথা ওখানকার সবাই জানে। আমরা সাত আটশো মাইল দূরে থাকি, ভিন্ন প্রদেশবাসী হ'লেও আমরাও জানি। তখন আমি ঐ অঞ্চলে ঘুরছিলাম ;—মধ্যে মধ্যে আতিথ্য উপভোগ করতাম।

এখন বয়স তাঁর পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে,—আজও তিনি নিঃসন্তান। অনেকেই বলেন, নাইডুর এত সাধুসঙ্গের উদ্দেশ্য,—যদি সাধুদের মধ্যে এমন কাকেও পাওয়া যায়, নিজ দৈব শক্তিতে, তাঁর একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়, নাইডুর স্ত্রীর হয়তো সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে কারণ তিনি যাগ-যজ্ঞ স্বস্ত্যয়নে বিশ্বাসী ; অনেক-কিছু করিয়েছেন। কিন্তু নাইডুর মত উচ্চ শিক্ষিত অবিশ্বাসীমনা একজন যথার্থ আধুনিক লোকের ঐ উদ্দেশ্যে সাধুসঙ্গ একেবারেই অসঙ্গত কল্পনা—কারণ বিবাহিত দম্পতির দীর্ঘকাল সন্তান না হওয়ার বৈজ্ঞানিক কৈফিয়ৎ তাঁর ভাল-

রকমই জানা আছে। সে যাই হোক, এখন তিনি এক বিচিত্র পরদেশীয় সাধু নিয়ে পড়েছেন, এমনই সময়ে অতিথিরূপে আমার আবির্ভাব তাঁর সংসারে।

প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করলেন, এক অদ্ভুত সাধুর আবির্ভাব হয়েছে এখানে। ভারী সুন্দর হিন্দী বলেন, উর্দুও বলেন, একজন ইংলিশ-ম্যানের মতই ইংরাজী বলেন, আমাদের মতই টেলেগু আর তামিলও বলেন, যেন তামিল নাড়ুর লোক। অসাধারণ মানুষ ;—কিন্তু কোন্ প্রদেশের মানুষ কেউ জানে না।

উড়ে নয়তো? জিজ্ঞাসা করলাম। অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের সেই, 'সড়া অন্ধা'র গল্পটাও বলতে হলো ; শুনে খানিক হাসাহাসির পর স্থির হলো পর্বতের উপরে গিয়ে রামায়ৎ সাধুর আশ্রমে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা যাবে।

বেজওয়াড়া স্টেশনের পশ্চিম দিকে পর্বতের উপরেই দুর্গা মন্দির ;—নাইডুর সেথা নিত্য যাতায়াত। মা দুর্গার ভক্ত কিনা তা জানিনা, তবে ঐ পুরানো মন্দিরটি সংস্কারের ভার নিয়েচেন নাইডু গারু। এখন সেই মন্দিরে চলছিল মার্বেল পাথরের কাজ। এখানে যেসব পাথর দেবীর মন্দিরে লাগানো হচ্ছে, তার বৈচিত্র্য ইটালিয়ান মার্বেলকে হার মানিয়েছে। বেজওয়াড়া থেকেই মাচারলা লাইন পশ্চিম দিকে গিয়েছে ; সেই লাইনে রাণ্টাচিন্তালায় এই পাথরের খনি। ঐখান থেকেই এখানে আসছে পাথরের ফালি লম্বা লম্বা সাইজ, নানা আকারই পাচ্ছে। এইসব প্রত্যহ দেখাশুনা, বন্ধু-বান্ধবদের দেখানো, তাদের মতামত নেওয়া, আবার তাই নিয়ে আলোচনায় তাঁর প্রবল উৎসাহ।

এখন ঐ দুর্গা-মন্দির থেকে খানিকটা দক্ষিণে গেলেই রামায়ৎ আশ্রমটি। নাইডু গারুর ঐ নবাগত এবং আমার অপরিচিত সাধুটি ঐখানেই নাকি আসন করেছেন। নাইডু মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যেই তাঁর কাছে আসেন, কত কথা নিবেদন করেন। নানাভাবেই সাধুকে প্রসন্ন করে তাঁকে কিছু দান গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেন। সাধুর কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই, এই পর্যন্তই তাঁদের সম্বন্ধের কথা।

এইটুকুই জানা হয়ে গেল, আমার পক্ষে তাই ঢের।

পরদিন সকালে একেবারে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে উঠলাম। মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ, এই সকালে, তখন সাড়ে সাতটা, এখন সাধুর কাছে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। প্রভাতে সাধুদের বিরক্ত করার অধিকার নেই—অবশ্য তাঁর আজ্ঞা থাকলে স্বতন্ত্র কথা। শেষে একটু উঁকি মেরে দেখেই চলে যাব এই মনে করে ঐ সাধু আশ্রমে গিয়েছি ;—দেখি কেউ নাই ; বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়েছেন। এইভাবে প্রথম উদ্যমে নিরাশা হয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাকেই বা বলবো, অন্তর্যামী জানলেন। একটা ভয়ও ছিল, বিরক্ত হয়ে সাধু এখান থেকে চলে যাননি তো?

॥ ২ ॥

চলেই এলাম আমি। এসে বসলাম স্টেশনে প্লাটফরমের উপর এক বেঞ্চে। সাধু দর্শন হলো না, এখন এই জনস্রোত দেখতেই রইলাম। বিচিত্র এই মানব-সমাজ, নানা প্রকৃতির মানুষ—তার মধ্যে এক ধরণের মানুষ যারা গায়ে পড়ে

আলাপ করে, মেশে, তারপর বিচ্ছেদ ঘটাতেও বেশী দেরী হয় না। নিজের কাজ যতই থাক পরচর্চার সময়াভাব হয় না। এমনই একজনের সঙ্গে দেখা হওয়া আমাদের যতই অরুচির হোক না কেন শেষ অবধি দেখা যায় সে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ করেছে।

অসংখ্য যাত্রী দেখছিলাম। তারই সঙ্গে এক মূর্তির সঙ্গে দেখাদেখি, খানিক পরিচয়ও ঘটে গেল—লোকটি বাঙ্গালী, পোষাকে আধুনিকতার ছাপ দেখেই বলচি। লম্বা দোহারা শরীর, পরণে ধোপদোস্ত ঢলঢলে পাজামা, তার উপর ঐ রকমের পাঞ্জাবী, ডান দিকে বোতামের সার, পায়ে নূতন স্যাণ্ডেল, মাথায় গান্ধী ক্যাপ। প্রৌঢ় বয়স হলেও মুখে যৌবনের চপলতা, তার মধ্যে ঘন চুলে প্রায় মাঝ বরাবর সিঁথি, মাথার দু'পাশের জুলপির চুল বেশী পাকা। মানানসই পাতলা ভ্রু, ছোট ছোট চক্ষু তার, তারা দুটি একটু কটা ; —কেমন একটা ছট্‌ফটানি নিয়েই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর, আমার সামনাসামনি। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন, তারপর হন্‌হন্‌ করে কাছে এসেই একগাল হেসে,—বাঙ্গালী ! নিশ্চয় ? বলে দুই কাঁকালে হাত দিয়ে বুক চিতিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ;—যেন বিচক্ষণতার প্রতিমূর্তি।

যেই আজ্ঞে হাঁ, বলেছি, একেবারেই পাশে এসে বসলেন।

আমার নাম কৈলাসপতি রায়, আজ প্রায় এক উইক এখানে এসেছি, আরও দক্ষিণ দিকেই যাবো, সেতুবন্ধ পর্যন্ত ইচ্ছে আছে। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু বলেই, আমার পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন আরম্ভ হলো ;—কে আমি, এখানে কোথায় এসেছি কোথা যাবো, কত দিনের জন্য, উদ্দেশ্য কি, কবে এখান থেকে যাবো এবং কোন্‌ দিকে ? আগে কোথা ছিলাম, আগে এসেছিলাম কিনা ইত্যাদি। প্রায় দশ মিনিট কাল প্রশ্ন-উত্তরের ঝড় উড়িয়ে শেষে বললেন,—আপনার কথা তো সবই বললেন, আমার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না তো ?

বললাম, আগ্রহের অভাব, বুঝতেই তো পারছেন।

ইতিমধ্যে তিনি জেনেই নিয়েছিলেন,—আমি এখানে বন্ধুত্বসূত্রে শ্রীমান ব্যান্‌কট রত্নম্‌ নাইডুর আশ্রয়ে তাঁর অতিথি হয়েই আছি। তিনি এখানকার একজন মহামান্য, বরেণ্য, ধনৈশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সবার উপর একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তার উপর ধার্মিক বলে, এখানে যতগুলি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ, তাঁর দানের প্রসিদ্ধিও কম নয়, এসবও তিনি শুনেছিলেন। এখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কথাই এনে ফেললেন, বললেন—তাঁর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছে, লোকটা কালচার্ড, বাঙ্গালীর গুণগ্রাহী ;—বেশ সৌখীনও বটে ;—বাড়ির কাছেই একটা ঠাকুরবাড়ি আছে, না ? সাধুসন্ত বৈরাগীদের আড্ডা, লোকটা ভিতরে ভিতরে কি রকম কে জানে ? বাইরে থেকে যেন রিলিজিয়াস মাইণ্ডেড্‌ মনে হয়, না ?

উত্তর দিলাম, হাঁ। তার পর জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কি সি-আই-ডি অথবা—

ইনসিওরেন্স এজেণ্ট ! হাঁ, মাঝে মাঝে ও-কাজও করে থাকি। ঠিক ধরেছেন।

তা হলে তো সবই জানেন দেখচি ?

তা জানতে হয় বৈকি ;—আরও জানি, সেদিন নাইডু একজন সাধুকে

অপমান করে তাঁর ঠাকুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে ঠিক অপমান নয়, একটু তাচ্ছিল্য করে যা তা বলেন, তাইতেই তিনি চলে যান, পরে চেষ্টা করেও আর ফেরাতে পারেন নি। আপনি জানেন না এ কথা?

বললাম,—মোটে পরশু রাত্রে আমি এসেছি, তাঁর বসত বাড়িতেই ছিলাম, ঠাকুরবাড়িতে কবে কি হয়েছে জানবো কি করে সব বৃত্তান্ত? তবে তাঁর কাছেই একটু আধটু শুনেচি ঐ সাধুর কথা।

তা হয়তো ঠিক, কিন্তু এ নিয়ে এখানে নানাকথা হয়েছে।—আমি সাতটা দিন আছি তো, দেখলাম শুনলাম অনেক কিছুই; যদিও আমি ঐ সাধু-ফাধু বেটাদের বিশ্বাস করি না, বরং ঘৃণাই করি ঐ সব অকর্মণ্য ভণ্ড তপস্বীদের।

এতক্ষণ আমার অসহ্য হয়ে এসেছিল এই লোকটির সঙ্গ। এবার আর কোন কথা না বলে একেবারেই উঠে পড়লাম, বেশ জোরেই পা চালিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছি। ফিরে দেখি লোকটিও আসচে; মতলবটা বুঝতে একটু দাঁড়িয়েচি;—কাছে এসে একটু অপ্রতিভের মত হেসে বললেন,—বিরক্ত হয়েছেন হয়তো, কিন্তু আমি মিথ্যা বলিনি; সে সাধুকে আমিও দেখেচি, পাগলাটে—ভিখারী ক্লাসের, মনে হয় বাঙ্গালী। দুর্গামন্দিরের কাছে রামানন্দীদের একটা আশ্রম আছে, সেইখানেই থাকে; সত্য মিথ্যা একবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেই আসুন না।

আর কথাটি না বলে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে বোধ হয় সাধুকে পাওয়া যাবে ভেবেই যথার্থ বলতে কি মনের অগোচরেই কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ পাহাড়ের উপর দুর্গামন্দিরের কাছে সাধুর দ্বারে পেঁছে দিলে।

সামনেই বসে এক মূর্তি,—নিম্ন দৃষ্টি তাঁর। এ আশ্রম আমার জানা, আগে অনেকবার এসেছি। এখন সোজা এসেই প্রবেশ করলাম।

এখন নির্জন। সামনেই বেশ লম্বা চওড়া চতুষ্কোণ বেদী বা চৌতারা। তারই এক ধারে বসে আছেন সাধু, একখানা চেটাইয়ের উপর। কতকগুলি তাল-পাতার চেটাই এক দিকে রাখা আছে, একখানা টেনে নিয়ে বসলেই হ'ল। দুই হাতে, খাড়া-মোড়া হাঁটু জড়িয়ে বসে আছেন তিনি। অদ্ভুত মূর্তি একটি। শ্রীহীন বিবর্ণ একখানা বস্ত্রমাত্র কটিদেশে জড়ানো, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন; দেখলেই মনে হয় পেটভুখা, সাধারণ গাঁজাখোর পথে ঘাটে যাদের হামেসাই দেখা যায় তাদেরই একজন;—লম্বা শরীর, ধূলায় ধূসরিত উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ; কোন চিহ্ন বা সাধু-সম্প্রদায়ের ভেক নেই। জানবার যো নেই মানুষটি সাধু সজ্জন অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক পথের পাগল একজন। মাথার চুলগুলি রুক্ষ, বহুকাল তৈলহীন, ধুলায় প্রায় কটা সামান্য একটু ছাগল দাড়ি কিন্তু গোঁফ-জোড়া বেশ ঘন, এ এক অদ্ভুত মূর্তি। বোধ হয় কিম্ভূতকিমাকার এই মূর্তি দেখেই নাইডু গারু প্রশ্ন করে থাকবেন।

গিয়ে দাঁড়িয়েছি,—কোন্ দেশের মানুষ কি সম্প্রদায় এই সব ভাবছি: —একবার মাত্র ঝটতি নিম্ন দৃষ্টি তুলে আমার মুখের উপর ফেললে;—তাঁর ঐ চাহনীতেই চমকে দিলেন আমাকে,—অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। বললেন,—সাধু দেখতে এসেছ তো দাঁড়িয়ে কেন? তখনই প্রণাম করে বসলাম,—এতক্ষণে মনটা শান্ত হলো।

সাধু অনেক তো দেখেছি—ভেক-ধারী, প্রচ্ছন্ন, যোগি, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, বাউল সহজিয়া, হিন্দু, মুসলমান,—কত কতরকম সাধুই আছেন এই ভারতে। বসে বসে মনের ভাবে ভাব মিলিয়ে দেখছি, এঁর সঙ্গে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ কোন সাধুরই মিল নাই।

নির্বাক, বিস্ময়াবিষ্ট, চেয়ে দেখছি মানুষটির দিকে ; বয়সটা কত, ধরাই মুস্কিল। রোগা একহারা শরীর, মুখের ভাবে একটা সরল গ্রাম্য রূঢ়তা। মাথার চুলের মধ্যে একবার আঙ্গুল চালিয়ে আর একবার আমায় দেখলেন। তাঁর চক্ষু দুটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ, ঘন ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল রক্তাভ নেত্র, জল-ভরা, টলটল করচে, মধ্যে বড় বড় কালো তারা,—ঐ চক্ষু দুটি ছাড়া এ মূর্তির মধ্যে আকৃষ্ট হবার কিছুই নেই। নিম্ন দৃষ্টিটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য. কথা কইচেন—নিম্নদৃষ্টি ঠিকই আছে।

এখন যেন আপন মনেই বলছেন ;—দক্ষিণের লোক. এঁদের সাধু চেনার লক্ষণ হল ভেক্, আর সম্প্রদায় ছাড়া সাধু হবে না ; সাধু হলেই তার দণ্ড চাই, ত্রিশূল চাই. কমণ্ডলু চাই, গৈরিক পীতাম্বর, রক্তাম্বর, শ্বেতাম্বরে ভূষিত হওয়া চাই, ফোঁটা তিলক রুদ্রাক্ষ মাথায় জটাভার না হয় মুণ্ডিত তুণ্ড,—এ সব না হলে সাধুই হল না। এই পর্যন্ত বলে চুপচাপ, কতক্ষণ আর কথাই নেই। আবার বলছেন ;—সেদিন ঠাকুরবাড়িতে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই যাইনি। সেদিন অনেকটা দূর পথ হেঁটে পথশ্রমে একটু ক্লান্ত হয়েই ফটকের ধারে নিমগাছটার ছাওয়ায় বসেছিলাম। এমন সময় ভাগ্যবান এলেন ; পিছনে দুই তিন জন সহচরও ছিল। প্রথমে আমিই ছিলাম, নজরে পড়লাম ;—অদ্ভুত এই মূর্তি দেখেই প্রশ্ন,—এই, আপ্ কোন্ সম্প্রদায়কা সাধু ? বললাম,—কোই সম্প্রদায়কো খাতেমে অব্‌তক্ তো নাম লিখায়া নহি। এ্যায়সাই ঘুমতা ফিরতা। ব্যাস্—শুনেই কর্তা বলে ফেললেন.—তব্ তো সাধুই নহি, হিঁয়া কাহে ? এইমাত্র কথা। তাঁর কথার ভিতর দিয়ে একটা প্রবল তাড়িত শক্তি যেন আমাকে তখনই উঠিয়ে দিলে সেখান থেকে।

তারপর চুপচাপ। খানিক পরে আবার বলছেন,—আপন মনেই চলে আসছিলাম। বাবুর সঙ্গী একজন তাঁর কানের কাছে কি বললেন ;—সুবুদ্ধি বাবু তখনি ফিরে এসে আমাকে ফিরতে এবং যেখানে খুশি বসতে বললেন। আমার আর ওখানে যেতে প্রবৃত্তি হল না ; সোজা এইখানেই এসে গেলাম,—

ব্যাস শান্তি। কিন্তু বাবুর দৃষ্টিটা ঠিকই আছে। প্রত্যহ দুর্গামন্দিরে আসেন, দর্শনের পর এখানেও আসেন, প্রায় এই সময়টায় ;—একটু বসেন, প্রশ্ন করেন, তুষ্ট করতে আমায় তাঁর আস্তানায় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি, অনেক উপরোধ অনুরোধ করেন, অনেক মিষ্ট কথাই বলেন ;—আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশও দেন যথা,—সাধুদের রাগ বা অভিমান ভাল নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, বাবুটি একেবারেই সোজা মানুষ ;—আর হিন্দী চমৎকার বলতে পারেন। দক্ষিণ দেশের লোককে এত সুন্দর হিন্দী বলতে শুনি নি।

ঠিক যেটুকু জানতে আসা বিনা প্রশ্নে চমৎকার জানা হয়ে গেল ! ইনি কি অন্তর্যামী ! এ কথাটিও একবার চিত্তের মধ্যে উঠলো ;—আমার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা কওয়ার মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দরকারের বেশী সাধু আর একটিও কথা কইলেন না।

আমার মধ্যে চিন্তার প্রবাহ। এখানে আর আমার কোনো কাজই নেই ; —সাধুর পরিচয় পাওয়া ছাড়া। আমার পক্ষে, এঁকে প্রশ্ন করে পরিচয় বার করা নিতান্তই অসঙ্গত, অশোভন এবং ধৃষ্টতা। বিশেষতঃ ইনি এমনই ভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, কারো পক্ষে তাঁর উপরে অযাচিতভাবে ঘনিষ্ঠতা করা অসম্ভব। তাঁর কথা কওয়ার মধ্যে লক্ষ্যের বিষয় হল, অতি মধুর কণ্ঠস্বর ; —অথচ বাইরেটা পাগলের মত মলিন যেন অস্পৃশ্যই করে রেখেছেন নিজেকে। তা ছাড়া এটিও জানতাম এ যুগে পরমহংসদেবের তিরোধানের পর থেকেই এমনই এক শ্রেণীর বৈরাগ্যবান দেখা গিয়াছে যাঁদের মধ্যে গতানুগতিক ধর্ম সম্প্রদায়ের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান অথবা ধর্মের কোন চিহ্ন এমন কি গৈরিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ মালা, তিলকাদি ব্যবহার উপেক্ষিত এবং অর্থহীন। এটি অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী সাধু সম্প্রদায়ের কথাও বটে।

তারপর আমার দিকেও একটু কথা আছে।

যখনই আমি কোন নূতন অপরিচিত সাধুর সঙ্গে মিলবার সুযোগ পাই ; সাধুর প্রকৃতি বুঝতে, তাঁর মূর্তি দেখে যা কিছু ভাব মনে আসে, তা বুঝতে খানিকক্ষণ যায়, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে কথা কইতে পারি না। এখন—এঁর সঙ্গ আমার কাম্য কিনা সেইটিই হ'ল কথা। সকল সাধুসঙ্গই যে প্রীতিকর হবে এমন কথা তো নেই। অনেক জায়গায় ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, ভাবে গদগদ হয়ে, এক সাধুর বাহ্য সৌম্য মূর্তি দেখে এগিয়ে মিলতে গিয়েচি, ফলে এমন হয়েছে মিলন তো হলই না উপরন্তু অনুশোচনা নিয়ে ফিরতে হয়েচে। সে যাই হোক, এখন সরল প্রাণেই আপন অকপটতার পরিচয় দিয়ে, আমার উদ্দেশ্য বুঝে এবং কৌতূহল মিটিয়ে প্রথমেই ইনি যে আমায় গ্রহণ করেছেন, তাইতেই আমায় আকৃষ্ট করেচে অর্থাৎ অন্তরে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েচি, এতে আর সন্দেহ মাত্র নেই। এখন এই গম্ভীরাত্মার কাছে আমার কোন কথাই যোগাচ্চে না অথচ ইনি আর কথাই কন না। আমি কি করবো, এইভাবে যখন সংশয় দোলায় দোল খাচ্চি ;—দেখি,—সামনেই, এই আশ্রমের প্রবেশ-পথে শ্রীযুত ব্যানকট্ রত্নম্ নাইডু গারু প্রবেশ করচেন। উজ্জ্বল, অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি তাঁর ঐ সাধুর উপর,—পিছনে পিছনে আসছে স্টেশনের সেই কৈলাসপতি রায়, অনুগত এক ভক্তের মতই এখন তাঁর ভাবটি।

হাওয়াটা যেন বদলে গেল, গুমোট কেটে গেল এখানকার।

আমাকে এখানে সাধুর সঙ্গে দেখে, বোধ হয় নাইডু গারু ধরে নিলেন আমরা পূর্ব-পরিচিত। তাঁর কি মনে হল ঠিক জানি না, বললেন, মিঃ চ্যাটারজি। একটা আহম্মকের মত কাজ আমি করে ফেলেচি, বোধহয় জীবনে এই প্রথম।

দক্ষিণ দেশে এলে আমাদের ইংরাজিতেই কথার আদানপ্রদান চলে। এখানেও ইংরাজীতেই হলো। বললাম,—শুনেছি কিছু কিছু,—কিন্তু আপনার এতে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, যেহেতু কোন অন্যায় অথবা অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নি। নিন, আসুন, এখন এখানে যখন এমন একজনকে পাওয়া গিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করা যাক।

শুনে—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এই জন্যেই তো এখন আসা ;—এই বলে নাইডু একখানা চেটাইয়ে বসলেন, কৈলাসপতি সসম্ভ্রমে আগেই পেতে দিয়েছিলেন। এখন নাইডু বললেন, আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েচি, এঁকে কি বলে সম্বোধন করবো ভেবে পাই না ;—কোন সম্প্রদায়ের চিহ্নই নেই এর মধ্যে, চেহারা দেখেও বোঝবার যো নাই কিছু। শুনে আমি বললাম,—

এতে মুস্কিলটাই বা কি, সাধুজী বলতে পারেন, স্বামীজী বলতে পারেন, মহাত্মাজীও বলতে পারেন।

এতক্ষণ পর সাধু সুন্দর ইংরাজীতেই বললেন,—ওটা গান্ধীজীর নিজস্ব, মহাত্মাজী বলতে একমাত্র তাঁকেই বুঝি আমরা।

সাধুর মুখে ইংরাজীতে কথা শুনে এবং সুন্দর সহজ শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিব্যক্তিতে নাইডু গারু মুগ্ধ হলেন--বললেন, তিনি তো মহাত্মা সত্যই, তবে পলিটিক্যাল ফিল্ডে।

এর পর কেউ আর কোন কথাই কইলেন না, কেমন যেন খাপছাড়া কথা-বার্তা। এবার কৈলাসপতি বাবু দম্ভভরে এগিয়ে এসে, যেন নাইডু গারুর সমপদস্থ ব্যক্তি এমন ভাবেই নাইডুকে লক্ষ্য করে ইংরাজীতে বললেন,—আমি কিন্তু, ভগবান বা ভক্তি ধর্ম, এ সব বুঝি না ; একজনের জীবনে তার কর্মই হল আসল, একথা আমাদের বুদ্ধদেবই বলে গিয়েছেন। নিরন্তর অভাবগ্রস্ত, পুরুষার্থহীন, অলস প্রকৃতির মানুষ যারা তারাই ধর্ম ধর্ম করে ভগবানের ভক্ত সেজে সমাজকে এক্স্প্লয়েট করচে, সংসারীদের দোহন করছে বহু কাল থেকে। আমার সাফ কথা, বলতে ভয় পাই না।

এই বলে রায় মশাই এখন জোর করেই নিজ যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করতে এগিয়ে এলেন।

নাইডু বললেন,—ওসব মার্ক্সবাদ এখানে চলবে না,—যদিও আমি স্বীকার করছি হয়তো কেউ কেউ ঐ ভাবের মানুষ থাকতে পারে ধর্ম-সমাজে। কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ্য করে যাঁরা সব কিছু ছেড়েছেন সে দৃষ্টান্তও বিরল নয় এ দেশে, তাঁদের পুরুষার্থহীন বলবেন কি করে?

কৈলাসপতি তবুও বললেন,—আসলে একটা অর্থকরী বৃত্তি ছেড়ে আর একটি অর্থকরী বৃত্তি ধরা,—ধন-সংগ্রহের ফিকিরটা তার ঠিকই আছে। ধন ছাড়া কারো গতি আছে কি, বুঝে দেখুন না।

কথাটি শুনেই সাধু একটু হেসে, যেন আপন মনেই বলছেন,—সাবাস! সার কথা বলেছেন বাবু খাঁটি জিনিসটাই ধরে ফেলেছেন একেবারে।

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে গলার স্বর চড়িয়ে কৈলাসবাবু বললেন,—পরিহাস করছেন, আমি প্রমাণ করে দেবো,—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দোয়ার্কা আর পূর্বে আসামের পরশুরাম তীর্থ পর্যন্ত যেখানে যত তীর্থ, ধর্মস্থান আছে, তাইতে যত সাধু আছে সবাই হা পয়সা, হা পয়সা করছে ;—পয়সা উপার্জনের ফিকিরেই দিন কাটাচ্ছে।

রায় মশাইয়ের এতটা উৎসাহ দেখে সাধু যেন চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তিনি সোজা হয়ে আসনে বসলেন, আকাশের দিকেই দৃষ্টি,—আর নিম্নদৃষ্টি নেই। তার পর কৈলাসপতি রায়মশাইয়ের চোখের উপর এমনই একটি দৃষ্টি হানলেন যার ফলে অমন উৎসাহদীপ্ত মুখখানি তাঁর নিষ্প্রভ হয়ে গেল, কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

সবাই চুপচাপ। কি যে হলো, কেউ কিছুই বুঝল না ; কিছুক্ষণের জন্য সব ঠাণ্ডা, কারো মুখে কথা নেই।

নাইডু গারুও সবার মুখের দিকে এক একবার দৃষ্টিপাত করে কিছু না বুঝতে পেরে চুপ করেই ছিলেন ;—এইবার—সুযোগটি তিনি চমৎকারভাবে ব্যবহার করে ফেললেন। দুই হাত জোড় করে, বিনয়পূর্ণ কোমল কণ্ঠে বললেন,--একটি কথা আমি কোনরকমেই মীমাংসা করে উঠতে পারিনি স্বামীজী—কথাটা আমার নিজেরই, ধন আর ভগবান এর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা যথার্থ বড়ো।

সাধু বললেন,—কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট এ কথায় কাজ কি, আপনার প্রাণ যেটি চায় সেইটিই বড়ো বা সত্য জেনে তাকেই কষে ধরে থাকুন না।

তা তো পারি না,—ভেবে দেখেছি, ভগবান তো শুধু মনের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু ধনের অস্তিত্ব বাস্তব, প্রত্যক্ষ, এতটা শক্তিশালী বস্তু জগতে আর আছে কি ? ভগবান না ভাবলেও দিন চলে কিন্তু অর্থ না থাকলে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আবার একটা যেন স্তম্ভিত ভাব এসে গেল। নাইডু গারুর এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে তখন সাধু স্থির হয়ে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ আকাশ-পানেই চেয়ে রইলেন, ঠিক যেন ঐখানেই উত্তর দেখে নিচ্ছেন। নাইডু গারু কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না, একটু অস্থিরভাবেই বললেন,—আজ যখন ধরা দিয়েছেন তখন চক্ষুলজ্জার বালাই রাখব না ; নির্লজ্জভাবেই সব কথা প্রকাশ করবো—প্রভু ! আমার দুইই চাই ;—ধনও চাই, ভগবানও চাই। কোনটা ছাড়তে রাজি নই। এই আমার চরম নিবেদন।

সাধু মাত্র একটি শব্দ প্রকাশ করলেন,—চমৎকার !

নাইডু আবার বললেন—ভিতরের কথাই বলছি,—যখন ধন উপার্জনের পিছনে কাজ করি তখন দেখেছি, নিরুদ্বেগে একটি দিনও কাটাতে পারি না, মনে হয় আমার আসল কিছুই হলো না, আবার যখন আসল কাজ বলে জপ-ধ্যান করতে যাই, কিছুতেই দীর্ঘ কাল মন রাখতেই পারি না, চিন্তার ভিতর দিয়ে ঠিক বিষয়ের এবং ভোগের মর্মস্থলেই এসে পড়ি,—এর কি উপায় বলতে পারেন ?

সাধুর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—এ প্রফুল্লতা স্বর্গীয়। বললেন,—আপনি মহৎ,—অকপট না হলে শুধু ধনাধিকারীর এ বুদ্ধি হয় না। কিন্তু

—প্রাণ তো একটা, দুটো সামলাবেন কি করে? দু নৌকোয় পা? —আবার যেখানে দুটো, সেইখানেই ঠোকাঠুকি, এড়াবেন কি করে?

নাইডু বললেন,—সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু মানুষের বেলা কেন এটা হবে?

স্বভাবের নিয়মে হবে। রাজার দুই রাণী—শুয়ো আর দুয়ো। দুই নিয়েই ঘর করতে হয়। দুইয়েরই আকর্ষণ আছে, ঠোকাঠুকি হবে না? জীবন্ত শক্তি যে। রাজার টান সুয়োরাণীর উপরেই বেশী। ধন, ঐশ্বর্য, ভোগ বিলাস, সকল আনন্দই সুয়োরাণী,—তার উপরেই দম বেশী, ঈশ্বর তো আপনার দুয়োরাণী, তাকে দেখা, তাকে নিয়ে ইচ্ছামত ব্যবহার চলে কি?

নাইডুর শরীরটা আর দুলছে না—একেবারেই স্থির। সাধু বলছেন,—আমাদের দেশে এক বড় ভাগ্যবান, শক্তিশালী, প্রবল বিষয়ী ছিলেন, লালাবাবু নাম; তাঁরও ঐ দুইই চাই;—বিষয়-ভোগটাই প্রবল অবশ্য। এইভাবে অর্ধেক জীবনই কেটে গেল,—দুই নিয়ে ঠোকাঠুকি, শান্তি পাচ্ছিলেন না,—তারপর যথাকালে ঘটে গেল এমনি গোলযোগ,—তখন তিনি নির্ঘাৎ বুঝলেন, এই ভাবে দুই নিয়ে থাকলে কোনটাই পাওয়া যাবে না। তখনই বিষয়ে অরুচি ধরল, জীবন দেবতার উপর লক্ষ্য স্থির হল;—তাইতেই ঝাঁপ; ফলে সর্বার্থসিদ্ধি, ইষ্টলাভ যাকে বলে তা-ই ঘটে গেল,—সময় হলে আপনিও ঠিক বুঝবেন।

আর প্রশ্ন নেই, নাইডু গারু একেবারেই স্থির। চোখের কোণে এক-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, জামার হাত দিয়ে সেটা মুছে ফেললেন,—তারপর বললেন,—আজ আমার মহাভাগ্য, আপনার কাছে বসে যেন সবকিছুই পেয়ে গেলাম;—প্রাণ ঠাণ্ডা হল, মনে দ্বন্দ্ব নেই আর। কিন্তু এখান থেকে যেই যাবো—পূর্ববৎ;—সার্থক মনে করে বিষয়ের উপাসনাই করবো।

সাধু বললেন,—বাবা, ওটাও তো মিথ্যা নয়, জগৎ-সংসারে ধনই তো আসল। এখানে কি বিশাল কর্মপ্রবাহ চলছে ঐ ধন নিয়ে, কত কত মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে, একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত ঐ ধনের অধিকার সর্বত্রই প্রবল। যখন তাঁর কৃপায় ঐ বস্তুর অধিকারী হয়েছেন তখন এর পরিচয়টি ভাল করে নিয়েই নিন না; এ থেকে যতটা হয় করে নেওয়াই ভাল। তা ছাড়া আপনার এই জীবনে কর্মপ্রবৃত্তির মূলে তাঁরও যে একটা অভিপ্রায় রয়েছে সেটি দেখচেন না কেন?

কথাটি এতই হৃদয়গ্রাহী, নাইডু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু,—এই কথাটা শুনেই কৈলাসপতি কট্‌মট্‌ দৃষ্টিতে একবার সাধুর দিকে দেখলেন,—তখন সাধুর দৃষ্টি নীচে জমির উপরেই ছিল তাই তিনি ওটা দেখতেই পেলেন না। কৈলাসের রোষকষায়িত নেত্রের দৃষ্টিটা বৃথাই গেল। নাইডু গারু একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন,—বললেন, যদি ভণ্ড মনে না করেন তা হলে সাহস করে একটি কথা বলতে পারি কি?

সাধু বললেন—ভণ্ড আমরা অল্পবিস্তর সবাই, ঐ বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন,—তিনি আমাদের কাজে কতই না অসঙ্গতি দেখছেন।

চিন্তিত মনে নাইডু বললেন—যখনই আপনাদের মত ত্যাগী মহাত্মাদের সঙ্গ পাই, তখনই মনে হয় যে পরমেশ্বরের উপাসনাই সবার বড়ো, সব ছেড়ে তা-ই করি। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণভাবে মনটা রাখতেই পারি না; অর্থকরী

বিষয়টাই টানে। তখন এটাও বুঝতে পারি সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় কোন একটা বস্তু ধরা বা ছাড়া কখনও স্থায়ী সুখের বিষয় হয় না। তখনই ভাবি পরমেশ্বর সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শুনে আগে কিছু সঞ্চয় না করে ওদিকে এগোনো যাবে না।

সাধু হেসে বললেন—এই তো ঠিক বিজনেস্‌ম্যানের মতই কথা, এই তো চাই।

নাইডুর মুখে একটু অপ্রতিভের হাসি। বললেন,—কথাটা হয়তো আমার ঠিক বলাই হয় নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম সম্বন্ধটি আগে ঠিক করতে পারলেই উপায় ঠিক পাওয়া যাবে, যেহেতু তাঁকে যে আমার চাই-ই।

এ চাওয়া আপনার কি রকম জানেন,—যেমন একজন মহারাজা বা রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া বা তাঁকে পাওয়া, আসলে আপনার বিলাসের একটা উপাদান হিসেবেই চাওয়া বা পাওয়ার কথা। কিন্তু আসলে বস্তুটি আপনার ধারণার বাইরে অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধারণা করা অসম্ভব।

তা হলে তো মুস্কিল,—আমরা কি তাঁর সম্বন্ধে কিছুটাও জানতে পারবো না? আচ্ছা, এই যে দুর্গা, কালী, অথবা রামসীতা, হরপার্বতী, কিম্বা রাধাকৃষ্ণ মূর্তি পূজা করি, তাও তো ঈশ্বর-পূজা?

যদি তা-ই ঈশ্বরপূজা বলে ধারণা হয়ে থাকে, তবে আবার আলাদা ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন কেন, তাইতেই ডুবে যান না। তাতেও লাভ কম নয়।

হাত জোড় করে নাইডু বললেন,—প্রভু! আমরা জ্ঞানবৃক্ষের ফলও যে খেয়েছি খানিকটা। কখন কখন মা জগদম্বা বলে বেশ শান্তি পাই ঐ মন্দিরে গিয়ে; আবার কখনও মনে হয় মায়ের উপরে বাবাও একজন আছেন, তত্ত্বের দিক থেকে হয়তো তা ঠিক জানা হচ্ছে না, ফাঁক পড়ে যাচ্ছে;—মনে হয় অনেক কিছু জানবার আছে এ সম্বন্ধে। পুরাণ পাঠ করে একরকম বুঝি,—তারপর উপনিষৎ বেদান্ত পড়ে মাথা একেবারেই গুলিয়ে যায়।

কি মনে হয়?

মনে হয় যে সেটি এমনই এক পদার্থ যে আমাদের মত মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও ধরা সাধ্য নয়।

এই তো ঠিক, ঐখান থেকেই তো আরম্ভ। কেবল পরমাত্মা, পরমেশ্বর, আর পরমব্রহ্ম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শব্দের এই ধোঁকাগুলি এক করে ফেলতে হবে,—তারপর তাঁর সঙ্গে সত্য সম্বন্ধটা যে কি তাই জানবার সরল পথ পাওয়া যাবে।

ক্ষমা করবেন, আবার বলছি একটু কষ্ট করে বলুন না আমার মত আকাট বোকার বুদ্ধিতে ধরবার মত করে। তাঁর সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধটি কি রকম?

আপনারা ইনটেলেক্‌চুয়াল, যুক্তিটাই বোঝেন, আর তাই ধরেই চলেন একরকম করে। বলতেই যদি হয়, সে বস্তুটি এমনই যে এখানকার ভাব দিয়ে বুঝানো যায় এমন কোন সম্বন্ধই নেই তাঁর সঙ্গে।

শুনেই বিষণ্ন মুখ;—ভিতর থেকে নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘশ্বাস প'ড়লো নাইডুর, বললেন, সেটি কি রকম সম্বন্ধ একটু বলুন না, অন্ততঃ কাছাকাছি কিছু, একটু আভাষও যদি পাই।

সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ আত্মিক অর্থাৎ আত্মার সঙ্গেই, তা ছাড়া শরীর মন

বুদ্ধি প্রভৃতি এখানকার কোন ব্যবহারিক শব্দ দিয়ে বুঝানো যাবে না। অথচ এখানকার কোন সম্বন্ধের উদাহরণ না দিলে আপনিও বুঝবেন না ;—তখন আমায় বাধ্য হয়েই এর নিদান, এখানকার চরম সম্পর্কের কথাই বলতে হবে,—তাঁর সঙ্গে মাত্র প্রেমেরই সম্বন্ধ।

আরও একটু বিশদ করে বলুন, প্রভু!

তিনি প্রেমময়! প্রেম ছাড়া আর কোন শব্দই নেই যা ঐ বস্তুর সম্পর্কে লাগানো যায়।

শুধু প্রেমময়?—কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি তো বলেন তিনি শক্তিময়ও বটেন।

যে পণ্ডিত ও কথা বলেন, তাঁর মাথায় তখন শক্তি নিয়ে প্রবল আলোড়ন চলছিল, শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের প্রবৃত্তিটাই প্রবল হয়েছিল, না হলে শক্তির মূলেই ঐটি, তাঁর না জানবার কথা নয়। আসলে তিনিই প্রেমময়। মানুষের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সেই প্রেম, আপনার মধ্যেও তার অভাব নেই ;—তবে যতক্ষণ ঐ প্রেম বিষয়ভোগ অথবা দান যজ্ঞাদি সৎকর্মের উপর রয়েছে ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা অবান্তর।

এক এক সময় তো আন্তরিকই চাই মনে হয়।

এক এক সময়ের কথা নয় ;—আপনার সকল সময়টাই যখন ঐ আন্তরিক চাওয়াতেই ভরে যাবে তখনই ঠিক জানা বা পাওয়ার কথা। সে ছট্‌ফটানির বর্ণনা নেই—একমাত্র তার দৃষ্টান্ত এই যে আসন্ন প্রসবার বেদনার মত।

আচ্ছা, তিনি তো সবকিছুই যা যা আমাদের মনে উঠেছে—জানতে পারছেন—

অনুভব করছেন, হাঁ, তাইতো সবকিছু ছেড়ে যতক্ষণ না তাকেই ধরতে চাইছেন ততক্ষণ পাবার কথাই উঠছে না—একমাত্র প্রেমেরই সম্বন্ধ কিনা।

প্রেমের সম্বন্ধটা—নাইডু ঠিক বুঝতে পারছেন না, বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রেম তো স্ত্রী-পুরুষের যৌবনঘটিত ব্যাপার।

নাইডুর উদ্বিগ্ন ভাবটি লক্ষ্য করে বললেন,—আচ্ছা নাইডু গারু।—যদি দেখেন আপনার শয্যায় বসে আপনার স্ত্রী একজন সুন্দর যুবা পুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করছে,—সহ্য করতে পারবেন? ওটা অবশ্য উলটো করেও বলা চলে—যথা, আপনার সাধ্বী স্ত্রী যদি দেখেন তাঁরই রচিত শয্যায় আপনি এক যুবতী-রূপবতীর সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত, তাঁর নিজস্ব অধিকারে অপর একজন ভাগ বসাচ্ছেন—তিনি কি সহ্য করতে পারবেন? মোদ্দা কথা এই যে, প্রেমের সম্পর্কে ভাগীদারের স্থান নেই। যতক্ষণ ধন, মান, ভোগ, ঐশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে রয়েছেন ভগবৎ প্রেমের টান বুঝবেন কি করে?

এবার নাইডুর সকল চাঞ্চল্য স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি স্থির নিশ্চল হয়েই রইলেন, আমরাও ঐ ভাবেই আছি। কতক্ষণ পর, যেন নাইডু আবার একটা কিছু বলবো বলবো করছেন, সাধু বললেন, বেশী আর না, এখন স্বকর্মে লেগে যান, আজ অনেক কথা হয়ে গেল।

শুনে নাইডু বিষণ্ন বদনে বললেন, বেশ ছিলাম এখানে, স্বর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছেন, কেন তাড়িয়ে দিচ্ছেন প্রভু!

সাধু বললেন,—যেটুকু হল, তাইতো ভাল, নিজ স্থানে গিয়ে ভাবনা করুন, আবার দেখা যাবে। অতএব, ভদ্র নাইডু গারু নমস্কারান্তে আর কোন কথা না বলে উঠে গেলেন।

॥ ৪ ॥

কৈলাসপতি বসে রইলেন দেখে সাধু বললেন, এক যাত্রার পৃথক ফল কেন, আপনার আবার কি ভাব ?

না, আমি থাকবো, কথা আছে ; বলে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আবার বললেন,—হাঁ, দেখুন, ভগবানের নামে ধর্ম, গুরুদীক্ষা, জপ্‌তপ্‌, এসব আফিং-এর নেশা, বহুকাল থেকেই সব দেশেই, বিশেষ ভারতবর্ষের জনসাধারণকে একস্‌প্লয়েট্‌ করে এসেছে ; সন্ন্যাসী, সাধু এদের আসল লক্ষ্য হল টাকা ; নাইডু গারুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আপনি ঝোপ বুঝে বেশ কোপটি লাগিয়েছেন ; তাঁকে ধন-সঞ্চয়ে লেগে থাকতে উপদেশ দিলেন, বুঝলাম, বেশ কিছু থোক্‌থাক্‌ মেরে সরে পড়বেন। আমায় ভোলাতে পারবেন না, আপনার বুজরুগি আমি আগেই বুঝেছি। ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে উঠে আসবার মধ্যে এত মতলব আছে তা তো জানা ছিল না। বড় চালটাই চেলেছেন।

তা হলে আমার আর নিষ্কৃতি নেই দেখছি—ধরা পড়ে গিয়েছি তোমার কাছে ?

নিশ্চয়ই গিয়েছেন, আচ্ছা বলুন তো,—ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে ঐ স্বামী-স্ত্রীর ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কি কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত জানা ছিল না, সৎ ভদ্রভাবের দৃষ্টান্ত।

প্রেমের কথা বোঝাতে ওর চেয়ে বড়ো বা ভালো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত আর কি হবে, আমি তো জানি না। প্রেমের চেয়ে আর বড় বিজ্ঞানই বা কি আছে এ জগতে ? আরে বাবা ! আমরা সেকালের মুখ্যু সুখ্যু লোক ঐ রকমই বলে থাকি ; তোমার মত মারক্‌স্‌ কিম্বা ফ্রয়েডের শিক্ষাদীক্ষা হজম করতে পারলেও বা কথা ছিল, তা যখন হয়নি তখন,—যাকগে ও কথা।—একটু হেসে তারপর বলচেন ;—জানো তো আমরা বড়লোক দেখে তাদের মাথায় হাত বুলাতেই আসি ; তা তুমিও তো সম্প্রতি ধনবান হয়েছো, দাও না কিছু আমায় ;—যাবার বেলা না হয় তোমার মাথাতেই হাত বুলিয়ে যাই !

আমি ধনবান ! কি প্রলাপ বকছেন ?

তাই তো বলছি, কলকাতা থেকে আসবার সময় প্রায় সত্তরের কোটায় হাজারের অধিকারী হয়ে আসোনি কি ? মোকদ্দমা মামলা চুকে গেলে তখন ভাল মানুষের মত দেশে ফিরবে এই তো মতলব ?

ঠিক মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল কৈলাসপতির অমন উজ্জ্বল মুখখানি, কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই সামলে নিলেন অবস্থাটা। তারপর সতেজেই বলতে লাগলেন,— পাগল সেজে এখানে ওসব দমবাজি এখনকার দিনে চলবে না, আপনাদের ওসব বুজরুগি আমার অনেক দেখা আছে, খুব চিনি আপনাদের—

উঁহুঁ,—অনেক বাকী আছে বাবা, মানুষ চিনতে—এখন তো শিশু, এই বলে সাধু ওখান থেকে আমায় বাইরে যেতে ইসারা করলেন। অবিলম্বে আমি আজ্ঞা পালন করলাম।

প্রায় পাঁচটি মিনিট, তার বেশী হবে না, বাইরে ছিলাম, সাধু ডাকলেন... এস গো ! এসো,—

গিয়ে দেখি রায় মশাই বিরস বদনে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। খানিকটা ঐ ভাবেই গেল, তারপর যেন কোন জ্যোতিষীর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন এমনভাবেই কৈলাসবাবু বললেন—আমার একটা কৌতূহল নিবৃত্তি করুন, কেমন করে এত ডিটেল্ জানতে পারলেন একটু বলবেন?

তুমিই তো সব কিছুই জানিয়ে দিয়েছ বাবা, না হলে আর কোথা পাবো?

আমি? কি বলছেন! আমি জানিয়ে দিয়েছি আপনাকে আমারই গোপন মনের কথা!

হাঁ, হাঁ, তুমি, তুমি—এখানে এসে যখন ধনের মহিমা জোর গলায় কীর্তন করছিলে যে, সাধুদের একমাত্র ধনের উপরই লোভ, তখনই আমার খটকা লেগেছিল, তাই তোমার মনের ভিতর কি আছে জানতে ইচ্ছা হল। তখন ডুব দিয়ে দেখি কি কান্ড। তিনিই সব কিছু দেখিয়ে দিলেন, পরিষ্কার।

কি রকম করে বলুন তো!

রকম আবার কি,—যা যা করেছ সবই তো তোমার মনের ভিতর সর্বক্ষণ জেগে রয়েছে—তারপর, যে মানুষ নিজের মনের খবর রাখে, সে ইচ্ছা করলে অপর একজনের মনের খবরও রাখতে পারে। যাক্, আর কেন, এখন সরে পড়ো দিকি; বুজরুগদের সঙ্গ আর নয়।

একটু কাতরভাবেই কৈলাসবাবু এবার বললেন,—আচ্ছা, এবার বলুন, আমার কি হবে, শেষটুকুও বলে দিন।

ধরা যে পড়তেই হবে তা তুমি খুব ভালই জানো, সেই জন্য টাকাটা রক্ষার ব্যবস্থাও করেছে খুব বুদ্ধি খেলিয়ে, তিন পুরুষের পাটোয়ারী বুদ্ধি কিনা,—কাজেই টাকা মজুদ থাকবে, কেবল কয়েক বৎসর শ্রীঘর বাসটুকুই লাভ,—আর জ্বালিও না—সরে পড়ো, ধন আমার!

এখন যদি সাধুভাবে দিন কাটাই?

সাধুভাবে দিন কাটাবে, ঐ অপরাধের বোঝা বুকে করে? সব পাতকেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে যে, বাবা!

এটার কি প্রায়শ্চিত্ত সেটা বলুন, ঠিকই করবো।

তা তো করবে না বাবা, আমায় মিছে ছলনা করছো বোকা পেয়ে,—এর প্রায়শ্চিত্ত হল অধিকারীদের টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া—তারা দয়া করলে রক্ষাও পেয়ে যেতে পারো।

রায় মশাই আর মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, গট্‌গট্ করে বাইরে চলে গেলেন গোঁ ভরে।

সাধু বললেন, কথাটা বাবুর মনঃপূত হলনা, ব্যাপারটা দেখলে? টাকাটা ছাড়বার কথা না বলে অন্য কিছু বললে হয়তো বা শুনলেও শুনতে পারতেন। জানেন না তো, কি ভয়ানক আগুনটা নিয়ে খেলচেন।

এই পর্যন্তই কৈলাসপতির কথা—

মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা অপ্রিয় নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, এমনই পবিত্র একটি স্থানে। বেশ মনে মনে বুঝলাম—আমারও এবার যাবার পালা—আর এঁকে জ্বালাতন করবার অধিকার নেই আমার।

ভদ্রতার হিসাবে আর কতটা উত্যক্ত করা যায়,—উঠে পড়াই ভালো।

অনেক তো হলো—আর কি চাই!

পরদিন আবার গিয়েছি, এখন গিয়ে সাধুকে দেখলাম। আরও দেখি,—বোধ হয় স্থানীয় ভদ্রলোক একজন, খুব আস্ফালন করে তেলেগু ভাষায় অনর্গল নিজ কথাই ব'লে চলেছেন,—আর সাধু এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে শরীর রেখে বসে আছেন কিছু শুনছেন কি না তা ভগবানই জানেন ; কারণ তিনি চেয়ে আছেন অন্য দিকে, অন্যমনস্কভাবে। কতক্ষণ পর হয়তো একটি কথায় কিছু বললেন কিন্তু তার দিকে চাইলেন না।

এইভাবেই চললো কতক্ষণ,—আমি দাঁড়িয়েই আছি। খানিক পর ভদ্র-ব্যক্তি একখানা চেটাই দেখিয়ে—

'নুণ্ডেন্দুকু, কুরচোণ্ডি,'—ব'লে আমার দিকে চাইলেন। আমি ভাবে বুঝে নিয়েই একখানা চেটাইয়ের উপর বসলাম। তাঁর কথা চলতেই লাগল। ভাষা তো বুঝিনা, কাজেই বসে বসে অপরূপ শব্দঝঙ্কার উপভোগ ক'রতেই রইলাম। তেলেগু, তামিল, কানাড়া মালেয়ালাম—এই চারটি দক্ষিণী ভাষার যে মহিমা এক তেলেগুতেই তার অনেকটাই পরিচয় পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এখানে এখন এসে ভাল করিনি, এখনই উঠবো ? —কথাটা মনের মধ্যেও উদয় হওয়া আর সাধু এই সময়ে অপাঙ্গে আমার দিকে একবার চাইলেন, তার মধ্যে যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবারই ইঙ্গিত। আমি আর যাবার কথা মনে স্থান না দিয়ে সাধুর মূর্তির দিকেই চেয়ে রইলাম। এটা ঠিক চেয়ে থাকা নয়, নিরীক্ষণ করা যাকে বলে তাই। সাধারণভাবে প্রথম দর্শনে এই মূর্তিটিতে দেখবার মতো এমন কিছুই নেই, কেবল পলকহীন উজ্জ্বল ঈষৎ রক্তাভ জলভরা চক্ষু দুটি, দুদিকে দুই গুচ্ছ ভ্রূর নীচে।

আমি গতকাল যতটুকু দেখেছি সেই সব ভাবছিলাম। তারপর—কৈলাসবাবুর শেষ পর্যন্ত মতিগতি কি দাঁড়ালো। গোপনে এসে কিছু জানিয়ে গিয়েছেন কিনা কে জানে! উনি তো সে-কথা বলবেন না। তবে তাঁর যদি সুমতি হয়ে থাকে তো ভালো।

আবার ভাবচি, কি উদ্দেশ্যে এ-মহাত্মার এখানে আসা।

অনেকক্ষণ দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়েচে, বক্তা এখনও উঠবার নাম করছে না। একটু ক্ষুণ্ণমনেই আমি আবার নিজেই উঠবার কথা মনে করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাধু আবার আমার দিকেই চাইলেন, আর সেই বক্তা লোকটাও উঠে দাঁড়ালো। প্রণাম নয়, নমস্কারও নয়, লোকটা কোন রকমেই বিদায়সূচক কর্তব্যের অনুষ্ঠান না করেই যেন হঠাৎ আপন মনে স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে চট্‌পট্‌ প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক যেন বিশেষ কাজে গেল এখনই আবার আসবে। কিন্তু কতক্ষণ গেল যে আর এলোনা। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এইবার সাধু আসন পরিবর্তন করলেন, কিন্তু আসন পিঁড়িতে বসে নিজভাবেই চুপচাপ রইলেন, কোন কথাই বললেন না বা আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। আমার মধ্যে আনন্দ উদ্বেগ ; লোকটা তো গেল ; কিন্তু আমার পথ কোথা খুললো। তবে এই যে চুপচাপ তার মধ্যে একটা জিনিস ছিল, অপূর্ব শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশটি এক দিব্যভাবেই ডুবিয়ে দিলে যা কথাবার্তার

অবসরে মেলে না—যেন সবই পেয়েছি, চাইবার আর কিছুই নেই, কোনও অভাব নেই সুতরাং কোন প্রশ্নই নেই।

এর পর যা ঘটলো তাকে নাটকীয় বলা যায়।

কতক্ষণ পরে, সময়ের জ্ঞান তো ছিলই না,—ঐ ভাব ভঙ্গের পরেই আমার মধ্যে একটা বিচার এল, সেই সকাল থেকে বোধ হয় ঐ লোকটাই এতক্ষণ জ্বালাতন ক'রে গেল, তারপর আমিও এতক্ষণ রইলাম, একটুও এঁকে একলা হ'তে দিলাম না—এটা আমার ভাল মনে হ'ল না ; তাই এখন সরে যাওয়াই ভাল ; এই ভেবে উঠবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বিদায় প্রণামের জন্য তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি, এইবার তিনি আমার দিকে চাইলেন, যেন অবাক হয়ে গিয়েছেন আমার ব্যবহার দেখে। আমি একটু থতমত খেয়ে হাত টেনে নিলাম, মুখে কথা ফুটলো না আমার ; কিন্তু তাঁর মুখে এবার কথা ফুটলো—সহজ বাঙ্গলা ভাষা—

এতক্ষণ পর সুযোগ এল, আর এখনি চলে যাচ্চ !

জলভরা চক্ষের দৃষ্টি আমার নয়নগোচর হ'তেই আমারও চক্ষু ফেটে জল এল। তাঁর ভাবের এই ছোঁয়াচ আমার অন্তরে যেন একটা আঘাত হ'য়েই লাগলো ; অগত্যা নিঃশব্দে বসলাম। এবার তাঁর দিকেই চেয়ে দেখি, এ কি দেখচি ?—এখানে এসে পর্যন্ত এতক্ষণ যে মূর্তি দেখেছি, একটু আগেই যা বর্ণনা করেছি এ তো সে পাগল মূর্তিই নয়, সামনে আমার একেবারেই একটি ভিন্ন মূর্তি, ঐ চক্ষু দুটি ছাড়া আর কোন সম্বন্ধই নেই পূর্বদৃষ্ট মূর্তির সঙ্গে। এ কি রহস্য ! এতক্ষণ যেন একটা মুখোস পরা ছিল এখন সেটি খসে গিয়েছে। এমনই দেবোপম সুকুমার মূর্তি—মানুষের মধ্যে. আমার এতটা বয়স হল, কখনও দেখিনি। অদ্ভুত রূপান্তর—অবিশ্বাস এ পরিবর্তন। আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল ; অথচ ঐ রূপ থেকে আমার দৃষ্টি এক মুহূর্তও নড়ে নি, এমনই আকর্ষণ ঐ রূপের।

ইনি নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধ মহাত্মা—বিভূতির অধিকারী। সাধারণের কাছে দেখতে এক রকম, আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিচিত্র ভাবের আতিশয্যে রূপ একেবারেই বদলে যায়। যিনি এ ব্যাপার জানেন না বা যাঁদের ধারণা নেই, তাঁদের কাছে এই রূপান্তরের তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলাই অসম্ভব। তবে আমাদের চিরদিনের অতুল্য সম্পদ পাতঞ্জল যোগদর্শনে এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে, সম্যক পরিচয়ও আছে।

যাঁরা সাধনের ভিতর দিয়ে কিছুকাল কাটিয়েছেন, তাঁরাই জানেন—যোগসাধনের ফলে অষ্টসিদ্ধি পর্যন্ত আয়ত্ত হয়। এসব বিভূতির অন্তর্গত। তবে এঁর সম্বন্ধে এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, ইনি ইচ্ছা ক'রে, ভেলকী দেখাতে রূপান্তর ঘটান নি, এমন কি তাঁর যে রূপান্তর ঘটেছে এ বিষয়ে ইনিও সচেতন নন। আসলে প্রাণের প্রবল স্পন্দনই এই বাহ্য রূপান্তর ঘটিয়েছে ; প্রীতির আস্পদ একজনকে পেয়ে অন্তরের ঐ আলোড়ন,—আসলে ভাব ঘনীভূত হয়েই এই প্রকাশ ; মরমী সাধকমাত্রেই একথা জানেন।

তবে এই সূত্রে তাঁর যোগসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। আমি দেখতেই রইলাম ওই মূর্তি, ফলে এক ভাব-তরঙ্গ, ওখান থেকে নিঃসারিত হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমায় যেন মাতাল ক'রে দিলে,—আমি তো আর এ মাটিতে নেই।

প্রাণের আনন্দে ভিতর বাহির সমান, সরল হয়ে গিয়েছে। সবকিছুই এখন সুখময় দেখছি। উনিও আর অপরিচিত নন, অতি আপন, চিরজনমের সাথী, আমার জন্মান্তরের সহচর। এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সর্ব-শরীরে পুলক ভরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রত্যাশিতভাবেই মুখ থেকেই বেরিয়ে গেল—

আপনি তো পেয়েই গিয়েছেন!

কথাটি কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রেমাশ্রুপূর্ণ তরল নয়নের পবিত্র দৃষ্টি প্রথমে আমার মুখে, সঙ্গে সঙ্গেই আমার নয়নে এসে মিলিত হ'ল, সেই স্পর্শে আমার চক্ষেও ঝর ঝর ঝরতে লাগলো ধারা, একই আলোড়ন আমাদের মধ্যে। একটুক্ষণেই সামলে নিয়ে বলচেন তিনি,—

হাঁ, পেয়েছি বন্ধু ; কিন্তু এ কি পাওয়া?

ভাবাবেগে তাঁর কন্ঠরুদ্ধ হ'ল। আমি তাঁর মূর্তি থেকে চক্ষু আর ফেরাতেই পারিনি। কতক্ষণ পর বলছেন,—

ঐ পাওয়া,—যখনই ধরে রাখতে চাই, অমনি হারাই। সে এমনই হারানো, তাঁকে পেয়েছিলাম, এ বিশ্বাস পর্যন্ত টলিয়ে দেয়।

আবার চুপি চুপি বলেছেন,—দুঃখের কথা কাকেই বা বলবো,—তুমি এসেছ, দরদী তোমাকেই বলতে পারলাম।

এই জীবনে গুরু ও প্রবর্তকস্থানীয় অনেককেই পেয়েছি ; কিন্তু এতটা ভাবের মিলন কারো সঙ্গে ঘটেনি ;—এরই মধ্যে যেন হারানিধি পেলাম। আজ সেই কোন বেলায় এসেছি,—দীর্ঘকাল, কতটা অস্থির অবস্থা ভোগ করেছি, তার পুরস্কার যে এই প্রকার হবে, এই বিস্ময়কর পরিণতি ভেবেই আনন্দের সীমা নেই। এমনটা যে ঘটবে তা কল্পনাও করিনি।

এর পরও একটু আছে—

এখন তিনি আসন থেকে উঠলেন, কাপড়খানি পড়ে রইলো, কাছে এসে আমার হাত দুটি নিয়ে নিজ হাতে ধরলেন, মুখের পানে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ, কি দেখলেন জানি না। সম্পূর্ণ মুক্ত উলঙ্গ মূর্তি—অশ্রু বিগলিত,—

বলবে আমায়, কেন এমনটা হয়?

কথাগুলি শুনতে যেন প্রশ্নের মতই—কেন এমন হয়? কিন্তু আমার অনুভব অন্য।

এ একটি আজ্ঞা, অলঙ্ঘনীয় আদেশ, যার উত্তরে আমার যা কিছু ঈশ্বরানু-সন্ধানের ফলাফল, সকল পুঁজিপাটা ধরে দিতে হবে এর গোচরে। এর চেয়ে বড় পরীক্ষায় জীবনে কখনও পড়িনি,—কে জানত এই অদ্ভূত পাগল কোথা থেকে এসে এখানে বসে আছে আমার চরম পরীক্ষা গ্রহণ ক'রতে। তবে তাঁর স্নেহময় কোমল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে যন্ত্রের মতই উত্তরটি বেরিয়ে এল নিঃসঙ্কোচে—

তিনি যে স্বেচ্ছাবিলাসী, তাঁর স্বভাবই তো ঐ—অপ্রত্যাশিত কোনো এক ক্ষণে আসা অন্তরক্ষেত্রে সবটাই পূর্ণ করে বসা, ক্ষণেক আমার প্রাণ নিয়ে বিলাস তাও আপন ইচ্ছামত। আমি তখন নিজ ক্ষুদ্রতা ভুলে যদি কাল-ব্যবধান ঘুচিয়ে আরো পেতে চাই, নিজ হৃদয়ে আর একটু রাখতে চাই,—তখনই অন্তর্ধান।

আর না—আর না, ব'লে একেবারে সুদীর্ঘ প্রবল দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন—যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনেই বাঁধলেন। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, সেই অন্ধকারে আমরা কতক্ষণ ডুবেই রইলাম, কারো বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কথা যেটুকু হ'ল,—তা সাহিত্যের অধিকার সীমা বহির্ভূত।

এইভাবেই আগে যাঁকে যোগী ভেবেছিলাম একটু যোগৈশ্বর্য দেখে এখন বেশ ভালমতেই অনুভব করলাম, রাগমার্গের একজন—মরমী। এটি দ্বিতীয় পরিচয়।

আজ যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা পড়লাম, ব্যবহারের পালা শেষ হ'লেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাল যদি আসতে পারি দেখা হবে কি?

কথাটা আমার মুখেও এসেছে যে, তা হ'লে কালও দেখা হবে। রাত্রে কোথায় থাকবে?

উত্তরে, নাইডুর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বললাম; এখানে এলে তাঁর অতিথি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

॥ ৬ ॥

আনন্দে ভরা প্রাণ, আত্মরাজ্যের অনুভূতি মধ্যে একাই আমি, যন্ত্রচালিত দেহটা নিয়ে কতক মাতালের মত প্রবাসের আশ্রয় লক্ষ্য ক'রে গিয়ে উঠলাম যেথা ব্যান্‌কট রত্নম্‌ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কথা কইবার অবস্থা নয়—আমার সঙ্গে তখনই কোন কথা হল না—

অন্দরমহলে ভোজনশালায় রাত্রে নাইডুর সঙ্গে দেখা। দুজনেই খেতে বসেছি—মেঝেতে পিঁড়ার উপর—গিন্নি পরিবেশন করছেন। প্রকাণ্ড কলাপাতায় অন্নব্যঞ্জনাদি। নাইডুর সঙ্গে যা কিছু কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা এই সময়টাতেই চলে। সারাদিন নিজের কাজেই ব্যস্ত গৃহস্বামী—অতিথি, বান্ধবের সেবার ভার গিন্নির উপরেই থাকে; কিন্তু গৃহিণীর ঘন ঘন খাওয়ার ব্যবস্থা এড়াতেই আমার পক্ষে দিনের বেলায় বেশীক্ষণ ওখানে থাকা সম্ভব হয় না। তাই বেরিয়ে পড়ি—নানাস্থানে ঘুরে বেড়াই,—যথাকালেই ফিরে আসি! নাইডুর সঙ্গে কথা আমাদের ইংরাজীতেই চলে, যেহেতু আমি তেলেগু বুঝি না।

এখন নাইডু বলছেন—আশ্চর্য ব্যাপার—তোমাদের এই বাঙ্গালী সাধু চেনা সহজ নয়। আশ্চর্য লাগে আমার একথা ভাবতে, জানো বন্ধু, এত সাধু ঘেঁটেছি তার সংখ্যা হয় না। ঐ তো আমার কাজ, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো। এঁকে কিন্তু আমি বাঙ্গালী ব'লে ধরতেই পারি নি। আশ্চর্য, আশ্চর্য, কি অসাধারণ আত্মগোপনের কৌশল! ঐ সাধুকে—কোন রকমেই চেনবার যো নেই। আমাদের সাধু সন্ন্যাসী দেখে দেখে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, সাধুমাত্রেই তার শরীর, পোশাক, তাদের অঙ্গে বিশেষ ক'রে একটা ছাপ,—সাম্প্রদায়িক ধর্মের চিহ্ন কিছু-না-কিছু থাকবেই। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন ভাব কোন সাধুরই দেখিনি, আমার জীবনের এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা।

এইভাবে, স্ট্রেঞ্জ কথাটা বহুবার ব্যবহার ক'রে তাঁর বিস্ময়কর অনুভবের পরিচয় দিলেন।

এক্ষেত্রে আমি বললাম,—বাইরের চিহ্ন দেখেই সাধু চেনার অভ্যাস কি তোমার যথার্থ সাধু চেনার উপায়?

আরে, কি দেখে বুঝবো তাই বলো না যে, ইনি আমাদের মত গৃহস্থ একজন, স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঘর করেন, কিংবা ইনি সংসারত্যাগী, ভগবানের দিকে লক্ষ্য এবং তাঁতেই আত্মসমর্পণ করেছেন। সাধুসম্প্রদায়ের একটা চিহ্ন বা লক্ষণ থাকবে তো। যেমন ধর—রামায়ৎ বৈষ্ণব ; অথবা শক্তি-উপাসক শাক্ত। বৈদান্তিক অথবা শৈব—এ সব লক্ষণ তো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন থেকেই বুঝা যায়। না হ'লে আমাদের সাধু চেনবার অন্য উপায় কি?

বললাম, ঠিক ধরেছ। ঐ বাঙ্গালী পাগলার কাছে তুমি যাওনি তারপর?

নাইডু বললেন,—আর কেন ও সব পাগলা-টাগলা বলছ ভাই ; যখন স্বীকার করছি যে চিনতেই পারিনি, কোন ধর্ম সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই ব'লে। এখন তুমি তো দেখে এসেছ, আমায় ব'লেই দাওনা কি রকম সাধু আর এ্যাপ্রোচ করবো কি ভাবে?

না ভাই, আমার কর্ম নয় তোমায় বোঝানো, তুমি স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে বুঝে নেবে। তুমি নিজেও তো কথা বলেছ, কালকে কি চমৎকার ঈশ্বরতত্ত্ব বললেন।

কি জানো, আসলে আমাদের দ্বারা সাধুদের খাওয়ানো, পরানো, তাকে রেলভাড়া দিয়ে তীর্থে পাঠানো এ সব হতে পারে, কিন্তু সাধুর যথার্থ পরিচয় নেওয়া সম্ভব নয়। একটু শ্রদ্ধা যার উপর হ'ল বড় জোর তার কথাগুলি বসে খানিক সময় নষ্ট ক'রে, কাজ-কর্ম ফেলে শুনলাম। যা দেখি সবাই একঘেয়ে, সেই জপ করো, ধ্যান, করো, সাধু গুরু সেবা করো, দান করো, তীর্থ করো—এইসব বলবে ; পজেটিভ কিছু পাবার হদিশ নেই। সন্দেহ হয় ওরাও হয়তো কিছু পায়নি, কেবল গুরু উপদেশ পালন করচে। আর ঘুরে ঘুরে সারা ভারতময় পর্যটন করচে। কিন্তু কৈ, তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারি কি, যাতে আমার কিছু সত্যই লাভ হয়?

আমি বললাম, উনি নাকি কালকেই চলে যাচ্ছেন?

এ্যাঁ, তাই নাকি? তা হ'লে তো আমায় কাল সকালে গিয়েই আট্‌কাতে হয়।

আট্‌কে কি করবে?

সাধুসঙ্গ করবো,—তার ফলটা যাবে কোথা? জানো তো, আমরা ইণ্ডিয়ান—সাধুসঙ্গের মহৎ ফল, আমাদের মর্মে মর্মে গাঁথা।

নাঃ, যতটা ভেবেছিলাম, নাইডু গারু বিগ বিস্‌নেসম্যান হ'লেও ততটা বহির্মুখী নন, সাধুসঙ্গের মহৎ ফলও ছাড়তে চান না। এ দিকে কিন্তু এর জন্য এতটা চেষ্টা করেও একটি পয়সাও এঁকে লওয়াতে পারেন নি কোন প্রকারে, না একখানা বস্ত্র, না খাওয়া, না কিছু, না কিছু টাকা রাহা খরচ ট্রেনভাড়া ইত্যাদি বাবদে, তাঁর প্রয়োজনমতো কিছুই গ্রহণ করাতে পারেন নি, তাই মহা ফাঁপরে পড়েছেন এই সাধুকে নিয়ে। অথচ দাতা তিনি, তাঁর মনটা ভাল নেই। কিন্তু এমনই চিত্তাকর্ষক কথাও কোথাও পান নি এতো সাধু সঙ্গ করছেন। সারাক্ষণ কথাবার্তায় এইটুকু মনের কথা পেলাম।

এখন ভোজন শেষে আমার সঙ্গে আর কোন কথাই হ'ল না, গম্ভীর মুখে উপরে তার শয়ন কক্ষে চলে গেলেন। ঠিক তার বিপরীত দিকেই আমার থাকবার ঘর। খানিক নিঃসঙ্গ থাকবার জন্য আমিও আমার স্থানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন একটি। ভাবতে ভাবতে সুষুপ্তির কোলে ডুবে গিয়েছিলাম,—জেগে উঠলাম ভোরবেলা।

কোন সাধুর কাছে সকালেই না যাওয়া ভাল। শুনেছিলাম,—বিশেষ,—সূর্যোদয়ের পর প্রথম চারদণ্ড যোগি বা সন্ন্যাসীরা একরকম আত্মস্থই থাকেন।

নাইডু যথাকালে নিজের অফিসে চলে গিয়েছেন শুনলাম তাঁর চাকরের মুখে। নিজ কর্তব্য সমাধা করে ঘড়িতে সাড়ে নটা দেখে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে ওখান থেকে দুর্গা মন্দিরে যেতে। ভেবেছিলাম আজ নিশ্চয়ই একলা পাব, প্রাণ খুলেই খানিক কথা কইব।

হায়রে অদৃষ্ট, গিয়ে দেখি আমাদের ব্যান্‌কেট্‌ রুম্‌ অফিস কামাই ক'রে সাধুর যাওয়া আটকাতেই বোধহয়,—একখানা চেটাইয়ের উপর আসন পিঁড়িয়ে বসে সাধুর সামনে, ভক্তিভাবে তন্ময় হয়ে সাধুসঙ্গ করচেন; অর্থাৎ মনের সুখে প্রশ্ন ক'রে উত্তর বার করছেন, সাধুর মুখ থেকে।

উলঙ্গসাধু, চেটাইয়ের উপর তাঁর কাপড়খানি, কাল যেমন দেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেই রকমই রাখা, তার উপরে এখন বসে আছেন; আর অন্য দিকে মুখ, চক্ষু বুজিয়ে হিন্দীতেই কথা কইছেন। চমৎকার, স্পষ্ট তাঁর হিন্দী শুনলে কে বলবে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী নন। বোধ হয় নাইডু হিন্দীতেই কথা আরম্ভ করেছেন। আমার জানা ছিল নাইডু খুব ভাল হিন্দী বলেন, তাঁর সঙ্গে একটিও ফার্সী বা উর্দু শব্দ থাকে না, সংস্কৃতবহুল হিন্দী। তখন কিন্তু এখনকার মতো জবরদস্তি ছিলনা হিন্দী শিক্ষার উপর। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা।

এখন দেখলাম সাধুর আর এক মূর্তি; কাল সন্ধ্যায় যা দেখেছি যেন সে মানুষই নয়। যাই হোক, এখন আমায় দেখে নাইডু কি ভাবলেন কে জানে? নিঃশব্দে একখানা চেটাইয়ের উপর বসে পড়লাম। তখন সাধু বলছিলেন—সহজ হিন্দী ভাষায়;—

পাগল না কি! ঐটাই তো সবার শ্রেষ্ঠ শক্তি, জীবনের পুঁজি। যেমন তীক্ষ্ম বুদ্ধিই তোমার ব্যবসায়ের মূল পুঁজি। এখানে প্রত্যেক জীবের ঐ প্রাণই সৃষ্টিশক্তিরূপে কাজ করে, যতই ভোগ ও কর্ম প্রবৃত্তির প্রেরণা, সকল গতির মূলেই ঐটাই যে।

পুরুষ প্রকৃতির সম্ভোগ—যার ফলে সৃষ্টি বা জীবোৎপত্তি। ঐ সৃষ্টি-প্রবৃত্তির মূলেই ঐটি, যা থেকে তোমার উৎপত্তি; আবার ঐটি নিয়ে তুমিও এসেচ জীবনের সম্বল করে। জন্ম থেকে তোমার বুদ্ধি, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি, তোমার সকল গতি নিয়ন্ত্রিত করচে ঐটিই। তবে এটা জেনো যে, যৌবনে সন্তান-সৃষ্টি উপলক্ষ্যে যে সম্ভোগ, সেইটাই তোমার সৃষ্টি-শক্তির সবটাই নয়। ওর উন্দামতা ও স্থূল অংশ যদিও সাধারণ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐ কর্মের উপর আকর্ষণটা প্রবলভাবেই থাকে। তাদের সংস্কারই ঐ রকম, স্থূলবুদ্ধি নিম্নস্তরের জীব ব'লে। এখন যার মধ্যে প্রথম থেকেই ওটা প্রবল সে নিশ্চয়ই অসাধারণ ধীমান। পরিণামে তাব দ্বারা হয়তো অনেক উচ্চস্তরের সৃষ্টি, কল্যাণকর অনেক কিছুই হতে পারে। এখানে সমাজের শীর্ষস্থানে থেকে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ঐ প্রাণশক্তির প্রাচুর্যই তাঁদের অস্তিত্বের মূলে

নাইডু বললেন—কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিটা ইন্দ্রিয় সুখের উপলক্ষ্য হয়েই তো রইল ; এর পরিবর্তন কোথা ?

তা'হলে আরও একটু স্থির হও। শোন,—পরমেশ্বরের বিচিত্র এই সৃষ্টির মধ্যে প্রাণীসমাজের শ্রেষ্ঠ এই মানব। এখন পুরুষজীবনে, এই পুরুষ বলতে প্রাণী জগতের পুরুষ জাতি বুঝতে হবে। পুরুষের সৃষ্টি প্রবৃত্তিটাই তার সহজাত, সংস্কারগত এবং আমরণ ক্রিয়াশীল। পুরুষের এইটিই বৈশিষ্ট্য। একটি মানব পুরুষের সৃষ্টি-স্পৃহা কতরকমে কতদিকেই কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে, কত প্রকারের কত কত সৃষ্টির কারণরূপে নিজ অস্তিত্ব সফল করছে—যে কেউ একজন পুরুষ, নিজ জীবনপ্রবাহ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। এইভাবে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখ জগৎসংসারের প্রতিটি জীবের গতিপথে, প্রতি পলে পলে, কি প্রবল বেগ সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি উপলক্ষ্যে এই বেগ, এ চাঞ্চল্য, একবার যদি লক্ষ্য করতে পারো—তোমাকে স্তম্ভিত ক'রে দেবে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ-প্রবৃত্তি উড়ে যাবে তোমার।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ, সাধু নির্বাক।

পরে বলছেন,—

ব্যক্তিগতভাবে তোমার ধী অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি, তোমার প্রবৃত্তি কিনা মন,—সুস্থ ও সবল ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে তোমার প্রত্যেক সৃষ্টির প্রেরণা সফল করছে। তোমার মনুষ্যত্বের এই মূল কথা।

॥ ৭ ॥

যেই একটু থেমেছেন, হঠাৎ নাইডু হাত জোড় করে একটু ভক্তিভাব দেখিয়ে ব'লে ফেললেন,—

আপনি মনে করলে ঐ বিপুল প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারেন।

সাধু যেন চমকে উঠলেন। চক্ষু দুটি খুলেই বললেন—হঠাৎ একি কথা এনে ফেললে তুমি ? এ যে তোমার অসঙ্গত আবদার দেখছি, স্বাভাবিক প্রাণের খেলা, ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যাপারে মরা-বাঁচার কথা আনলে কেন এখানে ?

নাইডু ইতিমধ্যে সচেতন হয়েছেন। বললেন, কারো মধ্যে ঐ সম্ভোগ-স্পৃহাটা প্রথম থেকেই দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে যে-কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম ;—ঐ রিপুর প্রভাবের কথা ভেবেই ব'লে ফেলেছি। শুনে সাধু বললেন,—

রিপু বলছ যখন, শত্রু ভেবেই তো ? এখন জিজ্ঞাসা করি, ওটা যথার্থ শত্রু ব'লে মনে হয়েছে কি ? তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে কি তোমার মতো প্রবল মনঃশক্তিসম্পন্ন মানব একজন, যার Superiority Complex সকল ব্যবহারে কাজ করছে তার মধ্যে এতক্ষণ টিকতে পারে ? তুমি যেন দেখতে চাইছ যে ওটা তুমি ছাড়তেই চাইছ, কিন্তু ও ছাড়ছে না ; তাই নয় কি ?

ক্ষমা করুন, অতটা বুঝে বলিনি, প্রভু !

আসল কথা তো আপনিই এসে পড়ত,—অধৈর্য হ'লে কেন ? সরল কথা এই যে, একজন পুরুষের জীবনে প্রথম যৌবনে, সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন, তাইতে জীবসৃষ্টির প্রবৃত্তি, এ তো সবাই জানে। দুই একটি সন্তান হয়ে

গেলেই প্রাকৃত নিয়মেই ওটা আর অত প্রবল থাকতে পারে না। পিতৃত্বের গৌরবই তাকে সংযত করে,—তারপর শিল্প-সৃষ্টি, উচ্চ চিন্তা বিলাসের পথে চলে যায়। তবে এক প্রকার নিম্নশ্রেণীর স্থূল দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই নারী-সম্ভোগটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বলে আঁকড়ে থাকে—তাদের কথা আলাদা, প্রকৃতির বিকৃতিও আছে তো—এখানে এদের কথা ছেড়ে দাও না।

নাইডু বললেন—যাদের সন্তান হ'ল না।

নাইডু নিঃসন্তান, বয়স পঁয়তাল্লিশের উপর দু-তিন বৎসর হবে।

সাধু বললেন—নাই বা হ'ল, এত লোকের হচ্ছে, এই সভ্য সমাজে দুই-একজনের যদি নাইবা হয়, ধরিত্রী হাল্‌কা হয়ে যাবেন না।

সন্তান না হ'লে বংশধারা লোপ হয়ে যায়, পিতৃপুরুষ নরকস্থ হন, এই সবও আছে না?

ওহো, ওসব এখনকার সমাজের কথা নয়। সেকালে, হাজার হাজার বছর আগেকার কথা,—তখনকার সমাজকে সম্প্রসারিত, শক্তিমান করতে দ্রুত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন সমাজপতিরা অনুভব করতেন। তাই প্রজাবৃদ্ধির উপর অতটা জোর

দিয়েছেন। এরই প্রতিক্রিয়ার কথাটা এই,—যেমন এখনকার মনীষিরা অধিক সন্তান বা প্রজাবৃদ্ধির ফলে আহার্য বস্তুর অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য বাড়ছে দেখে সেটাও সমাজের অশান্তির কারণ ব'লে সংযত হতে বলছেন। এমন কি, বাজারের রক্ষাকবচ ধারণ করতেও পরামর্শ দিচ্চেন, এই রকম আর কি।

মানুষ-সমাজ কি তখন সত্যই দুর্বল ছিল?

—আরে বাবা, খৃষ্টীয় আট দশ সেঞ্চুরী আগেও কোথা ছিল এত লোক-সংখ্যা আর এত বড় বড় সহর। দেশের চারদিকেই ঘন বন-জঙ্গল,—এক জায়গায় নদীর ধারে। একটু ঘন বসতি, একটা বড় গ্রাম, সেটাও সুলভ ছিল কি? সিংহ, বাঘ, ভালুক, নেকড়ের মত হিংস্র প্রাণী জঙ্গল-রাজ্যময়,—তার উপর চোর,

ডাকাত প্রভৃতি যাতুধানেরা, তাই মানব সভ্যতার প্রথম দিকে প্রজাবৃদ্ধিটা একমাত্র কাম্যই ছিল—মানুষ-সমাজে নিরাপত্তার জন্য, দলবৃদ্ধির কত প্রয়োজন বুঝতেই তো পাচ্চো। যার যত সন্তান তার ততই প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা এ সব তোমাদের তো না জানবার কথা নয়। তখনকার সেই প্রজাসংখ্যা অল্পতার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এযুগে—এখন প্রজাবৃদ্ধির ঠেলা সামলাও। তারপর বলচেন—

ওসব বুদ্ধি ছাড়ো, এখন জেনে রাখ—এখনকার দিনে সন্তান না হ'লেও জীবনে তোমার অগ্রগতির কোন বাধাই হবে না। বিশ্বজননীর প্রজাসৃষ্টির হিসাব ঠিকই আছে। এখন, যাদের গোড়া থেকেই ঐ সম্ভোগপ্রবৃত্তি উদ্দাম বলছিলে, আসলে তাদের প্রাণশক্তিঘটিত সৃষ্টি-প্রেরণাই প্রবল বুঝতে হবে। আর যৌবনে সৃষ্টির প্রেরণায় যে নারীসঙ্গলিপ্সা সেটা সৃষ্টি প্রেরণার প্রথম ধাপ, যেমন তোমার জীবনে কতকটা মোহাচ্ছন্ন শৈশব অবস্থা, সৃষ্টি-শক্তি বিকাশের শৈশব, ব্যাপারটা বুঝলে? নাইডু সস্মিত বদনে বললেন—তারপর—

তারপর পূর্ণ যৌবনে সৃষ্টি-শক্তি পরিণতির ক্রমে চৈতন্যের স্ফুরণ, স্থূল সৃষ্টির ধারা অতিক্রম ক'রে মানব চৈতন্য প্রতিভার এলাকায় পড়ে। তখন সাধারণ অসাধারণ ভেদে উচ্চস্তরের সৃষ্টি অধিকারী মানবসমাজের জ্ঞান, ধ্যান ও চিন্তাপ্রসূত কল্যাণকর নানা কর্ম প্রবৃত্তির স্ফুরণ। যথার্থ আনন্দময় মানব-জীবনের আস্বাদ, ফলে পরমাত্মার বিলাসক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত হওয়া সম্ভব করে। মানুষ-সমাজে সৃষ্টির পর্যায়ে এর বড় আর কি? ঐ বিলাসই তো মানুষ-জীবনে চরম সার্থকতা।

বিলাস! এ আবার কি রকম কথা?

হাঁ, একটু অবহিত হও, বৎস, এ সংসারে এই জীব কোটি কোটি অসংখ্য মানুষ, এরা কি নিয়ে থাকে, কি নিয়ে কালক্ষেপ করে?

করে তো অনেক কিছু, বহুকর্মই করে, এখানে কতগুলির নাম করব?

আহা, অনেক কিছুর মধ্যে যাবে কেন, বহুকে সংক্ষেপ ক'রে ফেল না—বুদ্ধি আছে তো?

তা হ'লে আপনিই বলুন। শুনে সাধু বললেন, এখানে ভোগ আর বিলাস ছাড়া আর কোন কর্ম আছে কি? মানুষের দৈনন্দিন জীবন লক্ষ্য কর না,—স্থূল কর্মেন্দ্রিয়ের কত রকমের কর্ম বা ভোগ, বাকিটা বিলাস, উপলক্ষ্য সুখ বা আনন্দ। ভোগের বেলাও তাই, আর বিলাসের বেলাও তাই। মানুষের মধ্যে এসব জন্মগত সংস্কার হয়েই আছে,—যাতে সুখ বা আনন্দ নেই এমন কর্ম কেউ ক'রতে চায়?

॥ ৮ ॥

এটা বুঝলাম, কিন্তু ঐ যে, সাধারণ অসাধারণ ভেদে ব'লে একটা ফ্যাঁকড়া তুলে রেখেছেন।

হাঁ, তোমার সমাজে কি সাধারণ, অসাধারণ ব'লে কোন ভেদ নেই?—কর্মক্ষেত্রে একজন খেটেখুটে নিজ সংসার পালন করে; আর একজন সহস্র জনাকে খাটায়, প্রতিপালন করে, দুইজন কি একই পর্যায়ে পড়ে? এ সব জানো তো?

অতীব বিনীত এবং নম্র বচনে নাইডু বললেন, প্রভু! জানি তো সবই, কথা আর কি নূতন আছে ; কিন্তু সেই পুরানো কথা যখন আপনার মতো কারো মুখ থেকে বেরোয় তাইতে এমন কিছু থাকে যাতে ভিতরটা আলোকিত হয়ে যায়।

তুমি কি আইনও ঘেঁটেছিলে, বাবা? যেন আইনজ্ঞের গন্ধ পাচ্ছি—কথাটায়?

বি. এ. পাশ করবার পর কিছুদিন আইন পড়েছিলাম এবং ভালভাবেই পাশও ক'রেছিলাম, ভেবেছিলাম আইন ব্যবসায়ী হব। কিন্তু শেষ অবধি বাবাই এ বিসনেসের জোয়াল ঘাড়ে তুলে দিলেন।

তোমায় উপযুক্ত কাজই দিয়েছেন। বেশ, এখন আরও একটা কথা—তুমি দর্শন শাস্ত্রও পড়েছ তো?

তা পড়েছি। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত অধ্যয়ন করেছি ; কিন্তু যথার্থ তার মধ্যে দিয়ে নিজ পথ ঠিক ক'রতে পারি নি—সাধনের পথে যাই নি।

পথের কথা বোলো না, তুমি তো পথেই আছ। ঠিক নিজ পথ যাকে বলে—

কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারি না আমি সত্যিই কোন্ অবস্থায় রয়েছি আর আমার ভবিষ্যৎটাই বা কি? সে যাক, আপনি এখন সাধারণ আর অসাধারণের কথাই বলুন।

মন আর বুদ্ধি এ দুটিই জীবনের পুঁজি, এটা বুঝতে পারো?

তা বোধ হয় পারি, তাই নিয়েই তো পথ চলছি।

সাধারণ যারা তাদেরই বলছি মন প্রধান, মনের বশেই চলে। শরীর, ইন্দ্রিয় আর নিজ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে না ; বুদ্ধি পর্যন্ত যাদের স্বার্থদুষ্ট, তারাই সাধারণ। আচ্ছা, আর একটা কথা বুঝতে পার, মন-প্রভাবিত বুদ্ধি, আর বুদ্ধি-প্রভাবিত মন?

অর্থাৎ যাদের মন, বুদ্ধি বা বিবেকের অনুমোদিত কর্মই করে তাদেরই বুদ্ধি-প্রভাবিত মন, আর যারা স্বার্থান্ধ মন নিয়ে বুদ্ধি-বিবেকের কথা বিশেষ বিপন্ন না হ'লে শোনে না, তাদেরই মন-প্রভাবিত বুদ্ধি অথবা স্বার্থদুষ্ট বুদ্ধি বলেছেন তো?

সাবাস, একদম ঠিক। আচ্ছা, তাহ'লে মন-শাসিত বুদ্ধি যাদের তারাই যদি সাধারণ পর্যায়ের হয় অঙ্কের হিসাবেই, বুদ্ধি-প্রভাবিত মন যাঁদের তাঁরাই হলেন অসাধারণ। তাঁদের মধ্যেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব।

সাধারণের মধ্যে কি প্রতিভা থাকে না?

ঠিক প্রতিভা যে শক্তি, চৈতন্যেরই স্ফুরণ,—তা স্বার্থদুষ্ট মনের প্রভাবে জন্মায় না। কর্মশক্তি প্রবল এমন কি অসাধারণও হতে পারে। সাধারণের থাকে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির দীপ্তি, স্বার্থময় আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধির জলুস,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি প্রবলও হতে পারে। কিন্তু প্রতিভার দীপ্তি স্বতন্ত্র বস্তু, আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ।

সাধারণের কথাটা আরও একটু খুলে বলুন না।

সাধারণের বিদ্যা ও বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে, তীব্রও হতে পারে কিন্তু তার সব কিছু সংস্কার স্বার্থের ছাঁচেই ঢালা। আরও একটা সরল বৈশিষ্ট্য আছে

তাদের মধ্যে—সকল কামনার পূর্তি এবং সর্বাবিধ প্রয়োজন সিদ্ধির প্রতীক হল ধন ; তাদের জীবনে ধনই সবার বড় হয়ে যায়। সাধারণের সর্বনিম্ন স্তর, তারপর মধ্য এবং সর্বোচ্চ স্তরেও মহা প্রতিষ্ঠাবান যারা তাদের সবটুকু বুদ্ধি, সকল শক্তি ধনের পিছনেই, নিজ সৃষ্ট সংসার ও পরিজনের লালন-পালন, সুখ-স্বাচ্ছন্দের পিছনে এবং সঞ্চয়ের পানে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাদের সৎকর্মেও মতি, অনেক ধনসঞ্চয়ের ফলে হয়তো সাধারণের কল্যাণকর কাজে তাদের দান, যদি তার প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয়, তাহ'লে তার অনেক-কিছু কর্মই সমাজে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটিই হল সাধারণের মোদ্দা কথা।

নাইডু গারু এবার একটু যেন ব্যস্তভাবেই বললেন, সাধারণ সম্বন্ধে সব বলা হয়েছে কি ?

সাধু বললেন, মোটামুটি তো ঐরকমই। তুমি বাবা, এবার আমায় কাৎ করবার মতলবেই আছো, দেখছি।

কথাটি কি মনে করে যে বলছেন তা তো আমি বুঝতে পারিনি।

তাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি ; তাইতো তোমার আসল কথাটা ?

আপনি অন্তর্যামী, ঠিক ঐ কথাই ছিল আমার।

মানুষের সত্ত্বা যে চৈতন্যময়, সেটা একেবারে এড়াবার যো কোথা ? তাই যখন প্রবীণ বয়স আসে, তার নিজ সমাজের গুরুস্থানীয় কাকেও আদর্শ ক'রে নিজ চৈতন্য প্রতিষ্ঠার অভাব খানিক পূর্ণ বা সার্থক করবার চেষ্টা থাকে। ঈশ্বরতত্ত্ব ধর্মবিজ্ঞান অথবা আত্মতত্ত্ব নিয়ে সাধারণ ধনৈশ্বর্যবান, তাঁরা কখনও মাথা ঘামাতে পারেন না। একটু স্থির হয়ে অথবা বিষয় বা ধনের চিন্তাধারা ক্ষণেকের জন্যও ত্যাগ ক'রে ধর্ম অথবা জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা তাদের ধাতে আসে না। তবে টেবল্ টক্ বেশ লাগে, দু-চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজ কর্ম, মত, পরের ধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম সম্বন্ধে বা নিজ পছন্দ ও অপছন্দ সম্বন্ধে ধর্ম নিয়ে আলোচনা তাঁদের আনন্দের সময়ক্ষেপ, অবশ্য যখন নিজের কাজকর্ম থাকেনা।

স্বভাবে ভক্তি নেই কিন্তু ভক্তি দেখাতে, ভক্ত পরিচয় দিতে উৎসাহের সীমা নেই ; কালের ধর্ম যা, তা নিয়ে ফ্যাসান হিসাবে কিছু কিছু দানের ব্যবস্থাও আছে। ঈশ্বর-কৃপা পেয়েছেন, কতভাবে বিশেষ বিপন্ন ও সঙ্কটময় অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছেন, ভগবান তাঁকে স্পেশাল ফেভার করেন যা অপরকে ক'রতে দেখা যায় না ; এইসব বর্ণনায় তাঁদের বড় লোভ। রাম সীতা দুর্গা রাধা কৃষ্ণ কালী অথবা শিব গণপতি বা মহাবীর—এই রকম একটি না একটি প্রতীক চাইই না হলে তাঁরা নড়তে পারেন না। আসলে, আধ্যাত্মিক যা কিছু, এমন কি ঈশ্বরানুরক্তি তাদের বাইরের জিনিস। অথচ সামান্য আয়োজনে কখনও কখনও বাইরের ঘরে হরিসংকীর্তন, কালীকীর্তন, অথবা ভাগবৎপাঠ দেওয়ার ফ্যাসন, বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে শোনানোর ব্যবস্থা, বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রতিবেশীদের আহ্বানও আছে। বেশী বেড়ে যাচ্ছে, খরচের ব্যাপার মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়—দেখে, কোন একটা অছিলায় তা বন্ধ ক'রে দিয়ে তার শান্তি। এর বেশী বলা ঠিক হবে না। সাধারণ ধনৈশ্বর্যশালীর এইসব বৈশিষ্ট্য। কারো সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে সংঘর্ষ যতক্ষণ না বাধে ততক্ষণ তাঁরা ধার্মিক। সমাজে

যারা অল্পবিত্ত তাদের আত্মীয় কুটুম্ব, তাদের আদর্শ হয়েই তাঁরা সমাজে আধিপত্য করেন।

নাইডু গারুর মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি, বললেন—যেমন আমরা।

সাধু নির্বাক।

॥ ৯ ॥

একটুখানি চুপচাপ নাইডু গারু বললেন,—এখন অসাধারণ যারা প্রতিভাশালী তাদের কথা।

যাদের দুর্দমনীয় সম্ভোগস্পৃহা বলছিলে, তাদের সৃষ্টি-প্রবৃত্তিটাই উদ্দাম। যৌবনে চৈতন্য স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দুর্দমনীয়তাই প্রতিভায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন থেকেই সৃষ্টি-প্রতিভার খেলা আরম্ভ।

প্রাণচৈতন্য স্পন্দনের এমনই গতিবেগ, ঐ প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয় সম্ভোগস্পৃহা ক্ষীণ হয়েই আসে, যতই গভীর তত্ত্ব, জ্ঞান এবং চিন্তাসমূহ নিয়ে অন্তঃকরণে আলোড়ন চলতে থাকে।

হঠাৎ নাইডু গারু ব'লে ফেললেন, অটুট ব্রহ্মচর্য না থাকলে কি ঈশ্বরলাভ ঘটে?

অটুট ব্রহ্মচর্যের হেঁয়ালীতে পেয়েছে দেখছি; যদি ওটা কারো জীবনে ঘটে যায় তাহ'লে সেটা হবে বড় একটা বিলাস, ঈশ্বরলাভের কোন সম্বন্ধই নেই তার সঙ্গে। ফলে তার আয়ুষ্কাল হ্রাস হয়েও যায় শক্তির অতিরিক্ত চালনার ফলে। এটা কর্মশক্তির কথা।

সে কি, শাস্ত্রে বলে যে, ব্রহ্মচর্যই তো ব্রহ্মলাভের উপায়।

ওটা অকালে ইন্দ্রিয় লালসা থেকে সামলাবার জন্যই অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংযমের উপদেশ,—তা ছাড়া আদর্শটা ভালো তো।

কিন্তু—ওর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে—

রক্ষা করো বাবা, সেকালের বশিষ্ট, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বামিত্র এদের কথা নাহয় ছেড়েই দিচ্ছি; কিন্তু একালের, গুরু নানক, কবির, কামাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত—এঁরা সংসারী, জীবন নিয়ে কি ঠাট্টা ক'রে গেছেন নাকি? তুমি শিক্ষিত, এখনকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরী তোমার মন, বল না, ঐ অটুট ব্রহ্মচর্য এই পৃথিবীর সমাজে মানবজীবনে স্বাভাবিক কি?

তবুও এটা তো ঠিক, যদি কেউ পারে সে তো শক্তিমান হয়?

হোক না, সে শক্তি একটি বিলাসই হবে মানুষের জীবনে। বড় জোর খুব বেশী কর্মশক্তি বাড়তে পারে—সেটাও তো বিলাস। তাছাড়া আর কি হতে পারে?

শক্তিমান হ'লে ঈশ্বরলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকার হবে না কেন?

শক্তিমান অবস্থায় সে তো নিজেকেই ঈশ্বর মনে করবে, দ্বিতীয় ঈশ্বর সে চাইবে কেন?

কিরকম?

রকম আবার কি, রুগ্ন শরীর একজনের মন যেমন সর্বদা শরীরের মধ্যে রোগের জায়গাতেই পড়ে থাকে—শক্তিমানের মনও তেমনি তার শরীর আর বল-

বীর্যের উপরেই পড়ে রইল। তার দম্ভ অহঙ্কারের দাপটে তার সামনে যাওয়াই দায়।

কি বিপদ!

সাধু বললেন,—কার বিপদ?

ঐ অটুট ব্রহ্মচারীর। শক্তিমানের শক্তি লাভ হয়েছে, অথচ ঈশ্বর বিমুখ।

মোটেই না—বিপদটা তোমার মনে। সে তো ভালই আছে নিজ শরীর এবং বল ও বীর্যের আনন্দে। ঐতেই তার সুখ-শান্তি না থাক জীবনের সার্থকতা তো আছে—ঈশ্বরের কথায় তার কাজ কি?

নাইডু বললেন—যেন কেমিক্যাল এ্যাকশানের মতো।

সাধু বললেন—সৃষ্টিতে সবই তো যোগাযোগেরই ব্যাপার—এখানকার খেলাটাই বিচিত্র। এখানে এক নেগেটিভের খেলাও আছে। সবই তো এক নিয়মে হয় না। ধর, সংযত পিতামাতার সন্তান সংযত প্রকৃতিরই হয়; আর যথাকালে সেই নিয়মেই হয়ে যায় প্রতিভার বিকাশ। আর কোথাও কোথাও দেখা যায়, ঐ উদ্দাম সম্ভোগ প্রবৃত্তি কোন প্রাকৃত নিয়মেই এমন আঘাত পায়, সেই বিষম আঘাতের বেদনাই তার প্রতিভা বিকাশের কারণ হয়।

এখানে জীব বিকাশের ক্রম জানতো। প্রাণরূপে চিৎশক্তি ঐ মাংসাস্থি-পূর্ণ শরীর মধ্যে বাড়তে লাগলেন। কালের মধ্যে দিয়ে সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মার গুণগুলি ফুটতে লাগলো শরীর মন ও বুদ্ধির সঙ্গে। যৌবনকালটাই ঐ সকল গুণ পূর্ণ বিকশিত হবার কাল;—বিশেষ চৈতন্য শক্তি সহজ কথায় বুদ্ধির। এখন কোন বিশিষ্ট আধারে ঐ চিৎশক্তি বিকাশের প্রবল বৈচিত্র্য আছে যেটা সাধারণ থেকে ভিন্ন।

তাকেই অসাধারণ বলছেন তো?

তারপর সৃষ্টি প্রেরণায় জাগ্রত ইন্দ্রিয়গ্রাম, সম্ভোগের আনন্দেই প্রথম পদক্ষেপ। মস্তিষ্ক পূর্ণায়ত, যখন আধার পুষ্ট হয়েছে, সবল মন, তীক্ষ্ন বুদ্ধি তখনই সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে চৈতন্যের যোগ, তারই ফলে প্রতিভা স্ফুরণ জীবন তার প্রতিভাদীপ্ত হয়ে উঠলো। তার প্রধান লক্ষণ আত্মশক্তির উপর অসাধারণ বিশ্বাস এইটিই প্রথম ও প্রধান, তাইতেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পরে নিজ বুদ্ধিবলে অভ্রান্তরূপে নিজ জীবনের উদ্দিষ্ট কর্মপথ নির্বাচন তার অবশ্যম্ভাবী ফল। দ্বিতীয় লক্ষণ, তার অবলম্বিত কর্মপন্থা গতানুগতিক পথে চলে না। তার কর্ম, ধর্ম, কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞান বা শিল্প —যা কিছু প্রবৃত্তি নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েই ফুটতে থাকে। সে প্রতিভার কাছে সাধারণকে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার উদ্ভাবিত জ্ঞানের অবদান অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণে বাধ্য করে। তীক্ষ্নতম বিচার-বুদ্ধি তাকে গভীর ফলপ্রসূ চিন্তার অধিকারী, এমন কি পরিণামে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানময় জগতের গভীর রহস্যপূর্ণ প্রবেশপথও তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। আপ্তকাম এবং তত্ত্বদর্শী মহান আদর্শ, জগৎগুরুরূপে সৃষ্টির কল্যাণে উৎসর্গী-কৃত জীবন,—পরমাত্মার উচ্চতম বিলাসের আধাররূপে জগতের জনসমাজে নূতন জ্ঞানের আলোক বহু অজ্ঞাত তত্ত্বের সন্ধানও দিতে পারেন।

এখন বুঝলে, যাকে কামশক্তি, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ প্রবৃত্তি বলেছিলে সেটা আসলে কি পদার্থ এবং উপযুক্ত আধার হ'লে কোথায় নিয়ে যেতে পারে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আমরা স্থির হয়ে শুনছিলাম। সাধু চক্ষু চেয়ে দেখলেন একবার। তারপর বলছেন,—

অশেষ বৈচিত্র্যময় এ সৃষ্টিতে মানবই পরমাত্মার সার্থক সৃষ্টি, সংসারে আজ মানবই মহান ; তার মধ্যে চৈতন্যশক্তির খেলা আর তার প্রসারের সম্ভাবনার জন্য। মানবগোষ্ঠিই পরমাত্মার সৃষ্টি বিলাসকে পূর্ণ করেছে প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ বিলাসের মধ্যে দিয়ে,—এ বিলাস একমাত্র তাঁরই—এইটিই জানতে হবে আর নিজ নিজ জীবনকালেই তা পূর্ণ ক'রতে হবে মানবকে। সর্বসুখের অধিকারী এই মানব-মূর্তির ভিতরে বাহিরে তাঁরই সত্ত্বা অনুপ্রবিষ্ট ;—এইটিই এখানকার চরম উপলব্ধি ; এরই নাম ঈশ্বরলাভ, ভগবান পাওয়া বা আত্ম উপলব্ধি। এই হল এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস।

॥ ১০ ॥

এরপর আর আমাদের কথার কিছুই রইল না। নাইডু একটি কি বলবার জন্য মুখ খুলছেন দেখেই সাধু বললেন,—

চুপ কর বাবা, ওটা আমিই বলছি। এখানে প্রত্যেক মানুষটির স্বাধীন সত্ত্বা, একজনের উপদেশ যে আর একজনের মনঃপূত হবেই এমন কথা নেই, কারণ তার মূল সত্ত্বা স্বাধীন, তার নিজ বুদ্ধি থাকতে আর কারো বুদ্ধি সে নেবে কেন? এখন এই যে কথায় কথায় আমার উপলব্ধিগত তত্ত্ব, তোমারই আগ্রহে প্র্যাকটিসে তোমাকে ধরে দিয়ে তোমারই গন্তব্যপথে সজাগ করতে চেয়েছি। ব্যবসায়বুদ্ধির দিক দিয়ে সেটা আমার কতটা আহম্মকি হয়েছে, তা আমি নিজেই জানি এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি ;—কিন্তু আমার সত্ত্বাও তো স্বাধীন, তারও তো একটা বুদ্ধি বিচার আছে,—তুমি যেটা জানতে না, সেটি জানিয়ে দেওয়াতে আমার, এবং স্রষ্টার একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হ'ল। যেহেতু তাঁরই কাছ থেকে প্রেরণাটা এসেছে তাই তোমার মনঃপূত হয়েছে ; মহাকালই রইলেন তাঁর সাক্ষী।

সাধু চুপ করলেন ; একেবারেই নিস্তব্ধ বায়ুমণ্ডল।

এর পরেও আবার নাইডু যেন কিছু বলতে চাইলেন। এবার সাধু বললেন,—তাহলে নিঃসঙ্কোচেই বলো যখন বলবার বিষয় রয়েচে।

প্রভু, আর কিছুই আমার জানবার নেই, শুধু এইটুকু যে, জপ, ধ্যান, তপস্যা এগুলোর সার্থকতা কি?

শুনে সাধু হেসে বললেন,—

বললাম না, এখানে মানবের দুটি কাজ—ভোগ আর বিলাস। ভোগের কথা বেশ ভালই বোঝ ; কেবল বিলাসটি কি পদার্থ তা ধরতে পারো নি।

ভোগটা যদি বুঝে থাক তাহ'লে জেনে রাখ ভোগ ছাড়া তোমার যা কিছু সৎ বা মহৎ কর্মোদ্যম সবই বিলাস। মানবজীবনে মৃত্যু অথবা সমাধি বা আত্মস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সবটুকু ভোগ আর বিলাসেরই জীবন। স্থূল নিয়ে মনের অধিকারে আনন্দ নিরানন্দ সেটা ভোগ, আর চৈতন্যের ক্ষেত্রে ধ্যানাদি, জ্ঞানানুভূতিমূলক যত কর্ম তাই হল বিলাস। অর্থাৎ তোমার ধর্ম, কর্ম, বিচার ও সংপ্রবৃত্তির বিস্তার নিয়ে যে ঘন আনন্দ, সেটিই বিলাস।

তার সঙ্গে যদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটে যায়,—সৃষ্টি-প্রবৃত্তি জাগে ?—

তাহলে স্থূল ভোগের পর্যায়ে পড়লো ;—এও কি বলে দিতে হবে ?

তবুও নাইডু বললেন,—ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য জপ, তপ, ধ্যান ?

বিলাস ছাড়া আর কি ? দেখছ ওটা উদ্দেশ্যমূলক কর্ম, বিলাস ছাড়া আর কি ?

যদি প্রেম সম্বন্ধ কারও সঙ্গে ঘটে ?

নরনারী নির্বিচারে, কাম সংস্পর্শশূন্য শুদ্ধ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধিগত সম্বন্ধ যদি হয়, মানব সমাজে এই বিলাস নিয়েই মানবের মহত্ত্ব নিরূপিত হয়। ফলে অ-ভেদ বুদ্ধিই তো আসবে ; তাই তো সৃষ্টির চরম বিলাস। এর বড় এখানে আর কিছু আছে নাকি ?

তাকেও বিলাস বলছেন কেন আপনি ?

সংক্ষেপে তত্ত্বটি বুঝাতে। তা ছাড়া ওটা আমি বলছি নাকি ?

তবে আবার কে বলেছে ?

সারা সৃষ্টি, এই চরাচর, বিশ্বজগৎ যার বিলাস মাত্র, এই বিলাসই যে তাঁর ঈশ্বরত্ব, অহরহ সর্বক্ষণই এর মধ্যে রয়েছেন, প্রত্যেককে (উস্কানি) প্রেরণা দিচ্ছেন, তাঁর বেশী আবার কে বলবে !

আমরা স্তম্ভিত হ'লাম, কথা যেন শেষ হয়ে গেল। সাধু কতক্ষণ পরে বললেন, এখন হয়েছে তো। আর কি চাই ?

নাইডুর সাহস বেড়ে গিয়েছে ; কিছুতে স্থির হতে পারছেন না বেশ বুঝলাম, আত্মাভিমানী মানুষের গরিমার বেগ সংযত হতে চায় না। আরও, বোধ হয় যে, সাধু কিছুতেই রাগ করবেন না, তাই বুঝেই বলে ফেললেন,- চাই তো অনেক কিছুই কিন্তু দেবে কে ?

সাধু বললেন,—

ভিখারীর আকাঙ্ক্ষা কে কবে মেটাতে পেরেছে বাবা, একটির পর আর একটি তার অভাব যে আসবেই। ওটা যে তারই অভাব, সৃষ্টির খেয়াল।

দোহাই প্রভু, হেঁয়ালী রাখুন যথার্থ বলুন ; আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কিছু কর্ম চাই কিনা।

জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা চলতে পারে, চিন্তা চলতে পারে কিন্তু যদি ঈশ্বরলাভের, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য হয় তা হলে। কোন চেষ্টাই চলে না বরং সকল চেষ্টা বা কর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ করাই আসল কাজ। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের ঠেলায় যা কিছু করবে তাই হবে বিলাস, ঈশ্বরলাভের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। তা তোমারই আনন্দ ও সম্ভোগের ব্যাপার বা বিষয়।

তবুও কেন মনে হয় যেন কিছু করতেই হবে।

আসল কথাটা কি জান, বিসনেস্ ম্যান্, মন নিয়েই কারবার কিনা এখানে সব কিছু চেষ্টার দ্বারাই লাভ হয়। ছোট বড় সকল কিছুর পিছনে চেষ্টা চাই। কাজেই ঈশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা অত বড় জিনিস বিনা চেষ্টায় লাভ হবে, এ যে একটা হাসির কথা, এর চেয়ে অবিশ্বাস্য আর কি হতে পারে ?

নাইডু তবু ছাড়েন না, আমার দিক থেকে একটু বুঝে দেখুন না, প্রভু !

প্রভু বললেন, বদ্ধ হওয়ার ঐ তো দোষ,—কিছু করতে হবেই না হ'লে নাইডুর অহং শান্ত হতেই পারবে না। আরে বাবা ! নিজ পুরুষার্থেই করছ

তো অনেক কিছুই, বিসনেস্ করচো কত রকমের, দান, ধ্যান, জপ, উৎসব, তীর্থভ্রমণ, সাম্প্রদায়িক ছাপওয়ালা সাধুসেবা, মন্দির-নির্মাণ আরো কত কি। কিন্তু ঈশ্বরলাভ পুরুষার্থের বিষয় নয় যে ;—বরং বিরোধী। এ কি ক'রে তোমায় বুঝাব বলো দেখি ; তোমার নিজ-শক্তিতে আর পাঁচটা লাভ করার যে কাজ সেই সব কাজের মত তাকে লাভ করবে, কাছে আনবে, বাধ্য করবে সে বস্তু ঈশ্বর নয়। চেষ্টা বা পুরুষার্থে সব কিছুই হতে পারে, কেবল ঐটি ছাড়া।

তবু কিছু করণীয় উপদেশ বলুন, বুঝতেই তো পারছেন সবই।

তা তো পারছি, কিন্তু ঐ যে বললাম বেশী আর কিছু করতে হবে না. যা করছো তাই স্ফূর্তিতে করে যাও ; সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কালেনাত্মনি বিন্দতি ; জান তো !

আপনি তো চলে যাবেন এখানকার বিলাস শেষ করে—তখন কি নিয়ে থাকব ? আপনাকে ভোলা যাবে না, তবু কিছু উপদেশ পেলে তাই নিয়েই থাকব। এটুকু আর বুঝলেন না।

আমাদের দেশে, নেই-আঁকুড়ে যাকে বলে, তুমি হলে তাই। তোমার ট্যাক্টও যতো টেনাসিটিও ততই দেখছি,—নাছোড়বান্দা। আচ্ছা, দেখা যাক, একটা বলছি, দেখ যদি পার।

বলুন, বলুন প্রভু। জয় হোক আপনার। আনন্দে নাইডু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সাধু বললেন—ও ফাঁকা জয় নিয়ে আমি কি করব ? আর ভগবানও ঘুষখোর নয়! মানুষের জয় অধিকারও নেই।

শুনেই নাইডু বললেন, ইউরোপ আমেরিকা তো মানুষের জয় ঘোষণাই করছে, নেচারকে কংকার ক'রে।

ওরা করুক, ওটা ওদেরই কর্মপথ ; আর কংকারের মোহটাই ওদের মধ্যে পরমাত্মারই দান,—সেইটাই ওদের শ্রেষ্ঠ বিলাস ; করুক না কংকার নেচারকে, ঠেকলে তখন পথ সহজ হয়ে যাবে। এখন একটু স্থির হও দেখি ; একেবারেই স্থির।

শুনেই নাইডু সোজা কাঠ হয়ে বসলেন, বাড়ীতে জপ তপ ক'রতে যেমনভাবে বসেন।

না না, ওরকম কাঠ হ'লে চলবে না, শরীর সহজ করো ; রিপোজ,—শরীর জ্ঞান ছেড়ে দাও—সম্পূর্ণ বিরাম চাই।

খানিকক্ষণ দেখতেই রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধে ডান হাতটি রেখে বললেন—

এ শরীর কার ?

আমার।

তারপর সাধু একটি আঙ্গুল নাইডুর বুকে ঠেকিয়ে,—

এর মধ্যে কে আছে ?

আমি—

তারপর ঐ আঙ্গুলটি নাইডুর যুগলের মধ্যে স্পর্শ ক'রে,—

এখানে কি বোধ হচ্ছে ?

নাইডু চক্ষু দুটি বুজিয়েই বললেন—

আমি—শুধু আমি। শুনে সাধু বললেন—

ঠিক তো? নাইডু নির্বাক। সাধু বললেন,—বেশ, ঐ আমি বোধটিই তোমার আসল সত্ত্বা। এখন যেখানে বোধটি হচ্ছে ঐখানে মনটি রাখ দেখি। এই হ'ল তোমার নিত্যকর্মের প্রথম অনুষ্ঠান।

কতক্ষণ সব চুপচাপ, নাইডু বেশ স্থির হয়েই গিয়েছেন। সাধু খানিক পর বললেন, তোমার দেহাতিরিক্ত ঐ আমিটি অনুভবের সঙ্গে যখন বেশ মিলে এক হয়ে গিয়েছে তখন থেকেই তোমার আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। শুনছো?

বলুন—

এরপর তোমার সামনে যে মূর্তিই আসবে, তোমার ঐ আমি, সেই মূর্তির মধ্যেই রয়েছে;—এইটিই হবে তোমার অনুভূতি। তোমার ঐ আমি সত্ত্বা, সবারই ভিতরে অর্থাৎ তুমি সত্ত্বারূপে সবার মধ্যেই রয়েছ। যাকেই তুমি দেখনা কেন তার মধ্যে তোমারই ঐ আমি সত্ত্বা। এইটি চালিয়ে যাও দেখি। দেখো, ঠিক ধরতে পেরেছো তো?

বোধ হয় পেরেছি।

যদি কল্পনা না মেশাও ওর সঙ্গে তা হ'লে সহজ। অতিবুদ্ধির ফলে কল্পনার যোগ ঘটালেই আর একরকম ফল দেবে তা তোমার ধাতে সইবে না, আমারও বদনাম। তোমার নিজের কোন কাজেই বাধা হবে না এটা। চেষ্টা এটুকু করবে—তোমার শত্রু ব'লে কেউ যেন ফাঁক না পড়ে, বাদ না যায়। এইভাবে সবাইকে জড়াও দেখি এই জালে। দেখনা, কি ফল হয়। তারপর আর এক কথা—কারো সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথা বা কোন আলোচনাই চলবে না—স্ত্রীর সঙ্গেও না। মোদ্দা কথা এই যে তুমি ছাড়া তোমার এই সাধনের কথা আর কেউ জানবে না। তারপর যা, সেটা শুধু যখন আমি আসবো তখন বুঝবো, কেমন?

প্রথম পরিচয়ে দেখেছিলাম যোগী এবং ঐশ্বর্যশালী; তারপর দেখলাম রাগমার্গের প্রবল অধিকারী। হরি, হরি এখন দেখলাম—পূর্ণজ্ঞানী বৈদান্তিক। এই ত্রি-মূর্তিই সাধুকে পরমহংসের স্তরে ধরে রেখেছে।

এখন শেষ কথাটা শোনো ব'লে সাধু চক্ষু দুটি খুললেন. আজই আমি যাচ্ছি। যদি আবার কখনও এ দিকে আসি তো দেখা হবে। আচ্ছা, এখন বল, পারবে তো?

চেষ্টা করব, তবে নিশ্চয়ই পারব কিনা—

আবার সন্দেহ! কাজ নেই তা হ'লে, ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার যা কিছু—

না না, তা হবে না প্রভু! যা দিয়েছেন তা একেবারেই দিয়েছেন, আমার বিশ্বাসটা প্রথম থেকেই জমে গিয়েছিল, কোন সংশয় নেই, তবে বলতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল তাই। এখন থেকে আমরণ এ অভ্যাস আমি ক'রে যেতে পারব।

যে আত্মবিশ্বাস তোমার সকল কর্মগতির মূলে সেইটিই থাকবে এর মধ্যেও,—

এইখানেই ইতি করো বাবাজী।

সমাপ্ত